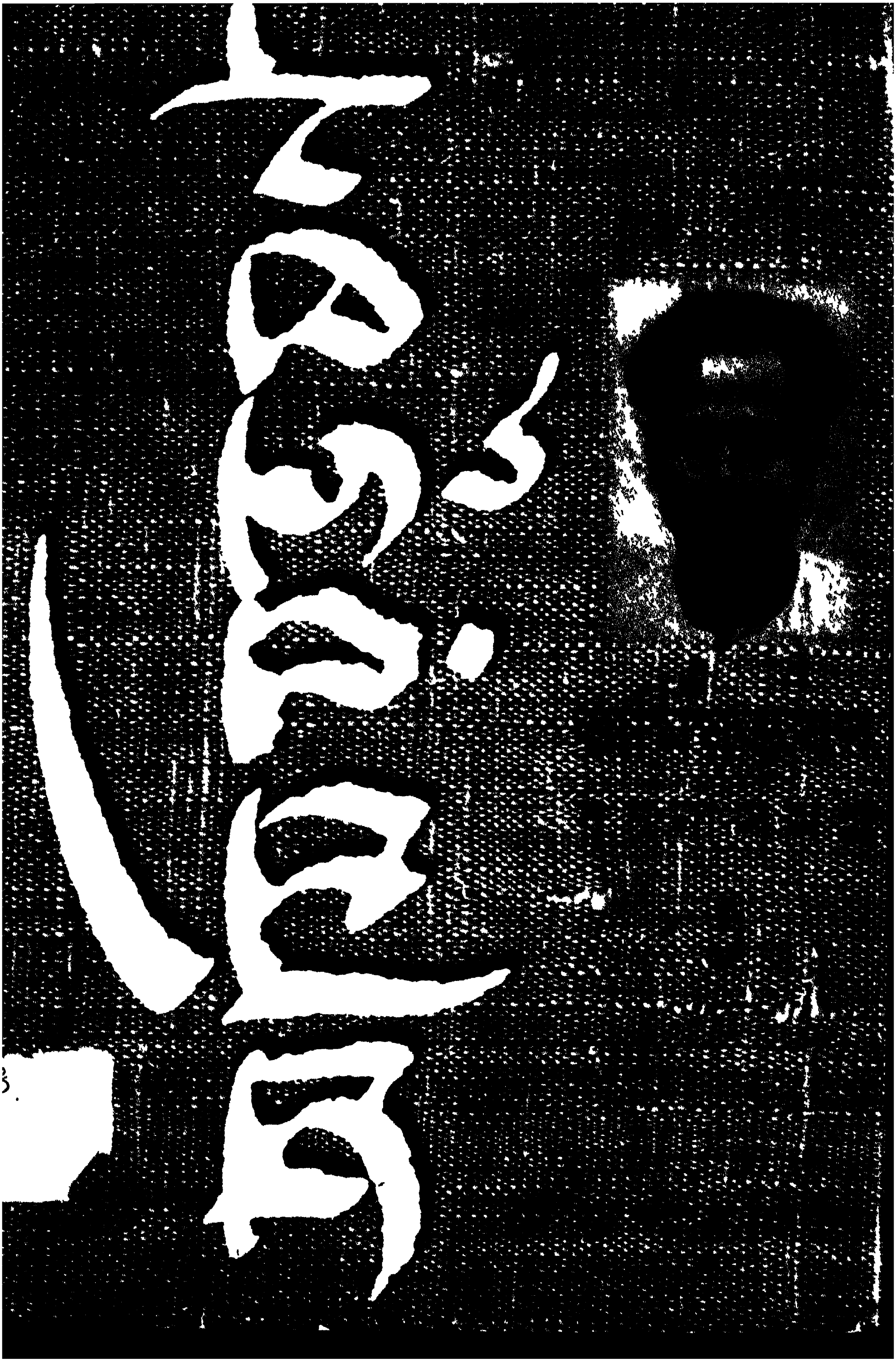


অমিয়ভূষণ
রচনাসমগ্র
৩

গ্রন্থনা

তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

AMIYABHUSHAN RACHANASAMAGRA (Vol III)

Collected Works of AMIYABHUSHAN MAJUMDAR
Published By Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

Rs. 250.00

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

দাম · ২৫০ টাকা

ISBN 81-295-0423-5

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

তৃতীয় খণ্ডে এসে অনুমান সত্যি হয়ে গেল—রচনাসমগ্রের গ্রন্থনা প্রস্তাবিত কালানুক্রমিক বিন্যাসে সম্ভব হল না, কথার খেলাপ তো বটেই। সত্যি যে, পদ্ধতি প্রয়োগের আগে নিজের অবস্থান ও সম্বল বুঝে নেওয়া জরুরি ; হিসেবি হয়ে সব অঙ্ক কষে উত্তর জেনে নিতে পারেন যিনি তাকে দূরদ্রষ্টা বলা হয়—কিন্তু, এভাবে হাতড়ে চলার মধ্যে পথের সঙ্গেই এক বোঝাপড়া তৈরি হয়, অর্জন হিসেবে যা ফেলনা নয়। দেখা গেছে, অমিয়ভূষণের সাহিত্যকৃতির আলোচনায় যত-না আগ্রহ, তুলনায় তাঁর রচনাপঞ্জির বিন্যাসে তেমন নয়। হতে পারে যে, কবে কোথায় কোন লেখা সেসবের পঞ্জিকরণ বা তথ্যবিন্যাস সমালোচন-পদ্ধতির অন্তর্গত নয়, সে-কাজের অন্য শ্রমিক আছে। যে-দীর্ঘ সময় জুড়ে অমিয়ভূষণ সাহিত্যচর্চা করেছেন, প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনা সেসবই শহরের মফস্‌সলের গঞ্জের স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকায়। সব পত্রিকা সহজলভ্য নয়, গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত নেই ধারাবাহিক ক্রমে, অন্যদিকে রচনাপঞ্জি চিহ্নিত যা পাওয়া যায় সেগুলি সূত্র মাত্র। আর, এই খণ্ডিত সূত্র নির্ভর করে আদতে পৌঁছানো ; মূলে পৌঁছানোর প্রয়োজন একমাত্র কারণে যে, তাঁর রচনার এক সামান্য অংশই আমাদের পরিচিত, বই আকারে প্রকাশিত হয়নি এমন রচনার সংখ্যাই বেশি। এমনও দেখা গেছে, 'প্রথম' প্রকাশ বলে মনে হয়েছে যে-রচনা প্রকৃতপক্ষে তা পুনর্মুদ্রণ—পত্রিকা 'সম্পাদক' সম্পাদনার সামাজিকতায় বিশ্বাসী নয় বলেই সূত্রোল্লেখ অবান্তর মনে করেন। এইভাবেও তৈরি হয়েছে এক 'আমাদের' অমিয়ভূষণ। অন্যতর সঙ্কট, পত্রিকার সম্পাদনার বিভিন্ন রীতি—কী বানানে, কী বিন্যাসে, এমনকী প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রেও ; জানা যাচ্ছে না লেখক কীভাবে বিন্যাস করেন, ক্রমান্বয়ে কীভাবে গড়ে ওঠে তাঁর ভাষা-ভাবনা, বানান-জিজ্ঞাসা। রচনাসমগ্রের প্রমিতকরণ এককথায় তাই অসাধ্য (আর, বাংলা বানান কুটির শিল্পোদ্যোগের মতো অঞ্চলভেদে, মৌজাভেদে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট)।

ইত্যাকার বিড়ম্বনার পরে লক্ষ করা যায়, গ্রন্থপ্রকাশের নিরিখে, যেন 'দুই' অমিয়ভূষণ। প্রথম জনের সমাপ্তি ১৯৬৫ সালে 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয় অমিয়ভূষণ ফিরে আসেন তে যখন এক ছোট প্রকাশক 'মহিষকুড়ার উপকথা' ছাপেন। অথচ, অন্তর্বর্তী এই ষোল বছরে পূর্বেকার মতোই সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি ; বরং গল্প-উপন্যাসের প্রায়-সমান্তরালে সাহিত্যভাবনাগত প্রবন্ধ বা আখ্যান লিখেছেন, নানা আলাপচাবিতায় আত্মবৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে যা পড়ছেন, যা ভাবছেন, এমনকী নিজের রচনার বিষয়েও জানাচ্ছেন। অমিয়ভূষণ তাঁর নিজের মতোই ছিলেন, ছিল না শুধু তাঁর 'বই'-এর প্রকাশক। আজ বাংলা সাহিত্যের সৃজনমূলক ঐতিহ্যের কথা বড়মুখ করে বলার সময়ে শুধু এই নির্লিপ্তির পর্বও মনে রাখা প্রয়োজন। বাস্তবিকই আগ্রহ জন্মায় কী ছিল মধ্য-ষাট বা সত্তরের দশকের বাংলা প্রকাশনার বাজার, এক প্রকাশনা-সুমারির বড় প্রয়োজন পড়ে তাই। জানতে ইচ্ছে হয়, 'লেখকদের লেখক' এমনই এক শিল্পিত চতুরালিতে দূরে সরিয়ে রাখার সাংস্কৃতিক প্রকৌশলের সবকিছু ততদিনে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে? অমিয়ভূষণ নিয়ে যত শ্লাঘা, যত আহ্লাদ সেসব সৎ-উদ্‌যোগের পরেও এই মুহূর্তে স্মরণ করতে চাই তাঁরই এক বাক্য : "আশির দশকের একজন উদীয়মান লেখক হিসাবে নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থিত হতে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করেছিলাম।" এই লজ্জা মনে রেখেই শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও, দেরিতে হলেও বর্তমানের সব আয়োজন—'সমগ্র' না-হোক, সংকলন তো বটেই।

সময়েরই এক গভীর ফেরে সবকিছুই যখন স্থূলতায় একাকার করে দেওয়া যায়, ক্ষমতাস্পর্ধীর তালুবন্দি সময়ে মানুষ যখন মানুষকেই লুকিয়ে ফেলার সব প্রযুক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে, সময়-অসময়ের সেই

ক্রান্তিকালে আমাদের মতো দেশগুলির সব সাহিত্যভাবুকেরই একমাত্র আশ্রয়বিন্দু নিজেকে নিয়ে সময়েরই মুখোমুখি বসা—এই তাঁর গরল, এই তাঁর অমৃত ; অমিয়ভূষণ আর কী করে ব্যতিক্রমী হবেন। আর, এও সমান সত্য, এই সময়কথা সেই 'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী' পাঠক আজ জেনে নিতে চাইছেন কবে, কোথায়, কী তাঁর সম্বল।

স্মরণ করি অমিয়ভূষণ মজুমদারের অন্যতম সুহৃদ, তাঁর রচনার প্রকাশক 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক অনিলকুমার সিংহ মহাশয়ের প্রয়াণ—এই খণ্ড প্রকাশে যাঁর অকৃপণ সাহায্য ও আতিথেয়তা ব্যক্তিগত অর্জন বলে মনে করি।

অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র
তৃতীয় খণ্ড

সূচি

কেন লিখি

কেন লিখি—এটাও একটা সমস্যা হতে পারে। এ সমস্যার অর্থ এই নয় যে লেখক হতাশ হয়ে পড়েছে লিখে কোনো লাভ নেই দেখে। বরং যেন এমন একটা ঝোঁক আছে যে হতাশা নানা রকমের থাকা সত্ত্বেও লিখছি এবং তারই কারণ খোঁজা।

কোনো কোনো লেখক বলেছেন না লিখে উপায় নেই বলে লিখে থাকেন তাঁরা। তাদের এ কথা শুনে প্রথমেই যা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই, কেউ যেন কিছু যেন তাদের পেয়ে বসেছে, সে-ই লিখতে বাধ্য করে। এ ভঙ্গিটা পাঠকসমাজকে অতীন্দ্রিয়র সান্নিধ্যে এনে চমকিত করতে পারে কিন্তু এ রকম কোনো প্রেরণার উৎসে মানুষ আজকাল আর বিশ্বাস রাখে না। লেখকদের এ বক্তব্যেরই আর একটি রকমফের আছে। তাতে বলা হয়েছে অন্তরে প্রয়োজনের বেশি বাড়তি খানিকটা কিছু আছে বলেই সাহিত্য করা। সেই বাড়তি কিছুর স্বরূপ নির্ধারণ কঠিন তো বটেই কিন্তু বাড়তি কিছু থাকলেই তা সাহিত্যের দিকে টানবে বা ঠেলে দেবে এমন নিশ্চয়তা দেখছি না। একই যুগে মানুষ এই বাড়তি কিছুর চাপে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ হয় কেন? বাড়তি কিছু নিশ্চয়ই থাকে—সেটা অন্যের চাইতে পরিশ্রম বেশি করার সাহস ও সামর্থ্য—এক ধরনের বাড়তি জেদও যেন। কিন্তু এ বাড়তি কিছু পথ বলে দেয় না। পথে চলার শক্তি যোগায় বরং।

এ কথাটা সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো সাহিত্য করার পথটাকে আমরা সজ্ঞানে বাছাই করে নিয়ে থাকি। আর বাছাই করার ব্যাপারটা হয় পুরো মন দিয়ে। মনের চেতন বা অবচেতন অংশ কে কাকে কতটুকু সাহায্য করল এ ব্যাপারে তা বলতে যাওয়া বৃথা। সাহিত্যকে মন সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করছে, তখন বাড়ির কে কতটুকু সাহায্য করবে, আয়োজনে কী তাদের প্রস্তুতি সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করলে অতিথি বিড়ম্বিত বোধ করতে পারে।

বাছাই করার কথা যখন বলা হয়েছে তখন এটা বুঝতে হবে সে আর যাই হোক অন্তত অজ্ঞাতকুলশীল নয়। কিন্তু এখানে এই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে মানুষের বেলায় যেমন সাহিত্যের বেলাতেও তা হতে পারে—অনেকের কাছে সে অনেক ভাবে পরিচিত এবং সব পরিচয় যে-কোনো একজনের জানা নয়। এটা স্বীকার করাই ভালো তার কোন পরিচয়টা সত্যিকারের পরিচয় এ নিয়ে এখনও তর্কাতীত অবস্থায় পৌঁছানো যায়নি। কিন্তু এ কথাও সত্য, তার একটি পরিচয় সত্য বলে লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটাই তার 'কেন লিখি'র উত্তর হতে পারে।

এ বাছাই করার ব্যাপার থেকে আর একটি বিষয় এই বলা যায় যে লিখবার একটা উদ্দেশ্য আছে।

এ রকম একটা উদ্দেশ্যর কথা শোনা যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যসৃষ্টি। বলা হয়ে থাকে বহির্বিশ্বে সৌন্দর্য আছে—শিশুর হাসিতে, পাখির ডানায় চমকে ওঠা রোদে, কোনো হিমবানের স্তব্ধ গাম্ভীর্যে। মহতেও আছে, ক্ষুদ্রেও আছে। মানুষ তার অনুকরণ করে যেমন অন্যান্য চারুশিল্পে তেমনি সাহিত্যেও। তাহলে সৌন্দর্যসৃষ্টির কারণ কি এই অনুকরণ প্রবৃত্তি? পশুজগতে পরিবেশকে অনুকরণ করার একটা রীতি আছে—সেটা অনুকরণের জন্যই অনুকরণ করা নয়। আমাদের এই অনুকরণের ঝোঁক যদি অনুকরণের জন্যই অনুকরণ না হয়ে থাকে তবে তার সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বর বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যের স্রষ্টা। মানুষ ঈশ্বরের অনুকৃতিতে সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর যেমন বিশ্বজগতে সৌন্দর্য নিয়ে মাখামাখি করেছে, আমরাও সাধ্যমতো তা করে থাকি। ঈশ্বরের সৌন্দর্যসৃষ্টির হেতু যেমন অনির্ণেয় আমাদের সৌন্দর্য-অনুকৃতির

কারণও আমাদের কাছে তেমনি দুর্জ্ঞেয়। এ বলে কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নকে নির্বাক করে দেয়া যায় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যার নেই সে তবে সৌন্দর্যসৃষ্টি করবে কেন? অনুকৃতির যুক্তিটাকে রেখে বলা যায় প্রকৃতির কথা। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম তাই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে প্রকৃতিতে আসা দুর্জ্ঞেয় থেকে পরিজ্ঞাতে আসার সামিল। ফুল সুন্দর কেন এর ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা আর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা এক নয়। ফুল সুন্দর, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক বলবে, এইজন্য যে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করতে হবে। সন্ধ্যার মেঘ সুন্দর এইজন্য যে সূর্যের আলোটা বিচিত্রভাবে পড়েছে মেঘে। দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যের কারণ আছে প্রকৃতিতে, উদ্দেশ্যও আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এ থেকে এ রকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দিকে ঝোঁক দেখা দিতে পারে—ঐশ্বরিক দুর্জ্ঞেয়তার কিম্বা প্রাকৃতিক পরিজ্ঞাততত্ত্বের অনুকরণে শিল্পে সৌন্দর্যসৃষ্টিরও একটা উদ্দেশ্য আছে। নতুবা বলতে হয় মানুষ বহিরঙ্গটুকুই অনুকরণ করতে পেরেছে অন্তরঙ্গ অনুকরণ করার শক্তি তার নেই।

তা সত্ত্বেও এ রকম শোনা গেছে সৌন্দর্যই সৌন্দর্যর শেষ কথা। সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যই সৌন্দর্যসৃষ্টি! এ মত মানতে হলে বলতে হবে বহির্বিশ্বে যে-সৌন্দর্য রয়েছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবং যথেষ্ট নয় বলেই এ ধরনের সৌন্দর্যসৃষ্টির একটা সার্থকতা আছে। যথেষ্ট হতো যদি বহির্বিশ্ব, সে সার্থকতা থাকত না। কিন্তু এ যুক্তিটাকে খুব সবল বলে বোধ হয় কেউই উপস্থাপিত করে না। কারণ এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায় যে বহির্বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতার অনুভবকে অ-যথেষ্ট বলার মতো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায়, সৌন্দর্যকে সৌন্দর্য হিসাবেই দেখতে গেলে সেটা বহির্বিশ্বে প্রতিভাত সৌন্দর্যেরই হেরফের। হয়তো ফটোগ্রাফ না হয়ে চিত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে চিত্রও একরকমের অনুকৃতি। যদি পরিপূর্ণটাই যথেষ্ট বিবেচিত না হয় তার একটা অংশের অনুকৃতি কী করে তা হবে?

এ যুক্তিটাকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেই বরং সৌন্দর্যবাদীরা বলে থাকে—সৌন্দর্য এইজন্যই যে সৌন্দর্যই সত্য, এবং কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছে—তাই কল্যাণ (আর এ বলা থেকেই কি প্রমাণ হয় সৌন্দর্য তখনই দাঁড়াতে পারে যখন তা সত্য এবং কল্যাণ?)। এ যুক্তিটাকে বুঝতে হলে আগে সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। সেটা এক দার্শনিক দুরূহতা—যার শেষ পাওয়া যায়নি।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য, সত্য এবং কল্যাণ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হল তা শব্দগুলির সাধারণগ্রাহ্য বোধের উপরে নির্ভর করেই। বিশুদ্ধ সত্য বা কল্যাণ অথবা সৌন্দর্যর সংজ্ঞা দেয়া কঠিন হলেও দেয়া যায় এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় সেগুলিকে বুঝবার মতো মনকেও আমরা কল্পনা করতে পারি। এবং হয়তো সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণ একই হয়ে ওঠে। কিন্তু দুটি কারণে সাহিত্যে সেই বিশুদ্ধত্বের স্থান নেই। প্রথম কারণ এই যে সেই বিশুদ্ধত্বে পৌঁছালে সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্যের বোধ পৃথক থাকে না। সেখানে সত্য এবং অসত্যে, কল্যাণ ও অকল্যাণেও পার্থক্য নেই, সুন্দর ও অসুন্দরের প্রভেদ সেখানে লুপ্ত। দ্বিতীয়ত, এই বিশুদ্ধত্ব নিয়ে সংসারে এবং সাহিত্যে দু-পাও চলা যায় না। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য, সৌন্দর্য সত্য এবং কল্যাণের বোধ জনে জনে পৃথক। কিন্তু এ সত্যকেও আমরা সংসারে ও সাহিত্যে গ্রহণ করি না। তার কারণ আমার এবং আমার পাঠকের বোধে পার্থক্য আছে এই যদি ধরে নিই, আমার কথা বলা হয়ে দাঁড়ায় নিরর্থক। আমার কল্যাণবোধ যদি রাষ্ট্রের অন্য সকলের কল্যাণবোধ থেকে পৃথক হবে বলে মনে করি রাষ্ট্রের জন্য আমি কিছুই করতে পারি না। রাষ্ট্রের বেলায় আমি যদি ধরে নিই আমি যাকে কল্যাণ ভাবছি অন্যেও তাকেই নিজের কল্যাণ বলে গ্রহণ করবে তবেই কল্যাণ করার দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি। সাহিত্যেও তেমনি একজন বিদগ্ধ পাঠক কল্পনা করে নিয়ে কথা বলা হয়—যার বোধ সাহিত্যিকের বোধের সঙ্গে সমান। এবং তার বোধকেই সাধারণগ্রাহ্য বোধ বলতে হয় কারণ সে-ই সব পাঠকের সাধারণ প্রতিভূ। এদিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

সুন্দর ও সত্য কি এক? সত্য তো অপ্রিয়ও হতে পারে এবং অপ্রিয় বিষয়কে কখনও সুন্দর বলা হয় না। সুতরাং সত্য মাত্রই সুন্দর নয়। প্রিয় মিথ্যাও আছে। 'সুন্দর' একটা সুপ্রকাশিত মিথ্যাও হতে পারে? সুরার প্রিয়তাকেই উদাহরণ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। কারো কারো কাছে সুরা নিশ্চয়ই প্রিয়। সুরা বলাধানের ভ্রান্তি জন্মায়। এটা কি সুন্দর একটা অসত্য বলে নেয়া যায় না? মৃগতৃষ্ণিকাকেও এখানে বিষয়ে হিসাবে নেয়া যেতে পারে। মৃগতৃষ্ণিকা সুন্দর—দৃশ্য হিসাবে নিশ্চয়ই এবং তা মৃগতৃষ্ণিকা হিসাবে সত্যও বটে। কিন্তু নীল বনরাজির সুজল আশ্বাস হিসাবে তার চাইতে মিথ্যা আর কী আছে, কিম্বা তার চাইতে ভয়ংকর অকল্যাণই-বা কী হতে পারে?

সব 'সুন্দর' সত্য নয়, এবং কল্যাণের কি না তাও সন্দেহ আছে। 'সুন্দর' কল্যাণেরই-বা কী করে হবে? শোনা গেছে নির্ঝরের মর্মরজাত সৌন্দর্য কোনো রমণীর মুখাকৃতিতে ছাপ রেখেছে। বলা বাহুল্য এটা চিরায়ত সর্বজনীন সত্য হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না। কিন্তু সীমায়িত সত্য হিসাবেও এ কবিচিন্তার কতটুকু তাৎপর্য? লুসির মুখে যে শান্তির স্নিগ্ধতা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি সে নগরে এসে পৌঁছালেও থাকবে? অন্য কথায় সৌন্দর্য যে কল্যাণ করেছে লুসির সেটা কি একটা কাব্যগত প্রত্যয় মাত্র নয়? যেহেতু সে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছিল তার সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য-উপজাত কল্যাণ কি তাকে পথ দেখাতে পারবে? কপালকুণ্ডলাকে পেরেছিল? সৌন্দর্য কল্যাণে পৌঁছে যাচ্ছে এর অন্য একটি উদাহরণও দেখানো হয়ে থাকে। গ্রীক সুরীরা বলেছে ট্র্যাজেডির বেদনাগূঢ় সৌন্দর্য মানুষকে বেদনা সম্বন্ধে সচেতন করে, মঙ্গল ও অমঙ্গলের পথের উদাহরণ তুলে ধরে মানুষকে কল্যাণ চিনতে সহায়তা করে। কিন্তু প্রকৃতই কি সেটা সৌন্দর্যর অবদান। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে কল্যাণ যা করে সেটা ট্র্যাজেডিতে বর্ণিত মানবিক অভিজ্ঞতা। এবং অভিজ্ঞতা হিসাবে তা যে খুব সুন্দর তাও নয়।

যা কিছু সুন্দর তাই সত্য এবং কল্যাণের এটা বলা যেমন বিপজ্জনক, কোনো 'সুন্দর' ই সত্য এবং কল্যাণের নয় বলাও তেমনি ভ্রমাত্মক। এমন কোনো কোনো প্রান্তিক উদাহরণ আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যেখানে একটি বিষয় যতখানি সুন্দর ঠিক ততখানি সত্য এবং ততখানি কল্যাণ। তা হলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি এই প্রান্তিক উদাহরণ সৃষ্টি করা? বরং এর বিপরীতটাই যেন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যে সৌন্দর্য সত্য এবং কল্যাণ সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করছে এটা আদৌ আমাদের অভিজ্ঞতা নয়। রামায়ণে সৌন্দর্য আছে, কল্যাণও বলতে পারি তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে, কিন্তু সত্য? এ কথা আমরা বহুবার শুনেছি অযোধ্যার রামের চাইতে বাল্মীকির রাম অধিকতর সত্য। অযোধ্যার রাম ও বাল্মীকির রাম পৃথক সত্য হতে পারে, কিন্তু একে অন্যের চাইতে অধিকতর সত্য হবে কেন? সুন্দরতর বলে? তাই যদি হয় তবে সেটা বৃত্তে ঘুরে ক্লান্ত হওয়ার সামিল হবে—যেহেতু সুন্দর সেজন্যই সত্য এই হবে একমাত্র ন্যায়। রামায়ণে সত্যকে বরং যেন দ্বিধাগ্রস্ত দেখতে পাই। কখনও 'সুন্দর'কে স্থান করে দেবার জন্য কখনও-বা কল্যাণের শাসানিতে সত্য আত্মগোপন করেই থেকেছে। বলা বাহুল্য, রাবণ দশমুণ্ড হওয়াতে আমাদের সত্যবোধ পীড়িত হয় না। রাবণের কেন পরাজয়? সে পাপী বলে? পাপী কি পৃথিবীতে পরাজিত হবেই এমন কোন কার্যকারণ তত্ত্ব আছে? পাপ কী? তথাপি রাবণের পক্ষেও মৃত্যুটাই কল্যাণ—এই তত্ত্বই যেন প্রতিভাত হয়। আর এটা শুধু প্রাচীনকালেই হয়েছে তা নয়। আধুনিকতর দিনে শেক্‌স্‌পীয়রীয় চিন্তায় 'সুন্দর' সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য নয় এমন ক্ষেত্রেও কল্যাণ অকল্যাণের প্রশ্ন সু-কুএর নাম নিয়ে সত্যকে বিড়ম্বিত করেছে। লিয়ার তার নির্বুদ্ধিতার জন্য যখন বিব্রত বিড়ম্বিত, গ্লস্টার তার অসম্বৃত প্রবৃত্তির হাতে যখন নিহত, তখন সীমায়িত মানবিক চেতনার জন্য আমরাও হাহাকার করে উঠি। কিন্তু সেই অলোকসম্ভব সৌন্দর্য এবং আংশিক কল্যাণবোধের মধ্যে এই প্রশ্নও জেগে ওঠে, এই অব্যবস্থিতচিত্ত চরাচরে 'কু' কি পরাজিত হয়। অন্যায় কি বিজয়ী হয় না অন্তত ততবারই যতবার ন্যায় জয়লাভ করে?

বস্তুত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রকম একটা ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুন্দর, কল্যাণ ও সত্যকে

সমভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্পৃহা কালের সঙ্গে সঙ্গে কমে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও গোর্কি কল্যাণকে রক্ষা করতে গিয়ে সত্য ও সুন্দর থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। জোলা সত্য ও কল্যাণকে স্থান করে দিতে গিয়ে সুন্দর থেকে বিচ্যুত, ফ্লবেয়ার সত্য ও সুন্দরকে বিধৃত করে কল্যাণকে বিস্মৃত। (এখানে বলে রাখা ভালো সাহিত্যে 'সুন্দর' বলতে তার ভাষার প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি গুণাবলী, সুষম প্রয়োগকৌশল, কিম্বা যথোপযুক্ত অলংকারের সদ্‌ব্যবহার বোঝায় না। এগুলি সাহিত্যেব এমন কতগুলি বহিরঙ্গ যা যে-কোনো শিল্পীকে আয়ত্বে আনতেই হবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার পেতে হলে। অন্য কথায় তার সাহিত্যকে আলোচ্য হবার গৌরব পেতে হলে)।

এটা আমাদের বলবার উদ্দেশ্য নয় যে সাহিত্যে সুন্দর কল্যাণ সত্যের অসম অবস্থিতি সাহিত্যের মূল্য হরণ করেছে। বরং বিপরীত। সাহিত্য এই স্বীকৃতি পাওয়ার পক্ষে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সম-সহ অবস্থিতি অপরিহার্য নয়। আর এই বিষম অবস্থায় নিয়ে আসাটা ব্যুৎপত্তিগত বা অন্য কোনো অক্ষমতার ফলও নয়। বরং যেন পছন্দ করার ব্যাপার, পথ বেছে নেয়ার ব্যাপার। সাহিত্যিকের শিল্প যদি পাখির গান হতো, বলা যেত তাদের বৈচিত্র্য প্রকৃতিদত্ত, ওর উপর তার হাত নেই। পাখির গান পাখির সৃষ্টি নয়। সে বহন করছে একটি ইতিপূর্বে নির্ধারিত সংঘটন। সাহিত্যিকের এমন সুবিধা নেই। তাকে কিছু বলতে হবে এবং তা বলতে গিয়ে সে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের স্থির অবস্থানে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে, বিচ্যুতি ঘটিয়ে বসে। আর এসবই সে করে দায়িত্ব নিয়ে সজ্ঞান মানসে। শেক্‌স্‌পীয়র নিজে খুব ভালোভাবে জানতেন নেমেসিস্ যদি সত্য হয়, পাপ যদি তার মৃত্যুবীজ নিজেই বহন করে, পৃথিবীতে পুণ্যের জয়ও বিশেষভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত। করডেলিয়ার মৃত্যু হয়। আর করডেলিয়ার মৃত্যু হয় বলেই এই পৃথিবী ট্র্যাজিক। লিয়াবের নিজের মৃত্যুর ব্যাপারটা সাহিত্যে স্বীকৃতি পাবার মতো উল্লেখযোগ্য নয়। আর ব্যাস জানতেন এই পৃথিবীতে পুণ্য বলো কিম্বা 'সু' বলো তার বিজয়লাভের পথ আপাতত আত্মহনন বলেই মনে হবে, কিন্তু পৃথিবী ট্র্যাজিক কিছু বললেই শেষ কথা বলা হয় না। ট্র্যাজিক প্রাকনির্ধারণকে চেতনা দিয়ে লঙ্ঘন করার পরীক্ষায় নামার মতো উদার ব্যাপ্তিও আছে পৃথিবীতে। লক্ষণীয় ব্যাস এবং শেক্‌স্‌পীয়রের চেতনায় সু এবং কু-এর দ্বন্দ্বে 'সু'-এর দিকে তাঁদের পক্ষপাতিত্ব থেকে গেছে, যদিও তাঁবা জানতেন সু এবং কু-এব পরাজয়ের সমান সম্ভাবনা আছে। শেক্‌স্‌পীয়রের কল্যাণবোধ 'সু'কে বিজয়ী করতে গিয়ে বেদনাদায়ক সত্যের সম্মুখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু সুন্দরের খাতিরে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেননি। পক্ষান্তরে ব্যাস যেন জানতেন একটা ট্র্যাজিক ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যাওয়ার চাইতে জীবন গভীর। আর অনন্তকালের ব্যাপ্তির তুলনায় মানবীয় ক্লাইম্যাক্সের সংঘটন সময়টুকু এত অকিঞ্চিৎকর যাকে সুন্দরের খাতিরেও মূল্য দেয়া যায় না।

বস্তুত সত্য, কল্যাণ, সুন্দর প্রভৃতি যেন সাহিত্যিকের হাতে ধরা তুলির রং ; কতটুকু কার প্রয়োগ হলে সাহিত্য তাঁর মনের মতো হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যভাবনা বিমূর্ত হয়ে ওঠে, এ তিনিই জানেন। আমরা শুধু সম্পূর্ণটাকে দেখে মোহিত হতে পারি, 'আশ্চর্য' এই কথাটা বলে উঠতে পারি। আর তার বেশি সচেতন হওয়াব মতো যদি সামর্থ্য থাকে , সাহিত্যিকের সাহিত্যভাবনা আমার নিজস্ব হতে পারে। এর এটাই শেষ কথা, সাহিত্যের সার্থকতা।

কিছু একটা সাহিত্যিক বলতে চান। এই পৃথিবীতে বাস করে এর অণুতে এবং সমগ্রতায় তিনি কিছু দেখে থাকবেন অন্য অনেকে যা দেখেনি। সে কথাটাই তিনি প্রকাশ করতে চান! এবং যেহেতু সমগ্র চরাচরকে ভূর্জপত্র কিম্বা কাগজের পিঠে স্থাপন করা সম্ভব নয়, কলাকৌশল করে তারই ভ্রমোৎপাদন করতে হয়। এই ভ্রমোৎপাদনই তার আর্ট। আর তার হাতের রং হচ্ছে সত্য কল্যাণ ও সুন্দরের সাধারণগ্রাহ্য বোধ।

চিত্রণের উপমাটা রেখে আরো বলা যায় রঙের প্রয়োগের তারতম্য শুধু পরিমাণগত নয়, আপাতন এবং গুণগতও বটে। তিন রং তেত্রিশ রং হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিল্পীর হাতে। লোহিত যেমন একশো রকমের

লাল হতে পারে, কল্যাণ বা সুন্দরও তাই হতে পারে। একেই অন্য কথায় কল্যাণ ও সুন্দর কিম্বা সত্যের বিভিন্ন মান আবিষ্কার বলা হয়ে থাকে। পিকাসোর ছবিতে কতখানি কোন আপাতনের কোন রং আছে, রেখার কোথায় কোন বক্রতার সুষমা এ কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ার পর কারো কারো চেতনায় ধরা দেয় চিত্রটিতে বিধৃত পিকাসোর নিজস্ব চেতনা। পিকাসোর সব প্রয়াস তখন সার্থক হয় এবং চিত্রে বিধৃত পিকাসোর এই চেতনাই চিত্রটির ভাবরূপ। এই ভাবরূপকে এক চেতনা থেকে অন্য চেতনায় স্থানান্তরিত করা যেমন পিকাসোকে পিকাসো করে তেমনি সাহিত্যিককে নামের যোগ্য করে তোলে। সৌন্দর্যসৃষ্টি করা কিম্বা সৌন্দর্যকে সত্য ও কল্যাণ বলে প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয় সাহিত্যিকের। লিয়ারের পরিণতি কিম্বা অন্য কারো পরিণতিই শেক্‌স্‌পীয়র নয়, পৃথিবীর ট্র্যাজিক ধারণাটাই শেক্‌স্‌পীয়র-চেতনা এবং সেটাই সাহিত্য।

কিন্তু এহ বাহ্য। ভাবরূপকে স্থানান্তরিত করার এই প্রয়াস কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েই আবার নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হয়। এই প্রয়াসের মূলে যে-তাগিদ সেটাকে দুর্জ্ঞেয় বলে বোধ হতে থাকে। কেন হয় তার উত্তর নেই যেন। আর উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ইতিপূর্বে অনেকে বলেছে অনুকৃতির কথা। কিন্তু যা চরাচরে আছে তারই অনুকরণ? যেন সর্বব্যাপী একটি চেতনা যে-তাগিদে চরাচর সৃষ্টি করেছে সাহিত্যিকও সেই একই তাগিদে সৃষ্টি করে চলেছে। সেই সর্বব্যাপী চেতনার অংশ সাহিত্যিকের চেতনাও। সেজন্যই সাহিত্যিকের চেতনা এবং ধারণা-বিধৃত ঈশ্বরের চেতনার তাগিদও এক—সে তাগিদ নিজেকে আবিষ্কার করা। সর্বব্যাপী চেতনাই-বা কেন করে এই প্রয়াস? আপাতত জনৈক ইহুদি দার্শনিকের মতো বলতে ইচ্ছা হয় : ত্রিভুজের তিন কোণ মিলে দুই সমকোণ হবেই। এটা অন্য কোনো উপযুক্ত ভাষার অভাবে বলা যায় প্রকৃতিগত। তেমনি চেতনার এই আত্মানুসন্ধানও সেই অর্থে ততখানি প্রকৃতিগত। এই আত্মানুসন্ধানের জন্য কখনও সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রচলিত প্রত্যয়কে লঙ্ঘন করে করে সাহিত্যিক অগ্রসর হতে থাকে। পথে হয়তো পৃথিবীর ট্র্যাজিক ধারণাটা আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়।

কিন্তু ঈশ্বর একবার ভুল করেছিলেন। তিনি একটা প্রকল্প খাড়া করে সেটিকে পরে যেন প্রমাণ করতেও চেয়েছিলেন। মানুষকে তিনি ইডেন উদ্যানের চতুঃসীমায় আটকে রাখবেন ভেবেছিলেন। এটা যেন তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের পথে ক্লান্তির চিহ্ন। ফল ভালো হয়নি। আত্মজের অসীম বেদনার মূল্যে সেই প্রকল্পকে নাকচ করাতে হয়েছিল। সাহিত্যিকরাও যে অনুরূপ ভুল করে না তা নয়। মানুষকে কখনও কখনও প্রকল্পের ছকে ফেলে দিয়ে প্রাকনির্ধারিত করার প্রয়াস করে সে। কিন্তু সাহিত্যিকের বারবার এই ভুল করে গেলে বোধ হয় চলবে না। তার আত্ম-আবিষ্কাবের এখনও শেষ নেই। কোনো প্রকল্প বলার সময় এসেছে—এ বলা শুধু ভুলই নয় ; মনে রাখা বোধ হয় দরকার, আমাদের সমস্ত প্রকল্প, এমনকী সত্য সুন্দর কল্যাণ সম্বন্ধেও, দাঁড়ায় বুদ্ধির উপরে। আর বুদ্ধি চেতনার একটা ক্ষীণাংশ মাত্র। নিজেকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে বুদ্ধি খানিকটা বোধহীন।

আর, বুদ্ধি যে সত্তাসারের সমগ্রতা ধরতে পাবে না দর্শন অনেকবার এ স্বীকারোক্তি করেছে। সেজন্যই আত্ম-আবিষ্কার আপাতদৃষ্টিতে দর্শনের 'দায় বলে ভ্রান্তি জন্মালেও মানুষ সাহিত্যের দিকে না ঝুঁকে পারে না। সেজন্যই লেখা।

অথবা কেন লিখতে হয়ই, কিংবা, আর একটু ভিতরে ঢুকে, কেন লিখতে বাধ্য হই, তা বলছি। এর আগে কেন লিখি তা প্রবন্ধের আকারে বলেছি। এখন, যখন লেখার বয়সই পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে, তখন সে রকম বলা যথার্থ মনে হয় না। লেখা ক্রিয়াটার কর্তা কে? এখন মনে হয়, যে রয়্যাল্টি পায়, পারিতোষিক পেয়েছে, সে ওই কর্তার এক চিরস্থায়ী নম্ ডি প্ল্যুম, অথবা লিপিকুশল গণেশ। ব্যাস কে? সোল নয়, আত্মন নয়, অহম্ নয়। ইংরেজিতে বলা যায় স্পিরিট, ভূত অর্থে নয়, কেননা সে তো বর্তমানই। এসব দেখে এর নাম দিয়েছি অধিদৈবত। এই অধিদৈবত নরনারী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, হিমবৎ ও মহাকাশ সকলেরই আছে। যখন কোনো ভাষা তৈরি হয়নি, যখন জগতে যতসব ঘটনা ঘটছে, ঋতু বিবর্তন, জন্মমৃত্যু, সবই ছিল সেই অধিদৈবতের অন্তরক্রিয়ার অভিক্ষেপ। কারো কারো মতে, পরম সে একম-এর স্বধার মতো, অধিদৈবতের এক সঙ্গিনী থাকে, যার নাম অ্যানিমা। এখন এই অধিদৈবত, যুবরাজের কাছে কোণঠাসা নৃপতির মতো। আত্মা তাকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করেছে। কিন্তু অধিদৈবত বিরাজমান। এই usurper আত্মা এখনও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অধিদৈবতের কোলে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে। আদি থেকেই এই অধিদৈবতের ম্যাজিক করার অভ্যাস। গ্রীষ্মকাল, আকাশ থেকে জল পড়ছে না, গাছে উঠে জল ঢেলে বর্ষার ম্যাজিক করত। যে-পশুদের খাদ্যের জন্য ধরতে হবে বা যাদের কাছে আত্মরক্ষা করতে হবে, গুহার গায়ে তাদের ছবি এঁকে রাখত। কে আঁকছে তা জানাতে নিজের হাতের ছাপ দিয়ে রাখত। সে স্টাইলাইজেশনেও ওস্তাদ ছিল। নইলে নব প্রাণসৃষ্টির প্রতীক বৃষকে স্টাইলাইজ করে ত্রিশূলের রূপ দিতে পারত না। এগুলি বলার একটাই উদ্দেশ্য ; এই অধিদৈবত বিশ্বজগৎকে নিজের অন্তরে ধারণ করতে পারে, যা নেই তাকে সৃষ্টি করার ম্যাজিক জানে, এবং যা চোখের সামনে নেই তা এঁকে চোখের সামনে আনতে পারে, এবং স্টাইলাইজ করে এককে অন্যরূপে দেখাতে পারে। এতক্ষণ এই বলা হল ; গোষ্ঠী-অবচেতনের অংশভাক ব্যক্তি-অবচেতন যার স্বরূপ হতে পারে, সেই অধিদৈবত ম্যাজিকদক্ষ, যা নেই তাকে চোখের সামনে আনতে পারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের অন্তরে নিবিষ্ট করতে পারে এবং ইচ্ছামতো সে দারুণ স্টাইলিস্ট—এককথায়, লেখক হওয়ার সব যোগ্যতা তার এবং লেখাস্বরূপ স্টাইলের ম্যাজিক সে-ই করে থাকে।

এই অধিদৈবত, অহং সকলেরই থাকে কিন্তু আমার অধিদৈবত কেন পলায়নপর হল, অন্য কোথাও যেতে চাইল, নিজের তৈরি জলস্তম্ভবৎ কিছুতে, যেমন অভিমানী রাজা দুর্যোধন, আশ্রয় নিতে চাইল—তা বলতে হলে, আমার ব্যথা-কষ্ট-অসুখভরা আত্মজীবনী নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, যাকে আমি ভুলতে চাই, যা থেকে আমি পলায়নপর।

এখানে একটা কথা বলে নেয়া দরকার। পলায়নপরতা বা এস্‌কেপেইজম একটা বহুনিন্দিত ব্যাপার, কিন্তু এস্‌কেপ না করে উপায় নেই। গান শোনা, টিভির সামনে বসে থাকা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভালোবাসা, নভেল পড়া, ঘুমের বিষবড়ি খেয়ে ঘুমানো, আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন হওয়া, সবই এই পলায়নপরতা।

পালিয়ে কোথায় যেতে চাই? অলীক জলস্তম্ভ তো বুঝলাম, কিন্তু তাতে কী হয়? আমার ব্যক্তিগত এই অনুভূতি, পলায়ন যখন সার্থক, তখন সময়স্থানের শৃঙ্খলের বাইরে, বিরতকর্ম এক আরামদায়ক অবস্থানে পৌঁছানো। সেই অবস্থান, আমার অনুভূতিতে, জননীজঠরে ভ্রূণের ভরহীন ভাসমান অনায়াসলব্ধ পুষ্টিতে হৃষ্ট অবস্থানের মতো।

এই অবস্থা আমরা সুনিদ্রায় প্রত্যহ কিছু পাই। শুনেছি, যোগীরা সেই পরম একমে যুক্ত হয়ে থাকেন। আর লেখক যখন রসে সিদ্ধ হয়েছে, তখন সেও পেয়ে থাকে। সেকালের কথাটা বোধ হয় উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। ভারতীয়দের শূন্য ও দশমিক আবিষ্কারের মতো এই সেকেলে কথাও

সত্য থেকে গেছে হয়তো, যে কাব্যের স্বাদ ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। যোগী অব্যক্ত সেই একমকে আস্বাদ করেন, আর কবিও তাঁর সৃষ্টিতে তেমন কিছু, কিন্তু কিছু পৃথক, আস্বাদ করেন, আগে এর নাম দেয়া হয়নি। আমি অনুভব করেছি, কবি যাকে আস্বাদ করেন, তিনি মাধব, তিনি সেই যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে রস বৈ সঃ।

অন্যে কেন পালাতে চায় তা তাদের জীবনে খুঁজতে হবে, আমার জীবনমশাই বা আমার অধিদৈবত কেন পলায়নপর তা বলতে আমার অহমের জীবনে খুঁজতে হয়। সে জীবনের কথা শুনলে আত্মগরিমা, আত্মসান্ত্বনা, আত্মকারুণ্যের কথা মনে হবে যা আমার অহমকে বিদ্রূপের পাত্র করে তুলবে। সত্য নিমপাতার মতো। কাজেই বিদ্রূপের গ্লানি সহ্য করা উচিত। আমার অহম তার অভিজাত রূপ, অভিজাতমিষ্ট ব্যবহার, স্কুল কলেজে ভালো ছাত্র রূপে সুখ্যাতি, ইত্যাদি নিয়ে আমাদের এই সুন্দর ছোট শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু বাড়িতে নয়, শহরে প্রায় সর্বত্র। সুতরাং আমার অধিদৈবত অবিচলিত সুখদায়ক এক স্বপ্নের ঘরে নিমজ্জিত ছিল, যেন সে নেই, এমন হয়েছিল।

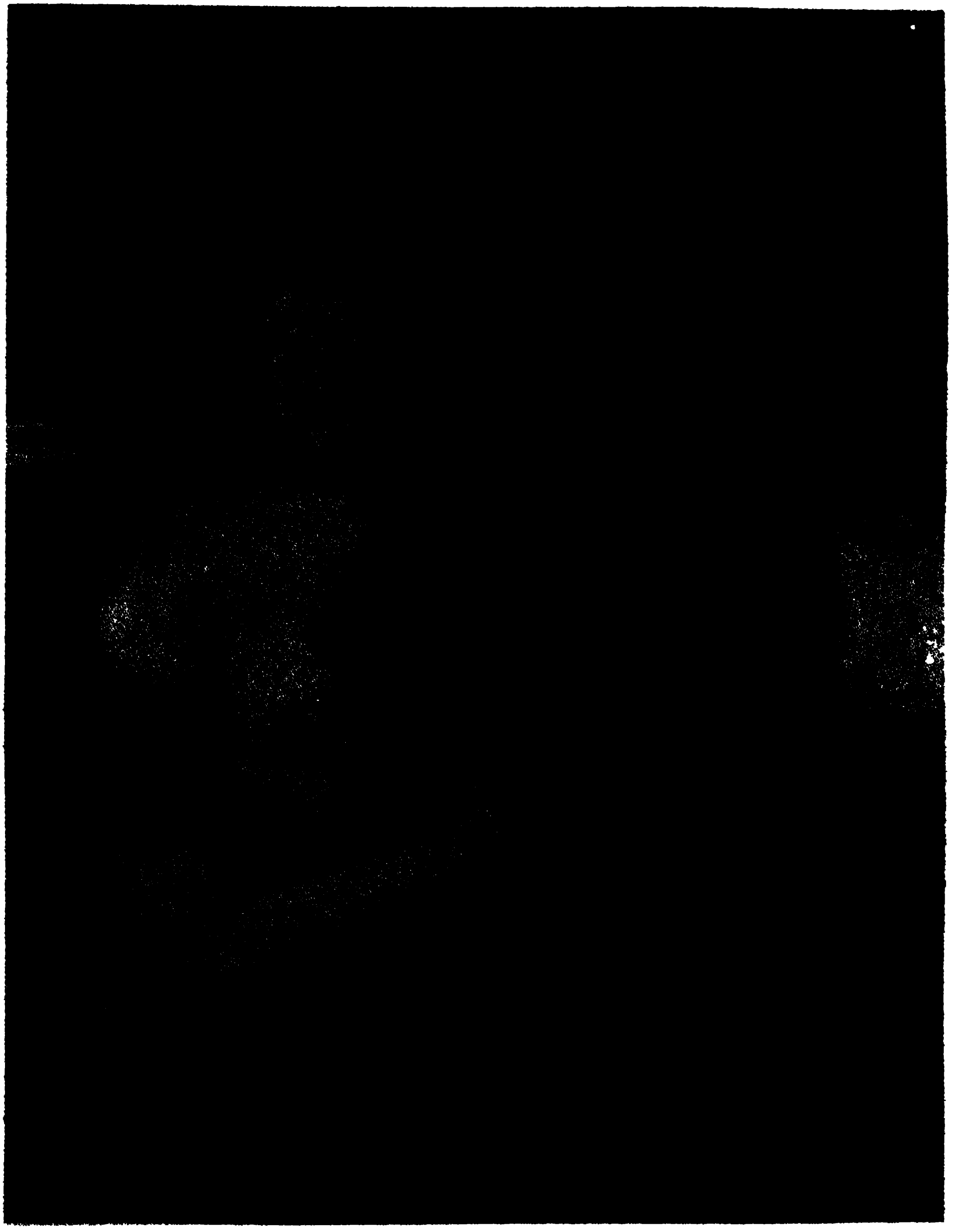
আমার জীবনে প্রথম আঘাত, প্রতিষ্ঠাবিচ্যুতি। যেন কেউ অভিশাপ দিলে মা প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ। আমি চাকরি করতে গেলাম, কেন সেই চাকরি করতে গেলাম? আজিজুল-ফজলুল হক আমলে ব্রাহ্মণ যুবক কেন্দ্রের রেল আর ডাকঘরে তবু ঢুকতে পারত পরীক্ষা দিয়ে। তাছাড়া, আমার ছোট চার ভাইকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার ব্যয়ভার থেকে বাবাকে মুক্ত করা দরকার বোধ হল। পরে বুঝেছি, তাও সব নয়। পারিবারিক প্রতিষ্ঠাবিচ্যুতি কিছু আগে থেকেই ঘটতে শুরু করেছে। আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা তা থেকে আমাকে আড়ালে রেখেছিল। চাকরি করতে যাওয়ার আগেই জানতে পারলাম, তা সম্ভবত বাবার মুখে, আমরা আর জমিদার নেই। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে জমিদারি স্বত্ব লাটের নিলামে উঠেছিল। ক্রেতার কাছ থেকে জোতদারি স্বত্ব কেনা গেছে। জানতে পারলাম, সেই দুর্গসদৃশ প্রকাণ্ড তিন কোয়াড্র্যাঙ্গলে বিভক্ত বাড়ি, যার থেকে আমি তখন অনেক দিন বিচ্ছিন্ন, তার দেয়ালগুলি অনেক শরিকের ফাটলযুক্তও বটে। কিন্তু কোথায় এলাম! আমার সেই সুন্দরী নগরী থেকে এই গণ্ডগ্রামে যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, যার সবচাইতে কাছের রেলস্টেশন সান্তাহার সাতাশ মাইল দূরে। আমার তখনকার অবস্থা শয়তানের মতো। তিনবার বলতে গেলুম, তিনবার দেবদূত-অশ্রু চোখ ফেটে বেরুল। শুধু কি নগণ্য চাকরি, শুধু কি আমার পারিবারিক প্রতিষ্ঠার অপসৃতি। দেখলাম কী অপরিসীম লজ্জা! যেন সব 'ক্রিচার্স দ্যাট ওয়্যার মেন'। দেশের পরাধীনতা, তার উপরে ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ে সদৃশ ডাকুয়া অফিসারদের ভ্রূকুটি। মনে হয় অ্যাডলার-কথিত পাওয়ার আর্জ আমার অবচেতন-প্রায় অধিদৈবতকেও প্রভাবিত করেছিল। শুধু অহমের অস্মিতা নয়, অন্য অনেকের অস্মিতাকে চূর্ণ করে সেই যে অত্যাচারের রথ, তাকে প্রতিহত করতে সংঘবদ্ধ হযে না-দাঁড়ালে আর তো মানুষ থাকা যায় না, এই রকম অবস্থায় নিজের প্রতিষ্ঠার অপসৃতিকে আর মুখ্য মনে হল না ; ট্রেড ইউনিয়নে নিজের সবটুকু অস্মিতা ও চিন্তাশীলতাকে সংযুক্ত করে অপ্রতিষ্ঠার প্লাবনকে এক বিশেষ গণ্ডির বাইরে রাখা ও সহস্র দুর্বল হাতে বাঁধ তুলতে তুলতে অপ্রতিষ্ঠার অভিশাপ ভুলে যাওয়া গেল। আমার ট্রেড ইউনিয়ন শুধু শুধু 'ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স' বাড়ানোর আন্দোলন ছিল না। আমার সহকর্মীদের সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রসারিত ছিল।

কিন্তু এসবই তো পালানোর বিপরীত, এসবই তো স্লোগানে স্লোগানে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। অথচ সব সময়েই আমার জাগ্রত স্লোগানমুখর অস্মিতাই বলি বা আত্মাই বলি, তার আড়ালে কে এক রোদনমুখী হয়, শয়তানের মতো দেবদূতের অশ্রুপাত করে না বটে, হতাশায় অনুজ্জ্বল সিসা রঙের চোখে চেয়ে থাকে। সেই অধিদৈবত—যার ভাষা নেই, অথচ নিগূঢ় বেদনার ঘটনাগুলো যার অন্তরলোকে ঘটেই চলেছে।

আমাদের পাঁচ ভাইয়ের পরে এক শ্যামল চেহারার বোন ছিল। পাঁচ-ছ বছর বয়স হয়েছিল। আমি তার বড়দা হিসাবে হয়তো একদিন বকেছিলাম। তাকে সোনার হারের বদলে পিতলের হার কিনে

দিয়েছিলাম। একইসঙ্গে আমার আর তার জ্বর হয়েছিল। আমি জ্বর থেকে উঠে দাঁড়াবার আগে সে চলে গেল। কেন, সে তার পাঁচ বছরে কী অপরাধ করেছিল ভগবানের কাছে যে তাকে এমন বিকারের কষ্টের মধ্যে চলে যেতে হল? কালক্রমে তার স্মৃতি আমার পরিবারের কাছে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পরে যারা সাবালক হয়েছে, সে হয়তো তাদের স্মৃতিতেও নেই। হয়তো, হতে পারে, পরে সে আমার শ্যামল রঙের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল। নতুবা আমাদের মেয়ের তেমন শ্যামলশ্রী হবে কেন? তা হোক, আর না হোক আমার সেই শ্যামলশ্রী মেয়েকে সাধ্যাতিরিক্ত স্বর্ণালংকার দিয়েছি। কিন্তু আমার সেই বোনকে, তার পিতলের হারকে, আমার অস্মিতা যদি ভোলে, আমার অবচেতন-স্বরূপ অধিদৈবত মূক কান্নায় নিজেকে কোথায় আড়াল করবে তা বুঝে ওঠে না। আমার এক কন্যা জন্মেছিল যাকে রুবি ছাড়া অন্য নামে ডাকা সম্ভব ছিল না। সে তার আড়াই বৎসরের জীবনে, পাপ দূরে থাক, কী অন্যায় করতে পারে? যার জন্য, ঈশ্বর, যদি তিনি বর্তমান হন, তাকে কষ্টকর মৃত্যুদণ্ড দিলেন? কেন? কেন আমাকে আমৃত্যু এই যন্ত্রণা?

এ রকম তো আরো সব ঘটনা আছে, আমার আত্মার এবং অস্মিতার পক্ষে যার প্রতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না, বারবার ঘটেছে, যাকে মানি না, সেই ভাগ্যের চক্রান্তের মতো। ঈশ্বরের অভিশাপ হলে মেনে নেয়া যেত, কিন্তু যাকে মানি না, তার চক্রান্ত? কেন, কোন পাপে আমাকে ছ বছর বয়সে ট্রপিক্যাল স্কুলের হাসপাতালে, এপাশে-ওপাশে বেডে যখন মৃত্যু ঘটে চলেছে, একা থাকতে হয়েছিল? সে এক বালক, যার মা খাইয়ে না দিলে খাওয়া হতো না, বাবার কোলের কাছে না শুলে ঘুম হতো না। এখন, পালাতে পেরে, আমি হাসি বটে, কিন্তু সে মেধাবী কিশোর ও যুবকের বিদ্যায় সাফল্যলাভের পথে বারংবার বাধা পড়েছে, তার ব্যর্থতার স্মৃতি অবচেতনে নেমে যখন অধিদৈবতের বেদনা হয়, এইসব অহেতুক মৃত্যুযন্ত্রণা, এইসব প্রতিকারহীন আরোপিত চাপিযে দেয়া ব্যর্থতা ট্রমা সৃষ্টি করে। এই ট্রমার উৎপাত থেকে পালাতেই হয়। রাতের গভীরে স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন নিয়ে ঘুমিয়ে ট্রমা ভোলা যায়। দিনের বেলায় কী করে বেচারা অধিদৈবত? সে তাই ট্রমাগুলোকে নিয়ে ভেঙেচুরে অর্ধচেতন অবস্থায় দিবাস্বপ্ন তৈরি করে। এই দিবাস্বপ্ন অধিদৈবতকে সেই সুপ্তির কাছে নিয়ে যায়, যেখানে সে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর রসস্বরূপ তাঁকে, মাধবকে, পেয়ে জঠরস্থ ভ্রূণের মতো নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট পরিপুষ্টিতে নিঃশব্দে আনন্দময়। অধিদৈবতের তার অন্তর্নিহিত ট্রমাকে নিয়ে পালানো ছাড়া অন্য পথ নেই।



হট অ্যাট তাসিলা

দুখিয়ার কুঠি

ভূমিকায় এইটুকু বলা উচিত যে উপন্যাসটির সমস্ত ঘটনাই কল্পনাপ্রসূত। এমনকী কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলকেও পটভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট করা উচিত হবে না।

মানুষের অনিবার্য সম্মুখবেগেও একটি বেদনা লুকানো থাকতে পারে, এর বেশি কিছু বলার নেই।

পটভূমিকে পরিচিত সভ্যতার প্রান্তে স্থাপন করার তাগিদে একটি আঞ্চলিক ভাষার ধাঁচ কথোপকথনে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে পদগুলির সঙ্গে সমার্থক বাংলা পদের মৌল পার্থক্য নেই। বিভক্তি অনুসর্গ প্রভৃতির প্রয়োগেই আকৃতিটা নতুন দেখায়। বিশেষ্যে বিভক্তিগত পার্থক্যের ফলে রামকে = রামক্, রামের = রামর। পঞ্চমীবাচক অনুসর্গ থেকে = থাকি। অধিকরণে গাছে = গছৎ। তুলনীয় নিচে = নিচৎ।

ক্রিয়ার রূপেই পার্থক্যটা বেশি দেখা যায়। অসমাপিকা খেয়ে = খায়া, গিয়ে = যায়া। তুমার্থক 'ইতে' প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে হাসিতে = হাসির, যেতে = যাবার, যাওয়ার, দিতে = দিবার।

বিভিন্ন কালে ক্রিয়াবিভক্তিগত পার্থক্যের ফল এই রকম দাঁড়ায়—

সাধারণ বর্তমান, কই = কং, দিই = দেং।

ঘটমান বর্তমান ধর্ ও লাগ্ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয়। যেমন দিচ্ছি = দিবার ধরছং, শুনছে = শোনার লাগছে।

পুরাঘটিত বর্তমান এবং সাধারণ অতীতে পার্থক্য সবসময়ে স্পষ্ট নয়। তাহলেও গিয়েছি = গেইছং, দিয়েছি = দিছং, পিয়েছে = গেইছে, ধরেছে = ধরছে। গিয়েছিলে= গিছলু, গিয়েছিলাম = গিছনু, ধরল, ধরেছিল = ধরিল্, ধরলেক, গেল, গিয়েছিল = গেইল, গেইলেক।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে উত্তমপুরুষে 'ইম্' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, যাব = যাইম্, করব = করিম্। কখনও কখনও দেব = দ্যাও। অন্যত্র যাবি = যাবু, যাবে = যাইবে।

নঞর্থক পদখণ্ড ক্রিয়ার পরে না আগে বসে। যেমন, না কং, নাই দেখং, নোয়ায় (= না + হয়) ; কিন্তু দেখিই না, যাই-ই না প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখঙে না, যাঙে না। লক্ষণীয় গুরুত্ব বোধক 'ই' 'এ'-তে পরিবর্তিত।

স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'টে' অনুসর্গের মতো ব্যবহার হয়। যেমন, কোথায় = কোটে, যেথায় = যেটে। কালবাচক এখন = এলা, যখন = যেলা।

অন্যত্র তবু = ত্যাও, তো = তা, ত্যা।

বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকু দেয়া দরকার ছিল।

মহকুমা সদর গদাধরপুর। শহরের লোকসংখ্যা পাঁচশো ছিয়াত্তর।

মহকুমা-অধিপতির পদবি নায়েব আহিলকার। তিনি রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ হিসাবে শাসক এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারক। স্বভাবতই তিনি শহরের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করছেন।

শহরের একমাত্র বাঁধানো পথের দৈর্ঘ্য আধ মাইল পরিমাণ। লাল সুরকির পথ বেমেরামতের ফলে ঝামা ও ইটের টুকরোয় খরখরে। উদ্বোধনের দিনে তার দু'পাশে যে দেবদারু গাছগুলো লাগানো হয়েছিল তারই কয়েকটি বিরলপত্র অবস্থায় বেঁচে আছে। কী একটা কারণে কাণ্ডগুলি বাঁকা বাঁকা ও অর্বুদযুক্ত। লাল ফল গায় সবুজপাতার একটা বেঁটে বট, কয়েকটা সেগুন বেশ জোর পেয়েছে।

কাঠের পাটাতন মেঝে, তারই দেয়াল এবং টিনের ছাদের চার কামরার যে বাংলোটায় নায়েব আহিলকার বাস করেন পাকারাস্তাটা তার সম্মুখ থেকে শুরু হয়ে ফাঁকা একটা মাঠের উপর দিয়ে মহকুমা-দপ্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। লাল রং-এর এই নিচু গড়নের দপ্তরটি যেমন শহরের একমাত্র পাকাবাড়ি, তেমনি দেয়ালের সবুজ রং কালিয়ে যাওয়া, টিনের লাল রং বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলোটিই সবচাইতে জমকালো স্থাপত্য নিদর্শন। দপ্তরের বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন বিভাগ : দক্ষিণ কোণের ঘরে লালসালু দিয়ে ঘেরা বিচারমঞ্চ, এবং সাক্ষী ও আসামীর কাঠগড়াসমেত এজলাস। উত্তর কোণের ঘরটিতে একাংশে লোহার শিক দিয়ে পৃথক-করা হাজত, অন্য অংশে দেয়ালের গায়ে হাতকড়া-ঝোলানো পুলিস অফিস ও থানা। একজন সাব-ইনস্পেক্টর, জন দু-এক মুন্সি, জন পাঁচেক কনস্টেবল নিয়ে মহকুমার পুলিস বিভাগের সদর দপ্তর।

দপ্তরের চারিদিকে ঘাসে ঢাকা ঢেউতোলা মাঠ। ঘাসগুলো দূর্বাজাতীয় কিন্তু রোদে পুড়ে শক্ত ও কর্কশ হয়ে যেন জাত বদলাচ্ছে।

দপ্তরের পিছন দিকে এবং তার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে মূল শহর শুরু হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন হাট বসে যে জায়গাটুকুতে তাকে ঘিরে একটা খোয়াছড়ানো মাটির পথ চলে গেছে। এই পথের উপরেই শহরের সবকয়টি উল্লেখযোগ্য বাসিন্দার বাড়ি। উল্লেখযোগ্য বলতে নায়েব আহিলকারের দপ্তরের পাঁচ-সাতজন আমলা পেয়াদা, পুলিসের লোক কয়েকটি, তিনজন উকিল, জন দু-তিন মোক্তার এবং কয়েকজন দোকানদার।

এরা ছাড়া যারা আছে তাদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বদন মাস্টার। সে এক দোকানদারের বাড়িতে থাকে। বছর দশেক হল সে এই শহরে এসেছে। সংসার সম্বন্ধে তার সন্ন্যাসীর মতো অনাসক্তি। অতীত জীবন সম্বন্ধে সে পাষাণের মতো নির্বাক। তার বুকে একটা ভয়ংকর ক্ষতচিহ্নের শুকনো দাগ আছে। ছেলেরা সেজন্য তাকে ভয় পায়। শহরের ছেলেদের কয়েকটিকে সে দু'বেলা পড়ায়।

দোকানিদের মধ্যে গোঁসাইদের দুই শরিকই মহাজন নামে পরিচিত। দোকান বলতে সাজানো-গোছানো ক্রেতার নয়নাভিরাম কিছু নয়, বরং যেন গুদামের মতো। দড়ি-দড়া, লোহা-লক্কড়, আলকাতরা ও গুড়ের টিন যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় চাল ডাল, মশলা, কাপড়চোপড়। খোঁজ করলে কলঙ্কধরা দু-একটা পিতল কাঁসার বাসনও ক্রেতা কিনতে পারে।

গোঁসাইদের বাড়ি ছাড়িয়ে কিছু দূরে গেলে রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মাথায় একটা ছোট দোকান উঠেছে কয়েক বছর আগে। কিছু কিছু পেটেন্ট ওষুধ কিনতে পাওয়া যায় সেখানে। শহরে কম্পাউন্ডারি করেছে এমন একজন লোক এই দোকানের মালিক। সে-ই এই শহরের একমাত্র ডাক্তার।

প্রকৃতপক্ষে শহর এখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এই পথের ধারেই—কিছু দুব এগিযে গেলে একটা নতুন ইটেব বাড়ি উঠছে। প্রথম দিকে লোকেব কৌতূহল অত্যুগ্র হযেছিল। বাড়িটা কিন্তু দ্যাখ-দ্যাখ করে গড়ে উঠল না। লোকেব কৌতূহলও মিইযে এসেছে। এই বাড়িটা চক্রবর্তীব। বয়স্ক লোকেরা তাকে লখাই বলে। সবকারি কাগজপত্রে তার নাম লক্ষ্মীশ্বর চক্রবর্তী। সে নাকি কনট্রাক্টব। তার দেখা পাওয়া ভাব।

স্কুল নেই, চিকিৎসাব ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বেশ্যালয় আছে। গদাধর নদীর ঘাট থেকে শহরের রাস্তায় পৌঁছানোর আগেই একটা ছোট দোকান। দিশি প্রথায বসানো কাঁচা দুধের দই, চিড়ে মুড়ি, পান বিড়ি, ইদানীং চা নামে এক রকমেব তরল পদার্থ পর্যন্ত বিক্রি হয়। এই দোকানটার পাশ দিয়ে সরবন ও বনঝাউ-এর মধ্যে দিয়ে যে সরুপথটি হাটের দিকে গেছে সেটাব শেষে দু-তিনখানি ঘর। দুজন বারনারী বাস করে সেখানে। এখানকার সব ব্যবসায়ের মতো তাদের ব্যবসাও হাটের দিনের উপরে নির্ভব করে। কিন্তু বিদেশিনী দুটির ব্যবসায়ে মন্দা চলেছে। ধানের গত ফসল ভালো হয়নি। এদিকে শহরের এক গৃহিণী নানা শাস্তি দেবে বলে শাসিযেছে। কবে কাব শখ হবে তাবই প্রতীক্ষা করছে তারা সংকীর্ণ হয়ে। অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা দিয়েছে।

ধুলো ধুলো ধুলো। বর্ষার দু'মাস পর থেকে ধুলো শুরু হযে ক্রমশ সেটা বাড়তে থাকে। নাযেব আহিলকারের দপ্তরের খাতাপত্র, এজলাসের সালু, গোঁসাইদেব দোকানেব পণ্য, ওষুধের দোকানেব শিশিগুলি—সর্বত্র ধুলোর আবরণ পড়ে যায়। তারপব আসে বর্ষা। কাদা কাদা। কাঁচাবাস্তাগুলিতে গোরুগাড়ির চাকায় গর্ত হয়ে যায, সেখানে জল জমে। বাড়িগুলোব সামনে কোথাও ড্রেন নেই। অন্যান্য ঋতুতে ব্যবহৃত জল শুকনো মাটিতে শুযে যায। বর্ষায তা হয না। বোদ উঠলে জমা জলে সর পড়ে বুদ্‌বুদ ওঠে। বাড়িগুলিব খাটা পায়খানার গন্ধ ছড়াতে থাকে। কারণ দূব শহর থেকে পনেরো দিনে একবাব কবে যে মেথবটি অন্য সময়ে আসে বর্ষাব কযেক মাস তাব দেখা পাওয়া যায় না।

কেন এই শহর তৈরি হয়েছিল এ নিয়ে নানা বকমেব মত আছে। আগে এ অঞ্চল সদর মহকুমারই এক শাসন-বহির্ভূত অংশ ছিল। একদা এ অঞ্চলে জরিপ হয়েছিল। জবিপকর্তার বাসের জন্য বাংলো উঠেছিল, এবং তার আমলা পেয়াদাদের বাসের জন্য এবং কাজকর্মের জন্যও বটে একটা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে এ দুটিই যথাক্রমে নায়েব আহিলকারের বাসভবন ও দপ্তর। কিন্তু তৈরি দুটি বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল বলেই মহকুমা হিসাবে এ অঞ্চলকে পৃথক করা হয়নি। মূলত বিধিবন্ধ ব্যবস্থায় অধিকতর খাজনা আদায়ের ইচ্ছা থাকলেও শাসনব্যবস্থাব উন্নতিব চেষ্টাও ছিল পরিকল্পনায়। শহরের পথটা সুরকি দিয়ে যারা বাঁধাতে শুরু কবেছিল অন্তত তাদের সম্বন্ধে এ রকম একটা চিন্তা করা যায়। কিন্তু পথের ধারে দেবদারু গাছ লাগানোর পরে যেমন রাজকীয় দৃষ্টি অন্যদিকে সবে গিয়েছিল, গোটা মহকুমার ব্যাপারেও হয়তো তাই ঘটে থাকবে।

তথাপি একটা শহর বিশ-ত্রিশ বছব ধরে টিঁকে গেলে আশা করা যায় হয়তো সেটা আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবে। অন্তত হালফিল কোনো কোনো বিষয় থেকে এ রকম একটা আন্দাজ হয যে গদাধরপুর তার যৌবনদশার দিকে এগোচ্ছে। এ ধরনেব একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পিচ-ঢালা পথ দিয়ে সদর মহকুমার সঙ্গে গদাধরপুরকে সংযুক্ত করার চেষ্টা। নদীর ওপারে শহর থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে মাটি তুলে রাস্তা চওড়া করার কাজ চলেছে এখন, তারও মাইল দু-এক পিছনে পাথর পড়েছে রাস্তায়, কুচোপাথর আর পিচে মিশিয়ে ঢালবার যন্ত্রও এসে গিয়েছে।

নদীটির ঠিক ওপারেই দুখজাগানিয়ার কুঠি। চলতি ভাষায় দুখিয়ার কুঠি বলে লোকে। অর্বাচীন

নোংরা মহকুমা শহরটার নাম গদাধরপুর হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য নেই, নদীর নাম থেকে সেটা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে গদাধর কেন নাম হল নদীটার। দশ-বারো হাত পরিসর একটি জলধারা শ'দুই হাত চওড়া কিন্তু অগভীর খাতে বয়ে যাচ্ছে। বর্ষায় কাদাগোলা জলের ঢল নামে, অন্যসময়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। এখানে ওখানে সেই খাতে চর জাগে। সাদা চকচকে বালির চর, কোথাও-বা সে চরে কাশ, কুশ, পুন্তির ঝোপঝাড়। অন্যদিকে এইসব চর সম্বন্ধে সতর্কও থাকতে হয়। যাকে চর মনে হচ্ছে, চাষের নতুন মাটি মনে হচ্ছে, তা হয়তো চোবাবালিমাত্র। হাতি গ্রাস করে এমন চোরাবালি। চাষ করা দূরে থাক, ঘর তোলা দূবে থাক, পা রাখলে তলিয়ে যাবে। নদীজলের ঘূর্ণিপাকে তবু হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা যায়। এখানে সে সুবিধাও নেই। সারা বছরই কিছু জল থাকে এবং তা থেকে মনে হয় কূলের দিক দিয়ে হয়তো হিমালয়ের আভিজাত্য এরও আছে। তীরে বেতের ঝোপই অধিকাংশ জায়গায়, যেখানে বর্ষায় পার ছাপিয়ে ওঠে জল সেখানে বনঝাউ এবং সরবন। নদীর নাম বেত্রবতী, কিংবা সরস্বতী হতে পারত। নামকরণ সম্বন্ধে কৌতূহল সার্থক বলেই মনে হয়। দক্ষিণবঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের প্রচাব করছেন তার প্রায় সমসাময়িক কালেই আসাম এবং উত্তরবঙ্গেও বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হচ্ছিল; সাহিত্য গড়ে উঠছিল ; বিভিন্ন মোঙ্গলীয় কৌমের যে-লোকেরা এসে ভারতের পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে অহম নাম নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল, ধর্মচিন্তার ঐক্য দিয়ে তাদেব একটি জাতিতে পবিণত করাব সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি পবিবর্তনেবও চেষ্টা হয়েছিল। উপাস্য বিষ্ণুব নাম থেকেই স্বাভাবিকভাবেই এই নদীটির নামকরণ হয়ে থাকবে। এবং এর জলধাবায় সে নাম ভেসে এসে উভয় তীরের আদি বাসিন্দাদের মধ্যেও সেই নবীন ধর্মের কিছু কিছু প্রচাব কবেছিল। নতুবা এ অঞ্চলেব ভাষার স্বাভাবিক যে প্রবণতা আছে, যাব ফলে নদীর নাম হয দোলং কিংবা তোবসা, তারই ফলে হয়তো এই ধারাটির নামও মাতালিযা অথবা আই হতে পারত।

পক্ষান্তবে দুখজাগানিযার কুঠি একান্তভাবেই আদি বাসিন্দাদের দেওযা নাম।

নামটা ষাট-সত্তর বছবের কিংবা তারও বেশি পুরনো। তার আগেও এসব অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল। প্রবাদ এই, এক রাজকুমারের উপরে এ অঞ্চলের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। যত গ্রাম তত বন, কিংবা বনই বেশি, গ্রামই কম। আদিম বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা পথে যুক্ত এদিকে ওদিকে ছড়ানো গ্রাম। সে সময়ে উত্তববঙ্গে ভোট বা ভুটিয়াদের কিছু প্রাধান্য হয়েছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য কবত, ডাকাতি করত, রাজার সৈন্যদলের সঙ্গেও যুদ্ধ করত। এমনকী একবার এক রাজাকে বন্দী করে ভোট দেশে নিয়েও গিয়েছিল। ইতিহাস কাহিনীতে শোনা যায় ভোটদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জনাই ইংবেজ কোম্পানির শরণ নিয়েছিল রাজা। কাজেই ধরে নেয়া যায়, যার উপবে এ অঞ্চলেব শাসনভার থাকত তার জীবনটা খুব একটা শান্তির ছিল না সাধারণভাবে বলতে গেলে। সে যাই হোক, ইংরেজ কোম্পানির ঘোড়ায় টানা কামানের মুখে পড়ে ভোটরা যখন পালাল তখন রাজ্যের প্রায় আধখানা কোম্পানির সৈন্যদলের ভরণপোষণের জন্য কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে রাজার জীবনে কিছু শান্তি এসেছিল, সুতরাং সৈন্যসামন্তের জীবনেও।

প্রবাদ এই, ভোটদের এক অভিযাত্রী দল মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ অঞ্চলের সুবিস্তীর্ণ অরণ্যে আত্মগোপন করেছিল। তারা দেশে ফিবে যাবার জন্য উদ্যোগ প্রচেষ্টা করেছিল কি না এ বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা গদাধরের তীরে একখানি ভোট-গ্রামের পত্তন করেছে। তখনকার দিনে সব জাতেব সৈন্যদলের মতো এদের দলের সঙ্গেও কিছু পরিমাণে নারী ছিল, কিছু খচ্চর পনি ছিল। গ্রামেব পত্তন হওয়ার পর নারীরা গৃহেরও পত্তন করালো। এ বিষয়ে একটি সুবিধা ছিল যে এক নারীর পক্ষে পঞ্চস্বামীর ঘর করার বিধান ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু অসুবিধা ছিল এই পুরুষরা চাষ-আবাদ করতে একেবারেই রাজি হল না, বরং কোমরে ঝোলানো

দেড় হাত লম্বা তরোয়াল ও তীরধনুকের সাহায্যে চারিদিকের গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় যা-কিছু সংগ্রহ করাকেই তারা স্বাভাবিক মনে করেছিল। এ পদ্ধতিতে কিছুদিন বেশ ভালোই থাকা যায়, তারপরে অবশ্য কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেয়; ক্রমাগত লুট করতে থাকলে মাটি-কামড়ে-থাকা কৃষকের মনেও ধিক্কার জন্মায়, সে জমিতে মন দিতে পারে না; তা ছাড়া লুটের সময়ে শস্যের অপচয়ও হয়; এর ফলে ভোটদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিল। উপরন্তু তাদের হাতের কাছে ইস্পাত ছিল না, কারিগরও ছিল না তাদের মধ্যে; ফলে তাদের তরোয়াল মরচে পড়ে অব্যবহার্য হয়ে গেলেও সেগুলিকে বদলে নেয়া গেল না। আর শেষ কথা এই যে পঞ্চস্বামীর ঘরনীরা বোধ হয় কোনো কারণে পঞ্চপুত্রবতী হয় না, বস্তুত ভোটদের লোকসংখ্যা বিশ বছর পরেও খুব একটা বৃদ্ধি হয়নি, যদিও তাদের শস্যভাণ্ডারস্বরূপ গ্রামগুলিতে অনেক আদিবাসী নারীর সন্তানের আকৃতিতে ভোটত্বের ছাপ পড়েছিল।

ঠিক এ রকম সময়েই এ অঞ্চলের শাসনকর্তার পরিবর্তন হয়েছিল। বুড়ো রাজকুমারের মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবক শিরোপা এবং কামদার চোগা খিলাৎ পেয়েছে রাজার কাছে নিয়োগ-নিদর্শন হিসাবে। বিজয়া দশমীর সকালে পাটহাতির পিঠে বসে রাজগুরু খঞ্জন পাখি উড়িয়ে দিয়েছিল। শরতে দিগ্বিজয় যাত্রা, তার দিগ্‌নির্ণয় করে খঞ্জন পাখির গতি। এবারে খঞ্জন সোজাসুজি পুবদিকে উড়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের চাইতে প্রথা বড়। কিন্তু এবার রাজামহাশয়ের কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল, কাজেই পুবদিকের জঙ্গলে শিকার অভিযান করেও রক্তপাত করার উৎসাহ ছিল না তাঁর। সুতরাং খঞ্জনের গতিপথে ধাবিত হলেন নবনিযুক্ত যুবক প্রদেশপাল। সঙ্গে চলল রিসালদার রামদীন শুক্ল, রিসালদার-মেজর হেদায়ৎ আলি খান এবং সত্তর-আশি জন ঘোড়সওয়ার।

পুবের জঙ্গলে শিকার চলল তিন দিন ধরে। চতুর্থ দিনে যে ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। জঙ্গলটার পারেই ভোটদের বস্তি। রিসালদার রামদীন শুক্লের এক ঘোড়সওয়ার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ক্রীড়ারত এক ভোট দম্পতিকে দেখতে পায় এবং রাক্ষস মতে ভোট নারীকে গ্রহণের চেষ্টা করে। ভোটপুরুষটির তরোয়াল অত্যন্ত পুরনো কিন্তু তার সাহায্যেই সে ঘোড়ার একটা কান কেটে দিয়েছিল এবং সওয়ারের কপালে একটা গাছের ডাল ছুঁড়ে মেরে দিয়েছিল। খবরাখবর হওয়ার পরে বেলা বারোটা আন্দাজ রিসালদারেরা প্রদেশপালের দেহরক্ষার জন্য জন পঁচিশ ঘোড়সওয়ার রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে ভোটবস্তির সম্মুখে গিয়ে পৌঁছাল। পঞ্চাশজন বালক যুবক ও বৃদ্ধ ভোট তাদের ঘরগুলিকে আড়ালে রাখবার জন্য বস্তির সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। শত্রুতা বংশপরম্পরায় চলে আসা ঐতিহ্য। সকালের দ্বৈত-সংঘাতের ঘটনাটা তাকে জীবন্ত করে দিয়েছে। কী আশ্চর্য! প্রথামাত্র নয়; দশমী অন্তে খঞ্জনের নির্দেশিত পথে নয়া দিগ্‌বিজয়ে যাত্রার অভিনয়। রাজ্যের সীমার মধ্যেই জয়যোগ্য বিদেশি গ্রাম। যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না, দেখামাত্রই শুরু হয়ে গেল। দৈহিক শক্তি ও জীর্ণ তরোয়াল, অব্যবহারে বেঁকে যাওয়া তীরধনুক নিয়ে ভোটরা; এদিকে ঝকঝকে তরোয়াল, আর কোম্পানির কাছে কেনা বন্দুক। ভোটদের কয়েকটি পনি অবশিষ্ট ছিল। বিশ-ত্রিশ মিনিট ধরে বস্তি রক্ষার চেষ্টা করে ছড়িয়ে পড়ল ভোটরা। তিন দিন তিন রাত ধরে চলল ছুটোছুটির যুদ্ধ। রাজসৈন্যদল অবশেষে বিজয়ী হল।

তখন মৃতাবশিষ্ট ভোটরা পুব-উত্তর লক্ষ্য করে রাজ্যের সীমা ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের বস্তিকে কেন্দ্র করে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে অন্তত চল্লিশজন ভোটের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বিজয়ের সন্ধ্যায় প্রদেশপালের স্কন্দাবারের সম্মুখে একটা মোটা রশিতে বাঁধা জন পনেরো নানা বয়সের ভোটনারীকে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। রশির মাথা দুটি হাতি বাঁধবার খোঁটায় জড়ানো। দূরে দূরে আগুন জ্বলছে। সেগুলি যুদ্ধে হত রাজসৈন্যের চিতা। কতকগুলি চিতার আগুন অপেক্ষাকৃত প্রবল, সেগুলিতে একত্র পুড়ছে মৃত ভোটদের দেহাবশেষ। যুদ্ধে তারা ছোট ছোট

দলে সংঘবদ্ধ হয়ে মরেছে, এখনও যেন সংঘবদ্ধতা বজায় আছে।

ভোটরা নির্মূল হল। এ রকম মনে করার যুক্তি আছে তাদের বস্তির চারিপাশের গ্রামের অধিবাসীদের তুলনায় তারা অগ্রসর ছিল। তাদের সভ্যতার কোনো নিদর্শন অবশ্য এ অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো-বা তাদের সমাজের কোনো প্রথা বর্তমানে একান্ত আঞ্চলিক কোনো সংস্কারের গোড়ায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটা বিষয়ে তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন কখনও কখনও চোখে পড়ে। এদিকের ইতস্তত ছড়ানো গ্রামগুলিতে ভোট ছাঁদের মুখাকৃতি পাওয়া যায়। আর ভোটবস্তিটার সীমার মধ্যে পড়ে যে গ্রামটা গড়ে উঠেছিল সেখানে কিছুদিন আগেও হলুদ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সন্ধান পাওয়া যেত। এই গ্রামেরই বর্তমান নাম দুখিয়ার কুঠি। প্রদেশপাল যুদ্ধ জয় করে এই আকস্মিক ভাগ্যোদয়ের জন্য বাণেশ্বর মহাদেবকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিতে দিতে রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিল। চারিদিকে কোম্পানির রাজত্ব, এ পরিস্থিতিতে এমন একটা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই সব রাজপুরুষের ভাগ্যে ঘটে না।

কিন্তু দুখিয়ার কুঠির বেদনাটা ভোটদের স্মৃতি বহন করছে কিংবা আরো পরবর্তী কালের, এ বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে।

প্রদেশপাল বছরে একবার এ অঞ্চলে শিকারে আসতেন এবং তদুপলক্ষে এই গ্রামে বাস করতেন। এটা বোধ হয় পৃথিবীর পক্ষে ভালো যে তাঁর বাসভবনের কোনো ধ্বংসাবশেষ এখানে অন্তত প্রকৃতিকে কদর্য করে রাখেনি। তাঁর স্কন্দাবার তৈরি হয়েছিল বাঁশের চাঁচারি দিয়ে। হাতির দাঁতের মতো হলদেটে রঙের সূক্ষ্ম জালির কারুকার্য করা বাঁশের দেয়াল, কাছে থেকে দেখেও মর্মরের কারুকুশলতার তুলনীয় বলে মনে হতো। আর সেই স্কন্দাবারের অভ্যন্তরে গালিচা ঢাকা মেঝেতে, শাস্ত্রে যেমন বলে, মদিরেক্ষণা নর্তকীদের ললিত হিল্লোলিত অবয়বের প্রতিচ্ছবি যথারীতি মৃত্যু ও অবসানের জটিল নৃত্যনাট্যের অঙ্কগুলি দেয়ালের গায়ে রচনা করত। আলোকমুখী রাজপুরুষ এবং তার সহচররা রমণীয় দেহগুলির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে স্বভাবতই তার কোনো সংবাদই রাখেনি। এক বসন্তে সেই লীলাস্থলে এল মৃত্যু। গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাওয়ারও সময় পেল না। ভয়ার্ত মানুষেরা যত পালানোর চেষ্টা করল ব্যাধির জাল তার তুলনায় অনেক দ্রুত বিস্তৃত হল। যে নগর গড়ে উঠছিল সেই কুঠির চারিদিকে সেটা গেল ফৌত হয়ে। কুঠিটা তারপরেও কয়েক বছর দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে দেখলে লোকের মনে দুঃখ জাগত। দুখজাগানিয়ার কুঠি। সভ্যতার একটা জোয়ার যেন সেই দ্বিতীয়বার এ অঞ্চলকে স্পর্শ করে গিয়েছিল।

কিন্তু গ্রামের নাম যারা দুখজাগানিয়ার কুঠি দিয়েছিল তারা সকলেই বাইরের লোক নয়। সেই গ্রামেই এমন কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিল যারা ক্রমশ এই দুঃখের নামটাকে মেনে নিয়ে নিজেদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাস করত।

এখন থেকে বিশ-বাইশ বছর আগে এখানেই আবার এখানকার পক্ষে অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটেছিল।

কুমরী—যাকে ক্রমশ দুখিয়ার কুঠিতে আই, কখনও এমনকী ডাঙ্গরআই বলা হয়, সে ফিরে এসেছিল।

২

তার আসল নাম মাতালু ধনী, কিন্তু গোঁসাইরা তাকে স্নেহ করে একটি নাম দিয়েছে—বটেশ্বর দাস। নিজ গ্রামে সে এখনও মাতালু বলেই পরিচিত। কিন্তু জমিজমার কাগজপত্রে আজকাল কখনও

কখনও ইশাদী হিসাবে, ক্রেতা-বিক্রেতা রূপেও তার নাম লেখা হচ্ছে। সেসব ক্ষেত্রে সে বটেশ্বর বলে উল্লিখিত হয়, কিন্তু দাস কথাটা তার মায়ের ভালো লাগেনি বলে উপাধি হিসাবে 'ধনী'টাকেই সে বহাল রেখেছে।

তার বয়স কুড়ি বছর হল এবার। পাহাড়িদের যেমন হয় তেমনি গেঁটে-গেঁটে ডিম-ডিম পেশীযুক্ত হাত-পা। কিন্তু গড়নটা দীর্ঘ। গায়ের রং তামাটের চাইতে বরং হলদের দিকে ঘেঁষা। নাক ও ঠোঁট কিছু বিস্তৃত। চিবুকে আর উপরের ঠোঁটের প্রান্তে কয়েকটি করে চুল। কিন্তু ভ্রূ ও চোখ দুটি বড় সুন্দর। ভারি সুরেলা তার কণ্ঠ। খালি গায়ে বুকখোলা ছিটের কোট, মাথায় জড়ানো লাল চৌখুপির নকশাতোলা এণ্ডির চাদর। পায়ের নতুন লাল রবারের জুতো হাতে উঠেছে।

মাতালু গদাধরপুর থেকে দুখিয়ার কুঠিতে যাচ্ছে। খেয়াঘাটের কাছে এসে তার মনে পড়ল সকালে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হয়েও ইজারাদারকে চারটে পয়সা দিতে হয়েছিল। যে বর্ষার স্রোতের নদী নৌকা বেয়ে পার করে তাকে পয়সা দিতে কেউ আপত্তি করে না, কিন্তু তুমি ঘাট ডেকেছ বলেই তোমার এমন অধিকার জন্মায় না যে নৌকা চলার মতো জল নেই তাই বনের বাঁশ কেটে এনে সাঁকো বানাবে, আর সেই সাঁকো দিয়ে যেই পার হবে তার কাছ থেকে পারানি পয়সা নেবে। এ এক নতুন প্রথা চলেছে এদেশে। সুতরাং এই অন্যায় থেকে সরে যাওয়ার জন্য মাতালু খানিকটা উজিয়ে গিয়ে পায়ে হেঁটে পার হওয়ার জন্য নদীতে নামল। ইজারাদারের লোকরা পয়সা না দিয়ে নদী পার হওয়ায় ব্যাপারটার প্রতিবাদ হিসাবে হৈ হৈ করে চিৎকার করল। মাতালু বুঝতে পেরে কৌতুক অনুভব করে ঐ ঐ বলে তাদের ব্যঙ্গ করল।

ওপারে উঠে ইজারাদারকে জব্দ করার প্রায় বালকোচিত একটা আনন্দে মাতালুর মুখ আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু ইজারাদারের তুলনায় অধিকতর আকর্ষণীয় অনেক কিছুই পৃথিবীতে আছে। সে যেখানটায় নদী পার হয়েছে তার কিছু দূরেই বারনারীদের ঘরগুলি। সে দেখল দুজন মেয়েমানুষ স্নান করতে নামছে। এ রকম পরিস্থিতিতে পুরুষদের দূরে সরে যাওয়াই বিধান। মাতালুও পথের দিকে চোখ রেখে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু নতুনত্বের একটা বিস্ময় তাকে কয়েক মুহূর্ত আটকে রাখল। মেয়ে দুটি তীরে কাপড় রেখে প্রায় নিরাবরণ হয়ে জলে নামল। মাতালু যদি বাঁয়ের দিকে লক্ষ্য করত সে দেখতে পেত ইজারাদারের পারানি আদায়ের টোং-এর কাছে চার-পাঁচটি পুরুষ মেয়ে দুটির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। মাতালুর মনে পড়ল জলপরীরা এ রকম ক'রে স্নান করে এ গল্প সে শুনেছে, কিন্তু দিবা-দ্বিপ্রহরে গদাধর নদীর ধারে জলপরী আসা সম্ভব নয়; এরা নিশ্চয়ই বিদেশি স্ত্রীলোক, যাদের কথা দুখজাগানিয়ার কোনো কোনো পুরুষ আড়ে-ঠারে আলাপ করে।

বনঝাউ-এর জঙ্গলটা পার হয়ে চলাচলের পথে উঠে মাতালু একটা অনির্দিষ্ট ক্ষুধার মতো কিছু অনুভব করল। খিন্নতা ছিল না, রূপকথায় শোনা অনেক রূপসী নারীর কথা তার মনে পড়ল।

সে শহরে এসেছিল সাক্ষী দিতে গোঁসাইদের শরিকানি মামলায়। বড় গোঁসাই মাস ছয়েক হল স্বর্গারোহণ করেছে, মামলাটা সে ঘটনার মাস দু-এক পর থেকেই বাধব বাধব করে এতদিনে আদালতে উঠল। মাতালুর মা বড়আই বা ডাঙ্গরআই তাকে নিষেধ করেছিল মামলার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে কিন্তু মাতালু সে নিষেধ মানতে পারেনি।

ইতিমধ্যে মাতালু দুখিয়ার কুঠির সীমান্তে এসে পড়েছিল। এবং তার বন্ধু কাঁকরুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কাঁকরু বয়সে কিছু বড়। মাতালুর বেশভূষার অনন্যসাধারণতা কাঁকরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে বলল, 'বাপুরে, সাহেব মানসি! কোটে গিছলেন, বাহে'?

'কোটে'।

'কোটে কোটে'? কাঁকরু কোর্ট কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল।

'কোর্ট, যাক কয় আদালৎ'।

কাঁকরুর সহজাত হাস্যরসবোধ প্রকাশিত হল। সে যমক দিয়ে বলল, 'গায়ৎ পিন্ধছেন কোট। গেইছেন কোর্টে? না কোটে। বাপুরে তোমরা কোটবাবু হইছেন দেখং'।

রসিকতাটা মাতালুর খুব ভালো লাগল, সেও হো হো করে হেসে উঠল।

গোঁসাইদের মামলার কথা কাঁকরু কিছু কিছু জানত এবং মাতালুকে যে উভয় পক্ষই তালিম দিচ্ছে সে সংবাদও তার কানে এসেছিল। বিষয়টাকে সে-ই প্রথমে অস্বস্তিবোধ করে ডাঙ্গরআইকে জানিয়েছিল। অন্যের ব্যাপারে লেগে থাকা স্বভাব নয় বলেই পরে অবশ্য এ নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি সে।

কাঁকরু বলল, 'ভাটিয়ারা মামলা করছে, তুই গেলু কেনে'?

'করিম কি তা কও। মুই তো এদি-উদি দেখবার লাগলং তো পিয়াদা হাঁকি দিলেক, বটেশ্বর দাস হাজির। মুই কিছু কঙে না। তিনেবার হাঁকি দিলেক, ত্যাও কিছু কঙে না। তার পাছৎ উকিল আসি কয়, বটেশ্বর তোমাক ডাকির লাগছে শোনেন নাই। গেইলং উকিলের পাছে। কি রেজলাস! (কথাটা এজলাস)। হাকিম কইলেক—তোমার নাম বটেশ্বর দাস? মুই কইলং, মাতালু ধনী। তিনেবার পুছিলেক হাকিম। তিনেবার কইলং দাস না হয়, ধনী। তার পাছে উকিল হ্যাটর-ম্যাটর করিল। তো হাকিম পুছিলেক, তোমার পিতার নাম কি? কইলং—খুঁজি ন্যান তোমরা। তো সবে হাসির ধরলেক। মুই রাগ হয়্যা কইলং, যাক চোখে নাই দ্যাখং তার নাম কেনে? লিখির চান তো লিখি রাখেন—ডাঙ্গর ধনী। হাসি থামি গেইলেক। মুই রাগ হয়্যা কইলং লিখি রাখেন : যে জমিন ধরি কাজিয়া সবে রাজার। খাস দখলকার ডাঙ্গরআই ডেমনি ধন্যা। তাঁয় ভাটিয়া গোঁসাইওক দান করছে পাঁচ বিঘাও কি বিশ বিঘাও। হাকিম কইলেক, থামেন থামেন। কাগজে লিখছে ইগুলা গোঁসাই-এর সম্পত্তি। মুই কইলং, কাগজে যা লিখছে তা লিখছে। উকিল ফির হ্যাটর-ম্যাটর করিল—হোটিল, হোটিল। (কথাটা হোস্টাইল)। হাকিম কয়, নামি যান। তো খাঁচা থাকি নামি আইসলং। তো হইল তোর যে সাক্ষী তো সে সাক্ষী'।

কাঁকরু বন্ধু মাতালুর হাকিমের সম্মুখে স্পষ্ট বাক্য বলার সৎ সাহসে মুগ্ধ হয়েছিল। সে বলল, '*ঠিকে করছিস্*'।

পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে শুরু করল। কাঁকরুর কোথায় একটা কাজ ছিল, সে-কথা ভুলে গেছে ইতিমধ্যে। শহরের মানুষের কাছে এই নগণ্য ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত উত্তেজক একটা ঘটনার মতো অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু সে চিন্তার এক স্তরে গিয়ে মনে মনে হাসছিল, সেটা প্রফুল্লতার ছাপ নিয়ে মুখে ফুটল। প্রচলিত গানের একটা কলি আবৃত্তি করল সে : হাহারে কুম্‌কুরা সূতা হইলেক লোহার গুনা।

'কি ত্যা'?

'ভাটিয়ার কন্যা তোক বিপাকে ফেলাইছে রে মাতালু'।

'কাঁয়, মালতী'?

'সম্ভব'।

দুজনে নীরবে পথ চলল।

রেশমের সুতোও ভাগ্যগুণে লোহার তারের শক্ত বাঁধন হয়। গোঁসাই-এর মেয়ে মালতীর বয়স এবার আঠারোতে পৌঁছেছে। এমন কিছু সুন্দর নয় দেখতে, তবু যৌবন ও স্বাস্থ্য তাকে রেশমের মতোই আকর্ষণীয় করে রেখেছে। দুখিয়ার কুঠিতে দু'ঘর ভাটিয়ার বাড়ি, দুটোই গোঁসাইদের। মালতী আদিবাসীদের ঘরদুয়ারের সঙ্গেও পরিচিত। তার শৈশবে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে ডাঙ্গরআই-এর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে তারই ঘরে সে একবেলা ঘুমিয়ে থেকেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তার গতিবিধিতে কিছুটা বাছবিচার দেখা দিয়েছে, তাহলেও কোনো কোনো বিকেলে সে এখনও

ডাঙ্গরআই-এর ঘরে এসে বসে, পানের ডাবর টেনে নিয়ে এদেশি পদ্ধতিতে মজাগুয়া দিয়ে পান খায়। ডাঙ্গরআই-এর সঙ্গে এদেশীয় ভাষায় গল্পগুজব করে। মাতালুর সঙ্গে সে ছোটবেলায় খেলেছে নিজেদের বাড়িতে এবং ডাঙ্গরআই-এর সঙ্গে বাড়িতে। ধানের জমির আল দিয়ে দুজনে অনেক বেড়িয়েছে, পথ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকী দু-এক বছর আগেও একদিন সে মাছ ধরতে নেমেছিল গদাধরের জলে মাতালু কাঁকরুর দলে মিশে। তার ফলে অবশ্য বাড়িতে গালমন্দ শুনেছিল সে।

মনের তলায় তলিয়ে দেখলে কথাটার মূলে রসিকতার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি খুঁজে পাওয়া যায়? গ্রামের অন্য যে কোনো যুবতীর তুলনায় মালতীকে মূল্যবান বলে মনে করে মাতালু। গ্রামের অন্য যুবকরা গোঁসাইদের সম্বন্ধে যতখানি সচেতন মাতালু যেন তার চাইতে বেশি উৎসুক তাদের ব্যাপারে। নতুবা এই মামলার বিষয়ে সে অনায়াসে 'মুই কী জানং' বলে দূরে সরে যেতে পারত।

মামলা কাজিয়া নিশ্চয় ভালো জিনিস নয়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে। মানুষ রাগ করে, চেঁচামেচি করে, রাগের মাথায় দু-এক ঘা এ ওকে বসিয়েও দেয়; কিন্তু সে রাগ ও উত্তেজনা ঠাণ্ডা কাগজে, ঠাণ্ডা কালি দিয়ে লিখে যারা জিইয়ে রাখতে পারে তারা ভয়ংকর লোক; তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো লোকের উচিত। কাঁকরুর সঙ্গে কাঁকরুর দাদার খুব চটাচটি হয়েছিল একবার। খবর পেয়ে গ্রামের অনেক পুরুষ ও নারী সেখানে গিয়েছিল। সব শেষে ডাঙ্গরআই। সে গিয়ে প্রথমে কাঁকরুর দাদা চ্যারকেটুকে তীব্র স্বরে ধমক দিয়ে বলল—তুই মান্‌সি না হয় রে চ্যারকেটু ; ভাইওক মারছিস তুই, কাটি গেইছে। তুই মান্‌সি না হয়। তারপরে কাঁকরুর দিকে ফিরে রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল সে—তুই মান্‌সি না হয় রে কাঁকরু, তুই মান্‌সি না হয়। পিতার তুল্য দাদাক রুখি গেইছিস! ঝগড়াটা তখনকার মতো থেমে গিয়েছিল এবং অন্য অনেক ঝগড়ার মতো একেবারেই হয়তো নিবে যেত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাটিয়ার বুদ্ধি নিয়েছিল চ্যারকেটু। একটা মামলা বাধবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কাঁকরু প্রথমে, পরে চ্যারকেটু প্রতিনিবৃত্ত হল। স্বজাতীয়রা কেউ তাদের উৎসাহ দিল না, নিরুৎসাহও করল না। কিন্তু সাক্ষ্য দেয়া দূরে থাক, বরং যেন অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল. যেন-বা তারা ভিন্ন জগতের অধিবাসী। কিন্তু তারা পৃথগন্ন হল, যেন-বা গোঁসাইদের অনুকরণ করবেই। এর ফলে চ্যারকেটুর লোকসানই হয়েছে। কারণ আয়ের তুলনায় চ্যারকেটুর পুত্রকন্যার সংখ্যা বেশি। অনেকদিন পর্যন্ত সমাজেও তাদের অসুবিধা ছিল। অবশেষে গ্রামের অন্যতম প্রবীণ বাসিন্দা রংবর ও তার ছেলে ফুলবর চেষ্টা করে তাদের জাতে তুলেছে।

মাতালুর মনে এই কথাগুলোই উঠল। এবং সে যেন খানিকটা মিইয়ে গেল। মালতীর আকর্ষণেই কি সত্যি সে গৃহবিবাদের মতো অরুচিকর ব্যাপারে অংশ নিয়েছিল? তার আকর্ষণে সে তো একটা ভালো কাজও করতে পারত। কী ভাগ্য তার!

সে বলল, 'ইগুলা বয়া কাম রে কাঁকরু'।

'কোন কাম'?

'ই মামলা কাজিয়া'।

'হবার পায়'।

'নিচ্চয় করি কং ইগুলা ভালো না হয়, বয়া। ছাড়ি দে ইগুলা কথা'।

মাতালু মামলার মতো নোংরা বিষয়টিকে যেন মন থেকেও ঝেড়ে ফেলবে। এই অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে যেন ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত বোধ হচ্ছে দেহটাকে। সে বিষয়ান্তরে যাওয়ার জন্য খানিকটা যেন অনিচ্ছাতেই স্নানরতা জলপরীদের কথা উত্থাপন করল।

'কাঁয়রে, কোটে'? কাঁকরু বিস্ময় প্রকাশ করল।

'শহরৎ। গদাধরর কোলে; বনবাড়ি থাকি বিরাইল কন্যা, ঠগমগ রূপ। অঙ্গৎ নাইরে বসন কন্যার,

কেশ দিয়া ঝাঁপা গাও'।

'সত্যি কইস'?

'না হয়রে, মনৎ হয় শহরেব কোনো বেটি-ছাওয়া হইবে'।

'তুই ফান্দৎ পড়ছিস রে মাতালু, রুদ্ধার (উদ্ধার) নাই'। কথাটা বলে কাঁকরু এবার সুর করে প্রচলিত গানটা ধরল :

ফান্দৎ পড়িয়া রে বগা করে টানাটুনা,
হাহারে কুম্‌কুরা সুতা হইলেক লোহার গুনা।

মাতালু বলল, 'ভালো তোর গানা কিন্তুক তোক ধরি যাইম্। দেখাইম্ তোক জলপরী, নিচ্চয় করি কং'।

কাঁকরুর বাড়ি যাবার পথটা এখান থেকে বাঁক নিয়েছে। মাতালুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার কাজ হয়নি, বাড়ি ফিরে যাওয়াই এখন সে প্রয়োজন বোধ করল।

সে বলল, 'মাতালু, ফুলপাকড়ি ধানের বেছন আছে রে তোর ঝাড়া'?

'রাখছং ঝাড়িয়া। যাইস বেলা পড়ি গেইলে'।

দূরে বড় গোঁসাইদের বাড়িটা চোখে পড়ছে। ছোট তরফের নতুন বাড়িটা ওরই পিছন দিকে। মাতালুর সামনে কয়েক হাত দূরে একটা বুড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাব কিছু দূরে প্রকাণ্ড রক্তকরবীর গাছটা। বয়সে কৃষ্ণচূড়ার সমান হলেও যেন বাড়ন্তটা তারই বেশি। এরা নাকি কুঠির বাগানের শেষ চিহ্ন। এরই পিছনে মাতালুর বাড়ি।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে মাতালু রংবরকে দেখতে পেল। রংবর এ গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী, বয়স সত্তর পার হয়েছে। তার দেহের উচ্চতা ও মুখের গড়ন থেকে তাকে ভোটবংশীয় বলে মনে হয়। তার পরনে নেংটি, পায়ে সুপুরির খোলা ও দড়ি দিয়ে তৈরি চপ্পল। মাটির একটা হাঁড়ি কোলে করে বসে সে মাতালুদের গাই দুইছে। রংবর পায়ের শব্দে চোখ তুলে মাতালুকে দেখে নিয়ে নিজের কাজের দিকে চোখ নামিয়ে বলল, 'আইসলেন, বা'?

মাতালু রংবরের অনতিদূরে উবু হয়ে বসে পড়ল, 'আইসলং'।

'হইল্ কাম'?

মাতালু কথা বলার আগে খেদসূচক চু চু শব্দ করল, 'যা হইল্ তা হইল্। কিন্তুক, আজা, না যাং আর কোটে ফিন সওয়ালের দিন'।

'হইল্ কী'?

'কং পাছে। পয়লা তোমার থাকি শুনি নেং ভাটিয়া গোঁসাইওর কথা।'

'যাও ত্যা, গাও ধোন, সাঁঝৎ কইম'।

মাতালু উঠে গেল, কিন্তু হাত-পা ধোয়ার বন্দোবস্ত না করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। ইতিমধ্যে সে-ও বাইরে যাবার পোশাক ছেড়ে ফেলেছে। তার পরনে এখন কাজের পোশাক অর্থাৎ বড়গোছের একটি নেংটি পরা। পাঁচ-ছয়টি দুধেলা গোরু দুইতে হবে। সে রংবরের হাত থেকে কেঁড়ে নিয়ে একটা গোরুর কাছে গিয়ে বসল।

'আজা'!

'কন্'।

'আজ দুখ্ পাইছ, আজা; গাইওক ঘাসপানি দিছ, বলদক ঘাসপানি দিছ, এলা দুধ দোয়ার ধরছ। মামু কোটে গেইছে'?

'ক্ষেত বাড়ি'।

'ফিন্ দেখং, মামু একলা মান্‌সি ক্ষেত গেইছে। আজী কি করছে'?

'ধান-ঝাড়া হবার পায়'।

'ফিন্ দেখং আজী দুখ্ পাইছে। আজা, বাপরে'।

'কি হইল ত্যা'?

'মশা ধরছে। ত্যা আজা—

'কন্'।

'মুই কোটে গেইলং, আর তোমরা বুড়া-বুড়ি দুখ্ পাছেন'।

রংবর নীরবে শুনে যেতে লাগল।

মনঃকষ্টের সময়ে মানুষকে কথা বলার সুযোগ দিতে হয়। গোরু বলদকে ঘাসজল দেয়া নতুন নয় তার পক্ষে। বয়সের জন্য ক্ষেতখামারের কাজে তেমন পটুতা তার নেই এখন। এখন সে এই কাজগুলোই করে। মাতালু কাছে থাকলে সে সাহায্য করে, কিন্তু ক্ষেতখামারের কাজে অনেকসময়েই সে অন্যত্র ব্যস্ত থাকে। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত ধনবানের ছেলে হিসাবে মাতালু কখনও কখনও কোনো কাজ না করেও সময় কাটায়, হয়তো-বা গদাধরের তীরে ছিপ নিয়ে বসে একটা দিনেব বেশির ভাগ কাটিয়ে আসে। শহরের হিসাবে রংবর তার আত্মীয় নয়, বরং ভৃত্যস্থানীয় প্রজা। রংবর অনায়াসেই বুঝতে পারছে মাতালুর মনোবেদনা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে।

সে ভাবল তার কারণ আছে বইকি। যেন অশুভ কিছু ঘটতে পারে এমন একটা আশঙ্কায় জড়ানো সে ব্যথা। মামলা মোকদ্দমা শহরের লোকরাই করে। দুখিয়ার কুঠির দু-একজন না করেছে এমন নয়। কিন্তু কখনোই কি ভালো হয় তার ফল? শহর থেকে যা কিছু আসে সবেবই যেন অশুভ ঘটাবার একটা প্রবণতা থাকে। গোঁসাইদের এই মামলার সঙ্গে মাতালুর জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারেও তেমনি কিছু অশুভকে ইঙ্গিত করছে।

মাতালুর দুধ দোয়া হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের ব্যবহারের দুধ কেঁড়েতে রেখে বিক্রির দুধ একটা হাঁড়ায় ঢেলে মাতালু পিঠ সোজা করে দাঁড়াল।

দিনের আলো পড়ে যাওয়ার আগেই আস্তাজ আসবে। সে ধর্মে মুসলমান কিন্তু করে দুধের ব্যবসা। শহরের কয়েকটি বাড়িতে দুধ যোগান দেয় সে, আর শহরের মিষ্টির দোকানটিতে।

'এটে থাউক দুধ, আস্তাজ আসি যাইবে'। বলল মাতালু।

'থাউক। কিন্তু হামার জন্য তোমরা দুখ না করেন। গাইওক ঘাস-পানি যে দিছং সে দিছং'!

নেংটির যে লম্বা খোঁটটা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছিল সেটা তুলে মাতালু নিজের ঘর্মাক্ত বাহু ও বুক মুছে নিল।

'আজা'।

'কন্'।

'গোঁসাইওর ঘরে যায়া কয়া দিম্ সাক্ষী দিবার না পারিম আর'।

'যাইবেন কেনে'?

মাতালুর মুখে লজ্জার চিহ্ন ফুটিফুটি করল। রংবর তো কাঁকরু নয় যে তার সামনে ভাটিয়ার কন্যা মালতীর কথা বিব্রত না হয়ে বলা যাবে।

বয়সের জন্যই বোধ হয় দুঃখের গভীরতার তুলনায় সুখের প্রসারই তার চিন্তাকে বেশি আকৃষ্ট করে। ইতিমধ্যে জলপরী আর মালতী তার মনের মধ্যে কোথায় এক হয়ে যেতে শুরু করেছে। প্রৌঢ়ের চোখে সে চিন্তা খানিকটা নির্লজ্জ কিন্তু যৌবনের কাছে তা স্বাভাবিক দুঃসাহস।

মাতালু আবার ভাবল : কী তার ভাগ্য!

সে বলল, 'আজা, আস্তাজ আসি যাইবে, দেখি রাখেন্ দুধটা'।

গোঁসাইবাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সে চলে গেল।

৩

এখন থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগে, শহরে নায়েব-আহিলকাব বসবার সমসাময়িক কালে গোঁসাই এ অঞ্চলে আসে। নায়েব আহিলকারকে বলে-কয়ে তার কাছাবির কাছে একটা ছোট কুঁড়ে তুলবার অনুমতি নিয়ে শহরে বসবাস শুরু করে।

কোম্পানির রাজত্ব থেকে অনেক লোক এ রাজ্যে নানা কাজ নিয়ে অনুপ্রবেশ করছিল এর কিছুদিন আগে থেকেই, বড় বড় রাজপুরুষ থেকে পেযাদা চাপরাসির পদে পর্যন্ত তারা নিযুক্ত হচ্ছিল। একজন পা রাখবার জায়গা পেলেই সে তার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনছিল। কিংবা ছুটিছাটায় সে দেশে-গ্রামে গেলে তার মুখে এদেশের ব্যবস্থা ও অব্যবস্থার কথা শুনে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় লোক এর দিকে প্রলুব্ধ হচ্ছিল। হযতো এর পিছনে কোম্পানি-সরকাবের পরোক্ষ সমর্থন ছিল, যেমন তার প্রত্যক্ষ সমর্থন দরকার হতো রাজ্যের বড় বড় পদগুলিতে কাউকে নিয়োগ করার আগে।

এদেবই একজন হেরম্ব গোঁসাই। চাকরি যোগাড় করে নেযা তার পক্ষে সম্ভব হযনি, কারণ এই সময়েব এক বিধানে ন্যূনপক্ষে এন্ট্রান্স পরীক্ষায পাশ না করলে কেরানির পদে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই আর ছিল না। অগত্যা হেবম্ব গোঁসাই এই মহকুমা শহরে এসে বাঁধি কারবার ধবল। কিন্তু মূলধন তার সামান্যই ছিল। বিনা মূলধনের পৈতৃক ব্যবসা অর্থাৎ গুরুগিরি এবং পুবোহিতের কাজে তার রুচি ছিল না। নিজের দেশে এই পেশাগুলি অবলম্বন করতে গিয়ে সে অনেক কষ্ট পেযেছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বীবা সেখানে বাষ্ট্র করেছিল একবার এক পেশাগত কলহের ফলে : তার মা ব্রাহ্মণকন্যা বটে কিন্তু পুরোপুরি নয়, তার মাতামহী ছিল ভরার মেয়ে এবং ব্রাহ্মণেব আশ্রিতা মাত্র, বিবাহিতা নয়। তার প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না, কারণ গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারই প্রতিপক্ষের আশ্রয়।

হেরম্ব গোঁসাই লক্ষ্য করেছিল, এ অঞ্চলের কৃষকরা শস্য উৎপাদন করার ব্যাপারে অপটু নয়, কিন্তু উৎপন্ন শস্যের মূল্য সম্বন্ধে উদাসীন। ব্যবসায়ের কোনো বালাই নেই। পরিমাণ ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে সারা বছরের শ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছে আমন ধান। ধান যে এত মিহি ও সুগন্ধি চাল দিতে পারে তা হেরম্ব এখানে আসবার আগে কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু কী দুর্গতি সে ধানের! ধান গোলায় উঠবার কিছুদিন পবেই বাজধানীতে হৈমন্তিক উৎসব হয়, উপলক্ষ হিসাবে রাসপূর্ণিমাকে অবলম্বন করে। সাবা দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। গোরুগাড়ির বহর সাজিয়ে গ্রামকে-গ্রাম রাজধানীতে চলে। গোরুগাড়িগুলি শুধু যাত্রীদের বহন করে না, চাটাই-এর তৈরি বড় বড় মটকি বোঝাই হয়ে ধানও যায় যাত্রীদের সঙ্গে। সেই ধানের বিনিময়ে তারা সারা বছরের প্রয়োজনের জিনিস, শখের জিনিস সংগ্রহ করে। শহবের মহাজনরা জানে কোন গ্রাম থেকে কারা আসবে। বস্তুত পাণ্ডাদের মতো তারা গ্রাম ও পরিবার ঠিক করে রাখত বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুযোগ বুঝে তারা ধানের দাম কমাত। উৎসব করাই যখন উদ্দেশ্য কে আর দরদস্তুর ক'রে মূল্যবান সময় নষ্ট করে? দাম পছন্দ হল না বলে কে ধান পাহারা দিতে বসে থাকবে? ধানের বদলে টাকা পাওয়ার চাইতে জিনিস পাওয়াতেই আনন্দ।

প্রকৃতপক্ষে ধানের যে নিজস্ব একটা মূল্যমান আছে যা আপাতত প্রয়োজন বা শখের মূল্যের উপরে নির্ভর করে চলে না, এটা যেন এরা জানতই না। হেবম্ব ভেবে স্থির করেছিল, অত্যন্ত উর্বরা জমি, প্রচুর বর্ষা এবং জমির পরিমাণের তুলনায় জনসংখ্যার স্বল্পতাই এই চপল মতির কারণ।

আর এ বিষয়ে সহায়তা করেছে মুদ্রার অভাব। হেরম্ব এ অঞ্চলে আসবার আগেই মুদ্রাব প্রচলন কিছু কিছু হয়েছিল। ঝুটি-বাঁধা রানীর ছবি আঁকা টাকার মূল্যকে এরা বিশ্বাস করতে শিখেছে তার কারণ তহসিলদারও সে টাকাকে মূল্য দেয়। কিন্তু যে সামান্য কিছু মুদ্রা এদের হাতে আসে তহসিলদারকে দেবার জন্যই তা সঞ্চয় করে রাখে মাটির ভাঁড়ে মাটিতে পুঁতে। অন্য সব কাজ চলে বিনিময় প্রথায়, এমনকী জমির দাম পর্যন্ত এরা দেয় ধান দিয়ে, বর্তমানের গোলা কিংবা ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত প্রত্যাশা থেকে।

হেরম্বই এ অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন করে। অন্তত দুখিয়ার কুঠিতে সে এ বিষয়ে একটা বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বিনিময়-প্রথা এই বিশ বছরেই প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। এখন শুধু শ্রমের বিনিময় চলে চাষীদের মধ্যে।

হেরম্বকে প্রথম দিকে বেগ পেতে হয়েছিল। লোকে প্রথমেই তাকে বিশ্বাস করেনি। রাসের মেলায় না গিয়ে তার কাছে ধান বিক্রি করবে কি না, এ নিয়ে দ্বিধা করেছিল কৃষকরা। কিন্তু মুদ্রার সুবিধা তারা এক রাসের মেলাতেই বুঝতে পারল। ডাঙ্গরআইকে সাক্ষী রেখে এই স্থির হল : শহরে বর্তমানে যে দামে ধান কিনছে মহাজনরা, হেরম্ব মণকরা তার চাইতে দু'আনা কম দেবে। সেটুকুই তার লাভ। গাড়ির ভাড়া, গাড়োয়ানের ভাড়া ইত্যাদি হিসাব করলে মণকরা দু'আনার কম পড়ে না। আর যদি শহরের মহাজনদের গড়পড়তা দাম এবং তার দামে দু'আনার বেশি পার্থক্য থাকে তবে সে ক্ষতি সে পূরণ করবে। সেবার ধানের বোঝা না বইবার সুবিধা সকলেই অনুভব করেছিল মেলায় গিয়ে, উৎসবটা অনেক বেশি আনন্দজনক হয়েছিল। এখন দুখিয়ার কুঠি এবং আশপাশের গ্রামে পাঁচ-দশ টাকার নোটও কিছু কিছু চলছে।

হেরম্বর ব্যবসাকে অবলম্বন করে সভ্যতার নিদর্শনী একটা প্রথা দুখিয়ার কুঠিতে এইভাবে এসেছিল।

নিঃস্ব হেরম্ব কালে এ অঞ্চলে মহাজন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গদাধরপুরে এবং দুখিয়ার কুঠিতে বাড়িঘর আড়ত গোলাবাড়ি তুলে যেন চিরকালের জন্যই সাজিয়ে নিয়েছিল সংসার। দেশে চিঠি লিখে নিজের সংসারের সকলকে আনিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে তার সৎ ভাই গজানন এবং তার স্ত্রী ছিল।

কিন্তু ষাট বছর পূর্ণ হতে না হতে তাকে ইহলোক ত্যাগ করতে হল। এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে—এ খবর সে যেন নিজেই পেয়েছিল যদিও সম্পূর্ণভাবে তা বিশ্বাস করেনি। মহাজনীতে প্রতিষ্ঠিত হবার মোহে তার নাওয়া-খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। এবং পাকস্থলীর নানা রকমের ব্যাধিই আক্রমণ করেছিল তাকে। ডাঙ্গরআই এবং রংবর জানে এমন একটা ঘটনার কথা। দুখিয়ার কুঠিতে তখন হেরম্ব স্বল্প-পরিচিত। একদিন রংবর এসে বলেছিল

—আই, ভাটিয়ার ছাওয়া মরি যেইছে, আঃ হা।

—কেনে তা?

—না জানং। গছর নিচৎ পড়ি আছে।

ডাঙ্গরআই রংবরের সঙ্গে গিয়েছিল দেখতে। গাছের তলায় হেরম্ব জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে। ফুলবর ও রংবর ধরাধরি করে তাকে ডাঙ্গরআই-এর ঘরে এনে শুইয়ে দিয়েছিল। তিনদিন ধরে দুঃসহ পেটের ব্যথায় ছটফট করল সে। তখনি সে বিড়বিড় করে বলেছিল—মরব, এতেই একদিন পথের ধারে মরে পড়ে থাকব। কিছুদিন পরে হলেও তার এ আশঙ্কাই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। অবশ্য মৃত্যুটা ঠিক পথের ধারে হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিজের দেহকে বঞ্চিত ও উৎপীড়িত করেই সে অর্থ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করেছিল।

এ বিষয়ে তার ভাই গজাননের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল। তার রোগাটে পাকানো চেহারার পাশে,

গজাননের পুষ্ট, আহারতৃপ্ত চেহারা দেখলেই যেন তাদের পার্থক্য ধরা পড়ত। ব্যবসায়ের বিষয়েও তেমনি তাদের প্রভেদ ছিল। হেরম্ব বাঁধি কারবার করত, মণে দু'আনা লাভ রাখতে পারলে ভাবত যথেষ্ট হল। রাজধানীতে ধানের দাম চড়া হলে এদিকে ধান কিনবার সময়ে নিজেই দাম চড়িয়ে দিত। অর্থনীতিবিদরা বলতে পারে—এটা তার উদারতার চিহ্ন নয়, আত্মরক্ষার চেষ্টা। সে এ রকম না করলে, কৃষকদের কেউ না কেউ রাজধানীতে যাওয়া-আসার সময়ে ধানের দাম জেনে এসে একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু যেহেতু সে নিজে থেকেই কিছু কিছু দাম বাড়িয়ে দিত তার উপরে কৃষকদের বিশ্বাস কখনও নষ্ট হয়নি, ব্যবসায়েও বিঘ্ন দেখা দেয়নি। গজানন এসেই দেখেছিল তাদের পরিবার কৃষকদের তুলনায় ধনী। হেরম্ব প্রথমদিকে অন্তত কৃষকদের তুলনায় নিজেকে নিঃস্ব দেখেছিল। গজনন তাব দাদার বিপ্লবকে কাজে লাগাল। বিনিময়-প্রথায় ধীরমন্থর গতি থাকে ধনের। মুদ্রা-প্রথায় গতিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আগে যে কৃষকরা শহরে ধান নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে প্রয়োজনের জিনিস সংগ্রহ করত তারা সহজে গাড়িতে ধান বোঝাই করার পরিশ্রম স্বীকার করতে আর চাইত না। কিন্তু মুদ্রা নিয়ে খালি হাত-পায়ে শহরে যাওয়া অন্য ব্যাপার। এর ফলে তাদের রাজধানীতে যাওয়া বেড়ে গিয়েছিল; দশটা চিত্তহারী জিনিস দেখলে তার কিছু নিজস্ব করতে ইচ্ছা যায়, তার ফলে কৃষকদের খরচের হাতটাও বেড়ে গেল। রাসমেলার উপলক্ষ ছাড়াও তারা খাজনার জন্য জমিয়ে বাখা টাকা পর্যন্ত খরচ করে ফেলত। সেই সুযোগে গজানন তেজারতি কারবাব শুরু করল। এবং এদের দুখ-ধন অর্থাৎ বন্ধকি সম্পত্তি প্রভৃতি গ্রাস করে অতি দ্রুত আর্থিক আভিজাত্যের দিকে অগ্রসর হল।

এই পার্থক্যের ফলে দুই গোঁসাই-ই কৃষকদেব কাছে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরিচিত হল। অনেক ব্যাপার আছে যা বড় গোঁসাইকে বলা যায়, ছোট গোঁসাই-এর কাছে গোপন করতে হয়; অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট গোঁসাই-এর বুদ্ধি নেয়াই ভালো। এ অঞ্চলের কৃষকদের পক্ষে এটাকেই চিন্তার জটিলতার সূত্রপাত বললে অত্যুক্তি হয় বটে, প্রবণতাটাকেও বর্ণনা করা হয়।

হেরম্বর মৃত্যুর কিছু আগেই তৎকালীন বিত্ত-সম্পত্তি দুই ভাই সমানভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। শুধু দুখিয়ার কুঠির বাড়ি এবং তৎসংলগ্ন সাত-আট বিঘা জমি এজমালি ছিল। গজানন অধিকাংশ সময় গদাধরপুরে বাস করত আর হেরম্ব দুখিয়ার কুঠিতে। কাজেই এজমালি জমি ও বাড়ি ভাগ করে নেয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। হেরম্বর মৃত্যুর কিছুদিন পরে গজাননের ইচ্ছা হল বাঁশের চাঁচারির দেয়ালের পরিবর্তে তার ব্যবহারের ঘরগুলোতে সে ইটের দেয়াল দেবে। গজাননের স্ত্রী স্বামীর বুদ্ধিহীনতা দেখে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এল : এজমালি বাড়িতে পাকাঘর তোলা আর পরের বাড়িতে পাকাঘর তোলা সমান নির্বুদ্ধিতা। এই এজমালি ভাগ করা নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত হল। তর্কবিতর্ক থেকে কোর্ট পর্যন্ত।

কিন্তু মাতালুর নির্বুদ্ধিতা আজ উকিলদের কোণঠাসা করে দিয়েছে। সে হলফ পড়ে যে সাক্ষী দিয়েছে তারপরে অগ্রসর হতে উকিলরা আর সাহস পেল না। মাতালুর সাক্ষ্য থেকে এই প্রমাণ হয় যে, জমিটাই আসলে গোঁসাইদের নয়। কতকটা চাকরান জমির মতো ডাঙ্গরআই-এর দান, জীবনকাল ভোগ দখলে রাখার জন্য সাময়িক একটা ব্যবস্থা। সুতরাং দু'পক্ষের উকিল নায়েব-আহিলকারের কাছে সোলের জন্য দরখাস্ত করেছে। আপসে নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে এবার। দু'পক্ষই বিব্রত বোধ করছে; গজানন একটু বেশি। গদাধরপুরের গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি সে। সে দুখিয়ার কুঠির একজন আদিবাসীর জমি ভোগ করছে চাকরান শর্তে এ ভাবতেও তার মন সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার আভিজাত্যবোধ আঘাত পাচ্ছে। অবশ্য হেরম্ব জীবিত থাকলে কী হতো তা বলা যায় না। সে জানত তার আদি ইতিহাস দুখিয়ার কুঠির সবাই জানে। তার অর্থ আছে কিন্তু জাঁক করার কিছু নেই। সে জাঁকের ফাঁকি আদিবাসীদের অজানা নয়।

ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে মাতালু যা বলেছে তারই মতো। রুগ্ন অসহায় অবস্থায় দিন তিনেক ডাঙ্গরআই-এর বাড়িতে কাটিয়ে হেরম্ব পরিচিত হয়েছিল ডাঙ্গরআই-এর সঙ্গে। উপকারের প্রতিদানস্বরূপ ধান বিক্রির সময় হলে হেরম্ব তাকে পরামর্শ দিত। ডাঙ্গরআই লক্ষ্য করেছিল হেরম্বর পরামর্শ নিয়ে সে লাভবানই হচ্ছে। একদিন ডাঙ্গরআই হেরম্বকে বলেছিল, দুখিয়ার কুঠিতেই যখন বারবার তাকে আসতে হয় তখন রোদে-জলে ঘোরাঘুরি করে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি নেয়ার বদলে দুখিয়ার কুঠিতে বাসা করাই তো ভালো। ঘর তুলবার জায়গা দিয়েছিল ডাঙ্গরআই। দ্বিতীয়বার সেটেলমেন্টের সময়ে হেরম্ব কিছু ফেরফার করেছিল। কিন্তু সে হাঙ্গামা মিটে গেলে ডাঙ্গরআই দেখতে পেয়েছিল হেরম্ব তার পক্ষ হয়ে তদবির তদারক করে ভালোই করেছে। অন্য অনেকের জমির পরিমাণ কমে গেলেও তার জমি কোথাও কমেনি। এদিকের কৃষকরা আত্মবিস্তারের তাগিদে রাজার সংরক্ষিত বন থেকে ক্রমাগত চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছিল। সেটেলমেন্ট বনের ধারের অনেক জমিই আবার বনের সীমায় ঢুকিয়ে নিয়েছে, ডাঙ্গরআই-এর বেলায় তা হয়নি। কিন্তু ডাঙ্গরআই এও লক্ষ্য করেছিল হেরম্বর দখলি জমি বেড়েছে। সে নিজে তাকে বসবাস করার জন্য যে বিঘা চারেক জমি দিয়েছিল সেটা গদাধরের পুরনো খাতের দিকে বেড়ে গিয়ে রাজার খাসের জমি গ্রাস করেছে—পরিমাণে দাঁড়িয়েছে প্রায় আট-দশ বিঘা। শুনে ডাঙ্গরআই বলেছিল প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে, ভাটিয়ার বুদ্ধি তো ভালোই দেখং। জমিজমার ব্যাপারে বুদ্ধি দেয়াই শুধু নয়, মাতালুর জন্মদিনে ডাঙ্গরআই-এর বাড়িতে বিশেষ ঘটা করে গদাধর নারায়ণের পুজো হয়। সে পুজোর প্রচলন করেছিল হেরম্ব এবং লাভজনক পৌরোহিত্যটাও সে-ই করত। হেরম্বর সঙ্গে ডাঙ্গরআই-এর সদ্ভাবই ছিল। এক ধরনের শ্রদ্ধাও করত হেরম্ব তাকে।

মাতালু যখন গোঁসাইদের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাল তখন হেরম্বর ছেলেরা আপসের কথা নিয়েই উত্তেজিত আলোচনা করছে। তার সঙ্গে আজ কেউই কথা বলল না।

সেখান থেকে সরে গিয়ে মাতালু মালতীর খোঁজ করল। মালতী ভিতর দিকের একটা ঘরে বসে সুপারি কাটছিল। মাতালু অন্দরের কোনো ঘরে ঢোকে না আজকাল না ডাকলে। বয়স হয়েছে তার। সে ঘুরে গিয়ে ঘরটার একটা জানলার বাইরে দাঁড়াল।

'মালতী'!

মালতী চমকে উঠে মুখ তুলে চাইল। মালতীর মনে বিবাগ বা বিরক্তি কোনোটাই প্রবল হয়ে ওঠেনি; কিন্তু সে দুপুর থেকে বিকেল এবং এখন প্রায় সন্ধ্যা হতে চলল ভাইদের আলাপে মাতালুর প্রতি এত ধিক্কার শুনেছে যে আবাল্যসঙ্গী এই লোকটির সঙ্গে সহজভাবে কথা বলাটা উচিত হবে কি না ভেবে পেল না।

'মালতী'।

'কী'?

'তোমরা শুনছ মামলার কথা'?

'শুনছি আপস হবে'।

খবরটা মাতালুর কাছে নতুন। সে বলল, 'ইস কও কি? আপস? ভালো খবর তা'।

মালতী সুপাবি কাটায় মন দিল আবার।

কথা খুঁজে না পেয়ে মাতালু বলল, 'সুপারি-গুয়া দিবে না'?

সামনের রেকাবি থেকে একমুঠো সুপারি নিয়ে জানলা গলিয়ে মাতালুর হাতে দিল মালতী।

'আপস হইল্ কেনে'?

'হবে না, তুমি যে বোম্ বুদ্ধু'।

'বুদ্ধু'! কথাট না জানার ফলে মাতালু বিস্ময় প্রকাশ করল।

'হ্যাঁ। অকাট-মুখ্খু'।

'কেনে'?

নিজের পিতা সম্বন্ধে যে খবর এজলাসে দাঁড়িয়ে বলে এসেছে মাতালু, সে কথা স্বাভাবিক সংকোচেই মালতী মুখে আনতে পারল না। তার দাদারা ধিক্কার দিয়ে বলেছিল, বেটা যেন কর্ণ। কিন্তু কলঙ্কের অসাধারণত্বে মানুষের যে স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে তারই ফলে যেন সে চোরাচোখে মাতালুর মুখখানা আর একবার দেখে নিল।

লোকে তাকে বোকা বলুক আর না বলুক তাতে তার বুদ্ধির কমবেশি হবে না। বোকামি যদি সে করেই থাকে তা অন্য সময়ে ভেবে দেখবে। এখন যেন অন্য কোনো সময়। কিন্তু সে সময়ের উপযুক্ত কোনো কথা মাতালু খুঁজে পেল না; যদিও তার অনুভবে ধরা পড়েছিল মালতীর চোখের কাজল।

'কাজল দিছ দেখং'।

'কাজল'!

কাজল মালতী অনেকদিনই পরে, কিন্তু এই প্রথমে কেউ উল্লেখ করল তার চোখের কাজলের কথা। যেন তা উল্লেখযোগ্য হতে পারে। চোখ দুটিকে মালতী সামনের রেকাবির দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নামিয়ে রাখল এক মুহূর্তের জন্য, তারপর তাকাল মাতালুর দিকে। সে দৃষ্টি যেন আগের চাইতে ডাগর, যেন মেলে ধরা।

'মালতী'!

'কী'?

'কাল একবার যাইবে আমার বাড়ি'।

'কেন'?

'যাইবে'?

'কেন বলো না'।

'যাইবে তো'?

'আচ্ছা সে তখন দেখব'।

মাতালু গোঁসাইবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বাড়ির পথ ধরল। কাল যদি আসে মালতী কী বলবে তাকে সে? এ রকম ভাবে আগে কোনোদিনই সে নিমন্ত্রণ করেনি। কাজেই নিমন্ত্রণের একটা উপলক্ষ খুঁজে বার করা দরকার। আর সে যদি আসেই তবে এই অনন্যসাধারণ ব্যাপারটার মূল্য দেয়ার জন্যই বোধ হয় কিছু উপহার তাকে দেয়া উচিত।

তারপরে মালতীর চোখ দুটি মনে পড়ল তার। মালতীর দেহের ছাঁদ তার বাবার মতো, অর্থাৎ রোগাটে এবং লম্বা, রংটা চাপা। নিরপেক্ষভাবে দেখলে এই উনিশ বছরের মেয়েটিকে আকর্ষণীয় মনে হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু মাতালু এ কথা হলফ পড়ে বলতে পারে এমন দুটি চঞ্চল চোখ দেখা যায় না অন্য কোথাও।

বাড়িতে ঢুকে সে দেখল রংবর গোরু বলদগুলোকে গোয়ালে তুলছে।

মাতালু বলল, 'আজ্জা রে, ব্যস, মামলা মিটি গেইছে, ব্যস'।

'হয় নাকি। ভালে দেখং'।

অন্যের শাস্তির সংবাদে আনন্দিত হল রংবর।

মালতী আসবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল মাতালুর। তবু অনেক চিন্তা করে সে অবশেষে স্থির করেছিল উপহার দেয়ার বিষয়ে সে রংবরের স্ত্রী ফুলমতীর সাহায্যই নেবে। ভালো এণ্ডি বোনে ফুলমতী। শহর থেকে আসবার সময়ে যে চাদরটা মাতালুর মাথায় জড়ানো ছিল তাও তারই হাতের বোনা। দু-তিন মাস যাবৎ ডাঙ্গরআই-এর ব্যবহারের জন্য সে একটা চাদর বুনছে। এতদিনে সেটা শেষ হয়ে যাবার কথা। ফুলমতীর কাছে প্রস্তাব করতে হবে। এবং হয়তো সে রাজিও হবে। ডাঙ্গরআই-এর চাদরের অভাব নেই, আর তা ছাড়া সে আজকাল রাজধানী থেকে ধোয়া মলমলের চাদর আনিয়েই ব্যবহার করে। এখানে বলে রাখা যায় এদেশের মেয়েদের চাদর তাদের বক্ষবাসের কাজ করে।

প্রস্তাব করতেই ফুলমতী রাজি হয়েছে। তার চোখে অবশ্য ভাটিয়ার কন্যা মালতী আকাঙ্ক্ষার যোগ্যা নারী নয়, কিন্তু দৌহিত্রস্থানীয় মাতালুর বক্তব্য শুনে সে কৌতূহলের কারণ খুঁজে পেল। চাদরটাকে ইস্ত্রি করা বাকি ছিল। কাঠের কুঁদোয় জড়িয়ে কাঠের চাপে ইস্ত্রি করতে হয়, নতুবা মসৃণ হয় না জমি। কিন্তু মাতালুর হাতে তত সময় নেই।

কিন্তু মালতী কি আসবে? যে নিজে থেকেই কখনও কখনও আসে নিমন্ত্রণ পেলে তার পক্ষে আসাটা সহজ হওয়া উচিত, কিন্তু মাতালু নিজেই যেন একটা কুণ্ঠা বোধ করছে, একটা অনির্দিষ্ট গোপন প্রয়াস তার মনে দেখা দিচ্ছে কখনও কখনও, যেমনটা আগে কখনও হয়নি।

সময় পার করে মালতী এল। দু-তিন মাস পরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। একটু যেন তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছে সে। হাঁপাচ্ছে, ঠোঁট দুটি যেন কিছু উন্মুক্ত।

'মাতালু'!

কী হল মাতালুর, সে কিছুতেই চোখ তুলে চাইতে পারল না মালতীর দিকে।

'মাতালু'!

মাতালু মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগল কথার জন্য।

মালতী বলল, 'মাতালু, একটা কাজ করবে আমার'?

'কও'!

'ছোড়দাকে একটু খবর দেবে'?

'তা দিম্'।

'যেখানে রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে সেখানে ছোড়দার বন্ধু আছে একজন। সেইখানেই পাবে তাকে। বলবে এখুনি একবার বাড়িতে আসা দরকার। যাবে'?

'তা যাং। শোনো, তোমাক্ একটা জিনিস আনি দেং, তার পাছে'।

'তুমি দিও ফিরে এসে। লক্ষ্মী মাতালু'।

মাতালু চলে গেল, মালতীও ফিরে গেল।

মালতীদের বাড়িতে আবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মালতীর মেজদাদা রাজধানীতে থেকে কলেজে পড়ে। এইবার নিয়ে তিনবার হল তার আই. এ. পরীক্ষা দেয়া। তার অকৃতকার্যতার নানা কারণই থাকতে পারে। সে এখন আই. এ. পরীক্ষা আর না দিয়ে সাব-ওভারসিয়ার হওয়ার চেষ্টা করতে চায়। এতে মালতীর বড়দাদা আপত্তি করেছে।

বড়দাদা বলেছিল—এতগুলো টাকা খরচ করলি আই. এ-র পিছনে। আর একবার চেষ্টা কর।

তা পরে যা হয় করিস। এই নিয়েই সূত্রপাত।

রাগের মাথায় বড়দাদা বলেছে—টাকা নষ্ট করিস খালি খালি, তোকে দিয়ে আর বিশ্বাস নেই। আজকাল ক্রমশই বেশি টাকা লাগছে তোর। আমি আর টাকা দিতে পারব না।

মেজদাদা চিৎকার করে উঠেছিল—টাকাটার সব তোমার নয়। আমার টাকা দিয়ে আমি যা খুশি করব।

মা এসে দাঁড়াতেই মেজদাদা বলেছিল—কার জন্যে টাকা খরচ হয় শুনি? আমার কি ছেলে-বউ আছে?

তার ইঙ্গিত ছিল, বড়দাদার ছেলে-বউ আছে, তার জন্য যে টাকা খরচ হয় অবিবাহিত ভাইদের জন্য তা হয় না।

মা বড়দাদাকে অনুরোধ করেছিল—তুই এখনকার মতো দিয়ে দে টাকাটা।

বড়দাদা বলেছিল—বেশ তো, দিচ্ছি। কিন্তু এরপরে মালতীর বিয়ের টাকা যদি খরচ হয়ে যায়, আমাকে কিছু বোলো না।

এ কথাটাই মালতীকে ঘর থেকে ঠেলে বার করেছে। তার মনে হয়েছিল সেই এই ঝগড়ার কারণ।

বড়দাদার কাজকর্ম এমনকী কথাবার্তাও মালতীর বাবার মতো। লেখাপড়া তার পাঠশালা পর্যন্ত। দেশে থাকতেই যা হয়েছে। এখানে আসবার পর বাড়িতে বসে হাতের লেখা মক্শো করেছে ব্যবসার খাতা লিখে। সংসারের জন্য, ব্যবসা চালানোর জন্য পরিশ্রম যা কিছু সেই করে। মালতীর চোখে সে-ই এই পরিবারটার আশ্রয়স্থল।

মেজদাদাকেও মালতী ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকেই রাজধানীর স্কুলে সে পড়েছে। পরিবারের মধ্যে বেশভূষার দিক দিয়ে যেমন, কথাবার্তা রুচির দিক দিয়েও তেমনি সে-ই সবচাইতে মার্জিত, যদিও সে আজ অত্যন্ত রাগ করে অনেক রূঢ় কথা বলেছে। সে হেঁটে গেলে প্রসাধনের মৃদু গন্ধ পাওয়া যায়। ভাইবোনদের জন্য সেও চিন্তা করে নিজের পথে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মালতী বা তার ছোড়দার ব্যবহারের সবকিছু শৌখিন জিনিস সে-ই কিনে এনেছে এতদিন।

মালতীর বাবা বেঁচে থাকতে একটা আলোচনার বিষয় হয়েছিল মেজদার এই রীতি।

ওটা কী হবে?—মালতীর বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

ছোড়দাদার জন্য একটা হাতঘড়ি কিনে এনেছিল মেজদাদা, তাই এই প্রশ্ন।

ভদ্রলোকের ছেলেরা ঘড়ি পরেই তো—বলেছিল মেজদাদা।

সূর্য থেকে সময় চিনতে অভ্যস্ত হেরম্বর কাছে হাতঘড়ি একটা নিরর্থক খেলনা ছিল। কিন্তু নিজের অভ্যস্ত জীবনধারার সঙ্গে ছেলেদের জীবনের পার্থক্য বোঝাতে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' এই কথাটা বলেই সে চুপ করে গিয়েছিল। কারণ সে অনুভব করছিল তার জীবন যেখান থেকে শুরু হয়েছিল ছেলেদের জীবন তার কয়েক ধাপ উপরের থেকে শুরু হবে। সে অর্থসঞ্চয় করেছে অসীম ক্লেশ স্বীকার করে। ছেলেরা একটু আরামপ্রিয়ই হবেই। গজাননও তার মতো সাদামাটা নীরস জীবন যাপন করে না। ভেবে দেখতে গেলে গজাননের জীবনও তার তুলনায় আভিজাত্যের এক ধাপ উপরে শুরু হয়েছে।

এ অবস্থায় ছোড়দা এসে কী করবে মালতী জানে না, কিন্তু যদি বিসম্বাদ গুরুতর হয়ে ওঠে, অন্তত দুজনের মাঝখানে গিয়ে তো দাঁড়াতে পারবে।

মাতালু রওনা হয়ে গেলে মালতী ভাবল : তাকে বোকা বলে ভালো হয়নি। আপদে-বিপদে যে লোকটা অনুযোগ না তুলে এগিয়ে আসে সে বোকা হলেও তার মুখের উপরে সেটা বলা ভালো দেখায় না।

মাতালু হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। সে ভাবল : সে ফিরে আসা পর্যন্ত কি মালতী অপেক্ষা করে থাকবে? লক্ষ্য করে আজও সে কাজল পরেছে। বেশ চোখ দুটি মালতীর। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। কিন্তু কী হল ওদের বাড়িতে কে জানে। বুড়ো গোঁসাই-এর মৃত্যুর পর থেকে একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে।

হঠাৎ কেন নজর পড়ল এদিকে, তা বোধ হয় হুকুমের মালিক ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। রাজধানী থেকে এই সড়কটা দ্যাখ দ্যাখ করে এগিয়ে আসছে গদাধরপুরের দিকে। যে রকম গতিতে আসছে তাতে মনে হয় সে গদাধরপুর ছাড়িয়েও এগিয়ে যাবে। যখন সেটলমেন্ট হয়েছিল এবং আমিনরা আসতে আরম্ভ করে তখনকার কথা মাতালু গল্পে শুনেছে। তখন নাকি এমনি শোরগোল পড়েছিল এ অঞ্চলে। অফিসেব তাঁবু পড়ত যে গ্রামে তার থেকে দু-পাঁচ মাইল এগিয়েও সব গ্রামে একটা অস্বস্তি যেন আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াত। হয়তো সড়ক যেসব গ্রামের কাছে এসেছে সেখানেও তেমনি একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেটলমেন্টের উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারেনি তখন। এখন দেখা যাচ্ছে ইচ্ছামতো বন-অরণ্য থেকে জমি কেড়ে নিয়ে চাষ-আবাদ করা বন্ধ হয়েছে। লোকসংখ্যার চাপ গ্রামের জমির উপরে যতই পড়ুক, ধারেকাছে জঙ্গল হয়ে যাওয়া জমির দিকে হাত বাড়ালে চলবে না। কিন্তু এ ব্যাপাবে মাতালুব নালিশ নেই। যাদের হুকুমে এসব কাজ হয় কখনও কখনও তাদের কাজকর্মে সন্দেহ এলেও সে বরং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করেছে, তারা সব জায়গার খবর একসঙ্গে পায়, সবদিকে নজর রেখে মনঃস্থিব করে, সুতরাং একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না তাদের সদ্‌বুদ্ধিকে। তার এ সিদ্ধান্তের মূলে হয়তো গোঁসাইবাড়ির কারো আলোচনা আছে। অবশ্য কথাটা ঠিক কে বলেছিল তা তার মনে নেই।

সন্ধ্যার রং লেগেছে তখন আকাশে, কিন্তু কাছের জিনিস তখনও স্পষ্ট দেখা যায়। মাতালু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল কারা যেন মাটি দিয়ে মস্ত একটা স্তূপ করে রেখেছে। সে যে-পথ ধরে এসেছিল সেটা বহু পুরনো পথ। স্তূপটা যেন তার বাঁয়ের দিকে, বাস্তা থেকে খানিকটা দূরে। ওদিকে আবাদের জমি থাকব্যরই কথা। সেই জমির উপরে মাটি রাখল কে? এখন হেঁউতির ফলনের সময়। এ অঞ্চলের কৃষকদের ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম সবই এই হেঁউতির ফলনের উপর নির্ভর করে। ও জমিটাও সবুজ ধানের ছড়ায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকার কথা। মাতালু ভাবল যদি কৃষক নিজেই জমিতে মাটি তুলে থাকে এখন, তবে সে নিশ্চয়ই হঠাৎ কোনো কারণে ঘোর উন্মাদ হয়ে পড়েছে; আর অন্য কেউ যদি এ কাজ করে থাকে, তবে সে মানুষ নয়, মানুষের পক্ষে এতটা নির্দয় হওয়া সম্ভব নয়।

মাতালু এইসব ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাকে থামতে হল। তার পথ রোধ করে এখানেও একটা মাটির স্তূপ। স্তূপ নয়, প্রাকার। ডাইনে-বাঁয়ে সেই ম্লান আলোয় যতদূর দৃষ্টি চলে মানুষ সমান আলগা মাটির উঁচু প্রাচীর তার পথকে কেটে চলে গেছে। অবাক কাণ্ড! কিন্তু থামলে চলবে না তার, খবরটা পৌঁছে দেয়া দরকার মালতীর ছোড়দাকে। সে প্রাচীরটার কোল ঘেঁষে এগোনোর চেষ্টা করে থামল। পায়ের তলায় কাঁচা ধানের ছড়া লাগছে। গাছগুলির গোড়া পড়েছে প্রাচীরের তলে, শিবসমেত মাথাটা লুটিয়ে আছে মাটিতে। হঠাৎ স্ফুরিত হল তার মনে, তাহলে এই প্রাকারটাই নতুন সড়ক। হাত-পায়ের সাহায্যে সে আলগা মাটির প্রাচীরটার মাথাতে উঠে পড়ল।

যা তার হঠাৎ মনে হয়েছে ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে তাই। নতুন সড়ক পুরনো পথ ধরে চলছে না। এ দুটির চালই যেন আলদা। পুরনো পথ চলত এঁকেবেঁকে, দু'পাশের জমিকে বাঁচিয়ে। জমির শস্য বহন যে করবে, সে কর্তব্য পালন করাই যার পরম গৌরব, সে জমিকে খাতির না-করে পারে না। কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে। তার গতি দেখে তার মতি বোঝা যায় না।

মনে হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার থাক, সেটা জমি এবং ফসলকে খাতির করা নয়।

বাঁয়ের দিকে সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চাইলে সে নতুন সড়কটার অগ্রগতি সম্বন্ধে জল্পনা করতে পারত। দুখিয়ার কুঠি দিয়ে যাওয়ার সময়ে কার কার জমির উপর দিয়ে এই কালো-নদী প্রবাহিত হবে তাও আন্দাজ করতে পারত। কিন্তু একবারে নিজের পায়ের তলায় মাড়িয়ে আসা ধানের গোছার চাইতে দূর ভবিষ্যতের দিকে তার মন অগ্রসর হতে চাইল না। বরং ডাইনের দিকে জোনাকির মতো জ্বলা আলোর দিকেই তার দৃষ্টি ও মন ধাবিত হল। ওই দিকেই তাহলে রাস্তার মজুর এবং তাদের মালিকেরা আছে। এবং এইখানেই মালতীর ছোড়দাকে পাওয়া যাবে।

কাঁচা মাটি, বড় বড় পাথরের টুকরো, নরম নরম সদ্যঢালা পিচের উপর দিয়ে চলে চলে অবশেষে নতুন পথের বালিঢাকা মসৃণ সমতায় পৌঁছে গেল মাতালু। দুপাশে এতক্ষণ যে নিচু নিচু গোল গোল খড়ের ছাউনি মিটমিটে কুপির আলোয় চোখে পড়ছিল, এখানে এসে সে বাসগৃহের পরিবর্তন হয়েছে। খড়ের একচালা, দোচালার মধ্যে হারিকেনের আলো জ্বলছে। এগুলি নিশ্চয়ই বাবুদের থাকবার জায়গা।

মালতীর ছোড়দাদাকে সহজেই পাওয়া গেল। সে এক দোচালায় হারিকেনের আলোয় একটা টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিল ওভারসিয়ারবাবুর সঙ্গে। দুজনে যেন যমজ এমন পোশাক। প্রথমে অগ্রাহ্য করলেও একটা লোক প্রায় তিন মাইল পথ এসেছে খবর দিতে এটা বোধ হয় যুক্তি হিসাবে ছোড়দাদার মনে লাগল। ওভারসিয়ারের কাছে বিদায় নিয়ে ছোড়দাদা বাড়িতে যাবার জন্য পা বাড়াল।

ছোড়দাদা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল—জানিস নাকি কী হয়েছে?

—মুই কী জানং।

পথে আর কথা হযনি। ছোড়দাদা টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে চলছে। কিছু পিছনে মাতালু।

নতুন পথ থেকে পুরনো পথের জন্য নামল তারা। এখানে এসে আবার সেই ধানের ছড়াগুলো পায়ে দলে চলতে হবে। ছোড়দার জুতোর তলায় ধানের শিষ স্পর্শ না দিলেও মাতালুর খালি পায়ে দিচ্ছিল। এ অবস্থায় অন্য কারো মনে কী হতে পারত তা কৌতূহলের হলেও নিরর্থক। মাতালুর নিজের মনেই ধানের জন্য যে খেদটা জেগেছিল হয়তো সেটাই তার কাছে আবার ফিরে আসতে পারত। কিম্বা পথটা এত তাড়াতাড়ি এত কাছে এসে পড়েছে, এই বিস্ময়। তা হল না। মাতালু ভাবল : মালতীর ছোড়দা এই সেদিনেও হাফপ্যান্ট-পরা রোগা বোগা একটা বালকমাত্র ছিল। কিন্তু এখন এই অন্ধকারের অস্পষ্টতার জন্যই এবং কিছুটা হয়তো পোশাকের জন্যও বটে একজন বয়স্ক ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে। বেশ পোশাক ভাটিয়াদের।

তারপর সে ভাবল : মালতী কি এখনও অপেক্ষা করে আছে? না থাকাই সম্ভব। বাড়িতে যদি সত্যই গোলমাল লেগে থাকে তবে তার পক্ষে বাড়িতে ফিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই কিছু ঘটেছে? এমন কি হতে পারে মালতীর এটা একটা খেলা—তাকে না হোক খানিকটা ছুটিয়ে নিল? সে যে বোকা এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা? তা যদি হয় তাহলে গভীর অন্যায় মালতীর, এর জন্য তাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবে না মাতালু।

কিন্তু কিছু দূর গিয়ে মাতালু চিন্তা করল : মালতীর যদি এটা ছলই হয়ে থাকে, তাহলেই এমন কথা বলা যায় না যে তাকে বোকা প্রমাণ করার চেষ্টাই ছিল মালতীর। এমনও হতে পারে সে নিজে যেমন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না, তেমনি হয়েছিল মালতীর। কিছু একটা বলার জন্যই সে বলেছিল ছোড়দাকে ডেকে আনার কথা। মালতী চিরকালই দুষ্টু, অনেক দুষ্টুমি সে ছেলেবেলায় করত।

নিজের বাড়িতে ফিরে মাতালু দেখল মালতী ফিরে গেছে। তার খুব ইচ্ছা হল ডাঙ্গরআইকে সে জিজ্ঞাসা করে মালতী তার জন্য অপেক্ষা করেছিল কি না। কিন্তু এই সাধারণ কথাটা জিজ্ঞাসা

করতে তার লজ্জা বোধ হল, আর কেন সে রকম হল তা সে বুঝতে পারল না।

দু-এক দিন পরে মাতালু মালতীকে দেবার জন্য ফুলমতীর কাছে চাদরখানা চাইতে গিয়ে শুনতে পেল মালতী সেখানা নিয়ে গিয়েছে।

৫

আমরা সম্ভবত ভগীরথ বংশের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট। সেজন্য গঙ্গা আনয়নের ব্যাপারটাকেই একমাত্র বক্তব্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি। গঙ্গা এমন কিছু শান্ত বা ধীর নয়। তার গতিপথে শুধু অরণ্যই ছিল না, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় তৈরি গ্রামও ছিল। সেসব গ্রাম নিশ্চিহ্ন করেই সে এগিয়েছে। কিন্তু পাবনী গঙ্গার কথা বলতে গিয়ে সেইসব নষ্ট-আশা মানুষের কথা চিন্তা করতে পারি না। দু-একজন জহ্নুর কথা হয়তো উল্লেখ করি, কিন্তু সবাই তো জহ্নু নয়।

পিচের পথ কালো-নদী দুখিয়ার কুঠির দিকে এগিয়ে এল। দুখিয়ার কুঠির ঠিক আগের গ্রামে ডেরা পড়েছে কুলিকামিন ও ওভারসিয়ার বাবুদের। দুই গ্রামের মাঝে কয়েক সারি শাল গাছ। সেটলমেন্টের ফলে এগুলো এখন সরকারের সম্পত্তি। দুপাশের গ্রামের চাপে নিশ্চিহ্ন-প্রায় আদিম না হোক বহু পুরাতন অরণ্যের শেষ কয়েকসারি গাছ। তাদের সাধ্য কি কালো-নদীর গতিপথ রুখে দেয়ার! ওপারে গ্রামের বেদনার কথা পরোক্ষভাবে কানে আসে, প্রত্যক্ষভাবে কানে আসে রোলার ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকার, বনের গাছে কুড়ুল মারার শব্দ। একটা অস্বস্তি বোধ করছে চাষীরা।

একদিন সকালে কাঁকরু দেখতে পেলে তার জমিতে কয়েকজন অপরিচিত লোক প্রবেশ করছে। ক্ষেতভরা হলুদ রং-এর ধান। আর দশদিনে ধান কাটতে হবে। এ সময়ে জোরে বাতাস বইলে চাষীর প্রাণ ধক্ ধক্ করে ধান ঝরে যাবে বলে। গ্রামের গোরু-বাছুরগুলিকে যৌথ চেষ্টায় ক্ষেত থেকে দূরে রাখে তারা। মানুষ ঢোকে না জমিতে পাছে গায়ে লেগে ধান ঝরে যায়। সেই জমিতে কিনা মানুষ!

পড়ি-মরি করে ছুটে গিয়ে কাঁকরু দেখল লোক কয়েকটি তার জমিতে খোঁটা পুঁতেছে, খোঁটার গায়ে দড়ি বাঁধা। সে কী? কাঁকরু তাকিয়ে দেখল তার ডান দিকে অন্য কয়েকজনের জমির উপর দিয়ে খোঁটার মাথায় মাথায় সেই দড়ি এগিয়ে এসেছে। শক্ত কাতার দড়ি। প্রথম করণীয় হিসাবে সে দু-হাতে টেনে দড়ি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল। শক্ত খসখসে দড়িতে তার হাত ছড়ে গেল, কিন্তু ছিঁড়ল দড়ি। তারপর সে সেই বিদেশি লোক ক'টির দিকে ফিরে দাঁড়াল, 'মান্‌সি না হয় তোমরা'?

লোক ক'টি বিস্মিত হয়েছিল কাঁকরুর সাহস দেখে। কিন্তু এর চাইতে কম শক্ত হয়ে দাঁড়ালেও অন্য গ্রামের লোকরাও প্রতিবাদ করেছে এর আগে। প্রতিবাদকে অবহেলা করতে তারা অভ্যস্ত। কাজেই তারা ছিঁড়ে দেয়া দড়িটা আবার বাঁধতে লাগল।

কাঁকরু দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল। একা তার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যারা দড়ি বাঁধছে তারা পাঁচ-সাতজন, কিন্তু দূরে তাদের দলের অন্য অনেককে দেখা যাচ্ছে। কাঁকরু তখন গ্রামে খবর দেয়ার জন্য চলে গেল। তার পথের দুপাশে বিমূঢ় উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল। প্রথম উত্তেজনায়, যাদের জমি দড়ির বাঁধনে পড়েছে, তারা চেঁচামিচি করল তারপর লাঠি হাতে দল বেঁধে অগ্রসর হল। তাদের দলে কাঁকরুর দাদা চ্যারকেটুও ছিল। কিন্তু কাঁকরু মনে মনে হিসাব করে দেখল সাত-আটজন চাষী লাঠি যত শক্ত করেই ধরুক অসংখ্য কুলিকামিনের

সম্মুখে তারা দাঁড়াতে পারবে না। পরন্তু সে দেখতে পেল টুপি মাথায় সাহেবি পোশাক-পরা কে একজন কুলি নিয়ে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ প্রতিরোধের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হিংস্রতা ছিল না তাতে। সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই হিংস্রতা দেখা দিল কাঁকরুর মনে।

হাতের লাঠি ঘরে রেখে চালে গোঁজা গুড়াল বাঁশ (বাঁটুল) হাতে করল সে; কোঁচড়ে ভরে নিল পাথরের কুচি, আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা মাটির গুলি, তারপরে উঠে দাঁড়াল তার গোয়ালঘরের পাশে গোয়ালের পুঁজে। নিজেকে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রেখে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। সাহেব আওতার মধ্যে আসতেই সে বাঁটুল টেনে ছেড়ে দিল প্রথম গুলি। টুপিতে লাগল সাহেবের। সে ভেবেছিল হঠাৎ কিছু একটা পড়েছে। সে বেশ কায়দা করে চাষীদের সম্মুখে বিপক্ষের বিজয়ী সেনাপতির মতোই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু প্রতি আধ মিনিটে একটা করে গুলি ছুটতে লাগল কাঁকরুর বাঁটুল থেকে। সবসমেত তিন মিনিট; একটু দূরে বলে নিশানা ঠিক হচ্ছিল না, বাঁটুলের বাখারিটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল বলেও বটে জোর তত ছিল না গুলির। কিন্তু মুখের উপরে গোটা দুই লাগতেই সাহেব উর্ধ্বশ্বাসে পালাল। তখন তার নাক বেয়ে রক্তও পড়ছে। দলপতি পালাতেই তার সৈন্যদলও পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। কাঁকরু সেই কুলিকামিনদের মধ্যে অবিরত গুলি ছুঁড়তে লাগল তার বাঁটুল থেকে। সবগুলো লক্ষ্যে পৌঁছল না, কিন্তু কয়েকটি কুলিদের গায়ে মাথায় পিঠে গিয়ে লাগল। তারা পড়ি-মরি দৌড়তে শুরু করল।

যে চাষীরা লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়েছিল তারা বিস্মিত হল, কিন্তু তখন বিস্ময় নিয়ে আলোচনার সময় ছিল না। কুলিকামিনরা পালিয়েছে বটে আবার হয়তো এখনই ফিরবে। তারা বুঝতে পেরেছে, বিদেশিরা তাদের লাঠির ভয়ে পালায়নি। এই বিদেশি বা ভাটিয়ারা কোথা থেকে জোর পায় কে জানে, কিন্তু এরা বাধা পেলেও থামে না, আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। চাষীদের দু-একজন ডাঙ্গরআই-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল, কিন্তু বাকি চার-পাঁচজন স্থির করল জমিগুলিকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রই করতে হয় তবে ধান কেটে নেয়াই ভালো। অসময়ে কাটার ফলে কিছু ধান কাঁচা থাকবে, ফসল নষ্ট হবে, কিন্তু এছাড়া কী-বা করার আছে। তারা বাড়িতে লাঠি রেখে প্রতিবেশীদের ডেকে কাস্তে হাতে ধান কাটতে ছুটল।

কাঁকরু তার গোয়ালের পুঁজ থেকে নামল। রাগ আর হিংস্রতাকে প্রকাশ করতে পেরে তার মন তখন খানিকটা শান্ত হয়েছে এবং তার ফলে উত্তেজনার অবসাদের মতো নানা দুশ্চিন্তা তার মনে ভিড় করে আসছে। একবার তার মনে হল, মাতালু যদি থাকত তার পাশে বাঁটুল নিয়ে, ওদের মনে তাহলে এ গ্রাম সম্বন্ধে আরো খানিকটা সমীহ জাগিয়ে দেয়া যেত। মাতালুর বাঁটুলের লক্ষ্যভেদ দেখার মতো। কিন্তু যারা কালো-নদীর প্রবাহপথের বাধা দূর করে করে রাজধানী থেকে এতটা পথ এগিয়ে এসেছে তারা পাখি নয় শিয়ালও নয় যে পাখি-তাড়ানো বাঁটুল দিয়ে তাদের তাড়ানো যাবে। তারা একটা গভীর অন্যায় করছে, কিন্তু কোথায় এর প্রতিকার? অধিকাংশ জমিতে চাষীরা ধান কাটতে বসেছে, সেও কি তাদের মতোই আধপাকা ধান কাটবে?

যারা ডাঙ্গরআই-এর বাড়িতে গিয়েছিল পরামর্শ করতে, তারা ফিরে এল মাতালুকে সঙ্গে করে। বলা বাহুল্য, পরামর্শ করে তারা কোনো উপায় বার করতে পারেনি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার। বরং তারা যখন দেখল অন্য চাষীরা ধান কাটতে গেছে তারাও কাস্তে নিয়ে জমির দিকে চলে গেল।

কিন্তু মাতালুর মন ভালো ছিল না। ব্যাপারটা শুনে তার মনে হয়েছিল, কাঁকরু না জানুক সে নিজে মাটি-চাপা-পড়া ধানের শিষ দেখে এসেছিল এর আগে। সে যদি ইতিপূর্বে সেকথা কাঁকরুকে বলত, গ্রামের চাষীদের সঙ্গে আলাপ করত, তাহলে হয়তো এমন আশু বিপদের মুখে এমন বিমূঢ় হয়ে দাঁড়াতে হত না। এখন এরা ধান কেটে নেয়ার সময় পাবে কি না সন্দেহ। প্লাবনের মুখে জমি যাবেই, আগে থেকে জানতে পারলে হয়তো ওভারসিয়ার সাহেবের সঙ্গে দরবার করে কয়েকটি

দিন সময় নেয়া যেত, ধানগুলো পাকার সময় পেত।

কাঁকরু কাস্তে নিয়ে বেরুচ্ছিল, দরজার কাছে মাতালুর সঙ্গে দেখা হল তার।

'কাঁকরুরে, ভাটিয়ারা ঘর গেইছে, মনৎ হয় আইস্‌বে ফিন্‌'।

'আইস্‌বে তো'।

'কোটে যাস্‌, ধান কাটিবার'?

'করং কী আর'?

তাই তো এছাড়া কী করার আছে?

'কাঁকরুরে, ধান এলাও পাকে নাই'।

'নাই পাকে'।

'জমি ধরি নিবে, বা। রুখিবার কোন নাই রে'?

কেউ নেই, কোনো উপায় নেই রুখবার। কাঁকরুর চোখ দিয়ে বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। জমি তো নেবেই, ধান কেটে আনতে পারবে এমন ভরসাও কমে আসছে।

মাতালুর মনে বেদনাটা প্রতিকারের পথ খুঁজছিল, তার কথা বলার প্রায় শান্ত সুর থেকে তার মনের উত্তাপ বুঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু চিরঅভ্যস্ত সংযত আলাপের মধ্যে কাঁকরুর নিগূঢ় বেদনা যেমন নিঃশব্দ অশ্রুজলে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি আকস্মিকভাবে প্রকাশ পেল মাতালুর ক্রোধ।

'মুই গদাধরপুর যাঙ্‌রে, নায়েব আহিলকারক ধরি আসিম। তাঁয় না খাজনা খায়'?

কাঁকরুর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। সে বলল, 'না আইসে তাঁয়'?

ততক্ষণে মাতালুর কপালের শিরাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুক ওঠাপড়া করছে। সে বলল, 'না আইসে? মারি দেঙরে, ঠ্যাং তুলিয়া মুখৎ মারিম্‌'।

পৃথিবীতে অনেক অন্যায় ঘটেছে, তার প্রতিকার করার জন্য স্বর্গের রাজসভায় গিয়েছে এবং প্রতিকার না পেয়ে সেই রাজসিংহাসনে পদাঘাত করেছে, পুরাণে এমন কোনো মুনিকুমারের কাহিনী যদি থাকে আমার তা জানা নেই। মাতালু ধনী কাঁকরুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গদাধরপুরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। অন্তরের প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য ফুটে উঠেছে তার ভঙ্গিতে। দু-একটি অজ্ঞাত ভয়, নিজের শক্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবিশ্বাস তার অন্তরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করল। কিন্তু এক্ষেত্রে ধানের ক্ষতির সঙ্গে বন্ধু কাঁকরুর বিপদ জড়িত। অধিকন্তু তার কেবলই মনে হচ্ছে, যে সময়ে সে ব্যাপারটা প্রথমে জানতে পেরেছিল তখনই যদি গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দিত, হয়তো এমন দুঃসময় উপস্থিত হতো না। একটা অনুশোচনা যেন।

নায়েব-আহিলকারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং তার আগে তার প্রতিজ্ঞা-কঠোর মনে কিছুমাত্র শ্লথতা আসেনি। শুধু একটা হাসির ব্যাপার ঘটেছিল। এবং তার ফলে কিছুক্ষণের জন্য তার মন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। নায়েব-আহিলকারের কাছে বলবার কথাগুলি মনে গুছিয়ে নেবার সুযোগই হল তাতে। গদাধরের খেয়ানৌকায় উঠে মাতালু দেখতে পেল, যাত্রীদের মধ্যে একজন একটা টুলে বসেছে। প্রথা অনুসারে গণ্যমান্য যাত্রীর জন্য ঘাটিয়াল এমন টুল পেতে দেয়। টুলের উচ্চতায় বসে যে যাত্রী তার পদমর্যাদার হিমালয়ত্ব রক্ষায় ব্যস্ত তার মুখ ছাতা দিয়ে আড়াল করা। কিন্তু নৌকা ঘুরতেই রোদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ছাতাটা সরিয়েছিল যাত্রীটি, তার ফলে তার মুখ দেখতে পেল মাতালু। মালতীর ছোড়দাদার বন্ধু সেই ওভারসিয়ার। কিন্তু মাতালু চিনতে না পারলেও অন্যায় হতো না। ওভারসিয়ারের নাক ও একটা চোখ ভীষণভাবে ফুলে আছে, গালে ও জামার বুকে শুকনো রক্ত। মাতালুর কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু কাঁকরুর বাঁটুলে এ রকম হয়েছে এ না জানলেও সে অনুমান করল হয়তো-বা কোনো চাষীর লাঠির আঘাতেই হয়েছে। হঠাৎ তার হাসি পেল, ওভারসিয়ার উচ্চাসনে বসে ছিল বলেই হয়তো।

মাতালু নায়েব-আহিলকারকে পেল তার কুঠিতে। সংক্ষেপে সোজা ভাষায় ধানের অপমান ও চাষীদের ক্ষতির কথা বর্ণনা করে মাতালু বলল, 'ইগুলা মান্সি না হয়, মান্সির লক্ষণ নাই দেখং'।

এই বাংলা দেশে একটা প্রথা আছে এই যে, জমি বেদখল বা ধান নষ্ট করার নালিশ রাজপুরুষদের কাছে খুব বেশি আমল পায় না, এবং বিচারের পদ্ধতিও এত জটিল যে মামলা করে ফল পেতে পেতে নষ্ট করা ধান একেবারে মাটিয়ে যায়, বেদখল করা জমিতে ফসলের নতুন খন্দ ওঠে। কাজেই যতক্ষণ না এসব একটা ফৌজদারি মামলা করার মতো খুনজখমের অপরাধে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে রাজপুরুষরা গুরুত্ব দিতে চায় না। মাতালুর নালিশ শুনে নায়েব-আহিলকার, সুতরাং, কী করত তা বলা কঠিন।

এক্ষেত্রে কিন্তু নায়েব-আহিলকারকে বিচলিত করার একটা কারণ ছিল। নায়েব-আহিলকার তার পদাধিকার বলে মহকুমার মালিক, এবং অপ্রচলিত হলেও একমাত্র তারই উপাধি এস.ডি.ও হতে পারে। কিন্তু তার কানে এসেছে রাস্তা তৈরি কবার ওভারসিয়ারকে তার অধস্তন কর্মচারীরা এস. ডি. ও. বলে উল্লেখ করে। এবং মাতালু যখন তার নালিশ জানাচ্ছিল ঠিক তখনই দরজা-দার চাপরাসি এসে বলল—এস. ডি. ও. সাহেব এসেছেন দেখা করতে।

নায়েব-আহিলকারের মুখে বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। সে চিরতা খাবার মতো মুখ করে বলল, 'আসতে বলো'।

দুই এস.ডি.ও-র সাক্ষাৎ খুব কৌতুককর হতে পারত। কিন্তু নায়েব-আহিলকারের কর্তব্য-তালিকা থেকে আর যাই বাদ দেয়া যাক অফেন্স এগেনস্ট পার্সনকে উপেক্ষা করা চলে না। কাজেই ওভারসিয়ার যখন নায়েব-আহিলকারের প্রথাসম্মত হাড়ুডু-র উত্তরে নিজের দৈহিক অবস্থার কথাই বলল, নায়েব-আহিলকারকে উপেক্ষার উত্তুঙ্গতা থেকে নামতে হল।

ওভারসিয়ার বলল, 'কে মেরেছে বলতে পারব না, পাঁচ-ছজন লোক গুলতি জাতীয় কিছু দিয়ে পাথর ছুঁড়েছিল এই আমার অনুমান'।

মাতালু ভাবল : তাহলে বাটুলের ব্যবহারই হয়েছিল। কিন্তু কাঁকরুদের পাড়ায় কাঁকরু ছাড়া এমন টিপ করে বাটুল ছাড়বার আর কে আছে। পাঁচ-ছজন নয়, কাঁকরুরই কাজ। এ তো পাখি মারা নয় যে টিপ করতে হবে। ওভারসিয়ারের মতো একটা বড় জানোয়ারকে লক্ষ্য করা। রাগের মাথায় মিনিটে দু-তিনটি গুলি ছোঁড়া কাঁকরুর পক্ষে কঠিন নয়।

নায়েব-আহিলকার ভাবল : এস.ডি.ও. হবার দুরাশা এমনভাবেই মিটবে তোমার একদিন। হুঁ হুঁ, এ বাপু দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া, তোমার মতো সড়ক তৈরি করা নয়।

সে গম্ভীর মুখে বলল, 'পিনাল কোড বলে বই আছে একখানা। তাতে বলে মারলেই অপরাধ হয় না। দেখতে হবে চাষীরা আত্মরক্ষার জন্য মেরেছে কি না। আপনি এবং আপনারা কী করেছিলেন জানা দরকার'।

ওভারসিয়ার দ্বিধা করতে লাগল।

সেই অবসরে নায়েব-আহিলকার ভাবল : এজলাসে বিচারপ্রার্থী হয়ে যদি দাঁড়ায় ওভারসিয়ার, দুই এস.ডি.ও-র পার্থক্যও সুপ্রমাণিত হয়ে যাবে।

ওভারসিয়ার বলল, 'আপনি কি চান সড়কের কাজ বন্ধ করে দেয়া হোক'?

'তা কেউ চায় না। তাই বলে আধপাকা ধানের উপরে মাটি চাপানোও সকলে সমর্থন করবে না'।

'ওরা তো ক্ষতিপূরণ পাবে পরে'।

'কতটা ক্ষতি করলেন তা কি লিখে রাখছেন? ক্ষতিপূরণ দেবার সময়ে কি ধানের দাম ধরবেন'?

নায়েব-আহিলকার সিগারেট ধরাল।

'ওসব ব্যাপারের ভার আপনাদের। আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়েছি বটে। কিন্তু যদি পদে পদে এ রকম বাধা পাই তবে শীতকালেও গদাধর নদী পর্যন্ত পৌছুতে পারব না। অথচ, আপনি জানেন কি না জানি না, রাজধানী থেকে ওঁরা কয়েকজন সড়কের অগ্রগতি দেখবার জন্য আজ-কালের মধ্যেই আসবেন। এবং আমি যতদূর জানি আমার কাজকে সব রকমে সাহায্য দেবার নির্দেশ হয়তো আপনার দপ্তরেও এসেছে। আমার রিপোর্টে আমি এদিকের সব কথাই লিখব'।

নায়েব-আহিলকার এ ইঙ্গিতটায় ক্রোধভরে বলল, 'তা আপনি করবেন, আমিও তদন্তে যাব। আপনার সম্মুখেই একজন উপস্থিত। যাও, মাতালু আমি আজ-কালের মধ্যেই দুখিয়ার কুঠিতে যাচ্ছি'।

ওভারসিয়ারও উঠে দাঁড়াল। সে যে কম নয় তার প্রমাণস্বরূপ এ অঞ্চলে যা কেউ করে না, নায়েব-আহিলকারের সামনে তেমনি করে মুখে সিগারেট গুঁজে তাতে কায়দা করে আগুন জ্বালল।

নায়েব-আহিলকারও তাকে উপেক্ষা করার জন্য বলল, 'দরকার হলে আপনার আঘাতের কথা আপনি পুলিসকে জানাবেন, থানায় এজাহার দেবেন। আমি বিচার করব। আমার কাছে আসবার দরকার নেই। কন্‌টেম্পট অব কোর্ট বলেও একটা কথা আছে'।

বিষয়টার পরিসমাপ্তিতে খানিকটা নাটকীয়তা দেখা দিল। মাতালু ও ওভারসিয়ার একই খেয়াতে গদাধর পার হয়েছিল, কিন্তু নিজেদেব মধ্যেকাব সামাজিক, ঘটনাগত ব্যবধান প্রমাণ করার জন্য ওভারসিয়ার মাতালুর বিশ-ত্রিশ হাত আগে আগে চলেছিল। প্রথমে অপবিচিত একটা তীব্র শব্দ শোনা গেল, তারপরে সেই শব্দকে অনুসরণ করে ঘটনাটা ঘটে গেল।

পথের দুধারে বড় বড় গাছ। একখানি লাল রং-এর মনোপ্লেন যেন সেই গাছগুলোব উপরে নেমে পড়বার জন্য ছুটে এল। মাতালু জীবনে এই প্রথমে দেখল এরোপ্লেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে বোবা হয়ে গিয়েছিল, আত্মরক্ষার তাগিদে পথেব ধারের গাছগুলো ঘেঁষে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। সে অবস্থা থেকে সে বুঝতে পারল, সেই লোহাব জটায়ু রাক্ষস এদিককার কোনো গাছে বসেনি, বরং যেন দূবে চলে যাচ্ছে। আর সবটুকু লক্ষ্য করতে না পারলেও তার মনে হল ওভারসিয়ারবাবু সেই হাওয়াই জাহাজেব নাবিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

বস্তুত ওভারসিয়ার মাতালুর মতো অশিক্ষিত আদিবাসী নয় যে ভয় পাবে। এরোপ্লেন দেখে সে-বুঝতে পেরেছিল কানাঘুষোয় যে কথাটা শোনা যাচ্ছিল এতদিনে সেটা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ পথের অগ্রগতি দেখবার জন্য রাষ্ট্রপালক নিজে বেরিয়েছেন। এরোপ্লেন 'পাঁচ-সাতশো' ফিট ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, মাতালুব যতই মনে হোক সেটা গাছে নামবার চেষ্টা করছে। তা হোক, ওভারসিয়ার টুপি খুলে উর্ধ্বদৃষ্টিতে গদগদ ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বলল, 'কিছু বললেন, স্যার? হ্যাঁ, এদিকের খবর সব ভালো। শীতের আগে গদাধর নদীতে পৌছে যাব, ইওর ম্যাজেস্টি'। কথাগুলো সে প্রাণপণ চিৎকার কবে বলতে লাগল। যেন সে এরোপ্লেনের প্রবল শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বক্তব্যকে যথাস্থানে পৌছে দেবে। অতি সম্ভ্রমবোধ থেকে তার পা কাঁপছে ঠকঠক করে।

মাতালু তার সব কথা শুনতে না পেলেও তার ধারণা হল সে আকাশযাত্রীর কাছে কিছু বলল এবং যেহেতু আজ সকালেই দুখিয়ার কুঠিতে একটা গোলমাল হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই সে খবরটাই সে দিয়েছে। মাতালুর মনে যে আত্মরক্ষার তাগিদটা এসেছিল সেটা তখন কেটে গেছে, বরং জীবনে প্রথম এরোপ্লেন দেখবার আনন্দটা ফুটিফুটি করছিল। নতুন এই চিন্তা তার মনে দেখা দিল : ওভারসিয়ার তাহলে হাব স্বীকার করবে না। বরং এই এরোপ্লেনের ঘটনা থেকে বোঝা গেল অসীম শক্তিমান আকাশপথযাত্রী রাজশক্তি তার পৃষ্ঠপোষক। হায়, বাটুল দিয়ে তুমি পাখি মারতে পারো,

কিন্তু লোহার তৈরি ওই আকাশরথের কী করতে পারবে? অসহায় পরাজয়ের বেদনায় মাতালুর অনুভবগুলি ডুবে যেতে লাগল। কাঁদলে বুকের ব্যথা কমে। মাতালুর দু'চোখেই জল ফেটে বেরল।

মাতালু তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কবতে পারেনি। নায়েব-আহিলকার তদন্তে আসেনি। তার না আসার নানা কারণ থাকতে পারে।

চাষীরা অপরিপক্ক ধান কেটে ঘরে তুলেছে। অর্ধেক টিকবে কি না বলা যায় না। অনেকেরই জমির উপরে এক মানুষ সমান মাটি ফেলেছে রাস্তা-করনেওয়ালারা। জমি এবং সড়কের আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে কারো কম কারো বেশি জমি দখল কবেছে সড়ক। নদীর বন্যা একসময়ে নেমে যায়। যখন সে পলির বদলে বালি দিয়ে যায় তখনও চাষীরা ভরসা করে, আর এক বন্যায় ভাগ্য পরিবর্তন হতেও পারে। কিন্তু এই কালো-নদীর ক্ষেত্রে তা হবে না।

কাঁকরুর সবসমেত ছ-সাত বিঘা জমি ছিল। সড়কের গতিপথের তলে তার ভাগ্য এবং জমির অধিকাংশ চাপা পড়েছে। কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়া ভুক্তাবশেষের মতো সড়কের দু'পাবে এখানে এক কাঠা ওখানে আধ কাঠা জমি হয়তো-বা সে খুঁজে পেতে পারে। এই গ্রামে কাঁকরু ভূমিহীন হয়ে গেল। তার কথায় লোকের আবার সেটলমেন্টের কথাই মনে পড়ে। অরণ্য থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সে সুযোগ আর নেই যে ভূমিহীন নিজের বাহু দুটিকে ভরসা করে আশ্বাস পাবে।

কাঁকরুর সঙ্গে মাতালুর একদিন দেখা হয়েছে ইতিমধ্যে। কিছুক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করে জমির কথায় এসে পৌছতেই মাতালু বলল, 'ক্ষতিপূরণ দিবে রে, বা'।

'হয় নাকি'? কাঁকরু হাসবার মতো মুখভঙ্গি করল।

সে শুনেছে ক্ষতিপূরণের কথা, কিন্তু ভাটিয়াদের ন্যাযবোধেব উপরে তার বিশ্বাস চূড়ান্তভাবেই মুছে গেছে। আর তা ছাড়া স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে তার বদলে কেউ যদি তোমাকে টাকা দিতে চায়?

মাতালু চুপ করে থেকে বিষয়ান্তরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। এ ধানের খন্দ থেকে দু-এক মাস খাওয়া-পরা চলবে, তারপর কাঁকরু কী করবে তার শিশু দুটি এবং স্ত্রীকে নিয়ে? কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করতে রাজি নয় কাঁকরু। চিরস্থায়ী অভ্যাসের ফলে এখনও তার মুখে হাসির মতো একটা ভঙ্গি দেখা দেয়। সেটা হাসি নয়। দেখতে দেখতে তার কপালের পাশে শিরা ফুলে ওঠে, তার চোখ দুটিতে দৃষ্টির পরিবর্তন হতে থাকে।

বন্ধুকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে আলাপের মাঝখানেই কাঁকরু চলে গেল।

কাঁকরু চলে গেলে মাতালুর মনে হল, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

পরিস্থিতিটা তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। চাষীদের সঙ্গে ওভারসিয়ারের বিবাদ কাবো অজানা ছিল না। মালতীও শুনেছিল। মালতী বলেছে, 'ওতে ভালোই হবে, মাতালু। হাজার বর্ষা-বাদলেও রাস্তায় আর কাদা হবে না। এরপরে দেখবে ওই রাস্তা দিয়ে মোটরগাড়ি চলবে। সকালবেলায় গিয়ে দুপুরের আগেই সদর থেকে ফিরে আসবে লোকে'।

দেখাটা হঠাৎ হয়েছিল। মালতী যতক্ষণ কথা বলছিল মাতালু তাব ঠোঁট দুটির ভাঙা-গড়াই দেখছিল। সে দেখতে পেল মালতীর ওপরের ঠোঁটের কোল ঘেঁষে একটা ছোট তিল আছে। সে ভাবছিল এর আগে কি কোনোদিন তিলটি এমন করে চোখে পড়েছে তার! মালতী থামলে মাতালু কথাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলল, 'সম্ভব'।

শুধু মালতী নয়, ভাটিয়ারা সকলেই আনন্দিত হয়েছে রাস্তার অগ্রগতি দেখে। তাদের আলাপ শুনলে মনে হয় কোথায় যেন একটা আত্মিক যোগ আছে তাদের সঙ্গে ওই সড়কেব। কিন্তু সকালবেলায় কোথাও গিয়ে দুপুরের আগেই ফিরে আসার কী সার্থকতা আছে, এটা মাতালু কিছুতেই

বুঝে উঠতে পারছে না।

কথাটা সভ্যতা এবং তার অগ্রগতি। এক্ষেত্রে রাজপথের অগ্রগতিতে সভ্যতার গতিটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু কী লাভ তাতে, কাকে সে লাভবান করে?

মালতী বলল, 'আমি যাই এখন, কাজ আছে'।

'তা যাও। কিন্তু মুই বুঝির পাই না কাঁকরুর কী হইবে। যেদুবা তোর মোটর হাওয়াগাড়ি চলে'।

কাঁকরু মালতীর পরিচিত। কাঁকরুর নিঃস্ব হওয়ার কথা সে শুনে থাকবে। হয়তো কিছু বেদনাবোধও করেছে তার জন্য। সান্ত্বনা দেয়ার মতো মধুর করে হেসে দেশি ভাষায় সে বলল, 'হইবে কোন একটা'। এ রকম তখনই বলা হয় যখন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মালতী চলে গেলে মাতালু কিছুক্ষণ ভেবেছিল। কিছুক্ষণ ধরে মালতীর কথার সুরে যে আশ্বাস ছিল সেটা তাকে দুশ্চিন্তা থেকে দূরে রেখেছিল, কিন্তু পরে একসময়ে সে নিজের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল : বুঝির পাই না ইয়াৎ কার লাভ অলাভ হইবে।

কাঁকরুর তীব্র প্রতিবাদের একটা ফল দেখা গেছে। শুধু রাস্তার জন্য জমি দখল কবা নয়, ছাউনির জন্যও তারা যেখানে-সেখানে জমি দখল করত, চলাচলের জন্য তারা সে-জমির উপর দিয়ে পথ করে নিত। দুখিয়ার কুঠিতে তারা এ স্বেচ্ছাচারগুলি থেকে বিরত হয়েছে। আসল ছাউনিটা পড়েছে রাস্তার উপরে, কিছু শ্রমিক কুঠির আগের গ্রামে পুরনো ছাউনিতে বাস করছে, কিছু এগিয়ে গিয়ে দুখিয়ার কুঠির পরের গ্রামে ছাউনি ফেলার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। দখলকারী শত্রুসৈন্যের মতো শ্রমিকরা ঘোরাফেরা করে না দুখিয়ার কুঠিতে যেমন অন্য গ্রামে করত, বরং কষ্টে দখল করা নালায় সন্তর্পণে বাস করছে যেন।

তবু মন্দের ভালো, এই ভেবেছিল মাতালু। কাঁকরু, তার দাদা চ্যারকেটু, ফুলবর এবং রংবরকে নিয়ে একটা পরামর্শ সভা করে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন ইত্যাদি করা উচিত হবে কি না তা স্থির করবে, এই ভেবেছিল সে। তারই সূচনায় সে একদিন কাঁকরুকে ডেকে নিয়ে এক মাঠের আলে জনান্তিকে বসেছিল। আলোচনাটা অগ্রসর হতে পারছিল না। কিছুদূর গিয়েই বিদ্বেষের বিশৃঙ্খল চিন্তায় পথ হারিয়ে ফেলেছিল তারা। মাতালুর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল কাঁকরু একলা বাটুল ধরেছিল বলে এ গ্রামে শ্রমিকরা বসতে সাহস পায়নি, যদি সে-ও দাঁড়াত কাঁকরুর পাশে হয়তো পথটা দুখিয়ার কুঠির বাইরে দিয়েই ঘুরে যেত।

ঠিক এমন সময়ে দেখতে পেল মাতালুরা, তাদের বাঁয়ের দিকের গ্রাম্যপথটি দিয়ে মালতীর মেজদার সঙ্গে সাহেবি-পোশাক পরা কে একজন যাচ্ছে। তাদের আলাপ শোনা গেল না, কিন্তু তাদের হাসির শব্দ দু-একবার উড়ে এল। সাহেবি-পোশাক পরা লোকটিতে চিনতে পারলে কাঁকরু। তার মুখের চেহারার পরিবর্তন হল।

মালতীর মেজদার সঙ্গে লোকটি যখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছে তখন তাদেব গন্তব্য যে মালতীদের বাড়ি তা ধরে নেয়া যায়। মাতালুর মনের মধ্যে একটা অচেনা আবেগ ছটফট করতে লাগল। যেন তার বুকের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে ওভারসিয়ার, ঠিক যখন সে ভাবছিল অনেক দূরে আছে সে এবং হয়তো তার কথা ভুলে যাওয়া যাবে।

এরপরে কাঁকরু কিংবা মাতালু কেউ কথা বলতে পারল না। তারা উঠে বাড়ির দিকে রওনা হল।

কিন্তু সন্ধ্যার পর রংবর যখন গোরুগুলোকে রাত্রির মতো বেঁধে দিয়ে চলে গেছে, মাতালু আবার তার নিঃসঙ্গ বোধটায় ফিরে এল। সেই নিঃসঙ্গতা নির্জন নয়, সাহেবি-পোশাক-পরা অনেক

ওভারসিয়ার সেই জগতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে শান্তিকে পীড়িত করে।

আমি ফরেস্টারদের কাছে শুনেছি হরিণদের চরার মাঠে ফরেস্টাররা বাংলো তুললে অনেক রাত্রিতে সেসব বাংলোর কাছে হরিণরা এসে খোলা জানলায় উঁকি দিয়েও দেখে।

মাতালু যখন মালতীদের বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন রাত্রি হয়েছে। ঝিঁঝি ডাকছে, জোনাকির ঝাঁক বাতাসে ভাসছে। আকাশে একফালি চাঁদ, তাই রাত্রির অন্ধকারটা স্বচ্ছ। মালতীদের বাড়ির সদরের দিকের রেলিং-ঘেরা বারান্দায় চেয়ারে বসে ওভারসিয়ার ও মালতীর ছোড়দাদা এবং মেজদাদা গল্পগুজব করছে। মাতালু এর আগে একদিন যে জানলাটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজও নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

আজ মালতীর পান সাজা হয়ে গিয়েছিল। হারিকেনের আলোয় সে চটের উপরে সুতোর ফোঁড় তুলে তুলে একটা আসন সেলাই করছিল। মাতালুর পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড়মড় করে উঠতেই মালতী চমকে উঠল।

'কী? চমকে দিয়েছ'।

মাতালু কিছু বলল না, আসার কোনো ওজর সে তৈরি করতে পারল না।

সে লক্ষ্য করতে লাগল পান খেয়ে ঠোঁটের উপরে কী বকম লাল একটা রেখা পড়েছে মালতীর, ছোট ছোট দাঁতগুলি কেমন লাল রং নিয়ে ঝকঝক করছে। দীঘল গড়নের এই কালো মেয়েটির মতো এমন আব কে আছে?

'কিছু বলবে'—বলে জানলার কাছে আর একটু এগিয়ে এল মালতী।

মাতালু একটা কথাও বলতে পারল না। কিন্তু তার চোখ দুটি থেকে মালতী নিজের চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হল। শাস্ত্রে একেই কি প্রথম দর্শন বলে? যার সঙ্গে রোজ দেখা হচ্ছে আকস্মিক ভাবেই এক বিশেষ মুহূর্তে তার ক্ষেত্রেও এই প্রথম দর্শনের ঘটনাটা ঘটে? তা যদি হয় তবে সে-দৃষ্টিতে কান্ত কোমলতা যত থাকে ঠিক ততখানি থাকে যেন সব সম্ভাব্য প্রতিযোগীর প্রতি অসহিষ্ণুতা।

এ রকম অবস্থায়, জীবনে যখন প্রথম চোখে চোখ লেগেছে, মাতালুর মনে হল ভাটিয়াদের মধ্যে খুব ভালো লোক কেউ কেউ আছে, তারা যা কিছু করছে সবই খারাপ নয়। সুতরাং কাঁকরু আজ কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিছু সময়ের মধ্যে ভাটিয়ারাই তার একটা ব্যবস্থা করে দেবে হয়তো। রংবরকে একথা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল সে। অবশ্য রংবর তার এ ধরনের ইঙ্গিতে সায় দেয়নি। রংবরের অনুভব হয়—অনির্দেশ্যকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে এই কালো-পথ। ওরা নিজেরাই কি জানে এই পথ ওদের কোথায় নিয়ে যাবে? নিজের খেয়ালে সে দুখিয়ার কুঠির দিকে এগিয়ে এসেছে, দূর দিয়ে বয়ে গেলেও কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু যে আদিবাসীদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই এই পথের তাদের ভাগ্যদোষেই যেন পথটা এত কাছে অবস্থান করছে। আর সে অবস্থানের ফলে গদাধরের জলের মতো এই কালো প্রবাহও তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে যাবে। কিন্তু গদাধরের গেরুয়া জল রক্তধারাকে মলিন করে না। তার প্রবাহ কালো নয়।

৬

সভ্যতার অগ্রগতি কারো জন্যই থেমে থাকে না। সড়কও দ্যাখ-দ্যাখ করে গদাধরের তীরে গিয়ে পৌঁছল। তারপর একদিন বিলাসপুরী এবং আজমগড়ের শ্রমিকরা দলে দলে খেয়া পার হয়ে চলে গেল। দুখিয়ার কুঠির লোকেরা ভেবেছিল ভিন্‌দেশিরা এবার ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাবে। দীর্ঘস্থায়ী

ব্যথার স্মৃতির মতো পথটা শুধু পড়ে থাকবে।

কিন্তু দুধ নিতে এসে আস্তাজ একদিন বলল, 'দুধর দাম বাড়ি যেইছে, বা'।

'কেনে রে'?

'গাহাক বেশি হইছে'।

গ্রাহক বেশি হলে দুধের দাম বাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্য দিয়ে আস্তাজের মনোভাবকে সবটুকু ধরা যায় না। সে দাম চড়িয়েও সব দুধ কিনতে চায়।

'তা তুই দর চড়াবু কেনে'?

'না হয় তো দুসরা দুসরা লোকক দুধ দিবেন তোমরা'। বাড়তি দামে দুধ কিনেও সে ব্যবসাটাকে একচেটিয়া করে রাখতে চায়।

'ঠিকে তো'। রংবর সায় দিল আস্তাজের কথায়।

আস্তাজ দুধের দাম চড়িয়ে দিয়েও আগের চাইতে বেশি করে দুধ কিনছে। অন্য অন্য দুধের ব্যবসায়ী গ্রামে এসেছে কি না তা মাতালু জানতে পারেনি। সে নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে দুধটা রাখত একদিন কথায় কথায় আস্তাজ সেটুকুও কিনতে চেয়েছিল। মাতালু হেসে বলেছিল—ভাগ্।

কিন্তু কাঁকরুর বাড়ির সংবাদ অন্য রকম। এর আগে সে দুধ বিক্রি করত না। আস্তাজ এখন তাকে দুধ বিক্রি কবতে রাজি করেছে। কাঁকরুর দুটি শিশু। তার স্ত্রী আপত্তি তুলেছিল, 'বাচ্চা খাইবে কী?''

'কেনে তোর বুকে দুধ নাই'।

তার স্ত্রী তর্ক না করে মুখ নিচু করে রান্নার লকড়ি সংগ্রহ করার জন্য বেরিয়ে গেল। কাঁকরু অনুভব করল, স্ত্রী-পুরুষের আহারে ধীরে ধীরে একটা অভাববোধ দেখা দিয়েছে কিন্তু ঘরে দুধ থাকায় এতদিন সে বা তার স্ত্রী শিশু দুটির জন্য উদ্বেগ বোধ করেনি। কিন্তু এখন তার স্ত্রীকে নিঃশব্দে চলে যেতে দেখতে দেখতে তার মনে হল রোগা রোগা দেখাচ্ছে তাকে। দ্বিতীয় সন্তান হবার পরও প্রথমটিকে আদর করে অনেকসময়ে স্তন দিত তার স্ত্রী। তাতে দুটি শিশুর কারোই অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এই পাঁচ-ছয় মাসে আহারের স্বাচ্ছন্দ্য কমে গেছে ক্রমশ। এখন কোলের শিশুটির পেট ভরার মতো দুধ দূরের কথা, কান্না থামানোর মতো দুধ নেই তার বুকে। কাঁকরুর মন আঁকুপাঁকু করে উঠল। সে জানে এসবই হয়েছে তার জমি নেই বলে, ওই সড়ক তার জমি গ্রাস করেছে বলে। কেউ আসেনি খোঁজ নিতে, ক্ষতিপূরণের কোনো আশাই নেই। কিন্তু কী করবে সে, কী করবে? অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে সে আহার্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছু দূরে গিয়েই সে আবার ফিরে এল। খালি হাতে বড় জোর নদীর কিনারা থেকে ঢোলকলমির শাক তুলে আনা যায়, কিন্তু শাক খেয়ে কি কোনোদিন কারো আদরিণী সুস্থ সবল হয়েছে যে দুধে দুধে তার বুক ফুলবে?

ঘরে ঢুকে সে পাখি শিকারের বাটুল নিল, মাছ ধরার কোঁচ নিল। গদাধরের তীর ধরে অগ্রসর হতে থাকলে কি দু-একটা পাখি চোখে পড়বে না? স্বল্প জলে কলমির জঙ্গলের পাশে শোল জাতীয় মাছও কখনও কখনও চোখে পড়ে। আমিষ সংগ্রহ করা দরকার। আমিষ ছাড়া স্ত্রীর শীর্ণতা দূর করা যাবে না। হায় রে, এসব কি তাকে কখনও এমন করে ভাবতে হয়েছে!

গদাধরের তীর ধরে যেতে যেতে সবসময়েই, বিশেষ করে, সকালের দিকে গ্রামবাসীদের কাউকে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো তারা কলমি শাকের ডগা সংগ্রহ করেছে, কিংবা কোনো গাছতলায় বসে নদীতে ছিপ ফেলে কেউ সময় কাটাচ্ছে। এসবই ছিল শখের ব্যাপার, মেয়েদের শাক সংগ্রহ করা কিংবা পুরুষদের মাছ ধরা। আজ কিন্তু কাঁকরু অবাক হয়ে দেখল অনেক স্ত্রীলোক

একত্রে শাক সংগ্রহ করছে, দু-তিনজন পুরুষ ছোট ছোট জাল হাতে জলে নেমে মাছের আশায় জল ঘোলা করে তুলেছে। কাঁকরু প্রথমে ভাবল এরা সকলেই তার পাড়ার লোক—রাস্তায় যাদের ভাগ্য চাপা পড়েছে। কিন্তু একটু নজর করেই সে বুঝতে পারল তাদের মধ্যে অন্য পাড়ার লোকরাও আছে। একটা অস্বস্তি মনে নিয়ে কাঁকরু এগিয়ে গেল। এ রকম কেন হল? সে শুধু একা নয়, এ এক বিশ্বজোড়া অভাববোধ।

গদাধরের তীরে ডাহুক থাকে, বুনোহাঁস থাকে, কাঁটাঝোপে বনমোরগ থাকে কখনও। কাঁকরুর চোখে পড়ল না সেসব কিছু আজ। অত্যধিক লোক চলাচলের ফলে তারা পালিয়েছে এ অঞ্চল ছেড়ে। তা ছাড়া অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে সে কখনও কখনও শিকারের কথাও ভুলে যাচ্ছিল।

অবশেষে একজন স্ত্রীলোককে শাকের বোঝা মাথায় নিয়ে একা একা চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করল সে, 'এত শাক কয়দিনে খাইবেন'?

'খামো কেনে, বেচিম'।

'বেচবেন? কোটে, শহরে'?

শহরেই বিক্রি হবে শাক। শাক? বিস্ময় বোধ হয় কাঁকরুর।

যাই হোক, সেদিন ভাগ্য ভালো ছিল তার। ঘাসের জঙ্গলে একটা খরগোস পেয়েছিল সে। কিন্তু শিকার নিয়ে ফিরে আসতে আসতে সে শহরের লোকদের লোলুপতার কথাই চিন্তা করতে লাগল যে লোলুপতা আকস্মিকভাবে বেড়ে উঠেছে। আর সে-লোলুপতার সঙ্গে অন্তত তার মনে এই কালো সড়কের যেন কোথায় একটা ঐক্য ধরা পড়ছে, যে-সড়ক চলমান কোনো সত্তার মতো গ্রাস করেছে তার জমি। সব ফুরিয়ে গেলে মানুষ খাবে নাকি তারা?

বিষয়টা রংবরও লক্ষ্য করেছিল। তার স্মৃতিতে তুলনীয় একটা সময়ের চিত্র ছিল। সেই সেটেলমেন্টের সময়ে যখন অনেক ভাটিয়া এসে জমিতে লোহার শিকল ফেলে ফেলে জমিগুলোকে ছোট করে দিচ্ছিল, তখনও একবার আহার্য সংগ্রহ করার একটা উত্তেজনা গ্রামে দেখা দিয়েছিল। তখন সংগ্রহকারীদের কেউ কেউ নামমাত্র মূল্যও পেয়েছিল তাদের শ্রমের, কেউবা পায়নি। এবার সংগ্রহকারীরা দাম পাচ্ছে এবং কখনও শ্রমের তুলনায় নগণ্য হলেও, সংগ্রহের প্রকৃতিজাত জিনিসগুলো এতদিন মূল্যহীন ছিল বলে সে-দামকেই কল্পনাতীত মনে হয়। আর সংগ্রহকারীদের একটা চারিত্রিক প্রবণতাও ধরা পড়ছে রংবরের কাছে—খুচরো পয়সা হাতে পাওয়ার যে মোহ একটা কৌতুকের খেলার মতো শুরু হয়েছিল, সেটাই যেন এর মধ্যে প্রয়োজনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হয় তা রংবর বুঝতে পারেনি, কিন্তু অন্য একটি প্রশ্ন উঠেছে তার মনে, এরই ফলে কি সবকিছুর দামই বাড়বে না? শহরের জন্য কি ধানও দরকার হবে না? রংবর নিজের জীবনে একটা ভুল করেছিল : ধানের দাম চড়তে দেখে সে খাওয়ার ধানেরও কিছু বিক্রি করে দিয়েছিল সেবার। কষ্টও পেয়েছিল যথেষ্ট, যে-চড়া দামে ধান বিক্রি হয়, কিনবার সময়ে চাষীকে তার চাইতেও বেশি দাম দিতে হয়। মুদ্রার প্রচলন হবার পর থেকেই এটা হয়েছে। এবারও যদি ধানের দাম চড়ে যায় তাহলে চাষীরা কি খাওয়ার ধানের কথা ভুলে যাবে না? কিন্তু বাহাত্তরে বুড়ো সে—একালের কী-বা বোঝে।

৭

সড়ক তৈরি করার নানা স্তর। একদল মাটি কেটে মাটি তুলে রাস্তা উঁচু করছে, তার পিছনের দল পাথর ভাঙছে, তার পিছনের দল পাথর ও পিচের রাস্তা বিছিয়ে দিচ্ছে। এতদিন তারা সড়কের পাশেপাশে দু-তিন মাইল ধরে ছড়িয়ে থাকত। গদাধরপুরের কাছাকাছি এসে তাদের রীতি বদলে গেল। দুখিয়ার কুঠি ছাড়িয়ে তারা গদাধর পার হয়ে হয়ে শহরে গিয়ে উঠল, কিন্তু কুচোপাথর ও পিচ ঢালার শেষ দলটি যখন শহরে পৌছল, মাটি কাটার প্রথম দলও তখনও শহর ছাড়েনি। প্রথমে মনে হল, এবার ওদের নিজেদের মধ্যেই সামনে এগোবার জন্য গুঁতোগুঁতি শুরু হবে, কিন্তু দেখতে দেখতে ওরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। গদাধরের পাড় ধরে একটি দল যেমন বসল, তেমনি আর এক দল বসে গেল নায়েব-আহিলকারের কুঠির অনতিদূরে বড় মাঠটা জুড়ে ; তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ দলও নদী পার হয়ে শহরের ইতস্তত ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ল। নদীর দু'ধারে ঝাউ ও কাশ, গ্রামে ও জঙ্গলের সীমায় বাঁশ। অজস্র, এমনকী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করে তারা আস্তানা বাঁধতে শুরু করল। প্রায় একপক্ষ কাল তারা অন্য কোনো কাজই করল না। দেখে-শুনে লোকে ভাবল, এরা কি নিজেদেব দেশ ও পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে গিয়ে এই শহরে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে? তাদের এ ধারণাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্যই যেন নায়েব-আহিলকারের কুঠি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছু দূরে শহরের পুরনো পথের ধারে ইটের তৈবি ছোট-ছোট চার-পাঁচটি বাড়ি উঠছে ওভারসিয়ার এবং তার সহায়ক অন্যান্যদেব জন্য। এ কথাও শোনা যাচ্ছে, একজন ইঞ্জিনিয়ার এসে বাস করবে এই বাড়িগুলোর সবচাইতে সুদৃশ্যটিতে, যখন সময় হবে।

সব অভিযানের মতো সভ্যতার এই অভিযানও সম্মুখে বর্ষা দেখে থেমে পড়েছে। আর বর্ষার আগে যেমন সঞ্চয়-প্রয়াস দেখা যায় সবক্ষেত্রেই, এ ব্যাপারেও যেন তেমনি সব লক্ষণই দেখা দিল। গোরুগাড়ি, মোটর, ট্রাকে যেমন আসছে তেমনি আসছে মানুষের কাঁধে মাথায়—ইট পাথর সিমেন্ট, লোহা লক্কড়, যন্ত্রপাতি। শ্রমিকদের বস্তির সামনে নদীর ধারে ইট-পাথরের স্তূপ জমা হচ্ছে। সিমেন্ট, লোহা লক্কড়, যন্ত্রাদি ওভারসিয়ারদের তাঁবুর কাছাকাছি দু-তিনটে লম্বা লম্বা একচালার নিচে জমে যাচ্ছে।

লোকে ভাবল নতুন ধরনের সড়ক তৈরি করতে পাথর পিচ লাগে, ওভারসিয়ারদেব কোয়ার্টার্সের জন্য না হয় ইট আর সিমেন্ট লাগবে, কিন্তু লোহার এই বড় বড় রেল দিয়ে কী হবে? শেষে শোনা গেল গদাধরের উপরে ব্রিজ তৈরি হবে। সংবাদটা শুনে উত্তেজনা অনুভব করল শহরের লোকরা ; গ্রামের লোকরা বিস্ময়ের কিছু দেখবাব জন্য ইতিমধ্যেই নিজেদের গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে গদাধরের বর্ষার আগেকার শীর্ণ ধারার দিকে চেয়ে থাকে।

বস্তির চালা তোলা শেষ হওয়ার পরই শ্রমিকরা কাজে লেগে গেল। গোরুগাড়ি আর ট্রাকে করে প্রত্যেকটি বস্তির সম্মুখে ঝামা ইট আর পাথর ঢালা হয়েছিল। এখন শ্রমিকরা বড় বড় পাথরের চাংড়া হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট করছে, ছোট করার পর আয়তন অনুসারে সেগুলিকে বাছাই করা হচ্ছে। যেন ধান থেকে চাল তৈরি হচ্ছে এমন আগ্রহ।

নায়েব-আহিলকার জানত সড়কটা গদাধরের ওপারে এসে থেমেছে। সে অনুমান করেছিল, শহরের মধ্যে দু-তিন মাইল পথ শেষ করার জন্য শ্রমিকরা ধারেকাছে কিছুদিন বাস করবে তারপর এগিয়ে যাবে। যদিও তার মত ছিল : শ্রমিকদের শহরের মধ্যে বাস না করাই ভালো। এক বিকেলে এজলাস থেকে ফিরে বাংলোর বারান্দায় বসে সে দেখতে পেয়েছিল নতুন একদল শ্রমিক সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে তার বাংলোর পিছনের দিকের মাঠটায় সে কর্মব্যস্ততার চিহ্ন

দেখতে পেল। তার সন্দেহ হল শ্রমিকরা সেই মাঠেই রাত কাটিয়েছে এবং এখন যেন সেখানে ডেরা তুলবার চেষ্টায় আছে। তার মনে হল বিষয়টা উপেক্ষা করার মতো নয়। সরকারের খাস-জমিতেই তারা ছোট ছোট চালাঘরগুলি তুলছে, কিন্তু তার আগে সরকারের প্রতিভূ হিসাবে তার সঙ্গে একবার কথা বলারও কি দরকার ছিল না? কী করা উচিত এটা স্থির করতে দু-চারদিন গেল নায়েব-আহিলকারের। ইতিমধ্যে ওভারসিয়ার একদিন তার সঙ্গে দেখা করছিল, এবং বিনয় সহকারে, যদিও নায়েব-আহিলকারের মনে হয়েছিল সে-বিনয় কাপট্যপূর্ণ, সে বলেছিল মহকুমা শাসকের খাস-এক্তিয়ারে বাস করবে তারা এখন কিছু দিন, তার জন্য অনুমতি নিতে এসেছে সে। নায়েব-আহিলকার ওভারসিয়ারের বিনয়ের কাপট্যটুকু লক্ষ্য না করার ভান করেছিল। কিন্তু তার মনোবেদনার কারণ ঘটেছে। সে দেখতে পেয়েছিল ওভারসিয়ার ও তার শ্রমিকরা এসে শহরের পরিধি এবং জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। সময়ে সময়ে মনে হয় শহরটাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর তার পরিবর্তে একটা শ্রমিকের উপনিবেশ দেখা দিয়েছে। তাহলেও তার এ আত্মপ্রসাদ ছিল—এলাকাটা তার। শাসনক্ষমতা তারই হাতে আছে। কিন্তু ওভারসিয়ারদের ঝকঝকে বাংলোগুলো যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেগুলিই যেন তার পুরনো কাঠের বাংলোর দিকে আঙুল দিয়ে তার পদমর্যাদাকে অসম্ভ্রমের ইঙ্গিত করতে লাগল। অসহায় বোধ করল নায়েব-আহিলকার। ঠিক দুটি মাসের মধ্যে এই অদ্ভুত ব্যাপার সব ঘটে গেল। সে কি সদরে লিখবে সম্মান ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে তার শহরে তার কুঠি ও দপ্তরের চাইতে অন্য কোনো কুঠি ও দপ্তর বেশি রংদার হওয়া উচিত নয়? নিরুপায় ব্যথায় সে স্থির করল, তা করে সে সদরের অফিসারদের কাছে নিজেকে হীনই করবে। সে যেন কোনো কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নায়ক ও নেতা ; বলবত্তর আর এক সভ্যতার কাছে চূড়ান্তভাবে হার মানতে বাধ্য হবে, এই তার ভাগ্য।

একটা কেন্দ্রীয় গতির চারিদিকে শহরটাই যেন গতিমান হয়ে উঠেছে। মানুষ যেন জোরে জোরে কথা বলছে আগের চাইতে, তাড়াতাড়ি চলছে।

আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত, ক্রেতা-বিক্রেতায় মিলে দু-চারশো লোক জমা হতো। সন্ধ্যা হতে না হতে তারা মিলিয়ে যেত। অন্ধকার গাঢ় হলে দেখা যেত হয়তো দু-একটি মাত্র কুপির আলো জ্বেলে দু'একজন মাত্র দোকানদার বসে আছে। অন্য আর একদিনও হাট বসবার নিয়ম ছিল, কিন্তু অনেকদিনই তা বসত না।

এখন সপ্তাহে দুদিন তো হাট হচ্ছেই, আর একদিন বসাতে পারলে যেন ভালো হয়। আগে যে গ্রামবাসী তিন-চারটি লাউ হাটে এনে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে শুধু ক্রেতাদের দাম কমানোর কৌশলগুলো লক্ষ্য করত, এখন সে হাটে বসতে সময় পায় না—যে কোনো দামে শ্রমিকরা তার হাত থেকে লাউগুলো কেড়ে নেয়। যে কাটা কাপড়-চোপড়ের দোকানদার বিরক্ত হয়ে থুথু ফেলত আর বলত, এ হাটে আবার মানুষ আসে, সে এখন ভিড়ে বিব্রত হয়ে চিন্তা করে পরের হাটে ছেলেকে আনতে হবে সাহায্য করার জন্য।

গোঁসাইদের দুটো দোকানের চেহারাই বদলে গেছে। হেরম্বর ছেলেরা সদর থেকে একজন দর্জি আনিয়ে বসিয়েছে তাদের দোকানে। জামা-কুর্তা তৈরি হচ্ছে সেখানে। হাটবার বলে কথা নয়, রোজই তাদের দোকানে শ্রমিকদের ভিড়। গজাননের ব্যবসা অন্য পথ ধরেছে—সাপ্তাহিক চাল ডাল তেল নুন সে শ্রমিকদের যোগান দেয় ওভারসিয়ারের হাতের চিঠির বিনিময়ে।

নতুন দোকান উঠেছে একটি। লখাই চক্রবর্তীর দোকান। দোকান ছোট, কিন্তু ভিড় কম নয়। দোকানের সামনে কালো রঙ-করা-টিনের পাতে চুন দিয়ে লেখা—সরকার অনুমোদিত গাঁজার দোকান। মদ, গাঁজা ও আফিম বিক্রি হয়।

মালতীর মেজদাদা পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বাড়ি এসেছিল ; কথা ছিল পুজোর ছুটির পরে কলেজে ফিবে যাবে। ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যাই যাই করেও তার যাওয়া হয়নি। এ বিষয়ে তাকে অনুপ্রেরিত করার কেউ ছিল না। সেই একদিনের কলহের পরে এই স্থির হয়েছে যেন—সে তার নিজের খুশি মতোই চলবে। ইতিমধ্যে কয়েকদিন সে শহরের দোকানে গিয়ে বসেছিল। সেখানে আজকাল কাজের চাপ পড়েছে। এতে মালতীব বড়দাদা খুশি হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই হয় বই নিয়ে কিংবা গ্রামোফোনেব রেকর্ড বাজিয়ে কাটে মেজদাদার। বিকেল হতেই সে গদাধরপুরে চলে যায়।

ওভারসিয়ারের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল ছোড়দাদার, কিন্তু এখন দেখে বোঝা যায় ওভারসিয়ার ও মেজদাদার মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছে। কোনো কোনো দিন ওভারসিয়ারকে নিয়ে সে গ্রামে আসে। ওভারসিয়ারের বন্দুক আছে—রিজার্ভ ফরেস্টের একজন কর্মচারীর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে ; এবং সেই সূত্রে কোনো কোনো দিন তারা শিকারে যায়। ইতিমধ্যে একদিন একটা হরিণ শিকার করেছিল তারা। সে রাত্রিতে মৃগমাংসের ভোজ হয়েছিল মালতীদের বাড়িতে। ফরেস্টার, মেজদাদা, ওভারসিয়ার মালতীদের বৈঠকখানায় অনেক বাত অবধি হাসি এবং গল্পে কাটিয়েছিল। সেদিন মালতীর মেজদাদা লক্ষ্য করেছিল শহরের সভ্য প্রথায় টেবিলে খেতে বসবার মতো বাসনপত্র নেই তাদের। এরই ফলে সদরে গিয়ে কাচের থালা প্লেট কাঁটা চামচ ছুরি ইত্যাদি কয়েক প্রস্থ সে কিনে এনেছে। সংসারের সাধাবণ হিসাবে এগুলি অপ্রয়োজনের। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুতরাং পড়েছে মালতীর উপরে। এবং এসব বিষয়ে সে মেজদাদাকে উৎসাহ না দিলেও তার রুচিকে ভালো বোধ করছে। পর্সিলেনের প্লেটগুলোর গঠনে যে সুকুমারতা সেটা একটা অজ্ঞাতনাম প্রতীকের মতো মালতীকে খুশি করে তোলে।

মেজদাদার রুচি মালতীকেও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করছে। স্নো-পাউডার তো বটেই, দু-এক মাস থেকে দাঁতের দিশি গার্হস্থ্য মাজনের পরিবর্তে টুথব্রাস ও পেস্ট ধরেছে সে। শহরের হোস্টেল থেকে এসব ব্যবহারের অভ্যাস মেজদার। মেজদার অনুপ্রেরণায়, আদেশেই প্রায়, তার আড়ালে আড়ালে মালতীও এসবে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আয়নায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছে দাঁতগুলোতে আগেকার তুলনায় অনেক ঔজ্জ্বল্য এসেছে। খোঁপা বাঁধবার কায়দায় নতুন ধরন দেখা দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

এর আগের এক ভোজসভায় পরিবেশনে করতে হয়েছিল মালতীকে। ওভারসিয়ার হেসে বলেছিল অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে—আপনিও আমাদের সঙ্গেই বসুন না। অসভ্যতা না দেখিয়ে যতদূর সম্ভব তেমনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিল মালতী। পরে অবশ্য মেজদাদা হাসিমুখে বলেছিল—তুই পালিয়ে এলি কেন? সব সভ্য সমাজেই আজকাল মেয়েরা পুরুষদের পাশে বসেই খায়। বিয়েব পর কী করতে হবে তোকে কে জানে।

মালতী বলেছিল—তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ, মেজদা।

ইতিমধ্যে মালতী মেজদার আনা কয়েকখানা বই পড়েছে। সেগুলোকে উপন্যাস বলা হয়, মেজদা বলেছে। তিন-চারখানা তো বটেই। একখানা বোধ হয়, মালতী মনে করে, প্রভাতকুমার। একখানা তো একজন স্ত্রীলোকেরই লেখা। আর দু'খানা শবৎচন্দ্র নামে একজনের। দেবদাসের কথা তো সে কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। কী অদ্ভুত কথা! মানুষের শরীরের মধ্যে এত ভাবনা এত অনুভূতি থাকতে পারে এই উপন্যাসগুলো পড়ার আগে সে কল্পনাও করেনি। আর গানও বটে। সুর তো বোকা প্রাণীরও ভালো লাগে। এই উপন্যাসগুলো পড়ার পর থেকে মেজদা যখন সন্ধ্যার

দিকে গ্রামোফোন বাজায়, তখন সুরের পিছনে যে-কথাগুলো থাকে মালতী একেবারে ইদানীং সেগুলোকেও ধরবার চেষ্টা করছে। বলতে হয়, সেই কথাগুলো, শরীরের ভিতরে উপন্যাসের অনুভূতিগুলো যেখানে জমা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে কে পৌঁছায়, মিশে যায়। একদিন মেজদা বলল, রবীন্দ্রনাথের গান। খুব কঠিন ধরা, কিন্তু কেমন যেন মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, আবার শুনতে ইচ্ছা করে, অনেকবার করে শুনলে কি বুঝবে না?

মালতীর মেজদাদা সিল্কের পায়জামা ব্যবহার করে। একবার সে এক বন্ধুকে কলকাতা থেকে তেমনি পায়জামা কিনে আনতে বলেছিল। বন্ধুর পছন্দে কেনা জিনিস সে ব্যবহার করতে পারেনি অত্যধিক চাকচিক্যের জন্য। প্যাকেটসুদ্ধ মালতীকে দিয়ে বলেছিল—কেটেকুটে নিজের জামা বানিয়ে নিস। হাতে কাজ ছিল না মালতীব এক সন্ধ্যায়। কাঁচিটাকে দেখে তার মনে পড়ল সেলাই করার কথা। রাত্রিতে বই পড়তে ভালো লাগে না, কাবণ লম্বা দুপুরটা সে আজকাল বই পড়েই কাটায়। সন্ধ্যাবেলায় আলমারি থেকে সে কাগজে মোড়া পায়জামাটা বার করেছিল কাঁচি চালানোর জন্য, কিন্তু বড়দাদার ছোটছেলেটার কান্না থামানোব জন্য বার দুই উঠে যেতে হযেছিল। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে তাব আবার মনে হল জামা বানানোর কথা। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটিয়ে দিল সে। প্যাকেটের উপরে দোকানদার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে স্ল্যাকস্ পরা একটি মহিলার ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে। হযতো আধুনিক সভ্যতাব একটা সাহসেব মতো কিছু মালতীর মনে কাজ করেছিল। হয়তো উপন্যাসে পড়া কোনো নায়িকাব পোশাক ও পরিবেশের কথা মনে হয়েছিল তার। পায়জামাটা কাটবার আগে সে সেটা পরল। কিন্তু আয়নার নিজের ছবি সে কিছুতেই দেখতে পারল না সোজাসুজি চেয়ে।

গানের ব্যাপার অন্যরকম। মেজদাদা অনেক সন্ধ্যায় একা বৈঠকখানার বারান্দায় ম্লান তারাব অন্ধকারে চুপ কবে বসে বসে কাটায় কিছুদিন থেকে। মালতী সন্ধ্যার পর বৈঠকখানার বারান্দায় আর যায় না, কারণ সেখানে হয় ফরেস্টার নয় ওভারসিয়ার, কিংবা আজকাল দুজনেই আসছে। দুপুরের কথা আলাদা। চুল শুকানোর সময়টা সে বই হাতে কখনও কখনও বৈঠকখানার বারান্দায় গিযে বসে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় মেজদাদাকে খুঁজতে গিয়ে সে বৈঠকখানা পর্যন্ত এগিয়েছিল, কারণ সেদিন মেজদাদা বেরোয়নি, তা সে জানত। সে যখন বৈঠকখানা থেকে ফিরে আসছে কাউকে দেখতে না পেয়ে, মেজদাদা কথা বলে উঠেছিল।

'কে, মালতী'?

'হ্যাঁ। তোমাকে দেখতেই পাইনি। আলো আনব'?

'না থাক। তুই বরং বোস এখানে'।

মালতী রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মেজদাদার পাশে গিযে। অনেকক্ষণ কথা না বলে নিঃশব্দেই কেটে গেল। অবাক-করা অভিজ্ঞতা। সেই নিস্তব্ধতায় মালতীব মনে হল, লেখাপড়া এবং তার সঙ্গের কোনো বিষয় নিয়েই হয়তো মেজদাদার মন এত খাবাপ।

সে বলল, 'গ্রামোফোন বাজাবে মেজদা'?

'সব গান তো পুরনো হয়ে গেছে। তার চাইতে তুই একটা গান কর শুনি'।

মালতী খিলখিল করে হেসে উঠল। জীবনে সে গান করেনি। গদাধরের মতো ছোট শহর থেকেও দূরে এই দুখিয়ার কুঠিতে এমন সমাজ ছিল না যে উচিত-অনুচিতেব অলিখিত আইনে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। কিন্তু শহরের সভ্য সমাজের প্রতিভূ হিসাবেই তো অধিষ্ঠান করছিল গোঁসাইরা, সুতরাং তাদের পরিবারে এই নিয়মই বাঁধা ছিল যে ভদ্রবংশের মেয়ে গান-বাজনা করে না, নাটক নভেল পড়ে না। এতদিন পর্যন্ত মালতীও এ নিয়ম মেনে চলেছে। ইদানীং মেজদার আনা বইগুলি পেয়ে এবং তার উৎসাহেই রাত্রিতেই কিংবা দুপুরে বন্ধ দরজার পিছনে

সেগুলি পড়ে মালতী যা করছে তাকে সব উল্টেপাল্টে দেয়া না বললেও, নতুন পথে যাত্রা বলতেই হবে। খানিকটা যেন অন্য জগতে সরে এসেছে মালতী তার পুরনো জীবন থেকে এবং সে-খবর কেউই জানত না, নিজেও না।

কিন্তু মালতীকে থামতে হল। তার হাসিতে মেজদাদার স্তব্ধতা দূর হয়নি বরং তার হাসিটাই যেন অসময়ের প্রমাণ হয়েছে।

গ্রামোফোন শুনতে বসে মনে মনে এর আগে গান করেনি সে কোনোদিন, তা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু সে কি কখনও নিজের গলায় ফুটোনো যায়। তবু এরপরে আর এক সন্ধ্যায় মালতী মেজদাদার অনুরোধে গুনগুন করে গান গেয়েছিল। চড়া পুরুষালি গলা ; শেখার কিছু সুযোগই হয়নি, অন্যের কানে খুব সম্ভব বেসুরো শোনাত সে গান। মেজদাদা কিন্তু তারিফ করেছিল।

মালতীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় সে কিন্তু বলবে তার গানের চাইতেও অনেক বেশি চোখে পড়ে মেজদাদার ভঙ্গি, সেটা যেন দিনকে-দিন একটা বিশেষ রূপ নিচ্ছে। সেটার সঙ্গে তার বড়দাদা কিংবা ছোড়দাদার বাস্তব জ্ঞানের উপরে গড়ে ওঠা জীবনযাপনে খুব বড় রকমের পার্থক্য দেখা দিচ্ছে কোথাও।

মেজদাদা বাড়িতে আসবার পর থেকেই এমনি করে ভাই-বোন পবস্পরের কাছাকাছি যাচ্ছিল বাড়ির অন্য সকলের তুলনায়। প্রতি সন্ধ্যায় তারা একত্র বসে না। কারণ অনেকদিনই ওভারসিয়াররা এসে পড়ে। বাইরে পুরুষদের হাসি গল্প চলতে থাকে। মালতী হয় সুপুরি কুচোয় কিংবা কাঁথায় ফুল তোলে। কিন্তু যেদিন ওভারসিয়াররা আসে না, মেজদাদা তাকে বাইবে ডেকে নেয়, তার পাশে বসে গুনগুন করে রেকর্ডে শোনা গান করে মালতী এখন। এবং দু'একদিন ওভারসিয়াররা এলেও ছোড়দার উপরে অতিথি সৎকারের ভার দিয়ে মেজদাদা পালিয়ে এসে বসে মালতীর ঘরে। এ রকম দু'একটি দুর্লভ সন্ধ্যায় আলাপটা বইগুলো পর্যন্তও এগোতে চেষ্টা করে। যদিচ বইটা ভালো কিংবা কঠিন কিংবা মিষ্টি এর চাইতে এগিয়ে কোনো মতামত দিতে পারে না মালতী।

একদিন মা তাদের আলাপ শুনে বলেছিলেন—বোনকে কি হাকিমেব ঘরে বিয়ে দিবি?

—তা কি কেউ বলতে পারে কোথায় হবে? শহরের কোনো ধনীর ঘরেও তো যেতে পারে।

—সে তোরাই বুঝবি, আমি আর কী বলব।

বউদি বলতে মালতীর একজনই, তার বড়দাদার স্ত্রী। সে রসিকতা করে বলেছিল—ঠাকুরঝি নিজেই হাকিম হতে পারে।

পিছন ফিরে মালতী দেখতে পায় গত চাব-পাঁচ মাসে সে যেন সত্যই একটা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে গেছে।

একদিন মালতীর একটা কষ্টের কারণ ঘটে গেল। দু-তিন' দিন ক্রমাগত অহর্নিশি বৃষ্টি চলবার পর দুপুরের মাঝামাঝি এসে সেটা থেমেছে। বর্ষাকালের এই রূপ এখানে। দু-তিন দিন থেমে থেমে জল হয়, বাদলা বাদলা বাতাস চলে, তারপর চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত ধারাবর্ষণ হতে থাকে। আজ বৃষ্টি ধরেছে বটে, আকাশ অত্যন্ত নিচু হয়ে আছে, তার রঙও কালচে। জল নামলেই হল।

এ বর্ষায় কেউ বাড়ি থেকেই বার হতে চায় না, গদাধরপুর থেকে ওভারসিয়ারের বেড়াতে আসা দূরের কথা। মালতীর বড়দাদা এবং ছোড়দাদা শহরের আড়ত থেকে আজও হয়তো বাড়িতে আসবে না। মালতী বৈঠকখানায় গিয়েছিল। খানিকটা সময় বর্ষামেদুর আকাশের তলে সজীব সচল প্রকৃতির দিকে চেয়ে থেকে তার মেজদাদার কথা মনে পড়ল। বৈঠকখানার বারান্দা থেকেই

মেজদাদার ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। জানলা খোলা ছিল। মালতী দেখতে পেল একটা ডেক-চেয়ারে মেজদাদা শুয়ে আছে। তার দুটো হাত মুঠো করা, মুখটা বিবর্ণ। মালতী তাকে ডাকতে যাচ্ছিল—এসো মেজদাদা বাইরে বসি। কিন্তু তার মুখে ভয়ংকর কষ্টের ছাপ দেখে সে তাড়াতাড়ি মেজদাদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'কী হয়েছে, মেজদা'?

মেজদাদা হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু কথা বলল না। উঠে পড়ে মালতীকে অবাক করে ঘরময় পায়চারি করে এল।

'না, মেজদা বলো, কী হয়েছে তোমার'?

হঠাৎ তার অনুভব হল কী এক দুরন্ত অভিমান মেজদাদার হয়েছে যার জন্যে অসুস্থতার কথাও বাড়ির কাউকে বলতে চায় না।

সেদিনের সন্ধ্যা-রাত্রি একটা অখণ্ড উৎকণ্ঠার মতো। বাড়ির আর কাউকে না জানালেও রাত্রিতে দু-একবার মালতী উঠে এসে মেজদাদার ঘরের বন্ধ দরজায় কান পেতে বুঝবার চেষ্টা করেছে মেজদাদার ঘুম হচ্ছে কি না। মেজদাদা ঘুমুতে পারছে না এটা বুঝতে পেরেছিল সে। ভোরবেলা সে মেজদাদার দরজায় মৃদু মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল। এক রাত্রিতে মেজদাদা যেন বুড়ো হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিয়ে সে হাসল বটে কিন্তু তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে কী একটা দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে—হাসিটাকে এসবের পাশে নিতান্ত 'মক্' বলেই মনে হল।

সকাল থেকে দুপুর—দুপুর থেকে বিকেল। মালতী অনেক অনুরোধ করে মেজদাদাকে স্নান করিয়েছে। মায়ের সাহায্য নিয়ে মেজদাদাকে কিছু খাইয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেজদাদা তার উত্তরে বলেছিল—এই তো কমে গেছে।

দিনটা অনেকটা শান্তভাবেই কেটে গেল। কিন্তু বিকেলের পর থেকে মালতী লক্ষ্য করল, মেজদাদা কেমন অস্থির হয়ে উঠছে আবার। বাইরেও আকাশ-বাতাস দুর্যোগের লক্ষণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

মালতী বলল, 'মেজদা, ডাক্তারকে ডাকাই'।

'কে ডাক্তার? গদাধরপুরের কম্পাউন্ডার ওষুধের দোকান দিয়েছে, সে-ই?'

'হ্যাঁ। সে তো চিকিৎসা করে।'

'আমার এ অসুখের কোনো ডাক্তারি নেই ভাই। সদরেও দেখিয়েছি। শেষ পর্যন্ত অসুখের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পাই।'

হেঁয়ালির মতো বোধ হল মেজদাদার কথা, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে আবার।

'মেজদা, সদর থেকে ডাক্তার আনানো হোক তা হলে'।

মেজদাদা জানলার গরাদ চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল, ফিরে এসে মালতীর মুখে দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি কাউকে জানাতে চাই না। তুই কি গোপনে একটা ব্যবস্থা করতে পারিস?'

মালতী যেন চাঁদ হাতে পেল।

'পারি। ছোড়দা বাড়িতে এসেছে কিছুক্ষণ আগে'।

'না। তুই থাম! এমন করে লোভ দেখাস নে'।

মালতী স্তব্ধ হয়ে বসে খানিকটা ভাবল।

'আমি পারি মেজদাদা গোপনে সব ব্যবস্থা করতে, কী করতে হবে বলো। কোথায় ওষুধ পাওয়া যাবে'?

'সদরে যেতে হবে না। গদাধরপুরে আমাদের বন্ধু ওভারসিয়ারের কাছে গেলেই পাওয়া যেতে পারে। সে জানে আমার এই অসুখের কথা'।

মালতী উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছিস? বোস। তোর ছোড়দার কাছে শুনেছিস তো পথঘাট কেমন কষ্টের। তা ছাড়া এখনই জল নামবে বলে মনে হচ্ছে'।

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি দেখছি'।

—আমি কি এত অমানুষ রে?

মালতী ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

নিজের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে মালতী চিন্তা করল। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে অগোছালো চুলগুলোতে চিকনি দিল, শাড়িটা পাল্টাল। আলনা থেকে মাতালুর উপহার দেওয়া ফুলদার চাদরটা গায়ে জড়াল ; দরজা খুলে বেরুনোর আগে টেবিলের কাছে ফিরে এসে সরু করে কাজল দিল চোখে।

একদিন এক বিপদে ছোড়দাদাকে ডাকবার জন্য মাতালুকে পাঠিয়ে ছিল মালতী ওভারসিয়ারের কাছে। আজকের এই বিপদেও মাতালুর কথাই মনে হয়েছে তার।

মাতালু তার ঘরে ছিল।

ধনী ঘরের আদুরে ছেলে সে, অন্যান্য কৃষকবা তখনও জমি থেকে ফেরেনি, রোপা ধান লাগাচ্ছে তারা। মাতালু আজ দুপুর থেকে ঘরে বসে দোতারাটাকে তাব পরাচ্ছে। সে ভাবছিল গুড়ালবাঁশ (বাটুল) চালানোটা কাঁকরু তার কাছে শিখেছে, কিন্তু সে কাঁকরুর কাছে দোতারা বাজানোটা তেমন শিখতে পারল না। কাঁকরু যে-কোনো সুর একবার শুনলেই দোতারায় তুলে নিতে পারে। কিন্তু কী যে হবে কাঁকরুর! সে কি আব দোতারা বাজাবে?

এমন সময়ে মালতী এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে।

'মাতালু, একবার গদাধরপুরে যেতে পারবে'?

'তোমরা পাগল হইছ? এক হাঁটু কাদা রে, পাকা রাস্তা যেটে শেষ হইছে'।

'আমাব অবস্থা পাগল হওযাব মতোই'।

'কেনে রে'? মাতালু উঠে দাঁড়িয়ে মালতীব কাছে গেল।

'গদাধরপুর থেকে একটা ওষুধ এনে দিতে হবে'।

'কাব ঔষুধ'?

'মনে করো না আমার জন্যেই'।

মাতালু মালতীর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল।

'ওভারসিয়াবকে চেনো তো, তার কাছেই ওষুধ আছে'।

'ওভারসিয়ার? তাব টে তোমার ঔষুধ! হুম'!

মালতীর মনে হল সে চালে ভুল করেছে। সুবেশ সেই যুবক ওভারসিযার তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করে এ সংবাদ মাতালুর অজ্ঞাত নয়। স্বভাবতই একটা ঈর্ষা, তা সেটা যতই অকারণের হোক, মাতালুকে পেয়ে বসতে পারে। তাই কি হতে পারে?

মালতী বলল, 'মেজদাব অসুখ করেছে'।

'হেঁ'?

'যাবে'?

'মুই ওবরসিয়ারের টে না যাং'।

মালতী কানাঘুষোয় এও শুনেছে যে কাঁকরুদের জমি বেদখল করা নিয়ে ওভারসিয়ারের উপরে এ গ্রামের সব কৃষকেরই একটা রাগ আর ঘৃণা আছে।

মালতী মাতালুর কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখল। আর সেই হাতের নিচে মাতালুর হৃদয়ের কাঠিন্যগুলি গলে যেতে শুরু করল। মাতালু লক্ষ্য করল মালতীর চোখের কাজলের রেখা, সে দেখতে পেল মালতীর শরীর ঘিরে তার উপহার-দেয়া চাদর।

মাতালু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'যাবে, মাতালু'?

মাতালু মালতীর হাতখানা নিজের কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে নিজের দু'হাতে নিল।

'যাং রে'। মাতালুর গলা মিশ্র আবেগে ধরে এল।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই মাতালুর পা দু'খানা যেন বিদ্রোহ করতে লাগল। কাঁকরুদের বাড়ির পাশ দিয়েই সোজা পথ। সে পথে না গিয়ে তাকে এড়িয়ে সে ঘোরাপথ ধরল। কিন্তু আকাশের মেঘ, পায়ের তলায় কাদায় ডোবা পথ, পথের পাশের কোনো গাছের ভিজে পল্লবের স্পর্শ, এসবই যেন তার অনুভূতির বাইরে বাইরে পড়ে রইল। মনের মধ্যে একটা অসহ অবস্থা, যার হদিস সবটুকু করতে পারছে না সে। দ্বন্দ্বের মতো ভিন্নমুখী কয়েকটি আকর্ষণে যেন তার অন্তরটা ছিঁড়ে যাবে। কেউ কি তাকে দেখেছে, দেখতে পাচ্ছে? এই ভাবতে ভাবতে সে প্রকাশ্য পথ ছেড়ে ক্রমাগত ঘোরাপথে চলতে লাগল। যেন পালানোই।

ওভারসিয়ারের নতুন বাংলোর সামনে সে যখন পৌঁছল তখন সে যেন অতিরিক্ত জোরে হেঁটে আসার ফলেই হাঁপাচ্ছে।

ওষুধ, মালতীর মেজদাদার অসুখ এ রকম দু-একটি কথা বলতেই বাকিটুকু ওভারসিয়ার বুঝতে পারল।

ফিরবার পথে মাতালু যেন ক্লান্তির শেষে পৌঁছে গেল। সর্বস্বান্ত হলে মানুষ যেমন দিগন্তে বিশ্রামের কোনো একটু বিন্দুর দিকে চাইতে চেষ্টা করে, মাতালুর মনে তেমনি থেকে থেকে মালতীর চোখ দুটি ফুটে উঠতে লাগল। সে বুঝতেই পারল না কেন পথ চলতে তার মতো পুরুষের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যেন হাঁটতেই পারছে না।

মেজদাদার সেই অদ্ভুত অসুখ সেবারের মতো সেরে গেল। ওভারসিয়ার আবার নিয়মিত আসছে। বারান্দায় বসে মেজদাদা সুস্থ সুন্দর গলায় হেসে ওঠে। মালতী একদিন লক্ষ্য করল অসুখের সময় যেমন করেছিল মেজদাদা, তেমনি ইনজেকশন নিচ্ছে মেজদাদা নিজে-নিজেই। আর শুধু সেই নয়, ওভারসিয়ারও। জামার আস্তিন গুটিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল মেজদাদার সামনে আর মেজদাদা ছুঁচ ফুঁড়িয়ে দিল ওষুধের।

মালতী বলল সেদিন, 'মেজদা, অসুখ তোমার সারেনি বলো'।

'কে বললে তোকে'—বলে মেজদাদা পাশ কাটিয়ে গেল।

মালতী এটা আজ বিশেষভাবে লক্ষ্য করল। মেজদাদা কিছুদিন থেকে যেন পাশ কাটিয়ে বেড়ায়। ওভারসিয়ার না এলেও মালতীর ঘরে গিয়ে সে বসে না। কারো সঙ্গেই সে কথা বলতে চায় না।

৯

কাঁকরু বলল একদিন, 'রাগ করছিস, ধনী'?

'কেনে'?

'আইসঙ্ নাই মুই বহুৎ দিন'।

দোষটা কাঁকরুর একার নয়। মাতালুও তাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেই ওষুধ আনার ঘটনাব পর থেকে। নতুবা দেখা হতো।

কাঁকরু যে-খবরটা দিতে এসেছিল সেটা দিতে তার বাধছে। সে মাতালুর মুখের থেকে চোখ সবিয়ে এনে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

মাতালু বলল 'কাঁকরু রে, দোতারা আনিম্ বা'?

কাঁকরু দোতারা বাজায় ভালো, ভালোওবাসে বাজাতে। আর যদি মন ভালো থাকে বাজাতে বাজাতেই গান গেয়ে ওঠে। দুঃখ বলে কোনো বিষয় ধারেকাছে থাকতে পারে না।

কাঁকরু নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে নিষেধ করল।

অবশেষে ইতিউতি করে আকাশ ও মাটির দিকে খানিকটা মনোযোগ দিয়ে কাঁকরু মাতালুর মুখের দিকে না চেয়ে বলল, 'নোকরি নিছঙ্'।

'নোকরি'? মাতালু পরিহাসের সাহায্যে লঘুতা আনার চেষ্টা করল, 'সাহেব হইবেন, বাহে? তোমরা দেখি বড়মানুষ হইবেন'।

কিন্তু রসিকতাটা জমল না।

মাতালু লক্ষ্য করল কাঁকরুর মুখের যে পাশটা তার দিকে ফেরানো তাতে পেশিগুলি কাঁপছে। চাকরি-নোকরি মাত্রই ভাটিয়ার হাতে। এবং খবরটা কাঁকরু হয়তো আনন্দ করে দিতে আসেনি। বন্ধুকে বলে অনুশোচনাটাই জানাতে চায। তার মনে হল চাকরিটা হয়তো ওভারসিয়ারের কাছেই পেয়েছে সে। সে তো এক অনাচারের চেহারা, যে অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে লাভ নেই বলে যা সাপেব মতো ঘৃণার, ভয়েব, রাগের বিষয়।

সান্ত্বনা দেখাব সুরে মাতালু বলল, 'কী করা তা। মান্‌সির তো বাঁচি থাকা লাইগবে'। কাঁকরু ভাবতে লাগল।

কিন্তু বিস্মিত হল মাতালু নিজের মনের গতিবিধি দেখে। সে অকস্মাৎ যেন সুখী হল কাঁকরুর চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে। চাকরি পেয়েছে বন্ধু, তার জীবিকার একটা উপায় হল এসব তার এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ নয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওভারসিয়ারের কাছে যেতে হয়েছিল তাকে। সে নিজের পরাজয় বোধ করতে পারেনি। এখন কাঁকরুও পরাজিত হয়েছে এটাই যেন তার হঠাৎ সুখের মূলে আছে—কিন্তু এ সুখেব মনোভাবটা মুহূর্তের এক স্বল্পাংশ ধরেই প্রাধান্য পেল। বিস্ময়ের পরে লজ্জা এল তার মনে।

পরক্ষণেই সেজন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিয়ে মাতালু বলল, 'কী নোকরি পাইছিস, কাঁকরু? কত করি তনখা? ইয়াতে তোর দিন যাইবে'?

কাঁকরু থুথু ফেলে বলল, 'দুই কুড়ি দিবে'।

'তা কর নোকরি। হইবে কোন রকম'। এ রকম তখনই বলা হয়, যখন আর কিছু বলার থাকে না।

কাঁকরুর চাকরিটা শুরু হয়েছে দু-তিন দিন হল। কিন্তু হাতে করে কোনো কাজই তাকে করতে হয়নি। যে লোকটি তাকে কাজ দিয়েছে তাব পোশাক-পরিচ্ছদ হাবভাব পুলিসেব বড় দারোগার মতো। সে বলে দিয়েছিল—ডাকব কাজের দরকার হলেই। আজ থেকে তুমি বহাল হলে, বেতন

পাবে। কিন্তু সপ্তাহ চলে গেলেও যখন কাজের জন্য ডাকতে এল না কেউ, কাঁকরু ভেবেছিল— ভাটিয়াদের অন্য অনেক ব্যাপাবের মধ্যে এটাতেও ফাঁকি নেই তো? আজ সে গিয়েছিল যাচাই করতে চাকরিটা স্বপ্ন কি না। সেই নতুন দারোগা তার কথা শুনে অনেক হাসল। তারপর বলেছে : সাত দিনে তোমার সাত টাকা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তবে এ চাকরির কথা কাউকেই বলবে না। না বলাই ভালো। বন্ধুবান্ধব দু-একজন ছাড়া।

কাঁকরুর মনের এ এক অদ্ভুত অবস্থা। ব্যাপারটা ভাটিয়াদের ফাঁকি হলেই যেন ভালো ছিল। চাকরিটা যত নিকটবর্তী এবং বাস্তব হয়ে উঠছিল, তত তার অস্বস্তি বাড়ছিল। চাকরিটা না হলেই যেন সংসারের যে অভাব ঠেকানো যায় না এমন একটা যুক্তির মতো চাকরির দিকে টানছে, তাকে মুখ ফিরিয়ে বলতে পারত—তোমাব কথা শুনে এগিয়েছিলাম—হল না চাকরি, কী করব বলো।

এখন হয়েছে কি, সরকারের একটা আবগারি বিভাগ আছে, আইনগতভাবে রাজ্যের সর্বত্রই তার শাসনাধিকার। কিন্তু এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত তার প্রভাব এসে পৌঁছয়নি। রাস্তাটা তৈরি হয়েছে বলেই যেন সেই পাকা সড়ক ধরে তারা এগিয়ে এসেছে। অনেক কাজ তাদের। প্রকাশ্য কাজগুলো কিছু শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে—এ অঞ্চলে প্রায় সব গৃহস্থের বাড়িতেই অনেক সুপারি গাছ আছে। গাছগুলোর গায়ে জড়িয়ে উঠেছে দিশি পানের লতা। কার বাড়িতে কত সুপারি গাছ আছে তার হিসাব নেয়া হচ্ছে। কার জমিতে কত তামাক হয়? আর গদাধরপুরে একটা দোকান তো আগেই বসেছে মদ-গাঁজা-আফিমের, আবো বসতে পারে।

কিন্তু অপ্রকাশ্য কাজও কম নয়—এ অঞ্চলের কোনো কোনো বাড়িতে এখনও দিশি প্রথায় মদ চোলাই হয়। সাধারণত বয়স্কদের মধ্যেই মদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো ততটা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নয়। প্রৌঢ়ত্বে পাব হতে হতে স্ত্রী কিংবা পুরুষ যখন নিজের রক্তের উষ্ণতা কমে যাচ্ছে বলে অনুভব করে তখন তাদের কেউ কেউ বলাধানের জন্য কিছু কিছু মদ চোলাই করে। এ কাজটিকে বিধিবদ্ধ প্রথায় তুলে দেয়া দরকার। এখন থেকে তেমন খেতে হলে গদাধরপুরের ওই সরকারি দোকান থেকেই কিনতে হবে।

কিন্তু প্রধান অপ্রকাশ্য কাজ হচ্ছে একটা আন্তঃ-প্রাদেশিক চোরাকারবারের মূলোচ্ছেদ করা। বহুদিন থেকেই এ সংবাদ পাওয়া গেছে গদাধরপুর এবং তার আশেপাশের গ্রাম্যপথ দিয়ে শতাধিক মণ আফিম আসাম থেকে চালান আসছে গোপনে। জেনেশুনেও এতদিন কিছু করতে পারেনি রাজ্য সরকার—কারণ আফিম চালান যাওয়া না-যাওয়াব উপরে রাজ্যের উন্নতি অবনতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কিন্তু নতুন মন্ত্রী এসে বলেছে শত শত মণ আফিমের উপরে ট্যাক্স-ডিউটি বসাতে পারলে লক্ষ লক্ষ টাকা আসবে রাজকোষে। আফিমের এই চোরাকারবার ধরার জন্য জাল তৈরি হচ্ছে, তার জন্যই কাঁকরুর চাকরি। তাকে এসব এখনও কিছু বলা হয়নি। আবগারি দারোগা স্থির করেছে, শুধু ভাটিয়া কর্মচারী দিয়ে চোরাচালানের কিনারা কবা সম্ভব নয়। আদিবাসীদের সঙ্গে সন্দেহ উদ্রেক না করে তাদের সঙ্গে মিশতে পারে এমন একজন লোকের খোঁজ করতে গিয়েই কাঁকরুর উপরে চোখ পড়েছে তার।

কাঁকরু অনুভব করল—কী উপায় আছে আর? রাস্তার উপরে ওদের যে স্টিমরোলার চলে সেটা যেমন সব বাধাকে চূর্ণ করে দিয়ে যায়, তেমনি নির্মম ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে ভাটিয়ার স্রোত গদাধরপুরের দিকে। দুখিয়ার কুঠির উপর দিয়েই সে স্রোত বয়ে যাবে। দুখিয়ার কুঠি আর থাকবে না।

মাতালু স্টিম রোলারের চাইতেও বেশি কিছু দেখেছিল। আকাশে উড়ে আসে হাওয়াই জাহাজ। কী তার গর্জন, কী তার ক্রোধ। ওভারসিয়ারকেও হাতজোড় কবে দাঁড়াতে হয়। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল তার।

কাঁকরু আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে অবশেষে বলল, 'কাউক কইস না'!

বলে বেড়ানোর মতো কথা নয় তা মাতালু অনুভব করেছে। সে-ও অবশ্য গোপন রেখে চলবে। প্রায় সকলেই হার মানছে। স্বকীয়তাকে রক্ষা করার সহজ প্রবৃত্তিটা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে বুকের মধ্যে কান্নাকাটি চেঁচামেচি করে, একের পরাজয়ে অন্যে হয়তো-বা সমবেদনা অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, অন্তত কথা দিয়ে তা নির্দিষ্ট হয় না। শহরে গিয়ে দ্যাখো, সকলেই সুখী।

ঘটনাগুলি বলবার দরকার নেই, সেগুলি সকলের চোখের সম্মুখেই ঘটছে। আলোচনায় সুতরাং ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে না কেউ। প্রশ্নটি উত্থাপন করে।

মাতালু একদিন রংবরকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কী হইবে, আজা?

কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা নয় ; কাঁকরু, মাতালু এবং তাদের মতো অন্য অনেকের সমস্যা মিলে মিলে একটা সার্বিক অনির্দিষ্ট সমস্যা রংবরের মনের কাছে সমাধান চাইছে। কিন্তু কী বলবে সে?

রংবর জানে জীবনে অনেকসময়ে অনেক জটিলতা এসে উপস্থিত হয়। বহু বুদ্ধিমান সমবেত চেষ্টা করেও তার গ্রন্থি মোচন করতে পারে না। কিন্তু একটা পথ রংবর নিজে খুঁজে পেয়েছে। গ্রন্থিমোচন নিজে থেকে হবে এই আশা নিয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করা যায়। জীবনে যতই জটিল আর্বত দেখা দিক, তার একটা সরল সম্মুখবেগও আছে। সে প্রবাহে আবর্তকে মুছে দিয়ে কখনও আবর্তকে অন্তর্লীন করে জীবন ছুটে চলেছে। তার নিজের জীবন থেকেও সে এমন দু-একটা জটিলতা উল্লেখ করতে পারে। আর সে জটিলতার মধ্যে এমন বিষয়ও আছে যা অন্তরের অন্তস্তলে দগ্ধক্ষতের সৃষ্টি করে। এই শব্দগুলো রংবরের ভাষায় নেই। তার অনুভূতি এই শব্দগুলো ছাড়া প্রকাশ করাও যায় না।

সেই মহামারীর পর দুখিয়ার কুঠিতে যে কয়েকজন ফিরতে পেরেছিল তাদেব মধ্যে ছিল রংবর, রংবরের মামা আর তার মেয়ে ফুলমতী। রংবর ও ফুলমতী প্রায় সমবয়সী। তখন তাদের বয়স বছর দশেক। এর প্রায় বছর পাঁচ-সাত পরে রংবর ও ফুলমতীকে বিয়ে দিয়ে তাদের সংসার সাজিয়ে দিয়ে রংবরেব মামা ইহলোক ত্যাগ করে। তখনকার দিনে একটা বাৎসরিক বিপদ ছিল। মহামারীর আতঙ্কে প্রদেশপালের চৌকি উঠে গিয়েছিল, কিন্তু দু-তিন বছর কেটে যেতেই খাজনা আদায়ের জন্য তহসিলদার আবার আসতে শুরু করেছিল। সে একা আসত না। তার তহসিলদারি বরং যেন লুটপাটের মতো ছিল। খাজনাটা নগদ টাকায় আদায় কমই হতো, সুতরাং ধান ও তামাক সংগ্রহ করত এবং তা করতে গিয়ে কৃষকদের উপর তম্বি করে যার কাছে যা সম্ভব তা নেয়া হতো। তহসিলদারির মধ্যে পড়ে না এমন সংগ্রহের দিকে তাদের নজর ছিল। পুরুষ আর সবই সহ্য করতে পারে, অনেক পরাজয়ও স্বীকার করতে হয় জীবনে, কিন্তু নারীকে অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া যায় না। ক্রোধে প্রতিবিধিৎসার ইচ্ছায় গ্রামের পুরুষরা অস্থির হয়ে উঠত। কিন্তু সশস্ত্র দুর্ধর্ষ ভোটরা যাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি, কী করতে পারে মুষ্টিমেয় কৃষক তাদের বিপক্ষে? তখন সড়ক তৈরি হয়নি। এক বুক ঘাস ছিল নদীব তীরের সব জমিতে। ঘোড়সওয়ারদের চলার ধাক্কায় সেসব ঘাস নুয়ে পড়ত, তারা চলে গেলেই ঘাসগুলো আবার মাথা তুলত। এ থেকেই যেন কৃষকরা কর্তব্য শিখে নিল। খাজনার পরিমাণ ধান ঘরে রেখে, বউ ছেলে মেয়ে ও গাইবলদ নিয়ে কৃষকরা বনে পালিয়ে যেত। দিন সাতেক বাদে ফিরে এসে তছনছ করা ঘরে আবার এক বছরের জন্য ঘর বাঁধত তারা। বড় কোনো নদীর তীরে যাদের বাস কালবৈশাখীর ব্যাপারে তাদেরও এ রকম করতে হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যেত। অত বড় বিরাট অরণ্যে যেক্ষেত্রে নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া যায়, গ্রামের কোনো কোনো মেয়ে ভাসাভাসা হালকা জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করত, কিংবা বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত। তারা ধরা পড়ত ঘোড়সওয়ারদের হাতে। এই ধরা পড়ার ব্যাপারে গ্রামের কতকগুলি মেয়ে যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল। অবশ্য সৈনিকরা চলে গেলে

আর এক বছরের জন্য তারা ঘরসংসারও করত। একবার ফুলমতীর কী হল, পালানোর সময় হলে সে বলল যাব না, শত অনুনয়েও সে শক্ত হয়ে রইল। রংবরের পালানোর জোর কমে গিয়েছিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে গোরু-বলদ তাড়িয়ে নিয়ে সে বনে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে যা আশঙ্কা করেছিল তাই দেখতে পেল। ঘরদোর তছনছ হয়নি, গোলার ধান গোলাতেই আছে কিন্তু ফুলমতী নেই। সাত-আট মাস পরে ফুলমতী ফিরে এল। রংবর সাত-আট মাস নীরবে থেকে তখন থেকেই নীরবে থাকার প্রথম পাঠ রপ্ত করে নিয়েছিল। পুরুষের বেশবাস আর চিকন চেহারা কেন এমন করে স্ত্রীলোককে টানে? তারপরে পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। তহসিলদারদের রীতি বদলে গিয়েছিল আকস্মিকভাবে। শুধু ফুলমতীই যেন একটু বাক্‌হীনা হয়ে গেছে। ফুলবরের জন্ম হল বছর দু-এক পরে। তাকে মানুষ করে তুলল, যৌবন থেকে জরায় পৌঁছে গেল সে নিঃশব্দে। একটা নেশা আছে তার—ঘরে বসে এণ্ডি বোনা। এণ্ডির পোকা চাষ করে সে নিজে, সুতো কাটে, হাত-তাঁতে দুরূহ ও সোজা নকশায়, কখনও-বা সাদা জমির এণ্ডি বোনে সে।

রংবরের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার এটি একটা উদাহরণমাত্র। কিন্তু সেই স্থির হয়ে থাকা তার রক্তস্রোতেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে যেন।

মাতালু নিজের ঘরের মধ্যে খানিকটা ঘুরে বেড়ালো। তারপর সে রংবরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। বৃদ্ধা ফুলমতী চরকায় সুতো কাটছিল।

মাদুরের একপ্রান্তে বসে মাতালু বলল, 'রাখেন তোর ঘ্যানর-ঘ্যানর আজী, কথা কইবার আসলং'।

ফুলমতী হাতের খেইটা টাকুতে জড়িয়ে চবকা সরিয়ে রাখল।

'কন্'।

'গল্প শুনিম্'।

মাতালু অনুভব করেছিল ফুলমতীর মতো দুঃখদাহনের এমন অভিজ্ঞতা আর কারো নেই। ভাটিয়াদের সঙ্গে ফুলমতীর মতো দুখিয়ার কুঠির আর কারোই অত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। রাজার সিপাইদের গল্পটা সে জানত।

কিন্তু কী শুনতে চায় মাতালু? পরিচয়ের ফল কখনও ভালো হয় না, ভাটিয়ারা কখনও আদিবাসীদের সমপর্যায়ের মানুষ বলে মনে করে না। পশু মনে ক'রে পীড়ন করে না বটে সবসময়ে, কিন্তু পার্থক্যটা সবসময়েই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

মাতালু বলল, 'আজী কন, মালতীকে তোর মনে ধরে'?

বৃদ্ধা ফুলমতী মাতালুর চালচলন থেকে মালতীর প্রতি তার টানটাকে খানিকটা আন্দাজ করেছিল। সে বিস্মিত হয়নি, কিন্তু মনে মনে অনুমোদন করতে পারেনি। ফুলমতীর অভিজ্ঞতা একসময়ে তাকে দগ্ধ করেছে, কিন্তু সেটা বহু দূরের ঘটনা। এখন তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে আসে না সে অভিজ্ঞতার বিদ্বেষে। মালতীকে অনুমোদন না করার কারণ সম্পূর্ণভাবে বর্তমানেই আছে। কালো এই ভাটিয়ার মেয়ের মধ্যে কী যে দেখতে পেল মাতালু কে বলবে!

নিচু করে কাটা ব্লাউজের গলা থেকে কণ্ঠার হাড় উঁকি দিচ্ছে যতই সেখানে চিকচিকে সোনার হার থাক। এমনকী স্তন দুটিও সুগঠিত সুউন্নত নয়। মুখের দিকে চেয়ে দেখবে, চোখা চোখা নাকে আকাশি নীল রঙের পাথরের নাকফুল। কিন্তু টানা টানা চোখ দুটিতে যতই কাজল আঁকা থাক—সেখানে প্রশান্তি নেই। বরং একটা ক্ষুধার আভাস। এ ক্ষুধাই যেন, এই অতৃপ্তিই যেন ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য। এ মেয়ে কি কখনও স্তব্ধ শান্ত হয়ে সেবা করতে পারে? আর তাই যদি না পারবে কী দিয়ে বাঁধবে স্বভাব-চপল পুরুষকে, স্বভাব-সন্ন্যাসী পুরুষ কীসের মোহে ঘরে থাকবে? ফুলমতী অবশ্যই এই শব্দগুলো দিয়ে ভাবে না। এই শব্দগুলো খুঁজে পায় না বলে তার অনুভূতির পাশে

পাশে অজানা গভীরতার আশঙ্কা থেকে যায়।

ফুলমতীর মনে হল মাতালু শক্ত একটা মতামত শুনতে চায় না, কী হবে মালতীর সম্বন্ধে তার নিজের মতামত প্রকাশ করে?

ফুলমতী বলল, 'ভালই তো দেখঙ্'।

কিন্তু এ কথায় মাতালু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। সেটাই স্বাভাবিক হতো। বরং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার। দিনেক দু-দিনে তার জীবনের মূল অনুভবগুলিতে একটা পরিবর্তন এসে গেছে। মালতীর সান্নিধ্য ভালো লাগত। শৈশবের খেলার সঙ্গিনীর শরীরে যখন যৌবন এল, তার নিজেরও এক অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা তখন সেই সান্নিধ্যে আরো গভীর কিছু অনুসন্ধান করছিল। কিন্তু একটা আঘাত পেয়ে তার যৌবন যেন পুরোপুরি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। যেটা ধীরে ধীরে হতো সেটা হয়েছে মুহূর্তেকে। ওভারসিয়ারের কাছে থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরতে ফিরতে শুধু সান্নিধ্য নয়, তার চাইতেও এগিয়ে গিয়ে কোনো পরিণতির সন্ধান করেছিল তার মন। যেন ওভারসিয়ারের কাছে অবনত হওয়ার সেই কষ্টের পক্ষে শুধুমাত্র সান্নিধ্যই যথেষ্ট পুরস্কার নয়।

কিন্তু পরিণতির সন্ধান করতে গিয়েই বাধাগুলির বাস্তব দৃঢ়তা তার চোখে পড়েছে। দুস্তর সামাজিক ব্যবধান, সে ব্যবধান ভাটিয়ারা বাড়িয়েই চলেছে। নদীনালা শুকিয়ে ছোট হয়, যানবাহনের উন্নতি হলে দেশে দেশে দূরত্ব কমে যায়, কিন্তু আকাশ কখনও ছোট হবে? দুটি তারায় কখনও সাক্ষাৎ হতে পারে? সান্নিধ্যটা এমন নির্দিষ্ট না হলে হয়তো ব্যবধানটাও এত প্রত্যক্ষ হতো না।

জ্বলে মরতেও সাধ যায়, দূরে পালাতেও ইচ্ছা করে। এ রকম অবস্থাই হয়তো ফুলমতীরও হয়েছিল। সবদিক দিয়ে যাকে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয় তাকে ভুলে যাওযাই ভালো। ফুলমতী ভুলে গেছে। এখনকার এই স্থবিরত্বে নয়, সেই উন্মত্ত দিনগুলির মধ্যেই সে ভুলে যাওযার মতো একটা আশ্রয়দ্বীপ আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

কিন্তু মাতালু জানত না, দেহ যেমন অচিন্ত্য-কামনাকে উদ্বুদ্ধ করে তার সান্নিধ্যই তেমনি নিবিয়ে দিতে পারে সে কামনাকে। ফুলমতীর পক্ষে ভুলে যাওয়া সেজন্যই সম্ভব হয়েছিল।

মাতালু বলল, 'হামার বোকামির শেষ নাই, আজী'।

কাঁকরুর পরাজয় তবু বাস্তব জ্ঞানের সমর্থন পাবে, আর তার নিজেব ক্ষেত্রে এ কী হল?

ওদের ওই রাস্তা যা দিনকে-দিন এগিয়ে যাবে চারপাশের গ্রাম্যজীবনে জটিলতা সৃষ্টি করতে করতে—তারও একটা পরিণতি আছে। হয়তো অন্য কোনো বড় রাস্তায় মিশে যাবার সুযোগ হবে তার—কিন্তু সে কোথায় যাবে?

মালতীও জানবে না।

কিছু বলবার না পেয়ে ফুলমতী শব্দ না করে চরকা কাটবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাতালু যে অস্থিরতা নিয়ে এসেছিল, সে অস্থিরতাকে মাথায় নিয়েই চলে গেল। রংবর তার বাড়ির আগড়ের পাশে দাঁড়িয়ে একটা গাছে এণ্ডিপোকাব গুটি লাগার ব্যাপারটা যেন লক্ষ্য করছিল। সে তেমনি স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

১০

বর্ষা শেষ হতেই গদাধরের ব্রিজ শুরু হয়েছে। দুখিয়ার কুঠির কোনো কোনো বাড়ি থেকে গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে আকাশের গায়ে ক্রেনের উঁচু মাথাটা চোখে পড়ে। বর্ষায় কুলিরা পাথর ভেঙেছিল, এখন ঝুড়ি করে করে সেই পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীর ধারে যেখানে ব্রিজের পায়া

তৈরি হচ্ছে। পাতাল থেকে গড়ে উঠছে ব্রিজ। অনন্তকাল টিকে থাকবে এমনি তার আয়োজন।

ওভারসিয়ার যে দল এনেছিল পিচঢালা রাস্তা করতে, তাদের চাইতে উঁচুদরের কর্মীদল এসেছে ওভারসিয়ারের চাইতে বড় নেতা এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। লোহার মিস্ত্রিরা এসেছে। এসেছে রাজমিস্ত্রি। এক ভদ্রলোকের দল এসেছে, তারা শুধু মাপজোখই করে আর হিসাব রাখে। তারা নাকি সাব-ওভারসিয়ার, নানা ডিভিশনের ক্লার্ক।

শুধু ব্রিজ তো নয়, বৈজ্ঞানিকরা হিসাব কষে দেখেছে গদাধরকে যদি বেঁধে না ফেলা হয়, সে যদি তার রুচিমাফিকই চলতে থাকে তবে ব্রিজ করাটাই নিরর্থক হয়ে পড়তে পারে। ব্রিজকে এড়িয়ে যেতে বাঁক নিয়ে পাশের বনজঙ্গলে ঢুকে পড়লেই হল। এর ফলে গদাধরের দু'পারেই বাঁধের কাজ হচ্ছে। নদীর বুকের মাটি সরিয়ে সেখানে ঢালাই হচ্ছে সিমেন্ট-কংক্রিট।

পাড়ায় পাড়ায় বিচিত্র কোলাহল, মানুষের কণ্ঠের, তার কাজের। হাতুড়ি পড়ছে পাথরে লোহায় ঠন্‌ঠনাস। হৈ লেচ্চা হৈ লেচ্চা—সুর করে, দড়ি টেনে টেনে আস্ত শাল গাছের খুঁটি পুঁতছে মজুররা। ট্রাকগুলো ভোঁ ভোঁ করে তীব্র স্বরে হর্ন দিয়ে লোক সরিয়ে পথ করছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে, ক্রেনের শিকল নামছে মোটা লোহার বিম নিয়ে।

সাহেবপাড়ায় এঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ারদের বাংলো উঠেছে। সেখানে রাস্তাগুলো এখন সব পিচে বাঁধানো। মজুরবস্তিগুলোর সামনের পথে একহাঁটু ধুলো। বর্ষায় মানুষের পায়ে-চষা জমির মতো চেহারা নিয়েছিল পথগুলো। গাড়ির চাকায় চাকায় সে কাদা সরে গিয়ে খানাখন্দ হয়েছিল এখানে-সেখানে। এখন শুকিয়ে-যাওয়া মাটি ধুলো হয়ে উড়তে থাকে মানুষের পায়ে পায়ে। খানাখন্দগুলিতে পাশের বস্তি থেকে জল এসে জমা হয়। ট্রাকগুলি সে জল বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে টালমাটাল করে, মবিল-ভাসা কাদাজল ছিটকে ওঠে, তবু গতি কমে না তাদের।

সন্ধ্যাতেও বিবাম নেই, বিশ্রাম নেই। তাঁবুতে তাঁবুতে ডে-লাইটের আলো জ্বলে। লোহার মিস্ত্রিদের পাড়ায় এসেটিলিনের চোখ-ধাঁধানো আলোয় ওভারটাইমের কাজ হয়। শ্রমিকদের কোনো কোনো মহল্লায় বসে জুয়ার আড্ডা। কোথাও ঢোল পিটিয়ে তারস্বরে গান করে তারা। বাজারের মহল্লায় আলো জ্বলে ওঠে দোকানে দোকানে। কেউ কি ভেবেছিল রোজকার এক বাজারও বসবে গদাধরপুরে। বেশ্যাপল্লীতে হট্টগোল শুরু হয়। নদীর পারের থেকে হাটে আসার পথে এখনকার বাজারের থেকে এক গলিপথে পাশাপাশি তাদের বাড়িগুলো। দিন হলে তাদের ঘর কয়েকটি খড়ের ছাদের নিচে ঘুমায়, সন্ধ্যায় সাজতে বসে। এসবের মধ্যে থেকে কোনো মুসলমান শ্রমিক অকস্মাৎ আজান দিয়ে ওঠে চিৎকার ক'রে।

হাটফেরতা গ্রামবাসীদের হাতে হাতে মশালের আলো জ্বলে। সে আলোয় পথের ধুলোয় আচ্ছন্ন বাতাস কুয়াশার মতো দেখায়।

নায়েব-আহিলকারের খেদটা এখন নেই। এঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ার নয়। মর্যাদায় ও বেতনে সে নায়েব-আহিলকারের সমকক্ষ। তার স্ত্রী অত্যন্ত মিশুকে। ইতিমধ্যে নায়েব-আহিলকারের গৃহিণীর সখী হয়ে উঠেছে সে। ব্রিজ রং-করা রং ইতিমধ্যে বিনা স্যাংসনেই নায়েব-আহিলকারের বাংলো রঙাতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার চায়ের আসর কোনোদিন বসে নায়েব-আহিলকারের বাড়িতে, কোনোদিন এঞ্জিনিয়ারের কুঠিতে। সেখানে মহকুমা শাসনের কথা এবং ব্রিজ তৈরির কথা একইভাবে আলোচিত হয়।

১১

মালতীর বড়দাদা ও ছোড়দাদা আজকাল গদাধরপুরেই বাস করছে। শহরের বাড়িটা তাদের বড় নয়, অসুবিধা হয়। তা সত্ত্বেও মালতীর বউদিদিও ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে গেছে। মা জিজ্ঞাসা করেছিল। বড়দাদা বলেছে এখন পিছিয়ে থাকার অর্থ হবে ভাগ্যকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখা। সকাল সাতটায় দোকানে বিক্রি শুরু হয়, রাত এগারোটার আগে ঝাঁপ ফেলা যায় না। তারপর আলো জ্বেলে দু'ভাই বসে হিসাব করতে। টাকা-পয়সাব আমদানি দেখে, মালের পরিমাণ যাচাই করে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানায় যেতে রাতদুপুর পার হয়ে যায়। কিন্তু সেটা রোজ নয়। অনেকদিনই দুই ভাইয়ের একজনকে খোঁজ করতে হয় সদরে যাওয়ার ট্রাকের অন্ধকার পথে পথে ঘুরে। ট্রাক পেলে তাতে চেপে সদবে যেতে হয়। মাল কিনে বেলা আটটার মধ্যে না ফিরলে মান থাকে না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে হলে খাটতেই হবে।

দুখিয়ার কুঠিতে মালতী, তার মেজদাদা এবং তাদের মা আছে। মা একদিন বলেছিল, 'যা না তুই শহরে। তোর ভাইরা কী করছে দেখে আয়'।

মেজদাদা সব কথার মতো এ কথাটাও এড়িয়ে গেল, 'দেখা যাক'।

মালতীর মা ভেবেছিল তার দু' ছেলে অজস্র অর্থ উপার্জন করছে। এ অবস্থায় যদি তাব মেজছেলে দূরে সরে থাকে পরে একদিন সে-অর্থের মালিকানা নিয়ে ভ্রাতৃদ্রোহ শুরু হতে পারে।

এদিকে ধানের সময় যাচ্ছে। একদিন চাষীরা এসে বলেছিল মেজদাদাকে, ধানেব জমির ঘাস নিড়িয়ে দিতে হবে। মজুরি এবার অন্যান্য বারেব চাইতে বেশি। শহবের কাজে অজস্র অর্থব্যয় হচ্ছে। নানা সূত্রে তার দু'এক কণা গ্রামবাসীদের হাতে এসে পৌঁছচ্ছে। অর্থ এখন দুর্লভ কিছু নয়।

মেজদাদা বলেছিল, 'দাদাকে বলো'।

তারা বলল, 'বড়বাবু বলেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে'।

মেজদাদা বলেছিল, 'বেশ, তাহলে যা ভালো বোঝো করো'।

কথাটা কেউ বলে দেয়নি কিন্তু অলিখিত অনুচ্চারিতভাবে সংসারের কর্তব্যভার ও কর্মক্ষেত্র মালতীর দাদারা ভাগ করে নিয়েছে। এবং এটা যে স্থায়ী হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনাই যেন দেখা দিচ্ছে। ব্যবসায়ের তাড়াহুড়ো ছুটোছুটির পক্ষে মেজদাদা, রুচি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে, অপটু হয়ে পড়ছে। গ্রামেব কাজগুলি, জমিজমা তদারক করা, তেজারতির টাকা আদায় করা এসব কাজ তবু মেজদাদার পক্ষে সম্ভব। এ রকমই ভাবা হচ্ছে।

কিন্তু দিয়ে শুরু করে মালতী অনুভব করে, এর মধ্যে যেন একটা উপেক্ষা-অভিমানের ব্যাপার আছে। একটা ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে। বড়দাদাদের দিকে যেমন একটা উপেক্ষার ভাব আছে, মেজদাদার পক্ষে যেন তেমনি অভিমান।

মেজদাদার কিন্তু এসব খুঁটিনাটিতে দৃকপাত নেই। আলখিল্লামতো জামা গায়ে, মুখে সিগারেট দিয়ে বেলা এগারোটা পর্যন্ত সে হয় তার ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কিংবা ক্যানভাসের চেয়ারে পড়ে থাকে। মালতী ডেকে-ডুকে চা খাওয়ায় তখন। ছুটির দিনের ঢিলেঢালা গড়িয়ে যাওয়ার ভাব। তার অন্য দুই ভাই, পক্ষান্তরে, সময়ের পাখায় ধেয়ে চলেছে।

এটা একটা কৌতুক যেন। শিক্ষা ও রুচির দিক দিয়ে যার সঙ্গে শহরের জীবনের সবচাইতে মিল হওয়া উচিত, সে-ই রইল গ্রামে। আর রুচির দিক দিয়ে যারা গ্রাম্য, অর্থোপার্জনের স্থূল আবেগ ছাড়া যারা অন্য কোনো আকর্ষণকেই স্বীকার করে না, তাদের স্থান হল শহরের সভ্যতায়।

মেজদাদা ছাড়া এ বিষয়ে আলাপ করার মতো আর কেউ নেই মালতীর আশেপাশে। মেজদাদাও

হুঁ-হাঁর বেশি কিছু বলতে নারাজ। অমন সুন্দর করে কথা বলতে পারে মেজদাদা, অথচ নিজে থেকে ডেকে কারো সঙ্গেই কথা বলে না আজকাল।

মালতী এক সন্ধ্যায় তার পাশে বসে বলেছিল, 'গান গাইব, মেজদাদা'?

একটু যেন বিস্মিত হল মেজদাদা, 'গাইবি? তা ভালোই হয়'।

গান শেষ হলে মেজদাদা মালতীর মাথার উপবে একখানা হাত রেখেছিল, কিন্তু তার উদাসীনতাও ধরা পড়েছিল মালতীর কাছে। শরীরের দিক দিয়ে নয় শুধু, মনের দিক দিয়েও যেন শুকিয়ে যাচ্ছে মেজদাদা।

আজকাল ওভারসিয়ার তেমন ছুটি পায় না, কারণ তার মাথার উপরে এঞ্জিনিয়ার আছে। সপ্তাহে একদিন সে আসে। ফরেস্টার আরো কম। তারও হঠাৎ কাজ বেড়ে উঠেছে। বোধ হয় আধুনিকতার খোঁজে এখন আর তাদের এই গ্রামে আসার দরকাব নেই, ব্যস্তসমস্ত শহরেই তো যথেষ্ট আধুনিকতা।

বউদির ছেলেপুলে হবে এ সংবাদ এল একদিন গ্রামে। মা শহরে চলে গেলেন।

বাড়িতে মেজদাদা এবং মালতী। মালতী ভাবল, এই অবসরে মেজদাদার মনোভার কিছু দূর করবে—হেসে, গল্প কবে, দিবারাত্রি সাহচর্য দিয়ে। জেনে নেবে যদি কোনো গোপন দুঃখ থাকে। এত খুশি মালতীকে কেউ কোনোদিনই দেখেনি। মেজদাদাকে চা দিযে সে চলে যায় না, নিজের কাপটা নিয়েও সে তার পাশে বসে পড়ে। মেজদাদাকে অনুকরণ করে, মনে মনে আউড়ে, সে কবিতা পড়ার সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে। হয়তো-বা চায়ের কাপ হাতে সে বলে ওঠে—আজি দিবসের শূন্য নয়নে কাজল পরালো কে? আর তা বলেই কেমন যেন নিজেদেরই অপরিচিত মনে হয়।

ইতিমধ্যে ফরেস্টার এসেছিল একদিন। সঙ্গে এনেছিল চাংড়ি ভরে বনমোরগ! মেজদাদাকে খুশি করার ইচ্ছায অপরিচিত পুরুষ ফরেস্টারকে সঙ্গে নিয়ে মালতী একটা চড়ুইভাতি করার মতো আনন্দে মেতে উঠেছিল।

কিন্তু মালতীব সব চেষ্টা একদিন ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভয় পেয়ে সে বলল, 'মেজদা তোমার ওষুধ কি ফুরিয়ে গেছে'?

'আনাইনি আর'।

কী হবে তাহলে, কী হবে? পাংশু শুকনো মুখে মেজদা তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এরপর পায়চারি শুরু হবে হয়তো, ডাকলেও সাড়া দেবে না ; সারা রাত ধবে চটি টেনে টেনে ঘুরে বেড়াবে।

মালতী তার নিজের ঘরে ছুটে এসে দু'হাতে চোখ মুখ ঢেকে বারংবার বলতে লাগল : ভগবান, তেমনি আর একটি রাত্রি থেকে আমাকে রক্ষা করো।

সমস্তটা দিন অস্বস্তিতে কেটেছে। বিকেল গড়িয়ে যেতে লাগল যত তত বাড়তে লাগল অস্বস্তি। মালতীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। গরম জল চায় মেজদা, তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় মালতী। মেজদাদা বলে, না দরকার নেই। নিজের ঘরের মধ্যে ফিরে ফিরে আসে মালতী। মনে মনে বলে—না না, আমি পারব না। মেজদা, আমাকে তুমি এমন নির্দেশ দিও না। মাতালু ছোটবেলার সঙ্গী কিন্তু এখন সে ছোটবেলার মন নিয়ে বসে নেই। সে আমার কথা রাখবে। কিন্তু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সে আমার মধ্যে শুধু ছোটবেলাব সঙ্গীকেই খুঁজে পায় না, তার চোখে সে যাওয়া একটা কিছুর আশ্বাসের মতো। আমি তাকে যা দিতে পারি না তারই আশার মতো তার সামনে দাঁড়াই। আমি তাকে আব কোনো হুকুমই করতে পারব না।

সন্ধ্যায় মেজদাদার ঘরের কাছে এসে সে দেখল ঘরে তালা ঝুলছে। সে ভাবল, মেজদাদা ওষুধ আনতে নিজেই গিয়েছে। একটা স্বস্তি বোধ হল তার। এবং সে স্বস্তিবোধটার দরুন সমস্ত বাড়িটায় সে একা, এ অস্বস্তি তার কাছে বড় হয়ে উঠতে পারল না।

রাত্রির প্রথম প্রহরে পায়েব শব্দে চোখ তুলে সে দেখল মাতালু দাঁড়িয়ে আছে সামনে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে টের পায়নি। তার ছোটবেলার ধারণাটা কিছুক্ষণের জন্য আবার তার মনে এল। প্রয়োজন হলে ছায়ার মতো নিঃশব্দে এই আদিবাসীরা চলতে পারে।

'কী, মাতালু'?

'তোমার মেজদা কইলেক, কিছু দেরি হইবে ফিরবার'।

তবুও ভালো মেজদাদার খবর পাওয়া গেল। মাতালুর উপরে খুশিই হল মালতী। সুস্থ সবল হাস্যময় মাতালু। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার এমন যে নির্ভর করা যায়।

'তোমার খবর কী মাতালু'?

'খবর কি কণ্ড'। মাতালু হাসল।

মেজদাদার কথা থেকে সরে যাওয়ার জন্যই মাতালুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু মেজদাদার কথাই যেন তাকে বলতে ইচ্ছা করছে। বাড়ির কাউকে সে বলতে পারেনি কিন্তু মাতালুকে বলবার জন্য একটা অযৌক্তিক ইচ্ছা সে অনুভব করল। সেদিন তাকে যে সে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল যেন সেকথা বলেই তার মনকে হালকা করা দরকার। কিন্তু মালতীর ভয় ভয়ও করতে লাগল; কী একটা প্রাচীর ধ্বসে পড়বে, চুরমার হয়ে যাবে। কিছুদিন আগেও এ ভয় ছিল না, কাল্পনিক প্রতিরোধটাও তৈরি হয়নি।

'আচ্ছা মাতালু, তুমি যাও'। মালতী তাড়াতাড়ি বলল।

মাতালু মালতীর মুখের দিকেও তাকাল না। মুখ নিচু কবে দাঁড়িয়েছিল, মুখ নিচু করেই চলে গেল সেই নিঃশব্দ বাড়ি থেকে।

মধ্যরাত্রিতে মেজদাদা ফিরল।

'এসেছ, মেজদা, খাবে তো'?

'না। একটু জল দে'।

জল নিয়ে মেজদাদা দরজা বন্ধ করে দিল।

মালতীর ঘুম ভালো হওয়ার কথা নয়, কিন্তু দুশ্চিন্তার চাইতে বাস্তব সহস্রগুণে মর্মান্তিক হয়ে থাকে। ভোর হওয়ার কিছু আগে একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙেছিল মালতীর। পাশের ঘরে মেজদাদা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে জানলা দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখতে পেল বন্ধ দরজার গোড়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে মেজদাদা, যেন দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে আর পারেনি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে মেজদাদাকে জাগাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর মালতী সেই অন্ধকার রাত্রিতে ছুটে বেরুল।

মাতালুর ঘুম ভাঙিয়ে তাকে সঙ্গে করে দৌড়তে দৌড়তে নিজেদের বাড়িতে যখন ফিরে এল মালতী, তখন সে আর কথা বলতে পারছে না। দরজা খুলবার বৃথা চেষ্টা দু'একবার করে মাতালু খোলা জানলাটাকে আক্রমণ করল। প্রাণপণ চেষ্টায় জানলার গরাদ বেঁকিয়ে যে ফাঁকটুকু করতে পারল তা দিয়ে তাব প্রকাণ্ড শরীরটা গলিয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু মালতীকে পার করে দেয়া গেল।

মালতী দরজা খুলে দিয়েছিল। মেজদাদাকে বিছানায় শুইয়ে বালতি বালতি জল এনে মাতালু মেজদাদার মূর্ছা ভাঙানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মালতীই অবশেষে হুহু করে কেঁদে উঠে বলল, 'কী করছ মাতালু, কাকে তুমি বাঁচাবে'?

১২

ভয় এবং অবিশ্বাস।

ক্ষতির ভয়, আর লাভের আশ্বাসের প্রতি অবিশ্বাস।

কাঁককুর জমিকে গ্রাস করার ব্যাপারে যে ভয়ের সূত্রপাত, তাকে নানা রূপে দেখবার আশঙ্কা যেমন যায়নি, কাঁকরু ক্ষতিপূরণ পাবে, এই দ্যাখো ইতিমধ্যে সে একটা চাকরি পেয়েছে, এসব আশ্বাসেও তেমন কারো বিশ্বাস জন্মায়নি। এটাকে উদাহরণ বলে ধবে নিলে এমন অন্য অনেক উদাহরণে পৌছনো যাবে। যার কিছুমাত্র মূল্য ছিল না, এখন তারও মূল্য হয়েছে এটা যেমন আশ্বাস, বহুদিন ধরে যার মূল্য ছিল, সেটা একান্ত মূল্যহীন হয়ে যাবে এটা তেমনি একটা আশঙ্কা।

জীবন, যাকে অহরহ সতর্ক-স্নেহ দিয়ে লালন করা হয়ে থাকে, অন্যকে ধ্বংস করেও যাকে রক্ষা করাই চিরাচরিত বিধান, তার উপরেই নাকি মানুষের ঘৃণা আসে, তাকেই নাশ করার জন্য নাকি মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে! সদরের রাসের মেলায় নানা রকমের মাটির পুতুল সাজিয়ে পুরাণের গল্প, রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান দর্শকদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরার ব্যবস্থা আছে। বীরত্ব, শৌর্য, করুণা, স্নেহ প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে সেসব শিল্প দর্শকদের মুগ্ধ করে। মাতালুর প্রাণ ভরে ওঠে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় তার চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে। ভাটিয়াদের প্রতি সে একটা শ্রদ্ধা অনুভব করে। কিন্তু একবার সে একটা আঘাত পেয়েছিল। অনেক পুতুলের মধ্যে সেবার একটা পুতুল ছিল—মনোহর পোশাক-পরিচ্ছদ অলংকারভূষিতা একটি মহিলা নিজের হাতের খড়্গো নিজের মুণ্ডচ্ছেদ করেছে, আর অন্য হাতে নিজের সেই খণ্ডিত মুণ্ড ধরে আছে, ফোয়ারার কায়দায় লাল রঙের জল রক্তের মতো সেই মুণ্ডের মুখে ঝরে পড়ছে ছিন্নকণ্ঠ থেকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে বারবার মাতালু সেই অদ্ভুত ছিন্নমস্তা মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন একটা মোহ আছে তার। অবশেষে তার শরীব এবং মন দুই-ই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অসুস্থ বোধ করে মাতালু গ্রামে ফিরে এসেছিল। এটাই একমাত্র ব্যাপার নয়, এমনি অদ্ভুত কিছু করে বসার একটা প্রবণতা ভাটিয়ামাত্রেরই আছে। নতুবা ভাবো, কী কবে মালতীব মেজদাদা নিজেকে নিজে মেরে ফেলল। মালতীর দাদারা ব্রিজ কোম্পানির ডাক্তারকে জানিয়েছিল। সে বলেছিল, সে নাকি আফিমের বিষে আত্মহত্যা। অনেক মৃত্যুর কথা রংবর জানে কিন্তু দুখিয়ার কুঠিতে নিজের জীবনের উপরে কেউ হাত দেয়নি আজ পর্যন্ত। সেটা যে সম্ভব তা কল্পনা করতেও যেন পারে না। অথচ ঘটে যাওয়ার পরে এখন অবাক লাগছে ভাবতে, সেটা এমন একজন সাধারণ চেহারার ভদ্রব্যক্তি ঘটিতে দিতে পারে। কিন্তু এছাড়াও এ ধরনের চিন্তার আর একটি পর্যায় আছে। সেখানে পৌছুলে মনে হয়—মৃত্যু নানা দিক দিয়ে আসে, নানা মূর্তি তার। এ মূর্তিটা এতদিন প্রকাশিত হয়নি, হয়তো-বা এখন থেকে হবে। এও একটা আশঙ্কা। দুখিয়ার কুঠিতে অনেক বাড়িতে সাদা কাপড়ের টুকরো বাঁশের মাথায় উড়তে দেখা যাচ্ছে আজকাল। নতুন লোক এসে তার কারণ খুঁজে পাবে না। মদন-কামেব পুজোর সময়ে অনেক লাল পতাকা অনেক বাড়ি থেকে পতপত করে ওড়ে। তখন বিদেশি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সেই পুজোর এক কলি গানও শুনতে পাবে। কিন্তু এখন এই সাদা পতাকার কথা জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। ঠিক উত্তরটা না দেয়াই প্রথা। ওতে এই নতুন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার নানা তুক আছে।

আর মাতালুর মনে কীভাবে ধারণাটা হল তা বলা কঠিন, কিন্তু হয়েছে তা বলা যায়। গদাধরের ব্রিজ যেমন আকাশকে স্পর্ধা করে দ্যাখো দ্যাখো করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে, তার সঙ্গে যোগ রেখে নাকি অনেক বেদনা, নতুন আধি-ব্যাধি দেখা দেবে এ অঞ্চলে। দুখিয়ার কুঠি বাঁচবে না তার হাত

থেকে। বরং যেভাবে দুখিয়ার কুঠিতে অনিবার্য একটা শহরমুখো টান ধরেছে, তাতে মনে হয় অন্যান্য গ্রামের চাইতে দুখিয়ার কুঠিতেই এই নতুন বেদনাগুলি আগে আসবে। পাখি উড়ে যাওয়ার সঙ্গে গাছ থেকে ফল পড়া, এ দুটো ঘটনায় কখনই কোনো যোগাযোগ নেই, তা ভাবাও অযৌক্তিক। রংবর জানে শহরবাসীদের অনেক ব্যাধি আছে যা তাদের পক্ষে তত মারাত্মক নয়, যতটা হয়ে দাঁড়ায় তাদের সংস্পর্শে এলে গ্রামবাসীদের। সম্পূর্ণ অজানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব যখন হয় তখন অনেকক্ষেত্রেই তা শহর থেকে বয়ে আনে গ্রামবাসীরা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা নেশা আছে শহরের। ছিন্নমস্তার ভয়ে কেউ রাসের মেলায় যাওয়া বন্ধ করে না। মাতালুও গদাধরপুরে যায়।

প্রথম যেদিন সে মোটর-ট্রাকে উঠেছিল সেদিনের অভিজ্ঞতা সহজে ভুলবাব নয়, কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ, একের পর এক নতুন অভিজ্ঞতা, একই অভিজ্ঞতার নতুন রূপ। মোটর-ট্রাকে ওঠা এখন এমন কিছু বড় কথা নয় মাতালুর পক্ষে, সে আজকাল পায়ে হেঁটে খুব কমই যাতায়াত করে গদাধরপুরে। পথের ধারে সে দাঁড়িয়ে থাকে, চলতি ট্রাক থামিয়ে ওঠে সে, যেখানে ব্রিজ হচ্ছে সেখানে গিয়ে নামে। দু-একজন ড্রাইভারের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত ড্রাইভারও একটা টাকা পেলেই সদরের শহরে নিতে আর কোনো আপত্তি কবে না।

অথচ অন্যান্য গ্রামবাসীর মতো মাতালু শহরে কাজ নিয়ে যায় না। শহরে গেলে হয় সে নতুন বাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নতুবা যেসব জায়গায় কাজ হচ্ছে তার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি-মজুরদের কাজ দেখে। ঘাটিয়ালেব চালায় বসে অর্ধসমাপ্ত ব্রিজের উপবে ব্যস্তসমস্ত মজুরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। মানুষগুলিকে বড় বড় পিঁপড়েব মতো দেখায়।

দু-একজন মিস্ত্রির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। বেশ মানুষগুলি, হাসিখুশি গল্পবাজ। স্ফূর্তির নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করতে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রিজ তৈরি করার মতো জটিল কাজকর্মে। কিন্তু কী যে বোকা তারা। ধান থেকে চাল হয় জানে কিন্তু কখন কোন ধান লাগাতে হয়, সবসময়ে কেন মিহি চালের ধান হয না, সেসব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই ; আকাশের মেঘ দেখে বলতে পারে না বৃষ্টি হবে কি না, চাঁদ দেখে তিথি বলে দেয়া দূরের কথা। এসব তবু সহ্য করা যায় কিন্তু ভাবো তাদের স্ত্রীকে ছেড়ে থাকার কথা। কতদিন থেকে যে এই পুরুষগুলো জমি আর স্ত্রীকে ছেড়ে থাকছে ভাবলে অবাক হতে হয়। স্ত্রীকে যদি বছরে আট-দশ মাস দূরে-দূরেই রাখবে, তবে বাকি দু-এক মাসের জন্য তাদের স্ত্রী করা কেন? একজন বলেছিল—বালবাচ্চা আছে। মাতালুর বলতে ইচ্ছা হয়েছিল—ওরে বোকা, স্ত্রী আগে তারপরে ওরা। কিন্তু মাতালু যেন একটা বেদনাও বোধ করে মিস্ত্রিদের জন্য এবং সে কারণেই নির্দয়ের মতো তাদের নির্বোধ মনে করতে পারে না। ওরা যেন একটা জালে ধরা পরেছে, যার জন্য এত শ্রমশক্তি আর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে, ছেলের মাকে ছেড়ে এই বিদেশে আসতে হয়। অবাক কাণ্ড এই, সেই জাল কেটে বেরুতে এরা চায় না যেন। মাতালুর স্ত্রী নেই, কিন্তু ভাবতে গিয়ে তার মনে হয়, এ রকম করার চাইতে সে বনে চলে যাবে স্ত্রীকে নিয়ে। এরপরেই তার মনে আসে—সবই যদি ভালো তবে এদের জীবন এ রকম কেন? এও তো নিজের মনকেই মেরে ফেলা। মালতীর দাদার রোগের মতোই কিছু।

এসব সত্ত্বেও অগ্নিকাণ্ডের কিংবা প্লাবনের ভয়ংকর রূপের মধ্যে যে একটা আকর্ষণ আছে, তেমনি কিছু যেন আছে এই কালো-নদীর ছুটে চলার মধ্যে। আর বোধ হয় কাঁকরুর সঙ্গে দেখা হয় না বলে, কারণ কাঁকরু এখন চাকরি করে, এবং মালতীকে সে ভুলবার চেষ্টা করেছে বলে, কারণ সে অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছে মালতী তার পক্ষে আকাশের চাঁদ—সে শহরের টানটা আরো বেশি অনুভব করে। মালতী ছাড়া, এক জায়গায় থেকে কী লাভ?

একদিন রংবর বলেছিল—শহরৎ যাইস?

—হয়।

আর কিছু রংবর বলেনি। বলা তার স্বভাব নয়। জীবনে শোক ছাড়াও এমন কোনো কোনো সময় আসে যখন তাকে অন্য বিষয় নিয়ে ভুলে থাকবার সুযোগ দিতে হয়। সে ফুলমতীব কাছেই শুনেছে মালতীর বিয়ের কথাবার্তা চলেছে। এমন একটা দুর্ঘটনার এত কাছাকাছি সময়ে এমন একটা আনন্দের বিষয়ের আয়োজন অরুচিকর শোনায়, কিন্তু মালতীর নিজের মঙ্গলের জন্যই এটা করতে হচ্ছে। মেজদাদার মৃত্যুর পর থেকেই তার ফিটের ব্যারাম হয়েছে। থেকে থেকে হঠাৎ একটা আকস্মিক আক্ষেপ আসে। সদরের ডাক্তার বলেছে, বিয়ে হলে ছেলেপুলে হলে সারে এ অসুখ, ওষুধপত্র বড় কাজ করে না। ফুলমতী ঝাড়তে গিয়েছিল। তার মন্ত্রতন্ত্রে ফল হল কি না-হল, হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল মালতী। চারপাশে লোকজন দেখে বিশেষ কবে ফুলমতীকে দেখে সে বলে উঠেছিল—আ, ছি ছি, এ কী করেছ তোমরা? তারপব সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে। মালতীর দাদারা যুক্তি পরামর্শ করে স্থির করেছে, মেজভাই-এর মৃত্যুতেই এ রকমটা হয়েছে। বাড়ির মধ্যে ওরা দুটিই পরস্পরকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসত। তাদের কাকা বলেছে: এই অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মনের অসুখ সারাতে মনকে অন্য খাতে নিয়ে যাওয়া দরকার। রংবর যখন এতটা জানে তখন মাতালুও কিছু নিশ্চয় জেনে থাকবে। অসম্ভবের ভালোবাসা হলেও মালতীকে সহজে ভুলতে পারবে না মাতালু। দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করা বরং ভালো। কারো কারো জীবনে কেন যে অকারণ বিপত্তি এসে জমা হয়!

এখন মাঝে মাঝে শহর থেকে ফিরতে রাত হয়ে যায় মাতালুর। বাঁধের উপরে ঘুরে বেড়ানো এবং ঘাটিয়ালের ঘরে বসে ব্রিজের কাজ দেখা ছাড়াও অন্যান্য আকর্ষণ আছে শহরের। সদরের রাস উপলক্ষে যে মেলা হয় সেটা আয়তন ও আয়োজনে বিরাট, কিন্তু সাময়িক, আর এখানে যা হয়েছে সেটা যেন ছোট হলেও চিরস্থায়ী। যেখানে হাট বসত সেখানেই সারি সারি দোকান। সন্ধ্যায় যখন সবগুলো দোকানে আলো জ্বলে ওঠে, দোকানে সাজানো মনোহারী কাচের জিনিসগুলি ঝকমক করতে থাকে, মাতালুর ভালো লাগে সেই স্বর্গপুরীর মধ্যে অকারণে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে।

ইতিমধ্যে মাতালু একদিন আবিষ্কার করেছে আকর্ষণের মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণ। দেয়ালের গায়ে নানা রঙের ছক কাটা একখানা কাঠের ফলক, পয়সা বাজি ধরে পালক-পরানো ছোট ছোট তীর ছুঁড়ে মারতে হয়। যে রঙে টাকা পয়সা রেখেছ সেই রঙে তীর বিঁধতে পারলেই পয়সা দ্বিগুণ ফিরে পাওয়া যায়। প্রথম দিনে হেরে গিয়ে দুঃখ হয়েছিল মাতালুর। এখন সে বুঝেছে, ওটা খেলা। উত্তেজনাটাই ওর আনন্দ। কিন্তু তার কৃষক-মন স্বভাবতই অপচয়-বিরোধী। এবং সেই মনই সম্ভবত উত্তেজনাটাকে ভালোবেসেও তাকে বেহিসেবি নেশা হিসাবে বুঝতে পেরেছে। নেশা ধরেনি তার, যেমন অনেক শ্রমিকের ধরেছে।

সেদিন বোধ হয় আকাশে মেঘ ছিল। বিকেলে সন্ধ্যার মতো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। বাড়িতে নিয়ে যাবার মতো কিছু কেনাকাটা করেছিল মাতালু। যে পথ দিয়ে সে রোজ যাওয়া-আসা করে সেটা ধরেই চলেছিল। এই পথের ধারে পাঁচ-সাতখানা নতুন ঘর অন্য বাড়িগুলো থেকে একটু পৃথক হয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। আজ আকস্মিকভাবে একটা যোগাযোগের মতো ঘটে গেল। মাতালু রাস্তার যে পাশে বাড়িগুলো সেদিক দিয়েই যাচ্ছিল। চতুর্থ ঘরটা ছাড়িয়ে যেতে যেতে সে থেমে দাঁড়াল। সে ঘরটার বারান্দায় একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের আদরায়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে তাকে যেন চেনা চেনা মনে হল মাতালুর। সে আর একবার দেখবার জন্য মুখ তুলতেই মেয়েটি বলল, 'ও মানুষ, পাশের ঘরের বুড়িটার অসুখ করেছে'।

কিন্তু মেয়েটি তার বক্তব্য শেষ করতে পারল না। একটা ভারি ট্রাক একেবারে মাতালুর গায়ের উপর দিয়ে যেন ছুটে এসে থামল তার ঘরের সামনে। মাতালু পাঁচ নম্বর ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে। ট্রাক থেকে একজন লোক টপ করে নেমে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বলল—রাখ, রাখ। কিন্তু সেই প্যান্ট-জামা পরা ভদ্রলোকটি তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে ঘরে নিয়ে গেল। মেয়েটির খিলখিল করে উপচে-পড়া হাসি শুনতে পেলে মাতালু ; ট্রাকটাও চলে গেল।

বারান্দা থেকে পথে নামবার আগে মাতালুর দৃষ্টিটা কিন্তু পাঁচ নম্বর ঘরের খোলা জানলা দিয়ে ঘরটার ভিতরের খানিকটা দেখতে পেয়েছিল। বিছানার উপর একটি স্ত্রীলোক অসুস্থ অবস্থায় ছটফট করছে, তার শিয়রে কলঙ্কধরা একটা গ্লাসে বোধ হয় খানিকটা জল।

এক পলক দেখে নিতে যে সময়টুকু লাগে তার চাইতে কিছু বেশি সময় মাতালু অসুস্থ স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিল। এর ফলে দুটি বিপরীত প্রবণতা দেখা দিল তার মনে—প্রথমটি হচ্ছে অসুস্থতার জন্য সমবেদনা, দ্বিতীয়টি রোগের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জান্তব প্রেরণা। দ্বিতীয় প্রেরণাটিকে সাহায্য করল আর-একটি সাবধানী সংস্কার, ভাটিয়ার ফাঁদে না পড়তে হয়। মাতালু নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে গ্রামের দিকে রওনা হল।

১৩

মালতীর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র ওভারসিয়ার নয়, লখাই চক্রবর্তী।

মালতীর দাদারা তার মাকে বলেছিল : শহরের এই হট্ট-কোলাহল কমে যাবে ব্রিজ তৈরি শেষ হলে। শুধু ব্যবসাদাররাই থাকবে তখন, আর রাজকর্মচারীরা। ব্যবসার আভিজাত্যই সুতরাং তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ওভারসিয়ারের বয়সের দিক দিয়ে পাত্র হওয়ার বেশি যোগ্যতা আছে হয়তো, কিন্তু ব্রিজ তৈরির মতো বিরাট ব্যাপার রোজ ঘটে না যে কাঁচাপয়সা তার নির্দিষ্ট বেতনকে ফাঁপিয়ে তুলবে। বেতনটা তুচ্ছই। এদিকে লখাই চক্রবর্তী এতদিন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়ালেও সেসব ছুটোছুটি নিরর্থক নয়, টাকা করেছে সে কিছু কিঞ্চিৎ। আর শহরে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে তাদের মধ্যে আভিজাত্যের দিক দিয়ে সে-ও একজন হবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে তার বাড়ি তৈরি করা শেষ করেছে সে। মা হয়তো দেখেনি, কিন্তু তার হলুদ রঙের আধুনিক কায়দার পাকাবাড়িটা শহরের উল্লেখযোগ্য চার-পাঁচটি বাড়ির মধ্যে একটি। আর ব্যবসা? সে শুধু গাঁজা আফিমের দোকানই দেয় না, আড়তদারির পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে প্রকাণ্ড একটা গুদাম তুলেছে। সে তো কনট্রাক্টরও বটে। বয়স? চল্লিশ বছর এমন কি বেশি বয়স, তোমার মেয়েরও তো বিশ প্রায় হল।

বিবাহের উৎসব দু-জায়গাতেই হল। শহরে লখাই চক্রবর্তীর বাড়িতে এবং দুখিয়ার কুঠিতে মালতীদের বাড়িতে।

মালতীদের বাড়িতে যে উৎসব হয়েছিল তাতে বৈচিত্র্য এনেছিল ফরেস্টার। বরভোজনে চিরাচরিত মাংসের পরিবর্তে সে হরিণ মাংসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। দুখিয়ার কুঠিতে অনেক শহরবাসী নিমন্ত্রিত হয়েছিল।

লখাই চক্রবর্তীর বাড়ির উৎসবে ওভারসিয়ার এবং তার ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তনরা ভিড় করে এসেছিল। নায়েব-আহিলকারও বাদ যায়নি। লখাইয়ের বাড়িতে এয়ো নেই। মালতীর কাকিমাই তার কাকিমা সেজে বসেছিল। ডেকে আনা হল এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীকে, নায়েব-আহিলকার গৃহিণীও

এসেছিল। নানা রকম আনন্দই ছিল, কিন্তু এই সাময়িক শহরে যে বিবাহের আনন্দের মতো আনন্দও এসে পড়বে এ কি আশা করে গিয়েছিল? অজস্র অর্থব্যয় করল লখাই। শহরের বড় এবং মেজরাও তো বটে, সেজরাও বাদ পড়ল না সবাই। ওভারসিয়ার এখানে বিচিত্রতার সন্ধান দিল। মালতীর বন্ধু এই পরিচয় দিয়ে সে লাল নীল : সোনালি রঙের বিচিত্র লতাপাতায় চিত্রিত টিসু কাগজে এক আধুনিক গদ্যকবিতা ছাপিয়ে বিতরণ করল, এবার নব কুমারসম্ভবের সূচনা ইত্যাদি।

মাতালু এবং তার পরিবার উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিল কিন্তু যোগ দেয়নি।

আর মালতীর সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল : এইবার সেই ফিট-টা হবে, আর সবকিছু পণ্ড হবে।

১৪

জলপরীদের কথা মনে থাকবার নয় মাতালুর, মনে ছিলও না। তার উপরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জলপরীদের বাসা ভেঙে যায়, তারা বাতাসে মিলিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তেমনি হয়েছে। জলপরীদের বাসা যেখানে ছিল সেখানে এখন বাঁধ তৈরি হয়েছে। সেই বাঁধের উপর দিয়ে সারাদিন ব্যস্তসমস্ত মিস্ত্রি-মজুররা যাওয়া-আসা করে। বিকেলে শহরের ভদ্রব্যক্তিরা বেড়াতে বেরোয়।

অপরিচিত লোককেও বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে দেখলে অনেকসময়ে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তার মুখের আদরা মনের উপরে রেখা ফেলে যায়। অনেকদিন পরে সেই ভঙ্গিতে কাউকে দেখলে পুরনো কোনো কথা মনে পড়ে যায়। এক্ষেত্রে তরল অজস্র হাসিটার সুর মাতালুর স্মৃতিকে সাহায্য করল। এত প্রচুর আনন্দ কি মানুষ করতে পারে?

মাতালু আর এক সন্ধ্যায় সেই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিল। নতুন ঘরগুলির কোনো কোনো বারান্দায় দু-একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের সেই হাস্যময়ী স্ত্রীলোকটিকে আজ দেখা গেল না, কিন্তু মাতালু বাড়িগুলোর সীমা পার হয়ে যাওয়ার আগেই আর একজন তাকে ডাকল হাতের ইশারায়। মাতালুর মনে হল এই স্ত্রীলোকটিকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিল।

সে এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকটির সম্মুখে দাঁড়াল। সাহায্য চায় নাকি?

'কী কন'?

স্ত্রীলোকটি কিছু বলল না, কেমন অদ্ভুত করে যেন হাসল। তার ভ্রূ দুটি যেন একটু ওঠানামা করল।

মাতালু বলল, 'কিছু কবার চান'?

স্ত্রীলোকটি পিছিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল এবং মাতালু ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা বন্ধ করে দিল।

কমলার বয়সের হিসাব কেউ স্নেহের দৃষ্টিতে যাচাই করে না। তা করলে লোকে বুঝতে পারত তার বয়স ত্রিশ পার হলেও চল্লিশের কাছাকাছি যায়নি, যে বয়সে স্ত্রীলোকেরা স্বামী-পুত্রাদি নিয়ে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে বিরাজ করে। বর্তমানের নিরিখে কমলার সেই বয়স যাতে গ্রাহকদের মধ্যে থেকে তরুণতররা সরে যেতে শুরু করে। তার শরীরে যৌবন থাকবার কথা নয়, কিন্তু তার গড়নে এক ধরনের স্থিতিশীল আকর্ষণ এখনও আছে যা স্থূলতার মধ্যে ডুবে যায়নি। গায়ের রং তো অত্যন্ত ফরসা, সেই হাস্যময়ী মেয়েটির তুলনায় তো বটেই। অসুখে ভুগে সে রক্তহীন হয়েছে, সেজন্যে তাকে প্রায় মোমের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। মুখে অবশ্য মেছেতার দাগ আছে। কিন্তু প্রচুর আর ফাঁপানো চুল।

ঘরের মধ্যে একখানিমাত্র বেতের চেয়ার। তাতে মাতালুকে বসিয়ে কমলা একটা ছোট আলমারি

থেকে সিগারেট দেশলাই এনে মাতালুর সামনে ধরল।

'না খাইম'।

মাতালু সিগারেট নিল না। কমলা তখন তার মুখোমুখি বিছানায় বসল।

'বাড়ি কোথায় আপনার'?

'দুখিয়ার কুঠি'।

আলাপ জমল না। কমলা উঠে গিয়ে ঘরের আলোটা একটু কমিয়ে দিল। বিছানায় বসে অদ্ভুত করে হাসল। একটা বালিশ কুড়িযে কোলে নিযে সেটাকে টিপে পিষে খেলা করতে লাগল। তারপর কী মনে করে বালিশ চারটের ওয়াড় খুলে ফেলল, বিছানার চাদর তুলে ফেলল। আলমারি থেকে নতুন ধোয়া চাদর বালিশের ওয়াড় বার করল।

মাতালু লক্ষ্য করল বালিশের ওয়াড় পরাতে বিছানার চাদর পাততে দুর্বলতায় কমলার হাত কাঁপছে।

মাতালু বলল, 'ছাড়ো, মুই ঠিক করি দ্যাঙ্'।

বালিশের ওয়াড় পরিয়ে, বিছানার চাদব পেতে আবার চেয়ারে গিয়ে বসল মাতালু। সে বলল, 'এলাও শরীর সাবে নাই দেখঙ্'।

কমলা যেন একটু বিস্মিতই হয়েছিল, সে সময-উপযোগী কথা খুঁজে পেল না।

কিন্তু মাতালু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা রাত হয়, মুই যাইম'।

এবার বিরক্ত বোধ হল কমলাব। সে বিরস মুখে বলল, 'তা হলেও টাকা দিতে হবে'।

'টাকা'? মাতালু পকেট হাতড়ে চার-পাঁচটা টাকা বার করে কমলার হাতে দিল।

মাতালু চলে যেতে না যেতেই কিন্তু কমলা বিমর্ষ হয়ে পড়ল। সে ভাবল রাগের মাথায় চূড়ান্ত ভুলই সে করে বসেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিনী শ্যামলী তিন-চারদিন আগে একজনকে রসিকতা করার জন্য পাঠিয়েছিল। অর্থ উপার্জনের অনেক আশ্বাস দেখিয়ে হাসি তামাসা করে শেষে সে কমলার বয়সেব দিকে ইঙ্গিত করে চলে গিয়েছিল। সেই মর্মান্তিক জ্বালা ভুলতে পারেনি কমলা। কিন্তু যে অত সহজে শুধু বসার জন্যই টাকা বার করে দেয় সে হয়তো শ্যামলীব পাঠানো কোনো অতি-ইতর রসিক নয়। কমলাব মনে হল সে ছুটে গিয়ে মাতালুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। একেই বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। আব কখনই কি মাতালু আসবে?

কমলা স্বভাবতই রূঢ়ভাষিণী নয়। কিছুদিন আগেও, তখনও বাঁধের জন্য উঠে আসতে হয়নি, শ্যামলী ও তার যৌথ সংসার ছিল। উপার্জন যারই হতো, যত স্বল্পই হোক, সুখস্বাচ্ছন্দ্য তারা ভাগাভাগি করে নিত। এখানে আসবার পব থেকেই দুজনের মধ্যে একটা প্রভেদ দেখা দিয়েছিল, ক্রমে তারা রান্নার ব্যাপারেও পৃথক বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এর জন্য কমলাই দায়ী, শ্যামলীর ভাষায় তাব ঢং। ব্যবসাই যদি কববে তবে আর বাছবিচার কেন? শুধু ভদ্রলোকই আসবে? এর আগেও কি তাই আসত? কমলা এসব যুক্তিকে অস্বীকাব করে না। সে চেষ্টাও করেছে। কিন্তু মিস্ত্রি ড্রাইভারদের সে কিছুতেই সহ্য কবতে পারেনি। শ্যামলী বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, সারাদিনের ঘর্মাক্ত গন্ধ যেন তাদের গায়ে লেগে থাকে। বিছানা সম্বন্ধে কমলা একটু পরিচ্ছন্ন, সেই বিছানায় বালিশে তেল কালির দাগ পড়ে যায়। আর এ বোধ হয় শ্যামলী কিছুতেই বুঝতে পারবে না। গ্রামবাসী কৃষকেরা যে শ্রদ্ধার ও বিস্ময়ের ভাব নিয়ে আসত, এই মিস্ত্রি ড্রাইভারদের তা নেই। এরা যেন ঊর্ধ্বশ্বাস ক্রূরতারই উপাসক। রূঢ়তা ও কর্কশতাই এদের কাম্য। সদর থেকে শ্যামলীর ঘরের ওপাশে এসে যারা বসেছে, কী করে ওরা শহর বৃদ্ধির সংবাদ পেল, কে ওদের আনল তাও বিস্ময়েব ব্যাপার, তাদের চেহারা ও রুচির সঙ্গেই বোধ হয় মিস্ত্রিদের মেলে। এইসব ভাবতে ভাবতে কমলা শুকিযে উঠছিল। তারপর তাকে ধরল জ্বর। উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল। কমলার

বসে বসে খাওয়া দেখে শ্যামলী চটে গিয়েছিল। কমলাও রাগের মাথায় তাকে দু'একটা কথা বলেছিল, তারপর থেকেই শুরু হল শ্যামলীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রকাশ্য শত্রুতা।

মাতালু চলে গেলে যত ভাবল কমলা, ততই সে হায় হায় করতে লাগল। মাতালুর ধীর-স্থির ভাব, তার বিছানা পেতে দেয়ার প্রস্তাবের মধ্যে একটু যেন স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধার ইঙ্গিত ছিল। তা থেকে কমলা বুঝতে পেরেছিল মাতালু এদিকের কোনো গ্রামের অধিবাসী এবং তার অর্থসঙ্গতিও আছে। কিন্তু আর কি আসবে? সে কি তার বয়সটা বুঝবে না?

কমলা নিজের বযসটাকে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করল না। নিজের বিশিষ্টতাটুকুকে শাণিত করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। চোখে কাজল দেয়া বন্ধ করল, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙালো না। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ধূপ দিতে লাগল আর যে সামান্য দু-একগাছা গহনা তার অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রি করে শয্যাটাকে আরো শুভ্র কবে তুলল। কিন্তু তার একথাও মনে ছিল যে বয়স চল্লিশের দিকে চলেছে। তার পক্ষে কমবয়সী কাউকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করা সম্ভব নয়।

চার-পাঁচ দিনের চেষ্টার পরে সে পথে বেরিয়ে মাতালুকে ধরতে পেরেছিল। রং-ঢং না করে পথের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাতালুব মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নীরবে কেঁদেছিল, কান্না চাপতে পান না খাওয়া পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। কান্নাটার ফল দেখে সেটা বারনাবীর অভিনয় বলেই মনে হয়, কিন্তু সেটা একেবারে নকল নয়। কারণ কমলার তখন মনে হচ্ছিল নিজের অসহাযতার কথা, শ্যামলীর বিদ্রূপের কথা।

কিন্তু বৃথাই সে দশ বছর ধরে ব্যবসা কবেনি। মাতালুকে যা ভেবেছিল ঠিক তাই সে। নতুবা কেউ বারনারীর ঘরে এসে তার চুল খুলে নিযে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে। এর ফলে অবশ্য কমলাকে আরো চুলের যত্ন নিতে হচ্ছে।

তারিখের হিসাবে সেটা মালতীর বিয়েব রাত্রি। আগের দিন মাতালু বলেছিল, সে আসতে পারবে না, তার বন্ধুর বিয়ে আছে।

—তোমার আবার বন্ধু আছে নাকি কেউ আমি ছাড়া। কমলা হাসি হাসি মুখে বলেছিল।

মাতালু বলেছিল—আছে, তার নাম মালতী; অনেক কষ্ট দিয়েছে নাকি সে।

কমলা মাতালুর জন্য প্রতীক্ষায় বসে নেই, কিন্তু কখন সে এসে পড়বে তার স্থিরতাও নেই। কাজেই সে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল। পাশের ঘরে দুপুরের পর থেকে যে বিচিত্র কোলাহল শুরু হয়েছে তা এখনও চলছে। কোলাহলকারী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়েছে নতুন নতুন গ্রাহক আসার সঙ্গে; কিন্তু মূঢ় ধ্বনিটা নানা কণ্ঠে যেন একইভাবে উৎসারিত হচ্ছে।

এমন সময়ে কমলার দরজায় কে মৃদু আঘাত করল। মাতালু মনে করে উঠে বসল সে। কিন্তু মাতালুই কি? এত রাত্রিতে কি সেই এসেছে?

কমলা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অচেনা প্যান্ট-কোট পরা এক ভদ্রব্যক্তি। কমলার মনে একটা দ্বিধা উপস্থিত হল। কিন্তু লোকটি বহু অভিজ্ঞ। সে দুখানা দশ টাকার নোট বার করে কমলার হাতে দিল এবং বিছানায় এসে বসে বলল, 'আমি একটু ঘুমাব শুধু'।

লোকটি সারারাতে ঘুমাল কি না সন্দেহ, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। বিছানার একপাশে শুয়ে কমলাও ঘুমাতে পারল না। লোকটাব চালচলনে তারও অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। চোর-ডাকাত নয় তো?

গিলটির গহনাগুলোকে সোনা মনে করে তার গলা টিপে না ধরে!

সোনার কথা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ঘোরে মনে পড়ছিল, মাতালু যে নাকফুলটা দিয়েছে সেটা সোনার, পাথরটাও নিশ্চয় খাঁটি। কিন্তু নাকফুল নিয়ে কে আর টানাটানি করবে। পাথরটার রংটা অবশ্য ভারি সুন্দর, পায়রার ডিমের মতো নীলের আভাস আছে তাতে।

লোকটা পাশ ফিরতেই তার কনুই-এর খোঁচা লাগল কমলার গায়ে। তন্দ্রাটা টুটে গেল তার।

কমলা তন্দ্রার ঘোরে যা ভাবছিল তা মনে পড়ল তার। দু-এক দিন আগে মাতালু কী একটা বলতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিল। কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারেনি, কিন্তু কমলা বুঝতে পেরেছিল তার অগোছালো বক্তব্যটার কোথায় সন্তান, ছেলেপুলে লুকিয়ে ছিল। মেয়েমানুষ সম্বন্ধে চিরকালের বিস্ময়।

কমলা আবার পাশ ফিরল ঘুমানোর জন্য। যেন রক্ষা করার অর্ধজাগ্রত একটা বৃত্তি থেকে তার একখানা হাত নাকফুলটার কাছে রইল।

সে ভাবল এমন অপরিচিত্ত ভিনদেশি লোক কোথা থেকে এল এই শহরে? টাকা দিয়েছে। কমলা জানত না অবশ্য ঠিক এমনি একটি ফুল আছে মালতীর নাকে। সেটা বেশি কথা নয়, পছন্দ করার সময়ে মাতালুও বুঝতে পাবেনি, দোকানি এটাকে দেখানো মাত্রই কেন তার মনে হয়েছিল—এটাকেই সে খুঁজছিল।

১৫

কথাটা বোধ হয় সিঁদুর। কপালে সিঁথিতে সিঁদুব, পায়ে আলতা। বাড়িটার দবজা-জানলার পর্দাগুলোয় লালের আভাস। মালতীর হাতে লাল শাঁখা। তাব সর্বাঙ্গের অজস্র নতুন গহনাগুলিতেও যেন লালের আভা।

অবাক লাগবার মতো কথা হলেও সত্যি বলে মনে হয়, কালো মেয়ে মালতীর গালে একটা লাল আভা দেখা দিয়েছে। এ দু'মাসে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

লখাই চক্রবর্তীর বাড়িটাই শুধু নতুন কায়দায় তৈরি নয়, সুপ্রচুর আসবাব ঘরে ঘরে। সেসবও আধুনিক ছাঁদে গড়া। মালতী সেসবের নাম জানে না, এমনকী লখাই চক্রবর্তীও না। সদর থেকে দু-তিনটে ট্রাকে বোঝাই হয়ে এসেছে সেগুলি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। সেগুলিকে ঠিক গুছিয়ে রাখা হয়নি।

বাড়িতে লোকজন নেই। ঝি থাকে একজন ভোর সকাল থেকে রাত আটটা-নটা অবধি। লখাই চক্রবর্তী চা-বিস্কুট-ডিমে প্রাতরাশ শেষ ক'রে বেরিয়ে যায়, দুপুরে ফিরে আহার ক'রে বিশ্রাম করে কিছুক্ষণ, তারপর আবার কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

ভোর সকালে উঠে স্নান ক'রে প্রাতরাশেব যোগাড় করে মালতী। লখাই বেরিয়ে গেলে নতুন রান্নাঘরে নতুন ঝকঝকে বাসনপত্র নিয়ে রিনিঠিনি চুড়ি বাজিয়ে রান্না করে সে।

অবসর সময়ে সে ঘরগুলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এতগুলো ঘর নিয়ে কী করবে সে খুঁজে পায় না, কিন্তু ঘরগুলোকে হাতছাড়া করতেও ইচ্ছা নেই তার। লাল রং করা ঝকঝকে মেঝে, সাদা ঝকঝকে দেয়াল। মালতী কোনো জানলার পর্দা ঠিক করে দেয়, কোনো টেবিলের ঢাকনা থেকে পালকের ঝাড়ন দিয়ে আলগা ধুলো ঝেড়ে ফেলে।

আর এ কী অদ্ভুত নেশা যা সকালের স্নানেও কাটে না। সারাদিন যেন তারই বিহ্বলতায় কেটে যায়। অন্ধ-করা, অন্ধ একটা উল্লাস। দেহ দেহ দেহ।

আর দুখিয়ার কুঠিতে যায়নি মালতী। লখাই তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না; ভাইরাও নিতে চায়নি। সেখানে গেলে নাকি তার পুরনো অসুখটা ফিরে আসতে পারে। মা বলেছেন আনতেই তো হবে—হয়নি এখনও কিছু, হবে তো। তখন আনলে হবে, বরং সময়ের অনেক আগেই আনা হবে।

বই পড়বে মালতী? অনেক বই এসেছে সদর থেকে। গ্রামোফোন চাই? সে তো আলমারিতেই আছে, আর আলমারির চাবির গোছা বাঁধা মালতীর আঁচলে। কত রকমের মদ আলমারিতে।

মদের কথা ভাবতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মালতীর একদিন মনে পড়ল মেজদাদা নেই। বাইরের দিকের একটা জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে, যেন দৃষ্টিটাকে বাইরে পাঠাতে চায়, ঠিক তখনই যেন অনিবার্যভাবে লখাইকে দেখা গেল। চোখাচোখি হল। দৃষ্টিটা ফিরে এল রঙিন স্বচ্ছ ছিটের পর্দায় ঘেরা ঘরের মধ্যে, বিছানায় অবশেষে। সে কাঁদতেই পারল না।

লখাই কনট্রাক্টর, সে ব্যবসাদারও। তার কুলিরা এখন শহরের মধ্যে দুটি প্রধান পথ বাঁধানোর কাজে ব্যস্ত। ব্রিজের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। আগামী মাসের প্রথম দিকেই ওপারের নতুন তৈরি রাস্তার সঙ্গে এপারের নতুন তৈরি সড়কের যোগাযোগ হবে। তারপর আরো অনেক নতুন তৈরি রাস্তার জন্য মিস্ত্রি-মজুররা নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে ছুটে চলবে। ওপারে প্রায় পনেরো মাইল পথের মাটি কাটার কনট্রাক্ট ইতিমধ্যে সে পেয়েছে। শহরের পথগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে। একসঙ্গে দেড়শো-দুশো মাইলের কনট্রাক্ট এরা কিছুতেই দেবে না। তা নাকি কোনো একজন কনট্রাক্টারকে দেয়া নিষেধ। তাহলে এই উদ্বেগ থাকত না লখাইয়ের। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে লখাই শুধু বলে—দেখা যাক। তারা তো জানে না লখাইয়ের শুধু দৃঢ় স্বাস্থ্যই নেই দেহে, তার এই চল্লিশ বৎসরের মনে আছে দুঃসাহস এবং অসীম উৎসাহ।

একদিন লখাই প্রাতরাশের পরে বেরুল না, তার বৈঠকখানায় একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে নিয়ে আগের দিন সন্ধ্যায় আসা বড় বড় দুটি প্যাকিং কেস খোলার বন্দোবস্ত করছিল। শব্দ পেয়ে ঝিকে জিজ্ঞাসা করেছিল মালতী, 'বাইরের ঘরে কে, তোমাদের বাবু'?

ঝি দেখে এসে বলেছিল তাই বটে। এবং কৌতূহল থেকে মালতী বৈঠকখানা ও অন্দরের মাঝখানের দরজায় ঝোলানো পর্দার এপারে দাঁড়িয়েছিল। লখাই আলতা রাঙানো দুখানা পা এবং শাড়ির আঁচলের খানিকটা দেখতে পেয়েছিল। সে উঠে এসে আদর করল স্ত্রীকে। তারপরে বলল, 'আজ বেরুব না, এসো না বাইরের ঘরে'।

'অন্য কেউ যেন আছে'।

'থাকলই বা। কর্মচারীরা জানবে না তাদের রানী কে'?

মালতী গিয়ে দেখেছিল বৈঠকখানার ঝকঝকে টেবিলে, ঝকঝকে মেঝেয় খড়ের কুচি জড়ানো নানা আকারের ঝকঝকে সব বোতল। মিস্ত্রি প্যাকিং বাক্স খুলছে আর লখাই নিজের হাতে সযত্নে বোতলগুলোকে বার করে সাজাচ্ছে আকার ও বর্ণ অনুসারে। মালতী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

বাক্স খোলা শেষ করে মিস্ত্রি চলে গেল। লখাই ততক্ষণে বোতলগুলো সাজিয়ে গুণে ফেলেছে, তারপরে সে কোঁচার খোঁট দিয়ে ঝাড়তে লাগল বোতলের গায়ের খড়ের কুচিগুলো। তা দেখে মালতীও এগিয়ে গেল এবং আঁচল দিয়ে ঝাড়া বোতলগুলো মুছতে লাগল। পরস্পরের সান্নিধ্য কাজটাকে একটা খেলার সামিল করে দিল।

একসময়ে মালতী বলল, 'কী এগুলো, ওষুধ? সেজন্য পরনের কাপড় দিয়েই...

লখাইয়ের চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। সে এক মুহূর্ত যেন কথাটাকে নিয়ে কীভাবে খেলা করা যায় তাই ভাবল।

'ভালোবাসা কাকে বলে জানো? এগুলো ভালোবাসার জিনিস'।

'ভালোবাসা'?

'কারো কারো কাছে স্ত্রীর চাইতে এর নেশা বেশি'।

'নেশা'?

'বিলেতি মদ। স্ত্রীর গহনা কেড়ে নিয়েও এই মদ কেনে লোকে'।

'সত্যি'?

মালতীর হাতে একটা বোতল ছিল। সে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল, যেন তার মধ্যে কোনো অদ্ভুত শক্তিকে সে দেখতে পাবে, একবার রাসের মেলায় তেলের বয়ামের মধ্যে যেমন পেল্লায় একটা মাকড়সা দেখেছিল। তার গা শিরশির করে উঠল এবং দৃশ্যতই সে কেঁপে উঠল।

সে বলল, 'কী হবে এত'?

তার সত্যিকারের প্রশ্নটা ছিল : তুমিও খাও নাকি?

লখাই মিটমিট করে হাসল, যে কথাটা যেভাবে উচ্চারিত হতে যাচ্ছে তার সমীচীনতাই যেন সে যাচাই করল মনে মনে।

সে বলল, 'শালাদের জন্যে এনেছি'।

মালতী চমকে উঠল। তারপরে নিঃশব্দে হাসবার চেষ্টা করল।

'তোমার ভাইরা নয়, তারা ছাড়াও আমার অনেক বাহানচোত শালাবা আছে'।

এ রকম ধরনের কথা এই প্রথম শুনল মালতী লখাইয়ের মুখে, বিব্রত বোধ করতে লাগল সে। এসব কি পুলিসের, নাকি পশ্চিমের গালাগালি? একদিন হাটে এক চোরকে ধবেছিল দাবোগা গদাধরপুরে। চোর কী তা দেখতে ছোট ছোট সমান-বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেও পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল। তখন দাবোগা এ রকম গালাগালি দিচ্ছিল। আর বড়দাদা বলেছিল—ঘবে আয়। দারোগার মুখ খারাপ করে। পক্ষান্তরে লখাই যেন একটা স্বাধীনতা পেল। বিয়ের আগে সে শুনেছিল মালতী অত্যন্ত মার্জিত রুচির মেয়ে। তার ফলে অত্যন্ত মেপে মেপে চলেছে সে এতদিন। কথায় ও ব্যবহারে একটা মার্জিত ভাব বজায় রেখেছিল। সেও একটা খেলা। বিয়ের আগে এই ঘরগুলোর মধ্যে লুঙ্গি পরে কত ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখন তার পরনে সবসময়ে ফরাসডাঙার ধুতি। ভালোই লাগে সদর শহরের দেখা যাত্রা নাটকের মতো। কিন্তু তাহলেও যেন তা কেমন আড়ষ্ট। এইমাত্র সে যেন সেই কৃত্রিমতার গুটি কেটে বেরুল এবং অনুভব করল মালতীর অসহ্য হল না তা। সে লোপ পেয়ে গেল না, তেমনি মেয়েছেলে হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। লখাই এরপরে তার স্বাভাবিক ভাষায় বকবক করতে লাগল। দোকানের কথা, এঞ্জিনিয়ার প্রমুখদের মদের বোতল ভেট দেওয়া কথা।

কথার মাঝখানে লখাই একটু আদরও করে নিল মালতীকে। মালতীর মনে হল এ কোনো অন্য জাতের লখাই, যার পারুষ্যকে ভয় করতে হয়। এবং যার প্রাবল্যে নতুনতর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। যেমন সকলেই বলেছে, এসবে সে মন থেকে সরে নীরোগ হবে।

লখাই নেশা করে না। অন্তত মালতী আজ পর্যন্ত তাকে মাতাল অবস্থায় দেখেনি। কিন্তু সে নেশার দোকানদার। আগে গাঁজা আফিম আর দিশি মদ ছিল—এখন থেকে বিলেতি মদও থাকবে। বিয়ের আগেই সে যা শুনেছিল তাতে আন্দাজ করতে পেরেছিল লখাইয়ের ব্যবসায়ের মধ্যে নেশার দোকানটাকেও ধরতে হবে—তারা নিজেরাও দোকানদার। দোকানে নানারকম পণ্য থাকতেই পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় অন্য ব্যাপার।

বোতলগুলোর মধ্যে একটির কথাই বিশেষ করে তার মনে আছে। সোনা যদি স্বচ্ছ হয় ঠিক তেমনি বোতলটা। কিন্তু শুধু একটাই নয়, প্রত্যেকটি বোতলই , কী সুন্দর গঠন, কী নিখুঁত সুন্দর ছাপা, কী পটুতা সেই ছবিগুলোতে যা বোতলেব গায়ে আঁকা ছিল, কী পরিপাটি করে মুখ আটকানো। মানুষ সভ্যতার ও কৃষ্টির পথে অনেকদূর এগিয়ে না গেলে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কিছু করতে পারে না।

কিন্তু নেশা! আকস্মিকভাবে সেই বেদনাটা জেগে উঠল : যে ব্যথা নিয়তই তাব নীরব অস্পষ্ট অনুভূতি দিয়ে তার হাসিকে করেছে অচপল, তার দৃষ্টিকে করেছে ধীর, যে মুহ্যমানতা থেকে উঠে পড়বার আগ্রহে লখাইকে সে কখনও কখনও আঁকড়ে ধরতে গিয়েছে। যেন লখাই-এর পাকাপোক্ত বড় শরীরের আড়ালে গেলে ভয় কমে।

ফিট আর তার হবে না। সে বর্ষীয়সীদের আলাপ থেকে এটা বুঝতে পেরেছে লখাই-এর স্পর্শই নাকি তার সে ব্যাধি নিরাময় করে দিয়েছে।

অবাক কথা! কিন্তু মেজদাদা? মেজদাদা। মালতী ছটফট করে উঠে দাঁড়াল। যেন সে কোথাও যেতে চায়। সংসারজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধি তাকে বাধা দিল। সে জানলার গোড়ার গিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে পাঠাল কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয়, বাইরে। তার মনে হতে লাগল হয়তো তার ফিট হবে, এখনই হবে। যেহেতু সেটাও একটা ব্যাধি, সেটা লখাই-এর মনে ঘৃণা এনে দিতে পারে। তাকে সামলে চলতে হয় না?

এ মনোভাব থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে কখনও কখনও সফল হতো সে, কিন্তু অন্য কোনো কোনো সময়ে এটাই তাকে আচ্ছন্ন করে দিত। বিশেষ করে লখাই আজকাল কখনও কখনও প্রাতরাশের পরে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন অনুপস্থিত থেকে রাত্রিতে ফিরে আসে। দীর্ঘ দিন একা একা উঠে-বসে দিন যায় মালতীর।

সেই একদিন হঠাৎ গ্রাম্য স্বাভাবিক সুরে কথা বলে ফেলার পর থেকে লখাই যেমন তার স্বাভাবিক ভাষায় ও চালচলনে ফিরে আসছে ক্রমশ, মালতীর ক্ষেত্রেও যেন তেমনি হল। লখাই যেমন চেষ্টা করে মার্জিত রূপটা তুলে ধরেছিল, মালতীও তেমনি তখন উলটো কিছু করেছিল। আচরণের দিক দিয়ে স্বভাবতই মালতী মার্জিত ছিল। মালতীর ক্ষেত্রে সেটা আত্মবিস্মৃতা হবার চেষ্টা যেন ছিল, ছিল লখাইকে সুখী করার প্রয়াস, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা শরীরের নতুন একটা অবস্থায়। মালতীও যেন কিছুটা স্বভাবে ফিরে আসছে। তার ফলেই সে তার এই নতুন বাড়িতে মেজদাদার বই আর গ্রামোফোন, মেজদাদার সেই ক্যানভাসের চেয়ারটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু নেশা। মেজদাদা নেশা করত। ওষুধ নয়, নেশা। একটা বিদ্রূপের মতোই শোনায়। আফিম খাওয়ার অর্ধসভ্য নেশা না করে মরফিয়া নিত ইনজেকশনে। মৃত্যুর পর এসবই প্রকাশ পেয়েছে। তার মৃত্যু সম্বন্ধে লোকে কানাকানি করছে আত্মহত্যা নয় সেটা, অত্যধিক নেশা করার ফল। মালতী জানে মেজদাদা এই নেশায় জড়িয়ে পড়ে কী আত্মগ্লানিই না ভোগ করেছে, যন্ত্রণায় বিবশ দিন কেটেছে তার। চোখ বেয়ে টসটস করে জল পড়ত যদি মালতীর হয়তো খানিকটা সুস্থ হতে পারত সে। কিন্তু কান্নার উৎসও রোধ করে দেয়ার মতো যেন একটা বিপরীত প্রবৃত্তিও জেগে ওঠে মনে। মেজদাদাকে সবটুকু শ্রদ্ধা করতে সে পারে না, যাকে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আদর্শের আসনে বসিয়েছিল, তার জন্য শোক করতে গিয়েও ছি ছি করে ওঠে মনের এক অংশ। আচ্ছা, মেজদাদা, নেশাই যদি করবে তবে তা প্রচুর পরিমাণে আনিয়ে রাখলেই পারতে, কেন আমাকে মাতালুর কাছে যেতে বলতে! তুমি কি বুঝতে না, কেন সে আমার কথা শুনত! ওভারসিয়ারকে মাতালুরা নীচ শত্রুর মতো দেখত। তার কাছেই তাকে যেতে হয়েছে নেশা আনতে। আরো মুখ নিচু করতে হয় না? তুমি কি বুঝতে না তার উপরে কেন আমার জোর খাটে? আমি তার সামনে একটা নীরব প্রতিশ্রুতির মতোই দাঁড়াতাম। অথচ মেজদাদা নেই, এ ভাবতেও বুক ফেটে যায়। এ রকম সময়ে মালতী জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। যেন কাউকে দেখবে বা খুঁজবে।

একদিন ঠিক এ রকম মন নিয়ে যখন সে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেখতে পেল মাতালু যাচ্ছে তার বাড়ির সামনের পথ দিয়ে। তখন বিকেল। মাতালু যেভাবে চলছে তাতে ঠিক জানলার নিচে দিয়েই তার যাবার কথা। পর্দাটাও যেন না দুলে ওঠে এমনিভাবে নিঃশব্দে নিঃসাড়ে সরে এল

মালতী। কিন্তু এরপরে দু-একটা বিকেলে মাতালুকে যেতে দেখল মালতী সেই পথেই। সময়ের দিক দিয়ে কিছু আগে-পরে, কিন্তু রাস্তাটার যে পাবে মালতীর বাড়ি সে পার ঘেঁষেই সে চলে। যেন সেটাই তার অভ্যাস।

দু-এক সপ্তাহের মধ্যে মালতী সে জানলায় যায়নি। মাতালু তার অভ্যাস বদলেছে কি না কে জানে। লখাই-এর অভ্যাস বদলেছে। ব্রিজের ওপারের কাজ দেখাশোনা করার জন্য রোজ রোজ বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করা তার সম্ভব নয়। তাঁবু পড়েছে সেখানে। কোনো কোনো রাত্রিতে বাড়িতে না ফিরে সেখানেই থাকে সে।

এমনি একটি রাত্রিতে ঘুম আসছিল না মালতীর। ওদিকের একটা ঘরে ঝি ঘুমে অচেতন এরই মধ্যে। দূরে বৈঠকখানার বারান্দায় একজন চাকর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

বই হাতে খানিকটা সময় বসে-শুয়ে কাটিয়ে মালতী রাস্তার ধারের জানলার গিয়ে দাঁড়াল। কী ভাগ্য তার! সভ্যতার সবটুকুই বিষ নয়, অথচ তার ভাগ্যে 'সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল গরল দিয়ে। সে গরলে বুক জ্বলে জ্বলে ওঠে। কোনোদিনই কি মেজদাদাকে ভোলা যাবে!

মাতালু? মাতালু নাকি? বারে, মাতালু। বেশ দেখায় তো তোমাকে ড্রাইভারদের মতো প্যান্টের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে-দেয়া সার্ট পরলে। এত রাত্রিতে এদিকে কেনই-বা এসেছ? কথাগুলো মনের নিভৃতে উচ্চারণ করে সরে যেতে গিয়ে পর্দাটা দুলে উঠল, জানলার ব্যাংটাতে খট্ করে শব্দ হল। পর্দার গায়ে চোখ লাগিয়ে মালতী দেখতে পেল মাতালু শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মুখ তুলে চেয়ে, বোধ হয় কিছু বুঝতে না পেরে চলে গেল।

সেদিন লখাই বিকেলে এসেছিল। বলে গেছে দুদিন ফিরতে পারবে না। মালতীর মনে হল সে বলে—একা একা থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু সেটা যেন হ্যাংলামির মতো শোনাবে, এই ভাবল সে। সে বলল, 'শরীবের অযত্ন কোরো না'।

আজও ঘুম হল না মালতীর। পায়ে পায়ে সে একবার বৈঠকখানায় গিয়েছিল। সেখান থেকে সবগুলি বোতল এখন সরে যায়নি। সেই অদ্ভুত অনুভূতির স্মৃতি এল মালতীর মনে, আরকে ভিজিয়ে-রাখা রাক্ষুসে মাকড়সার কথা মনে হয়েছিল তার আর একদিন। একটা মোহের মতো কিছু যেন বিকিরণ করতে পারে সেই বোতলগুলি। দেখতে দেখতে মালতী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেখান থেকে সরে এসে মালতীর মনে হল কী একটা যেন গলতি আছে তার জীবনে যেজন্য তার হৃদয়ের একটা অংশ কিছুতেই পূর্ণ হয় না। মেজদাদার কথা মনে হল না, কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট বিষাদ হৃদয়ের সেই ফাঁকা জায়গাটায় থেকে থেকে সে অনুভব করতে লাগল সেই মাঝরাতে।

রাস্তার দিকের সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। এত রাতে পথিকদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কে একজন তবু আসছে, চটির ফটফট শব্দ হচ্ছে। পর্দা আর জানলার ব্যবধানে একটা চোখ রেখে সে দেখল মাতালু আসছে। মাতালু!

যেন এটা ভাগ্য, এই দেখা হওয়া। যেন আজ সারাদিন ধরে তিলে তিলে সে এদিকেই এগিয়েছে। এ রকম অনুভব করতে করতে মালতী পর্দাটা একপাশ থেকে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে গরাদের উপর মাথাটা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'মাতালু'।

'মালতী? ঘুমাও নাই'।

'না। তুমি, তুমি কোটে যাও?'

'দুখিয়ার কুঠি'।

মালতী কী যেন বলতে গেল কিন্তু আকস্মিক একটা দমকা হাসিতে কথাটা তলিয়ে গেল। তারপরই অবশ্য সে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল।

মাতালু বিস্মিত হয়ে বলল, 'হাসো'!

'এসো না, গল্প করং। বিয়ের দিন কেনে তুমি যাওনি? ভেবেছিলাম বলি আইসং, রাগ না করো'।

মাতালু অবাক হয়ে চেয়ে রইল মালতীর দিকে। শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে নয় শরীরেরও পরিবর্তন হয়েছে মালতীর। গায়ের রং আগের চাইতে পরিষ্কার হয়েছে, গঠনও যেন পরিপূর্ণ হয়েছে। মাতালু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মালতী বলল, 'অনেকদিন থাকি ভাবং তোমার সঙ্গে বসে খানিকটা গল্প করং। আচ্ছা দাঁড়াও'।

রাস্তার দিকে ঘরের একটা দবজা ছিল, তার গোড়ায় সিঁড়ি ছিল না। এ ঘরে বাস কবছে মালতী, কিন্তু সেই দরজা আজ এই প্রথম খুলল।

'এসো'।

অবাক কবা এই অভিজ্ঞতা। মূর্ছার আক্রমণের মতো একটা অন্ধ আগ্রহই তাকে পর্দা সরিযে দিতে ইঙ্গিত কবেছিল। সান্নিধ্যের বাস্তববোধে সে মোহ কিছুটা টুটে যাওয়ার মতো হল পদশব্দে যেমন নির্জনতা টুটে যায়। কিন্তু এ যেন খেলার মতো কিছু কিংবা ঘরের বাইরে হঠাৎ পা দিয়ে পথের বিস্ময়ের টানে টানে আরো বিস্ময়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

মাতালুকে একটা চেয়ারে বসতে বলে মালতী ড্রেসিং-টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কী বলবে সে খুঁজে পেল না। একটা অপরিণামদর্শী বাস্তবজ্ঞান তাকে ঘরের মৃদু আলোটার দিকে ঠেলে দিল। আলোটা নিভিয়ে দিল সে। যে চাঁদেব আলোয় জানলার বাইরের মাতালুকে সে চিনতে পেরেছিল সে আলোটাতেই অস্পষ্টভাবে মাতালুকে দেখা যাচ্ছে।

'আমি বড় বোকা, মাতালু, আলোটা নিভিয়ে দিলাম। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, দুখিযার কুঠিতে'? মালতী খিলখিল করে হেসে উঠেই মুখে আঁচল চাপা দিল।

'হ্যাঁ'।

'ভালো। আচ্ছা, মাতালু, একটা কথা সত্যি কবে বলবে—তুমি আমার সব কথা শুনতে কেন? ভালোবাসতে'?

'মালতী'। মাতালুর বুক ওঠাপড়া করছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! মনের মধ্যে যেমন কখনও কখনও আলো পড়েছে বলে মনে হয়, অন্য কখনও যেমন সেখানে অন্ধকার অনুভব হয়, মালতীর মনেব মধ্যে আজ যেন একটা তেমনি ম্লান আলোকের হট্টগোলের সভা। সেখানে কে যেন খুব জোরে বলছে—সতী, সতী। কী বিরক্তিকব! কী অন্যায় সে করছে? এই ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক বেপরোয়া সাহস জেগে উঠে লাগল মালতীর মনে। যেন তা মাতালুর প্রেমের তীব্রতাকে যাচাই করে দেখবে।

রাস্তা দিয়ে দারুণ শব্দ করে একটা ট্রাক গেল। যেন ধরা পড়ে গেছে এমনিভাবে চমকে উঠল মালতী।

আবার একটা দুর্বার হাসির মতো কিছু উঠে আসছে এই অনুভব করল মালতী, কিন্তু সে সামলেও নিল নিজেকে। মাতালুর সামনে এসে দাঁড়াল সে, ফিসফিস করে বলল, 'তোমরা সব পুরুষরাই এত মিথ্যা বলো কেন? মেজদাদাও মিথ্যা বলত, আর জানো মেজদাদা শেষ নেশা করেছিল আফিম দিয়ে। মরফিয়া তো সভ্যতার জিনিস, এ গ্রাম্য শহরে পাওয়া যায় না। আর সে-আফিম সে কিনেছিল আমার স্বামীর দোকান থেকে। কিন্তু তোমরা এত মিথ্যা বলো কেন'?

মাতালু কিছু না বলে মালতীর কাঁধের উপরে একটা হাত রাখল। সহসা যেন মনে মনে ভেঙে পড়ল মালতী। সব কথা হারিয়ে সে মনে মনে কেঁদে যেতে লাগল: ওরে, ওরে মাতালু!

আর বহুদিন পরে, তার মেজদাদার মৃত্যুর পরে এই যেন প্রথম দুর্বার অশ্রু নামল তার গাল

বেয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মাতালু। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি দুয়ার দাও মালতী, মুই যাইম এলা'।

মালতীও উঠে দাঁড়াল।

মাতালু রাস্তায় নেমে দাঁড়ালে মালতী বলল, 'মাতালু, আবার কখনও যদি সুযোগ হয় দেখা কোরো আমার সঙ্গে। কিংবা যখন খুশি তখনই এসো। এসো, কেমন? এসো কিন্তু। এসো'।

মালতী দরজা বন্ধ করে এসে আলো জ্বালল। চোখে-মুখে জল দিল। মশারি ফেলে শুতে গিয়ে পাশের জোড়া বালিশে চোখ পড়ল। দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল রাত।

১৬

ঠিক সাতদিন হল। মাতালু আসেনি। একটু চিন্তা করতে হল কমলাকে। অসুখ-বিসুখ করল নাকি? সে জানতে পেরেছে দুখিয়ার কুঠিতে মাতালু ধনীর বাড়ি, কিন্তু খবর নেবার কোনো উপায় নেই। খবর নিলে উলটো ফল হতে পারে, কলঙ্ক কেলেঙ্কারির রটনা হবে। মাতালু হয়তো আর এ পথে কোনোদিনই আসবে না।

মাতালু সম্বন্ধে কমলাকে ভাবতে হচ্ছে। মাতালু রোজ আসে না। এলে সন্ধ্যাতেই আসে। অন্যান্যদের মতো মাঝরাতের গোপন ভিড়ে আসে না। গত দশ বছরে শহরের স্থায়ী ভদ্রলোকদের কয়েকজনকে কমলা চিনেছে। কেউ কালো, কেউ ফরসা, কেউ ফ্যাকাশে, কারো বাবরি চুল, কারো টাক পড়েছে, কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ চিমশে। এরা পুলিসে, কিংবা নায়েব-আহিলকারের দপ্তরে, কিংবা হয়তো মোক্তার। এই শহরে অনেকেরই স্ত্রী নিয়ে থাকার মতো বন্দোবস্ত নেই। সেই সারি সারি সরে সরে যাওয়া লোকগুলোর মধ্যে মাতালু আলাদা। কথাটা কি কম বয়স? কিংবা সেটা কি মাতালুর কৃতজ্ঞতা! ভালোবাসার কথা বলে না, এমন কেউ আসে না। মাতালু তা বলে না। হাসে, বসে, গল্প করে, চুল খুলতে বলে। বিশেষ বিশেষ সন্ধ্যায় মুখ নিচু করে বলে, দয়া করার কথা। সে জানে অন্যেরা আসে। সে থাকতে থাকতে অন্য কেউ না এলেই হল।

কিছুদিন আগে মাতালু তার অতীত সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিল। কমলা বলেছিল: বাজারের ঠোঙায় অনেকসময়ে কোনো বইয়ের একখানা পাতা দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে বইটার প্রথম বা শেষ কিছুই বোঝা যায় না। আমাদের জীবনও তেমনি।

মাতালু তার বক্তব্যটাকে ধরতে পারল, কিন্তু তার কৌতূহলের নিরসন হল না। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে তার মুখের ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে। বলেছিল, 'কমলা, শেষে তুমি কোথায় যাবে? আমার টে থাকি যাইবে'?

'এই তো আছি'।

'নোয়ায়, কং যেলা চুল পাকি যাইবে সেলাও থাকি যাইবে'।

কমলা কি হাসবে? বলবে নাকি, তোমার বউ এসে ঝাঁটা পিটবে!

মাতালু বলেছিল, 'নয়তো পাঁচ বিঘা জমি নেও। চাষ করো, রোয়া গাড়ো। নয়তো, মুই চাষ করি দেং। নয়তো দশ বিঘার আধিয়ার হয়্যা যাও। মুই চাষ করি দেং, রোয়া গাড়ি দেং, অর্ধেক ফসল তোমার। ষাঁড়, লাঙল, বীজ সবই মোর। আর আমনক্ষেতে জল জমি গেইলে দোনো জনা মিলি সকাল থাকি রাত তক রোয়া গাড়িম্ পাশাপাশি থাকিয়া'।

মাতালু তার চাইতে বছর পনেরো ছোট হবে, এগুলো ছেলেমানুষি কথা নয়?

এসব ধরনের আলাপে একটা অসুবিধা আছে। কারণ নানা রকম লোকের নানা ধরনের কথায় সায় দেওয়া নয় এটা। মাতালুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলে বোঝা যায় সেই শান্ত দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের আশ্বাস আছে। এরই ফলে অনেকসময় কমলাকে ভাবতে হয়।

কমলার জীবনকে যদি একটা তথ্য হিসাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় তবে তার থেকে এই অনুমান হবে—পুরুষকে বাঁধতে পারে সমাজের শাসন, প্রেম নয়। অথচ তারাই সমাজের বাইরে বনারণ্যে প্রেমকে নিয়ে কুটির তুলবার প্রলোভন দেখায়। তারা নিজেরাই বোধ হয় নিজের স্বরূপ জানে না, নিজেরাও সেই বনে যাওয়ার গল্পে প্রলুব্ধ হয়।

গদাধরপুর তখন ছিল সমাজের বাইরে, ঠিক বনারণ্য নয় : বন এবং শহরের প্রান্তে কতকটা শাসনহীন দেশ। কারো মুখে চেয়েই বালবিধবা কমলা এখন থেকে প্রায় দশ বছর আগে গদাধরপুরে এসেছিল। একদা সমাজের শাসন পুলিসের চাইতেও তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের সেই কুটিরে আবিষ্কার করেছিল। সমাজের শাসন এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক কোনো পার্শ্বচরের মতো হঠাৎ আক্রমণ করেছিল, কারণ শাসনটা কমলা এবং সেই পুরুষটির মনের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে সুযোগ খুঁজছিল। সেই পুরুষটির স্ত্রী-পুত্রাদি ছিল সদরের শহরে। তারা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠার আশ্বাস, তাদের নিঃশব্দ শাসন একদিন পুরুষটিকে বিচলিত করে তুলল। আর কমলাও মনে মনে স্বীকার করল, বিধবা সে, বয়স যতই কম হোক তার, এবং সে এক্ষেত্রে বিবাহিতা নয়। সাধারণ মেয়ে কমলা— প্রতিভাবানদের মতো নির্মম নিঃশঙ্ক হতে পারল না। বদলির হুকুম হয়েছিল পুরুষটির। কমলার পাশে শুয়ে সে ছটফট করছিল, যেন সে ডুকবে কেঁদে উঠবে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবে। কমলা বলেছিল—তুমি ফিরে যাও সদরে, আমার জন্যে ভেবো না। আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি না।

পুরুষটি চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কী কববে কমলা? কুলত্যাগিনী বিধবা সে, যদিও তখন সে পঁচিশ-ছাব্বিশের অবুঝ একটা মেয়ে বই কিছু নয়। আর সে একাও নয় যে গদাধরের জলে সমস্যাগুলোকে ডুবিয়ে দেয়। সতীনেব মেয়েকে সে বিয়ের রাতে বুকে করে নিয়েছিল ; তাকে নামাতে পারেনি বুক থেকে। সেই কুলত্যাগ করার রাত্রিতে ঘুমিয়েছিল সতীনের মেয়ে তার বুকের কাছে। রুগ্না জননীর সন্তান, রাত্রিতে উঠে তার খাওয়ার অভ্যাস। খাওয়ার সময় হয়েছিল তার, থেকে থেকে কেঁদে উঠেছিল ঘুমের ঘোরে। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষটি। মেয়েটির একখানা হাত ছিল কমলার গায়ের উপরে, কোমল রুগ্ন হাত। তাকে ফেলে পালিয়ে আসতে পারেনি কমলা। আর পুরুষটি, সেই প্রথম, রানী-টানি বলে আদর করেছিল কমলাকে। মেয়েটিকেও আদর করেছিল। এমনকী এখানে এসেও বলেছিল—কমলা তোমার কোলে এই মেয়ে আছে বলেই তোমাকে এত ভালো লাগে।

সেই মেয়ে শ্যামলী। এখনও সে কমলার বুকের কাঁটা। তার কুৎসিত তিরস্কার ও কুৎসিত পরিহাসে অনেক জল পড়ে কমলার চোখ থেকে। তবু তার ঘরে কেউ রাগের সুরে কথা বললে, মাতালের মতো চেঁচামেচি করলে তার অমঙ্গলের আশঙ্কায় এখনও কমলা ঘর-বার করে।

কোনো অভিযোগ আর নেই কমলার। প্লাবনে ঘর ভেঙে গেলে যে মানুষ নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে সে কি স্রোতের বিশ্লেষণ ক'রে সমালোচনা করে? নাকানিচোবানি খেয়ে তার প্রাণ আইঢাই করছে যখন, তখন বাঁচবার একটা অন্ধ চেষ্টা ক্লান্তদেহকে আর ক্লান্ত না করার একটা অবসন্ন ইচ্ছার সঙ্গে মিশে গিয়ে তার ভূত-ভবিষ্যৎকে একটি সংকীর্ণ বর্তমানে ধরে রাখে। কী করবে কমলা সভ্যতার এই অগাধ স্রোতস্বান আবর্তে! দ্বিতীয়বার সেটেলমেন্ট হওয়ার সময়ে সদর থেকে একটা সভ্যতার প্লাবন জোয়ারের মতো এ অঞ্চলে এসেছিল। সে জল নেমে গেছে। ভেসে আসা ফুলও জোয়ার নামা কাদায় পড়ে থাকলে আবর্জনার মতো দেখায়। কমলাও তেমনি আছে। আর মাতালু?

সে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু বোঝা যায় তার সমাজের ভয় নেই। হয়তো ভয় দেখানোর মতো সমাজই নেই তাদের। কিন্তু সেখানে গেলে কি একটা বনে কিংবা কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়ার মতো হয়?

১৭

এমনি নিজের ভূত-ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিল আরো দুজন। ডাঙ্গরআই এবং লখাই চক্রবর্তী।

এই আট বিঘা জমির ধান প্রায়ই বিক্রি করা হয় না। বিশেষ বিশেষ দিনে হয়তো খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়, কিন্তু বীজ হিসাবেই রাখা থাকে। বীজ হিসাবে, খুব ধরাধরি করলে, দু-পাঁচ সের বিক্রি করে ডাঙ্গরআই। এক বাড়িতে রান্না হতে থাকলে পাঁচ বাড়ি দূরে জানান দেয়। এর ঘিভাতে এলাচ দাবচিনি বাদ দেয়া ভালো। এ রকম কথা আছে, শুধু বীজে হয় না, তা হলে তো আই-এর অন্য সব জমিতে এই দামের ধান হতো।

এটা বিজ্ঞানসম্মত কি না তা এদিকের কেইবা জানে? গদাধরপুরে নায়েব-আহিলকার আর এঞ্জিনিয়ার যেমন একবার আলোচনা করেছিল। নায়েব-আহিলকার বলেছিল, এসব বোধ হয় বিজ্ঞানের কথা নয়, আর্টের কথা। এঞ্জিনিয়ার বলেছিল—এ রকমও হতে পারে বিজ্ঞান পুরনো হয়ে গেলে আর্ট হয়।

জমিটায় পুরো এক হাত জল। সেই জলে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে শুরু করে এইমাত্র সারিবাঁধা দলটা উত্তর দিকের আলিতে উঠে এল। চারজন নানা বয়সের স্ত্রীলোক, দুজন অল্পবয়সী ছোকরা। স্ত্রীলোকদের দুজনের পরে আই অথবা কুমরী। স্ত্রীলোকদের পরনে হাঁটু ঝুলের গাছকোমর কবে পরা শাড়ি, কাঁধ থেকে দুই বাহুই নিরাবরণ। ছোকরা দুটির পরনে চওড়া গামছা কৌপিনের মতো পরা, যার সামনের দিকের প্রান্তটা হাঁটুর একটু উপরে শেষ হয়েছে।

সূর্য উঠলে পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে উত্তর-দক্ষিণে সারি করে বোয়া গাড়তে গাড়তে পূর্বদিকে নামছিল তারা, নিজের ছায়া জলের উপরে নিজের দু'হাতের দু'পায়ের মধ্যে এসে গেলে এ বেলার মতো তারা জল থেকে আলিতে উঠল। একশো গজ দূরের ছোট ঝোরাটায় বেশ পরিষ্কার জল। সেখানে স্নান করে নিয়ে—কাদা তো শুধু হাঁটু আর কনুই পর্যন্তই নয়, গালে, মাথাতেও।

কুমরী আই-এর বয়স কয়েক সাল আগে চল্লিশ পার হয়েছে। তাব পরনের সাদা মলমল হাঁটু পর্যন্ত, কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত অনাবৃত রেখে গাছকোমরে জড়ানো। তার গায়ের রং এখন তত সাদা নয় যতটা হলুদ। ভরা ভরা মুখে ছোট নাক, অনেকটা লম্বাই কিন্তু সরু চোখ। হাত আর পা দু'খানা অসাধারণ সুন্দর গড়নের, আঙুলের গাঁটগুলোই চোখে পড়তে চায় না।

আই মাতালুর কথা ভাবল। কথা ছিল এ ক্ষেতটার রোয়ার জন্য মাতালু নামবে আজ। ফিরেছে রাত ভোর করে তার বন্ধু কাঁকরুকে নিয়ে। সঙ্গে কষ থেকে আঙুল দু-এক করে দাঁত বেরিয়ে আছে এ রকম এক বরা নিয়ে। দুজনের বুকে পিঠে সেই বরার রক্ত, কাঁধে করে অত বড় জানোয়ারের শরীর বয়ে আনলে যা হয়। এখন বোঝা যাচ্ছে শহরে না গিয়ে বনে গিয়েছিল। দুজনের হাতের ফালা বল্লমই প্রমাণ করে বনে যাওয়ারই বুদ্ধি ছিল, দুখিয়ার কুঠির এ অঞ্চলটার সব বাড়িতেই এবেলা মাংসের ভোজ।

ঝোরায় স্নান করতে নেমে, স্নান করে উঠে নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে আই ভাবল, মাতালু এখন বড় হয়েছে।

মাতালুকে নিয়ে কোনো চিন্তাই ছিল না আই-এর। যখন সে শিশু ছিল তখন ফুলমতী ছিল

পাশে। ছেলেকে মাটি ছুঁতে দিতে চায়নি। একটু বড় হলে রংবর আর তার ছেলে ফুলবর সবসময়ে দু'পাশে থেকে আগলে রেখেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের জমি জিরাতের দিকে নজর না রেখে আই-এর জমিজমার রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে নিজের স্বাতন্ত্র্যই ভুলে গেছে রংবর-এর পরিবার। আই-এর খামারের চাষ-আবাদেব সঙ্গে চাষ হয় তাদের জমির। ফসলও ওঠে একসঙ্গে।

শরতের দুপুরের মতো কবোষ্ণ, তেমনি ধানের আশ্বাসে ভরা দিন সব। মাতালু স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠেছে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ধানের জমি আছে। সে বেহিসেবি নয়, বদমেজাজি নয়। আই-এর চোখে এর চাইতে ভালো আর কোনো অবস্থার কামনা নেই।

মালতীর ব্যাপার নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা করতে হবে এ রকম আশঙ্কা হয়েছিল একসময়ে। ছেলের চোখে মুখে অশান্তির ছাপ কখনও কখনও দেখা যেত। ফুলমতীব চোখে মালতী একেবারে মূল্যহীন। আই ঠিক তেমনটা ভাবতে পারেনি। তার মনে হতো, অন্য সব ব্যাপাবে ছেলেকে সাহায্য করার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু মালতীর হৃদয় পরিবর্তন করার বিষয়ে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু শান্তিকে বিঘ্নিত কবার মতো ব্যাপার ঘটালো বাজপথেব অগ্রগতি। মাতালু বাগে আর উত্তেজনায় যেন পুড়ে যেতে লাগল। আই-এর তখন মনে হতো রাজধানীর লোকদের একটা কৌতুকের অভ্যাস আছে : মনে করো অনেকগুলো লোক একই দিকে অনেকক্ষণ ধরে চলেছে, হঠাৎ তাদের একজন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল, যে পথে চলছিল সে পথ ছেড়ে অন্যদিকে ঝুঁকল। তারপর সেই নতুন পথেই আ'বার অনেকে চলতে শুরু করল। তেমনি একটা নতুন ধরনের ঝোঁক এসেছে রাজধানীর লোকদের মাথায়, তারই ফলে কালো-নদীর মতো এই এক সড়ক। গদাধরপুরের ব্রিজের কথাও শুনেছে আই।

সেগুন গাছের সারিটা বছর দশেকের হল। মাতালু ছাড়া বাড়ির উঠানে কে সেগুন লাগায়! এখনই অর্ধেক উঠানে ছায়া ফেলে। ওই সারির পিছনেই সুনরীর ঘর। বিধবা সুনরীর একটি মেয়ে ছিল। বিঘা দুয়েক জমি ছিল। আই-এর বাড়িতে ঘরে বাইরে কাজ করে সুনরীর দিন চলত। সুনরীর বয়স পঁয়তাল্লিশ তো হলই। ফুলবরের চাইতে দশ বছরের বড় হবে। সুনরী এখন ফুলবরের স্ত্রী বলে পরিচিত। এটা অবশ্য বিবাহের স্ত্রী হওয়া নয়। তত গরিব ফুলবর কন্যা পাবে কোথায়? ধান সিদ্ধ করার সবচাইতে বড় কড়াই-এ রান্না করছে সুনরী আর ফুলবর। ফুলবর একবার উঠে গিয়ে মাতালুর কাঁধে আর ডান বাহুতে হাত বুলালো। যেন যে হাতে ধরা বল্লমে বরাটা শিকার হয়েছে তার তারিফ করল।

আই কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢুকল।

তখন মালতীর বিয়ের কথা চলছে। মাতালুর মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখতে পেত আই। রোজ সেসব কথা মনে জাগে না, গভীর বেদনা অনুভব করে তেমনি সব চিন্তার দিকেই আই মুখ ফিরিয়ে বসত তখন। অদ্ভুত মানুষ এই ভাটিয়ারা। মালতীর প্রতি মাতালুর এই ভালোবাসার কোনো পরিণতি নেই, পরিণতির পথে বাধা হবে ভাটিয়াদের জাতি-অভিমান। ভাষা পেতে থাকলে আই-এর অনুভবগুলি এ রকম হতো : কোনো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না অথচ অভিমানটা আছেই। নানা উপাদানে গঠিত সেটা; রূপের মিথ্যা বড়াই, জ্ঞানের বৃথা দম্ভ, ধর্মের বিকৃত ভান, এমনি আরো কত। কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও অস্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে আই-এর। আসল কথা এই : কোনো একদিন কোনো এক বড় যুদ্ধে বিজয়ী ভাটিয়ারা শক্তির এমন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে বাধা দেয়ার কথা আর চিন্তা করেনি আদিবাসীরা। তারা পালিয়েছিল। ভাটিয়াদের রক্তে এখন আর সেই শক্তি নেই, কিন্তু নির্মমভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা জন্মেছে। যার

ফলে বুঝে না-বুঝে তারা নির্দয় ব্যবহার করে। আর সেই পলায়নের পর থেকে আদিবাসীদের স্বভাবের মূলেও একটা পলায়নের সংস্কার জন্মেছে। যদি উপমা দিয়ে বুঝতে হয় তবে ভাটিয়ারা স্রোতস্বতী নদী, আর আদিবাসীরা সরোবর। বদ্ধ জল বলতে পারো; কিন্তু জলের নিচে যেমন পঙ্ক, জলের বুকে তেমন কহ্লার কুমুদও ফোটে দু-একটা। শান্তির কথা মনে হয় তার পাশে দাঁড়ালে। একদিন সুতীব্র গতি পারভাঙা নদী আবর্তে আবর্তে মকর কুম্ভীর নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত দেখে কোনো কবি বলতে পারে, নদীর চুম্বনে সরোবরের বুকে আলোড়ন জাগছে, তারপর একসময়ে কুমুদিনীরা হারিয়ে যায়, সরোবরের চিহ্নমাত্র থাকে না। প্রবল নদী সেই সরোবরের সবটুকু আত্মসাৎ করে নেয়। নদীর গতিপথে সরোবর নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়।

মাতালু আজকাল শহরে যাচ্ছে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই। তার পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। টাকা খরচ করার ব্যাপারে তার হাত দরাজ হয়েছে। একদিন আই দেখতে পেল মেঝে খুঁড়ে টাকার ঘট বার করছে মাতালু। হিসেবি গৃহিণীর মনে প্রথমে একটা প্রতিবাদ দেখা দিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মনে মনে হাসল। আছে—সব ফুরিয়ে দিলেও নতুন করে আবার সংসার করার মতো কিছু লুকানো আছে আই-এর।

কয়েকদিনেই মাতালুর শহরে আকর্ষণটাকে ধরতে পেরেছে আই। এবং খুশিই হয়েছে সে। তার কারণ মালতীর ব্যাপারের মতো এ বিষয়ে বোধ হয় ব্যর্থতার জ্বালা নেই, মাতালুর মুখে যেন বরং একটা তৃপ্তির ভাবই দেখতে পায় সে। খোঁজ করার দরকার নেই, ছেলেই খোঁজ দেবে একদিন, যদি খোঁজ করার মতো হয়। ইতিমধ্যে ফুলমতীকে গল্প করেছে। ফুলমতী বলেছে তার নাম নাকি কমলা। ভাটিয়ার মেয়েই সেও। কিন্তু নাকি পরী।

আর পরিবর্তনের কথা বলছ? কী পরিবর্তন কখন হবে কেউ কি বলতে পারে? দুখিয়ার কুঠির কি পরিবর্তন হয়নি? আই প্রথম যেদিন এসেছিল আর আজ—অনেক পার্থক্য আছে। আই এ রকম চিন্তা করল হাসি হাসি মুখে : (খাওয়া আর একটু বিশ্রাম শেষ করে রোয়াক্ষেতে যেতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যাবে)।

বিশ-বাইশ বছর আগেকার ঘটনা। সেটেলমেন্টের দু-এক বছর আগেই হবে। তখন দুখিয়ার কুঠিতে খুব কম লোকই ছিল।

সদরে রাজধানীতে একটা ঘটনা ঘটল—এক রাজপুরুষের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করল। লোকে অবাক, রাজপুরুষের আত্মীয়স্বজন বিব্রত, দাসদাসীরা মাথা হেঁট করল। লোকে করল ছি ছি, আত্মীয়স্বজনরা চূড়ান্ত শাসনের ভয় দেখাল, দাসদাসীরা দীন হয়ে গেল নিশ্চিন্ত আশ্রয় ভেঙে পড়ার আশঙ্কায়, কিন্তু সেই স্বামী পরিত্যাগিনী স্ত্রীলোকটির মনের জোর ছিল, আর তার মতামতকে শক্তি দেয়ার মতো আরো অনেক লোক নাকি ছিল কলকাতা-নামা এক শহরে। একদিন সেই স্বামী-পরিত্যাগিনী সত্য সত্য এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে কলকাতাতেই চলে গেল। রাজধানীকে এখন যদি ভাটিয়াদের কেল্লা বলা যায়, কলকাতা তবে ভাটিয়াদের পিতৃভূমি। কারণ রাজধানীতে ভাটিয়ারা যা কিছু করছে তা কলকাতার অনুকরণে।

কিন্তু কী কারণ ছিল এমন একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটবার। সেই রাজপুরুষ নাকি এক অভিনেত্রী নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিল। অথচ সেই রাজপুরুষের পিতামহের সময়েও হারেম না থাক প্রাসাদ ছিল, বহু নারী সেখানে প্রকাশ্যেই রাজপুরুষদের সঙ্গ-কামনা নিয়ে বাস করত। এই রাজপুরুষই বরং একটা আধুনিকতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সেসব প্রথা তুলে দিয়েছিল। প্রকাশ্যে অন্তত সে ছিল একপত্নীক।

স্ত্রী কলকাতা চলে যাওয়ার পর রাজপুরুষের মনে ধিক্কারের মতো একটা ভাব জন্মেছিল, তারই ফলে সেও করল দেশত্যাগ। বেশ কয়েকজন সুন্দরী ছিল তার সেই কন্যার পরিচারিকা হিসাবে।

নানা বয়সের তারা। প্রায়ই তারা অবিবাহিতা, তাদের একজন বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। অপূর্ব সুন্দরী সে; তার সৌন্দর্যের খুঁত হিসাবে তার চাপা নাকের কথা বলা যায় বটে, কিন্তু সেটা যেন তার সৌন্দর্যকে স্বাতন্ত্র্যই দিয়েছিল। তার উপরে সেই রাজপুরুষের স্ত্রীকে অলংকার আর পোশাক পরানোর ভার ছিল।

বড় গোলমাল সেদিন রাজধানীতে। যেন একটা বিপৎকাল উপস্থিত এমনভাবে নগরবাসীরা ছুটোছুটি করছে। খোলা কিরিচ হাতে ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে অকারণে। যে কোনও অপরাধ করেনি সেও দণ্ডভয়ে সংকীর্ণ।

সেই সুন্দরী পরিচারিকাটিব মনে হল আরো কিছু ঘটে যাওয়ার আগে পালাতে হবে। সেই নগরে সে কারো কন্যা ভগ্নী অথবা স্ত্রী নয়। কিন্তু পালানো বললেই তা হয় না। সিন্দুকে যেসব মহামূল্যবান অলংকার ছিল, তার কিছু নিয়ে গেছে কলকাতার সেই কন্যা আর কিছু নিয়েছে রাজপুরুষ নিজে। কিন্তু একটা ছোট পেটিতে কিছু অলংকার ছিল আগের সন্ধ্যা থেকে পরিচারিকাটির তত্ত্বাবধানে। কী হবে, কাকে দিয়ে যাবে সেগুলি সে? অনেক চিন্তা করে পেটির অলংকারগুলি আর নিজের অলংকারগুলি একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে সেই পরিচারিকাটি হাঁটতে শুরু করল।

প্রাসাদের বাইরে যখন সে পা দিয়েছে তখন সে দেখতে পেল তার সম্মুখে পূবমুখী একটা পথ। সেই পথটাই ধরল সে। কিন্তু কোথায় সে যাচ্ছে? শহরের কোলাহল শেষ হয়েছে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হল সঙ্গে যে পুঁটুলিটা আছে সেটাকে নিয়েও আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। ইতিমধ্যে ভারি বোধ হচ্ছে সেটা, আর তার ভিতরের চোখ ধাঁধানো সোনা জহরতের গায়েই যেন সহস্র চোখ বসানো। ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নিরুদ্দিষ্ট পথে আশ্রয়ের আশ্বাস নেই। শহর আর শহরের গ্রামের পরে এখন পথের দু'পাশে ঘাসের জঙ্গল, কোথাও শালের বন। কিছুক্ষণ আগে দুজন লোক যেন তার পিছন পিছন আসছিল। তারা কি জানে কী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সে? জানাই সম্ভব। আর নাও যদি তা জানে, তাকে তো দেখতে পাচ্ছেই তারা। পরিচারিকা সেই রাজপুরীর অনেক বিলাসের প্রান্তদেশে কাটিয়েছে। তার কুড়ি বছর বয়সের অভিজ্ঞতা এই, তাকে দেখলে পুরুষরা কেমন মাতালের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে শহর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে, এখন সেখানে ফেরা আর সম্ভব নয়। এখানে নির্জনতা, আরো দূরে হয়তো নির্জনতা আরো বাড়বে। কিন্তু শহরের পথে পথে এখন যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নয়, উন্মত্তও বটে। কী করল সে? হায়, এ কী বোকামি! নিজের যৌবন এবং জহরতের পুঁটলি এ দুটিকে নিয়ে সে কোথায় পালাবে। পালাবে কেন? বুদ্ধি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পা চলতে চাচ্ছে না। এ কী করে ফেলেছে সে? পথের শেষে কোনো নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই। পিছনে পায়ের শব্দ হয়, এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাচ্ছে মানুষরা। পরিচারিকা সব গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। একটা বিষয়ে সে শুধু মনকে শাসনে রেখেছে, সে ছুটে পালানোর ভঙ্গি নেবে না ; অতি দ্রুত চলবে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, কিন্তু ভয় পেয়েছে এ রকম ভাব ফুটতে দেবে না। পিছন থেকে কেউ তাকে স্পর্শ করবে এ ভয়ে শরীর শিউরে উঠছে তার, পিঠটাই সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তবু জহরতের পুঁটলি বুকের কাছে চেপে ধরে সে চলেছে।

যৌবন ও জহরত, রূপ এবং রত্ন—এদের যেন একটা আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই যেন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে। পায়ের তলায় কিছুক্ষণ থেকেই একটা জ্বালা শুরু হয়েছে, বোধ হয় ফোসকা পড়েছে। কান্না পাচ্ছে। প্রকাশ্যে কাঁদবার উপায় নেই। গল্পে শোনা গেছে আত্মাকে গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখা যায়, যদি সে পারত রূপ ও রত্নকে তেমনি কোথাও রাখতে।

আই চুল আঁচড়ানো শেষ করে মোড়ায় বসে রোয়াক্ষেতের ভিজে স্যাঁতসেঁতে হাতপায়ে তেলের

হাত বোলালো, ভাবল সে : তাকে এখন আর কেউ কুমরী বলে না। কুমরী হিসাবে কি সে বোকা ছিল?

প্রথম সন্ধ্যা হয়ে যেতেই সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, যেসব গ্রাম সে পার হয়ে এসেছে সেসব গ্রাম দিয়ে নগরে ফিরতে গেলেই লোকে সন্দেহ করবে। একবাব দেখে মানুষ তত খেয়াল করে না, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখে? তেমন ভয় পাওয়াটাও, বোধ হয় বোকামি হয়েছিল তখন। নগরে তার মতো আরো অনেকে তো থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তখন দ্বিতীয় দিন এসে গেলে ফেরার পথ আর ছিল না। রানীর অত অলংকারের মধ্যে যে কয়েকটি তার সঙ্গে তা হারিয়েছে কি না তাও কেউ খেয়াল করবে না। কিন্তু সে নিয়ে গিয়ে ফেরত দিলে? চুরি তো হয়েই গিয়েছে রাত কাটতেই।

কিন্তু কেন তেমন করে হাঁটতে থাকা? তাকে বোধ হয় কেউ বলেছিল, বোধ হয় বুড়ি পরিচারিকাই যাকে সে 'মাও', মা বলত, ছোটবেলায় যার পাশে সে ঘুমাত সে-ই বোধ হয় কোনোদিন বলেছিল, পূর্ব সড়ক দিয়ে চলতে থাকলে গদাধর নদী। সেখানে গ্রাম, কিন্তু কার গ্রাম? তা যদি তখনকার কুমরী, এখনকার আই, যদি কোনোভাবেই বলতে পারে! হয়তো সেই বুড়ি পরিচারিকারই গ্রাম ছিল গদাধরের পারে। কুমরী পূর্বমুখী সড়ক ধরে হেঁটে চলেছিল।

মানুষের শরীর তার মনের কাছে হার মানে না, মনকে কখনও কখনও হারিয়ে দেয়। শরীর এবং মনে বিবাদ লেগেছিল তার। আতঙ্কিত মন ছুটে পালাতে চাচ্ছে, আর শরীর সেই পথের ধুলোতেই লুটিয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে চাচ্ছে। পথের ধারে শালবন। সেই শালবনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অগম্য একটা অংশ খুঁজে নিয়ে জহরতের পুঁটুলির উপরে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করে নিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিন এল। ইতিমধ্যে একটা ছোট নদী পার হয়েছে সে—সামনে বোধ হয় আর একটা নদী। এখানে পথ অপ্রশস্ত। কোথাও কোথাও দু'পাশের জঙ্গল বেড়ে এসে পথকে ঢেকে ফেলেছে। পথের শেষে কিছু দূরে দূরে ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে দু'একটি গ্রাম চোখে পড়ছে। সকাল থেকে এ রকম দু'একটি গ্রাম পার হয়েছে সে। ক্ষুধা থেকে থেকে কষ্ট দিচ্ছে তাকে। সে কি গ্রামে যাবে এখন? কী ভুল করেছে সে জহরতের পুঁটুলিটার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত ক'রে। নগরের বাইরে আসার আগেই তার তো মনেই হচ্ছিল, কেউ যদি এসে বলত, গহনাগুলো দাও, তাহলে বেঁচে যেত সে। সে কি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত এমনি করে ছুটে চলবে!

নদীটা বড়, জল গভীর বলে মনে হয় না, কিন্তু খাতটা চওড়া। বর্ষায় নিশ্চয়ই প্রবল হয়। পথ সে অনেকক্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে কখনও সে পথের দেখা পাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কোনো নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা মনে হয় না। সে নদী পার না হয়ে, তার কূলে কূলে হাঁটতে শুরু করল।

একটা অদ্ভুত কথা তার মনে হল, কেউ কি তাকে আশ্রয় দিতে পারে না? ক্লান্ত অবসন্ন মনে এ কথাটাই বারবার পাক খেতে লাগল। কোনো পুরুষ, যে কোনো পুরুষ। সে এবং তার যৌবন এবং তার জহরতকে আশ্রয় দেবে এমন কোনো পুরুষ। যদি সে এই ছুটোছুটির আতঙ্ক থেকে তাকে বাঁচায়। একটা যে কোনো রকমের আশ্রয়ে বসতে পাওয়ার আশ্বাস পেলে সে পুরুষকে তার রত্নের ভাগ দিতে পারে, যৌবনের অংশীদার করতেও রাজি আছে। কিন্তু সে পুরুষ যেন সবল হয়, অন্যের ক্রুর লোভ থেকে রত্ন ও রূপকে যেন রক্ষা করতে পারে।

আই মোড়া টেনে নিয়ে বারান্দায় বসল। ধান সিদ্ধ হওয়ার বড় উনান দুটোর আগুন কমেছে। কড়াই নিচে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের সে দিকটায় খেতে বসেছে।

আই ভাবল : এত স্পষ্ট করে কি তখন ভাবছিল সে? বোধ হয় অস্পষ্টভাবে কোনো একজন সঙ্গীর কথা মনে হতে না হতেই সে তাকে দেখতে পেয়েছিল।

হঠাৎ চমকে উঠে পরিচারিকা কুমরী দেখতে পেলে—কে একজন এক হাঁটু জলে নেমে জল খাচ্ছে। আঁজলা করে জল না তুলে নিচু হয়ে পড়ে চুমুক দিয়ে জল শুষে নিচ্ছে—আঁজলা করে জল তুলতে গেলে যেন ময়লা উঠে পড়বে।

বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে লোকটিকে দেখতে লাগল পরিচারিকা। পুরুষ কিন্তু ঠিক পুরুষও নয়। লম্বাটে কালো চেহারার রোগা একটি ছোকরা। উপরের ঠোঁটে গোঁফের রেখা উঠেছে কি না উঠেছে। সতেরো-আঠারো হতে পারে। গায়ে ছেঁড়া জামা, পরনে আধময়লা কাপড়। জলে একটা পাখি বসেছিল। লোকটি ঢিল তুলে পাখিটাকে মারবার চেষ্টা করল। পাখিটা উড়ে গেলে একটা গাছের তলায় বসে সে বিড়ি ধরাল।

পরিচারিকার মনে অনেক জটিল চিন্তা দেখা দিল। তার মধ্যে একটি এই ছিল—লোকটি তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না। সেই তো ভালো, সেই তো ভালো। একটা ঢিল তুলে নিয়ে পরিচারিকা ছুঁড়ে মারল। লোকটির ঢিলটা যেখানে পড়েছিল তার ঢিলটাও অনায়াসে তার কাছাকাছি গেল। লোকটির কাছে তার জোর একেবারে নষ্ট হবে না। শরীরে এবং বুদ্ধিতেও বোধ হয় লোকটির উপবেই তার কিছু প্রাধান্য থাকবে। রত্নের পুঁটুলি কেড়ে নিতে পারবে না, রক্ষা করতে সহায়তাই করতে পারবে।

লোকটি পরিচারিকাকে দেখে অবাক হয়েছিল।

'কোথায় যাবে'? সে প্রশ্ন করল।

'জানি না। তুমি কোটে যাবা'?

'গদাধর। পথ জানো'?

'না'।

পরিচারিকা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তাব ভবিষ্যৎ-চিন্তা কি ইতিমধ্যে তার চোখেমুখে ও দেহভঙ্গিতে একটা আমন্ত্রণ হয়ে ফুটিফুটি করছে? লোকটি দর্শনীয় কিছু নয়, বলিষ্ঠ নয়, হয়তো-বা সবদিক দিয়েই নির্গুণ। তবু পুরুষ, যে সঙ্গী হতে পারে। আর এই তো ভালো যে যৌবন ও রত্নের উপরে কিছু প্রাধান্য পরিচারিকাই রাখতে পারবে। সে সঙ্গে থাকলেও।

'বিড়ি খাবা'?

পরিচারিকা ছোকরার হাত থেকে বিড়ি নিয়ে টানল, কাশল।

দুজনে পরামর্শ করে মুড়ি আর মুলো সংগ্রহ করেছিল গ্রাম থেকে। তিনদিন তারা অরণ্যে কাটাল। চারদিনের দিন নদী পার হল তারা। রত্নের পুঁটুলিটা এখনও পরিচারিকার কাঁকালে, কিন্তু সেই ছেলেটির ডান হাতখানা সে পুঁটুলিটা বেষ্টন করে পরিচারিকার কোমরে রয়েছে। নদীতে স্নান করে উঠে শুকনো শাড়ি পরতে হলে তো একজনের সামনেই পুঁটুলিটা খুলতেই হবে।

তখন দুখিয়ার কুঠিতে এত লোক ছিল না।

খোলা আকাশের নিচে তিন-চারটি রাত কাটিয়ে তারা অসুস্থ বোধ করছিল। পুরো এক পেট ভাতের ইচ্ছাও তাদের মনে দেখা দিয়েছিল। পরিচারিকার মনে গ্রামের ভয়ও আর ছিল না।

তারা পায়ে পায়ে চলে গ্রামটায় পৌঁছে একটা ভাঙা ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামটা দুখিয়ার কুঠি। সামনের নদীর নাম গদাধর। বাড়িটা রংবর-এর। সেই বাড়িতেই, এই বাড়িই, আশ্রয় পেয়েছিল পরিচারিকা। সে এবং তার বন্ধু। রংবর তার রূপলাবণ্য দেখে নাম দিল আই।

চার-পাঁচ মাস পরে একদিন আই-এর বন্ধু সেই ছোকরা হঠাৎ চলে গিয়েছিল। কোথায় গেল কেউ জানে না। সেই অলংকারের পেটির একাংশ মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিল দুজনে পরামর্শ করে। আই জানে সেই লুকিয়ে রাখা অলংকারগুলি নিয়ে গিয়েছিল সে-ই, অন্য কারো জানবার কথা নয়। যৌবন? কেউ তা নিতে পারে? এই চল্লিশ বছরের পারে এসে অলংকারহীন প্রসাধনহীন

আই এখনও শ্রেষ্ঠ রূপসী। সেই বন্ধুত্বও বৃথা নয়, মাতালুকে পেয়েছিল আই।

তারপরে কত ঘটনাই ঘটল। দুখিয়ার কুঠির এ পাড়াটাতেই লোক বেড়েছে। তার কারণ বোধ হয় রংবর আর ফুলমতী, আর তার সঙ্গে ফুলবর। নদীতে চর হয় বালি আর পলি জমে, কিন্তু নিশ্চয়ই মূলে একটা বড় পাথর থাকে, যাকে নদী সরাতে পারেনি। তেমন পাথরের মতো রংবরের ঘরকন্না। সেখানে কুমরী আই থিতিয়েছিল। জমি সোনা, জমি বাড়ানো সেই চরে প্রতি বর্ষায় পলিতে জমে উঁচু হওয়াব মতোই। এ কাজে বড়গোঁসাই তাকে সাহায্য করত গোড়ায়। এটাও স্বস্তি, আই অনুভব করল, তার জমি কেনার মূলে তার নিজের গহনা। কোমরের সেই মোটা মালাটা যা নগরে পরতেই হতো, সেটাই বিক্রি করে দিয়েছিল হেরম্ব, মালতীর বাবা। বাটা নিয়েছিল, পান মরা বাদ দিয়ে হিসাব ধরেছিল, কিন্তু দশ বিঘা জমিও কিনে দিয়েছিল সরকার থেকে। আর তার দু'বিঘাতে আবার নিজেই চাকরান স্বত্বে বসেছিল পরে শর্ত অনুসারে। এটা ভালোই সেই রানীর গহনাগুলো যার অধিকাংশ মাটিতে পোঁতা ছিল তা সেই লখু, লখাই, নিয়ে পালিয়েছিল।

আই-এর মুখ হাসিহাসি হল। চাকরান স্বত্বের ব্যাপারটা কৌতুকের। বড়গোঁসাই তার জমিজমার তদ্‌বির করত, ধান বিক্রি করত, ধানের টাকা সঙ্গে সঙ্গে না নিয়ে পরে নিলে সুদে বাড়িয়ে দিত, তার হয়ে উকিল মোক্তারের সঙ্গে ওঠাবসা করত। দু'বিঘা চাকরান জমির খাজনা দিত না, ফসল নিত। এসব কাজ রংবরকে দিয়ে তো নয়ই, ফুলবরকে দিয়েও হতো না।

সেটেলমেন্ট হল, জমি বাড়ল। মাতালু ক্রমে বড় হল। পরিবর্তনও হতে থাকে। সেটেলমেন্টের পরে সড়ক, সড়কের পরে ব্রিজ। গ্রামে তো বটে গদাধরপুরে আরো বেশি, যেমন ফুলবর বলে, ভাটিয়ার চাইতে বেশি ভাটিয়া আছে। গদাধরপুরের পুরনো ভাটিয়াদের চাইতে ব্রিজের সঙ্গে আসা নতুন ভাটিয়ারা দুখিয়াব কুঠির মানুষ থেকে আরো দূরের। নগরের সেই যে গোলমাল। তো তেমন নতুন পুরনো ভাটিয়ার তফাত।

মাতালুকে অবলম্বন করে যেন একটা পরিবর্তন আসবে দুখিয়ার কুঠিতে। শহরে মালতীর পরিবর্তে যার সঙ্গে মাতালুর দেখা হচ্ছে আজকাল তার কথাই ভাবো। কমলার কথা অনেকটাই জেনেছে আই। মাতালু ফুলমতীর কাছে গোপন করতে পারে না। তারপরে আই-এর কাছেও গোপন নেই। তা ছাড়া ফুলবরও হাটের দিন তাকে দেখে এসেছে। মালতীর চাইতে ফরসা রং, মালতীর চাইতে চুল বেশি। মালতী রোগা রোগা, কমলার চেহারা অনেক ভার। কিন্তু বয়সও মালতীর দেড় গুণ; মাতালুর চাইতে বয়স বেশি হবে। খোলা চুলে কিন্তু মাথায় ফুল।

বয়স বেশিই বড় কথা নয়। সেই একটা কথা যা ছেলের সঙ্গে আলাপ করা যায় না। মালতী বিয়ের আগে অন্য কোনো পুরুষকে ভালোবাসেনি, সেসবে খুবই কড়াকড়ি, যা আই জেনেছে, ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য। সেই অন্য কাউকে ভালোবাসার ব্যাপার নিয়েই, ভাটিয়া দেশের রানীর স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া। আবার এদিকে কমলা আরো যেন সাহসী ভাটিয়া। হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু সব শোনার পর মনে হয়, কমলা ব্রিজের সঙ্গে আসেনি। দ্বিতীয় সেটেলমেন্টের সময় থেকেই আছে। ব্রিজ হওয়া শুরু থেকে এখন আর পরী নয়। টাকা সকলেই চেনে আজকাল, ভাটিয়াদের মতো আর কেউ নয়। টাকার কত রকম ব্যবহারে ভাটিয়ারা সভ্য। টাকা দিয়ে তারা সব করতে পারে।

সুনরীও ফুলবরের কাছে আসার আগে বিশ বছর অন্যের স্ত্রী ছিল। স্বামী মরার পর মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কী হয়েছে, তা জানলেও কেউ আলাপ করে না। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে জামাইকে মেয়েকে দুই বিঘা জমি দেয়ার পর সুনরী ফুলবরের পিছনে পিছনে চলে এসে এই ঘরে উঠেছে। সুনরীও ফুলবরের চাইতে কিছু বড় বয়সে। কিন্তু ফুলবর কিছু ভয় পায় না। এতদিন পরে সুনরীর সেটা কেমন ভালোবাসা তা নিয়েও ভাবে না। ওদিকে সুনরীও সুখী আর শান্ত।

আই দেখতে পেল, এবার মাতালু, রংবর আর ফুলবর, আজকের ধানরোয়ার লোক দুটির সঙ্গে

খেতে বসল। এরপরে আই, সুনরী তারা ধানরোয়া সঙ্গিনীদের নিয়ে খেতে বসবে।

সুনরীর কথাই ধরো। রংবরের কাছে এসে সুনরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। বয়সও যেন কমেছে। কিন্তু তাই বলে, রোয়াগাড়ার জলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করতে করতে মেয়েরা কথা বলে। তাতে নিজেদের শরীরের কথা থাকে, লজ্জা কম থাকে, তাতে ধান নাকি ভালো হয়। মাত্র বছর কয়েক সুনরী রংবরের কাছে সেজন্য অধিক বয়স্কা হলেও সে যেন অপেক্ষাকৃত নতুন বিবাহের স্ত্রী। তাকে বিব্রত করছিল অন্যেরা। সুনরী স্বীকার করে ফেলেছিল সে সন্তান আশা করে না তার বয়সে। কিন্তু এই জলে দাঁড়িয়ে তা বলা ভুল হতো বলে বলেছিল, রংবরের খাওয়াদাওয়ার দিকে চোখ রাখছে।

মালতীর বদলে কমলাই যদি হয় আই-এরও পৌত্রদের সম্বন্ধে আশা রাখা যুক্তির হবে না। কিন্তু তাও নয়। আই গাছ তিনটিকে দেখতেই পাচ্ছে। দুটি সেগুন, একটা গামারি। ফল হয় না কিন্তু দামি গাছ। কী রকম একটা দৃঢ়তা আছে। অনেক নিচে পর্যন্ত নিশ্চয় শিকড়। আই অনেক সময়ে, সুনরীকে ওই ঘরটি দেয়ার আগে, গাছ তিনটিকে রংবর, ফুলমতী, ফুলবর এ রকম মনে করত। এখন সেগুলো থেকে দুটোকে বেছে নিয়ে সুনরী ও ফুলবর এ রকম অনুভব করল। আলোর তারতম্যে সে রকম হয়। মাতালুর লাগানো গাছ। সে গাছ তিনটি দিয়ে আই-এর জন্য রাজার বাড়ি তৈরি করবে। সে নিশ্চয় শুনেছে আই আগে রাজবাড়িতে ছিল।

—কেনে, মামু, হইবে না রাজবাড়ি?—হইবে তো।—বনায়ে দিস তো?—দিম্ বনায়ে। এসব আট-ন বছর আগেকার কথা।

এসবই তখন ছেলেমানুষ মাতালু বলত। সেই প্রকাণ্ড, দোতলা রাজবাড়ির চকচকে কারুকাজ করা দেয়াল মেঝে হবে সেগুন দুটিতে। গামারিটা দেবে খাট পালং। বাড়ির বাইরের দিকে একশো বছরের পুরনো কাঁঠাল গাছটা থেকে দরজা জানলা মেঝে হয়ে যাবে—হইবে তো।

দক্ষিণ ভিটার সামনে পেয়ারা গাছটা চোখে পড়ল আই-এর। মাঝারি বড় ফলন্ত পেয়ারা গাছ। সূক্ষ্ম বাঁশের প্রকাণ্ড টোপর পরানো। মাটি থেকে হাত পাঁচ-সাত উপরে সেই টোপর-খাঁচার মেঝে। সবচাইতে উঁচু ডাল পর্যন্ত উঁচু। টোপরের ভিতরে যত ডালপালা ফল, টোপরের শিকের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছড়ানো ছোট বড় ডালেও তত পাতা আর ফল। আসলে ওটা পাখিদের জন্য বাঁধা খাঁচা। নিচের দিকে দরজা। সেই দরজা দিয়ে ওই টোপর-খাঁচায় জোড়া দুয়েক পাখি ঢুকিয়ে দিলে তারা ফল খাবে, বাসা বাঁধবে, বাচ্চা হবে। গান করবে। বাসা চেনা হয়ে গেলে তখন তাদের জন্য দরজা বন্ধ করে রাখতে হয় না।

এই তো সেদিন, বছর দুয়েক আগে, মাতালু আর ফুলবর খাঁচাটাকে বানিয়েছে। দু'মাস লেগেছে বান'তে। তখনই, যখন মালতী বড় হয়ে উঠছিল।

তা ফুলবর ওই মধ্যের গাছটার মতো। পাশের ওই আর একটা গাছ, পরিচিত এক ফালি আকাশ, সারা বছরে সেখানকার পরিচিত রোদ, বৃষ্টি, কুয়াশার পুনরাবর্তন। এর বেশি ফুলবর চায় না। ওদিকে কিন্তু কোনো আশঙ্কা ভয়ও রাখে না মনে। আই একটু ভেবে নিয়ে স্থির করল, ফুলবর দুই দ্যাওকে, অপদেবতাকে, ভয় পায়। একটা অসুখ। অন্যটাকে সে বলে লোভ। তাকে দেখতে নাকি সাপের মতো, সাপ আবার কখনও ভাটিয়াদের সড়কের মতো। হুস হুস করে একদিক চলে যেতে থাকলেই হল, বাড়তে থাকলেই হল। লোভ, সড়ক, সাপ কাকে দেখে শেখে বলা যায় না।

মাতালু ছোটবেলা থেকে ভাটিয়াদের কালো মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল। বোঝা উচিত ছিল। সর্বদিক দিয়ে যারা উপকৃত আই-এর কাছে তারাও মাতালুকে মেয়ে দিতে চায়নি। তাদের সভ্যতা এই একরকম। তা সত্ত্বেও আবার মাতালু কমলার মোহে পড়ল। সেও কি ভাটিয়াদের স্রোতেরই

আর এক অঞ্চল নয়? আর দ্যাখো, এই স্রোত সেই স্রোত করতে মাঝে দাঁড়ানোর মাটি অনেক সময়ে চোরাবালি হয়।

১৮

লখাই চক্রবর্তী গদাধরের তীরেই তবে শহর থেকে অনেকটা দূরে একটা হাস্যকর পরিস্থিতিতে বসেছিল। এখন সে নিচে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে, ফ্লাস্কে কিছু মদ আছে। সত্যই স্যান্ডউইচ। গদাধরপুরের মেয়ে মালতীর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। লখাই নিজেই তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। লখু হিসাবে সে একসময়ে এমনকী কলকাতার রেস্টুরেন্টে কাজ করেছে কিছুদিন। সন্ধ্যার পর সে গাছে উঠে বসবে। আপাতত কেউ তাকে তাড়া করছে না। এক ঝাঁক মশা শুধু পিছনে লেগেছে।

মশার কামড়ে বিরক্ত বোধ হচ্ছে। পৃথিবী, সভ্যতা, জীবন সবকিছুর উপরেই বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে পড়ছে তার। নিজের প্রতি এবং থেকে থেকে মালতীর প্রতিও একটা অসহিষ্ণুতা অনুভব করছে সে। তার রাগও হচ্ছে। বিরক্তি থেকে বিষাক্ত বাষ্প উঠে পড়ার মতো একটা অনির্দিষ্ট বিদ্বেষও সে অনুভব করছে। মালতী ঘরে শুয়ে-বসে দিন কাটাচ্ছে, আর সে এই হাস্যকর অবস্থায়, সভ্য জগতের অনুচ্চারিত ধিক্কার শুনছে।

কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপার নয়। অদৃষ্ট বলে সহ্য কবাও যাচ্ছে না। অতীত যেন পিছনে পিছনে না চলে সামনে এসে দাঁড়াল, নির্বোধের মতো হাসছেও হি হি করে।

রাগে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসতে চাচ্ছে লখাই-এর। এমন ঘটনাও মানুষের জীবনে ঘটে? পাঁচ-সাত বছরে পারস্পরিক একটা বিস্মৃতি এসে গেছে এই আশা করেছিল সে। কিন্তু শোনা গেছে পাণ্ডারা দু-তিন পুরুষ পরেও যাকে চিনবার তাকে চিনে নেয়। এরা তার চাইতে কম নয়। খবরটা পেয়ে সে প্রথমে অবিশ্বাস কবেছিল। পরে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমলার ঘরে শুধু একটু ঘুমুব বলে যে বিদেশি আশ্রয় নিয়েছিল সে এতদূর বৃথাই আসেনি। তার কথা থেকে লখাই বুঝতে পেরেছিল সবকিছু ঝেড়ে ফেলা যায় না। এক্ষেত্রে তো তা যাবেই না। দলত্যাগের শাস্তি তারা কী আব দেবে? কিন্তু যে কোনো একটা গোলমাল হতে পারে, আর তার ফলে মান সম্মান বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। শহরের ঝকঝকে আধুনিক কায়দার বাড়ি, স্ত্রী মালতী, কিছুই যেন তারপরে তাকে আর মানাবে না। তার চাইতে আপস ভালো, বন্ধুতার অভিনয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। দশ-পনেরো বছর পরেও যারা খুঁজে বার করে তাদের এড়ানো যায় না।

ব্যাপারটা হচ্ছে মাদক দ্রব্যের চোরাচালান। একসময়ে লখাই-এর বাংলা থেকে আসামে আফিমের যাত্রাপথের একটা বিশেষ অঞ্চলের যোগসূত্র ছিল। কিন্তু কেউ কি বুঝবে না সেদিনের অসহায় লখাইয়ের কী ভয়ংকর প্রয়োজন ছিল এ-পথে আসবার? তখন বর্তমানই ছিল প্রবল, সেই প্রত্যক্ষ জগতে দৈহিক প্রয়োজনগুলো মিটানোই ছিল তার একমাত্র প্রয়োজন। লখাই-এর অন্তরাত্মাই যেন কেঁদে উঠল—বলো কী উপায় ছিল তখন? এরা তবু তো সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিল, অসুখবিসুখে সেবা শুশ্রূষাও করেছে। সদরের শহরে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কেউ কিছু দেয়নি তাকে। সে শুনেছিল গদাধরপুরের নতুন শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ আছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছেও দেখেছিল ব্যবসা করতে শুধু উৎসাহ উদ্দীপনাই যথেষ্ট নয়, মূলধন দরকার, ক্রেতার চাহিদা দরকার। আর তখন সে কি কখনও কল্পনা করেছিল এই শহর এমন রূপ নেবে, কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক মানুষ হওয়ার সুযোগ তার জীবনে আসবে? এ কি আর সেই শাসনহীন এলেকা? দ্যাখো, বদন মাস্টারের কী হল। কতদিন পরে পুলিস খুঁজে বার করেছে সে অপরাধী, আত্মগোপন করে আছে। এখন

গদাধরপুর দস্তুর মতো সভ্য শহর।

সে নিজেকে কখনও অসাধারণ কিছু মনে করেনি। সে যা কিছু সঞ্চয় করেছে তার মূলে আছে অসীম দুঃখবরণ এবং অনেক দুঃসাহস। অনেক আহারহীন দিন অনেক নিদ্রাবঞ্চিত রাত্রি অতিবাহিত করেছে সে পথে-বিপথে বন জঙ্গলে। তখন সে ভেবেছে মানুষ নেশা করবে কাজেই নেশার জিনিস চালান দেয়ায় দোষ নেই। কিন্তু সমাজের যে ধাপে বর্তমানে সে আছে তাতে সে অনায়াসেই বুঝতে পারে সভ্যতা অত সহজ এবং সরল কিছু নয়। এবং সে নিজের প্রয়োজনেই এখন আগেকার সেই কাজগুলোকে সমর্থন করতে পারে না।

কিন্তু শুধু তো বন্ধুত্ব রক্ষাই নয়, লোভও হয়েছিল তার হঠাৎ পড়ে পাওয়া এই লাভের প্রতি। এই শেষবার, বলে মনকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু এখন?

হা ভগবান, হা ভগবান! আমাকে ক্ষমা কবো, আমাকে ক্ষমা করো।

সে ভগবানকে যেন বলল। সে তখন নেহাত অল্প বয়সের ছিল। বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব ছিল বলেই যোল-সতেরোতেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। সে শুনেছিল এসব দিকে তাদের দেশের কেউ কেউ চাকরি করে। তখন সেই বেকার অবস্থায় সোনার লোভে পড়া কি অন্যায়? পাপও বলা যায় না। ভুল বটে। তার বোঝা উচিত ছিল ঝকঝকে পাথর বসানো উজ্জ্বল সোনার সেই গহনাগুলো চুরি করা যত সহজ তাকে টাকায় পরিণত কবা ততই কঠিন। দ্বিতীয় দিনেব সকালে ক্ষুধায় অন্ধকার দেখে একটা ছোট আংটিমাত্র সে বিক্রির চেষ্টা করেছিল, আর তাতেই সে ধরা পড়ে গিয়েছিল। পুলিস হলে কি ভালো হতো? কপালগুণে সেই হাসি হাসি মুখ লোকটি যে তাকে হোটেলে নিজের পয়সায় খাইয়েছিল, শুধু সে নয়, হোটেলের মালিকও ছিল আফিমের ব্যবসায়। পাপ নয়? মাটিতে গর্ত করে লুকিয়ে রাখা সেসব অলংকারই তো চুরি করে আনা। কিন্তু সেই একটা ভুলেই সব খোয়াতে বসেছে সে আজ।

অনেক কথাই মনে পড়ছে তার। মালতীর সন্তান-সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিতও যেন পেয়েছে সে। হায়, সেও কি ভবিষ্যতে কলঙ্ক বহন করে চলবে! আফিম চালান দেয়ার চাইতে আফিমের লাইসেন্স দোকান নিশ্চয়ই ভালো। তা ছাড়া সে তো বিলেতি মদ বিক্রি করে এখন, সে তো একজন কনট্রাকটরও।

আর অকারণেই যেন কিছুক্ষণ তার কথাও মনে পড়েছে লখাই-এর। কোনো কোনো মানুষের গঠনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যে তার কথা ভাবতে গেলে তার বিশেষ কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথাই মনে পড়ে। তার পেনসিলে টানা ভ্রূর মতো সরু ভ্রূ, আর তার খোঁপা থেকে বেরিয়ে থাকা চুলের ডগা যেন সজীব কিছু, যেন তা বসন্তের কোনো স্ফূর্তিবাজ পাখির পুচ্ছ। গত জীবনেব জন্য আক্ষেপ যদি কিছু থাকে লখাই-এর তবে সেটা তার জন্য। কোনো কোনো সময়ে শরীরে একটা পৃথক চেতনার মতো তার স্পর্শের স্মৃতি জেগে ওঠে। সে কি ফিরে গিয়ে বলবে, খুব ভুল করেছি, ওগুলো কাচ নয়, পাথর। বিক্রি করতে গেলেই লোকে ধরে ফেলবে। হা, ভগবান! তখন তখনই যা পারেনি এখন তা সম্ভব হবে কী করে! দুখিয়ার কুঠিতে একটি আদিবাসী রমণীর মোহে আদিবাসী হয়ে যেতে তখনই আর আপত্তি ছিল। হয়তো খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লখাই-এর নিজের চাইতে বেশি সাবান ব্যবহার করত। হয়তো হাতের আঙুলগুলো সরু সরু, লম্বা, গাঁট চোখে পড়ে না। আর যেন আদব কায়দা মাখানো। হয়তো গলার স্বর সবসময়ে নিচু আর টনটনে মিষ্টি। ওদিকে তিনি হয়তো-বা কোচ, মেচ, হয়তো-বা বাহে। আর তখনকাব লখু, লখাই কালো হতে পারে, গরিব হতে পারে আবার উঁচু জাতও। স্বীকার করি, কখনই তাকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়া যায় না। মালতী এবং তার আগের সে সময়ের অনেক রাত্রির আশ্রয়স্থল কমলাও পারেনি তাকে ভোলাতে। বরং এখন লখাই-এর চিন্তায় তাদের তুলনায় অন্তত এই মুহূর্তে

সেই রূপ ও রত্নময়ী আদিবাসী রমণী বেশি দেখা দিচ্ছে। তার সান্নিধ্যে এই স্নায়ু পোড়ানো যন্ত্রণা নেই। সেখানে অন্তত ঢিলেঢালা সহজ ভাব ছিল। প্রতিষ্ঠার চূড়া থেকে পড়ে যাবার এমন ভয় ছিল না। এই জঙ্গল ছাড়া উপায় কী? তার বাড়িতে যেখানে মালতী থাকে সেখানে কী করে তাদের সঙ্গে দেখা করবে—দশ-পনেরো বছর পরে যারা তাকে আবার খুঁজে পেয়েছে।

দিগন্তে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। এই পথেই তাদের আসবার কথা গদাধরের তীর ধরে। কী করবে লখাই। ভয়ংকর কিছু একটা ঘটানো যায়, কিন্তু ফণিমনসার জঙ্গলে ভরা শাসনসীমার বাইরে পড়ে থাকা অরাজক অঞ্চল আর নয় গদাধরপুব।

আর কাঁকরু। ডালকুত্তা সে দেখেনি, কিন্তু তেমনি যেন সে। অহর্নিশি সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আফিমের চোরাকারবারিকে ধরতে।

১৯

স্বপ্নে কুয়াশার জালে আটকে পড়া এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। না যায় এগোনো, না যায় পিছানো। রসাতলে ডুবে যাওয়ার মতো অনুভব হতে থাকে, উদ্ধারের চেষ্টায় আঁকুপাকু করে মানুষ।

মালতীর বাড়ি থেকে সেদিন যে বিমুগ্ধ ভাব নিয়ে সে বেরিয়েছিল সেটা যেন মন্ত্রের মতো কিছু। এদেশে এখনও মন্ত্রে বিশ্বাস করতে দেখা যায় অনেককেই। একদিকে যুক্তি বুদ্ধি, আর একদিকে সেই মগ্ন আলোকে অদৃশ্যপ্রায় গৃহসজ্জার মধ্যে অনুভবগ্রাহ্য মালতী। আলো নিবে যাবার আগের মুহূর্তে দেখা মালতীর প্রসাধন শাণিত শরীব।

ইতিমধ্যে একদিন মাতালু খানিকটা ঝাঁজের সঙ্গেই বলেছে রংবরকে, সে ঝকঝকে ইট কাঠের বাড়ি করবেই যতই তারা তাকে অহেতুক বলুক। মাতালুর ইচ্ছা হয় মালতীর ঘরের মতো একখানা ঘরের চার দেয়াল তাকে ঘিরে রাখুক। অসম্ভব ইচ্ছা নয়। সে মাতালু ধনী। কয়েক খন্দের ধানে সে পারে তেমনি একটা বাড়ি তুলতে।

কিন্তু বাড়ি তোলা আর তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা এক ব্যাপার নয়।

অনুভবটা যেন একটা স্বল্পপরিসর জায়গায় আবদ্ধ থাকার মতো। কে যেন তার হৃৎপিণ্ডকে বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে। যদি সেই মুঠি ছাড়াতে যাও, যেন নিচে পড়ে যেতে থাকো।

সাতদিন, সাতদিন করে তিন সপ্তাহ চলে গেলে কাঁকরুব হাত দিয়ে কমলাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে মাতালু। একবার তার মনে হয়েছিল কমলার কাছেই কেঁদে কেঁদে বলবে তাব কষ্টের কথা। অন্য একবার সে ভাবল: মালতী কি সত্যি এত নির্দয়? নির্দয় না হয়েই-বা উপায় কী তার।

শেষের সাতদিন তো সে ধানবাড়িতে বোয়াগাড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এমনকী আরো এগিয়ে গিয়ে কাঁকরুর জমিতেও বোয়াগাড়ার কাজে সাহায্য করে এসেছে। অল্পই তো জমি কাঁকরুর। কাঁকরু, মাতালু আর কাঁকরুর স্ত্রী একদিনেব দুবেলাতেই রোয়াগাড়া শেষ করেছে।

পরের দিন সকালে উঠানে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে থাকতে পেয়ারা গাছের সেই শূন্য খাঁচাটা তার চোখে পড়ল। একটাও পাখি আসেনি। সে ভেবেছিল দু-তিন জোড়া পাখি বাসা বাঁধবে সেই খাঁচার মধ্যে।

সে স্থির করে ফেলল : পাখি কখনও নিজে থেকে আসে না। বন থেকে ধরে আনতে হয়। সারাদিন বসে বসে বাঁশ দিয়ে একটা ছোট খাঁচা বানাল সে। বনের পাখি ধরতে এ রকম ছোট খাঁচা বানাতে হয় বনে। এ রকমই রীতি। কোনোরকমে পুরুষ কিংবা স্ত্রী পাখি একটা ধরতে হবে, ধান, কাউনের লোভ দেখিয়ে পাতায় আঠা মাখিয়ে। তারপর সেটাকে খাঁচায় অদৃশ্য সুতো দিয়ে

বেঁধে রাখলে তার আকুল ডাকে অন্য পাখি এসে ধরা পড়ে।

অনেকদিন আগে, তখনও মালতীর মেজদাদা বেঁচে, সে বনে ফাঁদ পেতেছিল। পরের দিন সকালে পাখি আনতে গিয়ে সে দেখেছিল খাঁচাটা ভাঙা, তোবড়ানো ; আর কী দুঃখের, ছড়ানো পালক কিংবা ভামের হাতে প্রাণ গিয়েছে। খাঁচায় বন্দী থাকায় উড়ে পালাতেও পারেনি। পাখি ধরার ব্যাপারে কাঁকরুর স্ত্রীই সবচাইতে ওস্তাদ। এমনকী মাতালু নিজেই প্রত্যক্ষ করেছে, কাঁকরুর স্ত্রী ডেকে ডেকে বনের মধ্যে পুরুষ ডাহুকের সাড়া আদায় করতে পাবে। সে মাতালুর ফাঁদ পাতার গল্প শুনে বলেছিল: ফাঁদ সারারাত বনে থাকলে সে রকমই হয। ফাঁদ পাতলে ফাঁদের পাহারাও দিতে হয়। আর প্রথম পাখিটাকে পাতায় আঠা দিযে আটকাতে হয, আটকে পড়ে সে ডাকতে থাকলে পাখিনী আসে।

তেমন একটা ছোট খাঁচা আবার তৈরি কবল মাতালু দুপাশে দুটো দরজা দিয়ে। আর তা করতে গিয়ে তার মনে পড়ল কাঁকরুর হাত দিয়ে কমলাকে টাকা পাঠানোর আগের দিনের কথা।

সেই সন্ধ্যায় কমলার কাছে যাবে বলে বেরিয়েছিল মাতালু। একসময়ে সে বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল সে মালতীর বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। পথের ধারের সেই জানলাটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখল মালতী ঘবে ঢুকে একটা টেবিলের সামনে বসল। আলোটা বাড়িয়ে দিযে একটা বই খুলল। আজও বোধ হয় লখাই বাড়িতে নেই। সময়েব জ্ঞান ছিল না মাতালুর। মালতী বইয়ে মন বসাতে পাবল না। উঠে একবার পায়চারি কবল। কী মনে কবে উঠে এসে দাঁড়াল জানলাটায়। যেন নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। মাতালু দেয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে সরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থেকে মালতী জানলাটা বন্ধ করে দিযে সরে গেল। মাতালু যেমন তাকে দেখতে পেযেছিল সেও কি তেমন মাতালুকে দেখেনি? সে কি মাতালুব চাপা নিঃশ্বাসেব শব্দে ভয় পেল?

ধান বোয়া শেষ হয়েছে। কিছু না করে বসে থাকার চাইতে কাঁকরুকে খুঁজে বার করে গল্প করা ভালো। কাঁকরুর সঙ্গে কি কমলার দেখা হযেছিল? কাঁকরু বাড়িতে না থাকলে কাঁকরুর স্ত্রী বাড়িতে থাকবে। তাব সঙ্গে পাখি-পাখিনী ধরার বুদ্ধি করা যাবে। এ রকম ভাবতে ভাবতে একদিন আকাশ মেঘমেদুর হয়েছে দ্বিতীয় প্রহরে। মাতালু অনুভব করল এ রকম সময়ে অনেক ছায়ায় বনের রংগুলো বিচিত্র হয়ে ওঠে। বনের মেঝেতে খুঁটে খাওয়া পাখিগুলো সেই আলোয় যেন গাঢ় রঙের হয়ে আরো স্পষ্ট দেখায়।

কাঁকরুর বাড়িতে কাঁকরু তখন মাদুরে শুয়ে ঘুমচ্ছে। তার সন্তান তিনটি দাওয়ায় ধুলোট খেলছে, কাঁকরুর স্ত্রী লাটাই ঘুরিয়ে পাট-সুতলি পাকাচ্ছে।

কাঁকরুর অবেলায় ঘুমনোর ব্যাপারটা সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারল মাতালু। এটা তাব রাতজাগা চাকরি সঙ্গে জড়িত।

কাঁকরুর স্ত্রী বলল, 'বইসেন। ডাকি দেং ঘুম থাকি'।

মাতালু একবার ভাবল সে ফিরে যাবে। কিন্তু সে বরং কাঁকরুর স্ত্রীর কাছাকাছি গিয়ে বসল। অপ্রতিভের মতো হেসে বলল, 'ভাবলং তোমাকে ধরি বনৎ যাং, পাখি ধরিম্'।

'পাখি? কী পাখি? আঠা নাই তো। কেমন করি ধরং? কী হইবে পাখি ধরি'?

কাঁকরুর স্ত্রী পাখি ধরে যেমন সে মাছ ধরে আহার সংস্থানের জন্য। মাতালুর কী দরকার হয়েছে তেমন মাছ বা পাখি ধরতে।

মাতালু বলল, 'জোড়া ধরি পাই পাখি, তো পুষিম্'।

কাঁকরুর স্ত্রী বসে বসে ভাবল। সে উঠে গিয়ে ঘবের মধ্যে থেকে বাখারি, জাল আর দড়িতে তৈরি একটা ফাঁদ নিযে এল। 'ইযাৎ কি হইবে'?

'চল দেখং'।

সেই ফাঁদে পাখি ধরা পড়বে কি না, তার চাইতে পাখি ধরার ঝোঁকটারই সম্ভবত গুরুত্ব ছিল। কাঁকরুর ঘুম ভাঙিয়ে তাকে মাতালুর পাখি ধরার কথা বলে ছেলেমেয়ে তিনটির দিকে চোখ রাখতে বলে কাঁকরুর স্ত্রী মাতালুর সঙ্গে যখন বেরুচ্ছে, কাঁকরু কপট গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করল, 'ফিরিস তো আবার? ভাত রাঁধি দিসতো ফির'?

আধঘণ্টায় তারা বনের প্রান্তে পৌঁছে গেল। সে রকম চলতে চলতে একবার মাতালুর মনে পড়ল জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কাঁকরু কমলাকে টাকাটা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পেয়েছে কি না। সে জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু কাঁকরুর স্ত্রীরই সংবাদটা বলার ইচ্ছা দেখা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সে বুনোপথে যখন তারা ছাড়া আর কেউ নেই, তখন কাঁকরুর স্ত্রী বলল, 'তোমার কমলাক টাকা পাঠাছেন, তোমার বন্ধু কমলার হাতত-এ দিছে কিন্তুক'। মাতালু সংকোচে কিছু বলতে পারছিল না। কাঁকরুর স্ত্রী বলল খুব সকালের দিকেই গিয়েছিল কাঁকরু, আর সে সময়ে দরজা খুলে কমলার ঘর থেকে কনট্রাকটারকে বেরতে দেখেছিল। 'ওই কনটাকটার যাঁয় মালতীক বিয়াও করছে'।

তারা বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ধীরে ধীরে পথ, ঝোপ, ঘাসে ঢাকা বনতল, কোনো কোনো শব্দ উচ্চ নিনাদের থাকে যা মানুষ শুনতে পায় না। মাতালু কাঁককর স্ত্রী কথা শুনতে পেল না। পাখি ধরতে শব্দ না করে ধীর পায়ে অগ্রসর হতে হয়। ধরার মতো পাখি বলতে তো যে কোনো পাখিকে বোঝায় না। সেজন্য বনের মেঝেতে যারা খুঁটে খাচ্ছিল, ডালে বসে যারা ডাকছিল তাদের নিঃশব্দে দেখতে থাকল। এই সময়ে পাখিরাও যাতে না শুনতে পায় এমন করে নিজেকে মাত্র শুনিয়ে বিড়বিড় করে কাঁকরুর স্ত্রী বলল, 'মালতীর সোয়ামী দুই রাত কমলার ঘরে ঘুমাইছে ঠিকই, কিন্তুক দুই দিনেই কমলার শরীর খারাপ ছিল। কমলাই বলছে তোমার বন্ধুক', তার মুখটা কিছু লাল হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা পূর্ণবয়স্ক ফেজ্যান্ট তার দুপাশে ছাই রঙের ডোরাকাটা লম্বা লেজ, লাল পা, সাদা বুক আর কালচে লাল মাথা নিয়ে ঝুপ করে নামল বনের মেঝেতে।

কাঁকরুর স্ত্রী ফিসফিস করে বলল, 'ফাঁদ পাতি? ধরবু এটাক। নাম নাই জানং। আর রং-ঢং পাঁয়তারা দেখি বেটা ছাওয়া মনৎ হয়। এইগুলা কেমন করি বা মাদীগুলাক ডাকে, নাই শোনং'।

কাঁকরুর স্ত্রী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ধনুকের আকারের জালটা পেতে তার নিচে কাউন ছড়িয়ে জালের ধনুকে বাঁধা সরু সুতলি নিয়ে দু-পাঁচ মিনিটে মাতালুর কাছে ফিরে এল। বলল 'এলা সুতা ধরি বসি থাকো। পাখি ফাঁদের নিচে ঢুকি গেলে অস্তে অলপ্ টানি ছাড়ি দেও। মুই যাং। পাখি ধরা গেইলে বাড়িৎ ধরি যাবে। আর যেদু সন্ধ্যা হয়্যা আসে, পাখি নাই পড়ে, ফাঁদ তুলি নেন। রাতত ফান্দে পাখি থাকিলে বনের বিড়াল খায়্যা ফেলবে'।

কাঁকরুর স্ত্রী মাতালুর পাশে দাঁড়িয়ে ফেজ্যান্টটার খাবার খুঁটে খাওয়া, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বসা এসব লক্ষ্য করল। মাতালু তো একটা মোটা গাছের আড়ালে নিজেকে আধখানা লুকিয়েই দাঁড়িয়েছিল। কাঁকরুর স্ত্রীও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাখিটাকে আর ফাঁদটাকে দু-এক মিনিট দেখল। পরে সে, 'মুই যাং এলা' মুখ তুলে মাতালুকে এই কথা বলতে গিয়ে দেখল কনুই থেকে বাঁ পুরো বাহুটায় মাতালুর চোখ দুটো আর কপালে চেপে ধরা।

'আরে, চোখুৎ কোন পড়ছে? দেখং দেখং'।

বলে কাঁকরুর স্ত্রীর মাতালুর চোখ-ঢাকা হাতটাকে টেনে নিল, এর ফলেই মাতালুর নাকের দু-পাশ দিয়ে বেশ খানিকটা জল গড়িয়ে নামল।

কাঁকরুর স্ত্রী দু-এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে খুব আস্তে মাতালুর পিঠে হাত রাখল। গলা নামিয়ে বলল, 'কী বা করং! এলা তোমার বন্ধুর ভাত রাঁধি দেয়া লাগে। আইতত ডিবটি তো। যাং, মুই যাং'।

খানিকটা গিয়ে কাঁকরুর স্ত্রী ফিরে দাঁড়াল, কেমন একটা হাসিকান্না জড়ানো গলায় বলল, 'করিম কী কও? এলা না দোতারা নিয়ে বইসে। যতকেনা ভাত না ধরি দেং পাও দোলায় আর বাজায়, মাথা নাচায় আর বাজায়। শেষে উঠি আইসে ঘিরি ঘিরি নাচে আর বাজায়'।

নিজের বাড়ির উঠানে কোনো পাখিনী বাচ্চা নিয়ে খুঁটে খাবে না তা তো মাতালু বুঝতেই পারছে।

কাঁকরু চিরদিনই দোতারা ভালো বাজায়। সে মন দিয়ে বাজালে তন্ত্রী থেকে মানুষের মুখের ভাষা শোনা যায়। সে ইচ্ছা করলে পাখির ডাক শোনাতে পারে তার তারে। সে যদি তার স্ত্রীকে ঘিরে দোতারায় আকাশ ফাটানো পিউ কঁহা পিউ কঁহা বাজিয়ে নাচতে থাকে তখন তার চারদিকে কলা গাছ লাগিয়ে ঘেরা বাড়িটার মধ্যে কী হয় কে জানে! আজকাল দোতারাটা কাঁকরুর কাঁধেই থাকে। হয়তো মাতালুর কাছে কোনো কাজের কথা বলতে এসেছে, এসেই দোতারা নামায় কাঁধ থেকে, টুং টাং করে বাজাতে বাজাতে একটা-বা গানই করে ওঠে সে—কোন্-আ হস্তে কদমেরো ফুল। পৃথিবীতে কত কন্যাই তো আছে। অম্বর মেঘমেদুব, সেই অতি ক্ষীণ আলোতে হাতে কদম ফুল নিয়ে তাদের পথে দাঁড়ানোও সম্ভব। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এটা কাঁকরুর একরকমের পরিবর্তন। সে আগেব চাইতে ভালো বাজায়, বেশিবার বাজায়, সবই প্রেম আর বিরহের গান। আর এসবই হয়েছে সেই কালো সড়ক তেমন করে জমিটাকে চেটে দিয়ে গেছে, সে যেন স্ত্রীর ভালোবাসার আরো গভীবে পালাতে চায়, সুবের চঞ্চল তীব্রতায় নিজেকে নিমজ্জিত করতে চায়। কিন্তু এ ব্যাপারটা তার বুদ্ধিতে কুলায় না। সে তার ছোট বাড়িটার প্রায় চারিদিক ঘিরে এমন কলা গাছ লাগিয়েছে যে সূর্য যেন তাকে আর দেখাত না পায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'কী করিম ত্যা? কলা রুয়্যা পাত না কাটো তো তাৎ ভাত কাপড়'।

কাঁকরুকে আজকাল একটু শীর্ণ দেখায়, কিন্তু তার দৃষ্টি যেন শাণিত হয়েছে। রাত্রিতে সে আজকাল ঘুমায় না। পরনে নেংটি, কাঁধে কালো সুতোর কম্বল, পায়ে মোটা চামড়ার জুতো। কোনো দিন হাতে গুড়াল বাঁশ থাকে, কোনো দিন থাকে না। কিন্তু দোতারা থাকে। রাত্রিতে একা একা বনে জঙ্গলে টুঁড়ে বেড়াতে হয় তাকে, তখন দোতারার মতো সঙ্গী আর কে?

মাতালু এখন জানে কাঁকরু একসাইজ বিভাগে কাজ কবে। কিছুদিন থেকে তাদের কাজ বেড়ে গেছে। সদর থেকে কয়েকজন ভাটিয়াও এসেছে এখানকার বাহিনীর শক্তি বাড়ানোর জন্য। কাঁকরুর প্রধান কাজ হচ্ছে তাদের এ অঞ্চলের পথঘাট চিনিয়ে দেয়া। বনের মধ্যে দিয়ে যে অসংখ্য সুঁড়িপথ ইতস্তত ছড়িয়ে গেছে—তার কোনো কোনোটা গোলকধাঁধার মতো ক্রমশ গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেছে, কোনোটা-বা গদাধর নদীর পারে শুরু হয়ে অনেক ঘুরে আবার সেই নদীতেই ফিরেছে—এসব বুঝিয়ে দেয়াই কাঁকরুর কাজ। কিন্তু রাত্রির অরণ্যে ভাটিয়া পুলিসরা যেতে চায় না। কাঁকরু তাদের বলেছে দিনের বেলার পথ আর রাত্রির পথ এক নয়।

সকালের নদী আর সন্ধ্যার নদী এক নাও থাকতে পারে। সুন্দর ফুল তুলে নিয়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হতে পারো, কাঁটার আঁচড়মাত্র লেগে শরীর পচে খসে যেতে পারে। চর দেখেই ধানচাষের কথাও ভেবো না, বনভোজনের কথাও না। বুঝে নিতে হবে সে চর হাতি-গেলা চোরাবালি কি না।

কাঁকরুর এখন এই আফিমের ব্যাপারে বেশ জানাশোনা হয়েছে। দক্ষিণে কোথায় জাহাজ বোঝাই করে আফিম আসে। ভাটিয়াদের রাজার বন্দোবস্ত। সেই আফিম অল্প অল্প করে সারা দেশে বিক্রি করা হয়, ছোট ছোট দোকান থেকে যেমন গদাধরপুরের সরকারি গাঁজা আফিম ও মদের দোকান। দক্ষিণের সেই জাহাজী আফিম দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছড়াতে ছড়াতে আসাম ডিঙিয়ে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত যায়। ওই ছোট ছোট দোকানগুলোকে বলে লাইসেনের দোকান। ওই সব দোকানের আফিম গাঁজায় মদে তেমন দোষ হয় না বোধ হয়। হয় কি না তা তো জানাই আছে। মালতীর মেজদাদা

তো লখাই ঠাকুরের দোকান থেকেই কিনেছিল আফিম। আবার দ্যাখো, বাড়িতে নিজের মতো নিজে চকোৎ মদ তৈরি করলে বেলাইসেনি হয়, বেকানুনি হয়, দোষের হয়। কিন্তু লখাই ঠাকুরের দোকান থেকে কিনে আনা মদে সেসব কোনো দোষই নেই। এদিকে কারা আবার ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে আফিম নিয়ে আসছে। এক জাহাজ না হোক, তাও কম নয় কিছু। বরং এমন হয়েছে ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে যেন একটা স্রোত নেমে আসছে। কাঁকরুর উপরওয়ালার মতে, গদাধরপুরের লখাই ঠাকুরের লাইসেনি দোকানের মতো যে দোকানগুলো সব শহরে সব বড় গ্রামে এমন করে সীমান্ত পর্যন্ত ছড়ানো আছে, সেগুলোকে বাড়ির কুয়ো মনে করতে পারো। তাহলে সীমান্ত থেকে দক্ষিণে নামা সেই স্রোতে এসব কুয়ো তলিয়ে যাবে। বন্যায় হয় না?

অনেকদিন থেকেই এ ব্যাপারটা নাকি চলে আসছে। ইদানীং বেশ বেড়েছে। কাঁকরুর উপরওয়ালারা বলেছে, সেই আফিমের যত পথ আছে তার একটা গদাধরের তীরের বনগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। সে পথে পাহারাদার বেখে আফিম আসা বন্ধ করা যায়। কিন্তু চিরকালের জন্য পাহারাদার রাখা যায় না। তার চাইতে যারা আফিম আনে তাদের নেতাকে বমাল ধরা ভালো। চালান বন্ধ হয়ে যাবে।

সংবাদগুলো অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু মাতালুকে একদিন বলল কাঁকরু। যদিও সে তার বুকের পিঞ্জর, তার ছেলেমেয়েদের মাকে, একবর্ণও জানতে দেয়নি। সদব শহব থেকে যারা এসেছে তাদের পথ চেনাতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কাঁকরুর ধারণা হয়েছে, সদরের উপরওয়ালা যে রকম বলেছে, আফিমের পথটা গদাধরপুর থেকেই গিয়েছে, আর সে-পথটাকে সে আন্দাজও করেছে। কাঁকরু মাতালুর টর্চটাকে চাইতে এসেছিল সেই সন্ধ্যায়।

অন্য এক সন্ধ্যায় কাঁকরু এল মাতালুর গুড়াল বাঁশটাকে ধার নিতে। তার নিজের বাটুলের বাঁশটা তেমন স্থিতিস্থাপক নয় আর গুলির জোর কমে গিয়েছে তার ফলে। দূরেও যায় না, জোবেও যায় না। কাঁকরুকে শহর আসা পুলিসরা বলেছে, আফিমচোরদেরও নাকি দারোগাদের মতো কোমরে ঝোলানো ছোট বন্দুক থাকে।

মাতালু তার বাটুল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু বলল, তাহলে কাঁকরুকে একা যেতে দেবে না, সে-ও সঙ্গে যাবে।

'কোটে যাবু'?

'তোর সাথ'।

'জঙ্গলৎ? কেনে তোর দুখ্ কী'?

কাঁকরু জানে কলাগাছের দেয়াল তুলে সূর্যকে আড়াল করলে লাজ অপমান যায় না, বন থেকে পাখিনী ধরতে পারলেও মানুষিনীর অভাব ঘোচে না।

সুতরাং স্থির হল মাতালু যাবে কাঁককর সঙ্গে। এটাকে নিছক একটা শখ বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু মাতালুর মনে অশান্তি ছিল তা থেকে অনুমান হয়, সে হয়তো একটা কিছু অবলম্বন হিসাবে খুঁজছিল। আর অরণ্যের নিস্তব্ধতায় বোধ হয় শান্তির একটা রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; সে রূপ আদিম হতে পারে, তবু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় সুদুর অতীত থেকেই অরণ্যস্তব্ধতার প্রতি তার একটা আকর্ষণ আছে।

কিন্তু কাঁককর কাজ ছিল। সে আগের রাত্রিতে যে গাছের নিচে একটি দামি সিগারেটের বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছিল সেখান থেকেই সে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। আগের রাত্রিতে গাছের উপরে যে আগুনকে দূর থেকে জোনাকি মনে করেছিল সেটা নিভন্ত সিগারেটের আগুন বলে তার ধারণা হয়েছে পরে। জায়গাটা গভীর অরণ্যে নয়, বরং যেখানে গাছগুলো ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এসেছে ক্রমশ অরণ্যের সীমান্তে পৌঁছবার আগে সেখানে, গদাধরের পুরনো খাতের দিকে।

পথে বেরিয়ে মাতালু বলল, 'দোতারা বাজাবু না'?

কাঁকরু দোতারা বাজায় বটে, তবে সেটা এখন নয়, সারা রাত ছুটোছুটির পর ক্লান্তি যখন দুঃসহ হয় তখন, কিংবা হঠাৎ যদি ভয় করে ওঠে গভীর অরণ্যের গাম্ভীর্যে, তখন।

'চোর ভাগি যাইবে'।

'তা যাউক'।

কাঁকরু ভাবল পথেব এই শুরু। এখন কিছুক্ষণ মৃদু শব্দে বাজানো যায়। আর সবকিছু হিসাব করার পর বন্ধুব সঙ্গে এই বাত্রির পথে দোতারা বাজিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা চোর ধরার সার্থকতাব চাইতে কম নয়। হয়তো-বা সভ্য সমাজে একে অপটুতার নিদর্শন হিসাবেই নেয়া হবে।

কাঁকরু দোতারা বাজিয়ে মৃদু স্বরে গান ধরল: হাহারে কুম্‌কুরা সুতা হইলেক লোহার গুনা। হায়, হায়, কী ভাগ্য! রেশমের সূতাও লোহার তারের ফাঁদ হয়ে দাঁড়াল। কেন হয় এমন পৃথিবীতে? অন্য কেউ বলেছে গলার মালা সাপ হয়ে দংশন করেছে। কেউ কি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়লাভ কবতে পারল? লোহার বাসবে কালনাগ প্রবেশ করে। জনবল, ধনবল, চরিত্রবল সব যেন একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই ফাঁদে পড়ে কাঁদা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মাতালু পালাই পালাই করতে লাগল। সে কাঁকরুর গান বন্ধ করার জন্য বলল, 'থামি যা বে কাঁকরু। থামি যা'।

আকাশে আলো আব মেঘ। হলুদ আলো আর সাদা মেঘ। খুব ভালো করে দেখলে মেঘ যেখানে ভাঙচুর হয় সেখানে কখনও হালকা নীল, কখনও হালকা কমলা রং চোখে পড়তে পাবে। এতক্ষণ নদীব ওপারের শহরের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল দিগন্তে। এখন তাও নেই। এ কী রকম নীবস, জীবনহীন, অপ্রয়োজনীয় আলো? জঙ্গল তো তাদের সামনে আর ডানদিকে আর বেশ খানিকটা দূরে। ওখানে যদি আলো ঢোকে তবে বনের সেই দোযাতের কালির রঙে মিশে বোধ হয় সবজে-হলুদ হবে।

কিন্তু যেন সেই নীরস, মবা-হলুদ আলোই কথাটা বলল। এখানে পাখি কোথায় যে তা বলবে?

'কমলাও কি লাইসেনি'?

কাঁকরু ঠাহর করে শুনে বলল, 'লাইসেনি? মুই না জানং। উমরার উটা দোকান? লাইচেঞ্চ? পিরিত না হয়'?

সেই নীরস বিস্বাদ আলোতে কোনো আকার ছিল না। আর সেই একান্ত অভাব থেকেই বোধ হয় শব্দের অভাবও কল্পনা করে মন।

কিছুক্ষণ চলতে না চলতে দু-একটা আরণ্য শব্দ কানে আসতে থাকে। কারণ তখন তো তারা জঙ্গলে ঢুকছে, আর নীল, কালো, সবুজ নানা রকমে মিশিয়ে ঝোপ ঝাড় গাছ ডালপালা বোধ হয় চলেছে আলোর সেই হলুদ কেটে কেটে। অল্পভাষী, গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলা কথার মতো শব্দগুলোকে অর্থবহুল মনে হচ্ছে। সবটুকু বুঝতে না পেরে ভয় ভয় করে। একদিন কাঁকরু খুব ভয় পেয়েছিল।

আজ কাঁকরুর কোনো ভয় নেই। মাতালু রোজ আসবে না। কাঁকরু ভাবছিল, অন্যদিন যা সে পারে না আজ তেমনি সাহসই সে দেখাবে।

টর্চের আলো পায়ের কাছে কাছে ফেলে চলছিল তারা।

মাতালু ভাবছিল জীবনটা যদি এমনি একটানা অন্ধকার আরণ্য পথে চলা হতো বোধ হয় কষ্ট অনেক কম হতো মানুষের।

এ জায়গাটায় বোধ হয় ঝিঁঝিদের একটা কলোনি। কানে তালা লাগিয়ে তারা ডাকাডাকি করছে। একটা পাখি বোধ হয় তাদের অভদ্রতায় বিরক্ত হয়ে থেকে থেকে গম্ভীর গলায় ক্রোক ক্রোক করে উঠছে।

ঝিঁঝিদেব সীমান্ত পার হয়ে কিছু দূরে গিয়ে কাঁকরু থেমে দাঁড়াল। টর্চের মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে গাছগুলোর অবস্থান দেখল। ঠিক পথেই এসেছে সে, সামনের ওই ঝাঁকড়া গাছটার নিচেই সিগারেটের বাক্স সে পেয়েছিল।

লখাই চক্রবর্তী খবর পেয়েছিল মালবাহক তারা দুজন আসবে। এদিকে কাঁকরু ও মাতালু সাবধানে চলছিল, কিন্তু তাদের পায়ের শব্দ হচ্ছিল শুকনো পাতার উপরে। আর তা ছাড়া টর্চের আলো যত স্বল্পস্থায়ী হয়েই জ্বলুক সেটা যে মানুষের হাতে জ্বলছে তা অনায়াসে বোঝা যায়। লখাই আর একটু বুঝতে পেরেছিল—আগন্তুকরা দুজন। সে মৃদুভাবে গলায় খাঁকরি দিল।

শব্দটা কাঁকরুর কানে গেল। সে নিজে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত ধরে মাতালুকেও দাঁড় করালো। দু-তিন মিনিট কোনোপক্ষে সাড়াশব্দ নেই। কাঁকরু ভাবছিল, এই গভীর অরণ্যে ওই মৃদু শব্দের অনুসরণ করা বুদ্ধিসম্মত হবে কি না।

লখাই চিন্তা করল, এরা কাঁকরুর দলের লোকও হতে পাবে, তার নিজের লোকও হতে পারে। কিছুটা ভালো করে না বুঝে আত্মপ্রকাশ করা যায় না।

ঠিক এমন সময়ে বাঁয়ের দিকের একজোড়া টর্চ কিছু দূবে দূবে জ্বলে উঠল কয়েকবার।

মাতালু ফিসফিস করে বলল, 'কাঁকরু রে, মান্‌সি'।

মানুষ তাতে আর সন্দেহ কী। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী বিষ বহন করার জন্য এত কৌশল ও এত বুদ্ধি প্রযোগ করতে পারে না।

লখাই এবার খানিকটা সাহস দেখাল। সে টর্চ দিয়ে ইশারা করার জন্য মাটির উপরে কযেকবার আলো ফেলল।

কাঁকরু বুঝল কারবারিরা সংখ্যায় ভারি এবং তারা দুটো দলে ভাগ হয়ে চলছে। সে চিন্তা করার সময় নিতে লাগল।

এই অবসরে ডান ও বাঁ দিক থেকে কারবারিরা এগিযে গিয়ে সামনে এক জায়গায় মিলল। তাদের কারবার করল। অত্যন্ত চাপা গলায কী আলাপ করল, কাঁকরুরা তা বুঝতে পারল না। তারপর তারা আবার দু'দলে ভাগ হল। একদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, অন্য দলটি যে পথে এসেছিল ফিরে যাওয়ার জন্য সে পথই ধরল।

এর নামই নাকি কারবার? এরই জন্য মানুষ এত বিপদের ঝুঁকি নেয়, আর একে বন্ধ করার জন্যই সরকারের এত তোড়জোড়! কাঁকরু বিস্মিত হয়ে দেখছিল ব্যাপারটা। কর্তব্যবোধের তুলনায় কৌতূহলই তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

যে দলটি সামনের দিকে যাচ্ছিল বলে মনে হয়েছিল, সেটা প্রকৃতপক্ষে দল নয়—লখাই একা যাচ্ছিল আন্দাজে পুবদিক লক্ষ্য করে। তার মনে কিছুটা নিশ্চিন্ততা এসেছে, সিগারেট ধরিয়েছে সে। তার এক হাতে একটা সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগ, অন্য হাতে টর্চ। একসময়ে সে চামড়ার ব্যাগের পরিবর্তে ধানের বস্তা ব্যবহার করত, দেশলাই জ্বেলে পথ দেখত। কিন্তু হঠাৎ তার কানে এল শব্দ—শুকনো পাতার উপর কারা হাঁটছে।

প্রাণী নাকি? বাঘ? ব্যাগ নিয়ে গাছে উঠে বসবে? ব্যাগটা গাছে রেখে পালাবে? না তা সম্ভব নয়। জীবনে এই শেষবার সে প্রলুব্ধ হয়েছে। যে করেই হোক বিভীষিকার রাত্রি যেন আজকের

রাত্রির সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। রাত্রি শেষ হওয়ার আগে আফিমসমেত ব্যাগটা হস্তান্তরিত করবে সে। কিন্তু শুকনো পাতার মর্মর যেন এগিয়েই আসছে।

তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ফিরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল। প্রাণী হলে ভয় পাবে, মানুষ হলে চিন্তা করবে।

কিন্তু আলোয় সে দেখতে পেয়েছিল প্রাণী নয়, মানুষই আসছে তাকে অনুসরণ করে এবং পরমুহূর্তে টর্চ নিবিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে সে শুনতে পেল তার অনুসরণকারীরাও দৌড়ুচ্ছে। সে বুঝল এরা আর কেউ নয়—সে যাকে ডালকুত্তা বলে সেই কাঁকরুরই দল। কিন্তু ভেবেছ তোমরা লখাই-এর বয়স হয়েছে? এই অরণ্যপথ তোমাদের বেশি পরিচিত? সে সোজাপথটা ছেড়ে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে সম্ভব মতো নিঃশব্দে ছুটে চলল গভীর অরণ্যের গোলকধাঁধার পথে।

কিন্তু বয়স লখাই-এর হয়েছে। ফুসফুসে একটা ভার বোধ হচ্ছে তার। সে একবার পিছন ফিবে দেখল পিছনের আলো দুটোর মধ্যে একটা ব্যবধান দেখা দিয়েছে। একটার প্রায় একশো গজ পিছনে অন্যটি। তা ছাড়া একটা টর্চ অন্যটা বাঁশের মশাল হবে। সে দৃঢ়সংকল্প হয়ে দাঁড়াল। একটাকে আহত করতে পারলে অন্যটি তার সেবাশুশ্রূষা করার জন্যই থমকে যাবে যদি এক দলেরই হয়, সেই অবসরে সে পালিয়ে যেতে পারবে। সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালিয়ে ওদের প্রলুব্ধ করতে লাগল।

মাতালুই আসছিল আগে। সে অপ্রস্তুত ছিল। মশাল হাতে লখাই-এর পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে সে ভাবছিল গেল কোথায় লোকটা, ঠিক সেই মুহূর্তে তার উপরে লাফিয়ে পড়ল লখাই। টর্চটা ঘুরিয়ে মারল মাতালুর মুখে। মাতালু পড়ে গেল, তার মাথাটা ঠুকে গেল গাছের গুঁড়িতে। লখাই যা ভেবেছিল তাই হল, লখাই দূর থেকে দেখল কাঁকরু এসে মাতালুর কাছে থেমে গেল।

মাতালুর আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু বয়স তার পক্ষে ছিল। লখাই দু-তিনশো গজ এগিয়ে গিয়েছিল মাত্র। তাবপবই সে দেখতে পেল একটা টর্চই কিন্তু তাকে অনুসরণ করে ছুটে আসছে।

লখাই স্থির করল ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁকরুর সঙ্গে এক্সাইজের লোক থাকার কথা। মাতালু কেন? টর্চ দিয়ে যাকে সে মেরেছে সে যে মাতালু সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে স্থির করলে ভয় দেখানো দরকার। কাঁকরুর টর্চ আর একবার জ্বলতেই সে রিভলবার থেকে দুবার গুলি করল। টর্চ নিবে গেল। কিন্তু লখাই আ আ কবে আর্তনাদ করে উঠল। তার রিভলবার ধরা আঙুলে, কপালে, গালে অন্তত তিন-চারটে বাটুলের গুলি লেগেছে। বাঁ চোখের উপর থেকে বেশ মোটা হয়ে রক্ত পড়ছে অন্ধকারেও বোঝা যায়।

প্রায় মধ্যরাত্রি হল, কিংবা সে সময়টাও পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অন্ধকার অরণ্যের গোলকধাঁধার পথে আরো দু'বার ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল পলাতক এবং অনুসরণকারীরা। মাতালুই বারবার কাঁকরুর চাইতে এগিয়ে থাকছিল বলে সংঘাতটা তার সঙ্গেই হয়েছে। তার ফলে আঘাতের দরুণ মাতালুর একটা চোখ ফুলে উঠেছে, মাথার পিছন দিকে খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে; আর লখাই-এর বাঁ চোয়ালটার যেন জোড়া খুলে গেছে। দ্বিতীয়বারের সংঘাতে মাতালুর আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। মাতালুর ঘুষি খেয়ে লোকটা পড়ে গেলে মাতালু থমকে দাঁড়াল। লোকটার হাতের টর্চটা তখনও জ্বলছিল। সেই আলোয় মাতালু তাকে চিনতে পেরেছে—লখাই চক্রবর্তী, মালতীর স্বামী। চিন্তা করতে হয়েছিল মাতালুকে, সেই অবসরে লখাই আবার পালিয়েছে তার টর্চ ও ব্যাগ নিয়ে।

স্নিগ্ধ রাত্রিতে ভেজা ভেজা সবজে আলোতে শান্ত গাছগুলো বিশ্রাম করছে। আর তিনটি ঘর্মাক্ত মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে এক নির্বোধ খেলায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। এ রকমও বলা যায়।

শক্তি, কৌশল ও বুদ্ধির দম্ভ লখাই-এর মন থেকে সরে যাচ্ছে। এখন আর সে আগেকার দিনের মতো বন্ধনহীন কেউ নয়—এ কথাটাই মনে হচ্ছে তার। প্রাণ থাকতে ধরা দেয়া যাবে না—প্রাণের চাইতে বড় না হলেও মানসম্মান, সমাজ, মালতী সব যেন সেই প্রাণের তুল্য মূল্যবান কিছু। দুদিকে বাঁচানোর চেষ্টাই আরো কঠিন হচ্ছে।

মধ্যরাত্রিতে যে চাঁদ উঠবার কথা ছিল তা উঠেছে। বনও এখানে হালকা হয়ে এসেছে। আগেকার দিন হলে, ম্লান আলোয় পথ দেখে খোলা জমিতে সে তীরবেগে ছুটে পালাত, কিন্তু আজ তার বন থেকে বেরুতে সাহস হচ্ছে না। এই অস্পষ্ট অন্ধকার তবু ভালো। হয়তো ওরা এখনও তাকে চিনতে পারেনি। আর একটা কথা ইতিমধ্যে পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে, ছুটোছুটি করে এদের সঙ্গে আর পারবে না সে। পুরনো নদীর একটা শাখা বনের মধ্যে এবারের বর্ষায় ঢুকে পড়েছে এখানে। এই খালটার এপার থেকে ওপারে কয়েকবার যাওয়া-আসা করে ওদের ধোঁকায় ফেলে পালানোই একমাত্র নিষ্কৃতির উপায় এখন। সেই অবসরে শেষবারের মতো কোনো কৌশল আবিষ্কার করতে হবে।

আফিমের ব্যাগটা সে ইতিমধ্যে ফেলে দিয়েছে, এখন শুধু আত্মগোপন করে সরে পড়া। ওরা দুখিয়ার কুঠি থেকে বেরিয়েছে, আব সে যদি পুবের পথ ছেড়ে দিয়ে সেই গ্রামেই ফিরে যায়?

দুখিয়ার কুঠি, ডাঙ্গরআই, সেই পেনসিলে টানা ভ্রূ, সেই বসন্তের পাখির পুচ্ছেব মতো খোঁপা থেকে বেরিয়ে থাকা চুলের গোছা। সেই হাতিব দাঁতের শরীর।

মাতালু ভাবছিল: মালতীর স্বামী তাতে তার কী? এই ছুটোছুটি ও ঘাত-প্রতিঘাত একটা বৈরী ভাব জন্মিয়েছে তার মনে। তা ছাড়াও আর একটা অন্ধ যুক্তিহীন বিদ্বেষও যেন জেগে উঠছে সেখানে। তার স্বরূপ সে বুঝতে পারছে না, কিন্তু মূলত সেটা মালতীকে অধিকার করা নিয়ে। আর কমলাও? যেন লখাইকে আঘাত করা দরকার। কিন্তু মালতীর আপনজন তো। লখাই মরলে মালতী কাঁদবে। আহা!

লখাই ভাবল: মাতালুকে সে চিনতে পেরেছে, তেমনি তারও তাকে চিনতে পারাই সম্ভব। তাহলে এ লুকোচুরিতে আর লাভ কী? লাভ কী? কিন্তু এখন যদি ডাঙ্গরআই তাকে একটা রাত্রিও আশ্রয় দেয়, দয়া কবে, তারপরে মাতালু কি আর কলঙ্ক ছড়াতে পারবে? ডাঙ্গরআইকেও তো অনুরোধ করা যেতে পারবে মাতালুকে নিষেধ করে দেয়ার জন্যে। আকস্মিকভাবে ডাঙ্গরআই-এর কাছে অভিমান জানানোর মতো মনের অবস্থা হল তার।

বহুদিন এমন গভীর করে সে চিন্তা করেনি ডাঙ্গরআই-এর কথা। আশ্রয় হিসাবে চিন্তা করতে গিয়ে অনেক স্মৃতি জেগে উঠল লখাই-এর মনে। সেই মৃদুভাষিণী মেয়েটির এখন বয়স হবারই কথা। প্রায় প্রৌঢ়া হল সে। তাহলেও অমন যে সুন্দরী ছিল সে কি এত তাড়াতাড়ি বিকৃতরূপা হয়েছে! এই ক্লান্তি, এই বিপন্নতার তুলনায় তার আশ্রয়কে শান্তির স্বর্গ বলে মনে হতে লাগল লখাই-এর। কী স্নিগ্ধ সমাদরই ছিল তার।

হায় ভগবান! তার সেই ষোল-সতেরো বয়সে কি বোঝা সম্ভব ছিল সেই নাকবোঁচা আদিবাসিনী কী অপূর্ব রূপসী, তার পাখির মতো গলার স্বরে বলা সেই ভাষায় সেটা কী অভিজাত আদবকায়দা?

শুধু মাতালু নয়, কাঁকরুর উপরেও যথেষ্ট প্রভাব আছে ডাঙ্গরআই-এর ; নিন্দা-পরিবাদের গুঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে ডাঙ্গরআই যদি একবার মাত্র তাকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এখন কি সে তার সব দোষ ক্ষমা করবে? এবং তা এতদিন পরে?

করতেও পারে। লখাই যতদূর জানে, সে অন্তত প্রকাশ্যে আর কোনো পুরুষকে নেয়নি।

তা ছাড়া, এক্‌সাইজের ব্যাপারে দুখিয়ার কুঠিতে একটি পরিবারের কিছু দুর্বলতা আছে।

ডাঙ্গরআই রাজধানী থেকে একটা নেশা নিয়ে এসেছিল—সেটা মদের। রাত্রিতে শুতে যাবার আগে তখনকার দিনেও দু-তিন চামচ মদ না হলে চলত না তার। এখন মদ তৈরি করে রংবর। আর এই দুর্বলতা এখনকার এক্‌সাইজের চোখে অপরাধ হয়ে আছে এটা যদি ডাঙ্গরআই-এর মনে বদ্ধমূল করে দেয়া যায়, হয়তো লখাইকে গ্রহণ না করার পক্ষে তার প্রতিরোধ কিছু দুর্বল হবে। একই অপরাধে অপরাধী দুজন।

দু-তিনবার শাখানদীটার দু'পারে লুকোচুরি খেলা হয়েছে। কাঁকরুদের সঙ্গে তার ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। এরপরে ইচ্ছা থাকলেও আর দুখিয়ার কুঠিতে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না সে। পা দুটো এত ভারী হয়েছে যে প্রতি পদক্ষেপে গতি কমে যাচ্ছে তার। আর দশ মিনিট, আর পাঁচ মিনিট। তারপরেই কাঁকরু তার বুকের উপরে বসে হা হা করে হেসে উঠবে। এখানে আর বনের আড়ালও নেই। বর্ষায় এই খাতে জল নামলে যে প্লাবন হয়েছিল তা সাময়িক হলেও দু'পারের বনারণ্যকেও ধ্বংস করে গিয়েছে। যে বড় গাছগুলো ভেঙে উপড়ে ভেসে যায়নি সেগুলো ধুলো রঙের আলোয় কঙ্কাল যেন।

একবার তার মনে হল এখানে দাঁড়িয়েই সে ঘোষণা করবে ডাঙ্গরআই-এর সঙ্গে তার পূর্ব সম্বন্ধের কথা।

মাতালু দেখল লখাই আর পারছে না। এদিকে কাঁকরুর চোখেও একটা তীব্রতা দেখা দিয়েছে। সে তার কাঁধ থেকে শুড়াল বাঁশ হাতে নিয়েছে আবার। যদি লখাই ধরা না দেয় তাকে আহত করেও ধরবে এই তার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় মাতালু দেখতে পেল লখাই আবার নদীর জলে নামল। নদীর এপার-ওপার করে চোখের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তবু যেন অভ্যস্ত কোনো পাঠের আবৃত্তির মতো লখাই তাই করে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাও। দু'পক্ষই যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ যেন নয় আর।

ইতিমধ্যে মাতালু ও লখাই একবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিল। লখাই ভেবেছিল সে নদী পার হলেই মাতালুরাও নদী পার হবে অনুসরণ করে। তারা যে তা একবার নাও করতে পারে এ যেন তার মাথায় আসেনি। ফলে প্রায় শুকনো অল্প জলের নদীখাত পার হয়ে অন্য পারে উঠে সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একে তো এবার পার হওয়ার সময় সেই স্বল্পজলের বালির খাতে প্রতি পদক্ষেপেই সে হাঁটু পর্যন্ত বসে যাচ্ছিল। তার ভয়েই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তার মধ্যেই সে দেখতে পেল কয়েক হাত দূরে কঙ্কালসার শাল গাছটার আড়ালে মানুষ যেন। তারা যে মাতালু আর কাঁকরু, বৃথা খাল পারাপার না হয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছে, এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। লখাই দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বল্লম উড়ে এসে তার এক হাত দূরের মাটিতে গেঁথে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর্ত চিৎকার করে লখাই বিপরীত দিকে ছুটতে গেলেও ঠিক সেই ব্যাপারই হল। বরং আরো মারাত্মক। সেই দ্বিতীয় উড়ন্ত বল্লম থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে সে মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কে তার বুকের উপরে চেপে বসল। বজ্রমুষ্টিতে মাতালু লখাই-এর গলা চেপে ধরেছিল। গভীর অরণ্যের এই মরা আলোর গলিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জন্তুর মতো বর্তমানের হিংস্র উল্লাস ছাড়া আর কোনো অনুভবই ছিল না তাদের তখন। হঠাৎ লখাই সেই নীরবতার মধ্যে আর্তস্বরে কী বলে উঠেছিল। তখন আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় তার সমগ্র চেতনা সমস্ত দৈহিক শক্তি একাগ্র করে আর্তনাদটাকে সৃষ্টি করতে পেরেছিল সে। নতুবা অত স্বল্প কথায় এত গভীর, এত তীব্র করে, এতখানি সংবাদ দেয়া যায় না। লখাই-এর গলা থেকে

মাতালুর বজ্রমুষ্টি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল, সে সরে এসেছিল। লখাই কিছুক্ষণ পড়ে থেকে পরে উঠে পালিয়েছিল আবার।

এক অদ্ভুত, অপ্রাকৃত ব্যাপারই যেন। এই আলোটা। এটা শেষ রাতের চাঁদের অথবা প্রথম সকালের সূর্যের তাও বোঝা যাচ্ছে না। পলাতক আর তার অনুসরণকারীরা বুঝতে পারছে না তারা এখন কোথায়—তারা এখন গদাধরের পারে অথবা সেই নতুন প্রবাহটার তীরে। দু'পারই সমান দেখতে। কোথাও- বন নদীর ধারে ঝুঁকে, কোথাও-বা তা নদীর পারে পঞ্চাশ-ষাট হাত ঝোপঝাড় ঢাকা সাদা রঙের মাটি রেখে দূরে। মাঝখানে খাতে কোথাও শ্যাওলা ঢাকা মাটি, কোথাও বালি, কোথাও-বা জল। বালি আর জল সমান চিকচিক করছে সেই অপার্থিব বিবর্ণ পাণ্ডুর আলোতে। তারা এখন গদাধরপুর শহরের পারে কিংবা দুখিয়ার কুঠির পারে তাও আর বলা যাচ্ছে না। উত্তর-দক্ষিণে এই আধ মাইল মতো নদীখাতটাকে পূর্ব-পশ্চিমে কতবার তারা পারাপার করেছে, তারও হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।

কেমন যেন একটা গোলমাল লাগছে মাতালুর। সবকিছু মিলে তাকে যেন বুদ্ধিহীন করে দেবে। মালতীর স্বামী লখাই, এই কথাটাই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই মৃদু আলোর চার দেয়ালের মধ্যে মালতীর কাছে অবাধ গতিবিধি যার। একটা বিদ্বেষ পোষণ করার ইচ্ছা হচ্ছে মনে, পরক্ষণে সেটা মিলিয়েও যাচ্ছে। মালতী সভ্যতা সম্বন্ধে ফিসফিস করে কী সব ধিক্কার দিয়েছিল সেই রাত্রিতে, তার কথাও মনে হচ্ছে। সভ্যতার একি চোরাবালির মতো ব্যবহার।

লখাই নদীর মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লান্ত শেয়ালের মতো তার দৃষ্টি। নদীখাতে জল নেই, চকচকে বালি, কোথাও-বা একহাঁটু জল। জল বাঁচিয়ে পার হযে যাচ্ছে লখাই, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। মাতালু নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, দিশি ভাষায় লখাই কেন তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করল? আত্মরক্ষার ছল? কিন্তু অন্য কোনো ছলনা কি তার ভাটিয়াসুলভ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উদ্ভাবন করতে পারল না? আর কী বোকা সে, আর্তনাদ শুনে তার মুঠি খুলে গেল। তা বোধ হয় ভালোই হয়েছে। নতুবা হয়তো নরহত্যা ঘটে যেত।

মাতালু আগে আগে চলছিল। সে এসে নদীর পারে দাঁড়িয়েছিল। কাঁকরু সেখানে পৌছালেই সে নদীখাতে নামবার জন্য পা বাড়াল।

কাঁকরু বাধা দিয়ে বলল, 'রইস'।

'কেনে? চোর ভাগি যায়'।

'যাউক কেনে'।

অবশ্য চোরের আর পালানোর ক্ষমতা নেই। লখাই যেন ক্লান্তিতেই ধুঁকছে। তা ছাড়া মাতালু ইচ্ছা করা মাত্রই গুড়াল বাঁশ হাতে নিয়ে তার পালানো একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে।

কাঁকরুর ভয় ভয় করে উঠল। দিনের আলো ফুটলে সে হয়তো বলতে পারবে তারা কোথায় এসে পৌছেছে। এই অল্প জলের নদীখাত, এই শ্যাওলা ঢাকা পচামাটি; এই নতুন জমতে শুরু করা চরগুলো এসব সম্বন্ধে কিছুই তার জানা নেই। এই নীরস বিবর্ণ চাঁদের আলো সেসবকে আরো অপরিচিত করছে। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ কি ভালো হচ্ছে? নদী মাটি নয়। তার এক পৃথক সত্তা আছে। অপরিচিত খাতে এ রকম ভাবে, একবার দুবার নয়, বহুবার অজ্ঞাত বিপদকে লঙ্ঘন করতে থাকা উচিত হচ্ছে না।

মাতালু ভাবল : কমলাকে নিয়ে ভালোই ছিল সে। আকস্মিকভাবে মালতীর দেখা পেল আবার। কিন্তু কী ভাববে সে। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

'ভাবিস কী, নে গুড়াল বাঁশ, মারি দে'।

মাতালু হাসল। হঠাৎ তার মনে হল কাঁকরুর হাত থেকে লখাইকে বাঁচাতে হবে। লখাই হাতেনাতে

ধরা পড়ুক তা সে চায় না। সে কাঁকরুকে মিথ্যা করে বোঝাল ঘোরাপথে গিয়ে আকস্মিকভাবে লখাই-এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লখাই ওপারে উঠে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলছে। মাতালু ঘোরাপথে পশ্চাদ্ধাবনের ভান করে দৌড়ুতে শুরু করল নদীর খাত বেয়ে। মাতালু আগে, পিছনে কাঁকরু। লখাইকে ভয় দেখানোর জন্য যেন সে একবার হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না সে কী করা উচিত তার।

আকস্মিক আর্ত চিৎকারে কাঁকরুর বুক হিম হয়ে গেল। নদীর বুকে এখানে-ওখানে ছোট ছোট কাশের ঝোপ। তারই একটার আড়াল থেকে মাতালুর আর্ত চিৎকার ভেসে এল।

'কাঁকরু রে, মোক বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও'।

কাঁকরু ভাবল পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে মাতালু।

'আইসং, ভাই, আইসং'।

দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল কাঁকরু।

এদিককার পাহাড়ী নদীগুলির খাতে এখানে-ওখানে চোরাবালি থাকে। দূর থেকে দেখে বালির চড়া বলে মনে হয়। কিন্তু সে চোরাবালিতে হাতি পড়লে তারও বাঁচোয়া নেই।

এরই মধ্যে কোমর অবধি ডুবে গেছে মাতালুর। দুই হাত মেলে সে শূন্যে আশ্রয় খুঁজছে, কাঁদছে, আর্তনাদ করছে।

কাঁকরু চেষ্টা করল গায়ের কম্বল ছুঁড়ে মাতালুর হাতে পৌঁছে দিতে। সে নিজে নামল খানিকটা চোরাবালিতে, শুয়ে শুয়ে চেষ্টা করল মাতালুর কাছে পৌঁছাতে, বল্লমটা ছুঁড়ে দিয়ে মাতালুর কাছে অবলম্বন পৌঁছে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু উঠে আসতে হল তাকে। মাতালু হাহাকার করছে, 'বন্ধু রে, কাঁকরু রে, বাঁচা মোক বাঁচাও'।

কয়েকটা মুহূর্ত। বুক পর্যন্ত ডুবেছে মাতালু। হঠাৎ আর্তনাদ থেমে গেল মাতালুর। সে কাঁদতে লাগল, 'মা বে, মা রে, তোর মাতালু গেইছে। আজা রে, গেইছে তোর মাতালু'।

গলা পর্যন্ত তলিয়ে গেল মাতালুর। একটা বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে। একেই মৃত্যু বলে? সে স্থির হয়ে গেল। চোরাবালি তার কাছে নতুন নয়। অনেক কাহিনী সে শুনেছে।

কাঁকরু কথা হারিয়ে ফেলেছে। সুস্থ সবল মাতালু। একটা চোখ লখাই-এর আঘাতে ফুলে আছে। তা সত্ত্বেও এত সুন্দর যেন কখনই মাতালুকে আর দেখায়নি, আজকের এই ম্লান চাঁদের আলোয় যেমন দেখাচ্ছে।

কিছুই করার নেই, কিছুই করার নেই।

অনেক কথা উঠে আসছে মাতালুর মনে। তার ঠোঁট কাঁপছে, ফুলে ফুলে উঠছে। বোধ হয় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ; বুক ওঠানামা করছে, থরথর করে কেঁপে উঠছে। বোধ হয় তার মস্তিষ্ক অবশ হয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাব।

মাতালু বলল, 'বন্ধু রে, মোর ছাওয়া আছে নাকি জলপরীর ঘর'?

ঠোঁট পর্যন্ত ডুবে গেছে মাতালু।

রাত্রিশেষে কয়েক গুচ্ছ কাঁচা কাশফুল মাতালুর সমাধিতে ছড়িয়ে কাঁকরু ফিরে চলল দুখিয়ার কুঠিতে। তার শেষ কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে। নিজেকে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখলে এই বোধ হয় মনোভাব হয় মানুষের। নিজের চিহ্ন রেখে যেতে সাধ যায়। কিন্তু কী খোঁজ নেবে কাঁকরু!

মাতালুর জলপরী যে কমলা তা সে জানে। বহুসেবিকা সেই সব নারীর প্রেম এবং দেহ সমান বন্ধ্যা হওয়াই স্বাভাবিক।

দুখিয়ার কুঠিতে ঢুকবার আগে কাঁকরু নিজের চোখ দুটি ভালো কবে মুছে নিল। খবরটা দিতে হবে। সে চোখ তুলে চাইতে পারছে না। তবু তাব চোখে পড়ল গদাধরের ব্রিজের মাথায় চড়ানো আলো যা এই সকালেও জ্বলছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে মজুরদের কাজে ডেকে। তার শব্দ যেন কানে এল। পুরোদস্তুর শহুবের কলের বাঁশির মতো রোলার ইঞ্জিন কয়েকটি একসঙ্গে তীব্র চিৎকার করে উঠল।

কাঁককর পাশ দিয়ে আন্ত্যজদের মতো কয়েকজন খালি ঝাঁকা মাথায় চলে গেল। শহরের জন্য আনাজ তরকারি সংগ্রহ করবে তারা। ইতিমধ্যে গ্রামের পথে পথে তারা ছড়িয়ে পড়ছে।

মাতালুদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে আর্তকান্নায় ভেঙে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল তার মনে। কথা হারিয়ে যাচ্ছে। দুঃখের সীমাহীনতাকে ধবার পক্ষে কোনো হাহাকারই যথেষ্ট নয় আর।

মাতালুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল কাঁকরু ডাঙ্গরআই-এর বিছানার উপরে বসে আছে লখাই চক্রবর্তী। হাসি হাসি মুখ তার। সেজন্য ক্লান্তির অবসাদ বোঝা যাচ্ছে না। সে বোধ হয় রাত্রির অবশিষ্ট সময়টুকু ঘুমিয়ে নিতে পেরেছে। একটা আকস্মিক ক্রোধ কাঁকরুকে যেন বিদীর্ণ করে দেয়ার জন্য তার বুকের মধ্যে চাপ দিতে লাগল।

কিন্তু এ কী—এ কী? চোখকে কি অবিশ্বাস করতে হবে! ডাঙ্গরআই এসে দাঁড়াল। তার মুখেও হাসি হাসি ভাব। সে মুখ যেন লজ্জাতেও সুন্দর। এই সকালেই যেন কিছু প্রসাধন করেছে ডাঙ্গরআই? অন্তত লতানো চুলে কপাল ঢাকা। ধবধবে সাদা মলমল তার পরনে। কাঁকরু জানত মাতালুর দরুন কোনো এক পুরুষকে স্নেহ করেছিল ডাঙ্গরআই। লখাই কি সেই ভাগ্যবান?

ঘবের এক কোণে আলনায় মাতালুর প্যান্ট ও সার্ট মৃদু হাওয়ায় দুলছে। যেন অসহায় তারা।

কাঁকরুর মুখে যে লবণাক্ত স্বাদ সেটা কি হিংসার না তার কান্নার?

তার মনে হতে লাগল ডাঙ্গবআই-এর এই ব্যাপাবটা কি পুড়ে যাবে না মাতালুর সংবাদ শোনামাত্র। কাঁকরুর বুকের মধ্যে কে যেন বারংবার বলছে—প্রতিশোধ নাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। কিন্তু অবাকও লাগছে ডাঙ্গরআই-এর মুখের প্রশান্ত লঘুতা দেখে।

হঠাৎ যেন রংবরের আদিম স্থবিরতার আত্মা একটা কুয়াশার মতো আবৃত করল, আত্মস্থ করল কাঁকরুকে। কাঁকরু দেখতে পেল স্থবির রংবর গোরুগুলোকে খেতে দিচ্ছে। কোনো কোনোটিকে আদর করছে। কাঁকরুর মনে হল কী হবে দুঃসংবাদ দিয়ে ডাঙ্গরআইকে? কী লাভ প্রতিশোধ নিয়ে লখাই চক্রবর্তীর উপবে? যে গেছে সে তো আর ফেরে না। একটু ক্লান্তি যেন নামছে কাঁকরুর রক্তে। একটা স্নিগ্ধ বেদনার কান্না যেন তার রক্তপ্রবাহে মিশতে শুরু করেছে।

আই কাঁকরুকে দেখতে পেয়েছিল।

'কী রে কাঁকরু'?

কী সুন্দর দেখাচ্ছে আইকে। এমনি ধীর সস্নেহ সলজ্জ অথচ উদাস তাব ভঙ্গি।

'মাতালু ভাগি গেইছে'। হাসার চেষ্টা করল কাঁকক।

'কোটে গেইল'?

'ইদি'। পুবদিক দেখিয়ে দিল কাঁকরু। কী লাভ কারো শান্তিকে বিঘ্নিত করে?

নির্বাস

গল্পটা না বলে উপায় নেই। কারণ চেতনায় অন্য কারো জীবনের ছায়া যদি মুহূর্তের জন্যও পড়ে তবে সে বাইরের বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ছায়াটাকে বিশ্লেষণ করে দেখা, তা নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কথায় গল্পটা বলে ফেলা। আমাদের চেতনা শুক্তির মতো কেন ছায়াটিকে আত্মস্থ করার চেষ্টায় মুক্তা তৈরি করে না তা অন্য কথা।

বিশ্লেষণটা হয় বুদ্ধির সাহায্যে। বুদ্ধি যুক্তিজীবী। খণ্ড খণ্ড ধারণাকে যুক্তির সাহায্যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলে দেখায় সে। মানুষ এবং বেদনার্ততাকে সে সংযুক্ত করে বলে 'মানুষ হয় বেদনার্ত'। তারপর সে ভাবে আর বলে, মানুষ কেন বেদনার্ত হয়। আর তা সে করে কথা দিয়ে।

কথা, কথা। গল্প কি বলা যায়? এখানে প্রতিটি শব্দই একটি খণ্ড প্রত্যয়কে ধরে আছে। প্রত্যয়ের নামরূপ কথা। প্রতিটি প্রত্যয়ই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের বাঁধনে বাঁধা। এ দিয়ে মানুষের দেহটাকে গড়ে তোলা যায়, তাকে সচেতন করা যায় না। বুদ্ধিব সাধ্য কি তার এই কথার ইটে জীবনবেগ গড়ে তোলে?

তা যদি হতো, ইস্কুলমাস্টারের বউ বিমি বলতে পারত, অন্তত বুঝতেও পারত, এই দুপুরে কেন সে কালো-পথটাকে পার হয়ে হয়ে এই রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে এসে বসেছে। আর, এক সপ্তাহে এই তৃতীয় দিন। বার বার তিনবার।

বিমি, বিমলা, বিমলপ্রভা।

আমাদের এই উনষাট খ্রিস্ট বৎসরে বসন্ত বলে কোনো ঋতুকে সাহিত্যে আনতে চাই না। কারণ বসন্তের সঙ্গে যে স্মৃতিগুলি সেকালের কবিরা জড়িয়ে রেখেছেন, আমাদের এই ফাল্গুন মাসের বর্ণনা করতে গিয়ে যদি সেগুলি মনে আসে, তবে সেটা নষ্ট হবে, এখানেও ভ্রষ্ট হব। এটা এখন তা সত্ত্বেও বসন্ত। শীতের আমেজ নেই, তা নয়। রৌদ্রে স্নান করা পরিচ্ছন্ন প্রান্তর। দুপুর পার হয়েছে। এখন প্রান্তরটা রোদ পোয়াচ্ছে যেন। আর তা ভালোও লাগে। বিমি এখন যাকে বাড়ি বলে সেখানে এই দুপুরেও রোদ নেই। এই প্রান্তরে আছে।

দূর্বা জাতীয়ই হবে প্রান্তরের আচ্ছাদন। কেমন যেন কাঠি কাঠি। কোমল ও নমনীয় নয়। বরং ক্ষণভঙ্গুর, পুট পুট করে ভেঙে যায় হাতে করে তুলে নোয়াতে গেলে। মাটি বোধ হয় তেমন উর্বর নয়। উর্বর হলে কি চাষ না করে ফেলে রাখত—এত বড় একটা মাটির চত্বরকে?

যেখানে সে বসেছে তার অদূরেই লতাকুলেব একটা ঝোপ। ফল থাকার কথা নয়। পাতাও কম। কাঁটা আছে। আর কাঁটা ও পাতার উপরে ধুলো। এই কাঁটা বেয়ে বেয়ে সোনালিরঙের একটা পরগাছা উঠেছে। একেবারে খালি খালি লাগত বিমলার যদি এই ঝোপটা না থাকত।

প্রান্তরটা তাই বলে প্রকৃতির হাতে নেই। চোখ তুলে তাকাতেই সে কাঁটাতারের ঘেরটা দেখতে পেল। ঘেরটা এখন নিশ্ছিদ্র নয়। কোথাও কোথাও একেবারেই লোপ পেয়েছে। লোহার খোঁটাগুলোরও সব নেই। সতেরো বছর ধরে রোদজলে টিকে থাকার কথা ভাবতে গেলে লোহাকেও দোষ দেয়া যায় না। ভিতরে এখনও সারি সারি তাঁবু। সেগুলিও বয়োজীর্ণ। কোন কালে কী রং তার ছিল এখন তা ভেবে লাভ নেই। এখন সব এক রং—কালচে ধূসর বলা যায়, কিন্তু আসলে সে রং পচনশীলতার। সেগুলোকে সতেরো বছর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে নাকি?

এখানে সৈন্যবিভাগের একটা বড় রকমের ঘাঁটি ছিল। কী করত তারা? কী উদ্দেশ্য? রাজপথ তৈরি?—না। রাজপথ দিয়ে যে বাহিনী চলাচল করবে তাদের গতি নির্দেশনা? বেয়াল্লিশে বসেছিল

পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত ছিল।

আর এটা যে সৈন্যদলের ঘাঁটি ছিল, তা অন্য কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়। কয়েকটি হাওয়া-জাহাজের মোচড়ানো দোমড়ানো ভগ্নাবশেষ এখনও পড়ে আছে প্রান্তরের দক্ষিণ সীমা ঘেঁষে। মনে হয় যেন তারা জড়াজড়ি করেই মরেছিল। হয়তো তা সত্য নয়।

এটা এখনও একটা ঘাঁটি। বাস্তুহারাদের। তাঁবুগুলোতে তারা থাকে। ছ'হাত বাই চার হাত তাঁবুতে বড়জোর দুটি যোগ করে এক একটি পরিবার। এমন অনেক পরিবার। আর কিছু দূরে বাঁশের বেড়া আর খড়ের ছাদ দিয়ে তৈরি কয়েকখানা ঘর। ক্যাম্পের দপ্তর।

হলুদমোহন ক্যাম্প। একসময়ে হলুদমোহন হাটের খ্যাতি ছিল। এখন এই ক্যাম্প।

চোখ তুলে তাকাল সে। শব্দটা গুর গুব করে এগিয়ে আসছিল। এবার হুইসিলটাও শোনা গেল। সাড়ে তিনটের গাড়িটা। বিমলার চোখের সামনে কিছু দূরে রেলের গুমটিঘর। সে দেখতে পেল লেভেল ক্রসিংয়ের দরজা বন্ধ করা। এপারে গাড়িঘোড়া লোকজন নেই। ওপারে একটা মোষের গাড়ি খাড়া করা আছে। একটা মোষ ধুঁকে ধুঁকে দম নিচ্ছে। গুমটি থেকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল লাইনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে আছে। এই দেখতে দেখতেই ইঞ্জিনটা এসে গেল। চোঙ থেকে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে দিল। আর সেই ধোঁয়ার তোড়ে প'ড়ে ফুলসমেত কৃষ্ণচূড়া ডালটা, ঝড়ে যেমন হয় তেমনি, উপবে নিচে ডাইনে-বাঁয়ে অস্থিব হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়েই গেল। ইঞ্জিনটাকে কিছু দূবে অনুসরণ করে তার দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল। ধোঁয়ার স্তম্ভটা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু জায়গাটা বোঝা যায়। দু'একটা শুকনো পাতা কিংবা ফুলের পাপড়ি তখনও পাক খাচ্ছে গাছটার উপরে। ধোঁয়ার তোড়ে উপরে উঠে পড়েছিল, এখন পাক খেয়ে খেয়ে নামছে। এব আগেও ঠিক এ দৃশ্যটাই চোখে পড়েছিল তার। গাছের ডালটা যেন কিছুক্ষণের জন্য নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। আর এই দৃশ্যটা যেন তার অনেক পরিচিত। প্রায় মুখস্থ করা স্মৃতির মতো। কিন্তু কোথায়? কোথায় এবং কবে স্মৃতি সংগ্রহ করেছে তা মনে হচ্ছে না।

তার কোলের উপরে একটা উলের বল। কাঁটা দিয়ে সে কিছু বুনছিল।

ক্যাম্প থেকে কে একজন বেরুল। তার তখন মনে হল—কেন এসেছি? প্রায় এক ঘণ্টা হল বসেও আছি।

প্রশ্ন উঠেছিল লোকটিতে বেরুতে দেখে। সে তার ধারেকাছে দিয়েও এল না। মাথা নিচু করে বেরিয়েছিল তেমনি করেই নিজের পথ ধরে রাজপথে গিয়ে উঠল। প্রশ্নটাও ঝিমিয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে তার অগোচরেই উত্তরের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রস্তুতি চলছিল। উত্তরের প্রয়োজন হল না। কিন্তু তাই বলে সে অংশের আলোড়নটাও থামল না। আর সে অংশে এই প্রত্যয় ছিল যে এরা দণ্ডকারণ্যে যাবে।

সে ভাবল : দণ্ডকারণ্য না জানি কেমন জায়গা। সেখানেই এরা যাবে। যাবে নয় ঠিক, যেতেই হবে। ওটা হয়তো গুজব যা রটেছে। মালতীর মুখেই। কিন্তু মূলে সত্য আছে? হাওয়াই-জাহাজ নামানোর জন্যেই দরকার হয়ে পড়েছে এই প্রান্তর। এবং সেজন্যেই এ ক্যাম্পটিকে আগে তুলে দেয়া হবে। মালতীরা আবার যুদ্ধবিরোধীও।

সে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যুদ্ধ, এই শব্দটাকে অবলম্বন করে তার মন এদিক-ওদিক খানিকটা হাতড়ে চ'লে তারপর এই ধারণাটাই পৌঁছুল : আবার যুদ্ধ বাধবে নাকি? কিন্তু এটা তার মনের ঈপ্সিত বিষয় নয়। হাই উঠল তার। তারপর সে চিন্তা করল—হ্যাঁ, যুদ্ধ কাকে বলে তা সে জানে। জানাটা খুব ঘনিষ্ঠই বলতে হবে। কিন্তু অনেক অতীতের ব্যাপার। তখনকার বেদনা কালের অনেক বাধা পার হতে হতে ক্লান্ত নিরুত্তাপ।

সতেরো বছর হল কম করেও। তখন ষোলো ছিল তার, এখন সে উত্তরতিরিশ। তখন নিশ্চয়ই

মুখে এমন মেছেতার দাগ ছিল না। শরীরও হালকা ছিল। হালকা এবং নমনীয়, কিন্তু দুর্বল নয়। দুর্বল হলে সে টিকে যেত না। তার দিদিকে নিশ্চয়ই তার চাইতে মজবুত দেখাত। কিংবা উপমাটাই যেন সত্য হতে পাবে। বাধাবিপত্তিকে সে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে—তাদের সম্মুখে নুয়ে নুয়ে পড়েছে বলেই। সে বাংলা দেশে পৌঁছুতে পেরেছিল। দিদি পাবেনি। রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনী।

দুঃখ নয়, শোক কবেও লাভ নেই। এত অতীত। কিংবা তাবপরে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে যার প্রখর স্পর্শের তুলনায সেই রেঙ্গুন বজ্রযোগিনীর প্রতিটি পদক্ষেপের রুদ্ধনিঃশ্বাস আকুতিগুলি মনে আর দাগ কাটে না যেন।

যুদ্ধ বইকি। সে খবরেব কাগজ থেকে যুদ্ধের খবব সংগ্রহ করত। আব বাবার মুখেও শুনত। তারপর তার বাবা বললেন একদিন, 'তোমরা কালই যাচ্ছ। তুমি, তোমার দিদি আর ভুবন'। বাবা থেকে গিয়েছিলেন। কাঠের কাববাব দেখাব জন্যই? কিংবা বোধ হয় তাঁব মনে হযেছিল একবার বেরিয়ে এলে আর ফেরা যাবে না। হয়তো তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো বাড়িটাকে ত্যাগ করবার ইচ্ছা ছিল না। ত্যাগ করতেও হয়নি। খাবাপ সংবাদের যথাস্থানে পৌঁছে যাওয়াব অদ্ভুত ক্ষমতাই যেন প্রমাণিত হল। মিত্রপক্ষ রেঙ্গুন দখল করার চেষ্টায় যেসব বোমা ফেলেছিল, তাতেই বাড়িসমেত তিনি নিঃশেষ হয়েছেন। সে যাই হোক, তার বাবা বলেছিলেন, 'কালই যাচ্ছ তোমরা'। আর বলবার সময়ে তার বাবার মুখটা কেমন দেখিয়েছিল তাও মনে আছে তার। কিংবা বলা যায তার বাবার সেই ভঙ্গিটাই একমাত্র যা মন ধরে রাখতে পেরেছে।

খররর্ করে একটানা একটা শব্দ হচ্ছে। ঠিক তাই। এর আগের দু'বাবেও এমন হয়েছিল। হাসি ফুটবে যেন তার মুখে। এ শহরে বোধ হয় এটাই একমাত্র এক্কাগাড়ি। মাল টানে? বড় বড় কয়েকটি চ্যাপ্টা চাংড়ি। পান হতে পারে কিংবা শাকসবজি। চাবুকের ডাঁটটা চলন্ত চাকায় অব-কাঠে বাধিয়ে ওই শব্দটা তৈরি করছে চালক। উদ্দেশ্য পথচারীকে জানিয়ে দেযা। কিন্তু মনে হয সে যেন মনের স্ফূর্তিই প্রকাশ করছে। গতি, গতি। অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিনি। যেন গতির দোলাটা লাগল তার স্মৃতির আধারে। তবু সে ভাবল—গাড়িটা বোধ হয় নিয়মিতভাবেই যাওয়া-আসা করে। তার সময়েরও বোধ হয় ঠিক আছে। তার তা যদি থাকে তবে এখন উঠতে হয়। কারণ এর আগের দিন এক্কাটা চলে যাবার পরে উঠে বাসায় পৌঁছে সে দেখেছিল ভুবনবাবু স্কুল থেকে বিষণ্ণ মুখে তার অপেক্ষা করছে। কী দরকার? কেন বিষণ্ণ হয?

উঠে দাঁড়াল সে।

এবার রাজপথ পার হতে হবে। এখন আর তেমন নির্জন নেই যেমন ছিল দুপুরে, তার এদিকে আসবার সময়ে। দুপুরের স্তব্ধতার পরে আবার চলাচল শুরু হয়েছে। সংকোচের মতো কিছু একটা অনুভব করল সে, তারপর রাস্তাটা পার হল। সংকোচ নয় ঠিক, সংকোচ অনুভব করা উচিত এই সংকীর্ণ করে আনা বোধটাই যেন।

এ পথটা নির্জন থাকার কথা নয়। সে জানে এটা জাতীয় মহাপথ। পুবদিকে এগিয়ে গিয়ে এটা মিশেছে সেই চীনে যাবার পথে। সে যখন বজ্রযোগিনীর দিকে আসছিল তখন এ পথ এমন মসৃণ হয়ে কোথাও ছিল না। থাকলে⋯ , যাক সে কথা। এটা একটা বিখ্যাত তেমাথা হতে পারত। পুব-পশ্চিমে কালো পিচঢালা রাজপথ। উত্তর-দক্ষিণে রেলের লোহা পাতা। লোহার পাশে চুড়ির মতো সেকালের লাল সুরকির রাস্তা এখনও কোথাও কোথাও চোখে পড়ে! তখনকার দিনে এ অঞ্চলের মানুষদের উত্তর দক্ষিণেই ঝোঁক ছিল, পুব-পশ্চিমে ছিল মাটি-ঢাকা গেঁয়ো সড়ক। উত্তর-দক্ষিণের ঝোঁকটা হঠাৎ কেটে গেছে মানুষের। দক্ষিণ দিকে আরো আট দশ মাইল পর্যন্ত রেলপথ গেছে। তারপরও কিছু দূর লোহার পাটি পাতা আছে, জঙ্গলে ধারা হারিয়ে যাওয়া নদীর মতো। ওধারে এখন পাকিস্তান—অন্যদেশ। উত্তর দিকের খবরও সে জানে। রেলপথ সেদিকে অনেক বাঁক

নিয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ করতে করতে পাহাড়ি ঢালু বেয়ে উঠতে থাকে। কয়েকটি চা বাগানের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে এক মহকুমা শহরে। আগে মানুষ যেত উত্তর-দক্ষিণে, এখন? তার দেখা ট্রেনটা উত্তরের চা বাগান থেকেই আসছিল।

সংকোচ হওয়ার তেমন কিছু নেই ভেবে দেখতে গেলে। আর, এখন তো নয়ই কারণ সে ইতিমধ্যেই নিজেদের পাড়ায় পৌঁছে গেছে। নিজের পাড়ায় মেয়েরা এবাড়ি ওবাড়ি গিয়েই থাকে। রাজপথ ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়াটা অবশ্য...

কেন গিয়েছিল সে এ রকম প্রশ্নটা এখানে আবার উঠতে পাবে।

কিছুদিন আগেও এটা অনাবাদী নিচু জমি ছিল। সেখানে একদল বাস্তুহারা এসে বাস করছে। ওপারের ওই রৌদ্রতপ্ত প্রান্তর থেকে এসে এদিকের স্যাঁতসেঁতে ভাবটাই প্রথমে অনুভবে ধরা দেয়। সমগ্র পল্লীটা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।

চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টায় যে-কোনো উপকরণে ঘর তুলেছে। খড়, গোলপাতা, খোলা, ঢেউতোলা টিন, কত কী দিয়েই মানুষ ঘর তোলে, কিন্তু গাছের ছাল? এদিকে একটা প্লাইউড তৈরির কারখানা আছে। সেখানে তাদের পরিত্যক্ত কাঠের পাত কিনতে পাওয়া যায়, গাছের ছাল বলতে পারো। এ পল্লীটিতে তাও ব্যবহৃত। ঘন সন্নিবিষ্ট ঘরগুলি। আর গাছ? চিন্তাশীল মানুষের মনে হতে পারে এ পল্লীতে ইতিমধ্যে পুরাতনত্বের রোগবীজ সংক্রামিত। নতুন আর কী হবে? এদিক-ওদিকের গ্রামে যা ছিল এবং আছে বড়জোর তাই গড়ে উঠতে পাবে। আর তা থেকে দূরে সরে যাবার উপায়ও নেই। তেমনি সব। শুধু বোধ হয় কতগুলি ব্যাপাবে সংকোচ কিছু কেটে গেছে। সংকোচ নাকি কথাটা?

একটা উদাহরণ মনে এল তার। বজ্রযোগিনীতে গরিব ছিল, মধ্যবিত্ত ছিল, অভাব ছিল। কিন্তু নিজের অভাবকে মানুষ নিজের মধ্যেই রাখত। তাকে দোকানের মতো সাজিয়ে বা পথে তাদের মিছিলের মতো চালিয়ে নিয়ে বেড়ানোর কথা কেউ ভাবত না যেন। দেখা হলে 'কেমন আছো' এর উত্তর 'ভালোই আছি' বলত লোকে। এখন অচেনা লোকও যদি কুশল প্রশ্ন করে, তার উত্তরে 'তবে, আর বলেন কেন, ক্যাশডোল বন্ধ, দিন চলে না, বড় দুঃখে আছি' ইত্যাদি বলার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। তখন সংকোচ ছিল? কোনটা স্বাভাবিক?

এমন অনেক উদাহরণই তুলে ধরা যায়। মেয়েদের পথে বেরুনোর দ্বিধা তার মধ্যে একটি। এ অঞ্চলটা যে শহরের উপান্ত তার পথে পথে এই বাস্তুহারা পল্লীর অনেক মেয়ের সঙ্গেই তোমার দেখা হয়ে যেতে পারে। এ জায়গাটায় একটু চিন্তা করতে হল তাকে। আগে সরকারের দপ্তর থেকে আগাম টাকা আদায় করা, মেয়েকে কোনো অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার চেষ্টা, বা তেমনি সব উদ্দেশ্যে তারা ঘুরে বেড়াত। এখন? গাঙ্গুলীমশাই-এর বড়মেয়ের মতো যদি হয়, বলা যায় রাজনীতি করে। রাজনীতিদলের হয়ে চাঁদার কৌটা নিয়ে বেড়ানোকে বাজনীতিই বলা যেতে পারে। সেনখুড়োর মেজোমেয়ের মতো যদি তানপুরা নিয়ে ঘোরা হয় তবে তার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু। অভ্যাস বলা যেতে পারে? সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন—এদের অনেকেই পথে পথে ঘুরছে। আট বছরেব অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারছে না তার পরের চার বৎসরে?

অভ্যাস? অভিজ্ঞতাও বলতে পারো। বিমলারও আছে সেসব। বোধ হয় সে বিব্রত বোধ করল। তার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল। বিরক্তির সময়ে যেমন হয়। কাছাকাছি কিন্তু পৃথক মনোভাবের ফলে একই রকমের রেখা পড়ে নাকি মুখে? ভাবপ্রকাশের এ ব্যাপারটাও ঠিকমতো অধিকারে আসেনি মানুষের? বিশ্রী লাগা? অনির্দিষ্টভাবে অনেককিছুই। এই স্যাঁতসেঁতে ভাবটাও। এত গাছ না লাগালে মানুষ বাস করে তা কি জানা যেত না? এটা নিচু জায়গা। বছরে চারমাস জলে ডুবে থাকত। বাঁধ দেয়া হয়েছে, নালা কাটা হয়েছে ওদিকে, তাই জল আসে না। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে ভাবটা শুকায়নি।

দণ্ডকারণ্যেও অবশ্য অনেক গাছপালাই থাকবে। তাহলেও···না, বরং গাছপালা থাকবে না। অরণ্য কি আর থাকবে? গাছপাল উড়িয়ে ফর্দাফাঁই করে শহর বসবে। ট্রাকটর দিয়ে চাষের ব্যবস্থা হবে। আর তা যদি হয়, বুলডোজার দিয়ে জঙ্গল উড়িয়ে দিতে কে আপত্তি দিচ্ছে? নিরাবরণ কুমারী উর্বরতা। নতুন হয়ে ওঠাও যেন। এমন একটি আবেগই তখন বিরাজ করতে থাকে।

নিজের বাসায় পৌঁছে সে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। ভুবনবাবু আসেনি। ভালোই হয়েছে। এবার সে একটা কাজ করবে। বিছানাও পাতবে না, চুলও আঁচড়াবে না। কারণ, সে নামের উপযুক্ত একমাত্রটি ভুবনবাবুর শয্যা। পাতাই থাকে। স্কুলে যাওয়ার আগে নিজেই টানটোন করে রেখে যায়। আর চুল আঁচড়ানোটা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ভুবনবাবু ইস্কুলে গেলে সে স্নান করে। তার আগে কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে চালিয়ে জট খুলে দেয় চুলের। যে কাজটা সে করতে চায় তা হচ্ছে আয়না দিয়ে নিজের মুখটাকে একবার দেখা।

আগ্রহটা যে কেন হল তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। অথচ অনেক দিন, অন্তত মাসছয়েক যা হয়নি, তা হল।

সে নিজের মুখ দেখল। নাকটা টিকলো, ছোট। নাকের বাঁদিকে উপরের ঠোঁটের উপরে তিলটা যেন আগের চাইতেও বড় হয়ছে। দু'গালেই কিছু কিছু মেছেতার দাগ পড়েছে। গায়ের রং তিন বছর আগে যে রকম দাঁড়িয়েছিল তার তুলনায় যেন কিছু পরিষ্কার হয়েছে আবার। তা বলে পনেরো-ষোলো বছর আগে যা ছিল তার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। সেকথা বলতে গেলে এও বলতে হবে, তিন-চার বছর আগে হঠাৎ যেমন বুড়িয়ে উঠছিল সে তার তুলনায় এখন তাকে তরুণতর দেখাচ্ছে। অন্তত সেই চোয়াল প্রকাশ পাওয়া চেহারাটা আর নেই। কিন্তু চোখের কোলের সেই ক্লান্তির কালিটা লেগেই আছে। আর মুখের চেহারা তরুণতর হলেও কানের পাশে দু'তিনটি সাদা চুল চিকচিক করছে। আর চোখ? চোখের দিকে চাইতেই সে দুটি টলোমলো করে উঠল আয়নায়। তা চোখের মণি কালো নয়। নীলও বলা যায় না তাকে। ফিরোজা বরং। সূর্যের আলো কখন কী ভাবে ধরছে তা যেন মণি দুটির দিকে চাইলে বোঝা যাবে। যেন আলো ধ'রে তারা বদলায়।

এ মণি দুটি নিয়ে তাকে কম নাকাল হতে হয়নি। রেঙ্গুনে থাকবার সময়ে বজ্রযোগিনীর কোনো স্মৃতিই প্রায় তার ছিল না, বিদেশ যাবার সময়ে এত কম বয়স ছিল তার। কিন্তু তার সেই অপরিণত মনে শৈশবস্মৃতির যে দু-একটি রেখা ছিল তার মধ্যেও একটি তার চোখ সম্বন্ধে। গ্রামের এক প্রতিবেশী বৃদ্ধা তার মাকে বলেছিল—এ চোখ তো ভালো নয়।

—কেন? বেশ চোখ তো!

—না বাছা, স্বামী টেকে না এমনসব মেয়ের।

আয়নায় চোখ দুটি টলোমলো করে উঠল আবার। যেন মণিদুটির পিছন থেকে কেউ চঞ্চল হয়ে কোনো প্রশ্ন করতে চায়। বারেকের জন্য দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে উঠল। সোনার দুটি তারের মতো সূক্ষ্ম রেখা দেখাল মণি দুটিতে। তারপর বোধ হয় একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার জন্যই সজল হল।

আয়নাটা নামিয়ে রেখে, ভুবনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে পৌঁছানোর আগে সে একবার বাইরে তাকাল। কালো রাজপথটা চোখে পড়ল। আর তার ওপারের প্রান্তরটার একাংশ।

নিজের ছোট ঘরখানার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে সে ভাবল : দণ্ডকারণ্য খারাপ হতে গেল কেন? খারাপই যে হবে তার কী প্রমাণ? গাঙ্গুলীমশাই-এর বড়মেয়ে মালতী বলে বটে। তার কথা ধরতে হলে বলতে হয় ভালোও নয়, মন্দও নয়। এর চাইতে মন্দ আর কী হবে? কিন্তু নীতিটা দেখতে হবে তো। সমস্যার সমাধান করতে পারছি না, কাজেই ওদের সরিয়ে ফেলো চোখের সামনে থেকে। কিন্তু এগুলি তার মুখের কথা নয়। সে কথা ঝাঁজালো। বাম-দক্ষিণকে অবলম্বন করে ঝাঁজ থাকে অনেক।

কী ভাবছি, ভেবেই-বা কী লাভ? আব ঘরের ঠিক মাঝখানে এমনি কেউ দাঁড়ায় নাকি, হলই-বা নিজেব ঘর। কেউ দেখলে কী ভাবে? তাব চাইতে জানলার গোড়ায় দেয়াল ঘেঁষে কিছু দেখার মতো করে দাঁড়ানো, কিংবা চৌকির উপরে বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসা ভালো।

এমনি এমনি কি আব কোনো কাজ হয় না? যুক্তি থাকবেই এমন কী কথা আছে? সব কাজের যুক্তি থাকে না। সে যে গিয়েছিল এবং এক সপ্তাহে এই তৃতীয়বাব, তা তো মিথ্যা নয়। যুক্তি দিতে গেলে তা টিকছে না কেন? ঘবটা স্যাঁতসেঁতে? মরণ! বোদ পোয়ানোব আর জায়গা নেই? রেলগাড়ি যাওয়া দেখতে? উত্তব না দিলেও চলে। যুক্তি দিতেই হবে তার কী মানে আছে? আব প্রশ্নই-বা কবছে কে?

নিজেব ডান হাতটা বাঁ হাতেব উপবে বাখল সে। ডান হাতটা—এখন একটু একটু মাংস লেগেছে আবার। কিন্তু শিবা ঢাকেনি। ও আব কোনোদিন ঢাকবেও না। একেবাবে আগেব মতো—তা হয় না।

জেলেবউকে অবশ্য জিজ্ঞাসা কবা যেত, সে যাবে কি না। যাবেই। সকলকেই যেতে হবে। আব গেলে হয়তো ভালো হবে।

নিজেই বুঝতে পারছে না কেন সে গিয়েছিল। হয, বলতে হয এটা একটা অযৌক্তিক ব্যাপার, কিংবা তেমন একটা ব্যাপাব যা যুক্তি দিয়ে মাপতে গেলে নিবর্থক। বুকেব ভিতবে গরম কী একটা বোধ হয় বটে কিন্তু সেটাব কোনো নাম আছে কি না মনে পডছে না। নাম নেই বোধ হয। দ্যাখো দেখি, পাড়াব লোক ইস্কুলমাস্টাবেব বউ বলে তাকে খাতিব না কবলেও একেবাবে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

কিন্তু এখন বসে থাকলে হবে না। চাযেব জলটল কবতে হবে।

ইতিমধ্যে আলো জ্বালিয়েছে সে। ভুবনবাবুব ঘবের টেবিলে সেটা জ্বলছে। তার নিজের ঘরে আলো জ্বালায না। প্রয়োজন মতো বান্নাঘরেব কুপিটায কাজ সেরে নেয। পযসার কিছু সাশ্রয় হয। তাব ফলে সন্ধ্যাব পব থেকে বাড়িটার অনাত্র চাঁদেব আলোই একমাত্র আলো হতে পাবে, কিন্তু ক'দিনই বা চাঁদ ওঠে? এতে তাব খুব একটা অসুবিধাও হয না।

ভুবনবাবুর সাডা পাওযা গেল। খবরেব কাগজ নিয়েই ফিরেছে সে। এবার সে কাগজ নিয়ে বসবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যন্ত পড়বে। বাত দশটা পর্যন্ত পডা চলে। তারপরে আহারের ব্যবস্থা। বিশেষ করে এ মাসে আহারেব ব্যবস্থাটা খুব সাদাসিধে। এটা বহাল কবেছে বিমলা নিজেই। ভুবনবাবু একটা হাজার টাকার পলিসি করেছে। কাগজখানা তাব হাতে দিয়ে ভুবনবাবু বলেছিল—রাখো।

—কী এটা?

ভুবনবাবু একটু ইতস্তত করে বলেছিল—মানুষের শরীর। আমার কিছু একটা হলে এটা তোমার কাজে লাগবে।

মনে হয়েছিল কিছু একটা বলা দবকার। কিন্তু একটা কথাও না বলে সে পলিসির কাগজখানা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। ভুবনবাবুও যেন বলবার কথা আর খুঁজে পেল না। বিমলা পলিসিটা নিয়ে তার বিছানাব নিচে রেখে দিয়েছিল। এখন হয়তো সেখানেই আছে।

ভুবনবাবু নিজের উপার্জনের অর্থ খুশিমতো খরচ করতে পারেন। কিন্তু উপার্জনের মোট অঙ্কটা এমন কিছু নয়। এবং সে টাকা থেকেই বাড়িটা তুলবার সময়ে সরকার যে ধার দিয়েছিল তা শোধ করতে হয়, সংসারও চালাতে হয়। পলিসির কথাটা ভুবনবাবু আগে তাকে বললে, হয়তো সে নিষেধ করত। তা হয়নি। কিন্তু ধার বাড়বে এতে, যদি সংসারের অনিবার্য কোনো কোনো খরচকেই নিবারণ না করা হয়। অগত্যা রাত্রির আহারকে আরো সাদাসিধে করতে হয়েছে।

আর এটা নতুনও নয়, ভুবনবাবুর এই ভবিষ্যৎ চিন্তা।

বজ্রযোগিনীতে যখন তারা অবশেষে পৌঁছেছিল, ঠিক তখন তখনই কোনো বিশেষ বিষয়ে চিন্তা

করার মতো অবস্থা ছিল না। একটা আদিম অবস্থায় যেন তারা পৌঁছে গিয়েছিল। রাত্রির নিদ্রা এবং দিনমানের আহার, এ ছাড়া অন্তত এক সপ্তাহ তারা কিছুই ভাবেনি। গায়ে জ্বর, হাতে পায়ে ঘা। ক্লান্তির কথা বলে লাভ নেই। কারণ সে মুহ্যমান অবস্থাকে বোঝাতে ক্লান্তি কথাটা বেশ কিছু অগভীর। প্রায় এক সপ্তাহ পরে তারা কেঁদেছিল। ক্ষতিটা কার বেশি? যাই হোক, শোকপর্বটা এক সময়ে শেষ হয়েছিল। আর তার কিছু পরে ভুবনবাবু ভবিষ্যতের কথা বলেছিল।

অনেক পুরনো কথা। নাড়াচাড়া করে লাভ নেই। কিন্তু কতগুলি কথা আছে যা ঘুরে ঘুরে মনে আসে, কিছুক্ষণ থেকে আবার কিছুদিনের জন্য বিদায় নেয়। ভুবনবাবুর পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা একটা প্রস্তাবের রূপ নিয়ে এসেছিল।

—বিমল, তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

—বিয়ে? কেন?

—বিয়ে হয় মানুষের। আমার হয়েছিল, তোমার দিদির হয়েছিল।

—তা হয়েছিল।

—পাত্র খোঁজ করছি।

রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন বিমলা। পরে বলব--বলে সে চলে গিয়েছিল। রাত্রির রান্না শেষ করে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে সে ভুবনবাবুর কাছে গিয়েছিল। তখন ভুবনবাবু ইস্কুল মাস্টারি করত না। পৈতৃক ভূমিজমার যা অনুপস্থিতিতে নষ্ট হতে বসেছিল তা আবার গুছিয়ে নিচ্ছিল,

—এখন খাবে নাকি?

—একটু পরে হোক!

ভুবনবাবুর চৌকির কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল সে।

বিমলাই বলল—আমার পিতৃবংশের খোঁজখবর নেওয়ার কথা ছিল।

—নিয়েছিলাম।

—এত ছোট উত্তর?

—তাঁরা, মানে তোমার জেঠামশাই এবং কাকা, তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

—আর আমরা কি খ্রিস্টান?

—তা অবশ্যই নয়। তবে ধরো, আহার বিহার ধরনধারণ, আমরা খানিকটা পৃথক হয়ে পড়েছি বলা যেতে পারে। রেঙ্গুনে খানার টেবিলে বসতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। এখানেও আহারটা আমাদের খুব সাত্ত্বিক নয়। আর ওই ছবিটার কথাই ধরো। ইলাস্‌ট্রেটেড্ উইক্‌লিতে অনেক ছবিই ছিল, তার মধ্যে থেকে যীশুর ক্রুশে আরোহণের ছবিটা কেন তোমার পছন্দ হল? ছবিটার জ্যামিতিক গঠনপদ্ধতি, কিংবা কালোর প্রাধান্যই তোমার ভালো লেগেছে বলে মনে হয় না।

—তাহলে আমরা খ্রিস্টানই। হেসেছিল বিমি।

—আর···

—কী আর?

—তোমার বিয়েটা দেয়া দরকার।

—সে সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন নাকি?

—তা বলেছেন। তোমাদের সে গ্রামেই একটা ভালো পাত্র আছে।

—কী করে পাত্র?

—আ ছি, নিজের বিয়ের কথায়···

—তা বটে, হাসল বিমলা, চিঠিটা দাও ভুবনবাবু, পড়ে নি। আলাপ না করেই বুঝতে পারব।

—না।

—কী যে ভাবো তুমি আমাকে? আঠারো বছর বয়স হল এবার। তা ছাড়া যে মেয়ে রেঙ্গুন থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে বাংলায় আসতে পারে, সে অনেক দূর যেতে পারে।

—আঠারো বয়সের কথাই। ভুবনবাবু বিমলার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই।

এক ঝলক রক্ত উঠল কানের গোড়া অবধি। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়—এই বলে বিমলা চেয়ার ছেড়ে ভুবনবাবুর পাশে গিয়ে বসল—কিন্তু গ্রামের পক্ষে যা নতুন, এই কাচের শার্সি বসানো দুখানা ঘর তুলেছ তুমি। এগুলো একটু পুরনো না হলে ছেড়ে যেতে আমার ভালো লাগবে না।

—তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গিয়েছিল বিমলা। মনের একটা গোলমেলে অবস্থা। অবশেষে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল—রান্না জুড়িয়ে দিয়ে আর লাভ কী হবে? খেতে দিই। বিয়ে আর নতুন কী দেবে এনে? সংসার দু'জন মিলেই তো করছি।

কিন্তু ওটা একটা কথার কথা। সেদিন রাত্রিতে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বিমলা ভেবেছিল। দুজনের পার্টনারশিপে একটা সংসার চালানো আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হওয়া এক কথা নয়। তা বুঝবার বয়েস তার হয়েছিল বইকি। নিঃসঙ্গ শয্যায় সে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

এক রাত্রি নয়, অনেক রাত্রিই সে ভেবেছে। চিন্তার সুযোগ ছিল। এখন যেমন তখনও তেমনি, কাছে থেকেও পৃথক থাকা সম্ভব ছিল বলেই তা হয়তো সম্ভব হয়েছে।

অন্ধকার উঠোনের ওপারে রান্নাঘরের দাওয়ায় কুপিটাও ধোঁয়াচ্ছে। ভুবনবাবুর ঘরের আলোটা বারান্দা পর্যন্ত এসে পড়তে পারত, কিন্তু তার বদলে ভুবনবাবুর ছায়াটাই এসে পড়েছে। রান্নাঘরে উনুনে আঁচ দিতে না গিয়ে সে বরং ভুবনবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'বসতে দাও'।

ভুবনবাবু কাগজটা একপাশে সরিয়ে কিছুক্ষণ বিমলার মুখের দিকে তাকাল, তারপর আবার কাগজেই মন দিল।

'শরীর কী রকম আছে'?

'তা মন্দ নয়'।

'কাগজে কী খবর'?

'সেই পুরনো খবর। দণ্ডকারণ্য'।

কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাল ভুবনবাবু।

বিমলা বলল, 'তোমার এবার বছর তেতাল্লিশ হল, ভুবনবাবু'?

'কিছু একটা হয়েছে। কেন'?

'তখনও আমাদের বয়সের বছর দশেক তফাত ছিল'।

'তোমার যখন দশ বছর, আমাদের বয়স তোমার বয়সের দ্বিগুণ ছিল'। রসিকতা করল ভুবনবাবু স্কুলমাস্টারের ভাষায়।

রসিকতায় পাশ কাটিয়ে গেল ভুবনবাবু। ভুবনবাবুকে দেখে এখন প্রথমেই যা মনে হয় ডাক্তারি ভাষায় তাকে রক্তহীনতা বলে। স্বল্পাহারী, স্বল্পভাষী, অনুষ্ণ একটি ব্যক্তি। এই লোকটি যে রেঙ্গুন বজ্রযোগিনীর পথে পাড়ি দিয়েছিল তা বিশ্বাস হয় না। কিংবা এমন হতে পারে সেবার

পাড়ি জমাতে গিয়েই তার সারবস্তু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর সারবস্তু নিঃশেষ হলেই মানুষ থেমে যায় না।

বিমি লক্ষ্য ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল ভুবনবাবু একসময়ে সুপুরুষ ছিল। এবং যদি কেউ অপক্ষপাতী দৃষ্টিতে যাচাই করে, এখনও তাকে রূপবান বলবে।

বিমলা বলল, 'আমরা অদ্ভুতভাবে স্বাধীন হয়ে গেছি, ভুবনবাবু তা কি লক্ষ্য করেছ'?

'আমার চাকরি সত্ত্বেও'?

'আরে না। ওদিকে যেয়ো না। সে স্বাধীনতা বনে জঙ্গলেও পাওয়ার পথ নেই। জঙ্গলের কুটির তোলার জায়গা, কুটির বাঁধার গোলপাতা বা বুনোঘাস সবই সরকারের। আমি বলছি আমার এবং তোমার ব্যাপার। আমার সেই সতর্ক জ্যেঠামশাইদের আব কোনো পাত্তা নেই। এই দু'জনে আছি—কারো কিছু বলার নেই'।

'হুঁ', বলল ভুবনবাবু।

'অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তোমার'?

'আলাপটা চালিয়ে যেতে চাও নাকি'? ভুবনবাবুর এটা এক অদ্ভুত ধরনের হাসি। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

'বন্ধ করলুম'।

কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাল ভুবনবাবু।

'আজ একটু রান্না করি রাত্রিতে? রোজকার মতো নয়'। বলল বিমি।

'কী হবে'?

'মুদিখানায ধার হবে না'। বিমি হাসল, 'মাঝে মাঝে স্বাদ বদলে নেয়া ভালো'।

'কেউ তোমাকে মুদিখানার ধার করতেও নিষেধ করেনি, স্বাদ বদলাতেও না। তুমিই নিষেধ করেছ সন্ধ্যাবেলার ছাত্র পড়াতে'।

'সে তো অনেকদিন আগে বলেছিলুম'।

'এখন তাহলে আপত্তি নেই'?

বিমলা মনের মধ্যে তলিয়ে দেখল। কী আপত্তি? মন্দ কী? নয়, কয়েকটা টাকাই আসবে। কিন্তু এখন আপত্তি নেই ভাবতে গিয়ে তখন কেন আপত্তি করেছিল সেই যুক্তিগুলি খুঁজল সে, মনে এল না। তার বদলে বরং সেই সময়ের সেই অনুভবলোকে যুক্তিহীন অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য সে পৌছে গেল। যুক্তি থাকলে এগোনো যায়, শুধু অনুভব পাক খেতে থাকে।

বিমলা বলল, 'তখন তোমার শরীর ভালো ছিল না'।

'তা হবে'।

তা হবে যে নয়, এটা বিমলা জানে। শুধু বোঝা গেল এ মিথ্যাটার আবরণ ভুবনবাবুর কাছেও স্বচ্ছ।

কিন্তু সাধারণত তাই হয়ে থাকে। উপার্জনক্ষম পুরুষটির স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই গৃহকর্ত্রীরা এমনসব নিষেধাত্মক অনুরোধ করে। তাদের অনুকরণ?

হাতের কাছে কথা থাকে না। কথা খুঁজেই আনতে হয়। হঠাৎ যেন খুঁজবার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেল।

বিমলা বলল, 'বসে থাকলে অন্যদিনের চাইতে ভালো রান্না হবে না, যাই'।

রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সে ভাবল। আর যাই হোক, নিষেধটার মধ্যে ভুবনবাবুর স্বাস্থ্যের জন্য দুর্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কিছু তো ছিল। যা ছিল বললে সত্য বলা হবে, সেটাই যে মিথ্যা। সে তো ভুবনবাবুর নবোঢ়া নয় যে সন্ধ্যায় বিশ্রামের ক্ষণ উপভোগ করার জন্যই ভুবনবাবুকে

বাইরে না যেতে অনুরোধ করে থাকবে। কিন্তু তখন এই মিথ্যা একটা আবেগই হয়তো তার ব্যবহার থেকে বুঝে থাকবে ভুবনবাবু। কিংবা তেমনি একটা ঝোঁক তারও এসেছিল। কৌতুকের মতো বোধ হয়।

উনুনে আঁচ দিয়ে বেরিয়ে এল বিমি।

মিথ্যা বলতে তাকে হচ্ছেই। পাঁচ-সাত দিন আগেকার কথা। গাঙ্গুলীগিন্নির কানে যত কথা যায়, সে বলে তার চাইতেও বেশি। আর গাঙ্গুলীগিন্নির একার কানে যত কথা যায়, পাড়ার পাঁচকানেও তত যায় না। গাঙ্গুলীগিন্নি বলেছিল—রাতে সেদিন তোমাদের বাবুর অসুখ করেছিল।

—তা করেছিল।

—এ বয়সে, কাছের লোককে পাশে পেতে ইচ্ছা হয়।

—হয় নাকি? কি জানি। বিমি হাসল গাঙ্গুলীগিন্নির উপদেশ দেবাব প্রবণতা দেখে।

গাঙ্গুলীগিন্নি মনে করল সে তার কথায় রস পেয়েছে।

বলল—অবশ্য মাঝে মাঝে রাগ করে অন্য ঘরে শোয়া মন্দ নয়, কিন্তু কষ্ট দিতে নেই পুরুষকে।

যতখানি সাবধান হওয়া দরকার তার চাইতে বেশি সাবধান হয়েছিল সে। বলেছিল—গত বছর প্লুরিসি হয়েছিল। তারপর…

—অ। ডাক্তার মানা করেছে বুঝি?

মাথা নাড়ল বিমলা।

সাবধান হওয়ার যুক্তিটা কি মূল্যহীন? কী হতো যদি সে বলত তাবা বিবাহিত নয? হতো কিছু। এর আগে কখনও কারো কাছে সে বলেনি, সে ভুবনবাবুর স্ত্রী। স্ত্রী নয় তাও তো বলেনি। আর মিথ্যাটা নতুনও নয়। গাঙ্গুলীগিন্নিকে যা বলেছিল সে, সেটাতে আচরণটাকে ভাষায় প্রকাশ করার বেশি কিছু নেই। দু'বছর হল তাবা পল্লীতে একই বাড়িতে বাস করছে; যেভাবে দু'জন দু'জনকে সম্বোধন করে, তাতে লোকের এই ধারণা জন্মালে তাকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

আর ধারণা জন্মাতে দেয়াতে তাব কি আপত্তি ছিল?

পুরনো অনুভবকে ঠিক আগের মতো করে ফিরিযে আনা যায় না। সে সময়কার বর্ণনা হতে পারে এমন কতগুলি কথা মনে আসে। কিন্তু কথাগুলি যেন পরাগ ঝরে যাওয়া ন্যাড়া কদম ফুলের মতো নিরেট কিছু। অনুভবের কোমল স্পর্শও নেই, সজীবতা দূরের কথা।

সে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছুল। কিন্তু তা রাত্রিতে। তার আগে সে আনাজ কুটে উঠে রান্নার যোগাড় করে নিল। দিনের বেলায় যেমন দু'একটা ব্যঞ্জন রান্না করে তা করল। ভুবনবাবুকে খেতে দিয়ে লক্ষ্য করল ভুবনবাবু অন্য রাত্রির তুলনায় তৃপ্তি করেই খেল। দুঃখের মতো কিছু একটা ভুবনবাবুর আহার পাত্রের চারিদিকে ঘোরাফেরা করল। কী হয় যদি ভুবনবাবু আর একটু পরিশ্রম করে তৃপ্তি পায় এ বাড়িটাব জন্য? কেন আর তাতে বাধা দেয়া?

অন্যান্য বাত্রির মতো অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ না করে সে চিন্তা করল।

হলুদমোহনে বন্যা হয়েছিল। কিছুদিন থেকে সারাদিন সারারাত বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্যাম্পের তাঁবুর ছাদ ফুটো করে জল পড়ছিল, বৃষ্টির তেরচা ছাঁটে কল্পনীয় সবদিকের কানাতের আবরণ দিয়েও জল আসছিল তাঁবুতে। যাকে মেঝে বলে ক্যাম্পের লোকেরা, তাঁবুগুলোর নিচে নিচে সেই স্বল্পপরিসর সিমেন্ট ঢাকা মাটি পায়ে পায়ে কাদায় প্যাচপেচে হয়ে উঠল। ক্যাম্পে বর্ষার রূপ এটা। রাত্রি এবং দিনে বসতে শুতে ওই কাদাই গায়ে মাখতে হবে। সহ্য হয়ে গিয়েছিল। যেমন সহ্য হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পের গন্ধ। পৃথিবীর সবকিছু পচতে শুরু করলে তেমন গন্ধ আসতে পারে। রাত্রিতে ক্যাম্পের কেউ ঘুমোতে পারল না। অসুস্থ শিশু কয়েকটিকেও বাপ মায়ের কোলে কিংবা জলে দাঁড়িয়ে কাটাতে হল। দু-তিন বছরের রুগ্ন কৃশ নিদ্রাবঞ্চিত শিশুরাও তাদের এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে।

ভোর রাতে একদল লোক উঁচু বলে রাজপথে গিয়ে দাঁড়াল। তারাই পথিকৃৎ। তাদের দেখাদেখি গোটা ক্যাম্পটাই সড়কের উচ্চতাকে আশ্রয় করল। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারল বন্যা হয়েছে। তাদের ক্যাম্পের অত বড় মাঠটা ডুবে আছে জলে।

কী করে ব্যাপারগুলো সম্ভব হল তা সে জানে না। উদ্বাস্তুরা জানত সড়কটা ধরে সোজাসুজি চলতে থাকলে কোথাও না কোথাও পৌঁছানো যায়। বুদ্ধিটা তারা নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল। সার বেঁধে উদ্বাস্তুরা চলতে লাগল। শহরে প্রধান স্কুলের কাছে পৌঁছুলে বন্ধ ফটকটার কাছে তারা কিছুক্ষণের জন্য দ্বিধা করেছিল। তারপর এক দুই করে তারের বেড়া ফাঁক করে গলিয়ে স্কুল বাড়িটার ঘরে গিয়ে উঠতে লাগল। দারোয়ান প্রথমে হাঁ হাঁ করে অধিকার ও ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জনতার ঘূর্ণ্যমান আবর্তে মিশে গিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার ভয়েই সম্ভবত সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

সাতদিন ছিল উদ্বাস্তুরা সেই স্কুলের বাড়িতে, বন্যা নেমে যাওয়ার পরেও চারদিন। স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই স্কুল বন্ধ রেখেছিল। আর স্থানীয় মাড়বারি ত্রাণ সমিতি একটা লঙ্গরখানা খুলেছিল স্কুলের প্রাঙ্গণে। দিনের বেলায় ডাল তরকারি ভাতের একটা মহোৎসব হতো। সন্ধ্যা হতেই বড় বড় বালতি হাতে ওদের লোকেরা ঘরে ঘরে ঘুরত। বালতিতে গরম পাতলা খিচুড়ি, চালের খুদে তৈরি। যার যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে যাবে। এ নিয়ে অনেক কৌতুকের ব্যাপার হয়েছিল। দুপুর বেলায় নিছক ভাত তরকারির মচ্ছোবে তাদের অনেকেরই এমন আকণ্ঠ খাওয়া হয়েছে যে অনাহারে অল্পাহারে অভ্যস্ত তাদের শুকিয়ে যাওয়া পাকস্থলীতে রাত্রির খিচুড়ির স্থান ছিল না। কিন্তু হাতের লক্ষ্মী ঠেলবার ভয় ছিল। কালিপড়া কড়াই, তাওয়া, গেলাস, থালা বার করে করে সকলেই তারা খিচুড়ি নিল! বিমি নেয়নি। তার এই না নেয়ায় ব্যাপারটাই একটা আলাপের সূত্রপাত করেছিল। আর এই আলাপ যেন ক্লাশ এইটের ঘরখানিকে একটা সমাজবদ্ধ শালীনতার দিকে এগিয়ে দিল। দরজার চৌকাঠে ইংরেজিতে ক্লাশ এইট-ই লেখা ছিল?

ক্লাশ এইটের ঘরখানি স্কুলের অন্যান্য ঘরের চাইতে বড় ছিল কি না সে খবর তারা রাখে না। সেই ঘরে তারা ছটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। পাঁচ-সাতটি শিশু, আট-নটি স্ত্রীলোক এবং অনুরূপ সংখ্যক পুরুষ।

মরণচাঁদ একটা ভাঙা কাঠের তোরঙ্গের উপরে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছিল। খিচুড়ির ব্যাপারে তার আগ্রহ দেখানোর কিছু নেই। সে ভার বউ সোদামুনির। বালতি ধরা জোয়ানরা চলে গেলে মরণচাঁদ অনেকটা সময় ইতিউতি করে হঠাৎ বলে বসল, 'আপনে নিলেন না'।

কথাটা যে তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে তা বুঝতে পারেনি বিমলা।

জেলেবউ বলল, 'কাকে কও, উনাকে নাকি'?

বিমি লক্ষ্য করেছিল, ঘরের লোকগুলির দৃষ্টি জেলেবউয়ের কথাকে অনুসরণ করে তার দিকে চেয়ে আছে। বিব্রত হয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল সে।

কিন্তু বিব্রত হওয়াটা অযৌক্তিক। অনেক দিন কেটেছে তার এদের সঙ্গে।

সে বলল, 'খিদে নেই'।

তারপর তাদের আলাপটা গড়িয়ে গেল খিচুড়ির দিকে। কবে কোথায় কে কীরূপ খিচুড়ি আস্বাদ করেছে। পুরুষদেরই আলাপ, মেয়েরাও যোগ দিল। পুরুষরা বড় বড় নিমন্ত্রণের আলাপ করল আর মেয়েরা কোন রান্নায় কী ফোড়ন দিতে হয়। এমন সময়ে মরণচাঁদ তার হুঁকো নামিয়ে রেখে বলল, 'আমাকে সকলে মাথাপিছু দুই দুই পয়সা যদি দাও…

'কী তাহলি'?'

'ভাজা কিনে আনে দিব। খিচুড়ির সোয়াদ হবি'।

পয়সা নিয়ে মরণচাঁদ বাজার থেকে পিঁয়াজবড়া কিনে এনেছিল। পয়সা সকলে দেয়নি এবং এও স্মরণীয় যে মরণচাঁদের কাছে দুটি আনা দুটি মোহরের মতো মূল্যবান। তা সত্ত্বেও সে যা এনেছিল পরিবেশনের সময়ে সকলকেই সমান করে দিল। অদ্ভুত উদার ভঙ্গি মরণচাঁদের। আর তার ঔদার্যই যেন একটা পূর্ণতার আবহাওয়া এনে দিল। সেই খিচুড়ি খাওয়ার সে কী আনন্দ।

মরণচাঁদ যেন তার পুরনো জীবনকে সার্থকভাবে স্পর্শ করেছে তার মনের দিক দিয়ে। হঠাৎ সে বলেছিল বিমিকে, 'মা ঠাকরুন। আপনের খাওয়া হ'লো না।' যেন মরণচাঁদ প্রাক্তন পল্লীজীবনের ন্যায়-অন্যায় বোধকেও ফিরে পেয়েছে।

আর সে ফিরে পাওয়া যেন একটা নেশার মতো। রাত্রিতে ঘুমানোর আগে। আহা, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চার দেয়াল, এমন মেঝে, বৃষ্টি-নিরোধক এমন ছাদের আবরণ কত যুগ তারা পায়নি। মরণচাঁদ বলল, 'ভাইসব, কথা কই একখান। মেয়ে ছাওয়ালরা ঘরে শ'ক আর ছোট ছাওয়ালরা। আর আমরা পুরুষরা এই বারান্দায়'।

সকলেই থ হয়ে গিয়েছিল। অবাক হওয়ার মতো কথা। এ ঘরের পবিসরে ছটি পরিবারের থাকা সাধারণের হিসাবে সহজসাধ্য নয়, কিন্তু ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা তা তো পারেই, বরং আনন্দের সঙ্গে পারে। হাত পা ছড়ানোর জায়গাই পেয়েছে তারা। মরণচাঁদের কথায় দ্বিধা করতে লাগল সকলেই। যেন বহুদিন ভুলে যাওয়া কথা কেউ মনে করে দিয়েছে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে একটি যুবক বিছানা পাতছিল। বিছানায় যেন তার একটা আকর্ষণ আছে। তার বউ রাস্তার কলে থালাবাটি ধুতে গিয়েছে। মরণচাঁদের কথায় অন্য পুরুষরা দ্বিধা করছিল, কিন্তু যুবকটি একরোখাব মতো তাব চটের বিছানা টানটোন করছিল। মরণচাঁদ তাকে হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, 'বাইরে আসো'।

সে রাত্রিতে এবং তার পরের কয়েক রাত্রি পুরুষরা বাইরে শুয়েছিল।

কথাটা বোধ হয় শালীনতাবোধ। ভাষাটা ওদের জানার কথা নয়। বহুদিন পরে বিমির মনে পড়েছিল মরণচাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে।

বিমি নিজের মাদুরের বিছানাটা বিছিয়ে নিয়েছিল। বহুদিন পরে কতগুলি পরিচিত গুঞ্জনের বদলে অন্য কতগুলি পরিচিত স্বর সে শুনতে পেল। ছেলেমেয়েরা দু-একবার কান্নাকাটি করল। কিন্তু ক্যাম্পের সেই প্রকাশ্য চাপা গলার প্রেম নিবেদনের কুৎসিত কামাতুরতা কারো নিদ্রাকে বিঘ্নিত করল না। দরজার কাছে মরণচাঁদ নিজে শুয়েছিল। সে বলল, হয়তো তার বাবার কাছে শিখে থাকবে, প্রয়োজনের সময়ে সে শিক্ষা কাজও দিচ্ছে। বলল, 'হরি, হরি'। 'তা বিনে আর কি'—ওদিক থেকে আর একটি পুরুষের কণ্ঠ সাড়া দিল। চার দেয়ালের সাদা চুনকাম করা পরিচ্ছন্নতা যেন মরণচাঁদকে নেশার মতো ধরেছে।

বহুদিন পরে বিমলা বড় ভাল ঘুমিয়েছিল। মানুষের ঘুম। চার দেয়ালের বাইরে আশঙ্কাকে নির্বাসিত রেখে ঘুম। জন্তুর মতো রাত্রির অন্ধকারে আত্মসমর্পণ করে এক কান সজাগ রেখে বিশ্রাম নেয়া নয়।

রাত্রির অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করাই বলা উচিত। তাও বোধ হয় কম বলাই হল। এখনও সে অনুভবটা কোনো কোনো রাত্রিতে স্নায়ুগুলিকে একটা প্রতিরোধ তৈরি করার মতো টনটনে করে রাখে। তেমনি যেন মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে থাকে ঘুমের মধ্যেও। এখন আর প্রয়োজন নেই। পাশের ঘরেই ভুবনবাবু। তা সত্ত্বেও অভ্যাসবশেই যেন কোনো কোনো দিন ঘুমোতে যাওয়াকে রাত্রির অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ বলে মনে হয়। মনে হয় অন্ধকারে পাতলা আবরণ ছাড়া আর কোনো আড়াল আছে বিপদ থেকে?

বিষয়গুলি ঠিক পরে পরে মনে আসে না। এলোমেলো হয়ে যাওয়া চিন্তা।

হ্যাঁ, মরণচাঁদরা ফিরে গিয়েছিল ক্যাম্পে। তাদের সেই শালীনতাবোধ? ক্যাম্পে ফিরে তা বোধ

হয় আবার অনেকদিনের জন্যই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যাম্প তো চুনকাম করা স্কুলঘরের দেয়াল নয় যে মনের ভিতরে তার শুভ্রতার ছায়া পড়বে।

কিন্তু বিমি আব ফিরে যায়নি ক্যাম্পে। ভুবনবাবু এসেছিল।

আশ্চর্য সে আসা। বিমলাকে খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য নয়। কারণ সে-ই চিঠি দিয়েছিল। ঠিকানা দিয়েছিল চিঠিতে। হলুদমোহন ক্যাম্প, গ্রুপ নম্বর ছয়, তাঁবু নম্বর সাতাশ, কার্ড নম্বর পাঁচশো সাতাশি। আশ্চর্য বোধ হয় ভেবে দেখতে গেলে, ততদিন পরেও ভুবনবাবুর সাড়া দেয়া। এ ভাবনাটা অবশ্য পরের, আশ্চর্য হওয়াটাও পরের। তখন নির্বাক হয়েছিল সে, কী করবে ভেবে পায়নি, কাঁদতে গিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! ভুবনবাবুর গায়ে ধোবাবাড়িতে ধোয়া ইস্ত্রি করা ধবধবে পাঞ্জাবি। পরিচ্ছন্ন করে তার দাড়ি কামানো। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! মৃদু একটা প্রসাধনের সৌরভও ভুবনবাবুর গায়ে। ভুবনবাবুর হাতে ছোট একটা ব্যাগ, তেমনি ছোট একটা বিছানা। আশ্চর্য, একই জাতের মানুষ সে আর ভুবনবাবু এই অনুভূতি।

আশ্চর্য, ততদিন পরে ভুবনবাবুকে তার চিঠি দেয়াও!

হাত ধরে ভুবনবাবুকে টেনে নিয়ে স্কুলের বারান্দায় ছুটতে ছুটতে উঠে গিয়েছিল সে। নিজেকে এবং তাকে সামলানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি ভুবনবাবু। সম্বিত পেলো সে দরজার কাছে ক্লাস এইটের ঘরে ঢুকতে গিয়ে। থেমে দাঁড়াল। পাথর হয়ে গেল। আর মরণচাঁদ অতি সুবিন্যস্ত বেশভূষায় এই বাবুটিকে, তার হাত ধরে দাঁড়ানো বিমলাকে দেখে মাথা নাড়তে লাগল। মরণচাঁদ করবার মতো একটা কাজ পেয়েছিল। রাস্তার ধারে নামানো ছিল ভুবনবাবুর ব্যাগ আর বিছানা। কুড়িয়ে নিয়ে ভুবনবাবুর কাছে এনে রাখল মরণচাঁদ।

মরণচাঁদ যেন ক্লাস এইট বাড়ির কর্তা, মেয়ে জামাই যেন তার সামনে। কিংবা এ উপমায় কি বাহুল্য আছে? এটাও কি মরণচাঁদের পূর্ব অভ্যাস ফিরে পাওয়ার নজির হিসাবে নেয়া যাবে? গ্রামের জীবনে বাবুদের মালপত্র তার গহনার নৌকা থেকে এমন করে নামিয়ে দিত নাকি?

কিংবা দুটি দিকই বোধ হয় অংশত সত্য। বাড়ির কর্তার মতোই আকস্মিক নিরানন্দে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে হঠাৎ পাওয়া সুখের মধ্যে। সেদিন রাত্রেই সে দরজার পাশে বিছানো বিছানা থেকে গল্প করছে এমন মেয়েদের গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিয়েছিল—চুপ থাক। কারণ সে দেখতে পেয়েছিল বিমি বিছানা না বিছিয়ে দেয়ালের গায়ে কালো ছায়া ফেলে গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

কারণ ভুবনবাবু যেমন আকস্মিক ভাবে এসেছিল তেমনি আকস্মিক ভাবেই চলে গিয়েছিল। ক্লাস এইটেই ঘরের মধ্যে একবার নজর দিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সে। আর যাবার সময়ে চিরকালের মতো চলে যাবার ভঙ্গিতে তার ব্যাগ ও বিছানা নিয়ে গিয়েছিল।

সে রাত্রিটা ঠায় বসে কাটাতে কাটাতে কী ভেবেছিল বিমি?

পাশ ফিরল বিমলা। কাঁথাটা গায়ে টেনে দিল। শীত শীত করছে। পারা গেল তো লেপ না বানিয়ে এ শীতটাও চালাতে। ভুবনবাবু রাগই করেছিল, এ বছরের শীতের গোড়ায় সে আপত্তি করাতে। কিন্তু তার নিজের জন্য লেপ বানানোর বদলে ভুবনবাবুর একটা চাদর হয়েছে। ভুবনবাবু যেভাবে স্কুলের সাময়িক ক্যাম্পে এসেছিল এখন তার তুলনায় বেশভূষায় অনেক দরিদ্র।

কী ভেবেছিল? ভুবনবাবুর চলে যাওয়াটা নয়। অবাক হওয়ার ভাবটাই তখন তার কাটেনি। তিন-চার দিনই বোধ হয় তার মনের এই অবস্থাটা ছিল। যে সবদিক দিয়েই অবলুপ্ত হঠাৎ সেই যেন ফিরে এসেছে। আর তার চাইতেও যা অসম্ভব যেন কালের স্রোতকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে, সেই পুরনো দিনে তার দিন আবার অবতরণ করবে। সেই ভুবনবাবু!

রাত্রি শেষে দিন এসেছিল। কী করবে সে? গালে হাত দিয়ে বসে থাকা ততক্ষণে সেই ঘরেও

অন্য লোকদের বিব্রত করছে। মাড়বারি ত্রাণ সমিতির দান তখন আর অবাক করার মতো নতুন নয়। ইতিমধ্যে তার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আলাপ করছে তারা। কিন্তু সেই আলাপের ফাঁকে ফাঁকে তারা এক একবার থেমে গিয়ে দেখছে তাকে।

উঠে গিয়ে পথের ধারে কলতলায় সে স্নান করেছিল। তা করে নিদ্রাহীন রাত্রির রুক্ষতাটা গেল। চিন্তা কিছুই পরিচ্ছন্ন হল না।

পায়ে পায়ে চলে পথে বেরিয়ে পড়েছিল সে। ভুবনবাবু আসবার পর থেকে তার আহার হয়নি, রাত্রিতে সে ঘুমোযনি। এসব কিছুই মনে পড়ল না তার। আবার পথ।

হলুদমোহন ক্যাম্পের পাশে এই শহর। পুবমুখি একটা রাস্তা তার সম্মুখে। চলতে গিয়ে মুখে আলো এসে পড়ছে। দু'পাশের বাড়িগুলোর ঘুমের জড়তা তখনও ভালো করে কাটেনি। তার যেন পূর্বনির্ধারিত একটা গন্তব্য আছে এমন করে সে পথ চলছে। একটা খেলাও যেন চলেছে তার মনে মনে। এক নিরাপদ যান্ত্রিক খেলাই যেন। এক নির্বোধ যেন বন্ধগলির এমাথা-ওমাথা করছে কাউকে ছুঁতে চেষ্টা ক'রে ক'রে। পথ একটা বাঁক নিয়েছিল। সূর্যের আলো মুখে না পড়ে বাঁ কাঁধের দিকে লাগছিল। দিক পরিবর্তন করা দরকার এ রকম একটা অনুভব হল। তাবপর আবার সে হেঁটে চলল।

শহরে শেষে নদী। দুপুরের কিছু আগে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিমলা। রোদ লেগে নদীতীবের বালি ঝকঝক করছে। নদী তরঙ্গগুলি স্ফটিকের মতো। আলো চমকাচ্ছে মাছরাঙার ডানায়। বন্যার পরে আবার খেয়ানৌকা এপার-ওপার করছে। কিন্তু এসবই তার মনকে স্পর্শ করে পিছলে পিছলে সরে গেল। এক রুদ্ধনিঃশ্বাস আকুতি যেন—খেয়া, খেয়া খেয়া।

শূন্যতা আর শূন্যতা। অনেক ঘুরেছিল সে সেদিন। কোথায় যেতে পারত সে?

দুপুর যখন পাব হচ্ছে, সে তখনও দু'পায়ের উপরে। একবার সে আবিষ্কার করল সে কাপড়ের দোকানগুলির মধ্যে এসে পড়েছে। দু'দিকে অনেক দোকান—তাদের বেশিরভাগই কাপড়েব। কাপড়, কত অজস্র, কত রকমের শাড়িই যে ব্যবহাব হয়। দোকানের শো কেসে সাজানো, দোকানের আলমারিতে গোছানো। অবাক, অবাক, এত কাপড় শাড়ি। এমন শুভ্র, এমন শুচি, এমন মনোহরণ। অন্য পথ ধবল সে। ঘুরে ঘুরে আবাব সেই কাপড়ের দোকানের সামনেই সে এসে পড়ল। সে কি তবে ইচ্ছা করেই আবার ঘুরে এল? কাপড়গুলিই তাকে ঘুরিয়ে আনল! দূরে যেতে দিচ্ছে না? ভুবনবাবুব পরিচ্ছন্ন বেশভূষার সঙ্গে এই ঘুরে ঘুরে মরার কি যোগ ছিল? সে সময়ের অনুভব এখন আর বোঝা যাবে না।

বাজারটা পার হওয়ার আগেই গানের শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখল সে পথের ধারে গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে একজন গান করছে। আর, একটি মেয়ে নাচছে। দূর থেকে মনে হয়েছিল তারা হযতোবা বন্যার্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করছে। কারণ যে ধরনের নাচগান হচ্ছিল, তার উৎসারিত আনন্দ চিনবার মতো প্রস্তুতি ছিল না তার মনের।

বিমলা অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলল। কালো তো একটা রং, অন্ধকারেব কোনো রঙই নেই। তার মনে হল তার ঘবে অন্ধকারটা কাঁপছে। অন্ধকার, না সময়?

ডান পা-টা বাস্তার উপর দিয়ে চলে চলে সেটাকে চেপে ধরল। পা-খানা যেন জীবন্ত কোনো সত্তা।

তার আগে যা ঘটেছিল তা বোধ হয় এই, বিমলা মনে করতে লাগল। গাইয়েদের চারিদিকে ক্রমশই ভিড় জমছিল। আর সেই ভিড়ের একপাশে সে দাঁড়িয়েছিল। সে ভাবল মেয়েদের নতুন ধরনের পোশাক পুরুষদের আকর্ষণ করবে। নাচুনে মেয়েটির ফিনফিনে রঙিন মখমলের পাঞ্জাবির দিকে পুরুষরা চেয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁপে কেঁপে, কখনও দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল। পথের

ধারে রুমালের মতো কিংবা কিছু বড় কাপড়ের টুকরো পাতা ছিল, তার উপরে আনি দুয়ানি পয়সা মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দিচ্ছিল পথচারী শ্রোতারা। একটা সিকি গড়িয়ে এল রুমালটায় না প'ড়ে। গড়িয়ে-এগিয়ে এল বিমলার পায়েব দিকে আর তখন তার ডান পা-টা চলে চলে সেটার উপরে গিয়ে থেমে গেল। আর তার দৃষ্টিটা তখন গিয়ে পড়েছিল নাচুনে মেয়েটার মুখের উপরে। একদৃষ্টিতে তাকে দেখছিল সে। মেয়েটার মুখে বসন্তের দাগ। আর তাব নিজের বুকও বোধ হয় থরথর করে কাঁপছিল। চোখ দুটি টলমল করছিল। সোনার তারের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল নাকি?

সিকিটা যেন গেঁথে দিয়েছিল তাকে পথের কাঁকর ধুলোর একটা আস্তরণের সঙ্গে। নাচুনেরা চলে গিয়েছিল হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে। তারপরেও দীর্ঘ সুদীর্ঘ মুহূর্ত সে দাঁড়িয়েছিল। ভয়?

জাল নাকি? জাল হওয়াই স্বাভাবিক। জাল না হলে কেউ নাচওয়ালা ভিখারিকে একটা সিকি ছুঁড়ে দেয়। জালই হবে। মুঠো করে চেপে ধরা সিকিটা হাতের গরমে ঘেমে উঠেছে। কিন্তু মুঠো করে চেপে ধরলেই কি জাল আসল বোঝা যায়?

সে যাই হোক, তার কী দরকার ছিল, কী যুক্তি ছিল সিকিটাকে ওভাবে আত্মসাৎ করার? সিকিতে ধোয়া শাড়ির কথা কেউ শুনেছে?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল তাব। অনেক কাজ। অনেক কাজই সে করে যায় যার যুক্তি নেই। যেমন মিথ্যা বলেছে গাঙ্গুলীগিন্নিকে। এটাও তেমনি একটা আচরণ।

আর ফুল কিনেছিল সে সিকিটা দিযে। শুভ্র পরিচ্ছন্ন রজনীগন্ধা কিনে সে ফিরে গিয়েছিল স্কুলের দিকে। নিস্পৃহ হাতেব মুঠি থেকে কয়েকটা ফুলের ডাঁটা খসেও পড়েছিল পথে। না ফিরে কী উপায়?

এত দূরে আসার ইচ্ছা ছিল না। কী একটা বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কত দূর চলে এল সে। এরপরে ঘুম হলে হয়। বিমলা আবার পাশ ফিরল।

লোভ ঠিক নয়। একটা অস্ফুট প্রবল পাওয়ার ইচ্ছা তার মোহগ্রস্ত মনের উপরে তরঙ্গের মতো ওঠাপড়া করছিল নাকি? ভুবনবাবু এসেছে। কী অবাক করা ব্যাপার! যেমন অবাক করা তার চেহারা ও সাজসজ্জা। তেমনি পার্থক্য তা সবের তার সেকালের 'অবস্থার সঙ্গে'। পার্থক্যটাই অবাক করার মতো। এটাই মোহ। আসল কথা সেদিন কী হয়েছিল, তা পরে আর কখনও-ই সে বুঝতে পারেনি।

অবাক হওয়ার কী-বা ছিল, ভাবল বিমলা। ভুবনবাবু তো কোনোদিন ক্যাম্পে বাস করেনি। কিন্তু তখন অবাক লাগেনি বললে মিথ্যা বলা হবে।

বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই মরণচাঁদ একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, আর সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেয়েছিল বিমি বারান্দার এককোণে বেডিং রেখে তার উপরে মাথা হেঁট করে বসে আছে ভুবনবাবু। অপরিসীম ক্লান্তিতে ভুবনবাবুর পিঠটাও যেন বেঁকে গেছে। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। সন্ধ্যা বলেই সম্ভবত তাতে পথের ধুলো দেখা গেল না।

'ভাড়াটে বাসা কোথাও পেলাম না, বিমল'।

'তা কি পাওয়া যায়'?

'কাল রাত্রিতে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ছিলাম'।

'ও'।

'হোটেল দু'একটি আছে। তাতে দু'জনে শুধু থাকা যায়, এ রকম খালি ঘর নেই'।

স্কুলের একটা ঘর কেউ দখল করেনি। ঘরটা দেখলে তালা দেওয়া বলে ভুল হয়। এই বোধ হয় কারণ। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে-ঘরটা খুঁজে বার করেছিল সে। আর সেই ঘরে ভুবনবাবুর বিছানা পেতে দিয়েছিল। যত্ন করে বিছানো পাতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটা

অনেকদিনের পরিচিত শোবার ঘর।

অনেক রাত্রিতে নয়, প্রথম রাত্রিতেই যখন সে-ঘরে এল বিমলা তখন বিছানার উপরে ভুবনবাবু বসে আছে। হাঁটুর উপরে চিবুক রেখে সে-ও যেন সেই তারার আলোর মতো অন্ধকারে অবাক হয়ে গেছে।

রজনীগন্ধার ফুলের গোছাটা স্কুলের বারান্দায় রেলিং-এ ভর রেখে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে করতে একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল সে।

পরে ঘরে ঢুকে বলল, 'ভুবনবাবু, তোমার একখানা ধুতি দাও'।

বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ও ময়লা শাড়িটা ফেলে দিয়ে ভুবনবাবুর ধুতি গায়ে জড়িয়ে সে যখন ঘরের অন্ধকারে ফিরে গেল তখন তার হাত পা কাঁপছে।

তাহলে ব্যাপারটা এ পল্লীতে এসেই হয়নি, গাঙ্গুলীগিন্নির রসিকতার উত্তর দিতে গিয়েও নয়। ক্লাস এইটের ঘরের উদ্বাস্তুদের চোখের সামনে সে রাত্রিতেই মিথ্যা এই ঘোষণা কবেছিল—সে ভুবনবাবুর স্ত্রী।

মিথ্যা? মনের দিক দিয়ে? অন্তত সে রাত্রিতে? নাকি, সে শুধু কৃতজ্ঞতা? কথাটাকে নাড়াচাড়া করল বিমলা মনে মনে।

কথাটাকে সে-ই বোধ হয় আবিষ্কার করেছে এই পৃথিবীতে। রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণ। সেদিন রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণের কথা মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছিল সেই অব্যক্ত আকুল প্রার্থনা করে অন্ধকারের গহ্বরে ঢুকবার দরকার নেই। ভুবনবাবুর বিছানা এক আঙুলে ছুঁয়ে মেঝেতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভুবনবাবু এতক্ষণে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে রাত্রিতে কিন্তু খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয় সারাদিন হাঁটাহাঁটি করার ফলেই। আর সেই অভ্যাসও যেন রেঙ্গুন বজ্রযোগিনী পথের।

বেশ তো, লোকে জানুক না সে ভুবনবাবুর স্ত্রী। স্বামীস্ত্রীর মতোই দু'জনে মিলে তারা এই সংসারে চালাচ্ছে। অনেকদিন আগে এ কথাটাকে বিশ্লেষণ করে চিন্তা করতে গিয়ে সে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। এখন তা হল না। সেটাও নির্বাক সংবেদনহীন অতীত। ভুবনবাবুর সত্যিকারের স্ত্রী হতে সে পারবে না। একটি স্বল্পোচ্চারিত দৃঢ় 'না' ছাড়া কিছুই বলার নেই তার এ বিষয়ে।

শীতল এই 'না'টা বলতে গিয়ে মনে মনে তার গরম লেগে উঠল যেন। কাঁথাটাকে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিল সে।

নিজের কথাই ভাবে সে, ভুবনবাবুর কথাও ভাবা উচিত, এ রকম একটা অনুযোগ তার মনে উঠে পড়ল। সেই এসেছিল ভুবনবাবু। তারপরে আর ফিরে যায়নি। কখনও মনে হয়েছে ভুবনবাবুর শান্ত শীতল ভঙ্গি দেখে, সে যেন অপেক্ষা করে আছে। একদিন বিমির মতি হবে আর সেদিন তাকে নিয়ে ফিরে যাবে অন্য জীবনটাতে।

কিন্তু ভুবনবাবু বিমলা বলে যাকে প্রতিমুহূর্তে মেনে নিচ্ছে, সে তো তারই বিমি নামে কল্পনা।

এই সৎসাহসী চিন্তাটার মুখোমুখি হয়ে সে যেন চিন্তার সাহসকেই হারিয়ে ফেলল। ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিয়ে তোমাদের যা ইচ্ছে হয় বলো এ রকম বলার মতো মনোভঙ্গি হল তার।

কিন্তু কথাটা ভুবনবাবুর কাছেই শোনা।

বজ্রযোগিনীতে একটা আধুনিক আবহাওয়া নিজেদের জন্য তৈরি করে নিয়েছিল তারা। বাড়িটা তৈরি করার সময়ে, ধনীদের অনুকরণে মধ্যবিত্তরা যা করে, তেমন কোনো বনেদিআনার চেষ্টা করেনি ভুবনবাবু। বরং কংক্রিটের ক্যাটালগে যেসব বাড়ির ছবি ছাপা থাকে তেমনি একটা চার

কামরার ছোট একতলা বাড়ি উঠেছিল মাটির পথের ধারে। ঘাসে ঢাকা একটা লন ছিল। জানালাগুলোর কোনো কোনোটায় কাচের শার্সি বসানো হয়েছিল। ভিতরের দিকের বারান্দার টবে ফুলগাছ ছিল কয়েকটি। আর উঠোনে এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে গেলে নজরে পড়ে, এমন জায়গায় রজনীগন্ধার চাষ ছিল। অচল সিকি দিয়ে দোকান থেকে যে-রকম কিনেছিল একদিন সে, তেমন শুকিয়ে ওঠা কিছু নয়। চা ভিজিয়ে দিয়ে যে অবসর পাওয়া যায় তার মধ্যেই কাঁচি হাতে উঠোনে নেমে একগোছা রজনীগন্ধা কেটে এনে চা-টেবিলের ভাসে সাজিয়ে দিতে পারত সে।

তেমনি এক চায়ের টেবিলে বসে ভুবনবাবু বলেছিল, 'যা দেখছ মনে করো তুমি, তাই কি সত্যি'?

স্বভাবতই বিমলা অবিশ্বাস করেছিল ভুবনবাবুর বক্তব্যে।

'এ কাঁচিটাকে দেখে মনে করতে পারো এটা রজনীগন্ধা? কিংবা এই রজনীগন্ধ দেখে মনে করতে পারো এটাই বিমলার আঙুল'? বলেছিল বিমলা।

রজনীগন্ধা! কেন যে এমন সব ভুল করে বসে সে কখনও কখনও?

আলাপটা তারা অনেকক্ষণ চালিয়ে গিয়েছিল। ভুবনবাবু সেই পুরনো তত্ত্ব নতুন ভাষায় প্রকাশ করেছিল। যার ফলে সাময়িকভাবে বিমলার এ রকম একটা ধারণ হয়েছিল, সত্যটা একাধিক হতে পাবে একই বিষয়ে।

মানুষ যদি সত্য বলে না বুঝত তার দৈনন্দিন জীবনকে, তবে সে কি হাতখানাও নড়াতে পারত মুখে ভাত তুলে দিতে। সত্য বটে কিন্তু কীসের যেন অন্তরাল আছে, আর তার আড়ালে একটা সত্য নিদ্রিত থেকে গেল। নিজের মনে এনে তাকে প্রাণবান করা হল না। নিজে মনের দিকে চেয়ে চেয়ে বিস্ময় বোধ করে বিমলা। কুয়াশায় ঢাকা একটা জলস্রোতের কাছে গেলে যেমন হয়। ঘটনাগুলোর কোলাহল কানে আসে। স্বরূপটা চোখে পড়ে না। এ যেন ভুবনবাবুর সেই জটিল তত্ত্বের সমান্তরাল কিছু।

২

'আচ্ছা, ভুবনবাবু···

'বোসো।'

ভুবনবাবু উঠে দাঁড়াল, যেন বিমলার বসবার জন্য আসনটা টেনে দেবে।

'বসছি,' বলে ভুবনবাবুর বিছানার উপরেই সে বসল, 'কিন্তু তুমি আজ এড়িয়ে যাবে না'।

'যাব না, বলো'।

'আমি দণ্ডকারণ্যের কথাই বলছি। গাঙ্গুলীমশাই-এর মেয়ে মালতী আসবে কিছুক্ষণ পরেই। একটা শোভাযাত্রা বার করছে তারা। খুব বলেছে যেতে'।

'যাবে নাকি'?

'গিয়ে কারো উপকার হবে'?

ভুবনবাবু ভাবতে লাগল চায়ের কাপ হাতে।

বিমলা বলল, 'খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। পড়েও সন্দেহই বাড়ে। ভালো যা তা বোঝাতে এত বিবৃতি দিতে হয় কেন? এত শোভাযাত্রাই-বা কেন করতে হয় ভালো নয় বোঝাতে'।

ভুবনবাবু বলল, 'মালতী কী বলে'?

'মেয়েটা সোজাসুজি বলে, ওরা চলে গেলে নাকি মালতীর দলের লোক কমে যাবে'।

'দল'?

'নেই, হবে বলেছে। এদেশে থাকলে ওরা এই বিড়ম্বনা ভুলতে পারবে না। নিচুতলাতে অসন্তোষ নিয়ে থাকবে। তার ফলে মালতীর দলের বৃদ্ধি হবে'।

ভুবনবাবু হেসে বলল, 'মেয়েটা একটা কথা ঠিক বলেছে, এখানে থাকলে বাকি জীবনটা অসন্তোষ নিয়ে কাটাতে হবে। শান্তি আসবে না'।

ভুবনবাবু ভাবতে লাগল, মিটমিট করে হেসেও চলল।

বলল, 'মালতীর দৃষ্টি বড় স্বচ্ছ। চোখে মোটে পর্দা নেই। দলের বৃদ্ধির ব্যাপার আর মানুষের মধ্যে কোনো সহানুভূতির সমবেদনার পর্দা রাখেনি'।

মালতীর চেহারাটা ফুটল বিমলার মনে। কালো রং, প্রকাণ্ড চেহারা, চোখ দুটি ছোট, নাকটার ডগা উলটানো, সামনের বড় বড় দাঁত ক'টিকে পুরু ঠোঁট দু'খানা ঢাকতে পারে না।

অত্যন্ত কর্মঠ মেয়ে, পাঁচজনের কাজ একা করতে পারে। বাড়িতে অত কাজ নেই বলে পাড়ার এ বাড়িতে ও বাড়িতে কাজ করে বেড়ায়। সে চাল ঝাড়া হোক, কিংবা রান্না করে দেয়া। এরই মধ্যে সময় করে সে দলের কাজও করে আসে শহরে গিয়ে। তার বিয়ের কথা ভাবাও যায় না। সময় কোথায়?

বিমলা বলল, 'কিন্তু আমরা দুজনেই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম'।

'ভালোই হয়েছে তা ক'রে'।

'আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো, আমরা পৃথিবীর কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজনীতির সুতো টানছে কারা আর আমরা হাত পা ছুঁড়ছি। ভাবছি সেটাই বাঁচা'। বলল বিমলা।

'মালতীর খোলামেলা কথা আমাদের মুখও আলগা করে দিয়েছে দেখছি। ভাগ্যে কেউ শুনছে না'।

'শুনলে অবশ্যই বোকার হদ্দ বলত'। বলে বিমি হাসল।

রাজনীতির কথা তার অনেকসময়েই মনে পড়ে। অন্তত ধর্মের চাইতে বেশি। আর অনেকসময়েই ভুবনবাবু থাকে না। রাজনীতির একটা সক্রিয় সত্তা আছে? একদিন তার অনুভব হয়েছিল সম্মুখের ওই কালো পথটাই যেন রাজনীতির প্রতিমা-অর্পিত রূপ। সরীসৃপ যেন রাজনীতি। কুণ্ডলীতে আবদ্ধ ওই হলুদমোহন ক্যাম্প। বিশ্রাম শেষ হলেই আবার গ্রাস করা শুরু হবে।

ভুবনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে ঘরের জানলা দিয়েই তার চোখ গিয়ে পড়ল রাজপথের ওপারে ক্যাম্পের একাংশে। একটা অনির্দিষ্ট বিষাদ বোধ করল সে। বিষণ্ণতা। একটা ঝিমিয়ে আসা যেন। আর সেটা এই সকালেই, যখন একটা গোটা দিন সামনে পড়ে আছে। তা কী করে চলবে? সকাল। অনেক সকালের তাজা ভাবের স্মৃতি। উঁ হুঁ হুঁ করে একটা যে কোনো সুরকে টেনে আনার সজ্ঞান চেষ্টা করল বিমি। সকাল যে এখন।

মালতী এল।

'কী করছ, বউদি'।

'মেয়েদের যা কাজ, রান্নার যোগাড় করে নিচ্ছি'।

'মেয়েদের কাজ বুঝি রান্না করাই'?

'না, আহার্য যোগাড় করাও। ও বিষয়ে নানা দেশের মেয়েই পুরুষদের সাহায্য করে'।

'তার ফলে পুরুষরা অলস হয়'।

'তাও হয়। অলস হয়ে মদটদ খায়'।

'সেটাই তো খারাপ'।

'ওটা মেয়েরাই করেছে নিজেদের স্বার্থে'।

'আমাদের স্বার্থে'?

'তা বইকি। অলস অবসরে আমাদের জন্য যেসব রঙিন বিষয় আবিষ্কার করে, তারই লোভে। তার মধ্যে অবশ্য অনেক মিথ্যা কথার আবিষ্কারও আছে'।

মালতীর মন নরনারীর সাম্য নিয়ে কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কঠিন হয়ে উঠছিল। কিন্তু সেও হেসে ফেলল। বলল, 'দাও, আনাজগুলো কুটে দিই। তুমি ততক্ষণে উনুন ধরিয়ে ফেলো। ওটাতো চোখ বুঁজে আছে'। এই বলে সে বঁটি পেতে আনাজের ঝুড়ি নিয়ে বসে গেল।

বিমি বলল, 'আমার যা আয়োজন তা তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। তুমি বরং বলো উদ্দেশ্যটা তোমার কী'। সে হাসলও একটু।

ততক্ষণে আনাজের ঝুড়ির উপরে চোখ বুলিয়ে কী কী তরকারি বানানো যেতে পারে তা আন্দাজ করে নিয়েছে মালতী। তার মোটা কালো রঙের কিন্তু সুদক্ষ আঙুলগুলো চালিয়ে চালিয়ে পাশের থালার উপরে কেটে রাখতেও শুরু করেছে।

বিমলা হাওয়া দিয়ে উনুনকে একটু তেজি করল, ভাত চাপিয়ে দিয়ে মালতীর কাছে এসে বসল। সে হঠাৎই লক্ষ্য করল। কাজের হাত মালতীর, কিন্তু নখগুলি কেমন সুন্দর রক্তাভ, যেন রঙে ডোবানো। আর আঙুলগুলোর গড়ন!

'কই, বললে না'।

'শোভাযাত্রা করে সারা শহর ঘুরব'।

'আর স্লোগান'?

'তাও নিশ্চয়। আমরা এই শহরের প্রত্যেকটি লোকেব কানে তুলে দেব এই উদ্বাস্তুরা যেতে চায় না, তাদের জোর করে তাড়ানো হচ্ছে। ভাবো দেখি বউদি, ডুবন্ত লোক নৌকার একটা পাশ চেপে ধরেছে, আর তুমি তার হাতের উপরে মেরে মেরে তার হাত ছাড়িয়ে দিচ্ছ'।

জলের দেশের মেয়ে মালতী, হয়তো খেলার ছলে সঙ্গীদের মধ্যে এ রকম ব্যাপার ঘটতে দেখেছে, তার থেকেই কল্পনায় এনেছে এই উপমা।

বিমি বলল, 'কিন্তু, মালতী, যদি নৌকাটা আরোহীদের নিয়েই ভারী হয়ে থাকে'?

'প্রমাণসাপেক্ষ'।

'তা না হয় হল। কিন্তু তোমাদের শোভাযাত্রায় আমি কী করব'?

'তুমি থাকবে না? তুমি না থাকলে আমাদের পাড়ার কোন কাজ মানায়? তা ছাড়া তুমি নিজে ক্যাম্পে না থেকেও ওদের কথা এত জানো'।

এটাই মালতীর ধরন। মানানোর কথা যা সে বলেছে সেটা বিমলার পক্ষে কৌতুকের ব্যাপার। অনেক কথা আছে যা টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে ছড়িয়ে কানে আসে। এ কথাটাও তেমনি। সব যোগ করলে এই দাঁড়ায়, বিমলার মুখ-চোখের গড়নে এমন একটা মর্যাদা আছে যা এ পল্লীতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর কতগুলি ব্যাপারে তার নাকি একটা স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা আছে যা শিখতে হলে এ পল্লীর অনেককেই অনেকদিন ধরে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপারটার সূচনা সেই নারীশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দিনে। শহর থেকে একজন বড়গোছের সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী এসেছিলেন সভাপতিত্ব করতে। এ পল্লীর মেয়েরা খুঁজে পাচ্ছিল না কী করে তাঁকে অভ্যর্থনা করা যায়। তখন বিমলা নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করেছিল সে যেন ঘরের মানুষ।

মালতী বলে, 'প্রথম প্রথম সে মহিলাটি তো আদুরে বেড়ালের মতো গাল ফুলিয়ে শুধু হুঁ হাঁ করছিল, তারপরে বিমলা বউদির কাছে হার মানল। সব জানি ভাবটা ছেড়ে দিয়ে কেবল জিজ্ঞাসাই করতে লাগল। আর চায়ের আসর! ভেবেছিল বোধ হয় গেঁইয়ারা জানে না। কিন্তু টেবিলের পাশে

দাঁড়িয়ে বউদির চা করার ভঙ্গিটা মনে আছে তো? সিনেমা দেখেছ? তার চাইতেও মানানসই ভঙ্গি। দোকান থেকে ধার করে আনা অত বাসনপত্র কাঁটা চামচ কী কাজে লাগে তা তো দেখলে। কেমন টুকটাক করে সাজিয়ে দিল। একটাও আর বাড়তি বলে মনে হল না। অথচ বিমলা বউদিকে সিনেমায় যেতে দেখছ'?

কেন যে টেবিল সাজাতে জানে সে কথা বলে আর কী হবে? তার জন্য দুঃখও আর হয় না।

কৌতুকের ব্যাপার দ্যাখো মালতীর মনের। বিমলার পক্ষপাতী সে এইজন্যে যে উঁচু মহলের আদবকায়দায় সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। অথচ উঁচুমহলের সম্বন্ধে যে কোনো কথা বলতে গেলেই মালতীর চোখ যেন জ্বলে ওঠে। ঘৃণায় নাক উঁচুতে যায়।

বাকি থাকল ওদের সম্বন্ধে জানার কথা। জানে হয়তো কিছু কিছু ক্যাম্পের অধিবাসীদের সম্বন্ধে। কিন্তু ওদের মনের কথা জানলেই যে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ হয় কী ক'রে? আর হলেও কী লাভ?

মালতী বলল, 'আর কী কুটব বলো'।

'আর দরকার হবে না। এবার তুমি ওঠো। এরপরে তুমি রান্না করে দিতে চাইবে'।

'তা চাইব না যদি তুমি রাজি হও'।

'ভেবে দেখি বললে হয় না'?

'না। তাহলে বেলা বারোটায় আমি ওদের নিয়ে আসছি'।

এই বলে মালতী চলে গেল হয়তো অন্য কারো ছেলে কোলে করে রেখে রান্নাব সাহায্য করতে, কিংবা কারো হয়তো রান্না করতেই বসে যাবে। ব্যাপারগুলি সম্ভাব্য কল্পনা নয়, ঘটতে দেখেছে সে।

মালতী চলে গেল। আনাজ কুটবার সময়ে যা নজরে পড়েছিল সেই আঙুলগুলির কথাই মনে হল বিমলার। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যই বোধ হয় কথাটা। তারপর মালতীর মুখের কথা মনে হল।

উনুনে তরকারির কড়া চাপিয়ে ভাবল সে। মানুষের কখনও তিলফুল নাসা হয়? কখনও শ্রুতি পরশে এমন চোখ হয়? অধর কখনও বান্ধুলিসদৃশ হতে দেখেছ? যুবকরা যেন কবিদের মতোই পাগল। কবিরা বোধ হয় কল্পনা করে প্রিয়তমা নারী সম্বন্ধে এমনসব অসম্ভব তুলনার সাহায্যে। কিংবা হয়তো কথাই। কথার নেশায় বলা, ছন্দের পূরণের জন্য। আকস্মিক উদ্‌ঘাটনের মতো কথা সংকুচিত হল তার মনে। একটু দ্বিধা করল। তারপর হাসি হাসি মুখে নিজের মনে জেগে ওঠা এই প্রত্যয়কে চেপে ধরে সে যেন মনের সামনে বসিয়ে দিল। কবিরাই এসব করিয়েছে। তারাই সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণাগুলি বদ্ধমূল করে দিয়েছে মানুষের মনে। আর সেজন্যই মালতীর মতো, স্বাস্থ্যবতী মেয়েও কোনো যুবককে আকর্ষণ করতে পারে না। সুগঠিত নিতম্ব, সু-উন্নত বক্ষ। মানুষের জীবনপ্রবাহ সংরক্ষণের পক্ষে এমন উপযুক্ত কে মালতীর মতো। তবু...

মানুষের মন আদিম অবস্থায় নেই, এই বোধ হয়, এ বিষয়ে উত্তর হতে পারে। কবিরা কি তাদের অনেক দিনের চেষ্টায় নারী সম্বন্ধে পুরুষের রুচি সত্যি বদলে দিয়েছে? তা যদি সত্যি হয়, অন্য অনেক ব্যাপারে এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বাইরে থেকে এতদিন যাকে কারণ বলে মনে হয়েছে সেটা তো কারণ নাও হতে পারে। মনে করো রাজনীতি। মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদেই যদি এককালে গড়ে উঠেও থাকে, এখন আর তা হয়তো হয় না। অনেক কথা বলেছে রাজনৈতিকরা। সেসব কথার টুকরো-টাকরার কোনো একটা মনে গেঁথে যেতে পারে। সেটাই তখন নিজের আত্মপ্রসারের তাগিদ বলে ভ্রম হতে পারে। ওই ক্যাম্পে যারা আছে তারা কি জানে কোনদিকে তাদের সত্যিকারের আগ্রহ? এমন কি হতে পারে মালতী যা বলছে তাই তারা মেনে নিচ্ছে? আর

সেই কথাগুলিকেই নিজের কথা মনে করছে?

কী ছাইপাঁশ ভাবছি বসে এই ভেবে উঠে দাঁড়াল বিমলা। ঘড়িটা একবার দেখে আসা দরকার।

তথাপি ঘড়ি দেখে ফিরে আসতে আসতে সে এই স্বগতোক্তি করল : মাটিতে আঁকা বাঘ যদি শঙ্করকেই খেয়ে থাকে আমরা কোথায়? নিজেকে চেনা কি এতই সহজ? বেশিরভাগ সময়েই কি অন্যের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার জায়গায় বসিয়ে দিই না? অন্য কারো প্রভাব মেনে নিই না?

ঘড়িতে নটা বেজেছিল। রান্নাও প্রায় হয়ে গেছে। কতটুকুই-বা সময় লাগে এই সামান্য রান্নার আয়োজন করতে। ভুবনবাবুকে ডাকতে হবে না। নিজেই স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়াবে। বিমি হাত চালিয়ে বাকি কাজটুকু সারতে লাগল।

ভুবনবাবু খেতে বসলে অনুমতি নেয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, 'মালতীদের সঙ্গে গেলে ফিরতে দেরি হতে পারে'।

'তা হোক না একদিন'।

ভালো পার্টনার ভুবনবাবু—অনেকবারের মতোই আবার মনে হল তার।

কিন্তু সেদিন শোভাযাত্রায় তার যাওয়া হল না। কারণটা শুনে মালতী বলল, 'তাহলে আর কী করা'।

শোভাযাত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল। সবার আগে মালতী। তার পিছনে যেন গোটা ক্যাম্পটাও ভেঙে চলেছে। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। এই পিচ বাঁধানো পথে এত ধুলো ছিল! মাথার উপরে দুপুরের রোদ। যুবক, বৃদ্ধ, ছেলে কোলে করে মা, কোলকুজো বৃদ্ধা। ভাঙা পুতুলের মিছিল। একটা সম-অনুভব বোধ করল সে। একটা প্রবল কিছু করা উচিত ওদের। তা সে যাই হোক। ওদের চিৎকার করে বলা স্লোগানের মতোই প্রবলভাবে ঘটা ভালো। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এসে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

শোভাযাত্রাটা একসময়ে চোখের বাইরে চলেও গেল।

এখন একটানা অবসর। ভুবনবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। ঘরটা গুছিয়ে দেবার দৈনন্দিন সময় এখনও অনেক দূরে। সে-কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিল সে। কিন্তু কতটুকু সময়ই বা তার জন্য ব্যয় করা যায়। অবসরটাই আবার ফিরে এল। এবার সে ভুবনবাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বই? বই পড়বে? গত পাঁচ-সাত বছরে সে এক লাইন পড়েছে কি না সন্দেহ। তার মনে হয়, বই হাতে নিয়ে পড়তে বসা তাকে মানায় না। যেমন মানায় না, ধরো, জুতো পায়ে দেয়া, কিংবা রঙিন শাড়ি পরা। একটা সামঞ্জস্যতার বোধই যেন তাকে বাধা দেয়। যা স্বাভাবিক রুচি হতে পারত, তা থেকে রুচিবোধই যেন তাকে সরিয়ে রাখে। দূরে দাঁড়িয়ে ভুবনবাবুর হাতে মেলে ধরা খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরগুলোকে না দেখার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে চোখ রাখে সে ক্বচিৎ, কিন্তু তাকে পড়া বলে না।

ভুবনবাবুর টেবিল থেকে একখানা বই নিল সে। উপন্যাস নাকি? উপন্যাস কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। জোলো জোলো, কী অসম্ভব রকমের অগভীর হয় উপন্যাস জীবনের চাইতে। উপন্যাস সে একসময় পড়ত। একসময়ে সে অনেককিছুই পড়ত। সে অনেক অতীতের ব্রহ্মদেশের কথা নয়। তারপরও। বরং বলা যায় বজ্রযোগিনীতে পড়াটাই একমাত্র কাজ ছিল। তার এবং ভুবনবাবুরও বটে।

উঠোনে একটা শব্দ হল। বইটা বন্ধ করে. যেন কিছুই হয়নি, এমন মুখ করে দাঁড়াল। কিছুই হয়নি। রান্নাঘরের পিছনে যে কাঁঠাল গাছটা আছে তা থেকে ছোট একটা শুকনো ডাল ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বই পড়া আর হল না। আর একদিন সে চেষ্টা করবে। পড়লে এমন কিছু তাজ্জব ব্যাপার হয় না। পায়ের শব্দ মনে করে বই বন্ধ করতে হল।

অবসর আজ ভোগ করতেই হবে। অথচ ভেবে দ্যাখো এ সময়ে তো রোজই অবসর। কাজ না থাকার এই দুপুর রোজই আসে। কোনো কোনো দিন কেন এমন ফাঁকা হয়ে যায়? মনে মনে সে শোভাযাত্রার চলার শ্রম দিয়ে এই সময়টুকুকে ভরে তুলেছিল। তা থেকে বঞ্চিত হয়েই হয়তো এমন হচ্ছে--ভাবল সে লুকোচুরি খেলার মতো। রাজনীতি নিয়ে ছাইপাঁশ ভেবেছে, সেটা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তার দেহের মধ্যে যেন কথাটা লুকিয়ে থাকে। দেহের কত কোষেরই তো মৃত্যু হচ্ছে রোজ। কথাগুলোও যদি মরে যেত।

ভুবনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে এবার ফাদার ফিলিপটকেই দেখতে পেল সে। চশমা চোখে হাসিমুখো ফাদার। মাথার হলুদে চুল শাদা হয়ে আসছে। গায়ের রং কাগজের মতো শাদা। আর তার চারিদিকে ভিড ক'রে ম্যাকব্রাইডের সাংবাদিক গোষ্ঠী।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল সে। চারিদিকে তাকিয়ে হাসপাতালের পূর্বপরিচিত আসবাবপত্র দেখে বুঝতে পেরেছিল কোনো হাসপাতালের কেবিনে সে আছে। নিজের একখানা হাত চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। একগাছা চুড়িও হাতে নেই। তারপর হাতখানাই গলার কাছে এনে দেখল হারটাও নেই গলায়। তারপর তার মনে হল ঘটনার কথা। কিছুই কি আছে? উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল তার পা এবং কোমর ফিতে দিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা। তারপর সে নরম বালিশে মাথা রেখেছিল। শয্যাটা পরিচ্ছন্ন ; বুকের ভিতরে কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। ঝকঝকে চুনকাম করা দেয়াল··· জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

সুস্থ হয়ে সে দেখল সে বিশপের পরিচারিকাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। হসপিট্যালের মালিক বিশপ। তার বাংলোর লাগোয়া হসপিট্যাল। যতদূর মনে পড়ে হসপিট্যাল থেকে একজন পরিচারিকাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল বাংলোর ভিতরে। দুপুরে আহার হয়েছিল পরিচারিকাদের টেবিলে। বিশ্রামেব জন্যও খানিকটা জায়গা। কারণ তখন বিশপ তার এক নিয়মিত পবিক্রমায় বেরিয়ে গিয়েছিল। বিশপ ফিরে না এলে তার সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না।

দিন তিনেক পরে বাংলোয় ফিরে বিশপ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল—এবার বলো তোমার বাড়ি কোথায়?

সব গোলমাল হয়ে গেলে যেমন হয় তেমন নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল সে। বাড়ি কোথায় তা তো সে ভুলে যায়নি, তবু এ প্রশ্নটার উত্তরই সে দিতে পারেনি। বরং মনে করার একটা তাগিদ অনুভব করল—এই বিদেশি মুখটিকে সেই রাত্রির বাড়িতে পাশের কামরায় দেখেছিল কি না।

বিশপ হাসিমুখে প্রশ্ন করেছিল—বাড়ি যাবে না?

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে অন্তরে অন্তরে। চোখে জল এসেছিল, মুখে শব্দ হল না। এ রকম ঘটাটা বিজ্ঞানসম্মত কি না কে জানে, বিমলা এখন বিশ্লেষণ করে। কনভেন্টের শিক্ষাই মনে পড়ে গিয়েছিল হয়তো ফাদারের সামনে। হ্যাঁ, কনভেন্টের সেই পাদরির মতো একটা ছোট ক্রুশও ছিল ফাদারের গলায় ঝোলানো।

আর ফাদারের মুখের চেহারা। দয়া, দয়ারই তৈরি মূর্তি বলতে হয়। চোখের চশমাটা। বাঁধানো ঝকঝকে দাঁতগুলি। কিছুই যেন দয়ার সেই রূপটির ছন্দহানি ঘটায়নি। বোধ হয় ওদের দেশে ভালো সিনেমা আর্টিস্ট দিয়ে দয়ার পোজের ছবি তৈরি করিয়ে সেটাকে অনুকরণ করার অভ্যাস করে ওরা। বিজ্ঞানের দেশ ওদের। কী করে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করা যায় সে সম্বন্ধে ওরা মোটা মোটা বই লিখে থাকে। হয়তো পাদরিদের মুখের চেহারা কী রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও ওদের বই আছে।

এ চিন্তা অবশ্য পরবর্তী কালের। তার আগে ফাদার তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। অনেক রকমের কাজই ছিল তার বন্দোবস্তের আওতায়। নারীদের কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত।

একটি দু'টি করে দিন যেতে যেতে অনেকগুলি দিনই চলে গেল। শেষের দিকে দিনগুলি লঘুপদেই যাচ্ছিল। পরিচারিকাদের মধ্যেই থাকা। তাদের টেবিলে আহার। নিদ্রার জন্য একটি কুঠরি পরিচারিকাদের মহলেই। পরিচ্ছন্নতা ছিল। আর ছিল প্রার্থনা। শুধু রবিবারে নয়। অন্যদিনের সকালেও ফাদার যখন প্রার্থনা করতেন, কিংবা অধস্তন পাদরি বেঞ্জামিন দাস, সেও চোখ বুজে হাত জোড় করে প্রার্থনা করত। কখনও কখনও অবশ্য সে অস্থির হয়ে যেত। পিউ-এর আসনে বসে থাকতে পারত না, জানু পেতে বসত মেঝেতে। এ ব্যাপারেও তাকে সাহায্য করেছে নাকি বাল্যের অভ্যাস, কনভেন্টে পড়ার সময়ে যা সে অর্জন করেছিল। আর তার আন্তরিকতা গোপন ছিল না, আলাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একদিন এল ম্যাকব্রাইড এবং তার বন্ধুরা। ম্যাকব্রাইড যে সে লোক নয়। সাংবাদিক নয়, সংবাদস্রষ্টা। সাহিত্যিকও বলা যায়। রাজনীতির ধূম্রজাল ভেদ করে চলে তার মনীষা। পৃথিবীর সব দেশে, অন্তত সভ্য দেশগুলিতে তো বটেই, তার বইগুলি আগ্রহসহকারে পড়ে লোকে। রাজনৈতিক বক্তৃতার ভিত্তি হয় তার নির্ধারিত তথ্য। অথচ কী সরল কথাবার্তা। বড়ভাই যেন এসেছে বাড়িতে, পরিচারিকারা পর্যন্ত তার ভদ্র ব্যবহারে অনুভব করল।

ম্যাকব্রাইড। টকটকে লাল চুল, ধাতবপরিধিহীন কাচের চশমা। প্রজাপতি আঁকা কালচে লাল রঙের টাই। একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সারা পৃথিবীর পথিক ব'লে, কোনো দেশের স্মারক হিসাবেই বোধ হয়, সে দেশের রীতি অনুসারে দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু একদিনের জন্য এসেছে। যাবে ইন্দোনেশিয়া, পথে থেমেছে। ফাদার ফিলিপটের ঠিকানা জানা ছিল, তাই সৌজন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাংবাদিক তো। উট যেমন মরুভূমিতে জলের গন্ধ পায়।

বিমলাকে যখন ডেকে নিয়ে গেল তখন ডিনার শেষ হয়েছে।

'কী হয়েছে'?

'ফাদার ডাকছেন আপনাকে'।

'আমাকে? কেন? খাবার ঘরে'?

বিমলা টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

ফাদার বাংলায় বলল, 'তুমি আমার সাক্ষী। ম্যাকব্রাইড বলছে আমি ওর সঙ্গে রসিকতা করেছি'।

বিমলা কী বলল, সে ম্যাকব্রাইডের সুবিধার জন্য তার ইংরেজি তর্জমাও করে দিল।

ম্যাকব্রাইড বিমলাকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কফি'?

ফাদার উত্তরটা যুগিয়ে দিল, 'ভদ্রতা সহকারে প্রত্যাখ্যান করো'। বিমলা কিছু বলার আগেই বলল, 'সি রিফিউজেস্ উইথ থ্যাঙ্কস্'।

ফাদার বলল, 'এবার তুমি বলো সেখানে কী হয়েছিল। কিছুই তো নয়। সে কথাটাই বলো। একটা সাধারণ ট্রেন ডাকাতির চেষ্টা। তাই নয়? সেই ভৈরবে কারো প্রাণ গিয়েছে বলে শোনা যায়নি। দু-একজন আহত হয়েছে। আর নারী ধর্ষণ—অসম্ভব। অন্তত তোমার চোখে তা পড়েনি। এবার তুমি বলো আমি তার ইংরেজি অনুবাদ সাহেবকে বলব। নাও ইউ উইল হিয়ার'। বলে ফাদার আহারতৃপ্ত হাসিমুখটা ফিরাল ম্যাকব্রাইডের দিকে।

কে যেন গলাটা চেপে ধরল বিমলার ; শত চেষ্টা করলেও একটা তীব্র আর্তনাদ, একটা অব্যক্ত প্রবল প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু তার গলায় ফুটবে না। বেঞ্জামিন, ভাগ্যক্রমে, বসেছিল এমন জায়গায় যেখান থেকে বিমলাকে সাহায্য করা যায়। সে টেবিলের পরে রাখা বিমলার আঙুলগুলোর উপরে চাপড়ে দিল আস্তে আস্তে। মৃদুস্বরে বলল, 'সাহেব যা বলল তাই হ্যাঁ করে যাও'।

'সাহেব যা বলল'? মানুষ কি ভুলে যেতে পারে? ভুলে থাকা যায় হয়তো কিছু সময়ের জন্য।

কিন্তু এতদিন পরেও কি সে ভুলতে পেরেছে। ফাদার এটুকুর জন্যই, এই স্তব্ধতার মধ্যে বলা 'সাহেব যা বলল' এই শব্দ তিনটির জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিল। হাসিমুখে বলল, 'সি সেজ—হোয়াট এভার আই হ্যাভ সেড্—অর্থাৎ আমি যা বলেছি তাই সত্য'। বিমলা এবং বেঞ্জামিনের সুবিধার জন্যই যেন ফাদার বাংলাতেও বলল। আর সুন্দর একটা জ্যোতির্ময় হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, যেন একটা ঘৃণা পরিবাদ থেকে মানবজাতিকে সে উদ্ধার করতে পেরেছে।

কিন্তু বিমি আর একটু শুনতে পেয়েছিল।

একজন সাংবাদিক বলল, 'কিন্তু আমরা ওদেশের কাগজে মার্ডার আর রেপ দেখে এলাম'।

ফাদার বলল, 'সন, ভুলে যেয়ো না আমাদের এই মিত্রদেশকে, এই বন্ধুদেশকে, সবরকমে বিব্রত করাই ওদেশে ওদের রাজনীতি'।

ম্যাকব্রাইড বলল, 'তাহলে এদেশের পুলিস এবং অন্যান্যরা সেই জঘন্য অপরাধীদের সাহায্য করেনি'?

কথাগুলি ইংরেজিতে হচ্ছিল। আর একটা শূন্যতা যেন যেখানে হৃদয় ছিল। সেই শূন্যতার মধ্যে যেন মনে হচ্ছিল দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, কেন সে ইংরেজি বুঝতে পারছে।

কোথা থেকে কী যেন হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল নিস্তব্ধ ঝিঁঝিঁ ডাকা একটা মাঠের মধ্যে। কোথায় এলাম বুঝবার উপায় ছিল না। গাড়ির হলুদে আলোয় রেলপথের ধারের ঝোপঝাড়কে গভীর করে দেখাচ্ছিল। তারপর কোলাহল আর আর্তনাদ শুরু হল। এঞ্জিনের দিক থেকে, গার্ডের গাড়ির দিকে থেকে। অনেক কণ্ঠের উল্লাস রব, অনেক কণ্ঠের আর্তনাদ। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সে পাশের ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় সাহেবদের লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। কিন্তু ভালো করে কিছু দেখবার আগেই বাইরের হ্যাঁচকা টানে তাদের কামরার দরজাটা খুলে গেল। বাইরের সেই উল্লাসরব আর আর্তনাদ এবার বুকের পাশে।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। যে বউটির সঙ্গে গল্প করেছিল সে ততক্ষণ, তার কথা মনে আছে। আতঙ্কে সে তার স্বামীর একখানা হাত চেপে ধরেছিল। তাকে যখন গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছে তখনও সে সংজ্ঞাশূন্য স্বামীকে ধরে আছে। তার স্বামীর দোমড়ানো মোচড়ানো দেহটা শেষ পর্যন্ত আধখানা গাড়ির মধ্যে আধখানা পাদানির উপরে ঝুলতে লাগল। গাড়ির সব আলোগুলো নিবে গিয়েছিল। উল্লাসকারীদের হাতে টর্চ জ্বলছে। অসংখ্য টর্চের আলোয় তারা স্ত্রীলোক খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিমলা হয় ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল, কিংবা ওইভাবেই তাকে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ডান পা-টা মচকে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না। পড়ে গেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। উঠে দাঁড়িয়ে কী হবে মানুষ তা ভাবে না।

তার শাড়িখানা ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। মচকানো পা-টা সে মাটিতে পাততে পারল না। আবার এক শ্বাপদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে পড়ে গেল। চারদিকে শ্বাপদের চোখ-টর্চগুলো জ্বলছে। দুড়দার করে তারা এ মাথা থেকে ও মাথা ছুটছে। কে একজন তার সেই পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। এর একজনের বুটের ধাক্কা লাগল তার মুখে। তারপরে দু-তিনজন এসে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল তাকে ঘিরে। কয়েক জোড়া হাত তার হাত পা মাথা চেপে ধরেছিল।

জ্ঞান হওয়ার মতো একটা ভাব হয়েছিল, বোধ হয় তখন শেষ রাত। আকাশে দু'একটি তারা। কোমর থেকে পা কি ট্রেনে কাটা গেছে? বুকের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছে নিঃশ্বাস নিতে। শুকনো ঘাস হাতে লাগল। পায়ের দিকটা কি ডোবায়? মাটিটা সেদিকে ভিজে। তারপরই আবার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল।

বেঞ্জামিনই বলেছিল। বেঞ্জামিন তাকে সত্য কথা বলত। যা মানায় তাই সত্য ছিল না বেঞ্জামিনের কাছে, যা ঘটে তাও সত্য ছিল। অন্তত কখনও কখনও বিমলার সামনে। সে বলেছিল এতদিনে

সত্যটা প্রকাশ পাবে। ম্যাকব্রাইড বিখ্যাত সাংবাদিক। তার কাছে সত্য গোপন থাকে না। ফ্ল্যাশ ক্যামেরায় তোমাদের ছবি তুলল বোঝোনি? প্রতিকারও হবে। তুমি কি ভাবো ঘটনা জানার পর পৃথিবীর সৎ মানুষদের ক্রোধ জেগে উঠবে না? পৃথিবীতে কি সৎ মানুষ নেই মনে করো?

একটু গোলমাল হয়ে যায় বিমলার। এ কথাগুলো কখন বলেছিল বেঞ্জামিন? সেই ভোজের টেবিলে যাওয়ার আগে তাকে আশা দিতে? নাকি পরে আশ্বাস হিসাবে?

কিন্তু আর ভাবতে চায় না সে রাজনীতির কথা। ধার্মিক ও সাংবাদিকদের সত্যনিষ্ঠার কথা। অস্থির হয়ে উঠেছে তার শরীর। বুকের ভিতরে কী যেন হাঁপাচ্ছে। অনেক পুরনো কথা। অনেক পুরনো কথার সামনে তুমি তো স্থির থাকতে পারো।

কে যেন বাইরে ডাকছে।

বিমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দুটি স্ত্রীলোক। একটি শিশু। স্ত্রীলোক দুটির একজন প্রৌঢ়া, দ্বিতীয়জনের ঘোমটা টানা দেখে মনে হয় তার বয়স কম। শিশুটি বছর তিনেকের হবে। রোগা রোগা। কিন্তু এখনও বোধ হয় রোগগ্রস্ত নয়।

শিশুটি পথের ধারে দাঁড়িয়ে আগাছার পাতা ছিঁড়ছে। ওই তার খেলা।

প্রৌঢ়াটি এক নিমেষে চোখে একটা অভ্যস্ত আর্ততা নিয়ে এল, কণ্ঠস্বরকে করুণ করে ফেলল, 'কিছু দাও মা'।

'কী দেব'?

'আর কিছু না দাও, ছেলেটার জন্য একটা পুরনো ফাটা জামা'।

'কোথায় পাব'?

'দাও মা'। কাতরিয়ে উঠল প্রৌঢ়া।

কিন্তু ঘোমটা টানা বউটি এবার এগিয়ে এল। ঘোমটা-টা খাটো করল। প্রৌঢ়া আর কী বলতে যাচ্ছিল তার সকরুণ আবেগকে আরো মর্মস্পর্শী করার জন্য, বউটি কথা বলল।

'এ বাড়িতে ছোট ছেলে নেই মাসি'। তারপরে বিমলাকে বলল, 'এই তোমার বাড়ি, মা ঠাকরুন? তবে তো তুমি এখনও আমাদের ছেড়ে যাওনি'।

মরণচাঁদের বউ। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিমি কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'কোথায় আর যাব'?

মরণচাঁদের বউ বলল, 'তুমি যে এখানে আছ, মানি এই শহরেই, তা মনে হতো। কিন্তু সাহস করে খুঁজি নাই'।

বিমি বলল, 'আমাকে দিয়ে কী দরকার'?

দরকারের কথা কিছু নয়। একটা আত্মীয়তার বোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সাময়িক একটা নৈকট্যের অনুভব। কিন্তু সে বোধকে কথায় প্রকাশ করতে পারার মতো ভাষাজ্ঞান নেই মরণচাঁদের বউ-এর।

প্রৌঢ়াটি কাজেই বেরিয়েছিল। এ রকম দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় ছিল না তার।

সে বলল, 'তুই কথা ক, আমি দু-এক বাড়ি ঘুরে দেখি'।

প্রৌঢ়াটি ছেলেটিকে টেনে নিয়ে ভিক্ষা করতে এগিয়ে গেল।

'কে'? বিমি প্রশ্ন করল।

'মাসি গো, ঠাকরুন'।

'মাসি আবার কোথায় পেলে তুমি'।

'আমার না-তেনার'।

'মরণচাঁদের? আর ছেলেটা'?

'বলে ওর নিজের। তা মনে হয় না। ওই আঁশের মতো খসখসে গা, কাঠের মতো শক্ত হাত পা, তার বুকের মধ্যে কি এমন নরম ছেলে তৈরি হয়'?

মাসির উপরে অসন্তুষ্ট মরণচাঁদের বউ। নানা কারণ থাকতে পারে তার এবং সেগুলি প্রকাশ করতেও চায় সে, মনে হল তার ভাবে।

কথা বলার দরকার ছিল বিমিরও। সে বলল, 'বোসো বউ'।

'না, মা ঠাকরুন, বসি না। বসে থাকলে ক্যাটক্যাট করে কথা শুনাবে ক্যাম্পে ফিরে। বোনপোও সায় দিবে। ভিক্ষা করতেই হবে ওর সঙ্গে। তা ভিক্ষা তো হয়ও। এই শাড়িখানা ভিক্ষা করেই পাওয়া। পুরানো। তা হলিও পাঁচ-সাত বছবে এমন পরিষ্কার শাড়ি পরি নাই'।

মরণচাঁদের বউ-এর পরনের শাড়িখানা পুরনো, দু-এক জায়গায় রিফু করাও বটে। কিন্তু এককালে সেটা মাঝারি দামের ভালো শাড়ি ছিল।

কাজেই সে চলে গেল।

বিমলার প্রথমেই মনে হল মরণচাঁদের বউ-এর একটা নাম আছে। মরণচাঁদের মুখে সোদামুনি। সৌদামিনী নাম ছিল মেয়েটার। সভ্যতার কাছাকাছি বাস ছিল। গ্রাম হতে পারে, কিন্তু সৌদামিনী কথাটা চালু হওয়ার মতো আবহাওয়া ছিল।

সে চলে যাওয়ার আগে বিমি তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'শোভাযাত্রায় যাওনি তুমি'?

'তিনি গেছে'।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিমলা আবার অন্দরে ফিরে এল। খানিকটা সময়ের জন্য যেন সে বাইরে এসে হাঁফ ছাড়তে পেরেছিল, আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। বন্দী ঠিক নয়। উপমাটা যেন স্বগৃহে অন্তরীণ। খানিকটা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু জীবন-স্ফূর্তির চারদিকে অদৃশ্য দেয়ালটাও আছে। আর সে দেয়াল তার অভিজ্ঞতা?

রাজনীতি কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো এসে পড়ে। কারণ নিশ্চয়ই আছে। সাইক্লোনের কি আর কারণ থাকে না? কিন্তু যারা সেই আবর্ত ঝড়ে পড়ে তাদের তখন কারণ বিশ্লেষণের কথা মনে থাকে না। পরেও ক্ষয়ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেগুলির জন্য বেদনা অনুভব করতে করতে কারণ বিশ্লেষণের কথা কারো মনে পড়ে না। যদি কেউ তা করতে যায় তাকে হৃদয়হীন যুক্তিসর্বস্ব বলে সমাজে বিদ্রূপ করা হয়। যুদ্ধটা এমনি ব্যাপার। আর দেশবিভাগ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের চাইতেও নির্মম এই ব্যাপারে মন যেন কারণ খুঁজবার জন্য দিশেহারা হয়ে মাথা কুটতে থাকে। যুদ্ধের ব্যাপারটা অধিকতর দূরের বলেই কি এমন হয়? কিংবা এ ব্যাপারটা ধুঁকে ধুঁকে মরার মতো কিছু। মৃত্যু দুটোই। কিন্তু বজ্রপাতের মৃত্যু কি ধীরে ধীরে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে সচেতনভাবে এগোনোর চাইতে কম ক্লেশদায়ক নয়? আর কখনওই যেন ভোলা যায় না এর কারণ রাজনীতির সঙ্গে যেন কোনোভাবে জড়িত, যে রাজনীতি এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

বিমির চোখ দুটি টলমল করল। হাতের আঙুলগুলো অস্থির হয়ে নড়ল। কত রূপ রাজনীতির। ফাদার ফিলিপটের চেহারাটা আবার চোখের সামনেই যেন দেখতে পেল সে। কিছুই হয়নি, তাই এই ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে মরণচাঁদ আর তার বউ সোদামুনি। কত দূরে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা কে জানে। সেই ঘটনার পরেই গৃহত্যাগ করেছে তারাও। বিমি নিজের কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তিকেই তারিফ করল যেন। সিনেমা আর্টিস্টের অভিনয় থেকে না শিখলেও চলে। উদ্ভাবিতটাকে বদলালো সে—হয়তো ভালো কোনো চিত্রকর দিয়ে দয়ার অভিব্যক্তি আঁকিয়ে নেয়, আর তা থেকে মুখভঙ্গি

অভ্যাস করে ওরা।

বিমির চিন্তা মোড় নিল এখানে। অভ্যাসই বলতে হবে। অভ্যাসটা ওদের এমন হয়ে যায় যে সেটাই ওদের চালনা করে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার চাইতে অভ্যাস।

বেঞ্জামিন সে রাত্রিতেও শয্যার পাশে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করেছিল। যে শয্যা, অন্তত বেঞ্জামিনের হিসাবে, কিছুক্ষণ বাদেই অবিবাহিত নরনারীর সঙ্গমশয়নে পরিণত হবে। দরজার আড়াল থেকে বিমি দেখেছিল। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছিল বেঞ্জামিনের প্রার্থনা। সেটা যদি অভ্যাস না হয়, তবে বোধ হয় তা বিমিকেই এই দেখানোর জন্য, যে শয্যাটাকে তার প্রার্থনা পবিত্র করছে।

ধর্ম আর রাজনীতি। কোথায় ধর্মের শেষ আর রাজনীতির শুরু? ধর্ম আর রাজনীতি যেন হাত ধরে চলছে।

এই হলুদমোহন ক্যাম্প ধর্মের তৈরি। বাহ্, বেশ তো। কথাগুলোকে জোড়া দিয়ে বাক্যটা খাড়া করে বিমি অবাক হয়ে গেল। এ বাক্যটা সত্য হতে পারে নাকি? মরণচাঁদ ধর্মের জন্য দেশত্যাগ করেছে। ধর্ম? গত বছর ক্যাম্পে দুর্গোৎসব হয়েছিল। ক্যাম্পের কর্মচারীরা চাঁদা দিয়েছিল। শহরের বদান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকেও আদায় হয়েছিল। এমনকী ক্যাম্পের অধিবাসীদের সামান্য ভাতা থেকেও। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। ক্যাম্পের প্রধান কর্মচারী অজয়ের কিছু নাম হয়েছিল। কিন্তু পুজো কি কোনো অন্ধকার দূর করতে পেরেছিল?

ছলনা! একদিক দিয়ে ছলনাই বলা যেতে পারে। একদল অন্য দলকে ছলনা করছে এবং তা করতে করতে নিজেরাও ছলিত হচ্ছে। অথবা নিজেদের ছলনা করে করে সর্বব্যাপী এক ছলনামণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে? নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো, ছলনাও গ্রহণ কবছি অস্তিত্বের জন্য।

বিমির চাহনির পরিবর্তন হল। বেদনার চিহ্ন দেখা দিল সেখানে।

ম্যাকব্রাইডের ঘটনার পরেও ওদের ধারণাটা টিকেছিল, অদ্ভুত মতি আছে ধর্মে বিমির। বোধ হয় সে প্রার্থনায় অনুপস্থিত থাকত না বলেই। এমন কথাও শোনা যেত, হয়তো সে ধর্মান্তর গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফাদার ফিলিপট একদিন বিশেষ প্রার্থনা ক'রে বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে তাকে মানবপুত্র যিশুর করুণার অধিকারী করবে। এই বিষয়ে বেঞ্জামিনের উৎসাহ ছিল সবচাইতে বেশি। প্রার্থনা করে মন্দির থেকে ফিরতে ফিরতে বেঞ্জামিন কোনো না কোনো সুযোগে তার পাশে পাশে চলতে শুরু করত। একমাসে যতটুকু সান্নিধ্যে এগোনো যায় তার চাইতেও কাছে আসবার চেষ্টা ছিল তার।

কিন্তু হসপিট্যাল থেকে ফাদার ফিলিপটের বাংলোয় আশ্রয় পাওয়ার এক মাসের মধ্যেই সংবাদ এল একটা। যশোর জেলায় ফাদারের যে ছোট গির্জা আছে সেখানকার কর্মচারী অসুস্থ। প্রার্থনা বন্ধ।

ফাদার বেঞ্জামিনকে ডেকে পরামর্শ করছিল। যশোরের কর্মচারীটি এক বছরে তিনবার অসুস্থ হল। তার বদলির দরকার। সে বরং যশিদি যাক। বেঞ্জামিন কি যশোরের ভার নিতে পারে? তা যদি পারে, সেখানকার ছ' বিছানার হাসপাতালটাকে এ সুযোগে বড়ও করা যায়। কারণ বেঞ্জামিনের অভিজ্ঞতা আছে হাসপাতাল সম্বন্ধে। কিছু ফাদারের আত্মজিজ্ঞাসা, কিছু আলোচনা। আর সবই বিমলা শুনতে পেত বেঞ্জামিনের কাছে। এ নিয়ে অন্তত তার কথা বলার সুযোগ হতো বিমির সঙ্গে।

যশোর বলে যশোর শহর নয়। দূরেই বরং। একেবারে সীমান্তের ধার ঘেঁষে। মাঝখানে খালের মতো স্থির জলের একটা নদী। কপোতাক্ষ। এপারে একদেশ ওপারে অন্যটি। এপার থেকে ওপারের মানুষকেও চিনতে পারা যায়। ওপারে, বুঝলে বিমলপ্রভা, একটা জমিদারের কাছারি আছে। পুরনো, এখানে-ওখানে ফাটল ধরা। কিন্তু এখনও রাত্রিতে জোছনা উঠলে মনে হয় দুধে স্নান করানো। ওটা কিন্তু এখন আর কাছারি বলে বিখ্যাত নয়। ওপারের ওটা একটা ভারতীয় ডাকঘর।

'তুমি কি একাই যাবে'? একদিন বিমলা প্রশ্ন করেছিল।

তখন 'তুমি' না বললে বেঞ্জামিন অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেছিল।

বেঞ্জামিন বলল, 'দু-একজন আরো যাবে। ওখানকার কর্মচারী বিবাহিত ছিলেন। সে চলে গেলে তার সঙ্গে তার স্ত্রীও যাবে। তার স্ত্রী ছিল ওখানকার হসপিট্যালেব মেট্রন। অবশ্য এটা আইনসঙ্গত নয়, যাজকের এই বিবাহিত হওয়াটা। কিন্তু অন্য উপায় নেই। ও রকম ছোট ছোট কেন্দ্রের জন্য ব্যাচেলাব সাহেব ফাদার পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ঠিক ফাদার নই। তাহলেও অবিবাহিত যাজক হব। হ্যাঁ, বলছিলাম, হসপিট্যালের কাজের জন্যই, এখান থেকে দু-একজন আরো যাবে'।

বেঞ্জামিনের কথা বলার ধরনই ছিল এমনি। একটি কথা ধরিয়ে দিলে দশটা বলত।

সেদিনই প্রার্থনা শেষে মন্দিব থেকে ফিরতে ফিরতে বিমলা বলল, 'আমি কিছু হসপিট্যালের কাজ জানি'।

'সে আমি খুব বুঝতে পেবেছি। তুমি এখানকার হসপিট্যালের জন্য নিজে থেকেই যেভাবে কাজকর্ম করছ...

'আমি যদি যশোর যাই'?

বেঞ্জামিন কী করবে খুঁজে পেল না। মাটির দিকে চোখ রেখে ঘেমে উঠল।

ফাদাব রাজি হয়েছিল। যশোরে রওনা হয়েছিল বিমি বেঞ্জামিনেব সঙ্গে।

স্টেশনে এটা-ওটা কিনে আনায়, হাতের উপবে কাঁপা কাঁপা হাত রাখায়, বিমিব তন্দ্রাতুর দেহের চারিদিকে চাদর ঠিক করে দেয়ার মধ্যে বেঞ্জামিন প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। ভালোবাসা বললে দোষ কী?

ব্যাচেলর বেঞ্জামিনের বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ স্পর্শ করেছে। এতদিনকার ধৈর্যের বাঁধ তাব ভাঙল কেন? ভ্রষ্টা মেয়েরা কি পুরুষ-মনে কামনা জাগিয়ে তোলে? আর সে কি ভ্রষ্টা মনে কবেছিল বিমলাকে?

বিমি নিজেই এখন বুঝতে পাবে না, কেন সে হেসেছিল, না কেঁদে। সোজা সরল প্রাণখোলা ব্যাপার নয়। তবুও হাসি। কিছুটা যেন বাধা, খানিকটা যেন গরবিনীর মতো। স্টিমার বদলে নৌকা। নৌকা বাঁধা আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে। মাঝিরা গিয়েছে কাছে এক হাটে।

'ওখানে গিয়ে'—বলে বিমলা একটু সরে বসেছিল।

বেঞ্জামিন কী বিড়বিড় করল।

'হ্যাঁ'। এই জায়গায় বিমলা হেসেছিল। সে কি নিজের ভাগ্যকে তখন বিদ্রূপ করেছিল সেই হাসি দিয়ে?

পাশাপাশি ঘরেই বন্দোবস্ত হয়েছিল যশোরের বাংলোয়। বাংলো একসময়ে নিদ্রায় নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল। প্রথম রাত্রিতে বিমলা এসেছিল নিজের জন্য পাওয়া ঘরটায়। দু'ঘবের মধ্যেকার দরজাটির একটি পাল্লা খোলা অন্যটি ভেজিয়ে রাখা। একটি ড্রেসিং টেবিলও আছে দেখছি। টেবিলের উপরে একটা দগদগে টেবিল ল্যাম্প। বিমলার ছায়া গিয়ে পড়ল পাশের ঘরে। এ পাশের শুভ্রশয্যায় চোখ পড়ল তার। প্রায় নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করল সে। তা করতে গিয়েই সে দেখতে পেল, বেঞ্জামিন মেঝেতে জানু পেতে বসে প্রার্থনা করছে খাটের পাশে। বিমির ছায়াটা বিছানার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেঞ্জামিনের গায়ে গিয়ে পড়েছিল। কী প্রার্থনা করেছিল সে? দুটো প্রার্থনার মধ্যে সংকুচিত করে রাখা এক টুকরো পাপ!

জানবার আর উপায় নেই।

কিন্তু বিমি জানত ডাকঘরের পাশ দিয়ে নদীটা কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে।

বিকেলে সে বেঞ্জামিনকে বলেছিল—চলো বেড়িয়ে আসি।

দুজনে নদীর ধার পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিল। চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে ফিরছিল।

বিমলা জিজ্ঞাসা করেছিল—এ নদীতে কি ডুব জল আছে?

—ডুব জল? আ ছি ছি! এ কথা কেন বলছ। না হয় তুমি সময় নাও।

—বলো না! আদরের কাছাকাছি গিয়েছিল বিমলার গলায় অভিনয়।

প্রগাঢ় অন্ধকারে বিকেলের চেনাপথ আন্দাজ করে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল সে। আলের পথ। পথে কাঁটাও ছিল। পায়ের তলায় ফুটল, ভাঙল। তারপর নদী।

বিমি হাঁপাতে লাগল। হাঁ করে বাতাস নিতে গিয়ে তার দু-একটি দাঁতের ডগা দেখা যেতে লাগল।

কিন্তু অতীত তো। সেজন্য সেদিন নদীর পরপারে পৌঁছে যেমনটা হয়েছিল ততটা হাঁপাতে হল না এখন।

তার চোখ পড়ল বাইরের কালো পথটাব উপরে। সে নদীও এতটাই চওড়া, কিন্তু রাতের কালো জলের। সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসছে। সে দেখতে পেল দু-একজন করে লোক পল্লীর দিকে আসছে। এই পল্লীর অফিসফেরত লোক। দু'একজন স্কুলমাস্টার, দু'চারজন অফিস-পিওন। অন্তত একজন উকিলের মুহুরি। এদের সঙ্গে সঙ্গে না হোক, কিছু পরে ভুবনবাবু আসবে। তখন অন্ধকার হয়ে আসবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল বিমিব। আর একটা পুতুল ভাঙল। কে? বেঞ্জামিন! তাকেও দয়া করা যায় নাকি? এ ভাবটা কবে থেকে হল তোমার মনের? তা কি উচিত?

বেঞ্জামিনের সেই রাত্রিতে শক্তই হতে হয়েছিল বিমিকে। ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। ইস্পাতের মতো শক্ত। সেই ভালো।

ছোটবেলায় রেঙ্গুনের সেই কনভেন্টে বিজ্ঞানেব কথাও শেখানো হতো মুখে মুখে। সিস্টার ম্যাগি নানারকম ম্যাজিকই যেন দেখাত। টেবিলেব উপরে জলের জগ বেখে মেঝের উপরে বিছিয়ে রাখা নল দিয়ে সে জল চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সক মুখ কাঁচের চোঙ দিয়ে ফোয়ারা বানানো একটা খেলা ছিল। যেহেতু জলটা টেবিলের মতো উঁচু জায়গা থেকে রওনা হয়েছিল, মেঝের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও তা উচ্ছ্রিত হয়ে টেবিলের উচ্চতায় পৌঁছাতে চেষ্টা করবেই, এই বোধ হয় বিজ্ঞানের সূত্রটা। কলকাতা যাবে বলেই বেরিয়েছিল সে। বন্ধু, পেনফ্রেন্ড। তাই যেন অনেক বাধার পরেও কলকাতার উচ্চতার কথা মনে ছিল তার। এই উপমায় একটা অন্ধ শক্তিব কথা হল। এমনি অযৌক্তিক আবেগই যেন ছিল তার। অন্তত বর্তমানে পৌঁছে তখনকার আবেগকে যেন কোনো যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যাবে না। কলকাতা সভ্য দেশ, সরকার একসময়ের সহপাঠী, ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত পেনফ্রেন্ড।

এসব ভাবনাই-বা কেন? কী যে হয়েছে আজ সকাল থেকে?

একদিন একটা ভারি সুন্দর গল্প বলেছিল ভুবনবাবু। নীল দাড়ি বুড়োর গল্প। অনেক টাকা তার। একের পর এক বউ মরত তার, আর নতুন বউ ঘরে আনত সে। টাকার মোহে আর এক মেয়ে বিয়ে করল তাকে। ভালোই দিন যাচ্ছিল। লোকে ভাবছিল বুড়োর এ বউ টিকে যাবে। কিন্তু কৌতূহল হল মেয়ের। যে আলমারির চাবি বুড়ো কাছ ছাড়া করে না, বুড়োর অসাক্ষাতে একদিন সেই আলমারি খুলল সে। সারি সারি কঙ্কাল? পুরনো বউদের? শাস্তি পেল, মৃত্যুও হল। বুড়োর সব বউয়েরই বোধ হয় এই নিয়তি। বুকে যে কঙ্কাল আছে থাক। সে আলমারির দরজা খুলতে নেই।

'মুখ অমন নীল কেন? রুখুসুখু দেখাচ্ছে'।

'কখন এলে? এইমাত্র'?

'হ্যাঁ। অসুখ করেনি তো'?

'না'।

'চলো। ভিতরে যাই'।

ভিতরে যেতে যেতে ভুবনবাবু একবার বিমল বলে ডাকল। পিঠের উপরে একখানা হাতও রাখল যেন একবার।

আঁকড়ে ধরার মতোই বর্তমান যেন। এ রকম ইচ্ছা হলে অনেকক্ষণ সে গল্প করবে আজ ভুবনবাবুর ঘরে বসে। এর আগে একদিন মাত্র হয়েছিল। গল্প করতে করতে টুলে বসে টেবিলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেদিন আলো ধরে ভুবনবাবু বিমিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

পটু হাতে চা করে আনল বিমি। ভুবনবাবুকে চা দিয়ে সে নিজের কাপটাও নিয়ে এল।

'বসি একটু এখানে'।

'বোসো'।

বিমি বসলে ভুবনবাবু বলল, 'মালতী তোমার ওস্তাদ মেয়ে। মস্ত শোভাযাত্রা বার করেছিল'।

'দেখলে'?

'স্কুলের পাশ দিয়েই গেল। ছেলেরাও হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল'।

'মাস্টারমশাইরা'?

'তারা যা করে থাকে। কমনরুমে বসে গল্পগুজব'।

'তোমরা আবার তা পারো নাকি'!

'খুব। ইস্তক পরনিন্দা। আজ অবশ্য তা হয়নি। বউদের নিয়ে, অভাব-অভিযোগ নিয়ে কথা হল'।

'তোমার ও দুটোর একটিরও বালাই নেই'।

'নেই বললে বিষ নেই। আছে বললে সবই'।

'বলো নাকি সেসব'?

'কখনও কখনও বলতে হয়। যেমন আজই। ছেলেমেয়েদের কথা উঠেছিল। কার ক'জন, তাই নিয়ে আলাপ। আমাকেও বলতে হল, সে ভার বইতে হয় না। দেরি আছে'।

এক মুহূর্তের জন্য বিমির মনের একটা অংশ কোনো এক নির্বোধকে তিরস্কার করার মতো কঠিন হয়ে উঠল। পরে তার মন এক পা এক পা করে পিছিয়ে এল। তার চোখের দিকে চেয়ে এটা প্রত্যক্ষ করা যেত। জ্বলে ওঠা মণিদুটি ধীরে ধীবে স্তিমিত হয়ে স্বাভাবিক হল যেন। অনুচ্চ স্বরে সে হাসল। হেসে যেন দৃষ্টিকে পবিষ্কার করা।

'না বললে চলবে কেন'—বলল সে।

'বোধ হয় এটা ঠিক। নতুবা আমার মুখে অমন কথা আসবে কেন'?

'যাক সেকথা। একটা ভালো গল্প বলো দেখি ভুবনবাবু, সময় কাটাই'।

'স্কুলমাস্টারের কি ভালো গল্প হয়? একপেশে হয়ে যায় তা অভাব-অভিযোগের চাপে'।

'তোমারও তেমন হয় নাকি'?

'হ্যাঁ, না—দুই-ই বলতে পারি'। বলে হাসল ভুবনবাবু।

ভালো, তবু ভালো। এই বর্তমানকে আঁকড়ে ধরা। চায়ের কাপের হাতল আঁকড়ে ধরা ভুবনবাবুর হাত। অত্যন্ত ফর্সা কিন্তু কমনীয় নয়। মসৃণ ত্বক কিন্তু হাড়ের কাঠামো বোঝা যায়। অত্যন্ত ফর্সা সেই ত্বকের উপরে কালো লম্বা চিকন লোম। শিল্পীব হাত? তেমনি লম্বাটে গড়ন।

কাগজ এল। রায়মশায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ভাগে কেনা কাগজ। রায়মশায় সারাদিন সারা দুপুর পড়ে ছেলেকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ভুবনবাবুর কাছে। রবিবারে এই কাগজকে কেন্দ্র করে আড্ডা

হয়। রায়মশায় কাগজ হাতে নিয়ে চলে আসে, কিংবা ভুবনবাবু যায় কাগজ পড়তে তার বাড়িতে।

ছেলেটি চলে গেলে কাগজ ভাঁজ করে রেখে দিল ভুবনবাবু।

বিমি বলল, 'পড়বে না'?

'গল্প করি বরং'।

'করব। খাওয়া-দাওয়া মিটুক। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলে'।

'আরে, আরে, এসব কী কথা'?

'এসব কথা বলাই স্বাভাবিক, ভুবনবাবু। বলা উচিত, ভাবা উচিত আমার। ছাইপাঁশ না ভেবে দেখা উচিত, অযত্নে তোমার দেহ পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রৌঢ়ত্বের দাগ পড়েছে তোমার মুখে'।

'আরে, শোনো শোনো'।

কিন্তু ততক্ষণে বিমি বেবিয়ে গেছে ঘর থেকে। ঠং ঠং করে কয়লা ভাঙছে। উনুনে তাড়াতাড়ি আঁচ দিয়ে অন্যদিনের চাইতে কিছু আগে রাত্রির আহার প্রস্তুত করবে। দিবস এবং রাত্রির দু'বারের আহারের মধ্যে ভালো স্বাস্থ্যপ্রদ জলখাবারের ব্যবস্থা করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়। অন্যে করে। এরই মধ্যে তা করার চেষ্টা করে। ফলে কিন্তু তারা অভাববোধকেও বাড়িয়ে তোলে। এই পথে যেন বিমি অভাববোধকে ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু···

ভুবনবাবু দু-এক মুহূর্ত এটা-ওটা করে খবরের কাগজ খুলে বসল। একটি ধীরস্থির লোক যদি অকস্মাৎ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, দর্শকও কিছুটা বিচলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে বিমি। আর তা ছাড়া, তাকে উপদেশ দেযা ভুবনবাবুর রীতিও নয়।

৩

আশা করেনি কিন্তু আশ্চর্যও হল না বিমি, যখন সোদামুনি দু-একদিন পরেই এক দুপুরে এসে ডাকল তাকে।

'বাবু বাড়িতে'?

'না, ইস্কুলে'।

'বসি তাইলে'।

'নিশ্চয়, বোসো'।

নিছক বেড়ানো, নিছক খানিকটা গল্পগাছা করা। তারও প্রয়োজন আছে। বুকের ভার বলো কিংবা একঘেঁয়েমি খানিকটা কেটে যায় তাতে। আর চাবহাত পাশে, ছ'হাত লম্বা আর সাড়ে চার হাত খাড়া তাঁবুতে যে বাস করে, অন্তত কখনও কখনও যদি তার বুকে সে কোনো বোঝা অনুভব করে তাহলে অন্যায় হয় না।

কিন্তু সোদামুনি যেন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়েই আলাপ করতে এসেছে। আর সূচনাটা কী করবে তাই ভাবছে।

বলল, 'মা ঠাকরুন, আপনেও কি যাবা'?

'কোথায়'?

'দণ্ডকান্ন। যেখানে আমাদের সকলকেই যেতে হবি'।

'না, সোদামুনি। আমি যাব না'। কোমল কবে বলল বিমলা।

সোদামুনি ভাবল বসে বসে। তার মুখখানি বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হল। তারপর তার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তা করে বিবর্ণতাকে যেন খানিকটা কাটিয়ে উঠল। সে সমস্যাটার অন্যদিকে গেল।

'গেলি কি খারাপ? গেলি কি ভালো'?

'আমি তো ঠিক জানি না'।

'আমুও বুঝছি না। মাসি কয়—এ ক্যাম্প উঠায়ে দিবে দিউক, শেয়ালদায় যায়ে বসবা। তা এখান থেকে যতি উঠায়ে দিবে শেয়ালদায় বসতে দিবে কেন্'?

'তা না দিতেও পারে'।

'তাইলে'?

এ প্রশ্নের কী উত্তর আছে? মালতীকে জিজ্ঞাসা করো, সে বলবে খারাপ খারাপ, বেহদ্দ খারাপ। খর, দূষণ। এমন দু-একজন আছে যারা বলবে রামায়ণও পড়োনি? এমন দেশ কি আর কোথাও আছে? অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র এখানেই গিয়েছিলেন। আর এ দুটির একটাও উত্তর নয়।

ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা স্বীকার করাই ভালো। হলুদমোহন ক্যাম্পে যে মানুষগুলি একটা পচনশীলতার আবহাওয়ায় অনিবার্য ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের দেখলে মনে হয় একমাত্র প্রতিকারই হচ্ছে এদের অন্য কোথাও স্থাপন করা। অন্য কোথাও? কোথায় সে দেশ? বিষয়টিকে জটিল করা এদের একটা স্বভাবগত প্রবণতা। প্রবণতা কথাটাকেই ব্যবহার করতে হয়। কারণ তাদের এই মনোভাবটিকে যে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়, সহজে তা চোখে পড়ে না। অথচ এত প্রবল সে মনোভাব যে তাকেই তাদের অন্য অনেক চিন্তার ও অনুভবের উপরে ছাপ ফেলতে দেখা যায়। কোনো কোনো দেশে নাকি এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা জন্ম থেকে মৃত্যু বংশপরম্পরায় নৌকায় বাস করে। তা করার ফলে অন্য অনেক লোকের চাইতে অনেক অসুবিধা ভোগ করে থাকে কিন্তু সেই অসুবিধাগুলি যেন তাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। হলুদমোহন ক্যাম্পে এমন অনেক লোক আছে যাদের একটা টান আছে সেই দেশের উপরে, পদ্মা যার মহাশিরা। পদ্মার কাছে জীবিকা নির্বাহের উপায় বাঁধা আছে, সবাই এমন কিছু জেলে নয়। পদ্মার পলি যাদের জমিকে উর্বর করবে এমন কৃষকও নয় সবাই। পদ্মা কিছুই দেয় না। বরং মাঝে মাঝে অভিশাপের মতো এগিয়ে এসে আঘাত ক'রে আবার দূরেই সরে যায়। প্রাণভয়ে এপার ওপার ক'রে আশ্রয় খোঁজে তবু কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করে। আর শুধু কি পদ্মা। পদ্মা আর তার আত্মীয়স্বজন। শাখানদী, উপনদী, কিংবা উপনদীর শাখা। পদ্মাকে না পেলে তাদের তীরেই এতটুকু স্থান করে নেবার জন্য এরা আকুলিবিকুলি করছে। মা তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু যেন মা কথাটিকে ভোলা সম্ভব নয়। পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা সেটাই দেশ। তার বাইরে পৃথিবী আছে, দেশ নেই। কিন্তু এ তো শুধু বর্ণনাই। চাঁদ এবং পৃথিবীর সমুদ্রের মধ্যে কোনো যোগাযোগ চোখে পড়ে না, কিন্তু কী জোয়ারই না ফুলে ফুলে ওঠে। পদ্মা আর মানুষের শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত! তাও যেন পদ্মায় মিশতে চায়। তেমনি দুর্নিবার টান।

কিছুটা যেন প্রবোধ দেয়ার সুরেই বলল বিমলা, 'ওরা বলে, ভালোই হবে'।

আলাপটা এ বিষয়ে আর এগোলো না। বিমলাই অন্য কথার সূত্রপাত করল।

'তোমার মাসি আজ কোথায়'?

'ছেইলে নিয়ে ভিখ্‌খে করতে গেল'।

'তুমি'!

'গেলাম না। কলাম—অসুখ। ভালো লাগে না'।

'কেন? দু একটা পয়সাও তো আসে'।

'কিন্তু…

'টাকাপয়সা তো দরকারও…

'ছেইলেটার কষ্ট হয়'।

'ও আর তুমি ভাবো কেন। যার ছেলে সে যদি না ভাবে'।

'তাও ভাবি। কিন্তুক মন শক্ত ক'রেই মনে হয়, মা হবের জানি নাই ব'লেই অমন শক্ত হয় মন'।

কথাটা সে হঠাৎ বলে ফেলেছে, কিন্তু বিমলাকে যেন ভাবতে হল। যেন সে গভীরতাকে অনুভব করার চেষ্টা করল।

মরণচাঁদের বউয়ের ছেলেপুলে হবে না বলেই মনে হয়।

সোদামুনি আবার কিছু বলার জন্যই যেন উসখুস করছে।

সে বলল, 'পরশুদিন ছেইলের পায়ে এক কাঁটা হিনে গেছিল। পা পাততে আজ কষ্ট হতেছে। কলাম আজ নিয়ে যায়ো না। শুনল না'।

'ওর ছেলে। তুমি বলেই-বা কী করবে'?

'তাও ঠিক। কিন্তুক, মা ঠাকরুন, আমার একটা কথা মনে হয়। মাসির একার তো ছেইলে না। আরেকটা লোকেরও। সেই আরেকটা লোককে মাসি ভালোবাসে নাই। তা বাসলি…

'হতেও পারে, নাও পারে'। এই বলে বিমলা কথাটাকে এড়িয়ে গেল। সে বলল, 'তোমাদের ও পাড়ার খবর কী'?

হলুদমোহন ক্যাম্পে মোটামুটি দেখতে গেলে দুটো পাড়া আছে। ক্যাম্পের কর্তার ঘরের কাছাকাছি কতগুলি তাঁবু মিলে একটা ভদ্রলোকের পাড়া। হতাশা নিঃস্বতা প্রভৃতির দিক দিয়ে ক্যাম্পের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের ঐক্যই আছে। মানসিক কালিমাও অগভীর নয়, যদিও এদের পোশাক পরিচ্ছদ কিছুটা পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে। চিঠিপত্র এ অংশে কিছু বেশি যাওয়া-আসা করে। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে যখন এদের কারো নামে পাঁচ-দশ টাকার মনিঅর্ডার আসে কোনো বদান্য আত্মীয়ের কাছ থেকে। কখনও দু'একটি ব্যাপার এরা ঘটিয়ে দেয় যাকে অর্থহীন না বলাই অযৌক্তিকতা। হলুদমোহন ক্যাম্পে একটা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। প্রায় একশোটা বই আছে সেখানে। দৈনিক পত্রিকা রাখারও ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারটা আইনত সকলের জন্যই উন্মুক্ত, কিন্তু নিরক্ষর অংশ অবশ্যই গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণ করে না।

তবে ঘরটাকে তারাও ব্যবহার করে। একবার কোথা থেকে ধর্মগুরু কিংবা কথক জাতীয় একজন এসেছিল। বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল গ্রন্থাগারেই। তখন সেখানে অন্য পাড়াটির লোকেরাও অবশ্য গিয়েছিল।

যেমন গ্রন্থাগার ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে, খেলাধুলোর জন্য তেমনি খানিকটা খালি জায়গাও পড়ে আছে। দু'একটি ছেলেমেয়ে কখনও কখনও বিরস মুখে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু খেলার মতো কোনো আনন্দ সেখানে দেখা যায়নি, অন্তত যতদিন বিমলা সেখানে ছিল।

কিন্তু আর এক ধরনের আনন্দের ব্যবস্থা একবার হয়েছিল। ক্যাম্পের কর্তা অজয়বাবু করেছিল। প্রচার বিভাগের ছবিগুলি দেখানোর বন্দোবস্ত। অস্বীকার করে লাভ নেই বিমলাও গিয়েছিল। পর্দার উপরে রাজস্থানের চাষীরা কী ফসল তুলছে, অলিম্পিকে ভারতীয় দলের খেলুড়েরা কী রকম খেলছে, তার ছবি যেমন ছিল তেমন ছিল ভারতীয় আকাশবাহিনীর ছবি। আর অনেক চিত্রপটেই সুসজ্জিত পুরুষের পাশে সানগ্লাস-পরা লোহিত-ওষ্ঠ বরনারীরা। স্বাধীন ভারতবর্ষের উন্নতির এই প্রচারগুলি ক্যাম্পের অধিবাসীদের কাছে কোনো সার্থকতার ইঙ্গিত বহন করছিল কি না সে কথা স্বতন্ত্র। দর্শক হিসাবে তারা আনন্দই পাচ্ছিল। পিছনের সারিতে খানকয়েক বেঞ্চে ভদ্রপাড়ার বাসিন্দারা যেমন, চত্বরে চট পেতে বসে নিরক্ষর পাড়ার লোকেরাও তেমনি।

অজয়বাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কাজটাও তার কম নয়। বন্দীশিবিরের মতো শৃঙ্খলা নাই আনতে হল, প্রায় এক হাজার লোক কাঁটাতারের ঘেরার মধ্যে। আর মানুষগুলি বেশিরভাগ ভাগ্যের

সঙ্গে আপস করে নিলেও, হঠাৎ কখনও কখনও অস্থির হয়েও ওঠে। পচনশীলতার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়া না হোক, যন্ত্রণার প্রকাশকে সীমায়িত রাখাও একটা কতর্ব্য ছিল তার।

বিমি জিজ্ঞাসা করল, 'অজয়বাবুই তো এখন ক্যাম্পের কর্তা'?

'হ্যাঁ, সেই আছে'।

'সুরথবাবু আর তার স্ত্রী সতী'?

'তারাও আছে'।

'মোহিতবাবুর খবর কী? অসুখটা···

'ভালো না'।

'কেন, কী হল তার'?

'বউটা ভেগে গিছে'।

'বলো কী! লতা'? এই বলতে গিয়ে বিমলা চুপ করে গেল। এ কী সংবাদ?

বউটার পালিয়ে যাবার ব্যাপার সোদামুনির কাছেও মুখরোচক নয়। সে বলল, 'শ্রীকান্তর কথা মনে আছে, মা ঠাকরুন, তার একটা ছেইলে হয়েছে'।

ক্যাম্পের এ পাড়া এবং ও পাড়ার আরো কিছু সংবাদ দিয়ে সোদামুনি যখন উঠি উঠি কবছে, মালতী এল। তার হাতে র‍্যাশনের ব্যাগ। চালের দাম আবার চল্লিশ ছুঁয়েছে।

সোদামুনি বলল, 'মা ঠাকরুন, আজ যাই। খবর পালে তিনিও আসবে'।

'কে, মরণচাঁদ? বেশ তো আসতে বোলো'।

সোদামুনির পর মালতী।

'চলো বউদি, চালটা নিয়ে আসি'।

'সে কী? বোসো। আজ বোধ হয় আমার দিন নয় চাল আনার'।

'তা নাই-বা হল। ডিউ তো হয়েছে'।

মালতীর সামনে কী করে বলা যায় যে সে কখনও চাল আনে না র‍্যাশনের দোকান থেকে। ভুবনবাবু আনতে দেয় না। সেটা তার মতো অবস্থায় কি মানায় বলা, সত্য হলেও? মালতীকে খানিকটা যেন ছোটও করে দেখা হবে। আর শুধু মালতীই তো একা নয়। এ পাড়ার অনেক বউ ঝি।

'কী ভাবছ'? মালতী তাড়া দিল।

'যেতেই হবে? চলো এমনি তোমার সঙ্গে যাই। কার্ড, টাকা এসবই অন্য লোকের কাছে আছে'।

'তাহলে মিছিমিছি'—মালতী সিঁড়ি থেকে পথে নেমে দাঁড়াল।

'যাব সত্যি। দাঁড়াও তালা দিই'।

বিমি সত্যি বেরিয়ে পড়ল দরজায় তালা দিয়ে। রোদের ঝাঁজ মাথায় নিয়ে ধুলো-ওড়া পথে চলা। কিছু নয়, তবু তাতে সময় কাটে। কী হয় নিজের পুরনো কথা রোমন্থন ক'রে?' তার চাইতে অনেক ভালো যে কোনো ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা তা সে যত সামান্যই হোক। সকলেরই তা উচিত।

পল্লী থেকে বেরিয়ে উঁচু পথটায় উঠে সামান্য কিছুদূর যেতেই আলাপ করার একটা বিষয় পেয়ে গেল তারা। একটা বাড়ি। হঠাৎ নয়, বরং অনেক দিন ধরে গড়ে উঠেছে। খানিকটা কাজ হয় আবার থেমে যায়। খানিকটা তোড়জোড়, খানিকটা তারপরে ঝিমিয়ে যাওয়া। এবার যেন শেষ হল। মাঝারিদের ঠিক নিচের স্তরে অবস্থান করে এমন রেলকর্মচারীদের জন্য যে রকম বাসা তৈরি হয়, তেমনি যেন। তফাত বোধ হয় এই যে দু-একটা কাচের জানলা আছে। আর বাইরের দেয়ালে রং লাগানো হচ্ছে।

কিন্তু আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে যেন বাড়িটার। দলছাড়া বলে মনে হয়। শহরের শেষ বাড়ি।

তারপরেই প্রান্তরটা শুরু হয়েছে, যার অধিকাংশ জুড়ে ক্যাম্প। এদিকে বাড়ি করার জন্য যারা জায়গা রেখেছে তারা বাড়ি করছে না বলেই বোধ হয় এটাকে এখনও একা লাগছে। এমনি সব আলাপ করতে করতে তারা বাড়িটা পার হয়েও গেল। বাইরের দিকে ছোট একফালি জমি আছে। ফুলগাছ লাগানো যেতে পারত। তা লাগানো হয়নি। একটা তেজপাতা গাছ কিন্তু বেশ সতেজ হয়ে বেড়ে উঠেছে। ফুলের চাইতে রান্নার উপকরণ? এ থেকে এ বাড়ির গৃহিণীর সংসারের উপরে ঝোঁকটা বোঝা যাচ্ছে?

'লোক এসেছে নাকি বাড়িতে'?

'তা এসেছে তো'।

'একদিন বেড়াতে গেলে কেমন হয়'?

'তা ভালোই হবে'।

'কিন্তু', বলল বিমি, 'ওবা যদি কিছু মনে করে? যদি মনে করে আমরা ছোঁয়াচে'?

মালতী এ ধরনের সূক্ষ্মতার ধার ধারে না। সে বলল, 'কী আর মনে করবে? মহিলা সমিতির সভ্য করার জন্য আমি ইতিমধ্যে আলাপ করে নিয়েছি। স্বামী স্ত্রী, একটি ছেলে। কিছু মনে করেনি'।

বিমির লোভ হল আলাপ করতে। কিন্তু সে ভাবল : মালতী বলল বটে, কিন্তু আলাপ করার জন্যই আসা না ভেবে, যদি ওরা ভাবে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সে গিয়েছে?

বাড়িটার পরেই খানিকটা পতিত জমি। ক্যাম্পের প্রান্তরের প্রবর্ধিত অংশ যেন, তাবপর কিছুটা জঙ্গলে ঢাকা নিচু জমি। তারপরেই একটা টিনের তৈরি বড় গুদাম। পথের অন্য পারে মালতীদের পল্লী শেষ হতেই চাষের জমি। তারপরেই শহরের বস্তি অঞ্চল শুরু। বস্তির ভিতরে একটা সরু গলির মুখে ছগনলালের মডিফায়েড র‍্যাশন শপ।

দোকানটার কাছাকাছি একটা কল আছে পথের ধারে। কে খুলে রেখে গেছে, অকারণে জল পড়ছে।

মালতী বলল, 'এখানে জল নষ্ট হয়। আর একটু গিয়ে আমাদের পল্লীতে কল বসালেই এদের নাকি জলের দম ফুরিয়ে যায়'।

'লাইন বসাতে টাকাও তো লাগে'।

'তা তো বলে না। উদ্বাস্তুদের অফিসে গেলে বলে. টাকা নেই, তবে টাকা হয়তো দেয়া যায়, কিন্তু জলওয়ালারা বলে অত দূরে পাইপ নিলে জলের জোর কমে যাবে'।

'এত খবরও রাখো তুমি'!

ফিরবার পথে বিমি বলল, 'মালতী, ক্যাম্পের লোকদের নিয়ে তুমি শোভাযাত্রা করলে, ওদেব সঙ্গে আলাপ হযেছে'?

'হলো! দু-চারজনকে আগেও চিনতাম'।

'আগেও চিনতে'?

'ওখানে যখন ছিলাম আমরা, তখনও ছিল এমন কযেকজন এখনও আছে ক্যাম্পে'।

'ক্যাম্প থেকেই কি এই পল্লীতে'?

'হ্যাঁ। পঞ্চাশে। সরকার থেকেই প্লট ভাগ করে করে আমাদের বাড়ি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমরা যখন ছিলাম তখন ক্যাম্পের কর্তা ছিল সুরেনবাবু। অজয়বাবু এসেছে পরে। ক্যাম্পের কথা আর তোমাকে কী বলব। এ পল্লীতে বাস করেই তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ। ক্যাম্প যে কী ব্যাপার। লাজলজ্জা বলে কিছু থাকে না'।

বিমির মুখ যেন মালতীর কথা শুনেই বিবর্ণ হয়ে গেল। ও ভয়টা যে কেন তার যাচ্ছে না। ভয়? ভয় বললে যেন অনুভবটাকে গণ্ডিবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ কথা সত্য নয়, যে মালতী জানলে

ক্ষতি হবে যে বিমলাও একদিন ক্যাম্পে বাস করেছে। কিন্তু মালতী যেন কঙ্কাল সাজিয়ে রাখা সেই আলমারির দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে।

মালতী বলল, 'মোহিতবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিল। সেদিন দেখলাম এখনও আছে। আমরা আসার দু-এক মাস আগে এসেছিল। উনপঞ্চাশ থেকে উনষাট। ক বছর হয়'?

'তা হল'।

'জানো বউদি', মালতী বলল, 'আমরা মোহিতবাবুকে দেখতে পারতাম না। ওর দিকে পক্ষপাত করত সুরেনবাবু। তখন ছোট ছিলাম। বড়দের মনের ভাব অন্যরকম ছিল। তারাও দেখতে পারত না। মোহিতবাবু আর তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাপ করত। ঢলানি কথাটা আমি তখনই শিখে ফেলেছিলাম। আমার এখন মনে হয় মোহিতবাবুর ওটা স্ত্রী ছিল না'।

পল্লীর কাছে এসে পড়েছিল তারা। বিমি বলল, 'এরপর থেকে র‍্যাশন আনার দিনে ডাক দিও। কাজটাও হয়ে যাবে। বেড়ানোও হবে'।

মালতী বলল, 'পুরুষদের একটু সাহায্যও হয়। কিন্তু মজা দ্যাখো, সেই তেতাল্লিশে শুরু হয়েছে র‍্যাশন। কত কী হয়ে গেল। যুদ্ধ ছিল, তা মিটল। দেশ ছিল, দু'ভাগ হল। পরাধীন থেকে স্বাধীন। মানুষ নাকি এখন উপগ্রহ তৈরি করছে। আমরা সেই থলি নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলাম'।

'এ তোমার বাজনীতি'।

মালতী তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

এবার বিমি তাব সংসারের কাজকর্ম করবে। ভুবনবাবুর ঘর গোছাবে আজ। ভুবনবাবু আসবার আগেই কাজটা সেরে নিতে হলে খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হবে। চিন্তাভাবনার সময় পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ঝাঁটা দিয়ে ঘরের দেয়াল ঝাড়া শেষ করে ভুবনবাবুর টেবিলে হাত দিয়ে, বিমির মনে পড়ল মোহিতবাবুর কথা।

ওই ক্যাম্প একটা স্মৃতির ঝাঁপিও বটে। তার পাশে কখনও কখনও তুমি উদাস হয়ে বসে থাকো। অন্য কখনও ঝাঁপিটার ভিতরটা তোমাকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

ভদ্রলোক একসময়ে খুব সুপুরুষ ছিল—মোহিতবাবু। কিন্তু মালতীর ভাষায় উনপঞ্চাশ থেকে উনষাট ক্যাম্পে বাস করে এখন তাকে বিবর্ণ হলুদ দেখায়। বউটি রূপবতী ছিল। শেষ যখন লতাকে দেখেছে বিমি, তখনও তাকে রূপবতী মনে হতো। বিমলার তাঁবুর তিনখানা তাঁবু পরে ওদের তাঁবু ছিল। ওদের তাঁবুর বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন তাঁবুর একদিক চৌকোনা করে কেটে একটা জানলা করেছিল। আর তাঁবুর ভিতরে এক হাত উঁচু একটা চৌকি পেতে তার উপরে বিছানা করত। তাঁবুর অন্যদিকে টিপয়ের মতো একটা ছোট টেবিল পেতে আয়না চিরুনি টুকিটাকি গুছিয়ে রাখত। ওদের তাঁবুতে ওরা বোধ হয় হয় ধূপও দিত।

কিন্তু ক্যাম্পের লোকেরা যে ওদের দেখতে পারত না, ক্যাম্পে আসবার এক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল বিমলা। সন্ধ্যার দিকে অকস্মাৎ কোনো তাঁবু থেকে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কুৎসিত ভাষায় কাকে গাল দিতে শুরু করল। বিশেষণগুলি শুনে বোঝা যায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীলোক। নিজের তাঁবুতে বসে বিমলা তখন ভাবছিল, এর চাইতে মরণচাঁদের তাঁবুর কাছাকাছি তার তাঁবুটা হলেই ভালো ছিল। ক্যাম্পের কর্তা তাকে দয়া করে এদিকে আশ্রয় না দিলেই ভালো করত। দয়াই বলতে হয় অজয়ের। পরে একদিন সে বলেছিল—আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম মরণচাঁদ এবং আপনি এক দলের হলেও এক শ্রেণীর নয়। আইনে না থাকলেও, ক্যাম্পে যখন দুটো পাড়া তৈরি হয়েছে তখন আপনি এ পাড়াতেই থাকুন।

তিরস্কারের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে চিনতে দেরি হল না। কলঙ্কের দিক দিয়েই তারা প্রাধান্য

পেয়েছিল। তা না হলেও তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করত। রূপ ও বেশভূষা নয় শুধু ; তারা স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তায় এমন একটা সুমার্জিত পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দিত, যে তাদের অগ্রাহ্য করা যেত না। কিংবা কলঙ্ক ও সুমার্জিত পরিবেশ এই দুয়ে মিলেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার শক্তি।

এক রাত্রির প্রথম প্রহরে আবাব কলহ শুরু হল। বিমলার পাশের তাঁবুর গুহগিন্নি সেই কলহেব মধ্যে বিমলাকে হাত ধরে টেনে নিযে গিয়েছিল। এসো না, এসো, দ্যাখো'সে।

মোহিতবাবুর তাঁবুর দরজা ফেলে দেয়া ছিল। নিজেব হাতে তুলল তা গুহগিন্নি, তাঁবুব মধ্যে বিছানায় শুয়ে একটা মদু আলোকে টেবিল ল্যাম্পে বই পড়ছে মোহিতবাবু। আর লতা তার ছোট টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে একটামাত্র মোমের আলোয় যেন বেড়িয়ে এসে পোশাক ছাড়ছে।

গুহগিন্নি ফেটে পড়ল, 'মাফলাবটা কোথায় পেলে'?

'মাফলার, ও হ্যাঁ মাফলার'। লতা নিজের গলায় হাত বাখলে। সেখানে একটা চকচকে নতুন মাফলাব জড়ানো।

বিমলা পিছিয়ে যাবে কি না বুঝতে না পেরে গুহগিন্নির পিছনে আত্মগোপন কবে রইল।

'কোথায় পেলে, তাই বলো না। তোমার ওটা'? গুহগিন্নি ফুঁসে উঠল।

'আমার গলায় বযেছে দেখছেন'।

'তা দেখছি। এতক্ষণ কোথায় ছিলে তাও দেখেছি। বিকেল থেকে এই রাত আটটা পর্যন্ত শূন্য মাঠে তোমাদের পায়চারি করা শেষ হতে আর চায় না'।

'কী বলছেন যা তা'।

'যা তা? ক্যাম্পসুদ্ধ লোক দেখেনি? ও মাফলার তোমার'?

'আমাব নয়'?

'একশোবার নয়। কালকের ডাকে এসেছে। ওর দিদি পাঠিয়েছে নিজের হাতে বুনে। খোকার মাফলার। বাগিয়ে নাওনি খোকার কাছ থেকে? ছেলেটাব মাথা চিবোওনি সারা সন্ধ্যা'?

'শেকল দিয়ে ছেলেকে সামলালে পারেন। এখনও খোকা নাকি'?

'ছেলেকে আটকে রাখব? বেহায়া মেয়েমানুষ'!

দপ করে চোখ জ্বলে উঠল লতার। সে বলল দাঁতে দাঁত চেপে, 'গাল দেবেন না বলছি'।

'দেব না? একশোবার দেব'। রাগের দমকে গুহগিন্নি হাঁপাতে লাগল।

লতা মাফলাবটা গলা থেকে খুলে হাতে নিয়েছিল। গুহগিন্নির দিকে ছুঁড়ে দিল। পৌঁছুল না সেটা। তখন পা দিযে ফেলে দিল দরজার দিকে গুহগিন্নির প্রায় গাযেব উপবে।

'নিয়ে গিয়ে পরিয়ে দেবেন ছেলেকে। পৌরুষ বাড়বে তার'।

গুহাগিন্নি দ্বিধা করল কিন্তু মাফলারটা কুড়িয়ে নিতে পারল না।

ওদের তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে আসতে আসতে বিমলা শুনতে পেয়েছিল। অত বাগের মাথায় গুহগিন্নি বোধ হয় শুনতে পায়নি।

মোহিত বলছিল, অনেক দূরেব যেন কণ্ঠস্বর, 'লতু, কাঁদছ নাকি'?

'না'।

'ও আমার দরকার, কে বলল তোমাকে'?

লতা সাড়া দিল না।

বিমলা নিজের তাঁবুতে ফিরে হতবাক হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পের দু'নম্বর কলে জল আনতে গিয়ে লতার সঙ্গে তার দেখা হযে গিয়েছিল। বিকেল থেকে কয়েকবার চেষ্টা করে ভিড়ের জন্য পারেনি এগোতে। ভিড়টা নেই এখন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় দূর থেকেই বোঝা যায় লোক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু চেনা যায় না। দু'জন লোক ছিল কলতলায়। পুরুষটি কল চালাচ্ছে আর মেয়েটি বালতি করে জল ধরে গা মুছে কাপড় ধুচ্ছে।

বিমলা কলের কাছাকাছি যেতে হঠাৎ পুরুষটি সরে গেল।

বিমলা দেখতে পেল কলতলায় লতা। গায়ের কাপড় চিপে এক বালতি জল নিয়ে লতা সরে দাঁড়াল কল থেকে।

বিমলাকে দেখে সে বলল, 'নতুন এসেছেন বুঝি? কালকে কি আপনিই ছিলেন গুহগিন্নির পিছনে'?

বিমলা হ্যাঁ কিংবা না বলা উচিত, এই ভাবতে লাগল। কিন্তু লতার কণ্ঠস্বর তার ভারি ভালো লেগেছিল। তার চাইতেও ভালো বোধ হয় তার উচ্চারণ।

চলে যাবার জন্য দু-এক পা এগিয়ে হঠাৎ লতা থামল। মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কলতলায় পুরুষটিকে চিনেছেন? গুহগিন্নির স্বামী—গুহমশাই'।

সেদিন কী মনে হয়েছিল বিমলার আজ তা মনে নেই। কিন্তু এ কথা সত্য, লতাকে সে কখনও ভুলতে পারবে না।

আর মোহিতবাবু?

মানুষ কোথায় নামে দ্যাখো, এ বলার সাহস তখন বিমলার ছিল না। এখনও? তখন সে ভাবত, তা সত্ত্বেও মোহিতকে কি লতা ভালবাসে? মনে মনে সে একটা গল্প তৈরি করেছিল। মোহিতবাবু যেন খুব বড়ঘরের কোনো ছেলে। লতাকে ভালবেসে সে হয়তো বাপ মা'র রোষে পড়েছে। হয়তো-বা সহায় সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত। তাই লতা তার সুখের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য কারো-বা মাথা চিবিয়ে খায়। তাহলেও মোহিতবাবুর অমন মেজাজি চালে শুয়ে শুয়ে বই পড়ারই কী সার্থকতা? বই পড়ত বটে সে। লাইব্রেরিটা স্থাপনের মূলে মোহিতবাবু ছিল।

শ্রীকান্তর কথাও বলেছে সোদামুনি। তাদের লাইনেই দু'খানা তাঁবুর পরে থাকত তখন শ্রীকান্ত আর তার স্ত্রী বিন্দা।

কেইবা কার খোঁজ রাখে, যদি খোঁজ করার মতো ব্যাপার না ঘটে?

সময়টা দুপুর। সব তাঁবুতেই তখন আহারের সময়। রান্না শেষ করে বিমলা জিরিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ হাঁকাহাঁকি মারপিটের মতো কিছু শোনা গেল।

তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, গোলমালটা মরণচাঁদের তাঁবুর দিক থেকেই আসছে। মরণচাঁদ সহজে রাগ করে না, কিন্তু রাগ করলে থামতে জানে না। কিন্তু তাকে শান্ত করার জন্য এগোনো দুঃসাধ্য, সবগুলি তাঁবু থেকে পুরুষরা হৈ হৈ করে ছুটছে। আর মরণচাঁদের তাঁবুর কাছে গিয়ে বিমি দেখতে পেল, নিজের তাঁবুর দরজায় বসে মরণচাঁদ নির্বিকার মুখে হুঁকো টানছে। সুখ দুঃখের ঝড় জলের বিপদ বিড়ম্বনার সাথি হুঁকো।

সন্ধ্যাবেলায় মরণচাঁদ এসে বলল, 'মা ঠাকরুন, বসতে আসলাম'।

'বসোসে।'

'দুপুরে গোলমাল হ'লো। বিন্দার স্বামী আসছিল'।

'তাতে কী হল'?

'শ্রীকান্ত না, আর একজন'।

'সে কী! বলো কী'?

শুধু বিমলাই-বা কেন, কে বিস্মিত হয়নি? নাকে নোলক পরা দেখতে একেবারে ছেলেমানুষ সেই বিন্দার এত কথা। পরে সারা ক্যাম্পেই গল্পটা ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষকের মেয়ে বিন্দা, সমান ঘরেই বিয়ে হয়েছিল তার, শুধু শ্রীকান্ত বয়সের দিকে একটু বেমানান। স্বগ্রামের এক যুবক

অগ্নিকুমার। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের, সেদিক দিয়ে শ্রীকান্তদের সদ্‌গোপ শ্রেণীর বাইরে। অগ্নিকুমার কলকাতায় চাকরি করে। কী থেকে কী হয়ে গেলো। দু বছর পরে হঠাৎ আবার বিন্দাকে পেল শ্রীকান্ত। কাশি রোগ হয়েছে তখন বিন্দার। গ্রামের রেলস্টেশনে নেমে সে আর চলতে পারছিল না। শ্রীকান্ত তাকে ঘরে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার সম্প্রদায় বলল—হাসপাতালে যাক কিংবা ভাগাড়ে। নমশূদ্রর উচ্ছিষ্ট না? কাশি সারল বিন্দার। হয়তো সে সংসারে মন দিত। কিন্তু গায়ে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল যেন, পচে গিয়ে মাছি আকর্ষণ করছে। দুশ্চরিত্র লোকেরা উৎপাত শুরু করল। একদিন ভেসে পড়ল শ্রীকান্ত বিন্দাকে নিয়ে।

কিন্তু সেদিন এসব জানা ছিল না। আর অগ্নিকুমার এসে দাবি জানায়নি শুধু, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের একখানা কাগজ সে মেলে ধরেছিল। পক্ষান্তরে শ্রীকান্ত? তার বিয়ের সাক্ষী যারা, কুষ্ঠিয়ার সে লোকেরা কোথায় কে জানে? কিছুই সে বলতে পারছিল না। এমনকী বিন্দার ইতিহাসও নয়। কেউ কি বলতে পারে, সকলের সামনে স্ত্রীর দুর্বলতার কথা?

তখন অজয়বাবু এসেছিল। সবসময় না হলেও কখনও কখনও সে দেবতার মতোই অবতীর্ণ হতো মঞ্চে। অজয়বাবু অগ্নিকুমারকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, কারণ অগ্নিকুমারের মুখ থেকে তখনও নাকি মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আর বিন্দাকে হুকুম করেছিল শ্রীকান্তর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে। সত্যিই বিন্দা একটা পৃথক তাঁবু পেয়েছিল। পুরনোই। ছোট তাঁবুগুলোর চাইতেও ছোট। শ্রীকান্তর তাঁবুর অদূরে কিন্তু পৃথক।

সেই শ্রীকান্তদের ছেলে হয়েছে।

দুটি ছবি পাশাপাশি বিরাজ করতে লাগল বিমলার মনে। মোহিতবাবু এবং লতার ছড়াছাড়ি হয়ে গেছে, পক্ষান্তরে শ্রীকান্ত এবং বিন্দা আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে! এ যেন কারো কূল হারানো, অন্য কারো তখন কূল পাওয়া। তাই কি?

শ্রীকান্ত অত্যন্ত লম্বা বলে তাকে রোগা দেখায়। মাথার চুলগুলি প্রায়ই পাকা বলে বুড়ো দেখায়। ঠিক কোথায় দলে এসে ভিড়েছিল তা মনে পড়ে না। হলুদমোহন ক্যাম্পে মরণচাঁদের দল যখন পৌঁছাল সে দলে শ্রীকান্ত এবং বিন্দাও ছিল। একটা প্রমাণ মনে পড়ছে, হলুদমোহন ক্যাম্পে পৌঁছানোর শেষ দু মাইল পথ যারা অসুস্থ বিমলাকে বহন করেছিল তাদের মধ্যে মরণচাঁদের সঙ্গে শ্রীকান্তও ছিল।

শ্রীকান্ত আর মরণচাঁদ। বিশেষ করে মরণচাঁদ।

দেখা হয়েছিল বনগাঁ রেলস্টেশনে। কপোতাক্ষ পার হয়ে তিনদিন তিনরাত্রির চেষ্টায় বনগাঁ। রাতেই বেশি। রাতে গায়ের রং বোঝা যায় না। অজানা পথ। পথের কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল না। আহার্য সংগ্রহের উপায় ছিল না। প্রথম দিন কেউ কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে এসেছে। দ্বিতীয় দিনে অনেকটা ধূলিমলিন হয়ে পড়েছিল সে। আর যাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, সেজন্য সে এক ঝোপের আড়ালে বসে শাড়ির রঙিন পাড়টা ছিঁড়ে ফেলেছিল। তার ফলে পায়ে পায়ে লেগে শাড়িটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়েছে, গিঁট দিতে হয়েছে। তৃতীয় দিনের সকালে প্রথম লোকটাই পাগলি বলেছিল।

বনগাঁ রেলস্টেশনে লোহার বেড়া ঘেঁষে অন্তত হাজার লোক। ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, কালি পড়া হাঁড়িকুড়ি, দড়ি দিয়ে বাঁধা জড়ানো, মলিন মাদুর কাঁথা। রুগ্ন, অভুক্ত, অস্নাত, হাজার লোকের পূতিগন্ধ জনতা।

বিমলাও মাটিতে বসে পড়েছিল। তাদের আলাপ শুনতে পাচ্ছিল সে। কিন্তু অর্থবোধ হচ্ছিল না সবসময়ে।

একটি দাড়িগোঁফ কামানো স্বাস্থ্যবান পুরুষ। এক হাতে হুঁকো, অন্য হাতে ধরা কল্কে। আগুনে

ফুঁ দিতে দিতে পাশ থেকে সে বলেছিল :

'যাওয়া হবি কনে'?

'কলকাতা'।

'সকলেই তো তা যায়। যা শুনি তা ভালো না'।

এরপরেই বোধ হয় জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল বিমলা।

তখন চারিদিক অন্ধকার। চোখ চেয়ে বিমলা ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

'আঃ হা, হ'লে কী'? পাশ থেকে কে বলল।

অন্ধকারের প্রথম আচমকা স্পর্শে সে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। এবার স্টেশনের মিটমিটে আলোয় সে দেখল সকালের দিকের জনতা এখন অনেকটা কমে গেছে।

'হ'লে কী'? পাশের লোকটা প্রশ্ন করল আবার। উত্তর না পেয়ে কাউকে বলল, 'হুঁকোটা কই। কাজের সময় হুঁকো পাই না। করো কি, সোদামুনি'?

লোকটি হুঁকো পেয়ে কল্কেতে আগুন জ্বালল, তারপর হুঁকো হাতে এগিয়ে এল।

'আপনি যাননি'? বিমলা প্রশ্ন করল।

'গেছে, অনেকেই গেছে। আমার আবার লটবহর অনেক। গাড়িতে উঠবের পারি নাই'। লোকটি বলল।

'আমাকে ফেলে যাবেন না'।

'আঃ হা। তা যাইও নাই। অ সোদামুনি, দ্যাখোতো গায়ে হাত দিয়ে, জ্বর নাকি'?

সোদামুনি উঠে এসে বিমলার গায়ে হাত রেখেছিল, 'জ্বর তো। তাই বলে কি এই জ্বরের রোগীর জন্যে রাতের গাড়িতেও ওঠা বন্ধ করবা নাকি'?

'আঃ হা'। হুঁকো টানার শব্দ হতে লাগল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছিল বিমলার। সে অনুভব করল মাথার তলায় তার বালিশের মতো কিছু। সে বোধ হয় মাদুরে শুয়ে আছে, গায়ের উপরে কাঁথাও বোধ হয়।

এই লোকটি মরণচাঁদ। এখন আর কথায় কথায় আঃ হা বলে না। ভাষার পরিবর্তন হয়েছে তার। হুঁকোটা আছে। বোধ হয় বুকের জোর কমে গেছে বলে তেমন আর মজা পায় না, বারে কমে গেছে। বিমলা পরে এ রকমও ভেবেছে, হুঁকো হাতে উত্তাল পদ্মার হাল ধরার অভ্যাস হয়তো।

দিনের গাড়িতে ওঠা হয়নি, রাতের গাড়িও চলে গিয়েছিল।

ঝাড়ুদারের ঝাঁটা থেকে ছিটকে আসা পাথরের কুচি গায়ে লাগতে উঠে বসল বিমলা। শুনতে পেল মরণচাঁদ বলছে, 'আরে ঝাড়ুদার ভাইয়া, উধারসে কাহে নাহি ঝাড়তে পারতা'।

অবশ্য জ্বর ত্যাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলেনি।

জ্বর কমতেই মরণচাঁদ এসে বলেছিল, 'মা ঠাকরুন, আজ গা তোলা লাগব্বি'।

'কলকাতায় যাবেন'?

'দেখি তো'।

এখানে একটু হাসি পেয়ে যায় বিমলার। আলাপটা সে শুনে ফেলেছিল।

'মা ঠাকরুন যখন কইছি মনে মনে গর্ভধারিণী মানছি। তা তোমাক কলাম, সোদামুনি'।

'আমি কি তাই কইছি'?

'কও নাই। ক'বের পারো। মনে হতি পারে তোমার'।

'তা কবো কেন? যতি মনেই হয় তুমি অন্য মানুষ ধরছো, ডুবে মরবো না গাঙে'?

'গাঙ তুমি কনে পাবা সোদামুনি সোনা, এদেশে কি ডুবে মরার গাঙ আছে'?

দাম্পত্য আলাপ।

কলকাতায় যাওয়া হয়নি। মরণচাঁদের দলের একজন হয়েই তার দিন কেটেছে হলুদমোহন ক্যাম্পে পৌছানোর আগে পর্যন্ত।

মরণচাঁদ একটা যুক্তি দিতে পারে না যাওয়ার। কলকাতায় পৌছানোর আগেই এক স্টেশনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার।

'মোত্‌দা খবর কী? ইস্টিশানে কী করো। তুমি না কলকেতায়'?

'নামের কেতাই সার, মানুষ নাই'—মোতি বলল।

'কী কও, বুঝি না'।

'নামো। বুঝায়ে কই'।

'গাড়ি ছাড়ে দিবি'।

'খালি গাড়ি যাক। যায়েও কি নরক'!

'নামো, নামো'। সবসমেত পাঁচ সাতজন মানুষ, তাদের মধ্যে বিমলাও ছিল। হুড়মুড় করে লটবহর নিয়ে, অন্য যাত্রীদের গালাগালি ধাক্কাধাক্কির মধ্যে নেমে পড়ল।

'তারপর, মোত্‌দা'?

'শিয়ালদহাব ইস্টিশানে তিন মাস'।

'ইস্টিশানে। বেশ তো, তারপর'?

'এমনি তো গন্ধে গা গুটায়। মানুষ পচা ধরছে'।

'হুঁ। হুঁকাটা কই সোদামুনি, তার বাদে'?

'মায়েব দয়া লাগছে। ইস্টিশানে লোক মরতেছে। লোকের গায়ে সাদা গুড়া ছিটায দিতেছে'।

'বাব্বা'।

খুব বেঁচে গেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে মরণচাঁদ লটবহরগুলি স্টেশনের বেড়ার দিকে সরিযে সরিয়ে রাখতে লাগল।

একবার তার মধ্যেই খোঁজ করেছিল, 'মা ঠাকরুন আছে, না গেছে'।

নিজে সে কেন কলকাতায় গেল না? কলকাতায় যাওয়ার গতিবেগ সঞ্চিত ছিল যে হাউই-এর, সব বারুদ পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থাই কি হয়েছিল তার? বাস্তহারাদের মধ্যেও চমকপ্রদ বাস্তহারা সে। শোবার মাদুরটাও নেই, পরনের খানা ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। মরণচাঁদের দলের যে কেউ সম্বলের দিক দিয়ে তার চাইতে ধনী। মনে হয়েছিল তার বারবার, সে আর মানুষ নেই ভৈরবের ঘটনার পর। সেই কুকুরদের কামড়ে সে এখন কুকুর। একটি নারীব প্রেত, প্রতিহিংসা নেবার মনোভাবই যার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারে। ...কী হবে আর কলকাতায় গিয়ে। বলা যাবে কোনো বন্ধুকে? সারা জীবন তারপর কৃপাদৃষ্টির ছোবল খেযে বেড়াতে হবে না? কিন্তু এসব যুক্তিই বোধ হয় পরে সংগ্রহ করা। তখন বোধ হয নিচের দিকে টান লেগেছিল। নিচেব গড়ানে দিকটাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বোধ হয়েছিল। এই একটি সিদ্ধান্তে পৌছুতে কি দুঃসহ বেদনাই তাকে অনুভব করতে হয়েছিল তখন।

প্রায় এক বছর লেগেছিল পথে পথে ঘুরে অবশেষে হলুদমোহন ক্যাম্পে পৌছুতে। সে সময়ে একদিন মরণচাঁদ বলেছিল শ্রীকান্তকে, 'বুঝলা কান্ত, আমার জ্যাঠা মাঠ চষতে যায়ে এক ঠাকুর পাছিলো। তার একখান পা ভাঙা। গাঁয়ের লোকে কয়, ও পূজা হয় না। জ্যাঠা বলে, এক পা আছে তার ধূলাতেই তরাবি। বুঝলা না কান্ত, সেবার কলকেতা থেকে এক বাবু আসলো। জ্যাঠার তখন অভাব। ধান ওঠার দেরি আছে। ঠাকুর দেখে বাবু কয়—কিনবো। দাম? নিষ্পত্তি হ'লে ন্যায্য একশো এক। জ্যাঠা কি দাম জানতো? তা না। বুঝতো গাহাক কি দূর যাবি, বুঝলা না। তা আমারও এক মা ঠাকরুন কুড়ায়ে পাওয়া হয়েছে। হুঁকাটা কই, অ সোদামুনি। আই'।

সোদামুনি হুঁকো এগিয়ে দেয় না কারণ সেটা মরণচাঁদের হাতেই ছিল। বরং কথা এগিয়ে দিল। বলল সে, 'তুমিও কি মা ঠাকরুন বেচবা'?

'থাম। মিয়েমানসের বুদ্ধি'। তারপর আশ্চর্য রকম স্থির হয়ে ভাবল মরণচাঁদ। বলল, 'তা যদি তেমন গাহাক পাই কোন কালে। জ্যাঠা যদি গাহাক চিনে থাকে আমুও চিনবো। না হয়, এক ট্যাকার ফুল লিব'।

সেদিন মরণচাঁদের মন ভালো ছিল। হিরণ ভিক্ষা করতে বেরিয়ে খবর এনেছিল আর বিমলা নিজেই তা সমর্থন করেছিল, সেও দেখে এসেছে। একটা জবরদখল কলোনির পিছনে জঙ্গল আড়াল বিস্তৃত একটা ডোবা। জঙ্গল কাটিয়ে নিলে ডোবাটার তিনদিকে বসা যায়। কারণ চতুর্থ দিকে রেলের লাইন। লাইন ছাড়িয়েও খানিকটা জমি সেখানে রেলের খাতিরেই ছেড়ে দিতে হবে। জঙ্গল কাটলে বাসাও বানানো যাবে। জবরদখল কলোনির ধার ঘেঁষে, কলোনির বস্তি সামিল হয়েই, বসা যেতে পারবে কিন্তুক রেললাইনের এপারে।

পথে আসতে আসতে হিরণ বলেছিল, 'গাঁ উদিকে। তুলে দিতে আসে উদিকে চোট পড়বে। আমরা একেবারে পিছনে। ওরা ওঠে, আমরাও ঝাঁক বাঁধব। না ওঠে, আমাদেরও কেউ তুলবে না ডোবা থেকে'।

ডোবা আর জঙ্গল। আরে, সেজন্যেই পড়ে আছে। না হলে, এতদিন অন্য কেউ বসতো না? এখন শীতকাল। ডোবায় জল যদি থাকে, লোকসানের নয়, লাভের। বর্ষায়? সে তখন দেখা যাবে। ডোবার ভিতরে তো বসছি না! কিনারে জল উঠতে কিছু দেরি হবে। আর কয় মাসই-বা বর্ষা? বিকেলের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত, এসব নিয়ে আলাপ হয়ে গেছে মরণচাঁদের দলে।

কাল সকালে সকলে মিলে জঙ্গল কাটবে। মেয়েরা বেড়া বাঁধবে জঙ্গল কুড়িয়ে। ছেলেরাও সাহায্য করবে। আর মা ঠাকরুন, তারও কাজ আছে। সকলের জন্য রান্না করবে। বেলা ডুবলে সারা দিনমানের একবার খাওয়া। যাদের ছেইলেপুলে কাঁদবে, তারা যেন চিড়েমুড়ি যোগাড় করে রাখে। ঘর তুলে ঘরে বসে তবে হাঁপ ছাড়া। ঘর না উঠলে রাতে ঘুমানো নাই। হুকুমগুলো মরণচাঁদের মুখ দিয়ে বেরুল, কিন্তু হুকুম নয় যেন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব।

তখনও প্রায় রাতই আছে, ডোবার ধারে গিয়ে পৌছেছিল মরণচাঁদের দল। হাতে দা, কাটারি, হেঁসো। সে জঙ্গলে সবচাইতে বড় গাছ খেজুর আর বাবলা। তার চারিদিকে ঘেঁটু। তাও প্রায় কোমর সমান। ঘেঁটুর ডালপালায় বেড়া হবে। হিরণ বলল, আর বাবলা কেউ যেন না কাটে। সেই দেখে শুনে কাটবে। পাঁচটি পরিবারের ছ'টি ঘর উঠবে। ছ-এর নম্বর মা ঠাকরুনের, যদিও সে মরণচাঁদের পরিবারেই একজন। খেজুরের পাতায় ছাউনি হবে। বলল একজন! হিরণ বলল— চায়ে দ্যাখো, ঘেঁটুর পরেই কাশা। আর ও কি হোগলার মতো দেখায়? বড়ঘর হবে না। চার হাত খাড়াই। আট হাত বাই ছ'হাত। দোচালা না, একচালা। বড়রা ঘেঁটুর জঙ্গল কাটা শেষ করে হিরণের খবরদারিতে বড় বাবলার ডাল, ছোট বাবলা গাছসমেত কাটছে ঘরের খুঁটা তীর বরগার জন্য। মেয়েরা বাবলার ডাল মাটিতে বিছিয়ে বেড়া বাঁধবার যোগাড় করছে।

সন্ধ্যায় চারখানা ঘর শেষ হল। সবুজ রং হল ঘরের। উপকরণের রং। চারখানা ঘরে পাঁচটি পরিবার আশ্রয় নিল। হিরণ বলেছিল—বাঁশ থাকলে ছ'খানাই উঠত। আঁকাবাঁকা বাবলার ডালে কি চৌরস কিছু হয়! কিন্তুক খবরদার। বাঁধন দড়ি হোগলার। কাল যদি রশি কিনে বাঁধাছাঁদা না করো এক বাতাসেই মাটিসই।

তার পরদিন আর দুখানা ঘর উঠল। ঘর উঠল, থাকবে। খাবে কী? ভিক্ষা। ক'দিন ভিক্ষা পাবে। সব লোক যখন চিনে ফেলবে তখন? ওরা তো বসেছে আমাদের আগে। ওরা কী করে? জেনে নিতে হবে অনুনয় বিনয় করে। ওরা না উঠবে বলেই তো তোমরা বসছ। ওরা খেলেই

তোমরা খাবে। নতুন বাড়ি তুলে চিন্তায় ঔদার্য এসেছিল।

কিন্তু একদিন জমির মালিক দেখা দিল। ও পাড়ায় ঢেঁড়া পিটে বলে গেল আগামী বিষ্যুদবারে উঠে যেতে হবে। সব। কেউ থাকবে না। জমির মালিক কে? সে যেই হোক। শুক্রবারেও যে থাকবে সে বুঝবে! ঘোষণা নয়, শাসানি। ও পাড়ার খবর এ পাড়ায় আসার কথা নয়। কিন্তু এল। এল বছর আঠারো বয়সের একটি ছেলের মুখে। তাকে বোধ হয় ও পাড়ার মুরুব্বিরা নাবালক বলে প্রতিরোধের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছিল। সে এসে বলে গেল, মিটিং হবে আজ রাতে, যেয়ো। কীসের মিটিং? তা দরকার কী। মরণচাঁদ নিজেই যাবে। এই সুযোগে শুনে আসবে কীসে দিন চলে ও পাড়ার।

মরণচাঁদ ফিরে এসেছিল খবর নিয়ে।

'হুঁকোটা কই, অ সোদামুনি'?

'খবর কী'?

'খবর? না কই। কলকেতায় যেতে হবি'।

'কেন'?

'কেন কী? ভাবো বুঝিন, জমি সব ভগবানের?'

'উঠিয়ে দিবি'? সোদামুনি ভয়ার্ত বড় বড় চোখ মেলে চেয়েছিল।

'অন্যায্য'।

কে কথাটা বলল? অনেকেরই মনে আছে কিন্তু বলল কে? এদিক-ওদিক চেয়ে সকলেই বুঝতে পারল কথাটা বলেছে মরণচাঁদের ছোটভাই, একরত্তি সোবাস।

'হুম্'—বলে মরণচাঁদ গুম হয়ে বসে রইল।

শুক্রবারের দিন কাণ্ডটা ঘটে গেল। জমির মালিক এল লোকজন নিয়ে। সঙ্গে পুলিস। দু মিনিটের হাত কাড়াকাড়ি, ধাক্কাধাক্কি, পাঁচ মিনিটের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। যে বসতবাড়ি দেখে হিরণ বলত বাঁশ আর দড়ি নেই আমাদের অমন অমরাবতী কী করে হয়, সেই বাড়িগুলি পিটিয়ে ভেঙে তছনছ করে দিল। তারপর জমির মালিক চলে গেল, পুলিসও গেল। লোকগুলি ভাঙা ঘরগুলির পাশে তাদের ছিটিয়ে-ছড়িয়ে যাওয়া দারিদ্র্যের মধ্যে বসে রইল সারা রাত। উনুন জ্বলল না। দু-একটা আগুন জ্বলল বোধ হয় অবুঝ শিশুদের খাবারের কোনো ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। কিন্তু সোবাস কই? ফিরে নাই? এই প্রথম বোধ হয় মরণচাঁদ বিপন্ন বোধ করেও হুঁকোর কথা বলতে ভুলে গেল। অ সোদামুনি, সোবাস কই? হাঁকাহাঁকি, চেঁচামিচি। ও পাড়ার সেই লোকগুলির কাছে খবর পেলো মরণচাঁদ, সোবাসকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। আর কয়েকজনকেও। মরণচাঁদ কাঁদল না, হুঁকোও খেল না। বসে থাকতে থাকতে তার বুকটা দুলে দুলে উঠছে, তাকেও নড়িয়ে দিচ্ছে।

পরদিন সকালে ভোজবাজির দৃশ্য। রেললাইনের ওপারে, তাদের সামনের বসতি একেবারে খালি হয়ে গেছে। একজন লোকও নড়ছে না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ঝড়ে বড় গাছ ফেলে দেয়, ঘাস খাড়া থাকে। বাবলার সরু সরু ডালের খোঁটায় হোগলার বাঁধনে বাঁধা হিরণের স্থাপত্য খাড়া হয়ে রইল। পিছনের পাড়াই একমাত্র পাড়া। ডোবার পারের ছ'খানা ঘরই একমাত্র ঘর সে প্রান্তরে। তারা থেকে গেল। তারা এত ছোট কেউ তাদের নজরেই আনল না।

বিমলা একদিন বলেছিল, 'মরণচাঁদ, সোবাসের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে'।

নিবিষ্ট হয়ে তামাক খেল মরণচাঁদ। তারপর বলল, 'সে তো তিন বছর'।

'তিন বছর'? কথাটা বিমলার, কিন্তু বক্তব্য অনেকের।

'হুম্। দারোগাকে মারছিল চেলাকাঠ দিয়ে। রক্ত বার হ'লে বেশি মিয়াদ হয়'।

সম্মুখে প্রান্তর, রেললাইন! পিছনে ডোবার ধারে আদিম কুঁড়ে। পাতা দিয়ে ভরে তোলা ডাঁটি

কাঠির বেড়া। শুকনো কাশ আর খেজুর পাতার ছাউনি। বর্ষা এগিয়ে আসছে। কী উপায়? ভিক্ষা? প্রান্তর চষবে? পড়ে থাকার মানে এই নয় যে জমি ভগবানকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিন মাস হল বসেছে তারা এখানে। দু'মাস হতে চলল সোবাসকে পুলিস নিয়ে গেছে। তিন বছরের দু'মাস মাত্র গেল।

ভুলটা ধরা দিল হিরণের মধ্যে, হিরণ যার হাতে ঘরের খুঁটি।

অন্য সকলের মতো সে-ও কষ্ট স্বীকার করত। তার মতো অন্য সকলেরই যথাসর্বস্ব শেষ হয়ে এসেছিল। বসে খেলে কুবেরের ধনও শেষ হয়। তাই করার আর কিছু না পেলে সে মা লক্ষ্মীকে ডেকে নিয়ে পাশা খেলে। কিন্তু একটা দোষ ছিল হিরণের। দিনে একবার সন্ধ্যায় সে গাঁজা খেত। শহরে সেজন্য মাঝে মাঝে যেতে হতো তাকে। অনেকসময়ে তার বউ সঙ্গী হতো।

এক সকালে মরণচাঁদ গিয়ে ডাকল, 'হিরণ, ঝাঁপ বন্ধ কেন, রাতে ঘুমাও নাই'?

সাড়া নেই। বেড়ায় শত শত ফাঁক। একটাতে চোখ বসাল মরণচাঁদ। ঘরের মেঝেতে বিছানা মাদুর ছেড়ে এসে কেমন যেন বেঁকেচুরে শুয়ে আছে হিরণ। বউ নেই।

মরণচাঁদ ঝাঁপ ঠেলেই ঘরে ঢুকেছিল। হিরণের চোখ বড় বড়, দৃষ্টিহীন, মুখের কষে ফেনা, গা ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট। সকলকে ডেকে এনেছিল মরণচাঁদ।

'আহা সাপে দংশেছে'।

শুধু বিমলাকে একপাশে ডেকে মরণচাঁদ বিবর্ণ মুখে বলল, 'মা ঠাকরুন, যে রোগে মানুষ নিজেকে মেরে ফেলায় সে রোগ বড় ভয়ানক। আর···

'কী?'

'আর এক রোগ। হিরণের বউ'?

তাই তো, কোথায় সে?

ঘর ছ'খানা পড়ে রইল। স্থপতি হিরণের মৃতদেহও। সেই সাপের ভয়ে মরণচাঁদের দল সেই রাতেই হাঁটতে শুরু করল। সোবাস? ঠোঁট কাঁপছে, জলে চোখ ঝাপসা হচ্ছে–কিন্তু উপায় কী দলপতির? কে একজন বলেছিল–পিছনে তাকাস নে।

অনেক হেঁটেছে তারা। এ ক্যাম্প থেকে ও সাময়িক ক্যাম্পে। এখানে ডোল চেয়ে ওখানে পথের মাটি কেটে। অবশেষে এই হলুদমোহন। কূল পাওয়া? শ্রীকান্তর কথায় তাই মনে হয়। সন্তান একধরনের স্থিতির প্রমাণ বইকি। কিন্তু খবরটা একইসঙ্গে আসে কেন? লতার কূল হারিয়ে যাওয়ার?

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বর্ষার জল চলতে দেখেছে বিমলা। শৈবালজাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদকে প্রায়ই সে ভেসে যেতে দেখেছে জলের স্রোতে। ডোবার শ্যাওলা স্রোতে বাঁচে না, মাটির দিকে ঝোঁকে। বর্ষায় ডোবা আর নদীর খাত একাকার হয়ে গেলে তারা ভেসে পড়ে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছে শৈবালগুলি পায়ের দিকে এসে যেন মাটি কামড়ে ধরতে চায়, দু-এক মুহূর্ত পারেও তা, তারপরই আবার স্রোতের টানে ভেসে যায়। লতা ভেসে গেল।

আর তা যদি বলো হলুদমোহন ক্যাম্পটারই তো অজ্ঞাতের দিকে ভেসে যাওয়ার কথা। দণ্ডকারণ্যের জোয়ার লেগে ক্যাম্পটাই টলোমলো করছে।

'চা দেবে না'?

'চা-ই তো করছি। ঘড়ির কাঁটায়'। বিমি হাসল। অবাকও হল নিজের হাতের দিকে চেয়ে। এতসব ভাবতে ভাবতে কখন যে সে উনুন ধরিয়ে চা করতে বসেছে খেয়ালই করেনি।

'কী করে বুঝলে, আমি এসেছি'?

উত্তরটা কঠিন হল বিমির পক্ষে।

বলতে গেল–এ সময়েই তো রোজ আসো। কিন্তু বাইরের দিকে চোখ পড়তেই সে বুঝল

অন্যদিনের চাইতে অনেক দেরিই করেছে ফিরতে ভুবনবাবু।

বলল, 'এত দেরি যখন হয়েছে, আর দেরি হবে না, এই বোধ হয় ভেবেছিলাম'।

'বেশ বললে'—এই বলে ভুবনবাবু হাসল। 'চা নিয়ে ঘবে এসো। তোমার চা-ও'।

ঘরে গেল বিমি।

'বোসো। চা খেতে খেতে কথা বলি'। বলল ভুবনবাবু।

বিমি বলল, 'দেরি হল যে'?

'মাস্টারিটা সেরে এলাম'।

'টিউশানি'?

'হ্যাঁ। সেদিন অনুমতি দিলে যে। হাতের কাছে যা পেলাম নিয়ে নিলাম। ক্লাশ টেনের ছাত্র। শুধু অঙ্ক, সপ্তাহে পাঁচদিন'।

'কষ্ট হবে তো'।

'এখন তো শরীরটা ভালোই যাচ্ছে'।

চা শেষ হলে বিমি উঠতে যাচ্ছিল।

'কোথায় যাচ্ছ'?

'কাপ রেখে আসি'।

'দেখি, তোমার হাত দেখি'।

'হাত'! হাত বাড়িযে দিল বিমলা।

পকেট থেকে একজোড়া বালা বার কবে পবিয়ে দিল সেই হাতে ভুবনবাবু। বিমি কোনো কথাই খুঁজে পেল না। ভুবনবাবু তখনও তাব দুটি হাত ধবে আছে। নিজের দুই বাহুর আড়ালে মাথাটা নামিয়ে আনল বিমি। হঠাৎ তার দু-চোখ ভরে জলও এল।

কিন্তু কযেক মুহূর্ত পবে হাত ছাড়িযে নিযে চোখ তুলল সে।

'কী দরকার ছিল এসবের ভুবনবাবু'?

'সবকিছু কি দবকাবের মাপে মাপা যায়? বলল হাতির দাঁত, সন্দেহ আছে। কতটুকুই-বা সোনার তার। কিন্তু কী সুন্দব মানাল তোমাকে'।

'ছাত্র পড়াতে গিযেই ধার হল'।

'মোটেই না। দস্তুর মতো পাওনা টাকায়। পুবনো একটা ডি-এ বিল আজ পেলাম'।

স্থিতি! এই নাকি স্থিতি? কারো কারো মুখে শুনেছে বিমি। মুখে নয়, এক আধুনিকার রংচং-এ ভাষায় লেখা খবরেব কাগজের রবিবারি প্রবন্ধেও যেন পড়েছে—বলয়ই হচ্ছে স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল। যা গৃহ আর স্ত্রী একত্র রাখে। স্থিতির জন্য তার প্রতীক হিসাবে আজ তা পৌঁছে গেল তাব হাতে? পরিক্রমার শেষ। সেই পুরনো কথা—আর এত সস্তা প্রতীক।

৪

আর কোথায় সে যাবে? অনেক দূবে দূরে ভ্রমণ করে এসেছে সে। বজ্রযোগিনী থেকে কলকাতার পথ ছুঁয়ে এই হলুদমোহন। তাবও আগে যদি বলতে চাও রেঙ্গুন থেকে। হলুদমোহনে পৌঁছেই কি শেষ হয়েছিল?

আর কোথাও সে যাবে না।

নিজের হাত দু'খানার দিকে চোখ পড়ল। বালাজোড়া পরাই আছে। খুলে বাখবে? একটিতে

রান্না করতে গিয়ে কালি লেগেছিল। বরং আঁচলে ঘষল বিমি।

বাড়ির বাইরের দিকে বারান্দায় গিয়ে বসল সে সিঁড়িতে পা রেখে। যেন সেটা দুপুরের জলাশয়ের নীরব কোন ঘাটলা। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ক্বচিৎ কখনও কেউ যায়। সে যাওয়া-আসা মেঘের ছায়ার মতো কিংবা বাতাস লেগে গাছের পাতা নড়ে ওঠার মতো। এ বাড়িতে এমনি ছিল তার দুপুর। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে শান্তিটা সে আর পাচ্ছে না।

বরং একটা অস্থিরতাই বোধ হয়।

কাল তারা হাটে গিয়েছিল।

এই শহরের একটা বৈশিষ্ট্য এই হাট। শহরে দৈনিক বাজার আছে দুটো। রোজ বাজার বসে সেখানে, কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও এই হাট বসে প্রতিমাসের শেষদিকে। একসময়ে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এই হাটের। এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কথায় প্রতিমাসের মেলা। হাট বলো, হলুদমোহনের। ধীরে ধীরে হলেও হাটের জাঁক অনেকটা কমে এসেছে। নানা কারণ থাকতে পারে তার। একটা কারণ বোধ হয় এই, বাণিজ্যটা এখন উৎপাদকের হাত থেকে ফড়েদের হাতে চলে গেছে। তা সত্ত্বেও এখনও কিছু কিছু তাঁতি এসে বসে, কোনো কোনো কৃষক আনাজের ঝাঁকা নামায় মাথা থেকে। আর ক্রেতাও আসে। আর এ শহরে এসে অন্তত একবার লোকে এ মেলায় যায়।

সাধারণ হাটে স্ত্রীলোকেরা যায় না, কিন্তু মেলায় যায়। যেহেতু এই হাটের অন্য নাম মেলাও বটে সেজন্যই যেন পুরুষদের সঙ্গে কিছু কিছু স্ত্রীলোকও থাকে। কৃষকদের নারীরা নয় শুধু, শখ করে শহরের মেয়েরা যায়, বিশেষ করে এই শহরে নতুন এলে।

হাটটা শহরের কেন্দ্র থেকে খানিকটা দূরে। অন্তত সেটার ধারেকাছে বাড়িঘরগুলিতে একটা গ্রাম্যভাব আছে। লোকে কিন্তু বলে এটাই সাবেক শহর। ইট সিমেন্টের নতুন শহরটা ডানদিকে অনেকটা সরে গেছে, যেন নদীটাকেও পার হয়ে যেতে চায়।

ছুটির দিন নয়, তবু বিমি বলেছিল—কোথাও চলো।

টেবিলের ধারে ধার চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল সে। যেন কোথাও থেকে পালিয়ে এল এমন করে বুকটা ওঠানামা করছে তার পরিশ্রমে।

দুপুরের কিছু পরে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। ভুবনবাবু যানবাহনের প্রস্তাব করেছিল, বিমি রাজি হয়নি।

'তাহলে তো হাটে যাওয়াই ফুরিয়ে গেল'?

'চলো তাহলে যে রকম যেতে চাও'।

প্রায় এক মাইল হেঁটে এই হাটে গিয়েছিল তারা। ভুবনবাবু শাকসবজি কিনেছিল। বিমি শখ করে একটা ঝাড়ন কিনেছিল। তারপর তারা দোকান দেখে বেড়াচ্ছিল। একবার কথা না বলাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন বিমি বলেছিল, 'এই হাট নাকি ফড়েদের উৎপাতে নষ্ট হতে বসেছে। তারা যদি গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মাল, তাঁতিদের মাল কিনে আনে তবে এ হাটে শহরের থেকে সস্তা হয় কেন জিনিসপত্র? কৃষক বা তাঁতি এরাই-বা আদৌ কেন আসে সব মাল ফড়েদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে'?

'ফড়েরা আড়তদার মহাজনের দালাল। কৃষকরা ঘরে বসে যা দাম পায় তার চাইতে কিছু বেশি দামেই বিক্রি করে এখানে। কিন্তু সে দামে মহাজনদের লাভের অংশটা যোগ হয় না বলে শহরের দামের চাইতে সস্তা'।

'তাহলে তুমি বাণিজ্য বোঝ, ভুবনবাবু'? বিমি সুআলাপীর মতো একটা হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল মুখে।

কিন্তু বাণিজ্য নিয়ে আলাপ এগোয় না।

চট দিয়ে তৈরি ছাদ, চটের স্বচ্ছপ্রায় দেয়ালের মধ্যে মনোহারি দোকান। দোকানগুলি সব ছ' আনার দোকানগুলির মতো। ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পড়েছিল এই দোকানগুলির কাছে।

পিছন থেকে চিনবার কোনো উপায় নেই। মেরুদণ্ডের গাঁটগুলি উঁচু হয়ে আছে। তৈলহীন ত্বক খসখসে। কাঁধের উপরে একটি তিন-চার বছরের ছেলে। ছেলেটির পরনে একটি নতুন প্যান্ট, যার গায়ে প্রস্তুতকারকের নামধাম তখনও সাঁটা আছে।

ভুবনবাবু না বলে দিলে মরণচাঁদকে চিনতে পারত না বিমি।

কিন্তু বিমি বলল, 'কী ভাবছ'?

'জিরিয়ে নেবে একটু'?

'জিরিয়ে কী হবে? ঘুরে ঘুরে দেখে নি বরং। তাঁতিদের মহল্লায় চলো'।

'আবার'?

মরণচাঁদকে না চেনার ভানই যেন করেছিল বিমি।

'চলো না দেখি সস্তায় বালিশ ঢাকবার কিছু পাওয়া যায় কি না'।

'ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে'।

ক্লান্তি। কথাটা যেন দেহের মধ্যেই থাকে তার নাম উচ্চাবণের অপেক্ষায়। ক্লান্তি, ক্লান্তি।

কিন্তু বিমি বলল, 'বাড়ি গিয়েই খুব ভালো কবে চা করে দেব'। কেমন একটা অদ্ভুত হাসি বিমির মুখে।

ভুবনবাবুও হাসল। চশমাটা খুলে ধুলো মুছে নিল।

বেড়ানো তো খেলাই। হাটে আসাটাও এমন কিছু কাজের নয়। খেলাই এটা বিমির। সে কি মনের সঙ্গেই খেলছে?

কিন্তু মরণচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিমির।

ভুবনবাবুকে সে হাত তুলে নমস্কার করল। খানিকটা সময় সে অভিভূতের মতো বিমির দিকে চেয়ে রইল।

ভুবনবাবু বলল, 'কী রকম আছো মরণচাঁদ'?

'তা ভালোই। মা ঠাকরুন…

'হ্যাঁ, মরণচাঁদ, আমিও ভালো আছি'।

একটু ইতস্তত করে মরণচাঁদ বলল, 'বাড়ি ফেরেন? আমি মা ঠাকরুনের সঙ্গে গোটা দুচ্চার কথা কই'?

'তা বলো'।

'মাসি আসছে, মা ঠাকরুন, শুনছ'?

'সোদামুনি বলেছে'।

'হাঁ। সোদামুনি। সেই আমাকে ক'লো, তুমি এই শহরেই আছ। ভাবি যায়ে চরণ দেখে আসি, তা হয় না। তা, মা ঠাকরুন, দণ্ডকাইন্য যাওয়া আর অ'মাব হয় না'।

'বুঝিয়ে বলো'।

'তা কবো। মাসি কয়, মরণ, এই ছেইলে নেও। আমি আর খাতে দিতে পারি না। কয় আমি থাকেও তোমার গলগ্গোহ। ছেইলে নেও আমি যেখানের চ'লে যাই'।

কে মাসি, কী রকমে মাসি, ছেলে রেখে কোথায় পালাল?

'কিন্তু তার সঙ্গে দণ্ডকারণ্য যাওয়ার কী সম্বন্ধ'? বিমি বললে।

'তা, মা ঠাকরুন, তুমি দণ্ডকান্নই কও আর দণ্ডাইন্য, কথা একই। জঙ্গল তো। ছেইলে কাঁধে নিয়ে জঙ্গল কাটে চায হয? কও'। অদ্ভুতভাবে হাসল মরণচাঁদ।

ফিরবার পথেও আবার মরণচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একটা গোরুগাড়ি বড় জ্বালাতন করছিল ধুলো উড়িয়ে। তাকে এগিয়ে যাবার সুবিধা দেয়ার জন্য তারা পাশ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনই মরণচাঁদ এল।

ভুবনবাবু বলল, 'বেশ ছেলে তোমার মবণচাঁদ, কী নাম'?

'আঁগে। অবিমন্নো'।

'স্বাস্থ্যেব দিকে নজর দিও'।

'তা দিব আঁগে'।

'আর কষ্ট হলেও লেখাপড়া শিখিও'।

'আঁগে অগত্যা'।

বিমি বলেছিল, 'এই ধুলোর মধ্যে আর ইস্কুল মাস্টারি কোবো না। আর মরণচাঁদ, তুমিও এগিয়ে যাও লম্বা লম্বা পায়ে। সারাটা পথ গাড়ির পিছনে ধুলো খেতে খেতে যাবে কেন'? মরণচাঁদের নিজের ইচ্ছাও বোধ হয় সে বকমই ছিল। সে তাদের ছাডিযে চলে গেল। যাবার সময়ে মিটমিট করে হাসলও। বোধ হয় ভুবনবাবুব উপরে তার মা ঠাককনেব খবরদারি করার ভঙ্গিটা তাব বেশ ভালো লেগে থাকবে।

শহরেরই কিন্তু সংস্কাবহীন পথ। বড় বড় পাথবের টুকবো আর ধুলো। পায়ে হেঁটে ফিরতে হলে এটা সোজা। ঘুরে যাওয়া যায নতুন শহরেব ধাব ঘেঁষে। লোক চলাচলেব ফলেই কি এখন ধুলো বেড়েছে?

ভুবনবাবু বলল, 'মনে হচ্ছে গাড়িটাই এমন কবে গেল। একটু ঘুরে চলো ধুলো বাঁচিয়ে। রিকশা নিই বরং'।

রিকশা নিল ভুবনবাবু।

'মাথা ধরেছে নাকি'?

রিকশায় বসেই একটা হাত উঁচু করে নিজেব কপাল ছুঁয়ে বসেছে বিমি।

'কই, না'। বলে সে হাত নামাল। কিন্তু তার ক্লান্তিমাখা মুখে অস্বস্তিই ফুটে উঠল।

ক্লান্তি, ক্লান্তি। অনুভবটাকে স্পষ্ট করার জন্য সে কথা খুঁজল। যে কয়েকটি পেল তাতে লাভ হল না কিছু। সেগুলো বাদ দিয়ে যা থাকল সেটা ক্লান্তি।

মরণচাঁদের সঙ্গে বাইরে দেখা হওয়া অধিকন্তু। মনে তো তারা রয়েছেই। হলুদমোহন ক্যাম্পটাই সে বয়ে বেড়াচ্ছে মনে মনে। আব মরণচাঁদকে না চিনে উপায় আছে? তার একটা বৈশিষ্ট্য তার দৈহিক উচ্চতা। এখন সে হৃতস্বাস্থ্য পূর্বের কঙ্কাল, তা সত্ত্বেও হাটের সহস্র লোকের ভিড়ের উপরে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল। কী লাভ হতে পাবে দূরে সবে গিয়ে?

কিছু একটা বলার জন্য বিমি বলেছিল, 'মরণচাঁদের ছেলের নাম অবিমন্নো'।

'অভিমন্যু? বেশ নাম'। ভুবনবাবু বলল।

খানিকটা নীববতা।

বিমি আবার বলল, 'তোমার স্কুলে যাবার পথ কি এটাই'?

'না'।

আবার নীরবতা।

কিন্তু তখন ভুবনবাবু বলল, 'দু'জনের মধ্যে ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে কেন? আরাম করে বোসো। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে'।

দুপুর-দিঘির ঘাটলা। কিন্তু অনুভব করল বিমি স্তব্ধতাকে মুখর করে তুলেছে অনেক ক্ষুণ্ণতা। সেই

নীরব অস্থিরতায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

আর এখানে এখন তো সোদামুনি নিজেই আসতে পারে। আসাটা যেন তাব অভ্যাসেই দাঁড়াবে। দণ্ডকারণ্যের কথাই তুলল সে। সেখানে নাকি সব নতুন হয়ে উঠবে?

'মরণচাঁদ কী বলে'?

'কাল রাতে ক'তে যায়ে কাঁদে কাটে কথা বন্ধ করলো। যাব যে, সোবাস কোথায়? সে কি দণ্ডকাম্নে পথ চিনে যাতে পারে? মানুষ দেখে বোঝা যায় না মা ঠাকরুন, তার বুকের কী জ্বালা। কয় হিরণ কী ভয়ই দেখালো চ'লে আলাম। সোবাস কি আর খুঁজে পাবি'? সোদামুনিও চোখ মুছল।

মানুষ দেখে তার অন্তরে জ্বালা কখনও বোঝা যায় না। মরণচাঁদ সোবাসের নাম মুখেও আনে না। হিরণের সেই ছোঁয়াচে রোগ থেকে দলটাকে বাঁচাতে গিয়ে দলের নেতার কাজই সে করেছিল। কিন্তু সোবাস তো এখনও জ্বলছে তার বুকের মধ্যে।

বিমি বলল, 'তোমাদের মাসির খবর কী'?

'যাতে চায়, তেনি কয়, না। কনে গেছে! তেনি আবার কয় বাড়ি যতি করলাম, ক্যাম্প থিকে বারায়ে, তবে সে বাড়িতে মা মাসি না থাকলি সংসার'?

মরণচাঁদ এখনও কল্পনা ত্যাগ করেনি।

এরপরে হয়তো শ্রীকান্তর কথা আসত, কিন্তু এল মালতী। এর আগে একদিন যেমন করে এসেছিল, আজও ঠিক তেমনি করেই। সোদামুনি, তারপরে মালতী।

মালতী পল্লীর মধ্যে থেকে এল না বরং ক্যাম্পের দিক থেকে। তার মুখ থমথম করছে, চোখ দুটি জ্বলছে। 'এই যে আপনি এখানে' বলে সে থেমে দাঁড়াল সোদামুনির সামনে।

সেদিনের শোভাযাত্রার পর সভা হয়েছিল, আর তারই প্রস্তাব অনুসারে মালতী যুক্ত প্রতিবাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। কেউ স্বাক্ষর দিয়েছে, কেউ দেয়নি। মরণচাঁদ এখনও মনঃস্থির করতে পারছে না। কিন্তু বিপদ তো তাদেরই বেশি হয় যারা পথ খুঁজে না পেয়ে এ পথ ও পথ কবতে থাকে। এই বলল মালতী।

সোদামুনি বলল, 'তাই তো। তাইলে এক কথা কই। তেনি কয়, তখন মা ঠাকরুন ছিলো। তার সুবিধা করতে হবি, এই ভাবতে গিয়ে পথ খুঁজে পেতাম। এখন কার জন্যে পথ খোঁজা'?

'মা ঠাকরুন? সে আবার কে'? মালতী প্রশ্ন কবল।

'কেউ নয়। সেটা ওদের একটা কল্পনা'। বলল বিমি। ভাবল এটা কি শুধু মালতীকে নিবৃত্ত করার জন্যই তোলা একটা যুক্তি?

'চুলোয় যাক কল্পনা। বউদি, এখন কি আর ওদের কল্পনা করার সময় আছে? আর সাতদিন মাত্র বাকি। তারপরই এসে যাবে ওঁদের সরানোর লোক'। কালকের মধ্যে সই শেষ করে প্রতিবাদ ম্যাজিস্ট্রেটকে পৌছে দিতে হবে। কেন সই পেলাম না জানো? ওই সুরথেব জন্য। একা সে নয়। তার স্ত্রী আর অজয়ের জন্যও'।

'সুরথ? সে কি যেতে চাচ্ছে'?

'যেতে নয় মরতে। তুমি কি কল্পনা করতে পারো যে সে চাষ করছে? বলল, সরকার কখনও ভুল সংবাদ দেয় না। মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরেছে! লোকটার ভিতরে নিশ্চয় দোষ আছে নতুবা এমন ঘুণ ধরে। নতুবা শিক্ষিত হয়ে এমন মূর্খের মতো কথা বলে'? মালতী একদমে এই বলে হাঁপাতে লাগল।

'দাঁড়িয়ে রইলে। বোসো, আসন নিয়ে আসি, বসব'।

'না, বসব না ; কাজ আছে'। মালতী দ্রুতগতিতেই চলে গেল।

'মা ঠাকরুন—' বলল সোদামুনি। বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ।

'সাতদিন বলল যে, সোদামুনি'।

'তাই বলল', ঠোঁট কাঁপল সোদামুনির। সে উঠে দাঁড়াল। 'মনে কয় তেনিও শুনছে'।

সোদামুনিও চলে গেল।

যাওয়াই ভালো। এখন হয়তো মরণচাঁদ হুঁকো হাতে করে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে। একসময়ে মনে হতো বিমলার, তার হুঁকো খোঁজার ভঙ্গিতে বিড়ম্বনাকে প্রতিপক্ষ খেলুড়ে হিসাবে ডাকবার মতো সরসতা আছে। এখন হুঁকো খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে 'অ সোদামুনি' আর বলে না সে। কিংবা হয়তো হুঁকো হাতে করার মতো সরসতাও আর নেই। এ কথা মনে হওয়ার কাবণ হিসাবে এই বলা যায়, মরণচাঁদের একটা আদর্শবাদ ছিল যা তাকে পথ দেখিতে দিত। এখন যেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো জোরই সে পাচ্ছে না।

কিন্তু সুরথ? সে তাহলে তেমনি আছে, যেমন ছিল বিমি যখন তাকে শেষ দেখেছিল।

চিন্তাটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল বিমি।

বরং সে সম্মুখে চেয়ে দেখতে পেল একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে চাকা চালাতে চালাতে রাস্তায় দৌড়ুচ্ছে। নতুন বাড়িটা ছাড়িয়ে কিছু দূবে এসে পড়েছিল, আবার ফিরে গেল দৌড়ুতে দৌড়ুতে। মালতীর মতে, গ্রামের মানুষ চাকরির জন্যে শহরে উদ্বাস্তু হয়েছিল। ওই বাড়িরই ছেলে নাকি? হয়তো ওর মা কাজকর্ম সেরে এখন বিশ্রাম করছে, কিংবা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকের এমন হয়। ছেলেটি বেরিয়ে পড়েছে সেই অবসরে। ছেলেটি একবার থেমে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে কী ভাবল, তারপর চাকা নিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল। হু হু করে ছুটে যেন সে উধাও হয়ে যাবে। অনেকটা দূরে সে ছুটেও গেল কালো রাস্তাটা ধরে, ক্যাম্পের দরজার কাছাকাছি। ছুটে বোধ হয় হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটু থেমে চাকা ধরে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগল বোধ হয়। তারপর ধীরে ধীরে চাকা চালিয়ে নিয়ে আবার নিজের বাসার দিকে ফিরল। ওর মায়ের বোধ হয় এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো নয়।

চিন্তাটায় ফিরে এল বিমি।

নদীর স্রোত দেখা যাচ্ছে না, কারণ নদীটাই সময়। আর সাত দিনের সঞ্চয় হলেই সেটা ক্যাম্পকে নিঃশেষ করার মতো ফুলে উঠবে, ফুঁসে উঠবে। এখনই যেন তার ধাক্কায় ধাক্কায় নভোমণ্ডল থরথর করে কাঁপছে।

শেষবারের মতো পরিক্রমা করবে যেন ক্যাম্পটাকে বিমি। ক্যাম্পটার দিকে মুখ তুলে চাইল সে।

আর এখন তা পারেও সে। বন্যায় আর যাই হোক সে ডুবে যাবে না। সে আর কোথায় যাবে বলো?

ক্যাম্পের গ্রন্থাগারটাই বসবার জায়গা ছিল। অজয় বসতো, মোহিত এবং লতা আসত। সুরথ থাকত যেন অজয়ের ফাইফরমাস খাটাব জন্যই। কখনও কখনও ডাক পড়ত বিমির। ডাকটা আসত মরণচাঁদেব ব্লকের খবব নেওয়ার জন্য। ক্যাম্পেও ব্লক আছে।

এমন কিছু আযোজন ছিল না। বাঁশের বেড়া, খড়ের ছাদ। তবু একটি প্রশস্ত ঘর, সে ঘরে জানলা দরজা ছিল। দিনের বেলায় দিনের আলো যেত, বাতাস চলাচল করত।

প্রথম দিন গিয়ে বিমি একধরনের উত্তেজনাই অনুভব করেছিল। উঁচু পাহাড়ে উঠে পরিচ্ছন্ন বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করে এমন অকারণ উল্লাস দেখা দেয় রক্তে। একই টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসত অজয়, সুরথ, মোহিত এবং মোহিতের স্ত্রী লতা; আর গুহগিন্নির ছেলে সৌম্যও। আলোচনার জন্য অর্থাৎ অভাব অভিযোগের ফর্দ তৈরি করার জন্যই বসা, কিন্তু আলাপ অন্যদিকে চলে যেত। সাহিত্যের কথা বলতে ভালোবাসত অজয়। হ্যাঁ, সেই ক্যাম্পের আওতায় বসে সেই ইদানীংকালের

লেখকদের সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করত। লেখকদের ঘরোয়া নামে উল্লেখ করাই ছিল তার রীতি। এককালে সেসব লেখকদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল এমন ধারণা হতো। এ রকম সন্দেহ হতো বিমির, বলা যায় না অজয়ও যদি প্রচ্ছন্নভাবে কোনো লেখকই হয়ে থাকে। কৌতূহলের সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য করত বিমি কারণ কোনো লেখককে সে কখনও দেখেনি। এর সেটাও আশ্চর্য তখনও এমন কোথাও আছে যেখানে সাহিত্য লেখা হয়! মোহিত বড় বেশি কথা বলত না। খবরের কাগজখানা পড়ত। সুন্দর সুঠাম তার কাগজ ধরা হাত। যত্ন করে দাড়ি কামাতে কখনও তার ভুল হতো না। আর লতা? খুব দামি শাড়ি ছিল তার? কিন্তু কী যত্ন করেই পরত। চোখে কাজল আঁকত কি আঁকত না, কিন্তু চোখের কোলের একটা কালো কোমলতা তার দৃষ্টিকে আকর্ষণীয় করে রাখত। কোনো কোনো দিন একটু বেশি রাতই হয়ে যেত। আটটা-ন'টা তো বটেই। একবার বিশেষ করে পূর্ণিমার কাছাকাছি ছিল রাত্রি। এত দেরি হয়েছিল ফিরতে যে সব পাড়ার সবগুলো তাঁবু নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল। সে রাতে সে রান্না করেনি, খায়নি।

অজয় ভাবটা দেখাত যেন অনেক রাত অবধি তারা উদ্বাস্তুদের সুখ-সুবিধা নিয়েই আলোচনা করেছে। কখনও খুব বেশি রাত হয়ে গেলে পরের দিন সে কিছু না কিছু ঘোষণা করত। তা সে যত সামান্যই হোক, উদ্বাস্তুদের জন্য সুবিধার দিকে ঝোঁক আছে এমন কোনো ব্যাপার সে ঘটাত, যেমন র‍্যাশনটা, কিংবা সপ্তাহের ক্যাশ ডোলটা সপ্তাহ শেষ হওয়ার একদিন আগেই দিয়ে দেয়া। একটা যত্নই ছিল অজয়ের, তাদের সেসব বৈঠককে গোপন রাখার। পাপ ছিল মনে? লতা? হলে সেটা নতুন কিছু হতো না। অন্তত উপর থেকে দেখে তেমন সন্দেহ কেউ করলে, অস্বাভাবিক হতো না। ওদিকে সুখ-সুবিধার সর্বময় কর্তা, এদিকে লতার মতো ঢলানি মেয়ে।

বিমি তখনও ছেলেমানুষ ছিল না। আর এ পথে এসে ঘুরে ঘুরে সে বোধ হয় মানুষ চিনতেও শিখেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে কি অজয়ের কৌতূহল ছিল না? ছিল, কিন্তু তার জাত আলাদা।

আর লতা? লতা সম্বন্ধে কিছু বলা খুব সহজ নয়। ঢলানি মেয়ে বলেই তার অখ্যাতি, কিন্তু তার সেই তরলতা—একটা উপমা একসময়ে বিমলা তৈরি করে নিয়েছিল, যেন কোনো কঠিন কাচের গোলকের মধ্যে আবদ্ধ। স্বচ্ছ আবরণের তলায় সরসতার আভাস দেখা যাচ্ছে, স্পর্শ করতে গেলে কঠিন শীতল গোলকটিতেই প্রতিহত হবে তৃষ্ণা। কিন্তু এসব ধারণা তার মনে নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল পরে।

তা সত্ত্বেও কিন্তু লতাকে বিপজ্জনক কিছু বলেই মনে হতো। সেই পূর্ণিমার রাত্রিটার পরিণতি ছিল। গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে সকলেই দাঁড়িয়েছে গ্রন্থাগারের সামনে। মোহিতবাবু দরজায় তালা দিচ্ছে। অন্য সকলের মতো দাঁড়িয়ে লতা, কিন্তু মনে হতে লাগল চাঁদের আলো যেন তার চোখ, ঠোঁট, কপাল, চুলের তরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। মোহিত আবার লাইব্রেরি খুললে।

চলতে শুরু করল সকলে। সুরথ অজয়ের সঙ্গে গেল। অজয়কে তার কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেয়াই তার রীতি। বিমি দেখল, সৌম্য ইতিমধ্যে লতার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করেছে। হাঁটছে যেন পা-পা করে। বিমিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া?

এখন আর ছি ছি-টা মনে হল না। কতটুকু ছেলেই-বা সৌম্য। কুড়ি পেরিয়েছে কি না-পেরিয়েছে। সে রাত্রিতেই কি সৌম্যের সঙ্গে তারও প্রথম কথা হয়েছিল? হয়তো ছাব্বিশ-সাতাশ হবে।

বিমির মন যেন একটা সচেতন চেষ্টায় মোড় ঘুরল। সুরথের কথা ভাবতে গিয়ে অন্য পথে চলে এসেছে সে।

সুরথ সে রাত্রিতেও অজয়কে তার কোয়ার্টার্সের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। অজয়কে খোশামোদ করাই তার অভ্যাস ছিল। তাই বলে বিশেষ কোনো সুবিধা? অথচ খোশামোদের উদ্দেশ্যই তো সুবিধা আদায়।

উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের জন্য কিছু এসে থাকবে জড়িয়ে, অনেকটা সেই চট পড়েছিল গ্রন্থাগারের পাশেই।

'ওগুলো কি চট'?

'হ্যাঁ। প্যাকিং-এর। নেবেন'? অজয় বলেছিল। 'কাজে লাগে নিয়ে যান'।

'কাজে আবার লাগে না। তাঁবুর মেঝেতে বিছানো যায়, তাঁবুর উপরে বিছিয়ে তাঁবুর সংস্কার করা যায়। খানিকটা চট পাওয়া তো সৌভাগ্য'।

'তাহলে নিন না। এ রকম চট আমার অফিসেও অনেক পড়ে আছে'।

চট সবাই নিয়েছিল, এমনকী বিমলা এবং সৌম্যও।

'আপনি নেবেন না'? বলল অজয় সুরথকে।

'আমি'?

'আপনার দরকার নেই'?

'দরকার। মানে, না—থাক।' সুরথ বলল।

'আপনার সবকিছুতেই ভয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন আমি দিয়েছি'।

'না, ভয় আর কী'? এই কথাটা বলতে সুরথ কেশে গলা সাফ করে নিয়েছিল।

'আপনি বড্ড ভয় পান মশায়'। অজয় হেসেছিল।

সুরথ মাথা নিচু করেছিল। অজয় যেন তার চরিত্র সম্বন্ধেও দেবতার মতো অভ্রান্ত।

এটা সুরথের ভয়েরই উদাহরণ। পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে, এমন দু-চার হাত প্যাকিং-এর চটের ব্যাপারেও কী অসামান্য ভয়।

সৌম্যই বলেছিল একদিন। বড্ড ভয় পায় সুরথদা। সেই চটের কথায় সে নিজেই বলেছিল আমাকে একদিন। বলেছিল অজয়বাবু দিচ্ছেন বলেই কি নিতে পারি? যদি অডিট হয়? অজয়বাবু যদি সরকারের কোনো জিনিস তোমাকে বেআইনিভাবে দিয়ে থাকেন, তাহলে অজয়বাবুর যেমন দোষ, তুমি নিয়েছ বলে তোমারও তেমন দোষ।

কথাটা হচ্ছিল একটা গাড়ির কামরায় বসে।

'তাহলে অজয়কে খোশামোদ করে কেন সুরথদা তোমার?' বলেছিল বিমি।

'ধারণা, বোধ হয়, অজয়দাকে খোশামোদ করলে আইনকেও খোশামোদ করা হবে'।

'তুমি ক্যাম্পের অনেককিছুই জানো অনেকের সম্বন্ধেই'। বিমি বলল।

'তা জানি। কী করে জানলাম ভেবে আশ্চর্য হই'।

'তুমি বোধ হয় খানিকটা সহৃদয়, সৌম্য'।

খুশি খুশি লাগছিল বিমির। ট্রেনের পথেব দু'ধারে কী সুন্দর লাগছিল দেখতে। নুয়ে নুয়ে যাওয়া সবুজ। গুল্ম, কাঁটা, আগাছা।

সৌম্য একসময়ে বলেছিল, 'রাজনীতি যেন আগেকার ঘটনা যার পর থাকে বাস্তুহীনতা। কিন্তু এই পরিণতিতে পৌছানোর অন্য অনেক পথই আছে রাজনীতি ছাড়া'।

আর সুরথই তার প্রমাণ। সুরথ পাকিস্তান থেকে আসেনি সদ্য উদ্বাস্তু হয়ে। চাকরির জন্য এদেশে ছিল, দেশ যেখানেই হোক। তার কথায় উত্তর কিংবা পূর্ববঙ্গের টান কিছু পাও? পাও না তো? বাস্তুহীন কেন হয়েছে সুরথ, তা বলেছিল সৌম্য।

'ঠিক তোমাকে যা বললাম তা হয়তো ঘটেনি। তা জানতে হলে সমস্ত ঘটনা সামনে রেখে গবেষণা করতে হবে। কিন্তু তাতেও কি সত্যটাকে ধরা যাবে? কাজেই খুঁটিনাটি জেনেও লাভ নেই, বলেও নেই। সুরথ ব্যাংকে কাজ করত'।

'ব্যাংকে? মানে...

'আইনের দিকে একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক হয়েছে। আইন ভাঙার কথা বললে, তা সে যে-আইনই হোক, ওব মনের এমন একটা অংশ বিচলিত হয়ে ওঠে যার উপরে শরীর এবং মনের অন্যান্য অংশকে সক্রিয় রাখার দায়িত্ব দেয়া আছে। শীতের দিনে আমি তার কপাল ঘেমে উঠতে দেখেছি, অজয়ের লেজার বইতে একটা ব্যাকডেট বসানোর কথা শুনে। কোনো একদিন সে এমন কোনো আইনই হয়তো ভেঙে থাকবে'।

'টাকা পয়সা'?

'অসম্ভব নয়। ঘটনার কথা বলছ? একদিন সকালে সুরথকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। বাড়িতে তার স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে। এই তো ঘটনা'।

'মানুষ অনেকসময়ে বাধ্য হয়ে অন্যায় কাজ করে। খেতে না পেয়ে, কিংবা নিজের খাওয়ার চাইতেও যা মহৎ, শিশুকে খাওয়ানোর জন্য...

'এসব নিয়ে সামাজিক উপন্যাসও লেখাটেখা হয়েছে। দেখানো হয় লোকটা আসলে সৎ। যেন সৎ উদ্দেশ্যে যাই করো, তাকে অসৎ বলতে দ্বিধা হবে। সুরথদার জন্যে আমি এ রকম কোনো সৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না। জানা নেই আমার'।

'চুরির জন্যই চুরি'?

'কেমন লাগছে শুনতে, তাই না? আমারও লাগে। কিন্তু ভুলও তো হয় মানুষের। হাত থেকে পড়ে দামি বাসন খানখান হয় না? কম সাজায় ছাড়া পেলেও'। হয়তো শুধু চাকরি পাওয়া।

এমনি ছিল সৌম্যের কথা বলার ধবন কিংবা এমনও হতে পারে রেলগাড়ির সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সে-ও উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আনন্দ নয় হয়তো, কিন্তু কথা বলার অকুণ্ঠতা।

সৌম্য বলেছিল, 'একটা ছোট ঘটনার কথা বলি, এবং সেটা না ঘটলে আমিও সুরথদাকে পাকিস্তানের উদ্বাস্তু মনে করতাম। একদিন সুরথদার স্ত্রী আমাকে বলেছিল তাকে স্টেশন নিযে যেতে। সে কী! কোথাও যাবে নাকি? না। একজন আত্মীয় যাবে স্টেশন দিয়ে, দেখা করব। গিয়েছিলাম। আত্মীয় গেলেনও। গাড়ির কামরার ধারে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই দু-একটা কথা হল। সুবথের স্ত্রী কী বললেন আমি শুনিনি। একটু দূবে দাঁড়িয়ে আমি গাড়ির আরোহীদের লক্ষ্য করলাম। স্বামী, স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলে। গাড়ি চলে গেলে আমরা ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে লাগলাম। কী হল? চোখে কিছু পড়ল? কান্না? রাম কহো! আমরা ক্যাম্পেব উদ্বাস্তু। আত্মীয়দের জন্য আমরা চোখের জল ফেলি? সুরথের স্ত্রী বুকের ওঠাপড়া নিয়ে চলতে পারছিলেন না। অবশেষে বললেন, সৌম্য, কাউকে না বললে আমি সইতে পারব না। গাড়িতে যে ছেলেটিকে দেখলে, সে আমার, সে আমাব'।

'মানে'—

হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সৌম্য, তেমনি হঠাৎ শুরু করল বলতে, 'না, ছেলেটিকে বিক্রি করেনি তারা। ছেলেটিকে ভার বোধ হয়নি। তা সত্ত্বেও দিয়ে দিয়েছিল। লিখে পড়ে পাকা কাজ'।

'ছেলের কল্যাণের জন্যই'? বিমলা প্রশ্ন করেছিল।

'হতে পারে। ও ভেবে আর কী হবে। অপরাধটা রোগ কিংবা ভুল, এ নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু সুরথ ব'লে যে সামাজিক জীবটা ছিল, সে কি আর থাকল তারপরে? তার সমস্ত অতীত, তার সমস্ত চরিত্র কি মোমের মতো গলে গলে গেল না সেই একটি মুহূর্তে? শহরে ফিরে কি আর সেই সুরথ ছিল? সুরথ ওপার থেকে এই ক্যাম্পে না এলেও বাস্তু হারিয়ে ফেলেছিল। গলে যাওয়াই নয় কথাটা? সবটুকু চরিত্র সবটুকু ব্যক্তিত্ব গলে গলে যাওয়া'।

সুরথ তাহলে যাবে দণ্ডকারণ্যে। কিংবা তাকে যেখানে পাঠাবে সেখানেই যাবে। আইন মানবে।

মালতীকেই দেখা গেল আবার। এবার সে তার বাসার দিক থেকে শহরের দিকে যাচ্ছে।

'সেই থেকে বসে আছো'?

'উঠি'। বিমি হাসল। 'কোথায় চলেছ এত তাড়াতাড়ি'?

'শহরে'।

'দলের অফিসে'?

'তাও বটে। শহরের ওপারে সুভাষপল্লীতে, হলুদমোহন ক্যাম্পেই আগে ছিল এমন কেউ কেউ আছে। দেখি তাদের কাউকে আনতে পারি কি না। তারা প্রমাণ, অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই বসা যায়'।

'দ্যাখো'।

তাকে তো আর উদ্বাস্তু হতে হবে না। অগ্রপশ্চাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কথাটাই বিমির মনে জাগল আবার। হলুদমোহন ক্যাম্প থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেযার জন্য সেটা কি তার মনের একটা চেষ্টা?

কেমন দেখাত সুরথকে? কাঁচাপাকা চুলে ভরা মাথা। কপালে চিন্তার রেখা। ঠিক পাকা নয় চুল। কলপ ধুয়ে গেলে যেমন লাল লাল দেখায়। রং? মেকআপ? কিন্তু ভদ্র, অদ্ভুত রকমের বিনয়ী। অতি মৃদুভাষী। যেখানে প্রতিদিনই কলহ, সেখানে কেউ তাকে জোরে কথা বলতে শোনেনি।

হলুদমোহন ক্যাম্পের চারিদিকে জোয়ারের দোলা লেগেছে এ রকম একটা অনুভব জেগে উঠতে উঠতে মিলিয়ে গেল বিমির মনে।

আর, বন্যার ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় না।

বাঁধ দিয়েছে শহর বাঁচানোর জন্য। সেজন্যই এদিকে গত দুই বর্ষায় জল ওঠেনি। আগে নাকি প্রতি বছরই চার মাস জলের তলাতেই থাকত। তাই জমিটা সস্তাতে পেয়েছে এ পাড়ার বাসিন্দারা। আশ্রয় গড়ে তুলেছে বন্যার পরপরই। ভুবনবাবুও। তিনমাস সময় নিয়েছিল।

কিন্তু মানুষের দেয়া বাঁধ। ফাটতে কতক্ষণ?

কিংবা ধরো এই জায়গাটাই আবার কোনো মহত্তর উদ্দেশ্যে কারো প্রয়োজন হল? যেমন হলুদমোহন ক্যাম্প হচ্ছে।

৫

আর চারদিন, যদি মালতী ঠিক সংবাদ আনতে পেরে থাকে। সংবাদটা সে ঠিকই এনে থাকবে। নাওয়া-খাওয়ার সময় দিচ্ছে না নিজেকে।

'চা করছ বউদি? দাও তো একটু'।

'বোসো'।

চা করছে বিমি।

'বাহ্, বেশ বালাজোড়া তো! ভুবনদার চোখ আছে'।

'তা আর নেই? তোমার খবর কী'? চা এগিয়ে দিল বিমি।

'ভালো নয়'।

'রোসো। তোমার দাদাকে চা দিয়ে আসি'।

চা দিয়ে ফিরে এসে বিমি দেখল মালতী পিরিচে ঢেলে চা গিলছে।

'বলো এবার। ছুটছ কেন'?

'কী বলব? পেরে উঠছি না। কয়েকটি লোক পেয়েছি সাহায্য করার। তুমি একটু যেতে পারো

না'?

'আমি'?

'তোমার মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারলে অনেক কাজ হতো। অভাব বোধ করছি সৌম্যদার। সে থাকলে একা মোড় ফিরিয়ে দিত। পারত সে'।

'যাচ্ছ'? কী যেন ভাবতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল মনের মধ্যে বিমি।

বিমিকে চমকে দিয়ে হঠাৎ মালতী ফেটে পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'অজয়, অজয়। ওর ভালো হবে কখনও'?

হন হন করে চলে গেল সে।

রান্না চাপাল বিমি।

অজয়?

না, সৌম্য। সৌম্যর বয়স কতই-বা হবে। চিবুকে কয়েকটি দাড়ি ছিল লম্বা। সবসময়ে থাকত না। মাঝে মাঝে কামাত। দিন পনেরো ধরে বেড়ে আবার আগের মতো।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে তীব্র একটা একটানা শব্দ করে হেলে গিয়ে গাড়িটা কী ভয়ই দেখিয়ে দিয়েছিল। আসলে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি, উপরেও উঠছে সঙ্গে সঙ্গে। গাড়িতে তখন লোকজন কমে গেছে। দু-তিন মাইল পরে পরে গোটা দু-এক স্টেশন। যত লোক নেমেছে তত ওঠেনি। নতুন দেশে গেলে সে দেশের মানুষদের মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নতুনত্ব খোঁজা স্বাভাবিক। আর এক্ষেত্রে নতুনত্বও ছিল। গাড়ির দু'দিকেই যেমন চায়ের চাষ চোখে পড়ছে। তেমনি মেয়েদের কানে বড় বড় ফুটোয় মোটা মোটা গোঁজ পরানো। নাক মুখের গড়নও একটু ভিন্ন রকমের।

ঠিক এই সময়েই গাড়িটা বিপর্যয় ঘটানোর মতো করে উঠেছিল। হাত ধরে টালটা সামলে দিল সৌম্য। আর বোধ হয় ছলাৎ করে এক ঝলক রক্ত উঠে পড়েছিল বিমলার কান পর্যন্ত।

'লজ্জার কী আছে? গাড়িটার এই বিদ্ঘুটে অভ্যাসের কথা জানা না থাকলে ভয় করে'।

'আর কত দূর'?

'আধ ঘণ্টাটেক লাগবে'।

'আচ্ছা, সৌম্য'?

'বলো'।

'চাকরি যে হবেই তার কি স্থিরতা আছে'?

'তা আছে বলেই মনে করি'।

হাত দু'খানা একেবারে আদুল। বিধবাদের মতো হাত। কিন্তু শাড়িটা নতুনই ছিল। তাঁতের, মাড়ে খরখরে। খুব হালকা জর্দা রঙের বোধ হয় ছিল। ধারে কেনা। ধারটা অজয়ের নামে হয়েছিল। এনেছিল সৌম্য, শোধ দেবে বিমলাই যদি চাকরি হয়।

'কিন্তু আর কিছু টাকা দরকার হবে তোমার'।

'কেন'?

'সংসার করতে হবে তো। আর একটু ভদ্র কায়দায় থাকতেও হবে'।

সেদিন সৌম্যের মুখে দাড়ি ছিল। আর সেটাই কমনীয় নরম করে রেখেছিল তার মুখকে। কত চক্রান্ত, কত নিচের টান থাকে চাকরির ব্যাপারে। চাকরি যেন একটা লড়াই-এ জিতে স্থিতি লাভ। তাই নয়? এইটুকু একজন কি পারে সেটাকে জয় করে দিতে?

'চাকরি পেলে থাকবার বাড়িও পাবে'। বলেছিল সৌম্য।

'আগে পাই'।

'পাবে। দেখে নিও। অজয়বাবু চিঠি দিয়েছেন'।

'সে তো তুমিই লিখিয়েছ'—বিমি বলল।

'আর সোয়েথয়েট বাগানের বড়ুয়া সাহেব তোমার জন্য চেষ্টা করবেন'।

'আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। সৌম্য, তুমি···তোমার মাথায় যে বুদ্ধিটা কী করে খেলে গেলো যে আমি চাকরি করতে পারি'।

সৌম্য পারে। চাকরির নামটাও ভালোই ছিল। লেডি ওয়েলফেয়ার ইনস্‌পেক্টর। সোয়েথয়েট বাগানের নারী শ্রমিকদের কীসে মঙ্গল হয় তার খোঁজ রাখা। শ্রমিকদের অনেকেই ছিল খ্রিস্টান। বিশেষ করে তাদেরই মঙ্গল করা। চার্চেও যেতে হতো শ্রমিকদের নিয়ে। গুঁড়ো দুধ, ভিটামিনের বড়ি বিতরণ করতে হতো। ওয়েলফেয়ার অফিসরকে ছাপানো ফর্মে রিপোর্ট দিতে হতো।

আর চার্চ। ওদিকে কুয়াশা নামত। নতুন কেউ গেলে মনে করতে পারত সবগুলি উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা হতেই অজস্র ধোঁয়াকুণ্ডলী বাড়তে বাড়তে যেন আকাশ ছেয়ে ফেলত। কিন্তু বোঝা যায় ধোঁয়া নয়। চোখ জ্বালা করে না। কাশি আসে না। ভালো লাগে। মনে হবে সন্ধ্যারই ব্যাপার। কিন্তু সকালে দেখো আকাশ থেকে মাটি সবটুকু ফাঁক ভরে ফেলেছে। সাদা মেঘ। সাদা নয় ঠিক, হালকা নীল। আর চা গাছের কোঁকড়ানো মাথাগুলোতে যেন জড়িয়ে যেত। উপরের আকাশ পরিষ্কার হয়। গাছগুলোর ডালপালা ফুটে ওঠে, তবু যেন চা গাছের মাথাগুলোতে জড়িয়ে থাকে কুয়াশা।

আর সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সাদা চার্চটা ফুটে উঠত। মেথডিস্ট চার্চ।

উঁচু গির্জার দিকে ঢালু পথ বেয়ে একটা একটা দল উঠছে মানুষের। ···স্টিপ্‌ল্ না স্পায়ার? চার্চ সংলগ্ন পাঁচ-ছ' বেডের হাসপাতাল। মেটার্নিটি।

সৌম্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলি বিমি, 'কী বলে ওকে মনে পড়ছে না। আমাদের কিন্তু এককালে এসবের তফাতও শিখতে হতো'।

অবাক হয়নি সৌম্য। বোধ হয় তার চাইতেও অবাক হওয়ার আর একটা কারণ হাতের কাছে ছিল তার তখন। বিমি চুল কেটে ফেলেছে। কাঁদ পর্যন্ত থলো থলো চুলের দিকে সৌম্য হাঁ করে চেয়েছিল।

চাকরি পেতে না পেতে সোফিস্টিকেটেড্!

নির্ঝঞ্ঝাট, নিরাত্মীয় সোফিস্টিকেটেড্ যুবতীকে চাকরি দিতে কেউ কেউ বিশেষ আগ্রহী হয়।

'তুমি তো চার্চে যাবে না'। বিমি বলল।

'না। অতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা পোষায় না'।

'আমি চলি। ওরা এগিয়ে গেছে। তুমি কি এখানে থাকবে আজ'?

'গত সপ্তাহ থেকেই আছি'।

'তাই নাকি'? হাসি হাসি মুখে অবাক হল বিমি।

'হ্যাঁ একটা দোকান দিয়েছি'।

স্টিপ্‌ল, না স্পায়ার? লাল পাথরের, অন্তত লাল পাথরই বেশি, টিলার উপরে সাদা গির্জা। তীক্ষ্ণ চূড়ার তীক্ষ্ণতা কমিয়ে ছোট ছোট ক্রশ। অবশ্যই চা বাগানের নয়।

সৌম্য বেশ কথা বলতে পারত। কিন্তু স্বভাবটা তার কেমন ছিল? বুঝি না, বুঝি না।

'কী বুঝতে পারছ না'?

গাড়িটা দুলছে। উপরে উঠছে বলে যত শব্দ হচ্ছে ততটা যেন এগোচ্ছে না।

'নিজেকেও'। বলল বিমি।

'আর আধ ঘণ্টা সময় আছে। ততক্ষণ নিজেকে বুঝে নিতে পারো। গাড়িটা একটা টানেলের মধ্যে ঢুকবে। অন্ধকার হয়ে যাবে। ভয় কোরো না। আর ভয় যদি না করো, তাহলে নিজেকে ধীরে সুস্থে বুঝবার চেষ্টা করতে আর বাধা কোথায়'? সৌম্য হেসেছিল।

কথাটা সৌম্য ভালোই বলত।

'তাহলে শোনো, বলি'।

'কেন বলবে? চাকরি একটা জুটিয়ে দিচ্ছি বল'।

'শোনো আমি পালিয়েছিলাম কেন বজ্রযোগিনী থেকে'।

সেদিনই সুরথের গল্পটা বলেছিল সৌম্য। বিমির বজ্রযোগিনী থেকে পালানোর কথা শুনেই কি সুরথের কথা মনে হয়েছিল সৌম্যর? না সুরথের কথা শুনেই বিমিরও ইচ্ছা হয়েছিল নিজের কথা বলতে? একইসঙ্গে দুটো গল্প আলোচনায় এসেছিল। পাশাপাশি চলে চলে উপসংহারে একই সুরে মিলে গিয়েছিল।

'বুঝলাম বজ্রযোগিনীতে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছিল তোমার'।

তা হয়েছিল, ভাবল বিমি। এবার ভাত বসাতে হবে। ক'টা বাজল কে জানে। ভাজাগুলো কুটে নিতে হবে। ডালে ঠিকই নুন দেয়া হয়েছে। নুনের বাটিতে আঙুলের দাগ রয়েছে। সেটা কাল রাত্রির নয়।

অসহ্য হয়েছিল বজ্রযোগিনীর স্থিতি। কেন? মরণচাঁদ বেরিয়ে এসেছিল কিছু একটাকে বাঁচাতে। কী সেটা? তাকে কি বাঁচাতে পেরেছে? আর বজ্রযোগিনী? যদি বলো এক দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে ভুবনবাবুকে বাঁচাতে এবং নিজেকে বাঁচাতে সে কলকাতা যাত্রা করেছিল, তবে ফিরে এসে এই অবস্থানটাকে কী বলবে? কী বলা যায়?

ভুবনবাবু স্কুলে গেল।

আজ বিমির স্নানও হয়নি সকালে। সকালে উঠতে দেরি হয়েছিল। শীত শীত লাগছিল, শরীর খারাপ হলে যেমন হয়।

কাপড় গামছা হাতে নিয়ে সাবানের কথা মনে হল। ভুবনবাবুকে বলেনি সে। বলতে কুণ্ঠিত হওয়ারই-বা কী যুক্তি? আজ সন্ধ্যাবেলাতেই বলে দেবে। সংসার করতে বসে প্রয়োজনের এক টুকরো সাবান না চাওয়াটাই তো হাসির ব্যাপার হতে পারে।

কাজ অবশ্য অনেক আছে। ভুবনবাবুর জামা কেচে রাখা হয়েছে, ইস্ত্রি করা হয়নি। চালের কাঁকর বাছা তো আছেই। কয়েক গজ কাপড় কেনা আছে। দেখতে হবে বালিশের ওয়াড় কিংবা পেটিকোট কোনটা করলে আয় দেবে।

খেতে খেতে সে ভাবল রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়া হয়নি দেখছি অনেকদিন। তাকের উপরে রাখা মশলাপাতির কৌটাগুলিতেও ময়লা জমেছে। সোডা আনিয়ে নিতে হবে।

একটা গোলমাল হচ্ছে যেন পথে। এমন একটা বড় রাজপথের ধারে বাড়ি করলে এ সইতেই হবে। রেললাইনের ধারে যারা বাস করে গাড়ির শব্দ না শুনে তাদের উপায় কী?

খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার মনে হল গোলমাল নয়, কে যেন ডাকছে।

'দাঁড়াও, আসছি'।

দরজা খুলে বিমি অবাক হল না বটে কিন্তু একেবারে সাধারণ ভাবেও গ্রহণ করতে পারল না।

'কী খবর সোদামুনি'?

'আর চারদিন পরেই যাওয়া'।

'কিন্তু তোমরা তো যাবে না শুনলাম'।

'কী জানি কী হবে'! ঢোক গিলল সোদামুনি।

'বসবে? নাকি আর কিছু পরে আসবে? কাজকর্ম কিছু সেরে নেই তাহলে'?

'বসি না। একটু বাজারে যাব। কান্তর বউ চারটে পয়সা দিয়ে একটু আচার আনে দিতে ক'লো। অরুচি'।

'ও'।

'তা, মা ঠাকরুন, তোমাকে যা কওয়ার ক'য়ে যাই। মোহিতবাবুকে চিনতা? তেনি বুঝি গল্পে গল্পে তোমার এখানেব কথা তাকে কইছে। তা মোহিতবাবু আজ ক'লো, সোদামুনি, তোমাদের মা ঠাকরুনকে একটুক ডেকে আনতে পারো'?

'আমি'?

'তোমাকেই যাতে কইছে। যায়ো, কেমন'?

'যাবো'?

'তা যদি কও, ফেরার পথে তোমাকে ডাকে নিয়ে যাবো'।

'আচ্ছা। তাই যেয়ো'।

দরজা বন্ধ করে কাজ কবতে গেল বিমি। চাল বাছাটাই সবচাইতে আগে দরকার। মোহিত অবশ্য···। মোহিতকে কোনো সান্ত্বনাই সে দিতে পারবে না। সান্ত্বনাই সে চায় এমন কোনো কথাও নয়। হয়তো দণ্ডকারণ্যের স্রোতে ভেসে যাওয়ার আগে পুরনো পরিচিত হিসাবে দেখা করতে চায়। গেলে ক্ষতি নেই। শুধু মোহিত নয়, সুরথরা রয়েছে, ওদিকে শ্রীকান্তরা।

কিন্তু কেমন লাগবে এতদিন পরে আবার ক্যাম্পের চৌহদ্দিব মধ্যে ঢুকে পড়তে? প্রায় দু'বছর হল, কিছু বেশিই হবে। সেই বন্যা নেবে যাওয়া কাদায় আচ্ছন্ন ক্যাম্পে আব সে ফেবেনি।

আবার ডাকল সোদামুনি।

'এত তাড়াতাড়ি'?

'সামনেই পানের দোকানে পাওয়া যায়। দু'পয়সার আচার কিনতে আর কতটুকু। যাবে'?

'চলো'।

ক্যাম্পের সদর দরজা পার হয়ে সোদামুনির পিছন পিছন ক্যাম্পের ভদ্রপাড়ায় এসে দাঁড়াল সে। এতক্ষণে সে মুখ তুলল। তাঁবুগুলো দেখে চিনতে পারবে কোনটা কার, এমন হয় না। বন্যায় ওলোট পালোট হয়েছে তা ছাড়া মাঝে মাঝে কিছু পরিবর্তন হতো স্বাভাবিকভাবেই। কেউ চলে গেলে সেই ফাঁকা জায়গায় অন্য কেউ তার তাঁবু নিয়ে গিয়ে বসেছে, এমন ঘটনাও বিবল নয়।

সোদামুনি ঘুরে ঘুরে চলল। ক্যাম্পের কর্তা অজযের কোয়ার্টার্সের পাশ দিয়েই যেন মোহিতের তাঁবুতে যাওয়ার রাস্তা। অ্যাম্বুলেন্স? লাল ক্রশ আঁকা সাদা রঙের গাড়ি। লোকজন নেই গাড়ির কাছে।

চিন্তাটা একটা কল্পিত আশঙ্কার রূপ নিয়ে এল। যেতে চাইবে না এরা, দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে— সেজন্য?

মোহিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে বিমি দেখতে পেল সুরথকে। এতটুকু বদলায়নি সুরথ। এক যদি মাথার চুলগুলো একটু বেশি সাদা হয়েছে বলা না যায়। বিমি হাত তুলে নমস্কার করল, থেমেও দাঁড়াল। প্রতিনমস্কাব জানাল কিন্তু যেন চিনতে পারল না বিমিকে। দু'বছরে সে কি খুব বদলে গেছে নাকি? সুরথবাবু আবার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল।

মোহিতবাবু শুয়েছিল বিছানায়। ক্যাম্পে থাকবার সময়ে মোহিতবাবুর তাঁবুতে দু'একবার আসতে হয়েছে বিমলাকে। লতা আনত ডেকে। তখনও সে লক্ষ্য করেছে মোহিতবাবু তার বিছানায় বসে কিংবা শুয়ে বই পড়ছে। ক্যাম্পের গ্রন্থাগারের বাইরে মোহিতবাবুকে ভাবতে গেলে এ দৃশ্যটাই মনে পড়ে। আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো মনের।

তাঁবুতে ঢুকতে গিয়েই তার মনে পড়ে গেল গুহগিন্নির সঙ্গে প্রথম যে সন্ধ্যায় সে এসেছিল। ছি ছি, লতা হয়তো মনে করেছিল মাফলারটার জন্য সেও গুহগিন্নির আক্রমণকে সমর্থন করে।

পায়ের শব্দে মোহিতবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসল। অনেকটা রোগা দেখাল তাকে। বিশেষ করে মুখটি যেন ভয়ানক বিবর্ণ।

'কে, সৌদামিনীদিদি'?

'হ্যাঁ, বাবু, মা ঠাকরুনকে নিয়ে আলাম'।

'মা ঠাকরুন? বিমলা! ও। ঐ টুলটা একটু টেনে দেওনা, দিদি। বসুন'। মোহিত মৃদুস্বরে কথা বলছিল। একটা বিবর্ণ হাসি দেখা দিল তার মুখে।

বিবর্ণ হওয়াটা দোষের নয়। লতার ঘটনার মতো ঘটনা যার ঘটে তার সবকিছুই বর্ণহীন হয়ে যায়। নাকি, সেজন্য নয়? বিমি যখন ক্যাম্প ছেড়েছিল তারপরও এদের উপর দিয়ে ক্যাম্পের দু'তিন বছরের জীবন প্রবাহিত হয়ে গেছে।

বিমি বসলে সোদামুনি বলল, 'আমি পরে আসে নিয়ে যাবো মা ঠাকরুনকে'।

'তাই কোরো'।

বিমি বলল, 'ভালো আছেন, মোহিতবাবু'?

'আছি একরকম'।

বিমি জিজ্ঞাসা করল, 'যাচ্ছেন নাকি'?

'কোথায়, দণ্ডক বনে? না। আপনাকে ডেকে না পাঠালেও হতো। দয়া করে এসেছেন, এজন্য মনে মনে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের দয়ার সীমা নেই। লতুও দয়াবতী। তার দয়ার তুলনা নেই'।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কি সমীচীন হল? লতার কথাই যদি উঠে পড়ে কী উত্তর দেবে সে। সোদামুনিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, অবিশ্বাস করার কিছু নেইও, স্বামীত্যাগিনী লতার কথা বলতে গেলে কেলেঙ্কারির কথাই মনে হতে থাকবে।

কিন্তু মোহিতবাবুর শেষ কথাটা কি শ্লেষ? তীব্র একটা বিদ্রূপ নারী জাতির উদ্দেশে? কিংবা আর একটা আত্মপ্রবঞ্চনা? মোহিতবাবুর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মোহিত বলল, 'লতু আমাকে বলে গেছে সে আপনার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার বলে চেয়ে নিয়েছিল। সে টাকাটা আজ আপনি নিন! সৌদামিনীদিদির কথায় হঠাৎ জানতে পারি আপনি এখানেই আছেন। নতুবা ধার শোধ করা কি হতো? কিন্তু ধার শোধ করাই নয়। বিশ্বাস করুন, বড্ড দেখতে ইচ্ছা হল আপনাকে। আর তা ছাড়া লতুর একটা জিনিস আছে, আপনাকে ছাড়া কাকে দিয়ে পাঠাই'।

মোহিত বালিশের তলা থেকে একটা সোনার লকেট বার করলে। হারের অবশেষ। এখন শুধু কারে বাঁধা।

এই শ্রমেই হঠাৎ মোহিত কাশতে শুরু করল। যা সে বলছে তার চাইতে অনেক গভীরেব কোনো আবেগ চাপতে গিয়েই হয়তো এমন হল। বেদম হয়ে বুক চেপে ধরল। লাল হয়ে উঠল তার বিবর্ণ মুখ। শিয়রের কাছে গামলা ছিল। চোখ সরিয়ে নিলেও ব্যাপারটা চোখে পড়ল বিমলাব। শিউরে উঠল সে।

'কত দিন থেকে এ অসুখ'?

'অনেক দিন। লতু অনেক সহ্য করেছে। অনেক ভিক্ষা করেছে সে আমার জন্যে'। মোহিতের চোখে জল এল যেন।

'আবার কাশি আসবে আপনার মোহিতবাবু। আমি...

'এই শেষ। আমরা ছড়িয়ে পড়লাম আবার। কেন জানি না বড্ড ভালো লাগে আপনাদের। আপনি, অজয়, সৌম্য, সুরথ, লতা; সবাই আপনারা ভালো। কত ভালো'!

'আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা...

'অনেক যুদ্ধ করেছে লতা। প্রথমেই গায়ের গয়না খুলে দিয়ে শুরু...। বড় দুঃখী মেয়ে লতা। সারা জীবনই সে দুঃখ সহ্য করেছে। যাক্‌গে। ছড়িয়ে পড়লাম আবার সবাই, এই দুঃখ। আপনাকে যে মুহূর্তের জন্যও ফিরে পাব এ আর ভাবিনি। সৌম্যর সঙ্গে আর দেখা হল না। আর ওদের পরিবারটা। গুহকর্তা মারা গেছেন। গিন্নি চলে গেছেন কোথায় কোন মেয়ের বাড়িতে। সৌম্য বড় ভালো ছিল, কিন্তু একটু নির্দয়ও ছিল বোধ হয়'।

'আপনি আর কথা বলবেন না, মোহিতবাবু'।

'সেজন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনাদের আমি বড্ড ভালোবাসি, এ কথাটাই বাবে বারে বলতে ইচ্ছা করে। আর লতু। তার তুলনা হয় না। আমার স্ত্রী বলে বলছি না। কী করে বোঝাব। একটা জেদ ছিল তার। রোগ রোজ ক্ষয় করছে, আব সে যেন থাবা থাবা মাটি তুলে সেই ক্ষয় ঢেকে দিচ্ছে। আমার এই দেহটা কতখানি লতুর স্নেহ দিয়ে গড়া, ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়'।

একটু বিশ্রাম করে নিল মোহিত।

বলল, 'দণ্ডক বনে ওরা যাবার আগেই আমি যাব ক্যাম্প থেকে। বিদায়'। থামল মোহিত। ভাবল। কিছু যেন বলবে। বলল আবার, 'বিদায়'।

সোদামুনি এল।

মোহিত বলল, 'এসেছ দিদি, এবার মা ঠাককনকে পৌঁছে দাও। টাকা ক'টা আপনি দয়া করে নিয়ে যান। লতু সাধারণত হাত পেতে চেয়েই নিত। ধার খুব একটা করত না। কযেকটা ধারেব কথা আমাকে সে বলেছে—তার মধ্যে আপনার একটি। পারেন, লকেটটা পৌঁছে দেবেন'।

মোহিতের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল বিমলা। আবার মোহিত কাশছে। কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করল বিমলা, অথচ মনটা তার হঠাৎ যেন শূন্য হয়ে গেল। সে কি কাঁদবে? কারো জন্য কি তার কাঁদা উচিত এখন?

কিন্তু সম্মুখেই সুরথের তাঁবু। তাঁবুর দরজার পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি করে আবার এসে দাঁড়িয়েছে, যেমন বিমি তাকে দেখে গিয়েছিল। ভঙ্গিটাও বদলায়নি।

এবার বিমি তার দিকে এগিয়ে গেল, 'কী করছেন সুরথবাবু'?

'যেতে হবে। বাঁধাছাঁদা করছি'।

দরজা দিয়ে সুরথের তাঁবুর ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। তোলা উনুনে রান্না করছে এখন সুরথের স্ত্রী। তাঁবুর ঠিক মাঝখানে বাঁধা পড়ে আছে কতগুলি পুঁটুলি। এমন হতে পারে পুঁটলি বাঁধবার তাগিদেই রান্না চড়াতে দেরি হয়েছে।

'দেরি আছে তো যাওয়ার'।

'যেতে যখন হবেই। আপনি বিমলা না'?

'চিনতে পারলেন'? বিমি হাসল।

'দেখুন নানা রকমের লোক নানা উদ্দেশ্যে ঘোরে। রাজনীতি করছে একটি মেয়ে ক্যাম্পে ঢোকে। তাই যদি হয়, তাহলে কি গোয়েন্দাও আর লাগেনি সরকার থেকে'!

'অসম্ভব কি'?

'একটা কথা বলি। এদিকে আসুন'।

তাঁবু থেকে একটু সরে দাঁড়াল সুরথবাবু।

'আপনি মোহিতবাবুর ঘর থেকে এলেন তো'? সুরথ বলল।

'হ্যাঁ'।

'এটা কি ভালো? অ্যাম্বুলেন্স দেখছেন। ওটা আনিয়েছে অজয়। অসুখই যদি তবে এতদিন হসপিট্যালে গেলেই হতো। ঠিক এখন যখন দণ্ডকারণ্যে যেতে বলেছে সরকার থেকে, তখন অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে হসপিট্যাল যাওয়া কেন'?

'সত্যি অসুখ তো মোহিতবাবুর'।

'অসুখ মিথ্যা তা তো বলছি না। দু'মাস আগে যা ছিল, এখন হয়তো একটু বেড়েছেও। যখন দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার কথা ছিল না, তখন তো অ্যাম্বুলেন্সের কথাও মনে হয়নি। দণ্ডকারণ্যে যেতে না হলে এখানেই থাকত না মোহিত? এটা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে না দণ্ডকারণ্যকে? আর অজয়ও যেন কেমন হয়েছে আজকাল। ভাব দেখাচ্ছে, অসুখটা যেন হঠাৎ হয়েছে। অথচ লতা যাওয়ার পর থেকেই তো অসুখ জানাজানি, সে তো একমাস হল। বলুন, এ কি কারো বুঝতে বাকি থাকে, দণ্ডকারণ্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এই অ্যাম্বুলেন্স ডাকা'?

বলতে বলতে সুরথের মুখটা রক্তহীন হয়ে গেল।

'অজয়ের কাছে যাচ্ছেন'?

'আছে নাকি কোয়ার্টার্সে'?

'তা আছে বোধ হয়। বিকেলে যাবে মোহিত'।

বিমি অজয়ের কোয়ার্টার্সের দিকে হাঁটতে লাগল।

'তুমি যাও, সোদামুনি। আমি একাই যেতে পারব'। এই বলে সে বিদায় দিল তাকে।

এতদিনে যেন বোঝা যাচ্ছে মোহিতের অদ্ভুত আয়েসি আভিজাত্যর ভাবটার গোড়ায় কী। কেন তার বই পড়ার বিলাস। কেন মোহিতবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে, আর বউ খেটে মরে।

অজয় তার ঘরে বসে খাতা দেখছিল হিসাবের।

বিমিকে দেখে একটু দ্বিধা করেই বলল, 'মাই...। আপনি? এতদিন পরে কোথা থেকে আবার? ক্যাম্প কিন্তু এবার সত্যি ভেঙে যাচ্ছে'।

'ক্যাম্পে থাকতে আসিনি আবার'। বিমি একটা বিবর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুলল।

'না-না। ও কথা নয়'। অজয় লজ্জিত হল। 'বলুন কী খবর। বসুন। লোকে যাই বলুক, আমি, আপনি, মোহিত, সৌম্য, সুরথ, লতা—একটা বন্ধুত্বই ছিল আমাদের'।

'মোহিতের কাছে এসেছিলাম'।

'আ মোহিত। স্যাড্। ও এই শহরেই থাকতে চায়। অ্যাম্বুলেন্স আনানো হয়েছে। বোধ হয় তা হলে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই দু'এক ঘণ্টা পরে যেতে চেয়েছিল। এখুনি হয়তো তাহলে যাত্রা করবে'।

'সুরথবাবু...

'হ্যাঁ, সুরথ মোহিতের এ ব্যাপারটাকে সমর্থন করবে না। মোহিত আগেই যেতে পারত হসপিট্যালে। যায়নি। আশা ছিল নাকি লতু ফিরবে? আর এখন যখন চলে যেতে হবে, এই শহরের থেকে যেতে চাচ্ছে না। হাসপাতাল হলেও লতুর সান্নিধ্য নাকি যদিও-বা দেখা না হয়। স্যাড্'।

'অসুখটা প্রকাশ করলে হয়তো...

'তা কোনোদিনই করেনি। দু'জনে মিলে সেটাকে লুকিয়ে রাখত। মানুষের ছোঁয়ার বাইরে ভেসে যাবার ভয় হয়তো'।

'লতা···

'লতু। আমি তাকে লতুই বলতাম মোহিতের অনুকরণ করে। হ্যাঁ লতু। জেদি মেয়ে। জেদি লোকের যা হয়। একচোখো হয় তারা। আজকাল উপন্যাসে অনেক পড়া যাচ্ছে। মোহিতের জন্য যারা টাকা দিত তাদের সকলেই নিছক দয়ালু হতে পারে না। যাক্‌গে। আপনার খবর বলুন'।

'দেবার মতো কিছু নয়'।

'সময় থাকলে আপনার কর্তার সঙ্গেও আলাপ করতাম'।

'তা—

'আর মাত্র চারদিন। ওদের পৌঁছে দেব। এখন আর এ শহরে নতুন কারো সঙ্গে আলাপ করতে চাই না। উঠছেন? আমিও উঠি। দেখি মোহিতকে রওনা করে দিই। অ্যাম্বুলেন্সকে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখব'।

'নমস্কার'।

'নমস্কার। হ্যাঁ। আর সৌম্য বুঝলেন, সে থাকলে···অবিশ্যি ওটা আমার কল্পনা। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো ও এই ক্যাম্প নিয়ে যেদিকে খুশি চলে যেতে পারত'। অজয় বলল।

ক্যাম্প থেকে বেরুতে হবে এবার। ভদ্রপাড়া থেকে সোজা তারের বেড়ার কাছে গিয়ে বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে দরজা দিয়ে।

একটি মেয়ে বারোয়ারি কলগুলোর একটিতে জল পাম্প করছে। জল না ওঠার ফাঁপা শব্দ যেন শুনতে পেল বিমি। প্রকৃতপক্ষে শুনতে পাওয়ার কথা নয়। পাম্প করতে গিয়ে মেয়েটির কোমর থেকে মাথা অবধি ওঠানামা করছে। ক্ষীণধারায় জল এল কি এল না। কা—কা—কা। ঝটাপটি করল দু'টো কাক। সোদামুনি। অবশ্য লতু···। হ্যাঁ লতাই তো, তাকেই ভাবছে সে।

এমন মেয়েকে কল্পনা করা যায় যে শরীর আর মনকে পৃথক করে ফেলেছে। শরীরের যাই হোক, মন গৃহমুখী। টাইপিস্ট আঙুল দিয়ে টাইপ করে টাকা কামাই করলে যদি দোষ না হয়—আঙুলও তো দেহই। তাই কি নয়? এই ভাবতে চেষ্টা করল বিমি।

'তুমি? আমি ভাবি আর কে হয়'। পাশের দিকে তাকাল বিমি।

'মা ঠাকরুন'!

'কিছু বলতে চাও, সোদামুনি'?

'আমরা যাবোই না দণ্ডকান্নে'।

'মন ঠিক হল তোমাদের'?

'অবিমন্নু'।

'ও। তার কী হল'?

'তেনি কয় মাসি পলাইছে। এখন এ ছেইলে নিয়ে কী করা'?

'পালিয়েছে'!

'কাল থিকে দ্যাখো নাই'। একটু থেমে সোদামুনি বলল, 'বিশ বছর আগে থিকেই মাসি চা বাগানের বাবুর কাছে থাকত। বউ না। সে বাবু মরেছে আজ পাঁচ বছর। সে বাবু নাকি তেনির গাঁয়ের। অনেককাল গাঁ ছাড়া। তা হউক। পরে নাকি হাসপাতাল ঝাড় দিত চা বাগানে। এ ছেইলে যদি চুরি করা না হয়, কি কইছি। পুলিসের ভয়ে পলাইছে। ছেইলে নিয়ে ভিক্ষে করাই মাসির কাজ'।

'এসব কী কথা? বলছ কী? মরণচাঁদ জেনেছে'?

'তেনি কয় এ কোনো ভদ্রলোকের ছেইলেই হবি। এমন মুখ, আর এমন চোখ। তা যদি হয়, ভালোই। ওকে বাঁচান লাগে। আর যদি পুলিস ওর বাপ মাকে খুঁজে বার করে, তবে নিয়ে যাও

ছেইলে তখন। তৎক্ষণ'?

পায়ে পায়ে বিমির দরজা পর্যন্ত সোদামুনি এল।

একটা নকল কিছু যেন আবার পেয়েছে মরণচাঁদ, ভাবল বিমি। নকল কিন্তু স্নেহ দেয়ার, সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রক্ষা করার কিছু। এবার কি নিজের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাবে?

কথাটা বিমলা হঠাৎ শুনেছিল—শুনে ফেলেছিল। 'চোখ দুটো দ্যাখো না সোনা আর নীলে তৈরি। কালো নাকি সকলের মতো? তা নয়। মা ঠাকরুন বলি কি অমনি? তা দ্যাখো সেদিন যে বক্তিমা শুনলে চরনিশুন্দির হাটে নেতা মহারাজের, সেই কথা। আমাদের জেতের মধ্যে তো ভালো কিছু আছে। তাকে বাঁচায়ে বাঁচায়ে যাতে হবি। তারপর একটু থিতু হতে পারলি যাকে বাঁচায়ে রাখছি, সেই আবার জেতেক প্রাণ দিবে। তা ধরো আমার মা ঠাকরুন তো তেমন কিছু হবের পারে। চোখ দেখেই মনে হয় আমার তোমার ঘরের নয়'।

মরণচাঁদের মুখে তখন একটা প্রাচীন গাম্ভীর্যই দেখা দিয়েছিল। তার দল তখন চরনিশুন্দি চাকদা সড়কে ঝপাঝপ কোদাল মারছে। রাস্তা হবে। বিনিময়ে এই যাযাবর উদ্বাস্তু দল চাল পাবে আর সপ্তাহে নগদ আট আনা। নকল কিছুর উপর যেন মরণচাঁদের একটা টান আছে। নকল নাকি কথাটা?

বিমি চোখ নামাল। সোদামুনি যেন তার চোখ দু'টিকে আজ প্রথম দেখল। আর দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

কার চোখ কেন কেমন হবে? এমনই ছিল হয়তো কারো তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে।

সোদামুনি বলল, 'মাসি কয় ছেইলে কুড়ায়ে পাওয়া। পেত্তয় হয় না। ছেইলে কি গাছের ফল, কুড়ায়ে নিলে হ'লো? চুরিই। বুক কাঁপে, মা ঠাকরুন। ভালোবাসলেও পাপ তো। সোবাস কোথায় গেলো? আর তার দাদাও যদি যায়? তার আ'গে আমার মরণ নাও হবের পারে'।

গলাটা কাঁপল সোদামুনির।

বিমির বুক কেঁপে উঠল। ঠোঁটও যেন নড়ছে। সে অন্যমনস্ক হতে ভাবলে, এও কি মরণচাঁদের সেই কিছু যাকে রক্ষা করলে জাতি রক্ষা পাবে। ওদিকে দ্যাখো, বিশ বছর আগে কুলত্যাগিনী মাসির খবর রাখত। হয়তো তারই এক পোস্টকার্ড পেয়ে মাসি এখানে জুটেছিল।

'আচ্ছা সোদামুনি, এখন একটু কাজ করি, পরে একসময়ে কেমন'?

সোদামুনি চলে গেল।

তালা খুলে বিমি ঘরে ঢুকল। বেলা পড়ে গেছে। আজ আর কাজ হবে না। ভুবনবাবুর ঘরটাই বরং দেখে আসা যাক গোছানোর দরকার আছে কি না।

অবশ্য সোদামুনিকে সে বসতে বলতে পারত। কিন্তু একটা অব্যক্ত আবেগের চাইতে আর বেশি কী? একটা কষ্টই যেন।

টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল বিমি। আয়নাটা শোয়ানো ছিল। তুলে দিল। পিছন ফিরে বিছানাটায় চাদরটা একটু টানটোন করে দিল। একটা বেডকভার দরকার। আবার ফিরল। আয়নাটা তুলে নিল সে। চুলের কথা আর বোলো না। কারো কারো কত যত্ন করতে হয়, দু'একটি কয়েল তৈরি করতে। আর কপালের উপরে সিঁথি যেখানে ভাগ হয়েছে এখনও সেখানে দু'তিনটি কয়েলের মতো ঢেউ দেখা যায়। আয়নাটা নামিয়ে হাতের বালা দুটিকে দেখল। আয়নায় চোখ দুটো খানিকটা ধোঁয়াটে রঙের। ধোঁয়াটে নয় বোধ হয় ফিরোজা। নাকি সোনালি?

আবার আয়নার দিকে ফিরল সে।

চুল সে নিজের হাতেই কেটেছিল। কাটা মুশকিলও। একদিনে হয় না। পিঠ থেকে কুড়িয়ে বুকের

উপরে এনে সমান করা ডগাগুলো কেটে দিতে পেরে তার সাহস হয়েছিল। লম্বা চুল ছোট করতে করতে এক সপ্তাহের প্রসাধনে কাঁধের কাছে উঠেছিল চুল। আরও সোফিস্টিকেট। আর সাবান দিয়ে দিয়ে দু'বছরের ময়লা যেন সে দূর করেছিল ক্রমাগত এক সপ্তাহের চেষ্টায়। তারপর একদিন চিরুনি দিয়ে কপালের উপরে কয়েল করে দিল চুল। কত সহজে তা হল।

প্রথম মাসের মাইনে পেযে চারখানা শাড়ি কিনল সে। টেবিলে টুকিটাকি সাজানোর জিনিস দিয়ে সাজাল। আর সেটা আবিষ্কার। মনে হয়েছিল আবর্জনা রাখবার কিছু। কিন্তু কুলি লাগিয়ে একতলার পুরনো ভাঁড়ারের ময়লা সাফ করিয়ে সে যখন বলছে ওটাকেও বিদায় করো, কুলিরাই উল্টেপাল্টে দেখে বলেছিল ভালোই আছে। মরচে-পড়া বটে। কলাই উঠে গেছে এখানে ওখানে। ময়লা লেগে লেগে এমন হয়েছে হাত দিতে ঘৃণা করে। কিন্তু কুলিকেই বলেছিল সোডা কিনে নিয়ে আয়। গরম জল দেব। সাফ করে দে। চা বাগানের কুলি। বাথটাব। পুরনো। জায়গায় জায়গায় কলাই চ'টে যাওয়া। তা হলেও সাদা ধবধবে এনামেল করা বাথটাব। একদিন বাসায় ফিরে এক ডেকচি গরম জল করে নিয়েছিল। ঠাণ্ডায় গরমে মিশিয়ে কবোষ্ণ এক বাথটাব টইটুম্বুর জল। সেই বাথটাবে কাঠের বেড়ার কাঠের পাটাতনের স্নান ঘরে অবগাহন করেছিল। গাহন গাহন গাহন। জলকে দেখা। জলকে অনুভব করা। নিজেকে দেখা। নিজেকে অনুভব করা। প্রতীকী স্নান।

নীল নীল কুয়াশা। তোমার চোখ দুটি নীল—বলেছিল সৌম্য।

সাজানো সাজানো চা গাছ। বেলকুঁড়ির মতো সাদা সাদা ফুল। নীল কুয়াশা গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে শিশির হয়ে পড়ছে। যদিও দুপুরের কাছে গেল বেলা।

এদিকে কলের লাঙ্গল চলছে। লাল কলের লাঙ্গলের উপবে কালো টুপি পরা ড্রাইভার। বাদামি ঘাসে ঢাকা প্রান্তর উল্টে উল্টে কালো মাটি বেরিয়ে পড়ছে। ধোঁয়া উঠছে যেন উল্টে যাওয়া মাটি থেকে। কাছে গেলে গন্ধও পাওয়া যাবে।

বাঁ হাতটাকে সোজা মেলে দিয়ে সামনের দিকে সরিয়ে আনতে থাকলে যেদিকটা অনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয় সেখানেই চাষ হচ্ছে। হাতটাকে পিছন দিকে নিলে যেদিক সেখানে এক বুক উঁচু ঘাস। বাতাসে হিলহিল করে কাঁপে ঘাসের ডগা। জোর বাতাস হলে জলের মতো তরঙ্গে মাতামাতি করে ঘাসের বুক। সামনে ঘাসে ঢাকা লন। লনের পরেই ছোট্ট হসপিট্যালের ম্যাটার্নিটি ওআর্ডের কাচের জানালা। ডানদিকে প্রান্তর। একটা টিলা। বড় বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে গড়ানে সবুজ জমি টিলার দিকে উঠে গেছে। এই টিলার উপরে চার্চ। সাদা রঙ। কালো ক্রুশে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশকে পবিত্র করেছে। যাবার পথ ওদিক দিয়ে। হসপিট্যালের সামনের দিক ঘুরে বাগানের বাবুদের পাড়া, কলঘর, সাহেবপাড়া দিয়ে রাস্তা বয়ে টিলায়।

চোখ সরিয়ে আনতে আনতে হসপিট্যালের কাচের জানালা ছুঁয়ে প্রান্তর দিয়ে, লঘু পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কৃষ্ণচূড়া গাছটা। থলো থলো লাল ফুল। দুপুরের দমকা বাতাস গাছটার নিচেকার সুরকির পথের লাল ধুলো ওড়ায়। ঘূর্ণিপাক লাগে। বাতাসগুলো মাঝে মাঝে পাতা উড়িয়ে ঘূর্ণিপাক তৈরি করে। সর সর করে ঝরাপাতা টেনে নিয়ে কোনোদিন ঘাসের জঙ্গলের উপর দিয়ে তরঙ্গ তুলতে তুলতে চলে যায়। অন্য কখনও হসপিট্যালের কাচের জানালা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ঝন ঝন করে শব্দ তুলে থেমে দাঁড়ায়।

দুপুর হল। রবিবারের দুপুর। চার্চ থেকে ফিরে এসেছে। না, কেউ তাকে চার্চে যেতে বলেনি। সেই অনেকদিন আগেকার কন্‌ভেন্টের অভ্যাস। যখন সে আর তার সময় খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়নি সেই কনভেন্ট স্কুল। স্নান করেছে। শীতের শেষের টান বাতাসে। শুকিয়ে গেছে চুল ইতিমধ্যে। শাড়িটা উড়ছে বাতাসে। দোয়েল ছিল বোধ হয় সেটা। বাড়ির সামনে কাপড় মেলার দড়ির খোঁটার উপরে বসে শিস দিয়ে দিয়ে লেজ নাচাত।

কাঠের রেলিং। কাঠের তৈরি বাড়ি। পথ থেকে উঠে আসা কাঠের সিঁড়ি। পথ ঠিক নয়। লনই বরং। অবশ্য ঘাসগুলো সমান করে কাটা নয়। পাটাতনের কাঠ জায়গায় জায়গায় ফাঁক হয়ে গেছে। কিন্তু তখন বোধ হয় পাটাতনও রং করা ছিল। দেয়াল বোধ হয় সাদা কিংবা নীলাভ ছিল। আর রেলিং বোধ হয় বার্নিশ করা। পুরনো ব্যবহার করা আসবারের মতো বার্নিশ-চটা রঙ এখন। তা হোক। তাহলেও খটখটে। সাবান সোডা দিয়ে ধোয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই তিনমাসে চার-পাঁচবার ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে। খটখটে পরিষ্কার। এই ধোয়া শাড়িটার মতোই মাড়ে খসখস করছে। পরিচ্ছন্নতার স্বাদ।

মাঝে মাঝে চার্চ, তার অন্যদিক আছে। পোশাক বিধবার নয়, অথচ কপাল সাদা, হাত খালি, এ অবস্থায় হিন্দু আইবুড়ো মেয়ে ভাবলে মহিলাদের কৌতূহল তার বাংলোতে ঢুকত। অস্বাচ্ছন্দ্য এই পুরুষরা তাকে স্বাধীনা ভাবে।

কৃষ্ণচূড়া গাছের কয়েকটা পাতাকে গাছের মাথার উপরে পাক খাওযাচ্ছে বাতাস। অনেকটা দূরে তুলে নিয়েছিল। এখন আবার পাক খেয়ে নামছে।

রান্নার তাগাদা নেই। ছোট হাঁড়িটাতে মুগের ডাল ফুটছে। নিরামিষ ব্যবস্থা আজ করেছে সে।

'কে? আরে তুমি'!

'আজ এসেছি'।

'কোথায় গিয়েছিলে সৌম্য'?

'ক্যাম্পে'।

'তোমার দোকান'?

'চলল না। তুলে দিয়েছি'।

'বেশ করেছ। এখানে থাকো না তাহলে'।

'না, প্রায় তিনমাস'।

'আমার চাকরি ছ'মাসে পড়ল এবার। কী দেখছ? ছ'মাসে কতটা বদলেছি'?

'না, তোমার চুলের কয়েল'।

'আচ্ছা, সে এমন কিছু নয়। তোমার দাড়িগুলো এবার ভালো হয়েছে কিন্তু। কামালেই তোমাকে বুড়ো বুড়ো মনে হয়। আরে, বসবে এসো। গত মাসে নিলাম হয়েছে ম্যানেজারের বাংলোয়। অনেকেই অনেক কিছু এনেছে। আমি দু'খানা বেতের চেয়ার কিনেছি, কুশ্যনগুলো দ্যাখো'।

'ভালোই আছো তাহলে'?

'আহ্ সৌম্য, আমি তোমার কাছে, অজয়ের কাছে কৃতজ্ঞ'।

'এখন বাইরে দাঁড়িয়ে কী করছিলে'?

'রান্না'।

'রান্না'? হাসল সৌম্য। 'কৃষ্ণচূড়া দিয়ে নাকি'?

'রোদ এসে গায়ে পড়ল। সরে বোসো। মুগের ডাল চড়েছে, গন্ধ পাচ্ছ'?

'রোদটা ভালো লাগে। ডালটার গন্ধও মিষ্টি'?

'রান্না হোক। খেতে দেব। আচ্ছা সৌম্য, পরিষ্কার লাগছে না চারিদিক'?

'ঝরঝরে। ফিটফাট'।

'আর আমাকে? তা সে যাই হোক। তুমি আবার আজই ফিরবে নাকি'?

'তা বটে'।

বিমি ফিরে এসে বলল, 'দুজনের চালই ভিজিয়ে দিলাম'।

'আর কে? আমি? স্নান না করে'?

'জলও আছে'।

'সে হবে। তোমাকে ভালো দেখেই খুশি। লোকে তোমাকে চিনেও ফেলেছে। ওলেফার মেমসাহেবের কোআর্টার্স দেখিয়ে দিল'।

'ওলেফার। ওয়েলফেয়ার। তা কেউ কেউ মেমসাহেব বলে। বোধ হয় চুল দেখে'।

'চোখও'।

'সৌম্য—'

ভুবনবাবুর বাড়ির উঠোনে নামল বিমি। মাথার উপর দিয়ে অনেক উঁচুতে শ্লথগতিতে বিকেলের মেঘ চলে যাচ্ছে। একটা গতি যেন তাদেব দেখা যাচ্ছে আজ।

'আচ্ছা সৌম্য, চা বাগানের কাজে রিটায়ার করে মানুষ'?

'তা করে'।

'অবশ্য তার এখনও অনেক দেরি। পঞ্চান্নতে যদি আবার নড়তে হয় এখনও পঁচিশ বছর চাকরি থাকবে'।

'তা থাকবে'।

'বিদায় নেবার আগেই কিছু টাকা জমবে বোধ হয় আমাব। বাসাবদলের মতো তাই নিযে কোনো শহর টহরে একটা ছোটবাড়ি তুলে থাকা যাবে'।

'তুমি অনেক দূর ভবিষ্যৎ ভাবো'। সৌম্য বলল।

'আহ্ সৌম্য'। আড়মোড়া ভাঙল মাথার উপরে হাত তুলে বিমি। উঠে দাঁড়াল। 'জল ফুটে গেছে। চা আনি। এখন বিকেল হচ্ছে'।

আর—

'আচ্ছা সৌম্য, সুরথ এখনও আছে ক্যাম্পে'?

'কোথায় আর যাবে'?

'তা বটে। ছেলেকে তো সে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না'।

'মুশকিল'।

'আমার মনে হয়, সৌম্য, আমি এদিকেই আসছিলাম। বজ্রযোগিনী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম এই ঘরখানির জন্যই। এই সোয়েথয়েট চা বাগানেরই অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় কিছুই নয় এটা। কিন্তু তাতে আমার কী এসে যায়? আরামদায়ক, দ্যাখো, এর পরিচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতা। মানুষ কি জানে সে কোথায় গিয়ে থামবে? কিন্তু তার থেমে দাঁড়ানোর জায়গা তো আছেই। এই আমার সেই বিশ্রামের বিন্দু। এই কামনাই এতদিন করে এসেছি তা কি জানতাম'!

'তোমার উদ্বাস্তু মন এখানে পুনর্বাসন পেল'।

'তা বলতে পারো। বোসো, আলো জ্বেলে আনি। কী এমন তাড়াতাড়ি'?

'গাড়ি ছেড়ে দেবে'।

'নাই-বা গেলে আজ ক্যাম্পে'।

'থাকব কোথায়'?

'এই বাসায়'।

আলো জ্বালার আগেই বিদায় নিল সৌম্য। সন্ধ্যা তখন ফেরা পাখির ডাকে এগিয়ে আসছে। প্রান্তরে আলো আছে, বাড়িটার বারান্দায় অস্পষ্টতা। সৌম্য চলে যাচ্ছে। আলো পড়ছে তার গায়ে।

অন্ধকার হয়ে আসা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বিমি, দু'হাতে দু'হাত জড়ানো, আড়াআড়ি রাখা বুকের উপরে। চারিদিকে থমথমে প্রকৃতির উপরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। বাঁদিকের ঘাসগুলো নড়ছে। অস্পষ্ট খ্যাঁকখ্যাঁক করল কেউ। শেয়াল বোধ হয় খরগোশের খোঁজে। ডানদিকে গির্জাটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আলোটা বারান্দায় টেবিলের উপরে এনেছিল, কারণ সেখানে চা এসেছিল। আলোটা জ্বালল সে। নিঃসঙ্গ বাড়ির নীরব পরিবেশ। তৃপ্তি, তৃপ্তি। কী একটা জন্তু ভয় পেল। অন্য কোনো জন্তু শিকার ধরেছে। চাপা গরগর শব্দ। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যেন এই অরণ্যেরই কোন মার্জারী। অনেক আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্তির অনেক পথ চলার মার্জার দূরগত। নিঃসঙ্গ মার্জারী মৃদু মৃদু গর্জন করে অগ্রসর হচ্ছে বনপথে। কিছু ক্লান্ত অভিজ্ঞতায় পরিতৃপ্তির আলস্যে লাঙ্গুল দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করছে। নিঃসঙ্গ অন্ধকার। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অরণ্যের সে ঈশ্বরী।

কান্নার সময়ে যেমন হয় ঠোঁট দুটি যেন তেমনি হল এক মুহূর্তের জন্য বিমির।

কিছু একটা করা দরকার। অস্পষ্টভাবে তার মনে হল—দু'হাতে তুলে তুলে পাথরের উপরে পাথর সাজানো। ইটের উপর ইট। প্রাকাব কিংবা প্রাচীর। বই পড়বে আজ রাত্রিতে। এখন থেকে অবসর সময়ে সে বই-ই পড়বে।

হাতের বালাটার উপরে নজর পড়ল। এখন বিকেল পার হচ্ছে। উনুন ধরানো, লণ্ঠন পরিষ্কাব করা ; এসব কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে সে কাপড় পাল্টাবে আজ, ভুবনবাবুব ফিরবার আগেই। আর ক্ষতি কি যদি চুলও আঁচড়ায়? চুলগুলি এখন পিঠের উপরে নেমে এসেছে। খোপাতে জড়ানো যায়।

একটা বাঁধ দেয়া দরকার কোথাও।

মালতী এল।

'আরে এসো, এসো'।

'এত ভালোবেসে ডাকো, বউদি'।

'আসোই না আজকাল দুপুরে। কী করে বেড়াও'?

'আজকাল আমিও তাই ভাবছি'।

'এর চাইতে আমাদের নারীমঙ্গল সমিতি ছিল ভালো। চলো আবাব তাই করি। কাজ কাজ কাজ। কিছু ভাবব না'। বলল বিমি।

'মন্দ নয়। তা যদি পারা যায়। এমন ক্লান্তি এই বর্তমানের হবে, ভবিষ্যতেব কথা মনে আসবে না'।

'আর অতীতেরও'। বলল বিমি।

'ভেবে কিছু কূল করা যায় না, বউদি। ওদের শতকরা আশিজন সই করেছে দরখাস্তে যাব না বলে। কী হবে'?

দুঃখ হল বিমলার এই ভ্রান্ত মেয়েটির জন্য।

বলল সে, 'কেন আর ভাবি বলো'?

'না ভেবে পাগল হয়ে যেতে হবে। মজার কথা শোনো' বলল মালতী, 'অজয়ের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে। সাইকেলে আসছিল শহর থেকে। আমাকে দেখেই সাইকেল থেকে নামল। বলল, মালতী না তোমার নাম? তা তুমি আমার উপরে রাগ করেছ ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে হট্টগোল করতে দিইনি বলে। আমি নিজে কিছুই বুঝি না। এরা দেশ ছেড়ে এসেছিল কেন? ধর্মের জন্য? এরা যদি মুসলমান হতো, ধর্মান্তরই! দেশ না ছেড়ে ধর্ম? এখানে এসে ধর্মে হিন্দু থাকলেও আর কী

কী রাখতে পেরেছে? আর দণ্ডকবনে গেলে তো বাঙালিআনাও গেলো। এখন বলো দেখি বাঙালি আনা বড় কিংবা ধর্ম? কিংবা এ দুয়ের চাইতেও আর কিছু বড় আছে? কী জানি'।

'অজয় বলল এসব'?

'হ্যাঁ পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো খেতে খেতে'।

'প্রশ্নটা কঠিন'।

'কিন্তু অজয় আমাকে কোণঠাসাও করেছিল একটা প্রস্তাব দিয়ে'।

'কী প্রস্তাব? বিয়ের নয় তো'?

'তুমি রসিকতাও করো দেখছি। হাসল মালতী, 'তা নয়। বলল তোমাদের দলের কর্তারাও যেন কী রকম। এই তো হলুদমোহন ক্যাম্পে প্রায় পনেরোটি পরিবার আছে। তারা বলছে, কেটে ফেললেও যাবে না বাংলার বাইরে। তোমরা সকলে মিলে এই পনেরোটির ব্যবস্থা করে দাও না। এই শহরেই তা পারা যায়'।

'তোমার মতো কাজের লোক লাগলে অসম্ভব সাধন করতে পাবে'।

'কিছুই পারি না, বউদি'।

'এমন হতাশ হলে কেন'?

খানিকটা নীরবতা।

'লতা বউদির কথা আজ শুনলাম'। মালতী আবার বলল।

'কে লতা'?

এই বলে বিমি ভাবল সেও যে ক্যাম্পে ছিল এ কথা প্রকাশ পেলে ক্ষতি কী? আলাপে সুবিধাই হয় অন্তত। আর গোপন করে রাখার সতর্কতা থেকে দূবে সরে এসে সহজও হওয়া। কিন্তু তাতে কি অতীত বর্তমান এক হয়ে যাবে না? প্রতিরোধটাই ধ্বসে পড়বে।

'মোহিতবাবু নামে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী। ক্যাম্পে থাকত। পালিয়ে গেছে সে। বলো এই যদি গেলো, হিন্দুআনি, বাঙালিআনা কোনটির মূল্য থাকল'?

বিমি ভাবল—লতাব কথা হয়তো ঠিক বুঝতে পারেনি মালতী। কিন্তু লতার মতো ঘটনা অন্য অনেক ঘটে থাকবে। সে রকম অন্য অনেক লতার কথা মনে করলে তোলা যায় বটে ও প্রশ্নটা। সত্যি কিছু কি অবশিষ্ট থাকে? বলবে তবু মানুষ থাকে? কিন্তু তার চাইতে অস্পষ্ট আর কী? কী কী করার স্বাধীনতা আছে মানুষের? কোন পথে চললে সে মানুষ হয়ে ওঠে, আর কোথায় পৌছালে সে ভ্রষ্ট?

'উঠছ কেন, মালতী। বোসো, চা করি। উঠে গেলেই তো নানা রাজ্যের কথা ভাবতে শুরু করবে'।

'তা হয়। কিন্তু বউদি এখন একবার আমাকে যেতেই হবে'।

'না, না, বোসো চা করি'।

'না, বউদি, কয়েকজন লোক আসবে'।

মালতী চলে গেলো।

আর এটাও তো একঘেয়েই, এই মালতী আর সোদামুনির আসা। এত আগ্রহ কেন দেখাল সে? যাবেই যখন কেন ধরে রাখতে হবে? অনুরোধের তো একটা সীমা আছে।

উঠে দাঁড়াল বিমি। উনুনে আঁচ দিল। ঘরগুলো ঝাঁট দিল। গা ধোয়ার ভঙ্গিতে গামছাটা কাঁধে ফেলে কী ভেবে নিল। খোপা বাঁধল আলগা করে। হাত পা ধুলো। কাপড় পাল্টাল। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবল।

ছি! আবার আর একদিকে বাড়াবাড়ি করতে যাচ্ছে। কী ভাববে ভুবনবাবু? নাই-বা ভাবল।

ভয় কেন? একা থাকা কি সত্যি ভয়ের ব্যাপার হতে পারে? এ কি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করা? আর এখন চুল পেকে উঠছে। কানের দু-পাশেই দু'তিনটে কবে স্পষ্ট হয়ে আছে। হয়তো নীরব রোদনের মতো বলা যায়—অকালে। তাহলেও বযসও অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত হতে পারে। এ বয়সে আর কোথায় যাবে সে?

সৌম্যর বযসই-বা কত হল এখন, কিংবা ভুবনবাবুর? এ বাড়ির বয়সও প্রায় তিন বছর হযে গেল। সেই বন্যা হয়েছিল '৫৬-র মাঝামাঝি। কী মেঘ হয়েছিল আকাশে! কী কালো মেঘ! কিন্তু বন্যা যখন শুরু হল আকাশ তখন সাদা ধবধব করছে।

আকাশ সব জায়গাতে কখনও কখনও ধবধবে সাদা হয়। সেই সাদা আকাশে বন্যার জলের মতো পাটকিলে মেঘও ছুটোছুটি করে।

আর সাদা মেঘই নয় শুধু, এখানেও নীল কুযাশা দেখা যায। বোজ নয়, সোয়েথয়েট বাগানের মতো। কিন্তু বন্যার বছরে শীতও যেন এদিকে বেশি পড়েছিল অন্যান্য বাবেব চাইতে। আর দু'একদিন বড়রাস্তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হতো বাস্তাটা হঠাৎ ভেঙে গেছে নীল নীল বন্যার ভাঙনে। কুয়াশার কথা মনে হতে পারে। তার আগে মনে হতো বাস্তাটাব ওই প্রান্তে গেলে হঠাৎ পা পিছলে যেতে পারে তারপর তলিয়ে যেতে হবে কত দূব কোথায় কে জানে।

'এ কী সৌম্য! কখন এলে'? বলল বিমি।

'সকালে'।

'ভালো খবব সব? তাবপর—কেমন সুন্দব কুয়াশা, না'?

'দরকারের কথা আছে'।

বিমি ভাবল যদি টাকা চায সৌম্য তা অবশ্যই দিতে পারি। সৌম্যর থেকেই তো, তাব উদ্যোগেই এই টাকা। এই চা বাগানে অন্য অনেকে তাব চাইতে অনেক বেশি মাইনে পায। কিন্তু সে যা পায় তাই তার কাছে যথেষ্ট। আর সৌম্যকে অদেয় কী আছে?

'হবে। স্নানাহারের ব্যবস্থা করি। বিকেলেব আগে তো গাড়ি নেই'।

'করো'।

টেবিলের এপারে সে, ওপারে সৌম্য। খেতে খেতেই কথা হল।

'কিছু করার কথা ভাবছ? এর মানে অবশ্য এই নয়, তোমার জন্য আমি খুব ভাবছি। এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এত স্বস্তি পাচ্ছি, তুমি কেন পাবে না'?

'কিছু ভাবছি না। কিছু না করা মন্দ নয়। দোকানটাকে বিদায কবে দিয়ে বেশ হালকা লাগছে'।

'মিটমিট করে হাসছ তুমি। কিছু একটা নিশ্চয করো'।

'করি, রাজনীতি'।

'সে কি'?

কুয়াশা নয়, নীল আলো। স্বপ্নে তোমার নিবাবরণ দেহেব চাবিদিকে যে আলো জড়িয়ে যেতে পাবে। তোমার হৃৎপিণ্ডটায় যে আলো সঞ্চারিত হতে পারে। কী শক্তি, কী জ্যোতি।

'আজও এত সকালেই'?

'তুমি-বা কী করে টের পেলে আমি আসব। এখন তোমার তো ডিউটিতে থাকবারই কথা'।

'হসপিট্যালের জানলা থেকে মনে হল, তোমাকে দেখলাম। চা হয়েছে খাওয়া? বোসো খাবার বানাই'।

'ডিউটি নেই'।

'ছুটি নিয়ে এসেছি, এ বেলার'।

'রোজই যদি আসি, রোজই ছুটি নেবে নাকি'?

'না। আজ তুমি আসবে, তা কাল সন্ধ্যাতেই তুমি চলে যেতেই মনে হয়েছিল। তুমি এত ভাবো! সত্যের এত কাছে তোমার ভাবনা, এতে শুধু অবাকই হইনি। অবাক হলাম ভেবে কী করে লুকিয়ে রাখো'।

'তাহলে তুমি রাজি আছ'।

'নিশ্চয়। আমার মনে হয়েছে সেটাই একটা করার মতো কিছু যা তুমি বলছ'।

'তাহলে বলি। কলঘরের বড়ুয়াসাহেব আমাদের লোক। গুদামের শ্রীমন্তবাবুও। এদিকে তুমি। তিনমাসে পাল্টা ইউনিয়ন খাড়া করতে হবে'।

'হবে, হয়ে যাবে'।

'খুব সহজ কিন্তু নয়'।

কাজে যাবার পোশাক, বনেট খুলে এসে স্টোভ জ্বালাল বিমি।

সেদিন বড়ুয়া আর শ্রীমন্তও এসেছিল।

'বনেদি ইউনিয়ন এবার ভেঙে পড়বে। সে ইউনিয়নের শ্রমিকেরা যে এতদিন নিজেদের প্রাপ্য পায়নি তা বুঝবে'।

'কিন্তু শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ...

'তা একটু হবে। বনেদি ইউনিয়ন তো কাউকে কাউকে এখনও মোহমুগ্ধ করে রেখেছে'।

অনেক আলাপ, অনেক পরামর্শ। রাত দশটায় শ্রীমন্ত আর বড়ুয়া গেল।

'এখন'? বলল সৌম্য।

'রান্না করি'।

'তারপর'?

'এখানেই থাকবে'।

আহাব শেষে শোবার ঘবে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আবাব আলোচনা।

'রাত একটা হল'।

'হঁ। তোমার হাই উঠছে। পাশের ঘরে বিছানা করে রেখেছি'।

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে'। সৌম্য বলল।

'যাও ঘুমোও গে। মশারিটা হসপিট্যাল থেকে চেয়ে এনেছি। একটু নিচু। তা এক রাত কষ্ট করে চলে যাবে'।

শুধু বাঁচা নয়। প্রাণ বিকিরণ করার মতো তারুণ্য ফিরে পাওয়া যেন মনের। যেন বলা যাবে, এত বেদনা, এত কষ্ট, সার্থকতার এই পথে এসে দাঁড়িয়ে সবই তপস্যার মতো মূল্যবান হয়ে উঠবে। কত আশা মানুষের জন্য। কত আশা এই পৃথিবীব। এই পৃথিবী যেন আবার নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে। এতদিন শুধু কিছু সময় নষ্ট হয়েছে বই তো নয়। তাকেই-বা ব্যর্থ বলা হবে কেন? অভিজ্ঞতারই বা কী কম মূল্য?

কিন্তু যত না আলো ততখানিই ছায়া। যতটুকু আকর্ষণ ততটুকুই নিস্পৃহতা। এক ধূসর দিগন্তের দিকে বিস্তৃত বালুরাশিতে ক্লান্ত পা দু'খানাকে টেনে টেনে চলা। ঢোক গিলল বিমি। ওপারে হলুদমোহন ক্যাম্প। এপারে উদ্বাস্তুদের পল্লী। ভুবনবাবু আসবে এখনই। আর সে তো বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

আর দু দিন। খবরটা এখন সকলেই জানে। কীসে যাবে?

ইভ্যাকুয়েশন কাকে বলে জানো? সেবার রেঙ্গুনে হয়েছিল। যত রকম যানবাহন আছে সব। যে কোনো জিনিস হলেই তা কাজে লাগবে, চাকা থাকলেই হল। ঠেলাগাড়ি তো গাড়িই বটে, হাসপাতালের চাকা লাগানো ভাঙা খাটও যেন গতির আধার হয়ে উঠবে। অথচ এই বেয়াড়া রকমের বসিকতায় হেসে উঠবার মতো মনের অবস্থা থাকে না, বরং যেন করণীয়ের ইঙ্গিত মনে করে অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে। আর নানা আকারের চাকার সেই কর্কশ ভাষণ উৎক্রোশ চিৎকারের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে নানাদিক।

এখানে আর তেমন কী জ্বলবে?

কিন্তু এসব চিন্তা করার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকাই উচিত মানুষের। মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে যাওয়ার কথা অনেকদিন থেকেই। তা ছাড়া পুনর্বাসন অফিসে ঋণের কিস্তিটাও পৌঁছে দেয়া যায়। ভুবনবাবু একা মানুষ। ওদিকে টিউশানি ধবেছে। পার্টনার হতে হলে খানিকটা কাজ বিমিকেও কবতে হবে বইকি।

একটা নতুন ধরনের শব্দ। এপাশে ওপাশে তাকাল সে। বাঁয়ের দিকেই। নতুন বাড়ির ছেলেটি। চাকা চলছে। চাকাব সঙ্গে সঙ্গে সাঁই সাঁই কবে দৌড়ে আসছে। ওদের বাড়িটা সামনেই। বোধ হয় বাড়ি পর্যন্তই ওর দৌড়ের সীমা এদিকের।

বাড়িটার দিকে চোখ পড়ল বিমির। দড়ি টাঙিযে ধোয়া কাপড় জামা মেলে দেয়া হযেছে। অনেকটা বোদ পায় বাড়িটা। বেশ খানিকটা ঝকঝকে রোদ।

খুদে খুদে নাক দিযে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে ছেলেটি। হাঁপিয়ে উঠছে। কিন্তু থামল না তো' বোধ হয় বিমিকে প্রতিযোগী কল্পনা কবে নিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, কিন্তু এত হাঁপিযে পড়েছে, তা পারছে না। কিংবা বোধ হয় চাকাটাকে নিজেব কায়দায় রেখে যে কোনো গতিতে চলতে পারার পবীক্ষা করছে। ছেলেটির পোশাক পরিচ্ছদে কি অযত্নের ভাব? আজ হয়তো ওদের বাড়িতে কাপড় কাচার দিন। যা তা একটা পরিয়ে দিয়ে ভালোগুলো সব কেচে দিয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে এই দুরন্ত ছেলেটি দু'দণ্ডেই সব ময়লা করে ফেলে আর মাকেও পরোয়া করে না। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়। পরিশ্রমে মুখ লাল হযে উঠেছে।

কিন্তু ছেলেটি আবার পিছিয়ে পড়ল। চাকা ঘুবিয়ে আবার ছুটে চলল। ওদের বাড়িটা পার হলেই খোলা জমিটুকু। তাহলে এ জমিরও মালিক আছে? চাষ হয়েছে যেন? সবটা নয়। যেখানে জমিটা খুব নিচু সেখানে বোধ হয় এখনও জল আছে। কচুরিপানার জঙ্গলও।

এরপরেই গুদাম। টিনের দরজাটা আজ খোলা। একটা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে মাল নিচ্ছে। এ রকম সব গাড়িই দূরে দূরে নিয়ে যায় পণ্য।

আর কিছু এগিয়ে গুদামটার উল্টো দিকে বস্তি শুরু। এই বস্তির মধ্যেই পথের ধারে পশ্চিমা মুদির র‍্যাশানের দোকান। একটা ধানভানার কল বসিয়েছে যেন। কলটা ঝক ঝক করে চলছে। দোকানটা বাড়ছে তাহলে।

এখন কোন পথে যাবে? সম্মুখে বেশ খানিকটা ভিড়। তাই স্বাভাবিক। এই পথটা ধরে যতই এগোবে অনেক পথ দু'দিক থেকে এসে মিশতে থাকবে। ক্রমশ ভিড়ও বাড়বে। একেবাবে হালে হয়েছে এমন কাঁচাপথ যেমন আছে, তেমনি আছে একেবারে সেকেলে লাল ধুলোর পথ। আবার

কালো পিচঢালা শাখাও আছে এই বড় কালো পিচের প্রবাহের। নানা রকমের প্রয়োজনে নানা পথ।

লাল ধুলোর পথগুলিতে চলতে গেলে একটা অভিনব অনুভূতি হয় যদি অনুভব করার মতো মনের অবস্থা থাকে। ধুলো, আর কোথাও কোথাও লাল ইটের টুকরো বেরিয়ে আছে। চলতে কষ্ট হয়। গাড়ি টালমাটাল করে। কিন্তু মনে হয় যেন পুরনো কোন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দিয়ে চলেছি। আর এসব পথ দু-চারশো বছরের পুরনো না হোক, যারা তৈরি করেছিল তাদের চিন্তা-ভাবনা সেকেলে ছিল। পথের ধারে ধারে গাছ। গুঁড়িগুলো পাকানো পাকানো। এখানে সেখানে অর্বুদ। বড় বড় খোদল। পথের ধুলোয় পাতাগুলো ধূসর। তবু ছায়া দেয়ার জন্যই গাছ। কালো পথের ধারে ধারে লোহার তাবে বাঁধা লোহার খুঁটি শুধু। চোখে পড়া মাত্র ঝলসানির কথাই মনে আসে।

আজ যে ঋণের কিস্তি দেয়ার একটা তারিখ তা বোধ হয় ভুবনবাবু ভুলেই গেছে। ভুলে যাওয়া স্বাভাবিকও। আজ সকালে বারান্দায় রায়মশাই এবং অন্য কেউ কেউ ভুবনবাবুকে নিয়ে বেশ একটা আড্ডা জমিয়েছিল। আলোচ্য বিষয় রাজনীতি। দু'একটা কথা ভিতরেও ভেসে আসছিল। মনে হয় রাজনীতি যেন একটা নদী যা প্রবাহিত হচ্ছে। বাঁধ ভেঙে নতুন কোন পথে যাবে—তাই যেন জল্পনার শেষ নেই। তখনই মনে হয়েছিল ভুবনবাবু হয়তো ভুলে যাবে। তা গেলেই বা। গলা শুনে মনে হচ্ছে সে একটু স্বাভাবিক হয়েই কথা বলছে। আলাপ থেকে এটাও বোঝা যায় ভুবনবাবু ক্রমশ এ পাড়ার বিশিষ্ট একজন হয়ে উঠছে। বাইবে ভুবনবাবু। আব ভিতবে সে।

জীবনের উপমাই যেন। ভিতরে শূন্যতা বাইরে যতই কোলাহল থাক। একটা শূন্যতা, বুক চলতে চলতে হঠাৎ ধক করে থেমে গিয়ে আবার চলার আগে যে শূন্যতা অনুভব হয়। এই উপমাটা তখনও মনে জাগেনি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তখনও পড়েছিল, এখনও পড়ল।

কালো রাজপথ ছেড়ে দিয়ে এ পথেই এসে পড়েছে সে তাহলে। এ রকম একটা পথের ধারেই সেই বাগানবাড়িটার ধ্বংসাবশেষ ছিল। সেখানে অন্তত সাতদিন ছিল মরণচাঁদের দল। পরিত্যক্ত হাঁড়িকুড়ি দেখে যেমন, নুনধরা চুনখসা দেয়ালের গায়ে কালির দাগ দেখেও তেমন বোঝা গিয়েছিল তাদের আগেও এমন অনেক দল আশ্রয় নিয়েছে। সামনের এই জঙ্গলটার আড়ালেই বোধ হয় সেই বাগানবাড়ি। এটা বোধ হয় পিছন দিক। তাহলে সে তার পল্লী থেকে অনেকটা দূরেই এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। প্রায় সাতদিন লেগেছিল এই বাগান থেকে ক্যাম্পে পৌছাতে। এক ক্রোশ কিন্তু সাতদিনের পথ। কত ঘটনাই ঘটতে পারে, ঘটেছিলও সেই সাত দিনে। বিন্দা হারিয়ে গিয়েছিল একদিন। শ্রীকান্ত অশ্রাব্য কুৎসিত ভাষায় মরণচাঁদকে তিরস্কার করতে শুরু করেছিল। তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য মরণচাঁদকেই দায়ী কবেছিল সে। মারতে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। দু'দিন পরে বিন্দা ফিরেছিল। গায়ে জ্বর, চোখ লাল। ডাক্তার কোথায়? মাথায় দেয়ার জলও নেই। গ্রীষ্মই বোধ হয় তখন। স্নান নেই চারদিন। কিন্তু মরণচাঁদ ডেরা ভাঙেনি। কোথায় যাব? শহুরে এলা কেন? থাক বইসে। ক্যাম্পো? তা দ্যাখো ঘুরে ফিরে কী সুখ সেখানে। তার বাদে যাচাই করো। ঢুকলে কি আর বেরুবা। এক সন্ধ্যায় একজন লোক এল। প্রথমে সে ঘুরে ঘরে দেখল। শেয়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করল। প্রায় মাঝরাতে সে এল সোজাসুজি প্রস্তাব নিয়ে। আভাস ইঙ্গিতে নয়, সুস্পষ্ট প্রস্তাব, টাকার অঙ্কসমেত। শহর, শহরের কাছে এসে পড়েছি। সামাল, সামাল। পাকের টান লেগেছে। চোপরাও হারামজাদিরা, নড়বি না। মরণচাঁদ উঠে দাঁড়াল। বুক ওঠা-পড়া করে কেন তোমার? এইবার? ভয়? চোখে জল কেন, মৃত্যু? হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণচাঁদ লোকটার উপরে।

বিমি হাঁটতে লাগল।

এক মুহূর্তেই মরণচাঁদকে দুমড়ে-মুচড়ে রেখে লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে চলে গিয়েছিল। পরাজয়। দলপতির পরাজয়ের পরেই ক্যাম্প। মাথা নিচু করে ক্যাম্পের দিকে চলেছিল যেন দলটা। মরণচাঁদকে

কেউ আর পথের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে হারজিতের কোনো সম্বন্ধ নেই। এই পৃথিবীতে, বিমি, এটাই বহুবার ঘটেছে, যাকে ন্যায় বলো তারই পরাজয়। পরাজয়ই হয় জীবনে। প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। জীবন ফাঁকা হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল বিমলা। আর এবার স্মরণচাঁদের দলও থাকবে না। এই দণ্ডকারণ্যের পথে।

একটা বুড়ো গোরু ধীরে ধীরে চলছে। হাড় জিরজিরে। এত ধীরে ধীরে চলছে সেটা যেন চলার জাবর কাটছে। অনেক চলেছে সারা জীবন। এবার জাবর কাটতে থাকবে। একটা বড় ঘুমের আগে যেন তন্দ্রা এসেছে তার আলস্যের।

কোনো কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা এই, যে সে কিছুতেই আজ চিন্তা করবে না।

পথের বাঁ দিকেই চোখ পড়ল। পথটা পরিচিতই বোধ হচ্ছে। এ গাছটাও হয়তো তা হবে। গাঁট গাঁট বাঁকা-তেড়া, মরা গুঁড়ির গা থেকে সরু সরু কয়েকটা ডাল বেরিয়েছে। শুকনো কাঠ কাঠ। কাঁটাও দেখছি সারা গায়ে। গুটিকয়েক পাতা আছে গাছে, তাও সরু ডালগুলির ডগার কাছে। আশ্চর্য, ফুল! লাল থোকা থোকা ফুল। চার পাঁচটি থোকা তো বটেই। সরু ডালগুলো যেন ফুল ক'টিকে তুলে ধরে আছে। যেন এ গাছের নয়। ধার করে আনা। কাঠি কাঠি ডালগুলোর মাথায় পরিয়ে দেয়া।

বর্ষায় এ রকম হয়। অনেক উদ্ভিদ সাড়া দেয়। কিন্তু এখন বর্ষা কোথায়? ফাল্গুন যায় যায়। জরাজীর্ণ ব্যর্থ আর একটি বৎসর প্রায় শেষ হয়ে এল। এক ফোঁটা বৃষ্টিও নেই। গাছটার গোড়া থেকে মাঝামাঝি অবধি সুরকির রং লাগানো। ধুলোয় হয়েছে। কিন্তু এ ফুল প্রসবের প্রাণ কোথায় পেল? এই নতুন হয়ে ওঠা?

কী কববে সে?

নারী শিল্প সমিতির অফিসে যাওয়া যায়। বেলা পাঁচটা অবধি কাটিয়ে দেয়া যায় সেখানে। ফর্‌ম্‌ নিতেই এসেছি, তাই ভাববে। তা ছাড়া নারীদের সমস্যা আছে, তুলে ধরলেই হল।

মাদার বোধ হয় গাছটা। ওর অত্যন্ত ভালো একটা নাম আছে, মন্দার।

সোদামুনি আর অবিমন্যুর মতোই। তাহলে বলতে হয় মান্দারের মতোই তারা চ্যুত, স্খলিত। মন্দার যা নাকি স্বর্গের!

কিন্তু কী সুন্দর যে লাগল আজ ফুল ক'টিকে!

আর সোদামুনি বলেছিল, অমন শক্ত আঁশ আঁশ যার চামড়া, অমন নরম ছেলে তার বুকে জন্মায় না। এই মন্দারের কাছে ডেকে এনে দেখাতে হয় সোদামুনিকে। বসন্ত এসেছে তা কি বুঝতে পারছ? কিন্তু ফুল ফোটানোর সব ক'টা ঋতুকে পার হয়ে হয়ে এসে এই ক্ষণস্থায়ী চপলতার কাছে আজ ক্ষণেকের জন্য ধরা দিল এই মাদার। কোকিলের ডাক নেই, শিহরিত হয়ে ওঠার মতো পল্লব নেই, তবু যে ফুল ফুটল, কী রক্তিম তারুণ্য তার!

সোদামুনির মাসির কথা তুলে লাভ নেই। তার মাসির কথা সে-ই সবচাইতে ভালো জানবে। তবে তার যুক্তিটাকে এই মাদারের তুলনায় আর জোরদার বলে মনে হয় না। অন্য কারো কারো জীবনেও এ রকম কিছু ঘটতে পারে।

বিমি ঠিক যেন এখানে পৌছুতে চায়নি। যেন এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজবে।

'এদিকে আসুন, এদিকে দরজা। চিনতে পারছিলেন না তো? আমরা আপনাব চলা দেখেই আন্দাজ করেছিলাম'। নারী শিল্প সমিতির সভ্যারা বলল।

'তারপর, কী মনে করে'?

'এলাম'। বলল বিমি।

'ভালোই করেছেন। দেখুন মেয়েরা কেমন সুন্দর হাতের কাজ করেছে। বাটিকের কাজের কতগুলো নকশা একেবারে নিজস্ব আমাদের। আর শুধু শখের জিনিসই নয়। বেতের চেয়ার টেবিলও বিক্রি হচ্ছে বাজারে। এক কথায় পুনর্বাসন'।

বিমি চোখ তুলল। মালতীরই যেন বয়োবৃদ্ধ সংস্করণ। অনেক দিন দেখা লোক। তুলনাটা আজ মনে পড়ে গেল। শুধু এর কপালে দগদগ করছে সিঁদুর। কালো মোটা চশমার নিচে গাল দুটিতে অনেক ভাঁজ।

'তারপর, আপনাদের পাড়াতেই তো হলুদমোহন ক্যাম্প। কবে যাচ্ছে ওরা? কালই'? সমিতিপ্রধানা খুশি মুখে প্রশ্ন করলেন।

'যাবে'। বলল বিমি।

'তা ভালোই হবে। মানুষের অসাধ্য কী? আর নতুন মাটি তো। কী জন্যে এসেছেন, বলুন এবার'।

'দেখা শোনা। আর কতগুলি ফর্ম্-এর দরকার আছে। দর্জির কাজ, বেতের কাজ শিখবে'।

'ফর্ম্? শোভা, সব রকমের ফর্ম্ কিছু কিছু আনো তো। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আপনার মত কী'?

'আমার? আমার মতের কী দাম? ভালোই হবে হয়তো'।

'ওটা কি আর কাজের কথা হল। আলোচনায় আসছেন না যেন'।

'আমাদের বয়সে...

শিল্পসমিতিব কর্ত্রী খপ করে চেপে ধরল বিমিকেই যেন। 'বয়স? কী বয়স আপনার? বত্রিশ-তেত্রিশ? আমার ছেচল্লিশ হল। বুঝতে পারেন? মানুষ যদি উন্নতির চেষ্টা না করে...

বিমি যখন বেরিয়ে এল সমিতির দপ্তর থেকে তখন প্রায় তিনটে হয়েছে বেলা, দপ্তরের ঘড়িতে। হাঁটতে লাগল বিমি। কিছু দূরে গিয়ে সমিতির দপ্তর থেকে আনা ফর্ম্গুলো তার হাত থেকে পড়ে গেল। পড়ে যেতে দিল সে? কিংবা তার মন তখন অন্যদিকে সরে গিয়েছে। সত্যি কেউ থাকবে এখানে?

মানুষ কি নতুন কিছু করতে পারে? দণ্ডকারণ্য। বিশ্বাস করার চেষ্টা করল বিমি, মানুষ সেখানে নতুন হয়ে উঠবে। বিশ্বাসটাকে স্থির হতে দিল না যেন কেউ। মানুষ না হয় ফুল ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু মানুষ কি মাদার গাছ? গত বছরের ফুলকে মাদার ভুলতে পারে। পারো তুমি?

একটা অদ্ভুত কিছু করে বসল বিমি। আচমকা ঘটল। মনের অনেক গভীর তল থেকে কিংবা অনেক দূরের স্মৃতি থেকে কথা উঠতেই, সে যেন অন্য সবকিছু বিস্মৃত হয়ে এই জেগে ওঠার ব্যাপারটাতেই কৌতুক বোধ করল। একলিজিয়াস্ট? তাই হবে। দেয়ার্স নাথিং নিউ আন্ডার দা সান্। কোথায় নতুন পাবে? মানুষ কি ভুলতে পারে?

নতুন? মানুষের ইতিহাসে কি নতুন হয়ে ওঠার কোনো নজিরই আছে?

বিমির মনে হল কোথায় যেন মানুষের পুনরুত্থানের কথা আছে। কে উঠেছে? সার্থকভাবে ভালোবাসা, অদ্বেষ? তাই বোধ হয়, সেটাই একমাত্র নজির। ওরা জানে না কী করছে ওরা! ক্ষমা করো!

দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিমির।

আর হাঁটবে না সে। অকারণেই যেন সে নিজেকে কষ্ট দিল। দুপুরের রোদে রোদে ঘুরে বেড়ানোই সার হল। পিপাসা পেয়েছে। সেটা এমন কিছু নয়। কিছুক্ষণ পরে আর মনে থাকে না। কিন্তু কী লাভ এই অকারণে ঘুরে বেড়িয়ে? সামনের সোজা পথটা ধরে গেলে পুনর্বাসন দপ্তর। কাছেই একটা বট গাছ আছে গোড়ায় বাঁধানো চাতাল। সেখানে বসা যায়। বসলে উদ্বাস্তু মনে করবে

লোকে। প্রশ্ন করে না। উদ্বাস্তুরাই বসে।

অত গাড়ি কেন ওখানে? বিমি বিস্মিত হল। পুনর্বাসন দপ্তরই তো?

চার পাঁচখানা বড় বড় বাস। কয়েকখানা ট্রাকও। কোনটি ধুচ্ছে, কোনটি মেরামত করছে। হুস হুস করে হোসের জল ছিটিয়ে, ঠুং ঠাং করে পিটেপুটে। যন্ত্র পরীক্ষাও চলেছে। আয়োজন উদ্যোগের মতো ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাজ করছে। মেরামত কারখানাই নাকি হয়েছে ওটা। অনেক ছুটোছুটি করে এসেছে বাসগুলো। তাই মেজে ঘষে ধুয়ে পুঁছে যত্ন আত্তি করে ওদের যেন তোয়াজ করা হচ্ছে।

উদ্বাস্তুদের জায়গাতেই বসেছে বিমি। তেমনি করেই শহরের দৃশ্যগুলো সে দেখতে লাগল যেন উদাস কৌতূহল নিয়ে।

হঠাৎ মনে এল কথাটা। তাই নাকি? তাই নাকি? এ গাড়িগুলোতে করেই কি ওদের সরানো হবে। একটা প্রস্তুতি যেন। যুদ্ধ কথাটা এল তার মনে। এক যুদ্ধের ক্লান্ত সৈনিক যেন এই গাড়িগুলি। সম্মুখে আর এক যুদ্ধের জন্য এরা প্রস্তুত হচ্ছে। যুদ্ধ, যুদ্ধ। ওরা কি হৈ চৈ করবে, বাধা দেবে! মালতীর দল!

অবাক হয়ে চেয়ে রইল বিমি।

এই ভয়ংকর লম্বা লম্বা বাসগুলো যেন তাকে—কথাটা ঠিক ঠাহব হচ্ছে না, অনুভব করা যাচ্ছে: কথাটা কি টান, প্রভাব?—টানছে?—যেন তারা প্রাগৈতিহাসিক শ্বাপদ, আর তাদের প্রবাদোক্ত আকর্ষণী শক্তিও আছে। ওরা কি পোষ মেনেছে, কখনও পোষ মানবে?

একটা মোটর গেল হঠাৎ বিমির সামনে দিয়ে। এক মুহূর্তের জন্য বাস ও ট্রাকগুলো আড়ালে পড়ে গেল।

এবার বিমি ভাবল : ওগুলিকে আনাই স্বাভাবিক। এদিকে ছোট ট্রেন। হয়তো দক্ষিণের বড় স্টেশনে গিয়ে ওরা দলে দলে ট্রেনে চাপবে। এ ব্যবস্থাই ভালো। ওঠানামার ধকল এড়াতে পারবে।

চলতে শুরু করল বিমি। বেলা পড়ে আসছে। এই দ্যাখো, টাকাটা আজও জমা দেয়া হল না। অফিস নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। বিমি যেন একটা আবিষ্কারের সামনে থমকে দাঁড়াল। এই দ্বিতীয়বার হল একরকম ভুল। শিল্প সমিতির দপ্তরে একবার আর এখানে এসে আবার। এজন্যই যে শহরে আসা তা কিছুতেই মনে পড়ল না।

ভাবব না স্থির করেছিল, কিন্তু ভাবতে গিয়েই গোলমাল হল।

কিন্তু তা তো নয়। মনের একটা অংশকে চেপে রাখতে গিয়েই এ রকম হল বোধ হয়। একটাকে পিছিয়ে রাখতে গিয়ে অন্য অংশগুলোও যেন পিছিয়ে রইল। অস্পষ্টভাবে এই অনুভব করল বিমি।

একটা সাইকেলের ঘন্টি বাজল। খস করে ব্রেক কষল। থামল একেবারে বিমির গায়ের কাছে। চমকে উঠল সে।

'চমকে দিয়েছি তো' বলে সাইকেল থেমে নামল অজয়! 'এখানে কোথায়? কাজ ছিল'?

'কাজ...

'আমারও কাজ ছিল। পুনর্বাসন দপ্তরে গিয়েছিলাম। গাড়ি এসে গেছে, মানে ক্যাম্প থেকে লোক নিয়ে যাবার। বাড়িতে ফিরছেন তো? চলুন একসঙ্গে যাই। আর কোনোদিনই হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। একটা লাইব্রেরি আছে। ঘুরে যাব। নতুন লাইব্রেরি। মোহিতের জন্য বই নিয়ে যেতে হতো এখান থেকে'।

'অসুখ কী রকম'?

'আর অসুখ। পুনর্বাসন দপ্তরে বসে বসে মনে হল ওর কথা। হেঁয়ালির মতো লাগল মোহিতকে। ওই সামনের বাড়িটাই লাইব্রেরি'।

অদূরে একটা ছোট বাড়ি। ঝকঝকে নতুন। যত না দেয়াল তার চাইতে বেশি কাচের জানালা।

রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠার আগেই ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে। কাচের জানালা দিয়ে সে আলো যারপরনাই সুন্দর দেখাচ্ছে।

'এ রকমই হওয়া উচিত', বলল অজয়, 'আলোর কথা বলছি। ওখানে বসে পড়ে অনেকেই। একটা ঘর আছে, জানেন, পড়তে পড়তে চোখ তুলে তাকিয়ে আকাশের মেঘ চলাচল দেখা যায় কাচের পর্দা দিয়ে'।

'এখানে দাঁড়াই আমি'—বলল বিমি। ভাবল : পুনর্বাসন দপ্তরের সামনে থেকে উঠে তাহলে সে বাড়ির পথ ধরেনি? দ্যাখো কাণ্ড!

'ভিতরে আসবেন না'?

অজয় লাইব্রেরির ভিতরে চলে গেল স্ট্যান্ডে সাইকেল রেখে।

বিমলা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে শার্সি দিয়ে পড়বার ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। বোধ হয় এটা ছোটদের পড়বার ঘর। তাদের উপযুক্ত বইপুঁথি দিয়ে সাজানো। সাত-আট থেকে দশ-বারো বছরের কয়েকটি ছেলে। পরিষ্কার সাজানো ছবি যেন। কী খুশি দেখাচ্ছে ছেলে ক'টিকে। যেন বাইরের শীতের থেকে ওরা এক কবোষ্ণ মাধুর্যে আশ্রয় নিয়েছে। একটা ছোট ছেলে, বোধ হয় বড় কারো সঙ্গে এসেছে, বই পড়তে সে পারে কি পারে না—কাচের পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে সে কী দেখছে বাইরের দিকে, বিমিকেই দেখছে নাকি?

অজয় লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বিমি কাচের পর্দার কাছে গিয়ে যেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওটা কিন্তু দরজা নয়, জানলা'।

বিমি অজয়ের এই কণ্ঠস্বর শুনে যেন একটু লজ্জিত হল, তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এল। অজয় বলল, 'আমাদের কিন্তু এসবের সুযোগ ছিল না। আমাদের লাইব্রেরি বলতে বোঝাত স্কুলের সবচাইতে ছোট ঘরখানার পুরনো বই-এর গন্ধভরা কয়েকটি আলমারি'।

বিমি ভাবল : সকালবেলার কথা নয়। তবু সেই ছেলেটার কথা। যে কোনো এক দুরন্ত ছেলের কথা। মনে মনে তার চারিদিকে আলোকিত কাচের সন্ধ্যা নামিয়ে আনল সে। চাকা ছেড়ে সে-ও হয়তো এই লাইব্রেরিতেই আসবে।

আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার।

অজয় বলল, 'কিন্তু একটা কাজ যে ভুলে এসেছি। বাজারে যাব ভেবেছিলাম। সুরথবাবুর জন্য একটা মশারি কেনা দরকার'।

'যান বাজারে তবে'। বলল বিমি। ভাবল—এটাও নতুন। ছেলেদের এই পড়ার উপরে ঝোঁক।

অজয় বলল, 'আপনি? আচ্ছা এক কাজ করি। চলুন ব্রাহ্মপাড়া দিয়ে যাই। ওখান থেকে আমি বাজারে যাব। আপনি মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবেন'।

'চলুন'। বলল বিমি। ভাবল: সত্যি কোনো নতুনের স্বপ্ন যেন।

'আপনাকে বলছিলাম আমাদের সময়ে এসব ছিল না। তবু ভালো, এখন হয়েছে। সবচাইতে এটাই ভালো লাগে, আমাদের এই পুরনো জাতটা নতুন হয়ে উঠছে। অবশ্য…' অজয় হাসল। কীসের যেন সংকোচও বোধ করল সে।

বিমি ভাবল : আজ যেন অনেকেই নতুন হয়ে ওঠার কথা বলছে। অবশ্য…কিন্তু…দুঃখের কথাই যেন। একটা অমিলই বোধ হয় ভিতরে বাইরে।

একটু থেমে অজয় বলল, 'এ রকম সহজ নয় ব্যাপার। চট করে আশাবাদী হয় দু'রকমে। রাজনীতির গোঁড়া ভক্ত, আর যার ভাবনাচিন্তার বালাই নেই। একটা ইংরেজি কবিতা আছে জানেন, পৃথিবীটা এক বুড়ি, শুকনো বন্ধ্যা প্রান্তরে লকড়ি খুঁজে পাক খাচ্ছে'।

বিমি ভাবল : কিছুক্ষণ আগে…আর এই অমিলটা…হ্যাঁ দুঃখই তো। সোদামুনির মাসির কথাই ভাবো। শুকনো আঁশের মতো তার ত্বক। কিংবা ওই মাদার।

অজয় বলল, 'কিন্তু সৌম্য এ কবিতাটাকে দুয়ো দিত। ঠাট্টা করত। বেশ লাগত সৌম্যকে আমার। আপনার কেমন লাগত? ভালোই, না? না, চাকরি করে দেয়ার কথা বলছি না। সে ও অনেকের জন্যই করতে পারত। আমাদের সঙ্গে, মানে, আপনি, আমি, মোহিত আমাদের সঙ্গে ওর একটা অন্য সম্বন্ধই গড়ে উঠেছিল'।

বিমি ভাবল: এখনই যা হল তা থেকে বলা যায় তার বুকেরই কিছু দোষ হয়েছে। ধক্ করে থেমে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে চলতে শুরু করল। উদ্বাস্তু জীবনের এটাই বোধ হয় স্থায়ী চিহ্ন থেকে গেলে, বুকের এই রোগ। অথচ বাইরে থেকে এখন তাকে স্বাস্থ্যবতীই মনে হবে।

বলল সে, 'যাবেন? এখান থেকেই আপনি বাজারে যেতে পারেন'।

'তাও পারি। ব্রাহ্মপাড়াই তো ডানদিকে, নয়? দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারলে আর একটু গল্প করা যেত। আচ্ছা, পথের উপরেই বিদায় নিচ্ছি'।

অজয় চলে গেল।

সন্ধ্যা হয়েছে। ডানদিকে ব্রাহ্মপাড়া। এ পাড়াটা শহরের নতুন পাড়ার মাঝখানে হলেও প্রাচীন চারিদিকেব তুলনায়। একটা ছোট বাগানের মধ্যে একটা সাদাবাড়ি। মিটমিটে একটা আলোও জ্বলছে ভিতরে। মন্দিরটাই বোধ হয়।

কোনো কোনো সন্ধ্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আজকেরটি যেন হালকা খয়েরি রঙের। সবকিছু যেন সেই রঙে রাঙানো।

শুকনো পাতা পায়ের তলায় মড়মড় কবল। কে আর ঝাঁট দেয়। আগে বোধ হয় মালী ছিল। আর বাগানও নেই এখন। একদিকে একগোছা বুড়ো পাম গাছ। আর দরজাব পাশে এই নাগকেশব দুটি। নাগকেশরের শুকনো পাতাই পায়ের তলায় ভাঙছে। এটা যদি বসন্তকাল হয়ে থাকে, এখন নাগকেশরে কচি পাতা হওয়ার সময়ও। বিমি মুখ তুলে চাইল কিন্তু দেখতে পেল না।

নতুনের কথা বলতে গেলে এই মন্দির সম্বন্ধেও তা যায়। ভুবনবাবুর সঙ্গে আলোচনায় এবং তারও আগে বাবার মুখে সে শুনেছে একটা জাতি নতুন হয়ে উঠেছিল।

মন্দিরে প্রার্থনা হচ্ছে। আচার্য প্রার্থনা করছে। মৃদু আলোকে সামনের দিকে পাঁচ-ছ জন উপাসক। হল বোঝাই সারি সারি ধূলিমলিন উঁচু ফাঁকা বেঞ্চ। একসময়ে নিশ্চয়ই লোক হতো। বিমলাব এ রকম একটা ঝোঁক হল কল্পনা করতে:

উপাসকদের বেশির ভাগই আচার্যের আত্মীয়। আর আচার্যও হয়তো কিছু মাসোহারা পায় প্রার্থনার শর্তে।

দেয়ালের গায়ে বিবর্ণ শালুতে লেখা ব্রহ্মের কৃপার কথা, হরের্নামৈব কেবলম্।

নতুনের জোয়ারটা চলে গেছে, বালিতে তার দাগ।

পিছনের দিকে একটা বেঞ্চে বসল বিমি।

হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো। আচার্যের সুবে সুর মিলিয়ে ফিসফিস করে বলল বিমি। আচার্যের মন বোধ হয় আজ কোনো কাবণে বিষণ্ণ। কিংবা এই মন্দিরের আবহাওযাই এটা। ক্ষমা করো।

হঠাৎ বুকটা তোলপাড় করে উঠল যেন বিমির। কোলের উপরে রাখা হাত দুটিকে সে সংযুক্ত করল। প্রার্থনাই সে করবে। হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো।

সবসময়ে কি বেঁধে রাখা যায়। কখনও কখনও চিড় খেয়ে যায় না বুকের বাঁধ? হাত দিয়ে চোখ ঢাকল বিমি। গোপন রাখা যায় না।… হোক না হয়, এখানে কারো কারো চোখেও।

'তোমার কথাগুলি এমন নতুন লাগে, সৌম্য'।

'লাগে সেটা তোমার খুশি হওয়া দেখে মনে হয়। কিন্তু আমার জানাশোনা কত দূর তা বুঝি জানো না? সবসময়েই মনে হয় কত নতুনই জানতে পারতাম, স্থির হয়ে বসে পড়তে পারলে'।

'আচ্ছা, সৌম্য, কতই-বা তোমার বয়েস। তোমার হিসাব মতোই কুড়ি-একুশের বেশি হয় না। পড়ো না তুমি। স্কুলে কলেজে নয়, এখানেই। বই আনিয়ে নাও'।

'বই'?

'হ্যাঁ। যখন যে বই দরকার'।

'সে তখন দেখা যাবে'।

'আচ্ছা, সৌম্য, পৃথিবী কি নতুন হয়ে উঠবে রাজনীতির পথেই'?

'বুঝতে পারি না বললাম যে। মনে হয় রাজনীতি একটা ধাপ। মানুষ নতুন হলে কি রাজনীতির আর দরকার হবে? রাজনীতি যেন একটা অস্থিরতার অপটু প্রকাশ। এটা কী খাচ্ছি বলো তো'?

'এক ধরনের পুডিং। দ্যাখো সব ভুলিনি এখনও'। বলল বিমি। 'আচ্ছা সৌম্য, এখানে এসে আমার স্বাস্থ্যটাও ভালো হয়েছে, না'?

'অনেক হয়েছে'।

সন্ধ্যা হয়েছিল। সৌম্য চলে গেল। নীল একটা জ্যোতি যেন সেই সন্ধ্যা। বুকে যেন বিঁধে যায়। যেন বুকের ভিতরেও চলে যেতে পারে। এক মুহূর্ত জ্বালার পরই শান্তি।

কী যে হল আজ। কী হল লাভ সারাটা দুপুর হেঁটে হেঁটে, নিজেকে ক্লান্ত ক'রে। ক্লান্ত না হলে বোধ হয় আর একটু জোর থাকত মনে। ববং সারাটা দিনই যেন আয়োজন কবে তাকে মুহ্যমান করে দিয়েছে।

বেলা চারটে।...

অদৃষ্ট নিস্পৃহতাও নয়, অপ্রেমও নয়। অনুশোচনা, বরং যেন করুণার মতো অশ্রু ছলছল।

ঢোক গিলল বিমি। আর প্রায় উচ্চারিত হল তার মনের কাছে ফিসফিস করে বলা—কী লাভ? কী লাভ হল?

বেলা চারটে। আগ্রহটা যেন আজ কান্না পাবে। পায়ের আঙুলের উপরে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখতে লাগল সে পথ। তার আগে সে আয়নার সামনে বসে চুলে চিকনি চালাতে চালাতে খুশি খুশি মুখে কী ভাবল। কী করবে, কী করবে? গান? দু'হাতের আঙুলগুলি। দু'হাতের আঙুলগুলি পরস্পরকে জড়াচ্ছে। হাতে হাতে তালি দিল সে মৃদু মৃদু। আয়নায় কি দেখবে একবার নিজেকে? পরনেব শাড়িটা দু'দণ্ড আগে পরা। সেটা পালটে সাদা ধবধবে একখানা জড়িয়ে জড়িয়ে পরল। ভিজে গামছা দিয়ে মুখটা আবার মুছে নিল। পাউডার যেটুকু লেগেছিল উঠে গেল এবার। চারটে। জানলাটা উঁচু নয়, পথটাই অসমতল। আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে পথের সবটুকু দেখবার চেষ্টা করল সে।

'এ কী'?

'পরো'।

'তাঁতের ধুতি আর গরদের জামা'?

'পরো, সৌম্য'।

'জামার মাপ পেলে কোথায়? এ কি ধুতির পাড় কুঁচিয়েছ বসে বসে'? ধুতি পালটালো সৌম্য, পাঞ্জাবি গায়ে দিল। পুরনো পাঞ্জাবিটা রিফু করার জন্য রেখে দিয়ে ভালোই করেছিল বিমি, নতুবা মাপ পেত কোথায়?

'শহরে গিয়েছিলাম'। বিমি বলল। হাসি তার মুখে। 'তোমাদের শহরে নয়। চা বাগানের ওপারে

মহকুমা শহরে। এ চা বাগান তোমাদের শহরের সঙ্গে এক জেলায় নয়, তা জানো'?

'তাই নাকি'?

'চলো আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। বেশ বাড়িটা, না? মেরামতের কথায় ওরা বলেছিল পুরনো বাংলো রেখে কী হবে? বাবুদের পাড়াতেই একটা আধুনিক ধরনের ছোটখাটো বাড়ি দিতে চায়। আমি বলেছি মেরামতের কী দরকার হল? যেমন আছে থাক না। এদিকে এবং ওদিকে দ্যাখো। অন্য কোনো বাড়ি দৃষ্টি আটকায় না'।

কোঁচানো ধুতিটার পাড় পায়ের পাতা পর্যন্ত পড়েছে। পাঞ্জাবিটার বোতাম দেয়া হয়নি। পাঞ্জাবি পরতে গিয়ে কয়েক গোছা চুল আলুথালু হয়ে কপালে এসে পড়েছে।

'আহ্। সৌম্য, সৌম্য'। বলল বিমি।

'ভাবছি'।

'কী ভাবছ? কিছুতেই ভাববাব কী আছে? আমি অনেক ঘুরেছি সৌম্য। এ আমার দুঃখের অর্জন। বিশ্রামের বিন্দু পেয়েছি খুঁজে খুঁজে। চার্চে যাবে? অবশ্য এখনও প্রার্থনা হচ্ছে না। হওয়ার সময় হলও বোধ হয়। ওটা মানুষের উর্ধ্বমুখী গতির চিহ্ন। কাছে গেলেও মন খুশি হয়ে ওঠে। চলো বেড়িয়ে আসি'।

'ভাবছি, তুমি আমাকে দয়া করো কেন'? সৌম্য বলল।

'দয়া'। খিলখিল করে মিষ্টি মিষ্টি করে হাসল বিমি। 'অল্প বয়স বলেছিলাম কবে, তাই? এত বড় হয়েছ তুমি। দ্যাখো তো তোমার আঙুলগুলো। পরিপুষ্ট, পরিপূর্ণ'।

লাল হয়ে উঠল বিমি।

ঢং ঢং করে চার্চে ঘণ্টা বাজল। ভেস্‌পার? সন্ধ্যার প্রার্থনা উঠবে ঈশ্বরের উদ্দেশে। জানো, এটা মেথডিস্ট গির্জা।

'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে'! বলল সৌম্য।

'ঘুমোওনি তুমি'?

'না'।

'রাত দুটো পাব হল। কাল তো অফিস আছে'। বলল সৌম্য।

'থাকলই-বা। বেলাতেই উঠব ঘুম থেকে। ঝি এসেই না হয় ডেকে তুলবে'।

'জেগে জেগে কী করছ'?

'তোমাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম'।

'কী'?

'তোমার কী কী দরকার জেনে নিতে ইচ্ছা হয়। বই তো বটেই। কাল দুপুরে আসবে? কী কী দরকার সব জেনে নেবে। আমি মাইনে কত পাই তা তুমি জানো। কিন্তু কত জমিয়ে ফেলেছি শুনলে অবাক হবে'।

'দুপুরে'?

'হ্যাঁ। কেন নয়? দুপুরে তো এর আগে আসতে। তবে? সৌম্য—

'উঁ'?

'সৌম্য, আমার উপরে খবরদারি করার কেউ নেই পৃথিবীতে। আমিই আমার'। ঝিকমিক কবে হাসল বিমি। 'আমি আমাকে নিয়ে যা খুশি কবতে পারি, পারি না'? স্বাধীনতার নেশায় জড়িয়ে জড়িয়ে এল বিমির গলা। 'আর এতটুকু অতৃপ্তি কোথাও নেই পৃথিবীতে। ভগবান দ্যাখো হাসছে বুকের মধ্যে'।

দয়া করো, দয়া কবো, ভগবান।

নিঃশব্দ ফোঁপানিতে বুকটা ওঠানামা করছে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল বিমি আনত মুখে প্রার্থনার ভঙ্গিতেই। আর সে হাতের আড়ালে চোখ ভিজে উঠল তার।

দয়া করো।

অথচ আজ সে মনকে বাঁধ দিয়ে বেঁধেছে ভেবে গৌরব করেছিল।

কী হল নিজেকে ক্লান্ত ক'রে? সারাদিন উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কি শান্তির বিশ্রামবিন্দুটি খুঁজে পেলে? বেঁধে রেখে কী হবে মনের তলায়। বরং উঠতে দাও, ভাষা পাক। বোবার যন্ত্রণাই তো আরো বেশি। ভাষা দিয়ে ধরে দেখো, হয়তো মনে হবে নতুন নয়, অভিনব নয় এ বেদনা। ভাবো, প্রেম নয়, অপ্রেম নয়। ঘটনা যদি না বলো, বলো বিস্ময়। মৃত্যু পর্যন্ত চলে চলেও যে বিস্ময় যায় না।

কিন্তু অশ্রুধারা নামল। অশ্রু-অন্ধ হয়ে, অশ্রু-আবিল মুখে সে বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। মনে হল তার, এরপরে প্রার্থনামন্দিরের শুচিতা নষ্ট হবে।

শরীর যুক্তি দেয় না, ভাবতে পারে না। তার কি আবেগ? অথবা সে কি ধোঁয়াটে নীল অব্যক্ত অনুভূতি যা প্রমাণ পেতে চায়, ভৈরবের ট্রেনে বিবর্তিত নারী শরীর আবার একত্র ও সুস্থ হয়েছে কি না। অথবা তা কি এক লেডি ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরের এক লাল ছাদ, সবজে দেয়াল ছোট্ট নিঃসঙ্গ একটি দোতলা কুটির? হয়তো যার উপরের সামনের বারান্দায় অর্কিড ঝোলে, টবে রজনীগন্ধা, যার শোবার বসবার ঘরের ঝকঝকে শার্সি দিয়ে অ্যাকেশিয়ার লাল স্তবক, আর পাহাড়ের নীল ঢেউ। আর ছোট সরু খাটে সাদা বিছানা, আর সরু টেবলে দাঁড় করানো কয়েকটি বই, আর মাসের শেষে নিয়মিত মাইনের খাম পাওয়া সেই একটি স্ত্রীলোকের যে '৪২ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে হাজার-হাজার মাইল হেঁটেছে।

কিন্তু তার আগে বোধ হয় ধর্মঘট হয়েছিল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। কিংবা বলো, বিমলা, তোমরাই তো প্রস্তুত হচ্ছিলে এ অশান্তির জন্যই। একেই তো তোমরা প্রাণশক্তির বিকাশ মনে করেছিলে, নিজেদের অস্থির সম্মুখবেগের একটি প্রকাশ বলেই অনুভব করতে।...

'সৌম্য, সৌম্য, কেন এলে তুমি'?

'কী বলছ'?

'তুমি যাও, যাও। পুলিস এসে ছেয়ে ফেলেছে চা বাগান। শ্রমিকরা মারামারি করছে। তুমি যাও'।

'আমি'?

'হ্যাঁ, যাও। দোহাই তোমার, সৌম্য, যাও'।...

আঁচল তুলে মুখটা মুছে নিল বিমি। এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউ তাকে দেখতে পাবে না আঁচল তুলে চোখ মুছলেও। তার ঠোঁট কাঁপল যেন ক্ষমা কথাটাকেই সে আবার উচ্চারণ করবে।

অজয়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল বিমির।

'অজয়বাবু'?

'হ্যাঁ। দেরি হয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। চলুন আবার একসঙ্গে যাই'।

'আপনি উদ্বাস্তুদের ভালোবাসতেন, অজয়বাবু'?

'তা বলতে পারি না। তবে সৌম্য, মোহিত, লতা, এদের কথা স্বতন্ত্র'।

'আমি যখন আবার ক্যাম্পে ফিরলাম আমাকে একটি প্রশ্নও করেননি। নতুন তাঁবু দিয়েছিলেন। সেই বন্যার আগে, নয়'?

'খবরের কাগজে সৌম্যের জেলে যাবার সংবাদ ছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম ধর্মঘটের ফলেই আপনারও চাকরি গিয়ে থাকবে'।

নীরবে চলতে লাগল দু'জনে।

বিমি ভাবল এই ঔদাস্যই ভালো। এই বর্ষণক্লান্ত আকাশের মতো শূন্য অন্তর। আর সেই শূন্যে সে আর অজয় দুটো খড় কিংবা দুটো কুটো বাতাসে ভেসে ভেসে একত্র হচ্ছে।

'আপনি কোথায় যাবেন অজয়বাবু'? বিমি প্রশ্ন করল।

'কোথায়? যেখানে যায়। সব স্রোত যেখানে টেনে নেয় মরা মাছকে। কলকাতাতেই যাব'।

'সে কী'!

'কলকাতা থেকেই বেরিয়েছিলাম। উজানে এসেছিলাম পাকের দাঁড়া বেয়ে বেয়ে। আজ যখন মর মর আবার তারই টান লেগেছে'।

'এ রকম কথা তো আর কখনও শুনিনি আপনার মুখে'।

'সৌম্য অনেক শুনেছে'।

আবার নীরবতা।

বিমি ভাবল : শান্ত হয়ে বরং ভাবাই ভালো। প্রশ্নটাব কি উত্তর আছে? চেপে না রেখে বিশ্লেষণ করলে বোধ হয় উত্তরটা পাওয়া যেত।

অজয় বলল, 'মোহিতের একটা গতি হল। সুরথ যাচ্ছে দণ্ডকারণ্যে। আপনিও সব ফিরে পেয়েছেন। লতার কথা ভেবে শুধু দুঃখ হয়। ভেবেছিলাম হল বোধ হয় ভালোই। কিন্তু ভয় হয়— নেশা যদি কেটে যায়। কিংবা নেশা কাটবার আগেই সব আশা যদি গুঁড়িয়ে যায় লতার'?

বিমি ভাবল · একটা সাধারণ দিনেই এমন হল। কাজেই ভুলে থাকবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আজ যদি এমন হয়ে থাকে, যে কোনো দিনেই এটা হতে পারে। এ কান্না তোমার জন্য তোলাই থাকবে। তা ছাড়া ওটা তো একটা অতীত জীবন। ওকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে! আর পেলেই-বা তুমি কী করছ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল বিমির।

অজয় বলল, 'মানুষের মনের বাঁধ কখন ভাঙবে তা বলা যায় না। সকালে আজ সুরথের বউ হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বলল তার ছেলের কথা। বলল, আমি যেন তার খবর করি মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে যেন তাকে সে খবর দিই। আমি মোটেই জানতাম না সুরথের ছেলে আছে'।

কী যেন বলছে অজয়। তবে অজয় এসে ভালোই হয়েছে। শান্ত করেছে তাকে। আর প্রকৃতপক্ষে ও চোখের জল কার জন্যই বা? কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্যই নয় বোধ হয়। ঘটনাগুলোই। তা যদি না হয়, বলো, তোমার কি সাহস আছে কোনো ব্যক্তিকে ফিরে পেতে? একটা ধূসর দিগন্ত যেন। মরুতৃষার পিছনে ছুটতে ছুটতে বৃত্তাকার পথে পরিচিত সেই ভাঙা জলপাত্রগুলির কাছে পৌঁছে ভয়ব্যাকুল আর্তনাদ করে ওঠা। তারপরই বোধ হয় মানুষ আশা আকাঙ্ক্ষাকে পার হয়ে এক ক্লান্তির অবসন্নতায় পৌঁছে যায়। এই ভাবল সে।

অজয় অনেক কিছু কথা বলছে। বোধ হয় এটা তার মনের অস্থিরতা ঢাকবার একটা ছল। যেন বিমির সান্নিধ্যকে সে কাঙালের মতো চেপে ধরেছে। বিমি ভাবল।...

হসপিট্যাল আবার। চা বাগানের হসপিট্যাল। অযত্ন করেনি ওরা। একটা কেবিনে একা সে। লোহার ছোট খাটটিতে সাত দিনের শিশু। জ্ঞানহীন মোহাচ্ছন্ন একটা আর্ততার মধ্যে কতদূর থেকে যেন কান্নাটা ভেসে এসেছিল। তারপর সাত দিন কেটে গেছে।

কেন যে আজ এ কথাগুলোই মনে আসবে। হাসপাতালের বারান্দার নিচে নাগকেশরেব লাল পাতাগুলো যেন রেশমের মতো কোমল। কচি বোধ হয় কথাটা। শিশুর স্পর্শের মতো।

কেবিনের সামনে কয়েক সারি ডালিয়া। বসন্ত বোধ হয় সেটাও। ম্লান হয়ে যাচ্ছে শীতের ফুলগুলি! আর সেগুলো বোধ হয় নাগকেশরই, হসপিট্যালের বেড়ার পাশে পাশে যেগুলি ছিল।

অজস্র লাল নতুন পাতা গাছে। ঝরা বাদামি পাতা গাছের গোড়ায় স্তূপ করে রাখা যেন। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ভেঙে ভেঙে যায় চলতে গেলে।

মেট্রন এল। 'কেমন আছেন—ভালো? আপনাকে ও রকম ছুটে আসতে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। ও অবস্থায় ও রকম করতে নেই। যাক, এসে ভালোই করেছিলেন। কিন্তু একটা খবর আমরা পাইনি'। মেট্রন কুণ্ঠিত হল। নামটা বলবেন?

'হেঁয়ালি নয়। যে নামটা বলেছি—ভুবনবাবু আমার ভগ্নীপতি'।

মেট্রন সরাসরি চাইতে পারল না।

'না। সে-ও নয়। কিন্তু, আমি কারো বিবাহিতা স্ত্রী নয়, সাবালিকাও বটে'। হাঁপাতে লাগল বিমলা।

বৃষ্টির অজস্র ধারার মতো বকে যাচ্ছে অজয়। ঠোঁট দুটিকে নির্দয়ভাবে দাঁত দিয়ে বিঁধে রাখল বিমি। ফোঁপানিটাকে চাপল গলার কাছে। বুকটা ওঠানামা করছে শুধু।

মেট্রন চলে গেল। কেবিনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল বিমি। পায়চারি কবতে লাগল সে। চলতে তার কোনোদিনই দুর্বলতা নেই। রেঙ্গুন বজ্রযোগিনীর পথ তাকে শক্ত করে দিয়েছে। নাগকেশরের পাতাগুলি লাল। যতই দ্যাখো ততই সুকুমার বলে বোধ হবে। লাল পাতাই ছিল। আর তখন বসন্তও বটে।

কাচের জানলা ছিল হসপিট্যালেরও। জানলার ওপারে তার শয্যা। সন্ধ্যার আগেই মৃদু আলোটা জ্বলছে। সাদা ধবধবে বিছানায় বাদামি নরম কম্বল। লোহার ছোট খাট। যেন ছবি। ঘুমন্ত শিশুটি দু'হাত তুলে রেখেছে মুখের সামনে। কোনো কাল্পনিক বিপদ থেকে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নাকি ওটা। বারান্দায় পায়চারি করেছে বিমি। একটু শীত শীত যেন করছে। জানলার ওপাবে কবোষ্ণ নিশ্চিন্ততায় সে ঘুমোচ্ছে।

বারান্দা থেকে লনে নামল বিমি। আরো দু' একজন বোগীও বেড়াচ্ছে তার মতোই। কম্পাউন্ডেব বেড়াটার তার এদিকে খানিকটা ছেঁড়া।

বিমি কম্পাউন্ডের বাইরে এল। পথ ধবে চলতে গিয়ে ফেরারি আসামীর মতোই সে সতর্ক হল। রাত হল। হাঁটতে লাগল সে। কোথায় যাবে? বাস্তুহারা কোথায় যায়?

তখনও অজয় বলছে, 'দেখা হয়ে ভালো হলো। তেমন কিছু নয়। পত্রিকা বার করেছিলাম একখানা। সবাইকে দিয়েছি। আপনাকে আর সৌম্যকে দেয়া হয়নি। আপনাকে দিয়ে যাব। এই পাড়াতেই থাকেন'?

বিমি ভাবল : কী সম্বন্ধ, বলো, সে জীবনের সঙ্গে আমার? লাইব্রেরিতে গিয়ে এমন হল? মন্দিরে গিয়ে এমন হল? সন্ধ্যা হয়েছে বলে?

কানাতের উপরে জল পড়ছে পিট পিট ক'রে। জমছে জল। জলের ভারে কানাত কাত হয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে অবশেষে। তেমনি যেন অজয়ের কথাগুলো শুনতে পেল বিমি।

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় এই দণ্ডকারণ্যের প্রস্তাব না এলেও এমন হতো? লতুর কথাই। মানে, চট কবে একটা সিদ্ধান্তই যেন নিতে হল তাকে এই সংকটে। তাই নয়? এই পথে যাবেন? নমস্কার। ভালো কথা মনে পড়ল। শুনুন। সৌম্যর একটা খবর দেয়ার আছে। যোগাযোগটা রাখতে পারিনি। অবশ্য কী করেই-বা রাখতাম। মাসখানেক আগে চিঠি পেয়েছিলাম। কোনো ঠিকানাই নেই চিঠিতে। শুধু ছাপ দেখে বোঝা যায় ওদেশ থেকে লেখা। কোন ওদেশ তা জেনেও লাভ নেই। লিখেছিল—''অজয়বাবু, কাল সকালেই বোধ হয় রাজঅতিথি হব আবার। কতদিনের জন্য কে জানে। আপনাদের খবর জানতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঠিকানা দিতে পারছি না। যদি অতিথিশালায় থিতু হয়ে বসি আর সুযোগ যদি পাই চিঠি দেব''।'

বিমি সংবাদগুলো মনে মনে আওড়াল। কিছু যেন অনুভব করছে না আর।

'এই রকমই সৌম্য'। বলল অজয়, 'কী দরকার ছিল ওদেশে আবার পাড়ি জমানোর। কী দরকার ছিল সেখানে গিয়ে তাদের সমাজ নিয়ে বিবাদ করার? যাক, সেটা তার মাথাব্যথা। আমার ধারণা হয়, কল্পনাও বলতে পারেন, যদি কখনও সে এদেশে আসে হয়তো বাপ মায়ের খোঁজ করতে হলুদমোহনে আসতেও পারে। আপনি কাছে রইলেন। যদি দেখা হয়ে যায়, হয় এমন দেখা, আজই আপনার সঙ্গে হল আমার, ওকে লতার কথা বলবেন। যদি কোনো হিল্লে করতে পারে, করে দেয় যেন। আমরা যা পারব না, ও পারবে। আর—অবশ্য তা না বললেও চলে। বাপ মায়ের খোঁজ এখানে না পেলে ও নিশ্চয়ই বোনের বাড়ি যাবে। বাপ তো গেছেই। ছেলের শোকে বলেই আমার ধারণা। মা যদি থাকে দেখা হবে।...আচ্ছা চলি'।

বিমলা কিছুই অনুভব করতে পারল না। আর একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবার মতো হল। মুখে আঁচল চাপা দিল সে। সে কি কিছু পারে আর?

এখন বোধ হয় তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। গুহার অন্ধকারে কত প্রাণীই তো ক্লান্ত দেহ নিয়ে টলতে টলতে ফিরে যায়।

কেন এমন হয়!

৭

রাতটা কেটেছে।

সকাল সকালই উঠেছে বিমি। তার মনে হল কী কী যেন ঘটেছিল রাত্রিতে।

ভুবনবাবু বলেছিল, ভুবনবাবুই বইকি, সে ছাড়া এ বাড়িতে পুরুষ কে: বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। ক্লান্ত? একটু জিরিয়ে নাও। মালতী তার বাড়িতে গেছে বলে আসতে। রান্না চাপায়নি, উনুন ধরিয়েছে। বোসো। চা করে আনব? না। তাহলে বরং দু'জনে মিলেই যাই ওদিকে।

ও মা, বউদি, রান্না চাপিয়ে দিয়েছে এরই মধ্যে! কম্মা বটে। কোথায় গিয়েছিলে? বেড়াতে?—অন্ধকার রাত।

কুপির আলোর ধোঁয়ায় রান্নাঘরের অন্ধকার কাঁপছে। উনুনের মুখের কাছে আভা। চৌকাঠের কাছে বসে মালতী।

কিন্তু কেউ কি হেসেছিল খিলখিল করে, কিংবা কে যেন আহত হয়ে কাউকে আঁচড়ে দিয়েছিল? এগুলো সম্ভবত বিমির ভুল। কখনও কখনও যা করিনি তাই করেছি বলে মনে হয়।

তখনও বাসি কাপড় ছাড়া হয়নি, মালতী এল।

'তুমি আসবে জানতাম। উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। চলো, চা খেতে খেতে গল্প করব। ভুবনবাবু আজ ঘুমুচ্ছে এখনও'। বিমি বলল।

'রাতে ভালো ঘুম হয়নি বোধ হয়'।

'হুঁ। কাল যেন গরম পড়েছিল। মেঘ ছিল নাকি আকাশে'?

কাপড় পালটে রান্নাঘরে এসে বিমি দেখল মালতী কেটলিটা বসিয়ে দিয়েছে।

মালতী বলল, 'বউদি, খবর শুনেছ'?

'কী খবর'?

'ওদের যেতেই হবে। কাল সকালেই যাবে। র‍্যাশন বন্ধ, ক্যাশ বন্ধ'।

বিমি আত্মগতভাবে বলল, 'তুমি হয়তো জানো না, মালতী। রাজনৈতিক নেতারা তোমার সঙ্গে রসিকতা করেনি তো? আন্দোলনের ব্যর্থতা হয়তো আগেই বুঝেছিল তারা'।

'কিছু বললে, বউদি'?

'যাবেই তো'। বিমি বলল। যাওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে মনে হল: কাল রাতে মেঘ যদি থেকেও থাকে আজ তা নেই। পরিষ্কার লাগছে আলোটা, কেমন যেন তীক্ষ্ণও।

মালতী বলল, 'কী লাভ হল আমার পরিশ্রমের'?

'লাভ কি সবসময়ে হয়'? বলল বিমি। ভাবল সে: মেয়েটা শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণ দুটি বেশ লাল। ধুলো লেগে? রাতেও ঘুম হয়নি। কিন্তু রাতের ঘুমে হয়নি। রাতের ঘুমে কি যায়? বলল, 'আজ কোথাও যাবার তাগিদ আছে নাকি?'

'গেলেও হয়, না গেলেও চলে। ...তোমার মুখটাও শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণ দুটিও লাল। ধুলো লেগে লেগে? রাতে ঘুম হয়নি'। বলল মালতী।

খালি চায়ের কাপটাকেই যেন একমনে পরীক্ষা করছে মালতী। তার সুন্দর সুপুষ্ট আঙুলগুলি কাপটার গায়েই চলে বেড়াচ্ছে।

বলল সে, 'আত্মহত্যা করেছে, শুনেছ'?

'কে'? বিমলার হৃৎপিণ্ডটা যেন থমকে দাঁড়াল। 'কার কথা বলছ'?

'লতা বউদি নয়। দু-চার দিন আগেই শুনেছি। বলতে সাহস পাইনি। সে যে মেয়েটাকে স্থানচ্যুত করেছিল, সে-ই। কিছু হৈ চৈ হবে এ নিয়ে। কাল রায়মশায়ের কাছে পুলিশের কেউ এসেছিল'।

ঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছে মালতী। এমন কর্মঠ মেয়েরও যেন আর কিছু করার নেই, পাড়ার গল্প ছাড়া।

মালতীই বলল আবার, 'রায়মশায় লতাবউদিদের আত্মীয় তা জানতাম না। কাল তোমার বাড়িতে বসেই রায়মশায় বলছিলেন এসব কথা। বুড়ো হলে পুরনো কথা বোধ হয় মনে পড়ে। লতাবউদির বাবা গিরীশবাবু রাজনীতি করতেন। উনিশশো দশ থেকে উনচল্লিশ। এর মধ্যেই একুশ বছর কেটেছিল তাঁর জেলে। উনচল্লিশে আন্দামান থেকে ফিরে এলেন তখন পক্ষাঘাতে বাঁ অঙ্গ পড়ে গেছে। স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারেন না। শুনলেন গাঁয়ের কেউ কেউ তাঁকে বলে গিরীশ ডাকাত। রায়মশায় চিনতেন তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবেই। একই গ্রাম তো। নদী পেরিয়ে গেলে এখান থেকে মাইলখানেক মাত্র। কে আর কেন নদী পার হয়? পুলিশের ঝামেলা তাঁকেও ভোগ করতে হতো, কারণ তিনি পুলিশের চাকরি করতে করতে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের হুজুগে। আর একটু চা দেবে, বউদি'?

কেটলিটা উনুনে বসাল বিমি।

মালতী বলল, 'তাহলে গিরীশের মেয়েই লতাবউদি। গিরীশ যখন ফিরলেন তখন লতাবউদির বছর এগারো হবে। বাপ সেই প্রথম মেয়ের মুখ দেখল। এ রকমই হবে কারণ গিরীশবাবু আন্দামানে দশ বছর ছিলেন পক্ষাঘাতে অসাড় হওয়ার আগে। আ, বউদি, তোমার তরকারির ঝুড়ি এঁঠো করে দিলাম। চা খেয়ে জলে হাত দিইনি'।

'রোসো চা করি আবার'। বলল বিমি। অনুভব করল—কী যেন ভাবছিলাম? ভাবল: মালতীকে এমন করে কথা বলতে আর কখনও শোনেনি। যেন গলা মোম, জলের উপরে পড়ে পড়ে—কিংবা যেন চৈত্রের বাতাস গাছ থেকে জীর্ণ পাতাগুলিকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

মালতী বলল, 'আর বেয়াল্লিশে এসে আই. বি.-র দারোগা মোহিতদার কাজ হল, বোবা নুলো, কিন্তু তাহলেও স্বদেশি গিরীশের চালচলনের খোঁজ রাখা। শেষের দিকে গিরীশের বাড়িতেই অনেকটা করে সময় কাটত মোহিতদার'।

'আচ্ছা, মালতী', বলে শুরু করল বিমলা, কিন্তু আঁচল জড়ো করে কেটলিটা ধরে উনুন থেকে নামিয়ে প্রশ্নটার জবাব সে নিজেই দিল। বলল 'বিয়ের আগে লতা অবশ্যই জানতে পেরেছিল, আর গিরীশবাবু তারও আগে—মোহিতের পুলিশি চাকরির কথাই বলছি। তাই স্বাভাবিক নয়'?

মালতী বলল, 'খুবই স্বাভাবিক। গিরীশবাবুর পক্ষে তখন কারো আর্থিক সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। বিয়ে হয়নি'।

চা করল বিমলা। মালতী নির্বাক চেয়ে রইল জলন্ত উনুনটার দিকে। বাতাসটা যেন সেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে কাঁপছে, যেন দর্শনীয় কিছু।

'উঠছ'?

'ভালো লাগছে না'।

'তোমাদের ভুবনদাকে ডেকে দেবে নাকি যেতে যেতে'?

'দিই'।

মালতী চলে গেল। মেয়েটা অস্থির হয়েছে। নিস্পৃহও যেন।

ভুবনবাবু হাত মুখ ধুয়ে জামা গায়ে এল বিমির কাছে চা খেতে। যেন সে তখনই বেরুবে কোথায়।

'কেন'? চা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল বিমি।

'কাল সন্ধ্যায় র‍্যাশান আনার কথাব ছিল। আনা হয়নি। দেখি যদি আজ সকালে দেয়'।

'ও, আচ্ছা'।

এটুকুই কালকের জের আছে। ভুবনবাবু র‍্যাশান আনতে গেল।

আজকের রোদটা খুব উজ্জ্বল। শীতের অস্পষ্টতা গ্রীষ্মের প্রখরতাও নয়। একটু তরুণ দীপ্তি যেন। যেন কোন তরুণ তাপস। যাব কমনীয়তা এখনও আছে। তপস্যার রুক্ষতা ভাস্বর করেছে। কিন্তু মরি, মরি, কী তরুণ কান্তি! বৈশাখের জটাজুট সমন্বিত রৌদ্রদীপ্তি নয়। কিন্তু তুলনাটা আর টানা যায় না। বর্ষাকালে তাহলে তাপসের কোন রূপ? মানুষ উপমা দেবে বলেই তো কাল নয়। তাব চাইতে উপমাহীন ঋতু পরিক্রমা ভাবাই ভালো। পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপরে হেলে ঘুরছে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বিমি ফিরে এল।

নিজের শোবার ঘরে এসে একটু দাঁড়াল সে ইতস্তত করার ভঙ্গিতে। কুলোয় করে চাল ঢেলে নিল। আঁচটা জ্বলে যাচ্ছে উনুনে।

তপস্যা—এই কথাটা তার মনে ফিরে এল। তপস্যা আর কষ্ট। কষ্ট কবাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তপস্যা হয়ে ওঠে নাকি? কালকের সন্ধ্যায় লাইব্রেবিব সেই ছেলেগুলি তাদের খেলাধুলো, স্বাভাবিক চঞ্চলতা থেকে সরে এসে বই পড়ছিল। তপস্যা নাকি তাদের?

তপস্যা আর জেদ। অনেকের জেদ থাকে। লতার বেশ খানিকটা ছিল। কিন্তু মালতী যেন তাকে অন্য কিছু হারিয়ে যাওয়ার উদাহরণ হিসাবে নিয়েছিল। অজয় বোধ হয় বলেছিল নেশার কথা। মেয়েদের মন আর শরীর কি আলাদা রাখা যায়। ভালো লাগার অভিনয় করতে করতে অভিনয়টাকেই ভালো লেগে যেতে পারে?

কী হয় তপস্যায় বলো?

এ ধরনের কথা আগে অনেক শোনা যেত। ক্যাম্পে কারো কারো মুখে, এই কলোনিতে এসে অনেকের বিশেষ করে রায়মশায়ের আলোচনায়। এই বাস্তবহীন দুর্দশায় আজ যারা তাদেরও অনেকে অনেক দিয়েছে—হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করা সে দান। আজ আবার দণ্ডকারণ্যের প্লাবনে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এই কথাগুলি কি অনেক কথার মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠবে? দীর্ঘ দিনমান তারাও তপশ্চারণ করেছে, সে তপস্যা কি ব্রাত্যের তপস্যার মতোই মূল্যহীন? কিংবা এ যেন কোনো অভিনব পুরাণকথা : নদীর দুই তীরেই তপস্যা হয়েছিল। সিদ্ধিও এল। কিন্তু এক তীরকে বঞ্চিত করে অন্য তীরেব ভাগ্য সবটুকু সিদ্ধিকে আত্মসাৎ করেছে?

কিংবা গিরীশবাবু—তার কথা মালতী যা বলে গেল? এই কথাটা ভাবতেই যেন তার মন প্রস্তুত

হচ্ছিল তপস্যার কথা তুলে তুলে।

বিমি ভাবল: কাঁদব কেন তা তো বুঝি না।

আর লতা। মোহিত বলে তপস্যাই ছিল সেটা লতার।

নাকি লতা আলো বাতাসের অভাবে হাঁপিয়ে উঠেছিল? নিজের তপস্যায় বন্দী ছিল সে? ধরা পড়াই নিয়তি এ জেনেও দীর্ঘ মেয়াদি হঠাৎ একদিন যেমন পাগলামি করে বসে?

আর সৌম্য? এ কি কারগার খুঁজে খুঁজে ফেরা? কে মূল্য দেবে তোমার এই তপস্যার? কে তোমার যশোগান করবে?

কাল কিন্তু এসবই ভেবেছে বিমি। নতুন হয়ে ওঠা, তপস্যা, এমন সব ব্যাপারই। কী লাভ হয়েছে ভেবে?

রাজপথটার উপরে শব্দ হল। কনভয়? এ পথে অনেক কনভয় যেত বটে। জানলার পাল্লাটা মেলে দিল বিমি। এ কি কালকের বাসগুলো নয়? একখানা, দুখানা…পাঁচখানা। সব আগের গাড়িটা কোথায় গিয়ে থামল? কিন্তু পরপর বাসগুলো আসছে আর থামছে। বাস, বাস, ট্রাক, বাস। দেখতে দেখতে গোটা ক্যাম্পের দৈর্ঘ্য জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল তারা। যেন প্রাকার তৈরি হল একটা, পৃথিবী আর ক্যাম্পের মধ্যে। কিন্তু আজ কেন? কাল যাবার কথা ছিল না? বিমি অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠল। কী ঘটবে এই প্রাকারের আড়ালে? অ্যাঁ, কী ঘটবে?

ভেবে সে কী করছে? মালতী তো কত ভাবল। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ঠিক খবরটাও আনতে পারেনি সে। আজই যাবে। অথবা ঠিক খবরই সে পেয়েছিল। গোলমাল এড়ানোর জন্যই একদিন আগেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন যে ভয়, বুঝি না। কেউ কি তাকে টেনে নিয়ে যাবে ঘর থেকে? কেন যাব? গিয়ে কী হবে? কী লাভ?

বিমি পেটের কাছে একটা সংকোচ প্রসারণ অনুভব করল। এই আক্ষেপটাই বুকের কাছে উঠে আসে, বুক তোলপাড় করে ওঠে। সে জানে। নিজের সম্বন্ধে বোধ হয় কিছুই তার অজানা নেই। বিক্ষোভই বোধ হয় কথাটা, ভুল নয়। থরথর করে বুক কেঁপে ওঠে।

'আচ্ছা, ভুবনবাবু', ভুবনবাবু খেতে বসেছে, বলল বিমি।

'কিছু বলবে'?

'দরকারি কথা নয়। বেদেদের কথা বলছি'। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টায় হাসল বিমি।

'বেদে? যারা ছোট ছোট তাঁবু আর বুড়ো-থুড়ো দু-একটি ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়'?

'হ্যাঁ। পথ চলতে চলতে পথের ধারেই কোন পড়ো বাগানে আশ্রয় করে নিল। তারপর আবার একদিন এগিয়ে চলল। কেনই-বা থেমেছিল আর কেনই-বা এগিয়ে গেল তা বোঝা যায় না। শিশুরা জন্মাচ্ছে, বৃদ্ধদের মৃত্যু হচ্ছে। তারা যেন খুঁজে ফিরছে কিছু। বৃদ্ধের মৃত্যু হল। উদ্দেশ্য তার সঙ্গে ফুরিয়ে যায়? শিশু জন্মাল। উদ্দেশ্যটার সে কিছুই জানে না। তবু তারই পিছনে চলেছে। কেন এমন হয়'?

'ওই ধারা ওদের'।

'হ্যাঁ, ভুবনবাবু, তুমি দেখেছ? নদীর চরে চরে চাষ করার একটা ঝোঁকও আছে কোনো কোনো চাষীর। সব চরে ফসল হয় না। বরং ঝড় উঠে পড়ে কখনও, নদীর কালো জল তার নড়বড়ে কুটিরের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে আঘাত দেয়। তবু তার চরের মায়া কাটে না'।

'সে-ও যাযাবর। কিন্তু ওদের কথা কেন বলছ'?

'কী জানি'! বলে ভাবল বিমি।

নিস্তব্ধ দুপুর। ভুবনবাবু খেয়ে ঘরে যাওয়ার অনেক পরে এই স্তব্ধতা এসেছে। অনেকদিন হয়

না কাজটা। কোনোদিন কি বিশেষ দিন হয়ে আসবে যে তার জন্য রেখে যাওয়া। বিমি নিজের ঘরখানা ঝাড়তে শুরু করেছে। প্রায় শেষ হয়েছে ঘণ্টাটেকের চেষ্টায়। দেয়াল ঝেড়ে, জিনিসপত্র এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে। কোণগুলিতে নিজেকে সংকীর্ণ ক'রে প্রবেশ করে, চৌকির তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে। মনে মনে বলল সে—কী জানি কেন বলি এসব কথা।

পরিশ্রম হয়েছে। চুলে মাকড়সার সুতো লেগেছে, গায়ে ধুলো। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বুকটা মৃদু মৃদু ওঠানামা করছে।

এবার স্নান করতে হবে। বাঁশের আড় থেকে গামছা নিয়ে সে মুখ নিচু করে স্নানের ঘরে গেল।

এ রকম হয় কোনো কোনো দিন, জলস্পর্শ করতে একটা অনিচ্ছা। দেহটা তপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু তাপদগ্ধ নয় যে জলের শীতলতা কাম্য হয়ে উঠবে। বরং জল যেন দেহের স্পর্শকাতরতাকে জাগিয়ে তুলবে।

স্নানঘরের দেয়ালগুলো বাঁশের, কিন্তু সিমেন্টের চৌবাচ্চাটা বেশ বড়ই। গভীর নয় খুব, কিন্তু চওড়া। চৌবাচ্চার দেয়ালের উপর বসল বিমি। অন্যমনস্কভাবে জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নজর পড়ল নিজের ছায়ার দিকে। জলটা স্থির। অঙ্গের ছায়া ধরেছে।

ছায়ার দিকে চাওয়াটাও অন্যমনস্কভাবে। আকস্মিক একটা নির্দয়তা যেন উঠে এল। যেন চারিদিকের প্রকৃতি থেকেই একটা রূঢ় নির্দয়তা তাকে গ্রাস করল। বুকের কাপড়টা সরে গিয়েছিল। অনাবৃত করল সে। কোমল সুঠাম স্নেহ ভারানত বুক দুটি ; কিছুটা উদ্ধত, কিছুটা যেন রোদনমুখী। বুক, কুক্ষি, জঙ্ঘা। অশ্রু যেন বাইরে আসার পথ পাচ্ছে না। এ কী করছে সে। ফোঁপানোর মতো দমকে দমকে তার মনে হতে লাগল—এর চাইতে কাঁদা ভালো, কাঁদা ভালো।

সম্বিত পেয়ে ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঝপ ঝপ করে জল ঢালল বিমলা। গা মুছল কি মুছল না। কাপড় পালটে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকল। ভিজে চুল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। জামা পরার সময়ে চোখ বুঁজে রইল সে, আয়নাতে মুখও দেখবে না।

দুপুরটা কী করে যেন কাটল। কাটবে দুপুর তা যেন মনে হয়নি। হিংস্রতার মতো, আদিমতার মতো একটা উত্তাপ যেন অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কী যেন নেই। অন্ধ সে, জড় সে, তার দেহ নেই, মুখাকৃতি বোঝা যায় না, একটা পিণ্ড যেন। যেন ভ্রষ্ট ভ্রূণ। কী যেন একটা অনুশোচনা। তাকে অস্বাভাবিক চাপে রেখে বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। আর তাকে চেনা যাবে না। চেষ্টা করলে আব তার স্বরূপ ফিরিয়ে দেখা যাবে না মুহূর্তের জন্য। ইচ্ছার মতো মুখ নিয়ে সে ফুটবে বলে মনে হয়। আবেগের মতো পিণ্ডাকার হয়ে যায়। যেন অনুচ্চারিত শোক, যেন কান্না হতে পারত।

বিমি নিজেকে প্রবোধ দিল। শক্ত হতে বলল। স্বগতোক্তি করল—না, না বিমি, শক্ত হও ; কী লাভ ভেবে?

শব্দ হচ্ছে রাজপথে। মোটরের হর্ন। স্টার্টারের শব্দ। অনেক লোকের একসঙ্গে বলা কথার প্রতিধ্বনি।

বিমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এ তো বোঝাই যায়। বাসগুলি এগিয়ে পিছিয়ে বোধ হয় ব্যূহটাকে জোরদার করছে।

হাতের দিকে নজর পড়ল হঠাৎ। এ কি বালা দুটো কোথায়? মনে পড়ল দুপুরে যেন এক সময়ে খুলে ফেলেছিল। কেন তা করল?

লোক আসছেই দ্যাখো, লোক বাড়ছেই। দেখতে আসছে? মানুষ দুঃখের কথা বলতে ভালোবাসে, শুনতেও। দুঃখ ভোগ করতেও নাকি? ভালোবাসা নয় বোধ হয় ; এমন হতে পারে, মন্ত্রের মতো

কোনো অদৃশ্য প্রভাব আছে দুঃখের। এটাই হয়তো উত্তর। হয়তো তার টানেই মানুষ যাযাবর হয়।

মালতী নয়? কয়েকজন সুবেশ তরুণ, না প্রৌঢ়ও আছে দু-একজন। ওদের পার্টি নাকি? ধবধবে পাঞ্জাবিগুলোর ফ্রেমে আঁটা মালতীর অনেক ব্যবহার করা সাদামাটা শাড়ি। ব্যবহার করা মেয়ে।

ভুবনবাবু এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

'যাচ্ছে'?

'হ্যাঁ'।

দুপুরেই তারা রাত্রির রান্না শেষ করেছে। প্রস্তুত হয়েছে যাত্রার জন্য। কিন্তু তাড়াতাড়ি কি পারছে? অজ্ঞাতের দিকে পা বাড়াতে যে দ্বিধা সেটা বিমূর্ত না হলেও আছেই তো। বিকেলের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো গাড়িতে কিছু কিছু লোক উঠে বসেছে। কিন্তু সব গাড়িই যেন খালি এখনও। যারা উঠেছে বাসে তারাও উৎকণ্ঠায় অস্থির যেন। ওঠানামা করছে। নেমে যেন মাটি স্পর্শ করে যাচ্ছে। বাসটাকে দেখছে ঘুবে ঘুরে, নিচু হয়ে তাব চাকা। গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

আজ সময় কোথা দিয়ে কাটবে কে জানে। এখনই আলো ধূসব হয়ে গেছে। সময়ের কোনো ধারণাই আজ অবশিষ্ট নেই।

বিমলা বারান্দা থেকে নেমে রাজপথের ধারে এসে দাঁড়াল।

নতুন একদল যাত্রী বেরিয়ে আসছে ক্যাম্প থেকে। আজ তাবা আর কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিযে চলাফেরা করবে না। সদর দরজার কাল্পনিক পবিস্থিতিটাকেই সম্মান দিচ্ছে। কাঁদে নাকি? না, না। উলু দিচ্ছে। কান্নার মতো শোনাল। উলু দেয় কেন?

বন্যা! বন্যা কি সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ হয়? ধীরে ধীবে জল বাড়তে থাকে। রাত্রির আঁধাব নামে। পাক বাড়ে। ডাক ওঠে জলের। তারপর শোনা যায় মানুষের হাহাকার। তারপবও জলও হাহাকার করতে থাকে অন্ধকাব আকাশের নিচে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল ইতিমধ্যে।

মালতী নাকি? মালতী তার দল থেকে একটু সরেই দাঁড়িয়েছে। বরং বিমলার থেকেই কাছে। জপ করছে? দ্যাখো রাজনীতি করা মেয়ে ভয় পেয়ে জপ করছে। ফিরিযে আনব, ফিরিয়ে আনব, ফিরিয়ে আনব। মালতী অস্ফুট কণ্ঠে, চোখের জলে মিশিয়ে আবৃত্তি করে যাচ্ছে।

দুর্বল হয়ে লাভ কী? বিমলা হাঁটতে শুরু করল বাসগুলির দিকে। বরং কথা বলা ভালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে, কাছে না গেলে মানুষ চেনা যায় না।

হলুদমোহন এর আগেও উদ্বাস্তু দেখেছে। ওই প্রান্তরটারই হলুদমোহন নাম ছিল। সেই সেবার হাওয়া-জাহাজের মাঠ করা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা সেদিনও এমনি গিয়েছিল দল বেঁধে।

চেনা মুখ যাদের তাদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলল বিমলা।

বাসের ভিতরের অন্ধকার যেন অজ্ঞাত কোন পৃথিবী। যেন ভবিষ্যতের গর্ভ। বাইরে তবু আলোর রেশ আছে।

'আলোটা বাড়িয়ে দিলেও পারত'। বলল বিমলা।

'দিবে। গাড়ি ছাড়লে ওজল হবে'। কে একজন বলল গাড়ি থেকে উদাস স্বরে।

বিমলা বাসের লাইনের গোড়ায় চলে এসেছিল। আবার এগোতে লাগল।

'শ্রীকান্ত'?

'মা ঠাকরুন'।

'বিন্দা কই'?

'এই যে হাতে ধরা'।

ম্লান অন্ধকার। বিন্দা তার এক মাসের শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে আছে, আর শ্রীকান্ত তার বাহু

স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্তর মুখ সাদা হয়ে গেছে। বিন্দা থরথর করে কাঁপছে।

'যাচ্ছ'?

'যাই, মা ঠাকরুন, আশীর্বাদ করেন'।

'মরণচাঁদকে দেখেছ'?

'এদিকেই আসছে। দেখাশোনা করতেছে সকলের সঙ্গে'।

'যাবে না'?

'জান নে'।

গলার স্বর ওঠানামা করল না, যেন মুখস্ত করা কথাগুলি বলছে শ্রীকান্ত।

বিমি আবার হাঁটতে শুরু করল।

মরণচাঁদ এখনও মনঃস্থির করতে পারেনি। বিন্দা নতুন হতে চলেছে? কোলে কি তার নতুন জীবনের ন্যাস?

শ্রীকান্ত ঠিকই বুঝেছে। এই পুরনো মাটিতে বিন্দার যদি আবার কলকাতার মোহ জাগে? মরণচাঁদ তার মাসির ছেলেকে কোলে করে এই ধ্বংসে ঘুরে বেড়িয়ে কী করবে। কিন্তু বিন্দা কাঁপছে কেন?

এ কী, বাস ছাড়ল? একটু যেন দুলে উঠল বাসের লম্বা লাইনটা। উঠে পড়ো তোমরা। মাটি, আশ্চর্য মাটি। এ মাটি আঁচলে বেঁধে কী হবে? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। কেউ যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

সবগুলি নয়। লাইনের একেবারে মাথায় পর পর দুটো ছেড়ে গেল। অন্যগুলো স্টার্টাব চেপে চেপে পরীক্ষা করছে। গোঁ গোঁ করছে। স্টার্ট নিচ্ছে না? কতবার তো দেখা হল। ড্রাইভারও যেন অকারণে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল বিমি। পরিচিতদেব অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়নি। মরণচাঁদ কোথায় থাকল? সুরথ? বেশ বোঝা যায় সুরথের মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ। আর সতী বোধ হয় শিশুকে প্রবোধ দেবার মতো তার ভয়কে দূর করার চেষ্টা করছে। বাসের ভিতরে যেমন বাইরেও তাই— স্ত্রী পুরুষ, কিশোর কিশোরী, শিশু ভিড় করে আছে। লোক চিনতে হলে ঠেলে ঠেলে এগোতে হয়।

তৃতীয় বাসটাও ছেড়ে গেল।

মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক। নতুন হয়ে ওঠো।

চতুর্থ বাসটাও নড়ে উঠল। সব লোক ওঠেনি। দুড়দাড় করে, গুঁতো খেয়ে কোনোরকমে উঠে বসল তারা। কয়েক পা এগিয়ে গেল কয়েকটি লোক বাসের সঙ্গে সঙ্গে। দর্শক? বিমিও কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। এবার সব পিছনের বাসটাই তার সামনে।

সবগুলিকেই এ রকম করে রওনা করে দেবে সে? তারপরে একখানা বাসও থাকবে না।

যেন তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে লাগছে অন্ধকারের তটে। টলমল করে উঠছে অন্ধকাব। অন্ধকারের মতো একটা ঢেউ লাগছে রক্তে। অথচ দ্যাখো বিকেল।

এ কী? মরণচাঁদের ছেলে না? অবিমন্যু? একা দাঁড়িযে কেন? এখানেও ভিক্ষা করছে? তাহলে? তাহলে? ধক্ করে উঠল বিমলার বুক। একা কেন? একা কেন? বাস ছাড়ছে যে। মরণচাঁদ কি শেষ পর্যন্ত ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে? পরের ছেলে বুঝি? মাসির? চুরি করা? হসপিট্যাল থেকে কুড়িয়ে আনা, তাই?

বাস গোঁ গোঁ করে উঠছে।

ওঠে, ওঠো ; উঠে পড়ো তোমরা।

ছেলেটির হাত ধরে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল বিমলা।

কেউ বললে, অন্ধকার বাস। আলো জ্বালাবার চেষ্টা করে মৃদু লাল আভা একটা ফোটাতে পারল বাল্‌বের গায়ে। মানুষগুলিকে চেনা যাচ্ছে না। কথা নেই কাবো মুখে। কে যেন উলু দিতে গিয়ে থেমে গেল। কান্না হয়ে গেল সেটা। বিমলা শক্ত লোহার মতো মুঠিতে হাত চেপে ধরল ছেলেটির। কাঁদছে ছেলেটা। হাত ছাড়ানোব চেষ্টা করছে সে। বাস ঝাঁকি দিয়ে উঠল। পথটা অসমান। বোধ হয় গুঁতো খেলো কেউ কেউ। কুৎসিত ভাষায় কে গালি দিয়ে উঠল। আরো কেউ কেউ কাঁদছে।

বিমলা হাঁপাতে লাগল। গরমও নয়, অন্ধকারও না, এখন বিকেল। অন্ধকাবে পাশের বউটা বুক আলগা করে সেখানে তার ছেলেকে টেনে নিল। বিমলাও কি তাই করবে নাকি? হাঁটুটা টাটাচ্ছে ব্যথায়। উঠতে গিয়ে গুঁতো লেগে থাকবে। মরণচাঁদ যায়নি এমন হতে পারে। কিন্তু এব যে যাওয়া দরকার। ছেলেটিকে বুকের উপরে চেপে ধরল বিমলা।

ঝাঁকি দিচ্ছে বাস। উঃ। ড্রাইভার কি এ পথে নতুন? কিংবা নিচে থেকে রাজপথকে যতটা সমতল বোধ হয়, তা নয়। বন্ধুরতার ধাক্কা লাগছে যাত্রীদের।

দুলছে বিমলা। হাত ছাড়াতে না পেরে তার কোলে মুখ রেখে কাঁদছে ছেলেটি। অনেকেই কাঁদছে। অন্য অনেকে কাঠ হয়ে বসে আছে।

আলো কেন হচ্ছে না? কুৎসিত ভাষায় গালি শুরু হল আবার। আলো, আলো। আর্ততাবও যেন তরঙ্গ আছে। আর এক ধমক এসে পড়েছে। এ কি আকুতি? এখনই কি আলো দরকাব? আলোতে কি সব ভয় যায়?

ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িটা থামাল। কেউ নেমো না যেন গাড়ি থেকে। আলো ঠিক করব। পিছনেব দরজা খুলে সে গাড়ির ভিতরে উঠল। বাল্‌বটা বদলাবে। যেটুকু আলো ছিল তাও নিবে গেছে।

পিছনের দরজাটা খোলাই। নিঃশব্দে নেমে পড়ল বিমলা ছেলেটির হাত ছেড়ে। আর কে যেন নামতে যাচ্ছিল। ড্রাইভার ধমকে উঠল—এইও ধরো তো ওর হাত। কে যেন ছেলেটিব হাত চেপে ধরল। কাঁদল ছেলেটি। এইও, চুপ। ধমকালো ড্রাইভার।

এবার আলো জ্বলেছে বাসে। হু হু করে সেটা বেরিয়ে গেল।

পথে আলো পড়েছে। পরের বাসটাও আসছে বোধ হয়। বিমলা পথের একেবাবে ধারে গিয়ে দাঁড়াল। শহরের বাইরে। পথের ধারে আগাছার জঙ্গল। অন্ধকারও নামছে এতক্ষণে। বিমি বললে, খর, দূষণ, হেলায় লংকা করিল…। কেউ কি শুনতে পেল? বিমি নিজেই শুনলে না। তার নিঃশ্বাসে গলার মধ্যে করাত চলছে শব্দ করে।

কত হল রাত? খুব বেশি হয়েছে কি?

ভুবনবাবুকে বিমর্ষ দেখাল। পরপর দু'সন্ধ্যা বিমলা ফিরতে দেরি করে ফেলেছে। কাল মালতী এসেছিল। আজ সে-ও আসেনি।

বিমলা বলল, 'না। দরজা দিয়ে দাও। তুমিও এসেই গেছ। আজকের মতো বাইরের সঙ্গে চুকে গেছে আমাদের'।

সে হাসল ভুবনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে।

'কিছু বলছ না যে'?

'কী বলব'? ভুবনবাবু বলল।

'কেন, ফিরতে দেরি করলাম। তার জন্যে ধমকে দিতে পারো না। কেন তুমি তা দেবে না'?

'বোসো। হাঁপাচ্ছ এখনও'। ভুবনবাবু বলল।

রান্না করবে বিমি। ভুবনবাবুকে খেতে দিতে হবে। রাতও হয়েছে। কাল স্কুলে যেতেই হবে। পিছন ফিরে উনুনের দিকে মুখ করে বসে আছে বিমলা। তার গা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ম্যানেজার অফিসে ডেকে বলল, 'তোমাকে বরখাস্ত করা হল বিমলা। তুমি তিনদিনের মধ্যে কোআর্টার্স ছেড়ে দেবে'।

আপনি নয়. তুমি। তিনদিন।

তার আগে সেই ধর্মঘট। দাঙ্গাও।

সে গেল শ্রমিক সংঘের প্রধান কর্মকেন্দ্রে। চা বাগানের আওতার বাইরে, মহকুমা শহরে। এ অঞ্চলের পুরনো ইউনিয়নগুলিকে স্থানচ্যুত করে নতুন ইউনিয়ন স্থাপন করার জন্য তিনি রাজনীতি থেকে দু'পা সরে এসে এই মহকুমা শহরে বাস করছেন নেতা। সফলও হয়েছেন। অনেক বাগানেই ছোট ছোট ইউনিয়ন স্থাপন করতে পেরেছেন। সোয়েথয়েটেও হল। খেজুর গাছেব গায়ে বট গাছকে পরগাছা হয়ে বসতে দেখেছ?

বিমলা হাসি হাসি মুখেই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও বিশ্বাস ছিল সংঘ নেতা এত ধর্মঘটী শ্রমিককে কাজে বাখতে পারছেন, তার বেলা কি এমন কঠিন হবে কাজটা। চাকরিটা তার জীবন সমান।

বিমলা বলল, 'আমার চাকরি গেছে শুনেছেন'?

নেতা অতি ভদ্র ভাষায় অতি মৃদু কণ্ঠে যা বলল, তার সারমর্ম এই রকম. চাকরি কি থাকে? শ্রমিক নেতৃত্বকে কর্তৃপক্ষ কখনও বরদাস্ত করে না। তার নিজের চাকরিও একদিন এমন করেই গিয়েছিল। বড় চাকরিই সে করত। সাত আটশো টাকার।

'কিন্তু আমি···চাকরি ছাড়া···

'এ বিষয়ে সংঘ কী করবে? আপস হয়েছে। এখন কি নতুন কিছু করা যায়? আর আইন অনুসারে আপনি একজন অফিসার। অফিসারকে কোনো অবস্থাতেই ওরা সংঘের সভ্য বলে মানতে রাজি নয়'।

'উপায়'? বিবর্ণ মুখে বিমি বসে পড়ল টুলটার উপরে।

বিমলা তার কোআর্টার্সে ফিরে এল। কাঠের বাড়ি। পুরনোও বটে। সস্তা ছিট কাপড়ের পর্দা ফেলা। সাজানো গোছানো দু'খানা ঘর। উপচার আর কোথায়? বরং যেন এক ধরনের কঠোরতাই। তাহলেও।

কিন্তু এই ঘরেই সৌম্য তাকে নতুন জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে। অনেক সন্ধ্যা, অনেক বিকেল থেকে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি।

না, না। সৌম্য সংঘের নেতার মতো অত বড় নয়। মনে পড়ল বিমির ম্যানেজার এবং নেতার ভ্রূর গঠনে যেন বেশি রকমের মিল ছিল। কাঠিন্য, প্রভুত্ব ও কঠোরতা।

আর। বিমলা উঠে গিয়েছিল আয়নার সামনে। বোঝা যায় এখনিই, তার দোষ নয়। কিছুতেই তার দোষ নয়। এক ধরনের আদিম স্বাধীনতাবোধই বরং জন্মেছিল তার নিজের। ভেবেছিল বিমলা, জীবন পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু কোথায় গেল সে? ধর্মঘটের মধ্যেই একদিন কোথায় চলে গেল সৌম্য। হয়তো অন্য কোনো শহরের অন্য কাউকে মিষ্টি করে ডেকে নতুন ধর্মঘটের ব্যবস্থা করছে। এখানকার বিমলা তার কাছে ব্যবহারশেষের মৃৎপাত্র?

বিমলা স্নান করল না, রান্না করল না। চোখেব জল মুছে, নিজের কোআর্টার্সের ঘরগুলিতে

ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেন সে মুঠি মুঠি করে ধরতে চায়। ঘরের ছিট কাপড়ের পর্দা, ঘরের দেওয়াল। চৌকিতে বসে সত্যি সত্যি সে চৌকির ধাব চেপে ধরল। যেন কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাবে—সে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় ঘরটিকে।

কোথায় যাবে সে, কোথায়? বারান্দায় বেরুতেও সাহস হয় না।

'ম্যানেজারসাব'। বলল ঝি। ফ্যাক্টরির খাতায় শ্রমিক হিসাবে নাম লেখা থাকলেও, সে বিমলার ঝি। অন্তত এতদিন তাই ছিল। শ্রমিকসংঘের সভ্যা হিসাবে তারও মাইনা বেড়েছে ধর্মঘটের আপসে।

ম্যানেজারসাব নয়, বড়বাবু। কোঁচানো চাদর গলায়, আঙুলে অজস্র আংটি।

'বিমলাদেবী, আপনাকে সুখবর দিতে এলাম। ম্যানেজার সাহেবকে ধরেছিলাম। কাল থেকে আর তিনদিন আপনাকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছেন'।

'তাহলে'? আর কিছু বলতে পারল না বিমলা।

'আপীল করে চাকরি রাখা যায় কি না তাও দেখতে হবে'।

'আমিও আপনার মতো ওদের পাল্লায় পড়ে ঠকেছিলাম একবার। যাক সে কথা'।

বিকেলে এল বড়বাবু, সকালেও এল সে।

ক্যাম্পে কি পথে ফিরে যেতে হবে না, যদি সে বড়বাবুর কথা শুনে চলে। ক্যাম্পে নয়, পথে নয়—সারাদিন এই ভাবল সে। নিজের আঁচলটা তুলে চোখের সামনে ধরে সে মনে কবল কী ময়লাই ছিল আঁচল, ক্যাম্পে থাকবার সময়ে। শুধু কি একটুকুই?

'আপনার আপন বলতে কেউ নেই, এ খবরও আমরা পেয়েছি'। বড়বাবু বলল!

'সত্যি আমার কেউ নেই'।

কিন্তু সৌম্য? সে কি জানত না, এই ধর্মঘটেব মতো ব্যাপারে তাকে জড়িয়ে দেয়া কতখানি অবিমৃশ্যকারিতা? সে কি মুখ দেখাতে পারছে না বলেই পালিয়েছে?

'কিন্তু, বাড়তি তিনদিনের আর দু'দিন আছে। এখনই স্থির করুন, যাবেন না থাকবেন'?

চমকে উঠল বিমলা। মনে হল সে কেঁদে ফেলবে। কোথায় যাব?

'তিন দিনকে তিন মাস, তিন বছরও করা যায়'।

চমকে উঠেছিল সে। আর কোঁচানো চাদর গলায, সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল, সরু করে কাটা যার গোঁফ, মৃদু মদের আর পানমশলার গন্ধ যার মুখে। বড়বাবু বলেছিল, 'আপনার অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট নেই। চা বাগানে তত ধরে না। আপনি আধুনিকা তা বোঝা যায়। আপনার রূপ আছে, রূপসীই। আর আপনিই আপনার গার্জেন। সৌম্যও আর ফিরবে না'।

'আপনি কি তিন দিনকে তিন বছর করতে পারেন'?

'করেছি। এই দ্যাখো সেই তিন দিনের হুকুম'। বড়বাবু একটা কাগজ ছিঁড়ে ফেললে।

'প্রথম থেকেই তোমাকে দেখছি, আজ এই আলোতে আরো ভালো। বসি বিছানাতেই। তত রাত হয়নি। তোমার ঝি এখানে আসতে দেখেছে, তা সে রকম ওরা অনেক দেখে। তুমি একা, তোমাকে দেখতে হয় না'?

'আপনি কি এরই মধ্যে এই বাংলোয় তিন বছর করতে পেরেছেন সত্যি? আমাকে চলে যেতে হবে না'।

'গভীর রাতেব চাইতে এই সময়টা ভালো'।

দুঃখিত হতে হতে বরং উদাস হল বিমি।

বলবে কি? —সৌম্য বসন্তে ফোটা নতুন জীবনের চম্পককলি আর আধপাকা কোঁকড়ানো চুলে আধেক কপালঢাকা বড়বাবু অভিজ্ঞতায় দক্ষ নিদাঘ কাল, যা মউলের গন্ধ মধুকে রসালে পরিণত করে; নীল মাছি আসে।

বেআল্লিশ থেকে বাহান্ন উদ্বাস্তু। হতে পারে সে ঘর পরের, কিন্তু নিজস্বই বলা যায়, যার কাচের শার্সি বজ্রযোগিনীকে মনে আনে। কিন্তু বাড়ি ছাড়াও, সে কি নিজস্ব, নারীদের যে রকম থাকা স্বাভাবিকতা পরীক্ষা করা? কিন্তু পান আর মশলা মুখে পচে ওঠে।

'তাহলে নাম বলুন তার। সৌম্য না? সৌম্য গুহ'?

'হ্যাঁ। আপনি পুলিশ? বড়বাবু বলেছে সৌম্যর সংবাদ'?

ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

এটা একেবারেই মিথ্যা কথা, শুধু কবি-কল্পনা যে জন্মের আগে ভ্রূণ, তা সে যতই পরিপুষ্ট হোক, কখনও তার ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। কল্পনা, কল্পনা। সেটা কান্না ছাড়া কিছুই নয় যা বিমলা অনুভব করেছিল। গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। এ কখনও হতে পারে, অন্তঃস্থ ভ্রূণ হাত তুলে তার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, সেই অস্বাভাবিক অভিযোগের সময়ে? আসামীর কাঠগড়ায় সৌম্য, আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় সে। শ্রমিকদের উসকানি দিয়েছিল সে-ই। শ্রমিকরা সাক্ষ্য দিল। অনেকবারই তাবা এ ধরনের সাক্ষ্য দিয়ে থাকবে। বিমলা শুধু বলল, তাকে সংঘ গড়তে পরামর্শ দিয়েছে সৌম্য, তাকে চালিয়েছে সৌম্য, চাকরিও সেই করিয়ে দেয় বড়ুয়ার সুপারিশে।

সৌম্য কিছুই বলল না। কাঠগড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে পাকানো কাগজ গুঁড়ো গুঁড়ো করে কুটি কুটি করে মেঝের উপর ফেলে দিচ্ছিল সে। চোখ তুলেও সে চায়নি। যেন লজ্জায় তার দৃষ্টি সংকুচিত।

আর সেনাপতি সৌম্য, আমি কি তোমার খরচ করা যায় এমন সৈনিক ছিলাম?

উনুনের ঠিক উপরে শূন্য অন্ধকার ঝিলমিল করে কাঁপছে। চোখ জ্বালা করছে। জল এলে কিছু শান্তি পাওয়া যেত।

আ, সৌম্য। কিংবা একি তোমার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পথের সঙ্গে আমার পরিণতির পথের বিরোধ। এই কি অনিবার্য ছিল। পূর্বনির্ধারিত এমন কিছুই কি ঘটে থাকে?

ভাতের জল বসাল বিমি। একটু দেরি হবে। আর একবার চা করে দেবে ভুবনবাবুকে?

সময় সময়। আদি অন্ত কেউ পায় না। কিন্তু একটি বিন্দুতে সে তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু সে তো অমনিবাস নয় যে ইচ্ছে করলে নামা-ওঠা যাবে। সময়ের কল্পনাকে যদি বাসের কম্পনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলো তো তোমারই ভুল। সময়ের আশ্রয়বিন্দু থেকে একবার স্খলিত হলে আশ্রয় পাওয়া যায় না। যাকে ত্যাগ করেছ তাকে কি আর আপন করে পাওয়া যায়? মরণচাঁদের ছেলেকে নিয়ে তুমি শুধু অনেক কল্পনা করতে পারো। যে সম্বন্ধ তুমি নানা ভাবে মুছে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে দিতে তুমি পারো না।

বিমি শুকনো কান্নায় ফোঁপাতে লাগল।

কিন্তু সেও তো একধরনের স্থিতি লাভ, কতকটা যেন শান্তিই। নির্বাস কি সেটুকু স্থিতিও পেতে পারে? কালক্রমে পুরনো জ্বালাগুলো জুড়িয়ে আসবে। আরো কিছুদিন জ্বলার জন্য নতুন কিছু তাকে সংগ্রহ করে রাখতেই হবে।

কিন্তু কারা যেন হা হা করে কেঁদে উঠল কোথায়। বাইরের আগর ঠেলছে কেউ।

'ও কী' চমকে উঠল বিমি উনুনের সামনে।

ভুবনবাবুর সাড়া পাওয়া গেল, সে টেবলল্যাম্প নিয়ে বাইরে এল।

বিমিকে দেখে বলল, 'সেই মা-টিই বোধ হয় কাঁদছে'।

'মা'?

'নতুন বাড়ির বউটি। সন্ধ্যা থেকে তার ছেলেটিকে পাচ্ছে না। সেই যে চাকা চালাত'।

আগর ঠেলে মালতী এল। 'বউদি ফিরেছে? এই তো, চা খেযেছ'?

'কারা সব কাঁদছে'? বিমলা বললে।

'হ্যাঁ। তুমি সবো, চা কবে নিই। আমিও খাব'।

মালতী হাঁড়ি নামিযে কেটলি বসিয়ে বারান্দায এল।

'অনেক খোঁজাখুঁজি কবছে সকলে'।

'কেন'?

'গাড়িতে উঠবার তাড়াতাড়িতে কোনো কোনো পরিবাব টুকবো টুকবো হয়েছে। কোনো বাবা মা তাদের শিশুদেব থেকে বিচ্ছিন্ন হযেছে'। মালতী বলল। 'কালও তো কয়েকটা বাস যাবে। তাতে গেলে ছেলে খুঁজে পাবে'।

ভুবনবাবু বললে, 'তা ছাড়া গাড়ি তো আসবে মাঝে মাঝে, তখন আবাব পবিবাবগুলো এক হতে পাববে। বোসো বিমি।'

চা নিয়ে এসে মালতী বললে, 'সেই যে মরণচাঁদ আর সোদামুনি, তাবা তাদের অবিমন্নুকে খুঁজছে। মাসিই আবার নিয়ে পালাল কি না কে জানে'।

সে ঢকঢক কবে চা খেলে। জিজ্ঞাসা কবলে ভাতেব হাঁড়িতে চাল ছাডবে কি না।

বিমলা টেবল্ ল্যাম্পেব কাছে বাবান্দায বসে পডেছিল মেঝেতে। ভুবনবাবুও সেখানে বসে বললে, 'এমন কী তাড়াতাড়ি মালতী'?

মালতী চা খেযে চলে গেল কাজেব খোঁজে।

ভুবনবাবু বললে, 'বোসো, বিমলা, এখানে চা খাওযা হোক। তোমাব চোখ দুটি বেশ লাল, নাকও, সর্দি লেগেছে? আবে আবে, তোমাব বালাজোড়া কই'।

বিমলা যেন নিজেব খালি হাত দুটোকে দেখে অবাক। বললে, 'ওহো। ওরা সব চলে যাচ্ছে, ওদের সামনে সোনা পরতে লজ্জা হল। বালিশেব তলে আছে। আনো না, ভুবনবাবু, আবাব পবিযে দিলেই বা। জানো ভুবনবাবু, একজন স্কুলমাস্টারের বিমিকে ধর্মপত্নীই ভাবা উচিত লোকের। নষ্টচবিত্র স্কুলমাস্টারেব চাকবি থাকে না'।

সে দেযালে হেলান দিযে বসল।

ভুবনবাবু বালাজোড়া খুঁজে পেযে সেখানে আনলে। বিমি হাত বাড়িযে নিয়ে পরে নিলে। বললে, 'ভাবছি, ভুবনবাবু, বাবান্দাটাকে ঘিরে গ্রিল দিযে নিলে কেমন হয। আব নিচের ধাপ সমান উঁচু করে বাড়ির সামনের দিকটাকে ইট সিমেন্টে বাঁধিয়ে নিলে। ফুলের টব বসানো যায়। আমরাও এ বকম বসতে পাবি বিকেলে'।

ভুবনবাবু বললে, 'কিন্তু বিমলা একটা কথা শোনো। তোমার নাক চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মুখ লাল হযে উঠেছে। এটা ধুলো সাধারণ সর্দি নয়। ক্যালপল জাতীয় কিছু খাবে'?

বিমলা সোজা হয়ে বসল। আঁচলে চোখ মুখ মুছলে। বললে, 'রান্না কবতে যাই'।

সে উঠে দাঁড়িযে বললে, 'আচ্ছা, ভুবনবাবু, দিদি যখন চলে গেল আমরা কিন্তু এক ফোঁটা ওষুধ যোগাড করতে পাবিনি। সেটা কি শান্দেব স্টেটে, না ইম্ফলে? ভাবতে ঢুকে, তাই নয়'?

গল্প

সাদা মাকড়সা

তুমি যে প্রশ্নটা করেছ সোজাসুজি তার উত্তর দেওয়া যায় না। কে কখন কী কাজ করে, কেন করে এ যদি বলা গেল তবে পৃথিবী সম্বন্ধে সব বলা হল, সীমাবদ্ধ করা হল। মানুষের মনকে কখনও পরিসীমায় বর্ণনা করা যায়?

লাভ-ক্ষতির হিসাবে যদি অর্থনীতি বড হয়, এটা তবে আমার লোকসানের কারবার। স্বাধীন ব্যবসা বলে একে যতই তারিফ করি, এতে ভিতসমেত বসে যাবার ধসে যাবার ভয় আছে। তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমি অনুভব করছি (অন্য কোনো কোনো সময়েও করি) : চা বাগানের ম্যানেজারির বেতন-ভাতা-বোনাস এবং অন্যবিধ পাওনা-যুক্ত চাকরি নিশ্চয়ই আরামপ্রদ ছিল। একজোড়া মধ্যবিত্ত প্রাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল জীবন।

তুমি ভাবতে পারো কিছু একটা ঘটেছে, কোনো পীড়াদায়ক ঘটনা। কিম্বা কন্ট্রাক্টের ব্লুপ্রিন্টে ছিল না এমন কোনো গরহিসাবি পাহাড় মাথা তুলেছে আমার রাস্তায়। আর সেইজন্যই আমার এই দুঃখের সুর। তা নয় কিন্তু।

বহুদিন আগে যখন ইংরেজি উপন্যাস পড়ার মতো মনের অবস্থা ছিল, সে সময়ে (এবং এ কথা মনে আনার মতো মধুর স্মৃতি কি কিছু নেই?)—একখানি বই আমাদের ভালো লেগেছিল। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রৌঢ়-প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোথায় যেন কিশোর প্রাণ লুকিয়ে থাকে ; কখনও যৌবনের চপলতায় সে উৎসারিত হতে চায়, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠার যে রেশমগুটিতে সে প্রাণ আবদ্ধ, কেটে বেরুনোর পক্ষে তা প্রৌঢ়ের কাছে অত্যন্ত শক্ত। তবু কর্মস্থল, শেয়ারবাজার ও ক্লাবে ছড়ানো কিছু মর্যাদায় মিশানো দিনের স্বল্প এক অবকাশে একমুঠো এক ফুলের মাঠ দেখে প্রাণ চঞ্চল হয়, আর উল্লেখ করতে পুরুষজাতীয় পক্ষ থেকে লজ্জা অনুভব করছি—ধোপাদের দড়িতে শুকাচ্ছে এমন স্ত্রীলোকের পরিধেয় দেখে বেহায়া মেয়ের কথা কল্পনা করতে থাকে।

পাহাড়ি রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে বড় একটা পরিচ্ছন্ন পাথরে বসেছি। তাঁবু থেকে চার-পাঁচশো গজ এগিয়ে আর রাস্তার যে অংশটায় সিমেন্টের সঙ্গে চাকা চাকা পাথর মিশিয়ে কজোয়ে গেঁথে তোলা হচ্ছে তার থেকে প্রায় ততটা পিছনে। সম্মুখে রাস্তা। বাঁ দিক দিয়ে একটা প্রাকৃতিক পাকদণ্ডীর পথে নেমে গেলে একটা পাতা ঢাকা ঝরনার জল তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। পাথরের খাঁজে খাঁজে মরচে রঙের জল। জলে পাতা পচে অমন সর পড়ে যায়। ঝরনাটার ধারে দু'একটি বড় গাছের গোড়ায় মস ও ফার্ন জাতীয় কিছু আগাছা। সেখানে সূর্যালোক নেই। বোধ হয় সেখানে নেমে গেলে ঠান্ডায় গা শিরশির করে উঠবে। ঐ ফার্নগাছগুলির শীতলতায় ঝিঁঝি ডাকছে। ঘড়ির কাটায় এখন দু'টো বাজে দিন। ডানদিক থেকে বহু শ্রমিকের মিলিত কোলাহল কখনও ভেসে আসছে।

পাথরটার পাশে যেখানে আর একটা পাথর লেগেছে সেই সন্ধিস্থলে উড়ন্ত আবর্জনা জমে জমে সারবান দোআঁশ মাটি তৈরি হয়েছে। কোথায় ছিল রডোডেনড্রনেব বীজ, উড়ে এসে সেই মাটিটুকুতে কিশোর একটি গাছ হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ সার্থকতা পাবে এমন ভরসা করি না। শিকড় প্রবেশ করিয়ে দু-পাশের পাথর দুটি ফাটিয়ে ধুলো ধুলো করতে পারলে হয়তো-বা সম্ভব ছিল। গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দু'টি মাকড়সা চোখে পড়ল। ক্রীড়া অবসান হলে তাদের পুরুষটি পাথরের উপবে আছড়ে পড়ল। ভাবলাম মরে গেছে, কিন্তু তার চাইতেও করুণ : ছ'পায়ের চারখানাই ভেঙে গেছে ;

পড়ে যাচ্ছিল বলেই গতি, পড়তে পড়তে যে গতি।

টেবল্ ল্যাম্পের আলোয় বসে দুপুরের এই ব্যাপারটা থেকে আমার মনে হচ্ছে জীবনটাই একটা স্ত্রী-মাকড়সা। কিন্তু তারা কি সংখ্যায় একাধিক? সমাজ-আবদ্ধ জীবন থেকে নতুবা কে আমাকে বাইরে টুইয়ে আনল? সমাজজীবনের উপমা যদি মাকড়সা হয় তবে এ কি দ্বিতীয় একটি?

তার স্বরূপ নিজের ক্ষেত্রে বুঝতে পারছি না বটে, গোকুলের ক্ষেত্রে পারি যেন।

আমাদেব সেই গোকুলই বটে। অবশ্য তাকে আমি মনে কবিয়ে দিইনি ডাকঘরে আমার কাছে লেখা তোমার চিঠিগুলো পৌঁছে দেওযার জন্য সে তখন কী বকম করে ছুটত। আমাব তাঁবুর পাশে ওর তাঁবু, কিছু না-বলে এইটুকু অধিকার ওকে আমি দিয়েছি। দুপুরে রোদেব কথা বলেছি, এখন হাড়-কাঁপানো শীত। রাত দশটা হয়েছে। এ জায়গাটায় তাঁবু ফেলেছি কিন্তু ক্যাম্প কবার মতো নয়। কী করা যায় বলো, দু-তিন দিকে পাহাড়ের দেওয়ালের মাঝখানে একফালি অধিত্যকা সর্বত্র পাওয়া যায় না। কাছিমের পিঠের মতো এ জায়গাটা। ক্রমশ উঁচু হয়ে সামনের চূড়ার দিকে উঠে গেছে। আমার রাস্তা এখন এই চূড়াকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে দু' একটা বার্চ গাছ মাত্র আছে। হু হু করে বাতাস বইছে। পাহাড়ি শীতের স্রোত তৈরি হচ্ছে। গনগনে আগুনের ধারে বসে চিঠি লিখছি। একটি মজুর মাঝে মাঝে এসে আগুন উস্কে দিচ্ছে। চবাচর নিস্তব্ধ। ঝিঁঝির ডাকও শুনছি না। আমার না-হয় চিঠি লেখার তাগিদ আছে, গোকুলের কী কাজ? উকুন ও পিসুপোকা-সমেত কম্বল মুড়ি দিয়ে মজুরের দল তাদের ছোট ছোট তাঁবুতে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি গোকুলের তাঁবুতে আলো জ্বলছে। ওর ছায়া তাঁবুর দরজার সামনে নড়ছে। আমি না দেখেও বলে দিতে পারি, সারাদিনে কতজন মজুর কত ঘণ্টা কাজ করেছে এবং তার দরুন কত তাদেব পাওনা হল এই হিসাব জুড়ছে সে। অত্যন্ত শীতে একভাবে বসে থাকতে পারছে না, সেজন্য মাঝে মাঝে উঠে পায়চাবি করছে। কিন্তু আমার অন্যান্য টাইমকিপাররা এ রকম করে না। তারা দিনের বেলাতেই তাদের কাগজ নিয়ে বেড়ায়, কাজ হচ্ছে আর টুকে যাচ্ছে। সে সময়ে গোকুলও হিসাব টোকে কিন্তু তার চাইতেও বেশি নজর রাখে কাজেব দিকে। কাজ না কবলে মজুরদের ধমকায় না; হেসে, গল্প করে, কখনও-বা চা এগিয়ে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। এমন নিবলস কর্মী খুব একটা দেখিনি। ওব শ্রমিকদের প্রতি মানবসুলভ ব্যবহারের ফলে অভিজ্ঞ মজুররা ফাঁকি দিচ্ছে। আব তার কাজের উপরে আত্যন্তিক ঝোঁক দেখে আমার মনে হয়েছিল কাজেব হেরফের কবে অন্য টাইমকিপাবদের চাইতে সে বেশি ভাগ বসাচ্ছে মজুরদের মজুরি থেকে।

কলেজে পড়াব বয়স গোকুলের। যদি তোমার সেই সম্পর্কের খুড়ো বেঁচে থাকতেন তবে বোধ করি ও কলেজেই পড়ত।

সংসারে জড়িয়ে পড়ে এই প্রথম যৌবনেই গোকুল নিজস্ব বলে কিছু ধরে রাখতে পারল না। ওকে ডেকে আমি বলেছিলাম—দামি না হোক, কম দামি একটা গ্রেটকোট করিয়ে নিও। এত শীত সইবে না।

খবর নিয়ে জেনেছি ও মাইনার টাকা এক পয়সাও নিজের জন্য খরচ করে না। আমার ফার্ম থেকে মজুরদের জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করেছি সেটাই ওর একমাত্র আহার্য। ক্যান্টিন থেকে কেউ কোনোদিন তাকে কিছু কিনতে দেখেনি। পরিজন-হিতৈষণার কুক্ষিগত হয়েছে ও, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু ওর পাগলামিও আছে। মার্কসবাদী কাগজপত্রে ওর নেশা আছে। ইতিমধ্যে এক কৌশল করে ও মজুরদের মজুরি দৈনিক দু'পয়সা বাড়িয়ে নিয়েছে। খানিকটা তর্ক করেছিল সে এ বাবদে।

মনে হচ্ছে এই এক দ্বিতীয় ঊর্ণনাভ ওকে পাকে ফেলেছে।

শীত আর সহ্য হয় না। আগুন-পরিচারককে পাঠিয়ে দিলাম গোকুলকে নিরস্ত করার জন্য। কোনো মাকড়সার পীড়নে ঘুম বর্জন করা মহাপাপ।

ব্যালেন্টাইনের কথা মনে আছে? তার চেহারা হয়তো তোমার মনে পড়ছে না। তোমার বহুদিন

ধারণা ছিল ম্যাগদালেন চা বাগানের ম্যানেজারি আমি ছেড়েছিলাম ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে। সেই ঝগড়ার মতো ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু কিছু তোমার কাছে গোপন করেছি। তুমি এতসব জানলে তোমাব মন খারাপ হতো। চা বাগান সম্বন্ধে, যেখানে আমার কৈশোব ও যৌবন কেটেছে, একটা কুৎসিতের ধারণা হতো তোমাব, ভবিষ্যতের শান্তি বিঘ্নিত হতো।

ব্যালেন্টাইন চা বাগানে কাজিনসাহেব নামে বিখ্যাত হয়েছিল। সে চা বাগানের মালিক দ্বিতীয় জনের সময়েও মাঝে মাঝে আসত চা বাগানে। তখন আমার ধারণা ছিল দুঃস্থ আত্মীয় হিসাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়াই তার উদ্দেশ্য। সে চা বাগানে প্রায় পাকাপাকি থাকবাব ব্যবস্থা কবে নেয় দ্বিতীয় জনের পুত্র প্রথম হ্যারল্ডেব আমলে। দ্বিতীয় জন্ যখন যুদ্ধ লাগতে না লাগতে দেশপ্রেমের প্রেরণায চা বাগানের ভার ছেলেকে দিয়ে সিভিক-গার্ডে কাজ করার জন্য হোমে চলে গেল তখনই হ্যারল্ডের সঙ্গে ব্যালেন্টাইন এসেছিল। প্রায় মাস ছয়েক ছিল একনাগাড়ে।

ব্যালেন্টাইন ও আমাব পূর্ব পবিচয ছিল। দ্বিতীয় জনেব আমলেব মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন চা বাগানেব হেড গুদামবাবু ছিলাম তখন সে এলে আমাকেই তাব ঘোড়া-দাবড়ানোব সঙ্গী করত। কারণ হ্যারল্ড তখন তাব সিমলার স্কুল থেকে প্রায়ই ছুটি পেত না।

দ্বিতীয় জন্ চা বাগানের ভাব হ্যাবল্ডেব হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পাবেনি, আমাব হাতেও অনেকটা কার্যকরী উপায গ্রহণ কবাব ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছিল। চা বাগান সম্বন্ধে যা কিছু জানাবাব সেটা আমিই হ্যারল্ডকে জানাব, আব হ্যাবল্ড ছাড়া আব কেউ যেন চা-বাগানে নাক গলাতে না পাবে— এই দু'টি নির্দেশও সে আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। এর ব্যত্যয় হলে সে নাকি কবর থেকে উঠে এসেও আমাকে আঘাত কববে। অবশ্য তাব কিছু আগে মামাব উত্তবাধিকাবসূত্রে আমি চা বাগানেব ম্যানেজাব হযেছি।

চা বাগানেব অবস্থাটা তখন এই বকম শীত পড়েছে, চা বাগানেব অটম্ লিবস্ উঠে গেছে, কাজে ঢিলে পড়েছে ; ম্যানেজাবসাহেবেব বাংলো এবং সাহেব মালিকেব কুঠির মাঝখানের বড় লনটায টেনিসের নেট পড়েছে। হ্যাবল্ড ও ব্যালেন্টাইন বিকেল হওয়াব আগেই লনে নেমে পড়ত। কখনও কখনও তাবা আমাকেও ডাকত। টেনিসে যত সময ব্যয হতো তাব চাইতে বেশি হতো কাগজ খুলে যুদ্ধের আলোচনায়। লনের পাশে সবুজ রং করা বেতের গভীর নিচু চেয়ারে বসে কখনও ওরা জার্মেনিকে নস্যাৎ করত, কখনও-বা পবাজযেব উত্তেজনায ওদের মুখের চেহারা বদলে যেত। ওদের সম্মুখে বেতের টিপয়ে হালকা মদ থাকত সে সময়ে।

কিন্তু এ রকম অবস্থা বেশি দিন চলল না। ভাবতে অবস্থানকাবী ইংবেজ হিসাবে ব্যালেন্টাইনেব ডাক পড়ল বাজকীয় ভাবতীয বাহিনীতে যোগ দিতে। যেদিন চিঠিটা এল সে রাত্রিতে মালিকসাহেবেব কুঠির ব্যাঙ্কেট হলের বাবে আমি, হ্যাবল্ড ও ব্যালেন্টাইন প্রায় রাত ভোর করে দিয়েছিলাম নানা আলাপ আলোচনায়। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাগান প্রায় বারো মাইল দূরে ও সিকি মাইল উঁচুতে। সেখান থেকে বাগানের খোদ মালিক এসেছিল। সেদিন আমার অনুভব হযেছিল, বীর দেশপ্রেমিক ইংরেজেরাও যুদ্ধে যেতে ভয় পায়। তাদের বন্ধুজনেব মুখও শুকিযে যায়। সেদিন আলাপে আলাপে জানতে পারলাম ব্যালেন্টাইন রুবকি ও এডিনববাব গ্রাজুযেট। সে এঞ্জিনিয়াব হিসাবে যুদ্ধে যাচ্ছে। লোকটা যে এত কবিৎকর্মা তা জানতাম না। ভেবেছিলাম লালমুখো হোৎকা গোরাদের আর একটি হবে। এতদিন চা বাগানে গড়াত মদ, নভেল আর আলস্য নিয়ে।

ব্যালেন্টাইন চলে গেলে হ্যারল্ড চা বাগানে মন দিল। এ কথা আমার পরিচিতরা সকলেই স্বীকাব করবে দ্বিতীয় জন নিজে থেকে যা পারেনি, হ্যাবল্ডেব বাজ্যে তা-ও সম্ভব হল। বছরের শেষে হিসাব নিয়ে অভূতপূর্ব লাভের সন্ধান পাওয়া গেল। হ্যাবল্ড নিজে থেকে আমার জন্য একটা মোটর আনিয়ে দিল। কিন্তু এসব বছরের শেষে ; তাব আগে হ্যাবল্ড ও আমি যেন পুরনো কাগজের মধ্যে সাপ দেখে চমকে উঠলাম।

দ্বিতীয় জনের আমলে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও ম্যানেজার একই ব্যক্তি ছিল, এবং ব্যক্তিটি আমার মাতুল। কাজেই সত্যের উদ্‌ঘাটনে আমি এবং হ্যারল্ড প্রায় সমান লজ্জিত হলাম। খরচের ঘরেই বেশি গোলমাল। অনেক স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, এমনকী নতুন একটি কলঘর স্থাপনের ইতিহাস আছে কিন্তু সেসব সম্পত্তি ও কলঘর স্বপ্নসৌধমাত্র। মালিক ও ম্যানেজারের সহযোগিতা ছাড়া এ রকম হিসাব খাড়া করা যায় না।

হ্যারল্ডের বয়স তখন বছব কুড়ি হবে। হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান ছেলে, যদিও বলে রাখি : দেখলে একজন পুরো মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু ঠোঁট দুটি ও গাল আপেল রঙের, ঠোঁটের উপবে কমলালেবু বঙের গোঁফের রেখা। চোখ দুটিতে দুষ্টুমি ছিল, বজ্জাতি ছিল না।

ব্যাপারটা বিস্ময়েরও বটে। নিজের উঠোনে কে গর্ত খোঁড়ে, শখ করে কে বাগানে লাগায় বিছুটি? কিন্তু হ্যারল্ডের কথায় আমি বুঝতে পারলাম এসবই করা হয়েছে বাগানেব হিস্যাদার তার এক পিসি এবং কাকার এক মেয়েকে ঠকানোর জন্যে!

গভীর রাত্রিতে হ্যারল্ডের শোবার ঘরে বসে পরামর্শ হল।

'বোনার্জি কী উপায়'?

'উপায় এই, যেসব কাল্পনিক খরচ আছে সেগুলোকে সত্যে পবিণত করতে হবে— কলঘব, সম্পত্তি সব'।

'তুমি কি মনে করো, প্রকাশ পাবে না'?

'কাগজপত্র কিছু জাল করতে হবে। প্রকাশ পাবে একসময়ে কিন্তু ডিবিডেন্ড সময় মতো পেলে হিস্যাদার সহসা গোলমাল করে না তো'।

'তুমি আমাদের জন্যে এত করতে যাবে কেন'?

'আমাব মামার জালিয়াতি ঢাকাব জন্যে। কিন্তু কেন বলো তো ম্যানেজিং পার্টনার জনের এত টাকাব ঘাঁকতি হল? তোমার মা তো শুনেছি পাদরির মেয়ে, অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ী, তোমাব জন্যও লাখ দু-লাখ কিছু খরচ হয়নি'।

হ্যারল্ডের রক্ত এখানে চিড়বিড় করে উঠে থাকবে। কিন্তু সে সামলে নিল। কোনো কোনো সময়ে ম্যানেজারকে বন্ধু বলে মানতে হয় অবস্থার বিপাকে।

সে বোধ হয় দ্বিতীয় জনের এসব ব্যাপাবের কারণটা জানত কিন্তু জানলেও সব কথা বলা যায় না।

সেদিন থেকে হ্যারল্ড এবং আমি বাগানের ব্যাপারে প্রায় একাত্ম হয়ে গেলাম।

কিন্তু ব্যালেন্টাইনের কথা বলছিলাম।

একদিন হ্যারল্ডের সঙ্গে কথায় কথায় ব্যালেন্টাইনের কথা উঠে পড়ল।

'ব্যালেন্টাইন ডিবিডেন্ডদারদের কেউ নয় তো? সে তো 'কাজিন' শুনি'।

'না'।

'তাকে এসব কিছু বলো নি তো'?

'পাগল নাকি। তবে ওর কিন্তু পার্টনার হওয়ার লুকনো সাধ আছে'।

বস্তুত ব্যালেন্টাইন চা বাগানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহশীল। দ্বিতীয় জনকে সে ভয় করত কিম্বা তার কাছে পাত্তা পেত না বলে সে তার আমলে চুপ করেছিল। কিন্তু ভরসা এই সে তখন যুদ্ধের দরুণ দূরে আছে।

মানুষ যেটাকে ভয় করে সেটার যেন আগে আগে ঘটে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। একদিন এক ইয়াংকি জীপে চেপে ব্যালেন্টাইন উপস্থিত। সে একা নয়, সঙ্গে দুজন ইয়াংকি সেনানী। তাদের দু'জনই বরং হ্যারল্ডের সমবয়সী, সবেমাত্র এই দশকের ঘরে এসেছে।

ব্যালেন্টাইন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ।

হ্যারল্ড আমার সঙ্গে লুকিয়ে কোথাও পরামর্শ করবে এমন উপায়ও রইল না। দিনরাত ব্যালেন্টাইন তার বন্ধুদের নিয়ে চা বাগানের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইয়াংকিদের চায়ের খুঁটিনাটি বোঝাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাজে অবৈজ্ঞানিক খবরও দিচ্ছে। হ্যারল্ড দলের সঙ্গে থেকেও নেই। নেহাত অতিথি, তাই সকলের পিছনে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সে। টেনিস লনে, যেখানে-সেখানে ঘাসের উপরে শীতের দুপুরে গড়াল তারা। যে জঙ্গলে হরিণও নেই সেটাকেই বাঘের খোঁজে চষে বেড়াতে লাগল সারারাত। আর হ্যারল্ডের বাপের আমলের মদের ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে লাগল।

তারপর একদিন ঘটনাটা ঘটল। পরের দিন ইয়াংকিদের সঙ্গে ব্যালেন্টাইন চলে যাবে, ছুটি ফুরিয়ে গেছে। কাজেই তারা স্থির করল পৃথিবী ছিঁড়ে ছিঁড়ে, বাতাস নিংড়ে আনন্দ সংগ্রহ করে নেবে। এমন হতে পাবে, জীবনে এই শেষবারের মতো আনন্দ করার সুযোগ পাচ্ছে তারা। সারাদিনে এক মিনিটের জন্যও বন-জঙ্গল-ঝরনা ছেড়ে ঘরে এল না তারা। রাত্রিতে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা ছিল।

আহারের সময়ে নারীদের কথা উঠল। বিশ-বাইশ বছরের গুটিকযেক অনভিজ্ঞ তরুণ। যুদ্ধে ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় তাদেব সব বৃত্তিকে অসহিষ্ণু করেছে। বারোমিশেলি সঙ্গ তাদের কিছু ভাষা উপহার দিয়ে থাকবে। তাদের অভিজ্ঞতাকে সেই অশ্লীলতা দিয়ে বিবৃত করতে গিয়ে তারা নিজেদের অজ্ঞাতে যে আর্তি ফুটিয়ে তুলছিল সেটা কখনও হাস্যকর কখনও বেদনাতুর হয়ে উঠল। তবু রমণী-গৃহ-সন্তান, একটি শান্ত পৃথিবীর মোহ তাদের কাল্পনিক অভিজ্ঞতার মিথ্যা গল্পগুলো থেকে প্রকাশ পেতে লাগল। তাদের কথায় ফুরিয়ে যাবার আক্ষেপও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হল। মৃত্যুপ্রেত যখন সম্মুখে ও পিছনে তখন নারীর সুকুমার দেহই প্রাণের একমাত্র আশ্বাস এমন একটা দার্শনিক মতের অস্ফুট আভাস ছিল তাদের আলাপে। প্রেমহীন কামনাতেও একটি লিরিক সৌরভ থাকতে পারে, এটা সেই প্রথম আমার সন্দেহ হয়েছিল।

তারা ভারতের আকাশ বাতাস গাছপালা প্রভৃতির সৌন্দর্য নিযেও আলোচনা কবেছিল একসময়ে। তাদের সেই আলোচনায় আন্তরিকতা ছিল। ভারত পৃথিবীর অংশ, পৃথিবী মধুময়। ডেজার্টের আঙুর চুষতে চুষতে এই দুটি আলাপেব ধারা সম্মিলিত হয়ে আলাপটি ভারতীয় নারীদের পরিচ্ছদের রুচিতে কিম্বা রুচিহীনতায় পৌঁছল। এদের মধ্যে একজন ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন এক চিত্রকরের বাসন ধোলাই-এর কাজ করে থাকবে। কাজেই তার ধারণা ছিল চিত্রাদি সম্বন্ধে তার কিছু বক্তব্য আছে। সে-ই আলাপটাকে পরিচ্ছদের রুচি থেকে গঠনগত দৈহিক রূপে নিয়ে এল। খেয়াল হল, প্রস্তাব উঠতেই সেটা প্রায় সর্বসম্মত হল, ভাবতীয় নারীর রূপ বিচার করে দেখতে হবে। আমার মনে হয় আলাপটা জার্মেনিতে কিম্বা আমেরিকায় হলে তারা সেই দেশের নারীদেব সম্বন্ধেই জানতে চাইত।

ব্যালেন্টাইন হ্যারল্ডের নাম করে এই সন্ধিক্ষণে ম্যাগদালেনকে ডেকে পাঠাল। কাবণ চা বাগানের এক্তিয়ারে ম্যাগদালেনের মতো সুন্দরী আর কেউ ছিল না।

আমাদের দেশীয় ব্যাপার হলে আমরা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের কথা বলতাম ; কিন্তু পয়সা দিয়ে যে দেশে মডেল-ম্যানিকিন পাওয়া যায়—সেদেশের লোক ওরা। একটা ডিভ্যানের উপরে প্রস্তরীভূত ম্যাগদালেনের চারিদিকে খাবার টেবিল সাজানো রুপোর বাতিদানগুলো সাজিয়ে ওরা বিবসনা ম্যাগদালেনকে নিয়ে আলোচনা করল।

আমি ম্যাগদালেন আসতেই বিদায় নিয়েছিলাম। শুনেছি হ্যারল্ডও মাতাল হবার ভান করে টেবিলে রাখা দুই বাহুর গভীরে মাথা রেখে মটকা মেরে পড়েছিল। আর ব্যালেন্টাইন ইয়াংকি বন্ধুদের পিছনে দাঁড়িয়ে রিভলবার ধরে রেখেছিল ম্যাগদালেনের চোখের সামনে পাছে মডেলি ভঙ্গিতে থাকতে সে অস্বীকার করে। হ্যারল্ড কয়েকদিন পরে বলেছিল—আর কিছু নয়, বোনার্জি, সেই রাত্রিতে আমার ডিনার জ্যাকেটের নিচে সোয়েটার ছিল। কী দুর্জয় শীত! ম্যাগদালেন যে পরদিন নিউমোনিয়ায় মরে যায়নি,

এটাই আশ্চর্য।

যাক সেকথা। পরদিন দাবানলের মতো একটা আক্রোশ ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিশ বছরে সেই প্রথম ধর্মঘট হল চা বাগানে। সে ধর্মঘট হ্যারল্ড থামিয়েছিল। কিন্তু দু'একজন মজুর প্রাণ দিল, আর ব্যালেন্টাইন ডান গালের উপরে টাঙির একটা দাগ নিয়ে পালাল। টাঙিটা সবটুকু নামবার আগেই টাঙিচালকের কপালে রিভলবারের গুলি লেগেছিল।

একথা বলবাব কারণ বলি শোনো।

দিন দশেক আগে সকালে বিছানায় বসে গায়ে কম্বল জড়িযে উঠি উঠি করছি, বাইরে কোলাহল শুনলাম। এ কোলাহলে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এই সময়েই ডাকবিলি করার লোকটি আসে। স্টোরকিপারের ট্রাক আসে, কখনও কখনও আসে সৈন্যবাহিনীর ওভারসিয়ার, এঞ্জিনিয়াররা বদলি হয়ে। দিনের অন্য সময়ে শত্রুবিমানের পক্ষে কনভয়গুলোকে খুঁজে বার করা যদিবা সম্ভব হয়, সকালের কুয়াশা ভেদ করে উপর থেকে তাদেব দেখা যায় না। ট্রাকগুলো পরিচিত পথে আলো জ্বেলে ধীর মন্থর গতিতে উঠে আসে। সেই কোলাহল ছাপিয়ে পরিচিত একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

প্রাতরাশের সময়ে গোকুল যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সে ব্যালেন্টাইন। তিন বছর পরে ক্যাপ্টেন ব্যালেন্টাইন। পথের তদারক করতে এসেছে, কনট্রাক্টের কাজ কী ভাবে এগোচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে খবরদারি করবে। তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম A2 সেক্সনে গ্যাবিসন্ এঞ্জিনিয়াব মেজর 'কার'-এর পরিবর্তেই সে এসেছে।

চা বাগানের জনদের কথা মনে পড়ে গেল। হ্যারল্ডেব চিঠি পেলাম আকস্মিকভাবে। চা বাগান ছেড়ে আসবার দু'বছরেরও পরে এই সংযোগ। ম্যাগদালেন দ্বিতীয় জনের হোমে যাওয়ার পর কিছুদিন চা বাগানের গেটগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। ব্যালেন্টাইন সেই ব্যাপাবটা ঘটিয়ে দেওয়ার পর ম্যাগদালেন হ্যারল্ডের কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এ ব্যবস্থাটাব মূলে আমারই পরামর্শ ছিল—পুলিসেব গোলমাল থেকে তাকে দূরে রাখবার জন্য। ম্যাগদালেন কুঠিতে অধিষ্ঠান হওয়ার পর জেন তাদের সেই বাংলোয় ফিরে গিয়েছিল। তার মদের খবচটা ম্যাগদালেন হ্যাবল্ডের ঘরকন্নার খরচেব মধ্যে থেকে চালায়। হ্যারল্ড লিখেছে : ম্যাগদালেনকে সে বুঝতে পারছে না। চা বাগানের অবস্থা ভালো নয়। পিসি ও কাকার ছেলেরা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য চিঠিপত্র দিচ্ছে। স্নায়ুগুলো তার ফলে চড়েই থাকে। হ্যারল্ড মদ ধরেছে। তাব নিজের ভাষায় সে মাঝে মাঝে বোতল নিয়ে মেঝের ম্যাটিঙে আশ্রয় নেয়। আর এক বিশেষ রাত্রিতে ম্যাগদালেন দ্বিতীয় জনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুলে না বললে কী হতো তা বলা যায় না।

কিন্তু আনুপূর্বিক বলি।

প্রথম জনকে আমি দেখেছি দূবে দূরে থেকে। তখন আমি আট-ন' বছরের স্কুলেব ছাত্র ছিলাম। মামাব বাড়ি বলতে চা বাগান। আমার পক্ষে মামার কাছে যাওয়াটা ঠিক শখের বিষয় ছিল না। আমাদের গ্রামে স্কুল ছিল না, দাদা বিদেশে থেকে পড়ছেন। দু'জনকেই বিদেশে রেখে পড়ানো সম্ভব কি না এসব বিষয়ে মা-বাবা ও মামা পরামর্শ করেছিলেন। মামা নিঃসন্তান ছিলেন এবং চা বাগানের হোমরা-চোমরাও বটে।

মামার চা বাগানে যাওয়ার জংশন স্টেশনেই আমি প্রথম জনকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করি। অবশ্য তাকে তখনই প্রথম জন্ বলে চিনতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ঘটনাটা আজও আমাব চোখের সম্মুখে ভাসছে বলতে পারি। তখন সারাদিনের রোদটা পড়ে গেছে। ছাদ-ঢাকা প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়ালে পৃথিবীটাকে স্নিগ্ধ বোধ হল। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে এদিক-ওদিক লক্ষ করছিলাম। প্রথম শ্রেণীব গাড়িগুলোর কাছে সোরাবজির কাঁচা এবং পাকা দাড়িওয়ালা বোয়রা ট্রে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। না করে কী উপায়! পরপর কয়েকখানা প্রথম শ্রেণীর

কামরায় একাধিক য়ুরোপীয় যাচ্ছে চা বাগানের অঞ্চলে। একটির জানলার কাছে একজন বোয় ধমক খেয়ে দাঁড়াতেই সেই জানালা দিয়ে একটি য়ুরোপীয়ের বুক পর্যন্ত দেহটা বেরিয়ে এল। বোয় অন্য একটা গাড়ি দেখিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সাহেব বোয়ের পাকা পাকা দাড়িগুলো ধরে ঝাঁকি দিয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে ট্রে-টা কেড়ে নিল। লোকটির দিকে আমার বালক মন আকৃষ্ট হয়েছিল, জবরদস্ত সাহেব বটে। চা খেয়ে সাহেব চুরুট খাবার জন্যে গাড়ি থেকে নামল। এবার তাকে পুরোপুরি দেখার সুযোগ হল আমার। লোকটি সাধারণ ইংরেজের তুলনায় বেঁটে এবং মোটা, খাকির সার্ট ও জাঙ্গিয়া পরা, গায়ের রং কাঁচা ট্যান-করা চামড়ার স্যাটকেসের মতো কিন্তু দানাদার। মনে রাখবার মতো তার দাড়ি গোঁফ, মাথার টাকের চৌহদ্দির চুলগুলো, সেগুলোর রং নতুন পয়সার মতো। এই প্রথম জন্। বুল জন্ কিম্বা জন্ বুলও বলা যায়।

জন বুল বা প্রথম জন জাহাজে কাজে করত বলে পরে শুনেছি। জাহাজের চাকরি ছেড়ে ম্যাগদালেন চা বাগান স্থাপন করে সে প্রায় একক চেষ্টায়। প্রথম বছর দশেক কলঘর ছিল না, বাবুরাও দু'একজন মাত্রই ছিল। একেবারে প্রথম দিকে হিসাব-নিকাশ থেকে কাঁচা চা-এর পাতা অন্য বাগানে বিক্রি করে আনার কাজ পর্যন্ত একা একা সে করত। এসব অবশ্য শোনা কথা।

এমনকী ম্যাগদালেন সম্বন্ধে তোমার প্রশ্ন মেটাতে যা বলব সেটাও গোড়ার দিকে শোনা কথা। যদিও ম্যাগদালেনের মা জেনকে এবং তার বাবা ঠাকুরা সিম্বাকে আমি দেখেছি। আমি যখন প্রথম চা বাগানে গেলাম তখন ম্যাগদালেনকে তার রোগা রোগা হাত পা নিয়ে বাগানের লনে, কুলিদের বস্তিতে, স্কুলের কাছে, খেলার মাঠে সর্বত্র একটা রঙিন পোকার মতো ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। তার জামাকাপড় খুব উঁচু দরের ছিল না। আমার যেন মনে পড়ছে তার একজোড়া কেড্‌স্ জাতীয় জুতো ছিল সে সময়ে, আর কালো-লালে মিশানো একটা ফ্রক। অন্তত এটাই যে সে বেশি পরত তা আমি বলতে পারি।

ম্যাগদালেন সম্ভবত আমার সমবয়সী ছিল। প্রথম প্রথম তাকে আমি মালিকদের একজন বলে জানতাম এবং দূরে দূরে তাকে এড়িয়ে চলতাম। লোভও ছিল তার সঙ্গে মিশবার, কারণ চা বাগানে নয় শুধু আমাদের নিজেদের গ্রামেও তার মতো কোনো সুন্দরী মেয়েকে আমি দেখিনি। তার গালদুটো তখন লাল ছিল, আর চুলগুলো ছিল নতুন ঝকঝকে তামার পয়সার রঙের। তার গালে হিম-বাতাসের ফাট ধরেছিল, চুলেও হয়তো অযত্নের আঠা ছিল কিন্তু সেসব লক্ষ্য করার মতো নৈকট্যও তখন অচিন্ত্য ছিল।

প্রথম যেদিন ম্যাগদালেন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম।

আমার কথায় কোনো অসঙ্গতি নেই। তার সেই অতি পরিচিত কালো-লাল ফ্রক ও কেড্‌স্ জুতো আমার এখনকার চোখে দারিদ্র্য ও অনাদর সূচনা করলেও আমার বাল্যকালে ধন্য হবার পক্ষে বাধা ছিল না। সে কার মেয়ে, মালিকপক্ষের সঙ্গে কী সম্বন্ধ, এসব বিচারও পরে করেছি। আমার তখনকার মনোভাবের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল দিগ্‌দর্শক একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার লাটিমটা নিয়ে নিঃসঙ্গ মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ম্যাগদালেন হুপ করে সে লাটিমটা নিয়ে চলে গেল। আমরা অনেকটা রাস্তার কুকুরের মতো মানুষ হচ্ছিলাম। অন্য কেউ হলে লাটিমটার জন্যে অত্যন্ত হিংস্রভাবেই তাকে আক্রমণ করতাম। চার-পাঁচ দিন পরে জলপাইতলা দিয়ে মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি লাটিমটা এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। চেয়ে দেখলাম গাছের একটা ডালে বসে ম্যাগদালেন পা দোলাচ্ছে।

ম্যাট্রিক পাস করার পর কিছুদিন গ্রামে থেকে মামার ডাক পেয়ে আবার চা বাগানে ফিরে গেলাম। তখন পৃথিবীটা আমার চোখের সম্মুখে বদলাতে শুরু করেছে। সেসব তরল দিনগুলোর আড়াল থেকে সংসারের কঠিন দিন দু-একটি করে আমার জীবনে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে। কলেজে পড়া হবে না একথা যেদিন স্থির হল, কিম্বা যেদিন জানতে পারলাম নিঃসংশয়ে ম্যাগদালেন মালিকপক্ষের সঙ্গে

যে নোংরা সূত্রে আবদ্ধ সে সংযোগকে অস্বীকার করাই উচিত, এমন ধরনের দিনগুলোর অনুপ্রবেশের কথাই বলছি।

আমি জানতে পেরেছিলাম ম্যাগদালেনের মা জেন ম্যাগদালেনের মতো মেমসাহেব নয়। তারা ক্রিশ্চান বটে, ভারতীয়ও বটে কিন্তু তারা আমার পরিচিত কোনো ক্রিশ্চান সম্প্রদায় কিম্বা ভারতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না। এখন আমার মনে হয় তাদের জাত ছিল 'চা বাগানি'। আদিতে জেনের পূর্বপুরুষ ও পূর্ব-নারীদের মানবগোষ্ঠীর কোন শাখাতে সম্বন্ধ ছিল এ খুঁজে বার করা আর সম্ভব নয়। ভাষা, আকৃতি, পরিচ্ছদ, ধর্মাচরণ সবকিছুতেই চা বাগানের ছাপ পড়েছে। সেই এক অদ্ভুত সংস্কৃতির মধ্যে হিমালয়, লুসাই, রাজমহল, বিন্ধ্য পাহাড়ের আচার-অনাচারগুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে। জেনকে আমি যখন দেখেছি তখনও তার বয়স যৌবন সীমাতেই আছে। তখনও তার দেহবর্ণ চাঁপার মতো ছিল। সাধারণ শ্রমিক রমণী ছিল না সে, কিন্তু তার পরিচ্ছন্নতা ও রুচি অসাধারণ শ্রমিক রমণীর পক্ষেও অসাধারণ ছিল।

জেনের স্বামী ঠাকুরা সিম্বার ধর্মমত ইত্যাদি আমার কাছে আরো দুর্নির্ণেয়। কেউ বলে সে মণিপুরি, কেউ সংশোধন করে বলত মণিপুরি নয়, কাছারি। যে একটু বেশি জানার দর্প রাখে সে বলে— লুসাই পাহাড়ের এক চা বাগানে ওর বাবা এর আগে ছিল বটে, আসলে ওরা নাগা। কেউ যদি বলত নাগা নয়, দাফলা কিম্বা আবর, কিম্বা প্রকৃতপক্ষে সদিয়া সীমান্তের ওপার থেকে আসা চাইনিজ ছিল তার মাতৃগোষ্ঠী—আমার তর্ক করার কিছু নেই। ঠাকুরা সিম্বা কেমন করে একটা নাম হয় তাও জানি না। আমার মনে আছে ঠাকুরা সিম্বার মাথায় মধ্যদেশীয়দের মতো একগোছা শিখা ছিল। সে প্যান্ট কোট পরত না, জেনকে ভালোবাসত, মদ গাঁজা খেত। সে অত্যন্ত অলস ছিল এবং প্রকৃতিতে অত্যন্ত হিংস্র ছিল। আমি তাকে জ্যান্ত হাঁস মুরগির পালক ছাড়াতে ছাড়াতে সেগুলোকে একতাল কম্পিত মাংসে পরিণত করতে দেখেছি, এমনকী একটি পাঁঠাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে। শেষদিকে সে কাজকর্ম কিছুই করত না। প্রকাশ্যে সে একজন কুলির মেট ছিল, কিন্তু কুলিদের সঙ্গে যাওয়া দূরের কথা, ঘর থেকেই সে অধিকাংশ সময় বার হতো না। যখন হতো তার কোমরে ঝোলানো থাকত হাত দেড়-দুই লম্বা লোহার খাপে ভরা ভোট-তরোয়াল বা তিব্বতীয় ধরনের ছোরা, মুখে থাকত ঘাসের ডাঁট। সে সর্বত্র থুথু ফেলত এবং তার অমার্জিত লালচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ত। বিশেষ করে আমাকে দেখলে তার ট্যারচা চোখ দুটি বিরলরোম ভ্রূর তলে আরো বাঁকা হয়ে যেত—অন্তত এ রকম একটা অনুভব যে আমার হতো, তা আমার মনে পড়েছে।

লোকে যেদিন এই লোকটির সম্মুখেই আমাকে বলল, তোমাব ম্যাগদালেনেব বাবা, তখন সে হাসল বটে, তার গোঁফহীন ঠোঁট দুটি বিস্তৃত হল অন্তত। আমার মনে হয়েছিল সন্তানত্ব কারো কারো জীবনেব অভিশাপ হতে পাবে। এবং যেদিন আমি বুঝতে পারলাম, প্রকাশ্যে কেউ না বললেও, প্রথম জন্‌-ই ম্যাগদালেনের জনক, আমি যেন সেই বেআইনি পরিচ্ছন্নতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

ম্যাগদালেন প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র শিক্ষার সুযোগ পায়নি। চা বাগানের কাছাকাছি একটিমাত্র স্কুলে মজুরদের ছেলেমেয়েরা আর চা বাগান থেকে কিছু দূরে যে বড় স্কুলটি তৈরি হয়ে উঠেছিল সেখানে চা বাগানের ভদ্রশ্রেণীর কর্মচারীদের ছেলেরা পড়ত। ম্যাগদালেন কাছের স্কুলের মতো নিচুতে নামতে পারল না, দূরের স্কুলের মতো উঁচুতে উঠতেও পারল না। সে এ-বি-সি শিখেছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তার মুখে যে কোনো ভাষার চাইতে সহজে ইংরেজিই আসত। অবশ্য সে সরলরেখা বা বিন্দু সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানত না। সে জানত না অশোক কিম্বা আলফ্রেড কোন দেশের রাজা ছিলেন, কিম্বা আদৌ রাজা ছিলেন কি না। কিন্তু সে জানত নখ পরিষ্কার রাখতে হয়, স্নান করার সময়ে গাত্রমার্জনা করতে হয়, সকালে-বিকালে মুক্ত বায়ুতে বেড়ানো ভালো। সে আরো জানত কাউকে অনুরোধ করে যত সহজে কাজ করিয়ে নেওয়া যায় হুকুম দিয়ে তা যায় না। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ঝগড়ার সূত্রপাতেই কাজ

আছে বলে উঠে যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন এও সে জানত, যেমন জানত ধন্যবাদ দিতে। সর্বোপরি সে জানত প্রয়োজন হলে সে চোখে বিদ্যুদ্ভাস আনতে পারে। অন্যসময়ে তার দৃষ্টিতে বয়ঃসন্ধিব বিস্মিত সারল্য আয়ত্ত হতো।

কিন্তু সে সকলের চোখে আদর্শ মহিলা ছিল না। সে প্রথম জনের কুঠি থেকে সাবান চুরি করেছিল আর একটা আধ-পুরনো তোয়ালে, আমাদের স্কুলের ছেলেবা যেমন পেয়াবা চুরি করত। সাবান চুরি করার জন্য প্রথম জন্ ম্যাগদালেনকে ঘুসি মেরেছিল, চার-পাঁচ দিন তাব ঠোঁট দুটো নীল হয়ে ফুলে ছিল। সে আর একবাব প্রথম জনের বিছানা-ঢাকার ফুলদার ব্রোকেড চুরি করে জামার মাপে কেটে ফেলেছিল। সেদিন ঘোড়াব চাবুক দিয়ে প্রথম জন্ শাসন করেছিল তাকে। তার হাত পা কেটে কেটে গিয়েছিল চাবুকে।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ম্যাগদালেনের কিছু কিছু খবর পেয়েছিলাম। চা বাগানেব পাশে একটা ছোট নদী ছিল। বর্ষাকালে ছাড়া অন্যসময়ে বড় বড় পাথবেব টুকরোয লুকনো একটা সংকীর্ণ ঝরনা হয়ে থাকত সেটা। তীরে কয়েকটা জলপাই গাছ ছিল। একটা দুটো কাঠবাদামেব গাছও বোধ হয়। দুপুবে এখানে চা বাগানের ধোপা দড়ি টাঙিযে কাপড় শুকাত। ধোপারা চলে গেলে কাঠবিড়ালিরা আসত। আর সেখানে সাদায় লাল ছোপ দেওয়া একটা বুড়ো পাহাড়ি গাই জাবব কাটত। সেখানে গিয়ে আমি বসতাম অনেকসময়ে। তেমনি বসেছিলাম, এমন সময়ে ম্যাগদালেন এল। কোন কথা থেকে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম এতদিন পবে মনে পড়াব কথা নয। ম্যাগদালেন একসময়ে কাঁদতে কাঁদতে তার সর্বাঙ্গের চাবুকের দাগগুলো দেখিয়েছিল। ভালো কথা, দৃশ্যটা মনে পড়ায় আমি মনে স্থির করেছি উত্তপ্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে, উত্তেজিত হলে লজ্জা-সংকোচ বলে কিছু তাব থাকত না।

প্রথম জন্ সম্বন্ধে অনেক কুৎসিত কথা বলে অবশেষে সে বলল— তাব মা জেনের সঙ্গে প্রথম জনেব ভাব আজই শেষ হবে। আজ এক হাত হয়েই যাবে। জেন বলেছে তাবা আব এই চা বাগানে থাকবে না, দেশে চলে যাবে। কোথায় তাদেব দেশ? জেন মিথ্যা ছেলেভুলানো গল্প বলেছে কি না? না, তা নয়। জেন নিজেও কোনোদিন যায়নি? কিন্তু তাহলেই মিথ্যা হয়ে যায় না। 'তিন বাজাব তিন নিশান পোঁতা আছে'। সেই নিশানকে পিছনে রেখে দাঁড়ালে ডুবন্ত সূর্যের আলোয় সেই দেশের প্রথম পাহারাদার জঙ্গল চোখে পড়ে। সেই পাহারাদারের পর নদী, নদীর পরে পাহাড়। সেই পাহাড় বেয়ে উঠলে যে দেশ সেই দেশ জেনদেব। জেন তাব ঠাকুবমাব মুখে শুনেছে এবং জেন নিজেই ম্যাগদালেনকে বলেছে।

বলা বাহুল্য জেনবা চলে যাযনি। না চলে যাওয়ার অন্য অনেক কাবণেব মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে প্রথম জনেব ব্যবহাবে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। ম্যাগদালেনকে চড়চাপড়টা মারলেও আদর করত সে। জেনের জন্যে আনা ছাপা-ছিটের গাউন ম্যাগদালেনের গায়ে উঠলে প্রথম জন্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করত না। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে পড়ছে। লোকে বলত নিজের মেয়েকেও ওভাবে আদব করা বিসদৃশ। তখন সে স্ত্রীলোক হয়েছে তো বটে।

প্রথম জনের পুত্র দ্বিতীয় জনের আমলে ম্যাগদালেনের বয়স ছিল সতেরো থেকে ত্রিশ। এবং এ কথা প্রথমদিকে চাপা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই জানত দ্বিতীয় জন্ ম্যাগদালেনকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ সংবাদটা এত পরিজ্ঞাত ছিল সকলেব যে এ নিয়ে কেউ আলাপও করত না। ম্যাগদালেনকে দ্বিতীয় জনের পাশে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে সকলেই দেখেছে, যেমন দেখেছে তাকে দ্বিতীয় জনের শিকারের সাথী হতে। শেষদিকে চা বাগানের ব্যাপারেও দ্বিতীয় জনকে ম্যাগদালেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা যেত। তাই বলে মনে কোরো না ম্যাগদালেন মালিককুঠিতে কোনোদিনই স্থান পেয়েছিল। সেখানে হ্যারল্ডের মা রেনির অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল। এবং সে যখন গরম পড়লে

সিমলায় চলে যেত কিম্বা হোমে তখনও সেখানে প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রী জেনই রাজ্য চালাত। ম্যাগদালেন থাকত মজুর-বস্তির শেষে পাহাড়ের গায়ে সেই নিঃসঙ্গ পুরনো বাংলোয়। কাঠের পাটাতনের উপরে শ্যাওলায় কালচে হয়ে আসা সাদা যে বাংলোটি প্রথম জনের আমলে তৈরি হয়েছিল ম্যাগদালেনের মা জেনের জন্যে। দ্বিতীয় জন্ বন্দুক কাঁধে খরগোশ বধে বেরিয়ে শিস দিতে দিতে কোনো কোনো বিকেলে আসত এই বাংলোয়। কিন্তু হরিণ কিম্বা শুয়োর শিকারের সুযোগ এলে জন্ ও ম্যাগীকে দেখা যেত চা বাগানের লনের উপর দিয়ে পাশাপাশি দুটি বে-রঙের ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে যেতে। তখন ম্যাগীকে অত্যন্ত উদ্ধত এবং মালিকি ভঙ্গিতে ঘোড়সওয়ার হতে দেখা যেত। আমার এ রকম একটা স্মৃতি আছে : ঘোড়া দুটি যেমন দাঁড়িয়ে থেকে চলার জন্যে অধৈর্য প্রকাশ করত নিকেলের সাজগুলো কাঁপিয়ে তেমনি ম্যাগীও করত ঘোড়ার পিঠে বসে তার লাল চুল ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে কপাল থেকে সরিয়ে।

আমার মনে পড়ছে কখন যেন শুনছিলাম যে ম্যাগীর চুলের বাল্যের সেই ব্রোঞ্জ রং একসময়ে ক্রমশ ময়লাটে খড়ের রং নিয়েছিল। ম্যাগী তখন চুলগুলোকে মেহেদি দিয়ে রাঙিয়ে লাল টকটকে করেছিল আবার। ইংরেজ মেয়েরা এ কৌশল জানে কি না সন্দেহ।

পিতা থেকে পুত্র। দ্বিতীয় জন্‌ও তার ঘোড়ার চাবুক ব্যবহার করত। এবং একদিন আমিই তার প্রমাণ পেলাম।

অত্যধিক গরম পড়েছিল। রেনি পাঁচ-ছয় দিন আগে সিমলায় পালিয়েছে। দ্বিতীয় জন্ নিজে মোটর চালিয়ে তাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছে। ফিরে এসে চা বাগানের দরজায় ম্যাগীর সঙ্গে দ্বিতীয় জনের সাক্ষাৎ হল। তারপর থেকে চার-পাঁচ দিন রোজ তারা শিকারে বেরুল। অন্যান্যবার যা দেখা যায়নি, এবার ম্যাগীর হাতে তেমন একটা হালকা ধরনের শট্‌গান দেখা দিয়েছিল।

এ রকম একটা দিনের বিকেলে স্নান করার অপ্রাত্যহিক একটা ইচ্ছা অনুভব করে আমি চা বাগানেব পিছনের ঝরনাটার স্বচ্ছ জলে স্নান করতে গিয়েছিলাম। লোক পরম্পরায় শুনেছিলাম ভিজে বালি ও পায়ের-পাতা-ডোবা জলের স্রোত ধরে চললে বর্ষায় নদীটা যেখানে পাক খায় এবার নাকি সেখানে একটা স্বচ্ছ জলের দহ পড়েছে দেখা যাবে। স্নানের চাইতেও দহটাকে উপভোগ করার ইচ্ছাই বেশি ছিল আমার।

স্নান করে উঠে বাগানের দিকে আসছিলাম। পশ্চিমের আকাশ তখন বত্তিচেলির ব্যবহার করা লাল রঙে ছেয়ে গেছে। আমার ছোটবেলাকার জলপাই গাছগুলো এখন আরো বড় হয়েছে। কাঠবাদাম গাছ দুটির একটি ঝড়ে পড়ে গেছে, অন্যটির গোড়া থেকে দু-তিন হাত উঁচুতে একটা গর্ত হয়েছে। একটি কাঠবিড়ালি তা থেকে উঁকি দিচ্ছে বলে আমার ধারণা হয়েছিল যেন। অবশ্য সেটা একটা শুকনো পাতাও হতে পারে। একটা কুকুরের গলার বাকল্‌সে বাঁধা ঘুন্টির শব্দে ঠাহর করে দেখলাম জলপাই সারির তল দিয়ে ম্যাগদালেন মাথা নিচু করে হেঁটে আসছে, আর তার কালো পুড্‌ল্‌টা শিকল থেকে ছাড়া পেয়ে তার আগে আগে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

অভ্যাসমতো বললাম, 'হ্যালো'।

ম্যাগদালেনকে খানিকটা সমীহ সকলেই করে, আমাকেও করতে হতো, কারণ সেটা তখনও হ্যারল্ডের যুগ নয়। এবং এটা ম্যাগদালেন বুঝত বলে সে আমাদের সম্ভাষণে গলে যেত না, গাম্ভীর্য রাখত। কিন্তু সে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সজ্ঞান ছিল বলে বিদ্রূপ আকর্ষণের ভয়ে কখনও উন্নাসিক হতো না। সে সাধারণত হেসে কিম্বা হা-ডু-ডু বলে চলে যায়। আজ সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বললাম, 'তোমাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে'।

'যেন তার যথেষ্ট কারণ নেই'!

কারণ শুনবার আগ্রহ আমার প্রকৃতপক্ষে ছিল না, কিন্তু অপরপক্ষ জানাতে উৎসুক ছিল। সে বলল,

'তোমার মনে পড়ে বোনার্জি, অনেকদিন আগে এই জলপাই গাছগুলোর তলাতেই আমার সারা গায়ের দাগগুলো তোমাকে দেখিয়েছিলাম'?

জলপাই গাছগুলো দেখে অন্তত মনে পড়েনি সে ঘটনা আমার মনের কাছে এত দূরে ছিল। কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়াতে বললাম, 'তা মনে পড়ে, দুষ্টু ছিলে তখন'।

'আর এখন'?

'এখন নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে'।

'এগুলো তাহলে কী'?

দেখলাম ম্যাগদালেনেব বাহুতে চাবুকের দাগে দাগে দু'এক জায়গায় রক্ত শুকিয়ে আছে। আমার মনে তবু করুণা এল না। তখন মনে হয়েছিল নোংরা মেয়ের চাইতে বেশি নয় ম্যাগদালেন। কিন্তু কৌতূহল হল। ভাবলাম হয়তো টাকা-পয়সা চুবির চেষ্টা কবেছিল। তার হয়তো মনে পড়েছিল ছোটবেলায় তার এ রকম শাস্তি হতো চুরির জন্যে এটা অনেকেবই জানা আছে। পাছে সে বকম কিছু কল্পনা কবে নেই সেজন্যে সে বলল—'এবং এতসব কেন? না— কপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ভিনেএটে হাত দিয়েছিলাম। আমার বাংলোয় যখন তাকে কোট পরিয়ে দিচ্ছিলাম তখন সেই হাতির দাঁতের ভিনেএটটা পড়ে গিযেছিল। তুলে দিয়েছিলাম, তুলে দিতে দিতে নিজেব চোখেব সম্মুখে ধরেছিলাম'।

'জনের স্ত্রী'?

'কখ্খনো না। হ্যারল্ডের মাকে আমি চিনি। এ মেয়েটি খুব সুন্দরী, খুব বড়ঘরের। বিলেতেই থাকে। আর এব পিছনে অজস্র টাকা খরচ কবছে জন্। হ্যারল্ডের মা রেনি এবাব সিমলা থেকে ফিরলেই আমি বলে দেব। বলো, ফটোতে আমি হাত দিলেই কি তা অপবিত্র হয়ে যায়? সে তো অন্য আর একজনের স্ত্রী'।

'সেজন্যে নয় সম্ভবত। বোধ হয় রুপোর ফ্রেমে দাগ লাগে আঙুলের'।

'তুমি ভেবেছ কপোর? নিকেল, নিকেল। আর হাতির দাঁতও নয়। কোনো বুড়ি গাইয়ের মরা হাড়ে তৈবি। আর তখনও আমার বালিশে জনের মাথাব ছাপটা সমান হয়নি'।

খানিকটা সময় চুপচাপ। আমার একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল কেউ যদি আমাদের এখন আবিষ্কার করে, কী ভাববে। চারিদিকে সন্ধ্যার নির্জনতা নেমে এসেছে। আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ম্যাগদালেনের কথাগুলো যতই চাপা গলায় হোক, তা উত্তেজনায় আতপ্ত, অশ্রুহীন নিরুদ্ধ-প্রায়। সে যদি দ্বিতীয় জনের স্ত্রী হতো তাহলে যে রকমের পরিস্থিতি আমার বড় গলা করে বলার মতো হতো, ম্যাগদালেনের ক্ষেত্রে সেটাই গোপন করাব মতো হল।

কিন্তু তাকে একেবারে উপেক্ষা করেও যেতে পারিনি। সম্ভবত সে এবং আমি এবং সকলেই এই চা বাগানের আশ্রিত জীব—এই স্বাজাত্যবোধ আমার চিন্তার কোথাও লুকিযে ছিল।

ম্যাগদালেন বলল এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই কথাটা আমারও মনে পড়েছিল, 'আচ্ছা বোনার্জি, তিন বাজ্যের নিশান একই জায়গায় পোঁতা এ বোধ হয় রূপকথা, না'?

'না, অসম্ভব কী, পাশাপাশি তিনটি রাজ্য যদি একই জায়গায় এসে মেশে তবে তা হতে পারে'।

সে তিক্ত হেসে বলল, 'তা আমিও বুঝি। পৃথিবীতে এ রকম কোথায় আছে'?

আমার ভূগোলের জ্ঞান বলার মতো না হলেও লাল রঙে আঁকা ভারতের মানচিত্র আমার মনে পড়ল। এবং অন্তত তিন জায়গায় ভারতের সীমান্তে এ রকম সম্ভব বলে মনে হল। সদিয়া লেডোর দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে ব্রহ্ম, চীন ও ভারত একই বিন্দুতে মিশেছে। কথাটা বলতে বলতে আমিও বিস্মিত হয়ে ভাবলাম তাহলে ম্যাগদালেনের পূর্বপুরুষ কি সদিয়ার কাছে হিমালয়ের কোনো লুকানো গ্রাম থেকে এসেছিল?

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবলাম : তাহলে কি তার অপমানিত হওয়ার মতো আত্ম

আছে— যে আত্মা নিজের চিরকালের জন্যে হারানো জন্মভূমির জন্যে কাঁদছে?

দূর হোক গে, বলে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে একটা কলরব কানে এল। বেতনের দিন রাত্রিতে কখনও কখনও হল্লা হয়, মাঝে মাঝে গান বাজনার আসরের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এ কলরবটা নতুন ধরনের। আমার ব্যক্তিগত চাকর বাবুলালকে ডেকে পাঠিয়ে দিলাম খবর করতে। বলে দিয়েছিলাম বিশেষ কিছু বলার না থাকলে রাত্রিতে খবর দেওয়ার চেষ্টা যেন না করে। সে দু'এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এল খবর নিয়ে। অস্বস্তিতে ঘুম পাতলা ছিল। পায়ের শব্দে জেগে বললাম, 'কী রে এত দেরি'?

'তামাশা'।

'কী তামাশা'?

'ম্যাগদালেন মেম খড় দিয়ে এক মানুষ তৈরি করে আগুনে পোড়াল আব কুলিদের মেট থেম্বা ফুদং লামাদের মতো চুঙ্গি টুপি পরে বসে দসাং থাসাং করে মন্ত্র পড়ছিল'।

মনের মধ্যে খচ করে উঠল। কিন্তু একটা অমায়িক হাসি টেনে এনে বললাম, 'ঘুমোগে যা। যত সব জংলি'।

এই চা বাগানের ধর্ম—লামার মন্ত্র, তান্ত্রিক অভিচাব, খ্রিস্টানি হোত্রী।

কিছুদিন পরে এক সকাল দশটায় স্টেশন থেকে ফিবছিলাম, মাটির পথের দু'ধাবে বুক সমান উঁচু আগাছাব জঙ্গল। মোড় নিতে একদল ভেড়া-দুম্বার পিছনে পড়লাম। ধুলো থেকে বাঁচবার জন্যে আগাছার জঙ্গলেব একটা গলিপথে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। সামনে একটা অনাবাদী মাঠ, কখনও সেটায় গল্‌ফ্‌ চলে, সেটা পার হলেই ভেড়ার দলেব আগে গিয়ে রাস্তায় ওঠা যাবে। হঠাৎ দু'তিনটে হাউন্ডের ইয়াপ্‌ ইয়াপ্‌ শুনে বুঝলাম কোনো জন্তুকে তাড়া করেছে তাবা। দিকটা ঠিক কবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে পরিষ্কার মেয়েলি গলার উঁচু হাসি কানে এল। তাবপব অবশ্য ম্যাগীব লাল মাথা আর দ্বিতীয় জনের শিকারেব টুপিসমেত তাব জ্যাকেটেব পিঠও চোখে পড়ল।

কিন্তু হ্যারল্ডের চিঠির কথা বলছিলাম। অত্যন্ত তীর্যক ভাষায় দ্বিতীয় জন্‌ ও ম্যাগদালেনকে কশাঘাত করেছে হ্যারল্ড, নিজেকেও বাদ দেয়নি। অবশেষে লিখেছে : বোনার্জি, এই এত বড় পৃথিবীটায় আমাব সব কথা বলে একই আগুনের পাশে বসতে পারি এমন বন্ধু তুমিই আছো। যদিও এখনও তোমাকে মনে মনে বর্বর জাতীয় একজন বলেই চিন্তা করি।

তারপর আবার দ্বিতীয় জনকে টেনে এনে বলেছে : তাব খবর সে পেয়েছে। হ্যারল্ডের মা তাকে ডাইভোর্স করেছে কিন্তু দ্বিতীয় জনেব ভাগ্যের কিছু উন্নতি হয়নি। সে তার কল্পলোকের লেডি টাইটেনিয়ার সঙ্গ পাচ্ছে বটে, ঘর বাঁধবার কোনো সুযোগই পাবে না। লেডিরা ভিন্ন জাতে বিয়ে করে না। তার মা রেনি লিখেছে · বুড়ো এব চাইতে ম্যাগীকে নিয়ে যেমন শিকাবে যেত সেই ভালো ছিল। তাতে অন্তত আমি আর তুমি বঞ্চিত হইনি। তাকেও অবশ্য আমরা বঞ্চনা করিনি। কিন্তু আরো কিছু লিখবার আগে, আমার জানা দরকার তোমার জনককে ডাইভোর্স করার পরেও এখনও তোমার কাছে আমি মা কি না। অবশ্য আমি তোমাকে জনের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইনে। তার বাবা দ্বিতীয় জনও লিখেছে : রডি যা ঘটে গেছে তার আর চারা নেই। আমার ইচ্ছা তুমি আমার এবং রেনির দু'জনেরই থাকো।

দ্বিতীয় জনের বয়স এতদিনে পঞ্চাশে উঠল বোধ হয়। ইংল্যান্ডে, শুনেছি, আজকাল ব্রিথসক্রিগ-এর দৌরাত্ম্যে মানুষের প্রাণমূল বিশীর্ণ। সেই দেশের থেকেই এই কাহিনী। হ্যারল্ডের চিঠি পড়তে পড়তে মনে হল মানুষের উদ্ধারের কোনো আশাই আর নেই।

হ্যারল্ডের অন্য বক্তব্য : আমার তো মনে হয় মাঠে যেখানে ইতস্তত কাউস্লিপ ও ডেইজি ফুটে উঠেছে সেখানে এক য়ুরোপীয় গ্রীষ্মের দিনে কোনো হপ্-মাতাল চাষীছেলে এক রঙচঙে মাকড়সা দেখতে দেখতে ঝিমুচ্ছিল, প্রেম কথাটা তারই সৃষ্টি।

তোমাদের ম্যাগদালেনকে দেখেও আমার একদিন মাকডসাব কথা মনে হয়েছিল। রেল স্টেশনে গিয়েছিলাম। সময়টা অটম্। অনুজ্জ্বল সোনালি পাতা গাছ থেকে ঘুরে ঘুরে পড়ছে। পথেব ধারে সাদা রং করা চা বাগানেব গেট। ধুলোয় রাঙানো বিকেলের আলোয় দেখলাম ম্যাগী গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ইংল্যান্ডের কোনো খামারের স্টাইল গেটে কোনো পেগী প্রেমিকের অপেক্ষা করছে। আমাব মনে হল সে আমারই প্রতীক্ষা কবছে।

কিন্তু যখন কোনো মধ্যবাত্রিতে নিঃসঙ্গ সুপ্রশস্ত ব্যাংকেট্ হলের কোনো গদি আঁটা চেয়াবের সম্মুখেব মেঝের ম্যাটিং থেকে ম্যাগী আমাকে তুলে খাড়া কবে আমাব শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায় তখন তাব কাঁধ ধরে চলতে চলতে তাকে কমবেড বলে অনুভব করার মতো মনেব অবস্থা যেন হয়, যদি সে মনের কোনো অবস্থায় পবিবর্তন হওযাব ক্ষমতাব গল্পে তুমি আস্থা রাখতে পাবো। আব একদিন, বোধ হয় সেদিন নেশা ততটা প্রগাঢ় হয়নি, ম্যাগীর কাঁধ ধবে যেতে যেতে হাতের তলায় তার নিরাবরণ কাঁধের কাঁচা মাংসের স্পর্শ পেয়েছিলাম। ম্যাগী আজকাল হাল ফ্যাশানের গাউন পবে। ভাগ্যে সে এবং আমি দ্বিতীয় জনেব পরিচিত্ত এবং এ পরিচয়েব কথা আমাদের দুজনেরই জানা আছে।

অনেক বড চিঠি হল। এখন ঘুমোতে যাব।

গোকুলেব বাডিব খবর জানা থাকলে দিও। বাডিব খবর না পেয়ে ও মনমরা হয়ে আছে।

আমাব তাঁবু থেকে কিছু দূরে একটা আগুনেব চাবিদিকে চেনার গাছটার তলে গোল হযে বসে একদল মুণ্ডা কুলি গান গাইছে। নদী নয়, খাল, সেই খালের দু'ধাবে জোয়ারের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে ভইসা টহলায় এক ছেলে। চিরাচবিত একটা মেয়েকেও ওরা এনে ফেলেছে গানে। সকলে মিলে ধুয়া ধরেছে · 'সোনাব পাহাড়ের ঋতুমতী কন্যে সেই গলায় লালকাঠি লবঙ্গহার পরা দেশ'।

বেটাবা এত দেশভক্ত তো জানতাম না। দেশের চিঠি পায না। এদিকে বোমা পডে মরাব ভয় প্রত্যক্ষ না হলেও চিন্তা-ভাবনাব পিছনে লেগে আছে। তাই বোধ হয় এমন কবে দেশেব কথা মনে পড়ছে ওদেব।

আজকের চিঠিতে তোমাকে একটি উপকথা উপহার দিলাম। তিন রাজ্যের সীমানা এসে মিশেছে তিন রাজার নিশানপোঁতা এক জায়গায়। তার দিকে পিছন ফিরে ডুবন্ত সূর্যের পাহাডের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই পাখি ডাকা বিশ্রামের গ্রাম।

আর একটা কথা মনে হচ্ছে। ম্যাগদালেন ওব নাম ছিল না বোধ হয়, পদবি ছিল। ম্যাগদালেন চা বাগানে বাস কবে এই তাব পরিচয়। কৌলিন্যহীন মানবগোষ্ঠী কুল ও পরিচয় কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

অনেকদিন পরে আবার চিঠি লিখতে বসেছি। তোমার চিঠি যে পাইনি এটা স্বাভাবিক। তোমাকে শেষবার খবর পৌঁছে দেবাব পর এই প্রথম আবার ডাকেব যোগাযোগ স্থাপন করা গেল। কিন্তু এ যোগসূত্রকেও তেমন দৃঢ় কিছু মনে হচ্ছে না।

তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাও আমি ঠিক কোথায় আছি। যুদ্ধ মিটে যাক। তখন একসময়ে শোবার ঘরের টেবলে ম্যাপ বিছিয়ে, রাস্তার ব্লু প্রিন্ট মেলে ধরে তোমাকে দেখিয়ে দেব কোথায় আমার ক্যাম্প ছিল এবং কোন ক্যাম্প থেকে তোমাকে কোন চিঠি দিয়েছিলাম।

ব্যালেন্টাইন সম্বন্ধে একটা খবর দেযার আছে। সে যখন এল তখন তাকে দেখেই মনে হয়েছিল সে কাজ করতেই এসেছে। সেই প্রথম সকালেব প্রাতবাশেব টেবলেই অনেক কাজের কথা হযেছিল।

আমি ভেবেছিলাম বর্তমানে যেখানে কাজ হচ্ছে সেখান থেকে মাইলটেক দূবে যে পাহাড়ের চূডা

পড়েছে সেটাকে উড়িয়ে না দিয়ে রাস্তাটাকে টানেল করে নিয়ে যাওয়া হবে। মেজর কারও রাজি ছিল। ব্যালেন্টাইন প্রথম আলাপেই ব্যবস্থাটা উল্টে দিয়ে বলল, টানেলিং-এর সময় নেই ; বর্ষা নামার আগেই A2 সেকশনের সীমায় রাস্তা পৌঁছে দিতে হবে। হয় চূড়াটার গায়ে একটা লুপ বসিয়ে দাও নতুবা ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে পথ করে নাও। সে জানাল, পাহাড়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলতে হবে না, প্রয়োজন মতো জবরদস্তিও করতে হবে।

এতসব কেন, এত তাড়াতাড়ি কীসের ? এমনতর প্রশ্ন করা আমাদের রীতি নয়। একটু বিস্মিত হলাম, কারণ কন্‌ট্রাক্টের চাইতে আমি অন্তত এক মাস এগিয়ে ছিলাম। একটা ব্যস্ততা, একটা অধীরতা, ব্যালেন্টাইনের কথাবার্তায় ও চালচলনে ধরা পড়ত। কাজের গতিটা যেন কখনই তার মনের মতো নয়। রাস্তাটা যদি একটা প্রকাণ্ড হোসপাইপ হতো তবে আগুনপুলিশের ভঙ্গিতে সে পাইপের মাথা ধরে এক দৌড়ে পাইপ বিছানোর কায়দায় রাস্তাটাকে পেতে দিত।

এসব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততাই তার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক।

রাস্তা যে পাহাড়ে বেয়ে উঠবে সেটা পরীক্ষা করার জন্যে ব্যালেন্টাইনেব সঙ্গে আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হত। কোনো কোনো দিন আমাদের সঙ্গে আমার ফার্মের এঞ্জিনিয়ারবাও থাকত। ব্যালেন্টাইন তাদের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঢেড়া চিহ্ন দেওয়া রাস্তার ব্লু প্রিন্ট খুলে ধরে বুঝিয়ে দিত।

একদিন একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটে গেল। পাহাড় পরিক্রমায় আমরা বেরিয়েছিলাম। রাস্তাটার সম্ভাব্য বাধা একটা ন্যাড়া পাহাডের চূড়ায় আমরা উঠলাম। প্রস্তাবটা আমার, টানেলিং করে বা ধস নামিয়ে এ চূড়াকে কায়দা করা যাবে না, যদি তার গা বেয়ে পাক খেয়ে বাস্তা ওঠে চূড়ার অপর দিকে মোটর নামার উপযুক্ত ঢালু পথ চাই। তা যদি না-ই হয়, সেদিকে যদি খাড়া হয় চূড়ার গা, পথটাকে হযতো ব্লু প্রিন্ট থেকে সিকিমাইল পরিমাণ ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

চূড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন কুয়াশা সরে গেল। আমাদের বাঁয়ে A2 সেকশনের পুব-উত্তর কোণে কিছু দূরে একটা ছোট অধিত্যকা আমরা আবিষ্কাব করলাম। সে অধিত্যকার ওপারের পাহাড়গুলো মভ্ রঙের। নিজ অধিত্যকার রং কালচে সবুজ ও সোনালি সবুজে মিশানো। পাইন-বার্চ গাছের বন। এবং বনের চাইতেও বড় বিস্ময় একটি লোকালয়। শহর তো নয়ই, গ্রামও নয়। একটা লম্বা বড় ঘরের চারিদিকে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। বড় ঘরটার থেকে কিছু নিচুতে পাহাড়ের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে বলে মনে হল। জুম চাষ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অন্য দু'একটি চিহ্নও চোখে পড়ল।

ফিরবার পথে এই গ্রামটি নিয়ে কথা হল আমাদের। ব্লু প্রিন্টে এ রকম সব বস্তি-আস্তানার নির্দেশ আছে একটি একটি ছোট বিন্দু দিয়ে। এ বস্তিটা সেখানে সম্পূর্ণ উহ্য।

ব্যালেন্টাইন বলল, 'বস্তিটায় একটা চা বাগান হতে পারত, বোনার্জি'।

'অবশ্য যদি চা চালান দেওয়ার পথ থাকে'।

'বস্তিটায় যেন শান্তি বিরাজ করছে। অন্তত যুদ্ধ নেই'।

'দূর থেকে তাই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো অজ্ঞাত মহামারীতে গ্রামটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং হয়তো কোণঠাসা হয়ে লড়ছে। কিম্বা তোমাদের ব্লু প্রিন্ট হওয়ার পরেই গ্রামটার পত্তন হয়েছে এবং অগ্রগামী দল এখনও এগিয়েই যাচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে ছোটখাটো দাঙ্গা হচ্ছে'।

আমরা আমাদের আস্তানার কাছে এসে পড়েছিলাম। ব্যালেন্টাইন বলল, 'দ্যাখো বোনার্জি, শান্তি জিনিসটার মূল্য এসব চুরমার হৈ হৈ-এর চাইতে অনেক বেশি'।

আমি রসিকতার সুরে বললাম, 'ঐ গ্রামটায় নেমে গেলে কী রকম হয়? যদি আর কোনোদিনই না-উঠি'?

ব্যালেন্টাইন ও বোনার্জি পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত এ কিন্তু আমাদের আলাপ-আলোচনা থেকে

বুঝবার কোনো উপায় ছিল না। ব্যালেন্টাইন পূর্ব-পরিচয় অস্বীকার না করায় আমাদের আলাপে নতুনের আড়ষ্টতা ছিল না। কিন্তু আমরা কেউই ম্যাগদালেন চা বাগানের উল্লেখ করতাম না।

সমস্যাবহুল চূড়াটি থেকে তখন আমরা সিকিমাইল পিছনে তাঁবু ফেলেছি। বাজিযে দেখার কথা ছিল। কী করণীয় আজই তা স্থিব হয়ে যাবে।

সকালেই ব্যালেন্টাইন তার তাঁবু থেকে কখন বার হয় এই প্রতীক্ষায় আমি আমার তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ব্যালেন্টাইন এল। তার পোশাকে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। পাহাড়ে উঠবার কুড়ুল-লাঠি হাতে, পিঠে একটা ছোট হ্যাভারস্যাক, কোমরে রিভলবার তো বটেই।

ব্যাপারটা কিছু দূর গড়াতে পারে এই আশঙ্কা হল আমাদেব। সুতরাং পাহাড়ে চড়ার জুতো এবং কুড়ুল-লাঠি আমাকেও নিতে হল। একটি ছোট ঝোলায় কিছু শুকনো খাবার নিলাম আর জলের ব্যাগ।

আধ ঘণ্টাটেক পরিচিত পাহাড়েব গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপব ব্যালেন্টাইন একটা শুড়িপথ বেয়ে নিচে নামতে লাগল। কিছু দূব নামবাব পর আমাব ধারণা হল আগে যেমন মনে করেছিলাম পাহাড়েব আদিবাসীদের পায়ে পায়ে এই পথ সৃষ্টি হয়েছে সেটা ভুল। কোনো এক সময়ে বর্ষার সঞ্চিত জল একটা ঝর্ণা হয়ে নেমেছিল, সেই জলের ধারায় পথটা সৃষ্টি হয়েছে। ছোট ছোট নুড়ি পায়ের তলায় খরখর কবে সবে যাচ্ছে। শিথিল মূল যেসব লতা ও আগাছা চোখে পড়ছিল সেগুলোর উপরে নির্ভর করা মূর্খতা হতো। ববং কুড়ুল-লাঠি কাজে লাগল। ভবসা এই দূব থেকে যতটা খাড়া মনে হচ্ছিল পথটা আসলে তা নয়। এবং উপব থেকে যার খোঁজ পাওয়া যায়নি, তিন-চারশো ফিট প্রাণ হাতে কবে নামতে বার্চেব জঙ্গলের মধ্যে তেমনি একটি মাটি-মিশানো পথ পাওয়া গেল। পথ অর্থাৎ কিছু কিছু সমতল জায়গা শ্যাওলা ঢাকা গাছেব শুঁড়ি ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। শুধু বাহারে পাতাব ফার্ন নয়, পাথবেব গাযেব নানা রঙেব মস্ই নয়, দেখলাম নানা জাতের ফুলগাছও আছে। যেসব ফুলকে আমবা সিজনের ফুল বলে সযত্নে বাগানে লাগাই তাবই কয়েকটি জাত অনাদরে অজস্র ফুটে আছে। যত দূব মনে পডছে কার্নেশ্যন্ ফুলই বেশি ছিল। প্যান্সি ও ভায়োলেটের আভাস পাচ্ছিলাম। একটা প্রৌঢ় বার্চের কণ্ঠলগ্না উজ্জ্বল স্বচ্ছপ্রায় কমলা রঙের ফুলের মালার মতো একটি অর্কিড। গাছগুলো থেকে একটু দূবে খানিকটা ঘাসের জঙ্গল চোখে পড়ল। চারিদিকে চাইতে চাইতে বসবার মতো জায়গাও খুঁজে পেলাম। দলছাড়া কিন্তু শক্তিমান একটা বার্চের তলায় একটা পরিচ্ছন্ন বড় পাথর ছিল, আমরা তার উপরে গিয়ে বসেছিলাম। আমরা দুপুরের আহার সাবছি এমন সময়ে চারিদিকের বাতাস শুঁকতে শুঁকতে একটা ছাগল-জাতীয় হবিণ এসে উপস্থিত হল। নিঃশব্দে আমি ব্যালেন্টাইনকে ইঙ্গিত করলাম রিভলবার দিয়ে তাক করো। কিন্তু পাঁচ-দশ হাত দূবের সেই হরিণকে ব্যালেন্টাইন হত্যা করল না। বরং আমি যখন রিভলবাব হাতে কবলাম সে আমার হাত চেপে ধবে চোখ দিয়ে নিষেধ করল। হরিণটা খুঁটে খুঁটে পাতা খেল, ঘুবে ঘুরে চলে গেল।

ফিরতি পথে কিছু কষ্ট পেতে হয়েছিল। করকিতে পড়ার সময়ে ব্যালেন্টাইন পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস করত, সেটা কাজে লাগল তার।

এই সূত্রপাত হল।

প্রথম প্রথম রাস্তার সীমা সরহদ্দ নির্ণয় করাব উপলক্ষ ছিল, পবে তাও থাকল না। প্রায়ই ব্যালেন্টাইন পাহাড়ে চড়ার পোশাক পবে বেরিয়ে যেত। এ যাওয়া সপ্তাহে একদিন থেকে তিন চারদিনে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম প্রাতরাশের টেবলে দেখা হতো, দু'একবার তাব সঙ্গে যেতেও হয়েছে। তারপবে বেরুনোব তাগিদে প্রাতরাশেব টেবলে অনুপস্থিত হতে লাগল সে। কখনও তাঁবুব দরজায় দেখা হলে সে বলত—বোনার্জি, দক্ষিণ-পুবে যাচ্ছি। তারপর সে-খবর দেওয়াও বন্ধ হল।

একদিন সন্ধ্যাব পর সুন্দরাইযা এসে খবর দিল—তার সাব তখনও ফেরেনি। সুন্দরাইয়া ব্যালেন্টাইনের অর্ডারলি। কতদিন হল? দু'দিন হল।

ভাবনারই কথা। গোকুল ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ব্যালেন্টাইনের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা হল। স্থির হল রাত্রিতে কোনো ব্যবস্থা করা অসম্ভব। দিনের বেলায় শুরু হবে।

পরদিন সকালে ছোট ছোট চারটে দলে ভাগ হয়ে আমরা বার হলাম। দু-তিন ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর গোকুলই প্রথম তাকে দেখতে পেল। কাছাকাছির মধ্যে সবচাইতে উঁচু চূড়াটায় উঠে গোকুল দূরবিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

তার ডাকাডাকিতে অনেক কষ্টে উপরে উঠে তার নির্দেশিত দিকে লক্ষ্য করে মনে হল পাহাড়ের পথে অনেক নিচে কী যেন একটা চলছে। প্রায় দশ মিনিট ধরে সেই 'কী যেন'-টা উপরে উঠলে আমি ঘোষণা করার সাহস পেলাম ব্যালেন্টাইন আসছে। তারও এক প্রহর পরে পুবদিকের পাহাড়ের ধারে ব্যালেন্টাইনের হেলমেটের চূড়া চোখে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যার পর ব্যালেন্টাইন আমার তাঁবুতে এল। তার হ্যাভারস্যাক থেকে এটা-ওটা বার করে সে আমার টেবলে রাখতে লাগল। সোনালি দাগ দেওয়া এক টুকরো পাথর, কুচকুচে কয়লা রঙের একটা নুড়ি, পাথর হয়ে যাওয়া কোনো পাতা, একজোড়া ডালপালা মেলা ছোট একটা হরিণের শিং। এসব দেখে বুঝবার উপায় নেই বিজ্ঞানের কোন অঙ্গে তার ঝোঁক। কারণ সবশেষে সে একটা অজ্ঞাত গাছের শিকড় বার করে বসল, বাজিকররা যেমন তাদের ঝোলা থেকে ভেল্‌কির হাড় বার করে।

দৃশ্যতই ব্যালেন্টাইন এসব সংগ্রহ করার জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো প্রশংসাবাক্য আশা করছিল আমার কাছে। তার কাছে কিছুক্ষণ তার সংগ্রহের বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো শুনলাম।

দু-তিন দিন সে বেরুল না।

একদিন তাকে কাজের কথায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্যাপ্টেন, সিমেন্ট-এর স্টক কমে এসেছে, লেখালিখি করতে হয়'।

সে আমার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি যেন কোনো অবুঝ স্কুলমাস্টার।

কিন্তু সে একবার আর ফিরলই না। আমাদেব পক্ষে যতদূর সম্ভব খোঁজাখুঁজি করা হল। আট-দশ দিন খোঁজাখুঁজি কবে আমরা A ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার্সে খবর পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন ব্যালেন্টাইন নিখোঁজ হয়েছে।

লোকজন এল। রেসকিউ পার্টি নিয়ে একজন লেফ্‌টেন্যান্ট দিন দশ-পনেরো খোঁজাখুঁজি করল। তারা ফিবে গেলে ব্যালেন্টাইনের জায়গায় A2 সেকশনের নতুন এঞ্জিনিয়ার এল মেজর নিল্‌।

গোকুলরা অবশ্য ব্যালেন্টাইনকে নিয়ে এখনও আলোচনা করে। ওদের কারো কারো ধারণা দুষ্প্রাপ্য কোনো খনিজের সন্ধান পেয়েছিল সে। এবং সোনার লোভে মানুষ কী না করতে পারে এবং সোনার জন্য মানুষের কী না হয়েছে?

কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে : ব্যালেন্টাইনের মতো আজন্ম মাংসাশী হরিণকে পাঁচ হাতের মধ্যে পেয়েও তাকে নিরাপদে যেতে দিল সেটাই-বা কী রকম ব্যাপার?

সে যাই হোক, ব্যালেন্টাইনকে ডিজারটার বলে উল্লেখ করে হুলিয়া বার হল।

যুদ্ধের ভয়ই যদি বলো প্রতিবাদ কবাব কিছু নেই। অনেক জাঁদরেল সেনাপতিই সে ভয়ে ভীত। কিন্তু যুদ্ধের ভয় এ জায়গাটায় কী এমন বেশি?

জায়গাটার নাম ধরে নিও নামচা। নামচা বাজারও বলতে পারো। বহু বহু দিন পরে আমাদের এই সাম্রাজ্যপথ যেন লোকালয়ের দিকে ঝুঁকেছে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার থেকে কিছু পিছনে উপজাতীয়দের একটা গ্রাম চোখে পড়েছিল। সে গ্রামেব দিকে যাওয়া ছিল সর্বপ্রকারে নিষেধ। আমরা খবর পেয়েছিলাম সেটা একটা পড়তি গ্রাম—অশক্ত ছাড়া প্রায় সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। প্রথমে

ধারণা হয়েছিল কোনো মহামারী, পরে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারি—এই সড়ক-মাপের ভয়।

কিন্তু আমার এবং তোমার এই নাম্‌চা বাজার, যদিও ভূগোলের সবচাইতে বড় ছবিতেও এ নামের কোনো গ্রামের হদিশ নেই, সে রকম গ্রাম নয়। অগ্রসর দল এসে প্রথমে খবর দিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে গায়ে ইতস্তত জুম চাষের চিহ্ন চোখে পড়েছে। স্কাউট পাঠানো হয়েছিল। তারা ফিরে এসে বলল, দু-চারশো ঘরের একটি বাজারসমেত গ্রামই বটে।

মেজর সাহেবের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে বসে আলাপ হল। স্থির হল গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে—প্রয়োজন হলে উপঢৌকন বিনিময়। অনাবিষ্কৃত ভারতবর্ষের এ পাহাড়ে যদি অত বড় একটা গ্রাম থেকে থাকে তবে সেখানে কিছু সভ্যতা আশা করা যায় এবং সম্ভবত কিছু ফলমূল আনাজ-তরকারি পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

তুমি শিলং দেখেছ, আলমোড়া দেখেছ; সেসব জায়গায় বাজার কী রকম হয় তার ধারণা একটা আছে। বাজার সর্বত্রই একরকম; লোকের আনাগোনা আছে, কেনাবেচার আয়োজন আছে। কিন্তু নাম্‌চা বাজার বিলাসের তাগিদে গড়ে ওঠেনি, উঠেছে বাঁচার প্রয়োজনে। ইট কাঠের বড় বাড়ি কাচের দরজা-জানালা একটিও চোখে পড়ল না। বাঁশের ও খড়ের আচ্ছাদন যেগুলোর উপরে আছে সেগুলোই সবচাইতে বড় দোকান। অন্য দোকানগুলোর কোনো আচ্ছাদন নেই। ক্রেতারা প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ। লক্ষ্য করা গেল বিক্রেত্রীরা ক্রেতা ও ক্রেত্রীদের চাইতে সাজসজ্জার দিকে অধিকতর অগ্রসর। মনে হল ক্রেতাদের একটা বড় অংশ আশপাশের গ্রাম থেকে উঠে এসেছে।

আনাজের আশায় গিয়েছিলাম আমরা। সারা বাজারে রাইজাতীয় শাক, গাছের শিকড় ও ধুঁধুল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিছু পাখি অবশ্য পাওয়া গেল। এবং মেজর সাহেবের পরামর্শ মতো উপযুক্ত দামের প্রায় দ্বিগুণ দিয়ে আমরা কিনলাম সেসবই। দাম আমরা দিলাম রুপোর টাকায়, পুরনো কম্বলে, বিস্কুট ও রুটিতে, জমানো দুধ ও মাংসের খালি রঙদার টিনের কৌটায়। দোকানিরা প্রথমে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চেয়েছিল, পরে তারা খুশিই হল যেন। কী সহজেই না এরা খুশি হতে পারে! এদের ভাষা এক বর্ণও আমরা বুঝলাম না। ওরা আমাদের প্যান্টকোট দেখে আমাদের সকলকেই একই নামে সম্বোধন করল।

তাদের অসভ্য মনে করার কোনো যুক্তি নেই। তাদের পরনে তাঁতে বোনা এক ধরনের বস্ত্রখণ্ড ছিল। রঙের ঔজ্জ্বল্য ও নকশার মনোহারিতায় তা ভালো ব্রোকেডকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে পারে।

বাজারের কাজ আমাদের শেষ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে যে সিপাই-এর দল এসেছিল তারা ফিরে গেছে।

এমন সময়ে মেজর সাহেব বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠলেন। তাঁর ইঙ্গিত মতো চেয়ে দেখলাম। একটি ছোট কাঠের বাড়ি, বয়সের দিকে সেটার অতি প্রৌঢ় অবস্থা। এদের তৈরি অন্যান্য যা কিছু চোখে পড়েছে তার সঙ্গে এ ঘরখানির গঠনে মৌল পার্থক্য আছে। পাথরের ভিত্তিতে কাঠের থামের উপরে বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনের দিকে গাড়িবারান্দার ঢঙে ঘরের তিনচালা ছাদ এগিয়ে এসেছে। গ্যাবেলড্ রুফ। গাড়িবারান্দার একদিকে বোধ হয় জালিকাটা কাঠের পর্দা ছিল কোনোকালে। সেই পর্দার দু-পাশে দু'টি পাতাবাহারের গাছ জটপড়া পাকানো পাকানো গুঁড়ি নিয়ে এখনও সতেজে বাড়ছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড এই বাড়িটার ছাদের উপরে ছোট একটা গথিক ধরনের ক্রস্।

আমরা খানিকটা অগ্রসর হয়ে সেই চার্চ বা একদা যা চার্চ ছিল তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পাদরিকে খুঁজতে হল না। প্রধান দরজার সামনে এখনও লোহার শিকলে সবজে হয়ে যাওয়া ভাঙা পিতলের ঘণ্টাটা ঝুলছে, কিন্তু দরজাটার অনেকটা জুড়ে একটা উইঢিবি। সেই উইঢিবিও এখন পরিত্যক্ত। গাড়ি বারান্দার নিচে গ্রামের লোহারের দোকান। গনগনে আগুনের ভিতরে লোহা তাতিয়ে সহকারীর সাহায্যে সে ভালো ব্যবসাই করছে। তার গ্রাহকরা উবু হয়ে বসে তার কাজের তারিফ করছে। নিজেদের

মধ্যে রংতামাশাও করছে। বোধ হয় চার্চেরই সম্পত্তি এমন একটি লোহার ফ্রেমের বেঞ্চ একধারে পড়ে আছে।

গত চিঠিতে কথাটি তোমাকে বলিনি। কারণ দর্শন আমাকে পেয়ে বসেছে, চিঠিতেও দর্শন ফলাচ্ছি এবং এ ব্যাপারটা বলতে গিয়েও দর্শনেব কথাই মনে হচ্ছিল।

পাদরিদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে : তারা পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত। কিন্তু যে পাদরি এই নামহীন অজ্ঞাত বাজারে তার গির্জা স্থাপন করেছিল—তার কী তাগিদ ছিল! সে কি সাম্রাজ্যবাদী টাকায় এই গির্জা তুলেছিল! তার কোনো খোঁজই পাচ্ছি না। কিন্তু এমন তো হতে পারে সে ইংরেজ নয়, হয়তো সাম্রাজ্যবাদকে যারা অবাস্তব স্বপ্ন বলে জানে এমন কোনো দেশের লোক, হয়তো-বা সুইডিস্ কিম্বা মোরাভিয়ান কোনো পাদরি। গির্জা টেকেনি। তার প্রাণরক্ষা পেয়েছিল কি না তাই-বা কে বলবে?

একটা বিষয় আমরা বুঝতে পারলাম। নাম্‌চা বাজারে সভ্যতার বোঝা নিয়ে পৌঁছুতে সাম্রাজ্যের নিকটতম কেন্দ্রটি থেকে দুশো মাইলব্যাপী নির্জন এই সাম্রাজ্যপথে আসতে হয়। কিন্তু আর একটি পথও হয়তো আছে। অতি সুগভীর এক উপত্যকার ওপারে ফিরোজা-বেগুনি নীল রঙের একটি নিচু পাহাড়ের মাথায় লাল ছাদের হলুদে দেয়ালের একটি চিমনি-তোলা বাড়ি কি চোখে পড়তে পারে?

মনে হল ক্রমাগত জুমচাষের জন্য কাটা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উঠতে উঠতে দু-তিন মাইল নিচের কোনো শহর থেকে কিম্বা ওই চা বাগান থেকে হয়তো এখানে পৌঁছানো যায়। অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ চড়াই-এর এবং সভ্যজগতের অজ্ঞাত পথে হয়তো। কোনো পাহাড়ি কুলির মাথায় বিছানা পোর্টম্যান্টো ও প্যারাসল চাপিয়ে এক পাদরি উঠে এসেছিল।

একটা দুঃখের খবর দেয়ার আছে।

পথের স্থায়িত্ব রক্ষা করার দিকে লক্ষ্য রেখে এ জায়গাটায় দু-পাশেই পাহাড়েব গা সিমেন্টে বাঁধাতে হচ্ছে। বাঁদিকে আলগা পাথরের একটু ঢাল নিচের একটা ছোট ও সংকীর্ণ অধিত্যকায় নেমে গেছে। শুধু প্যারাপেট নয় আলগা পাথরগুলোকে নিচে থেকে কংক্রিটে বাঁধিয়ে তুলতে হবে। আমার লোকজন অধিত্যকায় নেমে গিয়ে সিমেন্টে পাথরে গেঁথে গেঁথে ক্রমশ উঠে আসছে।

একদিন সন্ধ্যায় গোকুল কাজ শেষ করে ফিরে আমার তাঁবুতে এল।

আমার একটা বাতিক হয়েছে দেখছি— জিনিস কুড়নোর। রঙিন কিম্বা অদ্ভুত চেহারার পাথর, পাথর হয়ে যাওয়া গাছের পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে একটা ট্রাংক বোঝাই করে ফেলেছি।

নিজের বাতিকে নিজেই বিব্রত বোধ করছি। আমার এই সংগ্রহের ব্যাপারে গোকুল সহায়তা করে। আজ সে মরচে-পড়া লোহার মতো কী একটা নিয়ে এসেছে। আসলে সেটা কিছু প্রাগৈতিহাসিক কিছু নয়, একটু লক্ষ্য করেই বোঝা গেল সেটা পাহাড়ে উঠবার একটা কুডুল-লাঠির ভগ্নাংশ। সংগ্রহ হিসাবে সেটা কিছু নয় কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে কৌতূহল অনুভব করলাম, এই সভ্যজগতের অজ্ঞাত পথে য়ুরোপীয় কায়দায় কেবা পাহাড়ে চড়তে এসেছিল। আমি গোকুলকে চারিদিকে দৃষ্টি রাখতে বললাম।

দুদিন বাদে একটা ঝোপের পাশে ব্যালেন্টাইনের পাইপটা পাওয়া গেল। অন্তত পাইপটা যে ব্যালেন্টাইনের সদা-ব্যবহৃত একটির মতোই, এ আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি। আমাদের একটা সন্দেহ হল : ব্যালেন্টাইনের আরো বেশি খোঁজখবর এদিকে পাওয়া যেতে পারে। দু'দিন ধরে আবার খোঁজ চলেছিল। পাঁচ-সাত জন আর্মির লোকের সঙ্গে আমার আট-দশ জন কুলিও ছিল!

সেদিন সন্ধ্যায় তাদের একটি দল ফিরে এসেছে। তারা একটি করোটিহীন কঙ্কাল আবিষ্কার করেছে।

আমি এবং মেজর গিয়েছিলাম। কঙ্কালের কাছে পোশাক পরিচ্ছদ কিছু ছিল না। হাড়গুলো হলুদে হয়ে গেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেগুলোকে কুড়িয়ে এদিকের ওদিকের ঝোপঝাড়ে ন্যাড়াপাথরের

আড়ালে আবডালে খোঁজ করে হাড় ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না।

মেজর বললেন, 'বোনার্জি, হাড়গুলো দেখে কি অত্যন্ত পুরনো কিছু বলে মনে হয় না'?

'তা হয় বইকি'।

কিন্তু কঙ্কালের বাহুর হাড়ে রুপোর বিবর্ণ চেনে বাঁধা আইডেনটিটি ডিস্ক পাওয়া গেছে। ধুয়ে মুছে সে ডিস্কের ইংরেজি অক্ষর পড়ে জানা গেল ব্যালেন্টাইনের কঙ্কালই পাওয়া গেছে বটে। রাজকীয় ভারতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন ব্যালেন্টাইন! ডিজারটার ব্যালেন্টাইনকে এখনও মিলিটারি পুলিস ভারতীয় পুলিসের সহায়তায় খুঁজে বেড়াচ্ছে! সমস্ত বন্দর সমস্ত স্টেশন তার পক্ষে প্রতিরুদ্ধ।

এখন ব্যালেন্টাইন সম্বন্ধে অনেকের ধারণাই বদলে গেল। মেজর এতদিন, অন্তত প্রকাশ্যে, নেতার পক্ষে স্বাভাবিক স্বরে এই দলত্যাগীকে ধিকৃত করেছেন ইংরেজ জাতিকে কলঙ্কিত করেছে বলে। এমনকী তার ইংরেজ রক্ত যে অবিমিশ্র নয়, এশিয়ার রক্তের মিশেল আছে, এমনসব মত তিনি পরোক্ষে প্রচার করতেন। একদিন তিনি মদের গ্লাসের গায়ে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললেন, 'বোনার্জি, পথের ধারে একটা ছোট সেনোটাফ বানিয়ে দেবে'?

রাজি হলাম। স্থির হল ব্যালেন্টাইনের পার্থিব অবশেষ সমাধিস্থ করে ছোট সুদৃশ্য একটি আরন্ জাতীয় কিছু তৈরি করে দেওয়া হবে। মেজর বললেন একটি ইংরেজি কবিতার দু'টি চরণ উৎকীর্ণ করতে।

কবিতাটি তোমার পরিচিত : নাবিক সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে, শ্রান্ত শিকারি পাহাড় থেকে ঘরে এসেছে।

আমার মনে হয়েছিল : ইন্দ্র পথচারীদের সহচর— এই অনূদিত বাক্যটি লিখে দেব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ব্যালেন্টাইন ঠিক পথচারী নয় তো। সে বোধ হয় তার মনের মতো কোনো ঘরেরই কাঙাল ছিল যেখানে ক্লান্তি দূর হয়। কাজেই ইংরেজ কবিই বোধ করি ওর মনের কাছে গিয়েছে।

গোকুল অবশেষে চূড়ান্ত পাগলামি শুরু করেছে।

মানুষের জীবন-রহস্য ভাবতে গিয়ে সেদিন আমার নোটিলাসের গল্প মনে পড়ল। সেই যে ডুবুরি-জাহাজের জানালায় বসে সমুদ্রের প্রাণময় বিস্ময়কে লক্ষ্য করার গল্প। জীবন-রহস্য সম্ভবত তার চাইতেও বড়, গতিমান বিস্ময় চারিদিকে থই থই করছে।

গোকুলকে ডুবুরি জাহাজের গল্পটা বলে অবশেষে বলেছিলাম, 'তুমি কি মনে করো একটিমাত্র কাচের জানলাই আছে সে রহস্যের দিকে ফিরানো'?

গোকুলের ধারণা তাই। অর্থনীতির জানলা দিয়ে দেখাই নাকি জীবন-রহস্যকে বুঝবার একমাত্র পথ।

সে যাই হোক, ওকে ফেরত না পাঠিয়ে উপায় নেই। মেজরের কাছেও ও মতবাদ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কাল র‍্যাশান তুলে আনতে একটা ছোট কনভয় যাচ্ছে। তার সঙ্গে গোকুল রওনা হচ্ছে। যদি ওর ফিরতে ইচ্ছা হয় কাজে, ফিরবে। নতুবা হ্যারন্ডের নামে চিঠি দিয়ে দিলাম, সেটা দেখালে চাকবি পাবে। ওর চাকরির দরকার সেটা যেন ওর চাইতে আমি বেশি বুঝি।

হ্যারল্ডকে লিখলাম ম্যাগদালেনের খবর দিতে।

মেজর সাহেবের সঙ্গে কাল একটু তকরার হয়ে গেল। ঠিক কী কী কথা হয়েছে তোমাকে জানাতে পারব না। তবে ভদ্রলোকের একটি কথা আমি ভাবছি, হয়তো এরপরও দু'এক সময়ে মনে হবে।

তিনি কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন—রূপের সার্থকতা কোথায়?

আমি কাব্যগত ও জীবতত্ত্বগত রূপের প্রয়োজনগুলো উল্লেখ করলাম।

ভদ্রলোকের লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিধি য়ুরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ছড়ানো। ইদানীং তিনি পূর্ব

এশিয়ায় অধিস্থিতি করছেন।

কাব্যগত কারণগুলোকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'রূপ যদি পুরুষকে বাঁধবার জন্যই হয়ে থাকে তবে তার ব্যর্থতাও অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ পুরুষ রূপকে গ্রাস করছে অর্থের সাহায্যে, পৌরুষ সেখানে উহ্য। প্রকৃতপক্ষে রূপ নিজের উদ্দেশ্য সাধন না করে পণ্য হয়েছে—সতীর বেলাতে এবং গণিকার বেলাতেও। কারণ সতীর বেলাতেও রূপ ভীমার্জুন সংগ্রহ করে না, করে বকফেলার জাতীয় কোলাব্যাঙরা। আমি তোমাদের হাঁড়াপেটো বিত্তেশ্বর কুবেরের মূর্তি দেখেছি, তারপর থেকে অর্থবান লোকের উল্লেখমাত্রই তার কথাই মনে হয়। কিন্তু এ রকমই যদি অবস্থা তবে প্রকাশ্যে নারীপণ্যে দোষ কোথায়'?

আমার মনে হল মেজর তার দৃষ্টিকে পিছন দিকে ফিরিয়ে রেখেছেন। তাই বললাম, ভীমার্জুনের যে পৌরুষকে তিনি সমালোচনার উর্ধ্বের কোনো নির্দিষ্ট মান বলে স্বীকার করছেন সেটার জন্যে তৎকালীন ক্ষাত্রসমাজ বা ক্ষাত্রযুগ দায়ী। এখন এটা বৈশ্য যুগ চলছে এবং এ সময়ের বীর বলতে ফোর্ডকে কেন উল্লেখ করা হবে না? কিম্বা আগতপ্রায় দাসযুগে স্টাখানোভই বীরোত্তমের আদর্শ হিসাবে? এ যুগের চিত্রাঙ্গদার পক্ষে অর্জুন গাণ্ডীবধারী নয়।

মেজর সাহেব পাইপে তামাক ভরে প্রশ্ন করলেন, 'রূপসী যদি নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়, তবে তার সতী জীবনের অন্তরালে গোপন স্বপ্নগুলো কোনো নাইটকে আমরণ অন্বেষণ করে নাকি'?

এত কথা উঠল কেন তা এবার বলি।

পথের অগ্রসর স্কাউট দলের মুখে খবর পেয়ে আমি ও মেজর খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা দেখতে। তাদের সংবাদ অমূলক নয়। নাম্‌চা বাজারের দিক থেকে একটা উপজাতির দল রাস্তার মুখ পার হয়ে অন্যদিকের পাহাড়ের কোন এক অনির্দেশ্য স্থানকে লক্ষ্য করে চলেছে। বহু নিচে থেকে মানুষগুলো উঠে আসছে, নেমেও যাচ্ছে তেমনি বিপরীত দিকে? দূরবিন ছাড়া খালি চোখে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল বর্ষার হদিশ পেলে পিঁপড়েরা যেমন ডিম মুখে করে গর্ত থেকে উঠে আসে, তেমনি পাহাড় বেয়ে উঠছে তারা। মনে হল—তারাও বিপন্ন।

মেজর অবশ্য বলল— এটা উপজাতীযদের যাযাবর বৃত্তির চিহ্ন। খবর নেবার জন্য মেজর এবং আমি আরো কিছু এগিয়ে যেখানে ওরা রাস্তাটা পার হচ্ছিল তার পনেরো-বিশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন এদের দলের একজনকে দেখে বিস্মিত হতে হল। একটি স্ত্রীলোক। শুধু ত্বকের বর্ণ নয়, মুখাবয়ব, চুল, বেশভূষা সবদিক দিয়েই দলের অন্য সব ক'টি স্ত্রীলোক থেকে সে স্বতন্ত্র।

আমি অনুচ্চকণ্ঠে নিজেকে শুনিয়ে বললাম, 'ম্যাগদালেন'? মেজরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'টেম্মা'?

স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে আমাদের দু'জনেরই পরিচয়ের অনুচ্চারিত দাবি দু'জনের কানে গিয়েছিল।

মেজর বললেন, 'এ যদি টেম্মা না হয় এক পাউন্ড পাইপ-মিকশ্চার বাজি, বোনার্জি'।

আমি বললাম, 'এ যদি ম্যাগদালেন না হয়, জনি ওয়াকার এক পাঁইট'।

আগ্রহ ভরে দু'জনেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরিচিতের কাছেও তাকে ম্যাগদালেনের যমজ বলে চালিয়ে দেওয়া গেলেও সে কি ম্যাগদালেন? এ মেয়েটির চুল বব্‌ বা শিঙ্গল নয়। পিঠের উপরে বেণীতে লুটিয়ে পড়েছে। চুলগুলো ম্যাগদালেনের মতো লাল নয়! গাঢ় বাদামির মধ্যে দু'একটি সাদার রেখা পড়েছে। পরিধানে অদ্ভুত ধরনের ফ্রক। গাঢ় কফি রঙের ব্রোকেডের ফ্রক ঝুলে যেমন পা পর্যন্ত নেমেছে, আস্তিনের দিকেও তেমনি কবজি ছাড়িয়ে খানিকটা ঝুলছে, অন্তত ঝুলত যদি না অনেকগুলো বড় বড় ভাঁজে উল্টে দেওয়া হতো। তার উপরে কোমরে লাল-কালোয় ডোরাকাটা অ্যাপ্রন জাতীয় কিছু। গলায় একগাছা রুপোর হার, তাতে অনেক বড় বড় রঙিন কাচ। পায়ে মোটা রঙিন ডোরাদার ক্যানভাসের মোকাসিন জাতীয় দড়ির সোলের জুতো। রগের দু'পাশে রুপোলি প্লাস্টিকের দু'টি চাকতি

টিপের কায়দায় সাঁটা। মেয়েটি যে তিব্বত-ভোট সংস্কৃতির প্রভাবে অনুভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। ম্যাগদালেনকে এ অবস্থায় কল্পনা করা তখনই যায়, যদি মেনে নিতে পারি সে রূপসজ্জাদক্ষ এবং গভীর কোনো সমাজবিরোধী কাজ ক'রে সে আত্মগোপন ক'রে চলেছে। আর এ বিষয়ে কিছু বলতে হলে জানতে হবে হ্যাবল্ডকে চিঠি লিখে।

মেজর বললেন, 'বোনার্জি, তুমিই বোধ হয় জিতলে'।

'ঠিক এ কথাটাই আমি আপনার সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিলাম'।

'তোমার ম্যাগদালেন নয় তাহলে? অবশ্য টেম্মা নয়, এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারছি না। কারণ রাত্রির অস্পষ্ট আলোতেই আমি টেম্মাকে দেখেছিলাম। তখন তার পরনে টিসু সিল্কের কিম্বা অর্গ্যান্ডির গাউন ছিল, ঠোঁট রাঙানো ছিল এবং আমিও নেশায় চুর হয়ে ছিলাম। নেশার অবস্থায় ছাড়া টেম্মাকে অত রাত্রিতে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়'।

এই বলে টেম্মার পরিচয় দিলেন মেজর। তার আস্তানার নাম বলতে পারব না, অবশ্য বললেও কেউ ম্যাপে খুঁজে পাবে না। বিদেশি সৈন্যদের একটি ব্যোম-ময়দানের পাশে অর্ধ খ্রিস্টান একটি পল্লী অস্থায়ী এক শহরের রূপ নিয়েছিল এবং টেম্মার মতো অনেকে কখনও প্রাণের ভয়ে, কখনও টাকার লোভে বিপথে এসেছে।

এরপরেই আমাদের আলাপ তাত্ত্বিক হয়ে ওঠে যেমন আগে বলেছি। মেজর বললেন, 'টেম্মার স্বামীও বোধ হয় ছিল। কিন্তু সে বেচারা কী বলবে, বলো'।

মেজরের বক্তব্য শুনে আমার পুরনো কথা মনে পড়ল। চিত্রাঙ্গদাও তো এদিকেরই মেয়ে। (এবং তার সঙ্গে সঙ্গে) ম্যাগদালেনের মা জেনেরও স্বামী ছিল। সাধারণ পুরুষে তার মন ওঠে না। তার বিশিষ্ট কল্পনার সেই অর্জুনকে সে খুঁজছে। তা যদি না পায় খুঁজে, মেজরের কথা সত্য হয়ে দাঁড়ায় বর্তমানের পৃথিবীতে টাকা, লোভ এবং কৌলিন্যের মোহে, স্বৈরিণী নেই বলেই রূপের মূল্যও নেই।

তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেকার এক চিঠিতে টেম্মার কথা বলেছিলাম। তারা পাহাড়ের একপাশ থেকে উঠে আমাদের সাম্রাজ্য সড়ক পার হয়ে অন্যপাশে নেমে যাচ্ছিল পিঁপড়েরা ডিম মুখে করে যেমন যায়। প্রবাদটা এই যে পিঁপড়েরা বর্ষার আশঙ্কায় এমন করে। কিছুদিনের মধ্যে আশঙ্কাটাকে প্রত্যক্ষ করলাম। A1 এবং A2 সেকশন যেখানে মিলবে তার থেকে মাইল দু'এক আগে শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণ শুরু হল। একটা ক্যান্টিলিভার ব্রিজ করার কথা ছিল। লোহালক্কর এসে পৌঁছেছে। ঢাউস একটা ক্রেন্ শতভাগে বিভক্ত হয়ে উঠে এসেছে, সেটি জোড়া হচ্ছে। কাজ আরম্ভ হয়নি, কিন্তু পয়েন্ট নির্বাচিত হয়েছে। ব্রিজের সেই পরিকাল্পনিক অবস্থিতির পঞ্চাশ ষাট গজের মধ্যে দু-পাঁচটি বড় বোমা পড়ল। এই শুরু, কিন্তু শেষ নয়। সাইরেন নেই, পাকা রাস্তায় পাহাড়ের পাথরে স্লিট্-ট্রেঞ্চ খুঁড়বার উপায় নেই। দিনদুপুরে হাঙরের মতো তেড়ে তেড়ে এসে বোমা ফেলছে। অসহায় মানুষ মৃত্যুকে নির্মম এবং দুর্বার গতিতে আসতে দেখছে, রাশি রাশি হাহাকার ছুঁড়ে বোমারুদের প্রতিহত করার চেষ্টা করল একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন।

মেজর বললেন এবং আমারও ধারণা হল, শত্রুপক্ষের চর আছে কাছাকাছি কোথাও, নতুবা এত সূক্ষ্ম হিসাবে বোমা ফেলা সম্ভব হতো না।

কিন্তু শত্রুপক্ষের পাঁচ-সাত দিন বোমা ফেলে পাঁচ-সাত মাসের কঠিন পরিশ্রম চুরমার করে না দিলেও চলত। বোমা বর্ষণের দিন পনেরো পরে চিঠি এল, আপাতত চার মাসের জন্য রাস্তার কাজ বন্ধ থাকবে। বোধ হয় যুদ্ধের গতি ঘুরে যাচ্ছে।

কেউ কারো সংবাদ পাচ্ছিনে, এ অবস্থায় তা সম্ভবও নয়। কিন্তু খবর এই, আমি ফিরে যাচ্ছি। কুলিদের চারমাস বসিয়ে রাখা চলে না, মন ভালো করার জন্য সাময়িক বিদায় দেওয়াও চলে না। বোমার যে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছে তাতে ছুটির পরে কোনো প্রলোভনেই তারা ফিরবে না। মাইল

পঞ্চাশেক দূরে এক এরোড্রোম তৈরির কাজ পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে আমার এঞ্জিনিয়ার রওনা হয়েছে কুলিদের নিয়ে। আমি পাহাড় ডিঙিয়ে সবচাইতে কাছের রেল স্টেশন ধরব।

এত ক্লান্ত জীবনে কখনও বোধ করিনি। ফিরতি পথে যেখানে ব্যালেন্টাইনের সমাধি তৈরি করেছিলাম সে পর্যন্ত গিয়ে থামতে হল। ব্যালেন্টাইনের সমাধি এবং রাস্তার অনেকটা জায়গা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে অনবরত ব্লু প্রিন্ট দেখতে অভ্যস্ত দৃষ্টি ছাড়া সে জায়গাটা ঠাহর করারও কোনো উপায় নেই। বোমার বৃষ্টি এদিকেও কম হয়নি।

স্কাউটরা বলল, রাস্তা থেকে নেমে বুনোপথ ধরে বরাবর দক্ষিণ-পুবে চলতে পারলে লোকালয় পাওয়া যাবে। দশ-পনেরো মাইল পার হয়ে আবার সড়কে ওঠা যেতে পারে।

চার-পাঁচ জন লোক নিয়ে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের পথ ধরলাম।

তোমাকে চিঠি লেখাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভাগ্যে এখন শীত বা বর্ষা নয়। বড় একটা বার্চ গাছের নিচে আগুন জ্বেলে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। তবু হাঁটুর উপরে ডায়েরি রেখে তাতে চিঠি লিখতে বসেছি। রোজ লিখব।

সড়ক ছেড়ে বুনোপথে নামার পাঁচদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। দশ-পনেরো মাইলের জায়গায় পঞ্চাশ মাইল হয়ে গেছে। যদি কাল লোকালয় না পাই তবে আবার পিছু ফিরে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম সেখানেই ফিরে যাব।

এ রকম মনের অবস্থা নিয়ে চলছি এমন সময়ে একটি ঝরনার সাক্ষাৎ মিলল। ঝরনার ধাবে নিবাবরণ একটি মেয়ে পোশাক কাচছে। কিন্তু তার পিঠে ডানা ছিল না, বরং পাঁজরাগুলো দেখা যাচ্ছিল। লোকালয় তাহলে কাছেই।

এই ভাবতে ভাবতে দেখলাম আমাদের চারিদিকে অন্তত পঞ্চাশজন উপজাতীয় পুরুষ। তারা সশস্ত্র অর্থাৎ তাদের কারো হাতে বল্লম ছিল, কারো হাতে পাহাড়ি লম্বা দা। তারা কোন জাতীয়? মিকির, দাফলা, আবর? যে কয়েকটি নাম জানি তার বাইরেও কোনো উপজাতি গোষ্ঠী থাকতে পারে। নৃতত্ত্বে আমার অধিকার নেই, কৌতূহলও নেই।

তারা আমাদের গায়ে হাত দিল না কিন্তু বুঝতে পারলাম আমরা বন্দী হয়েছি।

গ্রামের মধ্যে একটা জায়গা খোলামেলা। গ্রাম বলতে একটা প্রকাণ্ড ঘর, যার ছাদ দেখে আমার উল্টিয়ে রাখা নৌকার কথা মনে হচ্ছিল, আর এদিকে-ওদিকে ছড়ানো দু'একখানি ছোট ছোট ঘর। খোলা জায়গাটা খেলার মাঠ হতে পারে, বাজারেব জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে, বিচারের আসরও হতে পারে। সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা।

বেশিক্ষণ বন্দীদশা ভাগ্যে ছিল না। একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়াল। সে একটি বৃদ্ধকে কী বলল। সেই বৃদ্ধ কয়েকজনের সঙ্গে কী পরামর্শ করল। তারা তখন দু' দু'জন উপজাতীয়ের মধ্যে আমাদের এক একজনকে দাঁড় করিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে গেল বড় বাড়িটার কাছে।

সেখানে কী কী ঘটেছিল আমার মনে নেই। পায়ের ফোস্কাগুলো পেকে উঠেছিল, বোধ হয় বেশিরকমের জ্বরও হয়েছিল। হাতড়ে হাতড়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম, কুইনিন ও অ্যান্টিবায়োটিক্স্ যাতে ছিল সেই ভ্যালিসটা ওরা সরিয়ে ফেলেছে। দু'দিন কিম্বা ছ'দিন সেখানে ছিলাম, হলপ করে বলতে পারি এমন অবস্থা তখন আমার ছিল না।

মনে হচ্ছে সেই বাড়িটার প্রবেশদ্বারে একটি নরকপাল ঝুলানো ছিল। সেখানে টেম্মা যেন ছিল। অন্তত আমার ধারণা জ্বরের ঘোরে যাকে দেখেছি সে টেম্মাই।

অন্নপথ্যের ব্যবস্থাও করেছিল ওরা। আমাদের মতো চাল ফুটিয়েই ভাত করছিল। আর আমার সঙ্গীরা যখন একে একে সকলেই এল তখন বুঝলাম কোনো নরকপাল-লোলুপের হাতে তারা শিকার হয়নি।

এব দু'দিন পরে ডুলির মতো কিছু করে ওরা আমাকে বয়ে সড়কে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এবং ফিরতি একটা কনভয় পেয়ে নেমে এলাম।

যে বাড়ির প্রবেশদ্বারে নরকপাল থাকে তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তোমার অনেক প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক! মৃত্যু ও হনন যে গৃহের বাস্তু-প্রতিষ্ঠার প্রতীক সেখানে নতুন প্রাণ যেন ছন্দছাড়া। কিন্তু টেম্মার সেই বাংলোবাড়িতে প্রকৃতপক্ষে একটি শিশুকে হামা টেনে বেড়াতে আমি দেখলাম। মলিন শিশু। তবু আধো-আধো কথা ও একটি দু'টি দুধের দাঁতের হাসিতে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করার আগ্রহে মাটি-কাঠি-নুড়ি মুখে দিয়ে যাচ্ছে।

টেম্মার কথা মনে হচ্ছে। মেজরের কাছে তার নাগরিক জীবনের পরিচয় পেয়েছি। তাকে এখানেও দেখছি। এই শিশুটি তাব। টেম্মার সঙ্গে ম্যাগদালেনেব সাদৃশ্য থেকেই এই কথাগুলো আমাব মনে পড়ল : ম্যাগদালেন ও তার নাগরিক জীবনের খুঁটিনাটিতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল পরিকল্পনাটি এক। সেই স্বজাতীয় মানুষগুলির সাহচর্য ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চা বাগানের মতো বারো মিশালি জীবনস্রোতে স্থিতিহীন ভাসমান অবস্থা। টেম্মাব বক্তেও দু-তিন পুরুষের মধ্যে বহু জাতির বহু বিদেশি মনোভাবের মিশ্রণ হয়েছে। তার নারীজীবনে প্রথম জন ও দ্বিতীয় জনের মতো কারো শাসন এবং সমাদর লাভ ঘটেছে, এতে সন্দেহ কবাব কিছু নেই। টেম্মার জননী শ্বেতাঙ্গব ঘর করেছিল তার প্রমাণ টেম্মার নাক, ভ্রূ ও চোয়ালের গঠন। আর এ অঞ্চলে চা বাগানের মালিক ও পাদরি ছাড়া শ্বেতাঙ্গ কোথায় পাওয়া যেত?

আমি যদি গল্প-লিখিয়ে হতাম এমন সুযোগ ছাড়তাম না। টেম্মাকে আমি ম্যাগদালেন এই নামেই উল্লেখ করতাম। তাহলে আমার এত কথা বলাব প্রয়োজন হতো না। ম্যাগদালেনের বিগত জীবনের সঙ্গে টেম্মার বিগত জীবনের একান্ত সামঞ্জস্য স্বতঃপ্রমাণিত হতো সেক্ষেত্রে। তোমার যদি বুঝতে অসুবিধা হয় টেম্মা ও ম্যাগদালেন অন্তরের দিক দিয়ে একই ব্যক্তি, তুমি ভেবে নিও ম্যাগদালেনই টেম্মা সেজে বেড়াচ্ছে, এবং টেম্মা ম্যাগীরই আর এক নাম। ম্যাগদালেন তো একটা চা বাগানেব নাম যা একটা উপাধি হতে পারে।

গল্পে স্বাভাবিক হলেও বাস্তবজীবনে এমন হয় না যে প্রত্যেক প্রাণের স্বপ্ন সার্থক হবে। টেম্মার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। ম্যাগীর সেই স্বপ্নরাজ্য, তিন রাজ্যের সীমার কাছে হারানো সেই বাজ্যের কথা আমার মনে পড়ছে। পণ্ডিতরা নাকি শাস্ত্র আলোচনা করে দেখতে পেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ বলে যে কথাটা আছে সেটা মাথার উপবের আকাশের ওপারের কিছু নয়। সেটা নাকি পূর্বপুরুষদের আদি বাসভূমি। তা যদি হয় তবে টেম্মা সশরীবে স্বর্গলাভ করেছে।

এবং ম্যাগদালেন তার সেই দুষ্প্রাপ্য স্বর্গলোককে হয়তো আমবণ বুকের নিভৃতে পুষে যাবে। জন্‌দের কাছে চাবুক খেয়ে তার বিতৃষ্ণা আসত চা বাগানের জীবনে, প্রকৃত বিতৃষ্ণা, সশরীরে স্বর্গলাভের পক্ষে যথেষ্ট ব্যাকুলতা কিন্তু তার প্রাণে হয়তো সঞ্চিত হয়নি, যেমন টেম্মার হয়েছিল মেজরদের বাধ্যতামূলক সাহচর্যে। ভীমার্জুন পারেনি, একা ধর্মপুত্রই পেরেছিল।

এই যে কথাগুলো তোমাকে বলছি এ কারোকে বলার মতো নয়। যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের ভয়ের চাইতে বড় কথা, ক্ষতি হয়ে যেতে পারে কারো কারো। (এমন সন্দেহ হচ্ছে আমার)। যদি এটা ডায়েরিতে লিখে রাখা চিঠিমাত্র না হতো, যদি এটা ডাকে দেওয়ার জন্যও লেখা হতো, এ কথাগুলো আমি লিখতাম না।

টেম্মার শিশুটির একটি পাহারাদারও ছিল। পাহারাদার হওয়ার উপযুক্তই বটে। উপজাতীয়দের

কোনো পুরুষ তার কাঁধের সমান উঁচুও নয়। লোকটা অসম্ভব স্থূলকায়। মেদের ভারে তার সহজে নড়াচড়া করার উপায়ও নেই যেন। তবে অন্যান্য উপজাতীয় পুরুষের মতো সে নগ্ন নয়, তার পরনে প্যান্টজাতীয় একটা পরিচ্ছদ দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। এই ভীমকায় দেহ অথচ কী অসহায় ভঙ্গি তার! সে যেন কাচপোকার বাসায় ধরা পড়া তেলাপোকা।

জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরে দেখতাম লোকটির কাজ হচ্ছে বাইরেব দিকের বারান্দায় বসে সূর্যমুখী ফুলের বিচি ও বাদাম চিবানো আর গলা শুকিয়ে উঠলে দিশি মদ গলায় গলগল শব্দে ঢেলে দেওয়া। সত্যই ঢেলে দেওয়া, সে চুমুক দিয়ে খেত না : লাল হয়ে যাওয়া একটা লাউয়ের খোল উঁচু করে ধরে গলগল করে গলায় ঢেলে দিত। তারপর আস্ত তামাক পাতা জড়িয়ে বানানো চুরুট ধরাত। তার স্থূলতা মদ্যজাত কি না শারীবতাত্ত্বিকরা বলতে পারে। বাইরে থেকে সেই ধীরমন্থরতা দেখে তার পিপাসার তীব্রতা আন্দাজ করা যায় না।

একটা বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছিলাম। টেম্মা লোকটিকে সূর্যমুখী বিচি দিয়ে যেত যেমন, তেমনি তামাক পাতা জড়িয়ে চুরুট তৈরি করে দিত। লোকটির ডান হাত কনুইয়ের উপর থেকে নেই।

কিন্তু লোকটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হতো তাব ভাঙা তোবড়ানো লাল নাকটিতে এখনও স্যাক্‌সনি ধাঁচ আসে।

একদিন সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। আমার গলার স্বরে সে চোখ তুলে তাকাল এবং যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে তাডাতাড়ি উঠে গেল। তেমনি তাড়াতাড়ি টেম্মা এসে প্রশ্ন কবল ইংরেজিতে, 'কিছু চাই'?—'না, ধন্যবাদ'।

যখন ওবা আমাকে ডুলিতে তুলে বওনা করে দিচ্ছে তখন টেম্মা এসেছিল এবং এই লোকটি লোকটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল তাকে আমি চিনি। স্থূলকায় নাক চোখ মুখের আকৃতি ঢেকে গেছে, কিন্তু ডান গালে রগ ছুঁয়ে টাঙিব দাগ এখনও যেন স্পষ্ট। ব্যালেন্টাইন!

কিন্তু ডান হাত হারাল কী করে? আর এই কি তার পথিক-বৃত্তিব পরিণাম! সেই করোটিহীন কঙ্কাল? টেম্মাব দরজায় নরকপাল দেখে আমার সেই করোটিহীন কঙ্কালের কথা মনে হয়েছে অনেকবার। সেট কি টেম্মার সমাজে প্রত্যাবর্তনের প্রায়শ্চিত্তমূল্য? কিন্তু বাকিটুকু তাহলে পরিকল্পনা। কঙ্কালের বাহুর হাড়ে আইডেনটিটি ডিস্ক পরিয়ে দেওয়াটা কার বুদ্ধি— ব্যালেন্টাইন কিম্বা টেম্মার?

টেম্মা যখন একটু দূবে দাঁডিযে আমার অগম্য ভাষায ডুলিওযালাদের কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি লোকটির মুখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম? সে ছটফট কবে উঠল, কিন্তু পালাল না। তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল, যেন কিছু বলে উঠবে।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, 'ব্যালেন্টাইন? ম্যাগীকে নিয়েই না হয় চলো'। লোকটি কী যেন বলতে গেল কিন্তু কতগুলি অস্ফুট দেশীয় শব্দই সৃষ্টি করতে পাবল।

টেম্মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, 'কী চাই, আপনার'? —'না কিছু নয়, ধন্যবাদ'। এই বললাম আমি বস্তুত কিছু বলার ছিল না আমার। করোটিহীন কঙ্কালের বাহুতে আইডেন্টিটি ডিস্ক পবানো কিম্বা কঙ্কাল থেকে করোটি খুলে এনে নিজের ঘরের দরজায় বসিয়ে দেওয়া একটি মনোভঙ্গির প্রাবল্য সূচনা করে। কিন্তু ঘোড়ার চাবুক খাওয়া ম্যাগদালেনদের পক্ষে কিম্বা যোদ্ধা ব্যালেন্টাইনের পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

আমার একটা কথা মনে হল। সেই পাদরির সঙ্গে ব্যালেন্টাইনের আকৃতিগত মিল কিছু থাকতে পারে হয়তো দু'জনেই নর্ডিক ছিল মুখের গঠনে। পাহাড় থেকে পড়ার পর তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য কি ধরা যাবে? এ লোকটি যদি ব্যালেন্টাইন না হয়ে নাম্‌চা বাজারের পাদরি হয়, আমার প্রতিবাদ করার যুক্তি নেই।

ডুলি ছাড়ল। টেম্মা ডুলির পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভাঙাচোরা ইংরেজিতে কিন্তু গোপন কথা

বলার ঢঙে বলল, 'আমরা চিরদিনই এদেশে থাকতে পারব না। যুদ্ধের পরে যদি এদিকে কখনও তুমি আসো, নাম্চা বাজারে আমাদেব খোঁজ কোরো— ডরোথি কুঙ্গার খোঁজ কোরো তাহলেই হবে। আমার স্বামীর চিকিৎসা করার জন্যই যেতে হবে। বেচারার জিভ যেন ক্রমশই আড়ষ্ট হযে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আর চোয়াল আঘাত পেয়ে এমন হয়েছে। আর তা ছাড়া এ জীবন আমাদের স্যুট্ করছে না'।

এমন না হলে আর জীবনকে কেউ কেউ ট্র্যাজেডি বলেছে কেন? পৃথিবী থেকে স্বর্গ, স্বর্গে পৌঁছেই পৃথিবীর জন্য হাহাকার।

কিন্তু রেল স্টেশনে পৌঁছেছি। কী আনন্দ, কী আনন্দ! একটা ছোট রেল স্টেশন কী অপার আনন্দ দিতে পারে এ আমার মতো আর বোধ হয় কেউ অনুভব কবেনি। কযেক ঘণ্টা বাদেই গাড়ি।

হনিড লার্ক

উৎকণ্ঠাই বোধ হল। অল্পপরিসর পথ। দু ধারে জঙ্গুলে গাছ। বিকেল অনেকটা আগেই শেষ হয়েছে। এখনও আলো জ্বালেনি। ব্যাটাবিতে নাকি তেমন জোর নেই। মাঝাবি করে চলছে আধবুড়ো ল্যান্ডরোভার। ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে যখন, ড্রাইভারের মুখের চেহারাও যেন বদলে যাচ্ছে। আমার অনুমান হল ক্লাচ, ব্রেক বা গিয়ার কিছু একটাকে বেশি জোবে চাপ দেয়ার জন্য সে সিট ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠছে।

স্টেশনে নেমে অসহায় বোধ করেছিলুম। স্টেশনেব ধারে ধুলোর বাস্তাটাব উপরে বাঁশেব দেয়াল আর টিনের ছাদের নিচে, পান বিড়ি, চা ডাব, মিষ্টির দোকান গুটি তিন-চার, কালো টিনের গায়ে চুন দিয়ে বাঁকাচোরা অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড-সমেত একটি পাইস হোটেল, আব তাব পাশেই একটা মনোহারি দোকান। প্রচুর ধুলো এবং প্রচুর বেমেবামতেব ভাঙাচোবা গাযে নিযে সেই ঘর কয়খানি। দেখলে মনে হয়, একটা সাময়িক বন্দোবস্ত। প্রকৃতপক্ষে, হযতো পনেবো বছর ধরে কিংবা তারও আগে থেকে এমনি এগুলি দাঁড়িযে আছে। স্টেশনে দু'একজন যাত্রী নেমেছিল। দোকানগুলির কাছাকাছি দু'চারজন লোক ছিল অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। স্টেশনে মাল নিতে এসেছে এমন একখানি গোরুব গাডি। কমলগড় গ্রাম বা বন্দরের স্টেশনের এই পরিবেশে নিজেকে অসহায় অনুভব করলাম। ভালো করিনি এসে। নিজের বোকামিতে বেকায়দায় পড়লে যেমন বলাও যায় না সহাও যায না তেমন বোধ হতে লাগল।

কিন্তু ঠিক তখনই প্রচুর ধুলো উড়িয়ে, প্রচুর যান্ত্রিক শব্দ করে ল্যান্ডরোভারটা এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার এবং একজন আরোহী। আরোহী নিজের পরিচয় দিল মহাতব সিং-এর কর্মচাবী সে। অসহায় ভাবটা কেটে গেল। বরং একটু সময়োচিত খুশি খুশি ভাবই আনবার চেষ্টা করলুম। নিজের হোল্ডঅল এবং ব্যাগটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে ব্যস্ত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি এ রকম একটা ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালুম। দেখতে দেখতে সেটা ভঙ্গি থেকে উন্নীত হয়ে মনের প্রকৃত অবস্থাই হয়ে দাঁড়াল। সাহিত্যিকদের যেমন হয়ে থাকে, অচেনা অজানার কৌতূহল আবাব আমাকে অধিকার করল। তা যদি না হতো তবে আমার এখানে আসবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। মহাতব সিং জমিদার হতে পারে, এম.এল.এ. হতে পারে; এবং যদিও সে নিমন্ত্রণপত্রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল এখন থেকে বিশ বছর আগে একই কলেজে পড়তুম আমরা, চেষ্টা করেও তার কথা নির্দিষ্টভাবে কিছু মনে করতে পারিনি। এই চেষ্টায় চার-পাঁচটি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আসা মুখ স্মৃতিতে ফুটে উঠবে বলে মনে হয়েছিল। যেহেতু নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করার ব্যাপারে কৌতূহল আমাকে চাপ দিচ্ছিল, আমার ঝোঁক হল মহাতব সিংও চার-পাঁচটি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আসা মুখগুলিরই একটি হবে। জানা ছিল, ভ্রমণের স্মৃতি পরে যদি একটা গল্প হয়।

মোটরটার যন্ত্রপাতি আলগা হয়ে গেলে যেমন হতে পারে তেমন সব শব্দ হচ্ছিল। জানলা দিয়ে ধুলোও আসছিল। তাহলেও সিটটাকে আরামদায়ক বলেই মনে হল। পথের দু-ধারে ঘন সবুজ, আকাশে সূর্যাস্তের রং। ভালোই লাগছিল। নিমন্ত্রণপত্রের বর্ণনা অনুসারে মহাতব সিং-এর নিজ গ্রাম স্টেশন থেকে মাইল সাত-আট হবে। যে গতিতে যাচ্ছি বড়জোর পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে পৌঁছতে। গরদের জামার হাতায় ধুলো লেগেছিল, আঙুলের টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেললুম, চাদরটার ভাঁজটাকেও ঠিক করে দিলুম

একটু। এতে আর লজ্জা করার কী আছে। নিমন্ত্রণপত্রটা আমার কাছে গিয়েছিল তার কারণ আমি সাহিত্যিক। পরে অবশ্য সাহিত্যিক বাছাই করার ব্যাপারে আমরা একইসঙ্গে পড়তুম এটা মহাতবকে সাহায্য করে থাকতে পারে।

কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই এই বন শুরু হয়েছে। পথের ধারে ধারে দু-চারটে শাল গাছ থেকে ক্রমশ তাদেব সংখ্যা বেড়েছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে ফাঁক কমে আসছিল। হঠাৎ একসময়ে অনুভূতিতে ধরা পড়ল আমরা একটা বনের মধ্যে দিয়েই চলেছি। গাড়ি নানা বাঁকে পাক খাচ্ছে, নানা মোড়ে বাঁক নিচ্ছে, কিন্তু বন থেকে বেড়িয়ে পড়ার কোনো সুযোগই যেন পাচ্ছে না। বরং বনটা যেন ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। আর পথটাও যেন ছোট ছোট চড়াই উৎরাই-এ ঢেউ খেলে চলেছে। একটা আদিমতার ভাবই যেন। ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। গাড়ির ব্যাটারি পুরনো। ড্রাইভারের ভঙ্গিতে অস্বস্তি দেখা গিয়েছে। এ জঙ্গলে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলাম— এমন সম্ভাবনা নেই অবশ্য, কারণ এটা অনাবিষ্কৃত আফ্রিকা নয়। কিন্তু দু-একবেলা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঘুরতে পারার মতো গভীরতা আছে অরণ্যের। ড্রাইভারকে কি কিছু বলব। মনে হল এ রকম অবস্থায় শান্ত হয়ে থাকাই ভালো, উৎকণ্ঠা ও ভয়কে সুযোগ দিলে তারা ক্রমশ স্বাভাবিক বুদ্ধিকেও গুলিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে ড্রাইভার সিট থেকে প্রায় খাড়া হয়ে উঠে ক্লাচ কিংবা গিয়ার কিছু একটাকে জুতো দিয়ে চাপবার চেষ্টা করছে, স্টিযাবিং চাকাটাকে দক্ষিণাবর্তে বামাবর্তে বনবন করে ঘোরাচ্ছে।

লোকটি কি পথ হারিয়ে ফেলেনি?

বললাম, 'আলোটা জ্বালো'।

আলো জ্বালতে তাকে গাড়ি থামিয়ে নামতে হল, যন্ত্রপাতি নিয়ে ঠুকঠাকও করল সে।

আর এ ব্যাপারটা জঙ্গলের বিপন্নতাকে বাড়িয়ে তুলল। কতটুকু আলোই-বা জ্বলল, আর জঙ্গলের কত ক্ষীণাংশই না আলোকিত হল। তারপর আবার গাড়ি চালাল সে।

কিন্তু এমন করেই আমরা মহাতব সিং-এর গড়ে পৌঁছেও গেলুম। গ্রামটার নামই তাই। ঠিক যখন আমি অন্তত সে রাত্রিতে লোকালয়ে পৌঁছনোর সব আশা ছেড়ে দিয়েছি, গাড়িটা তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই আব একবার এলোপাথাড়ি মোচড় নিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল যেন। ফাঁকা জায়গাটা যেন বেশ বড়ই। এরপর থেকে জঙ্গলও যেন পাতলা হয়ে এল। দু'এক মিনিটের মধ্যেই পথের দু-ধারে দু'একটা শাল গাছ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না এমন হল। ধানক্ষেত চোখে পড়ছে। দু'একটা করে কৃষকের বাড়িও।

ড্রাইভার পথ হারায়নি, এটাই স্বাভাবিক পথ পরে জেনেছিলুম। অখ্যাত একটা বেল স্টেশনে নেমে বেশ খানিকটা ঘন অরণ্য পাব হয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা কমলগড়ে পৌঁছতে হয়। সেকালে এই জঙ্গল গড় পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করত কি না, জানা নেই। রেল স্টেশন যদি সমাজের একটা বিশেষ অগ্রসব অবস্থাব প্রতীক হয়, এই জঙ্গলের প্রাচীর যেন কমলগড়কে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করছে।

কিন্তু তাই বলে কমলগড়কে অসভ্য দেশ বলারও কিছু নেই। এখানেও মোটরগাড়ি আছে, বন্দুক আছে, রেডিও আছে। মহাতব সিং-এর নিজের বাড়ি এবং তার গেস্ট হাউসের জন্য হয়তো ইলেকট্রিকেরও ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু চারিদিকের ওই জঙ্গলের জন্যই বোধ হয় এসব থাকা সত্ত্বেও রেল লাইনের ধারের জনপদগুলি থেকে কমলগড়কে পৃথক মনে হয়।

সন্ধ্যা পার হয়ে তখন রাত্রি হয়েছে। মহাতব সিং-এর গেস্টহাউসের কাছে গাড়িটা থামল। দূর থেকেই চোখে পড়েছিল, এখন কাছ থেকেও দেখা গেল। কাচের শার্সি দিয়ে দরজার পর্দার পাশ দিয়ে ঘরের ভিতরের ঝকঝকে হ্যাজাকের আলো বাইরের লনে এসে পড়েছে। গাড়িবারান্দা পার হয়ে প্রশস্ত ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমের সামনে দিয়ে করিডোর। করিডোরের উপরে ছোট ছোট শোবার ঘর। হঠাৎ মনে

হয় শহরের কোনো ডাকবাংলোয় এসে পড়া গিয়েছে। কেবল আসবাবপত্রগুলো একটু সেকেলে ধরনের।

আগে থেকে সব ঠিক করা ছিল। গেস্ট হাউসে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই উর্দিপরা বেয়ারা এল। তার সঙ্গে গিয়ে স্নান করে ফিরে আসতেই চা এসে গেল। আর চায়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাতব নিজে। পরিচয় না দিলে তাকে চিনবার কোনো উপায় ছিল না। তার মুখের দিকে কয়েকবার তাকিয়েও তার আদরায় পূর্বপরিচিত কোনো সহপাঠীর মুখের স্মৃতি খুঁজে পেলাম না। তার কারণ হযতো পরবর্তী কুড়িটা বছরের জীবনযাত্রার ছাপ পড়েছে তাতে। মহাতবকে দেখে একইসঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা এবং আর্থিক সচ্ছলতার কথা মনে পড়ে। কিন্তু কথাটি বুঝিযে বলা দরকার। অর্থাভাব এবং স্বাস্থ্যহীনতা একইসঙ্গে দেখা দিলে মানুষ শুকিয়ে যায়। কাঠি কাঠি দেখায় তাকে। মহাতবকে হৃষ্টপুষ্টই দেখাচ্ছে। বয়স কতই-বা হবে, চল্লিশের এদিকেই। কিন্তু তাব ত্বক, চোখেব দৃষ্টি, মুখের পেশির শ্লথতা এসবে কোথাও কোথাও যেন একটা স্বাস্থ্যহীনতার ছাপই দেখা দিয়েছে। মাথার চুলগুলিতে কলপ দেয়– ফলে সেগুলির রং প্রায় খয়েরি। গায়ে দামি সিল্কের জামা। হাতে কয়েকটি মূল্যবান আংটি। সোনার একটা তাবিজ যেন জামার তলা থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে।

মহাতব বলল, 'চিনতে পাবছ'?

যার অতিথি হয়ে এসেছি, তাকে কোনো অবস্থাতেই চিনি না বলা সঙ্গত নয়।

বললুম, 'তা চিনেছি বইকি'?

মহাতবেব হাবভাবে, ব্যবহারে কিন্তু একটা নতুন ধবনের সবলতাব দেখা পেলুম।

বলল, 'চা খাও। আমিও খাই'। এই বলে সে নিজের জন্য এক কাপ চা করে নিল।

আমি কিছু বলার আগেই বলল, 'তোমাদের এই আউটিং ভালো লাগলেই ভালো। আমি আনন্দিত হব'।

বললুম, 'আমাদের আউটিং বলছ'?

'গেট টুগেদারও বলতে পারো'।

'আরো অতিথি আসবে নাকি'?

'দু-চারজন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আমাদের এস্টেটের উকিল, সদবেব ডাক্তার সাহেব, আর...

'আর কে'?

মহাতবের দৃষ্টিতে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা দিল। তার স্বরূপ বোঝা গেল না। একটু হেসে বলল, 'আন্দাজ করতে পারবে না। কাজেই বলি– অমিতা। চেনো অমিতাকে? না? এবার আলাপ করতে পারবে। নাম শুনেছ তো'?

'সিনেমা'?

'হ্যাঁ। সে-ই। কী রকম? নাম আছে তো'?

'তা আছে কিছু। একটা হিট হলে তারা হতেও পারে'।

চা শেষ হলে মহাতব আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেস্ট হাউসের করিডব দিয়ে হেঁটে হেঁটে বেড়ালো। আমাদের, অর্থাৎ তার অতিথিদের, কার কার জন্য কোন কোন ঘর ঠিক করা হয়েছে তা দেখিয়ে দিল।

তার অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে তার এস্টেটের উকিল এসে পৌঁছেছে। বাকি সবাই কাল আসবে। উকিলবাবু তার এস্টেটের আপিসেই আছেন। কাল সকালেই তিনিও এ বাড়িতে আসবেন।

আমাব খুব কৌতূহল হল এসব শুনে মহাতবের এই আয়োজনের পিছনে উদ্দেশ্যটা কী আছে তা জানতে।

কিন্তু মহাতব আগেও যেমন বলেছিল এখনও তেমনি বলল, 'পিকনিক বলতে পারো, গেট টুগেদার বলতে পারো'।

বললুম, 'অতিথিরা অর্থাৎ আমরা তো সবাই পূর্বপরিচিত নই যে গেট টুগেদার হিসেবে এর একটা মূল্য থাকবে'।

মহাতব হাসল। তার হাসিটা অজস্র, যদিও কলরবের দিক দিয়ে তা খুব উচ্চগ্রামের নয়।

সে বলল, 'নতুন আলাপ হলেই-বা মন্দ কী? একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, বা একজন প্রথম সারির অভিনেত্রীর সঙ্গে কি রোজ আলাপ করার সুবিধা হয় আমাদের? কিংবা এক হার্টস্পেশ্যালিস্ট? এটাই একটা হেতু বলতে পারো ; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যদি বলো, বলো তো উদ্দেশ্য কি শেষ পর্যন্ত বদলে যায় না? যে উদ্দেশ্যে আয়োজন, আয়োজনটাই তার চাইতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য মনে এনে দিতে পারে না'?

ঘরগুলো দেখে আমরা আবার ড্রয়িংরুমেই ফিরে এসেছিলাম। মহাতব বলল, 'এবার পথের কথা বলো। কষ্ট হয়নি তো'?

খুব স্বাভাবিক ভাবে পথের তীব্রতম অনুভূতির কারণ বনের কথা মনে এল। কাজেই বললুম, 'তোমার এই কমলগড়ে পৌঁছানোর আগে কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলুম। বনটা খুব ছোট বলে মনে হল না। পথ হারিয়ে যাওয়া সম্ভব'।

মহাতব বলল, 'বনটা বেশ বড়ই। আর অনেক দিনেরও বটে'।

'বনের মধ্যে দিয়ে যে পথে এলুম তা কিন্তু সমতলও নয়। পথ যেমন বাঁকাচোরা, তেমন উঁচুনিচু'।

'তাই বটে। কাল দিনের বেলায় দেখতে পাবে এ গ্রামটাও যেন সমতলে নয়। পাহাড় থেকে অনেক দূরে। এমন কী করে হয় জানি না। হয়তো অনেকদিন আগে ভূমিকম্প হয়েছিল দারুণ রকমের'।

'বনটা কি সবকারের বন বিভাগের'?

'না। ওটা আমারই'। বলল মহাতব। 'আর বন বলেই আছে এখনও। নতুবা জমিদারি দখল আইনের ফলে ওটা চাষযোগ্য জমি হলে থাকত না'। মহাতব হাসল।

'বন থেকেই কি লাভ হচ্ছে'?

'তা হচ্ছে। ভালো কাঠ পাই। একটা প্লাইউডেব কারখানা খুলবার ইচ্ছা আছে। আর কারখানার নামেই হয়তো ও বনটাকে আরো কিছুদিন হাতে রাখতে পাবব। যতদিন না সুপ্রিম কোর্টে হারি। প্রকৃতপক্ষে এই বাড়িটা যাকে গেস্ট হাউস মনে হচ্ছে— এটা আমাদের সেই প্লাইউড কারখানার আপিসবাড়ি। আগামী শীতে কারখানার আরো সব যন্ত্রপাতি এসে পড়বে'।

'তখন তাহলে বন থাকবে না'।

'থাকবে। একেবারে যাতে লোপ না পায় সে ব্যবস্থাই করতে হবে। প্লাইউড কম হবে না হয়'।

'বনে কি তোমাব শিকার চলে'?

'তাও চলে। হরিণ আছে। শুয়োর আছে। চিতা আছে। দুটো বাঘ মেরেছি আমি দুবারে এখান থেকেই। জ্যাঠামশায়েব আমলে একবার কিছু হরিণ এনে ছাড়া হয়েছিল। তারা বেড়েছে মন্দ নয়। আর আমি একটা পরীক্ষা করছি জানো? (মহাতব এই জায়গায় বিশেষ উৎসাহিত হল) আট-নটি মোষের বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছি জঙ্গলে বছর পাঁচেক আগে। গত শীতে একটা পুরুষ মোষ মেরেছিলাম। তার শিং দেখে, গড়ন দেখে, তার তেড়ে আসার ভঙ্গি দেখে তোমার মনে হতো বুনো মোষ। আসাম থেকে একটি বাইসন এনে ছেড়ে দিয়েছি এবার। সেটা মাদী। দেখা যাক আমার সেই মোষগুলোর সর্দার তাকে বাগাতে পারে কি না।

মহাতবের মুখের দিকে তাকালাম। তার পাঞ্জাবির বোতামগুলোর মোতি আলোতে চকচক করছে। সিগারেট ঠোঁটে তুলল সে, আর তখন তার হাতের আংটির নীলার আলো চমকে উঠল।

মহাতবকে আমার যেন একটু অসাধারণ বলেই মনে হল। ভূমিকম্পে তৈরি নকল পাহাড়ি দেশ, অরণ্য যার পরমায়ু সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করবে, গৃহপালিত থেকে বন্যপশু করা, অস্বাস্থ্য, হার্টস্পেশালিস্ট

ও ম্যাজিস্ট্রেট আসছে— এসব একসঙ্গে মনে এল। না, না। তাহলে তো একটা গল্পই শুরু হয়ে গেল।

মহাতব বলল, 'যদি তা বাগাতে পারে— বছর পাঁচেক পরে বনে কিছু বাইসন পাব। মোষের সংখ্যাও বেড়ে চলবে। কিন্তু বাইসনের চরিত্র তাদের চাইতে প্রবল বলে তারাও স্বভাবে বাইসন হয়ে উঠতে পারে'।

আমাদের আলাপে এ জায়গাতেই ছেদ পড়ল। গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মহাতবকে নিতে তার গাড়ি এসেছে।

মহাতব বলল, 'চলো। আজকের ডিনার আমার বাড়িতেই হবে। ডিনারের আগে আমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে পারবে'।

এ ডিনারটি আমাদের বর্ণনায় না আনলেও চলে। তার সম্বন্ধে এটুকু মনে আছে ডিনারে উকিলবাবু একটু বেশি মদ খেল। তার ফলে সে যখন শুতে যাওয়ার জন্য বিদায় নিল, মহাতব একজন চাকরকে ইঙ্গিত করল সঙ্গে সঙ্গে যেতে তার। তারপরে আর একবার সিগারেট ধরিয়ে আমি ও মহাতব গল্প করলুম। সেসব গল্প সেদিনের খবরের কাগজ সম্বন্ধে।

অনেক রাতে মহাতবের গাড়ি আমাকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিল।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে মহাতবের কথাই মনে এল। বাইসন এনে বনে ছেড়ে দিয়েছে। পরে শিকার করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটা একটু অসাধারণ নয়?

সকালে যখন ঘুম ভাঙল অনেকটা বেলা হয়েছে। কাচের জানলায় পর্দা থাকলেও বাইরেব আলো এসে পড়েছে ঘরে। জানলার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়ালুম। আর তখনই একখানা সরকারি জিপ চোখে পড়ল লনের উপরে। তাহলে আর কোনো অতিথি এসেছে এরই মধ্যে। হয়তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই। হঠাৎ যেন সকালটাকে ভালোই লাগল। সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালু লনের উপরে কালচে সবুজ রঙের জিপ, তার পিছনে গেস্ট হাউসের বেড়াব কাছে বোনা ক্রিপ্টোম্যারিয়ার চারাগাছে একটা ছোট পাখি। আর এ সবকিছুই শরতের পরিচ্ছন্ন আলোয় স্পষ্ট করে আঁকা।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই বটে। আর্দালির কোমরবন্ধে পিতলের ফলক তার মনিবেব পরিচয় দিচ্ছে। ড্রয়িংরুমে সে বসেছিল। আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই ব্রেকফাস্ট এল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মহাতবের গাড়িও দেখা দিল গাড়িবাবান্দার নিচে। মহাতব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে করমর্দন করে অভ্যর্থনা জানাল। আমাদের পরিচয় করে দিল। দেখলুম ম্যাজিস্ট্রেট আমার অন্তত একখানা বই পড়েছেন। মাদ্রাজের লোক, কিন্তু তরতব করে বাংলা বলেন।

আমাদের আলাপটা সাহিত্যের দিকে গড়াবে বলে মনে হল। কিন্তু তখন সময় হয়েছে— ব্রেকফাস্ট এল।

ব্রেকফাস্টের কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে এইজন্যে : মাখন এবং ডিম টাটকা ছিল। রুটিটা তত সুবিধার ছিল না— থাকার কথাও নয় কলকাতার থেকে এত দূরে। কিন্তু বৈচিত্র্য ছিল রোস্ট তিতির। ব্রেকফাস্টে রোস্ট তিতির কদাচিৎ খেয়ে থাকি। যখন ঘটনাটা ঘটেছিল আর যখন তার বর্ণনা দিচ্ছি— এ দুই-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে। এই ব্যবধান ডিঙিয়ে আর যা মনে পড়ছে তা ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের আদরা। ম্যাজিস্ট্রেটকে আমার ভালো লেগেছিল। অল্প বয়স। মনে হচ্ছে তাকে তার পদমর্যাদার জন্যই কথাটা বলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের পার্টিতে সে-ই প্রকৃতপক্ষে বেবি ছিল। বছর সাতাশ-আটাশ বয়স। সুন্দর সুগৌর দেহ। চিকন করে ছাঁটা গোঁফ। চোখে সোনার চশমা। পরে উকিল ও ডাক্তারের মুখে শুনেছিলুম লোকটি যারপরনাই সৎ এবং আদর্শবাদী, উকিলবাবু আর একটু বলেছিল— নতুন বিয়ে করেছে ম্যাজিস্ট্রেট, মাস পাঁচ-ছয় হবে। মহিলাটিকে সে কলেজ জীবন থেকেই

ভালোবাসত। যাক, সে পরের কথা।

ব্রেকফাস্টে অনেক গল্পগুজব হল। মহাতর বলল তার প্লাইউড কারখানার কথা। আমাকে বলল, 'বাঁ দিকের জানলা দিয়ে চেয়ে দ্যাখো, প্লাইউড কারখানার সাইনবোর্ড দেখতে পাবে'।

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। এবার দেখতে পেলাম। দুটো খুঁটির মাথায় বেশ বড় একটা সাইনবোর্ড। কিন্তু সেটা পিছন দিকই, আমাদের চোখের সম্মুখে কাজেই কী লেখা আছে তাতে তা পড়া গেল না।

দ্বিতীয় পট চা দিয়ে গেল বাবুর্চি।

তখন আমি বললুম, 'আপনি কি সদর থেকে গাড়িতে এলেন? তাহলে বোধ হয় আপনি দেখেননি। স্টেশনে নেমে এলে বোধ হয় দেখা যায়'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'কী দেখবার কথা বলছেন'?

'বন'।

'হ্যাঁ। তা দেখেছি বইকি। সদর থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে আসতে আসতে যেখানে মেঠোপথ শুরু হয়েছে সেখান থেকেই বনও শুরু হল'।

'এই বনে জন্তুজানোয়ারও আছে'। বলে মহাতরের দিকে চাইলুম, আলাপটাকে যাতে সে সেই খাতে চালিয়ে নিতে পারে।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'তাই নাকি? তাহলে তো শিকারও চলে'।

মহাতর বলল, 'কেন চলবে না। অন্তত হরিণ পাবই। আর সবাই এসে পড়বে। তখন সকলে বসে একটা প্রোগ্রাম খাড়া করে ফেলা যাবে। যদি সকলেই রাজি হন রাত্রিতে আমরা শিকারে যেতে পারি'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'আর সকলে কখন আসবেন'?

'অমিতা – মানে চিত্রতারকা অমিতাকে আনতে গাড়ি গিয়েছে স্টেশনে। আর ডাক্তার সাহেব যা লিখেছিলেন তা থেকে বুঝতে পারছি তিনি গোটা দশেকের মধ্যে পৌঁছবেন। লাঞ্চে আমরা সকলেই একত্র হব। তারপর প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে'।

সিগারেট ধরালুম আমরা। মহাতর বলল, 'যদি তুমি গ্রাম দেখতে চাও ঘুরে, এখনই ভালো। আর তা যদি দেখতে যাওই বিল পর্যন্ত যেতে হয়। সকালে নানা জাতের পাখি দেখা যাবে সেখানে'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'তাহলে বন্দুক পেলে শিকারও করা যায়'?

মহাতর বেরিয়ে গিয়ে একজন কর্মচারীকে কী বলে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাতরের বাড়ি থেকে গাড়ি এল। তার কর্মচারীরা বন্দুক নামিয়ে আনল দু-তিনটি— চামড়ার বেল্টে তৈরি গুলির মালা।

ম্যাজিস্ট্রেট হতে হলে সবদিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। দেখলাম বয়স কম হলেও সব ব্যাপারে চোখ রেখে চলে। বন্দুক পছন্দ করে রেখে সে নিজের ঘরে চলে গেল। যখন ফিরল তখন তার পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। খাকি ট্রাউজার্স-এর উপরে খাকি শার্ট চাপিয়েছে, চোখে সানগ্লাস।

এরপরে আমরা বিলের উদ্দেশে রওনা হলুম। কিন্তু পায়ে হেঁটে। বোধ হয় এক্স্কারশানের মতো কিছু একটা করার ঝোঁক ছিল দুজনেরই। হেঁটে গেলে কী হয়— কেউ আলগা ভাবে বলতেই, সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল। ম্যাজিস্ট্রেটের বন্দুক বয়ে নিয়ে তার আর্দালি যাবে, অন্তত তার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। বোধ হয় এ দেখেই মহাতর তার একজন কর্মচারীকে ডাকল। বলল, 'একজন লোক ডেকে দাও, বিলের পথ দেখিয়ে দেবে। আর এই সাহিত্যিকবাবুর বন্দুকটাও বয়ে নেবে'।

তখন তখনই একটা লোক পাওয়া কঠিন হতে পারে এই ভাবলুম আমি, কিন্তু দেখা গেল তা হল না। বাবুর্চিখানার দরজার কাছে একজন লোক মাটিতে বসে পিতলের গ্লাসে করে চা খাচ্ছিল। তাকে ইশারায় ডাকতেই সে উঠে এল।

পরে আমরা জানতে পারলুম এরই নাম ছিনাথ। অত্যন্ত রোগা একটি লোক। উপযুক্ত আহারের

অভাবে গায়ে মেদ বলতে কিছু নেই। হাড়ে-মাসে জড়ানো কালো রঙের পাতলা শরীর। কপালের উপরে অনেকটা টাক। তার উপরে কিছু পাকা চুল। পরনে ময়লা একটা খাটো ধুতি।

যা হোক আমরা বিলের দিকে চললুম আর ছিনাথ আমাদের সঙ্গে আমার বন্দুকটা বয়ে নিয়ে চলল।

মহাতরের কাছে যে রকম শুনেছিলাম, গ্রামের জমিটা সমতল নয়। গেস্ট হাউসটাই একটা উঁচু টিলার উপরে। পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। আমার মনে হল বর্ষায় বোধ হয় নিচু জায়গাগুলো জলে ডুবে যায়।

ছিনাথকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল— ডুবে যায় না, তবে কাদা হয়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ অঞ্চলে জমি এমন অসমান কেন বলতে পারো?

সে বলল, 'বোধ হয় বিলেরই অংশ ছিল একসময়ে'।

গ্রামের বাড়ি ঘর, চাষের জমি, কোথাও ছোটখাটো আম কাঁঠালের বাগান। এসবের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। সকালের মৃদু বাতাসটা তখনও স্নিগ্ধ। ভালোই লাগছিল চলতে। প্রকৃতপক্ষে বিলের সঙ্গে আমার এই পরিচয় হতে চলেছে। যদি শিকারটাও ভালো হয় তবে এই যাত্রাটা অনেক দিন মনে রাখার মতো কিছু হবে।

ছিনাথকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাখি যদি পড়ে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো?'

'তা পাওয়া যাবে।'

'যদি গভীর জলে পড়ে?'

'তাও যাবে।'

লোকটির ভঙ্গিটি বেশ শান্ত। কিন্তু তার চোখ দেখে তাকে বোকা বলে মনে হল না। কিন্তু এর চাইতেও বেশি বোধ হয় কিছু ছিল তার চেহারায়— যা তার সম্বন্ধে কৌতূহলকে ডেকে আনে।

বললুম, 'তোমার নাম তো ছিনাথ। তুমি কি চাষের কাজ করো?'

'আজ্ঞে হাঁ, না করি না।'

তার উত্তরটায় যদি হাসির কিছু থাকে তবে তা অনিচ্ছাকৃত।

বললুম 'কী করো তাহলে?'

'আজ্ঞা আমি চৌকিদার।'

'ডাকবাংলোর?'

'আজ্ঞা না, সরকারের'।

ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ইংরেজি করে বলল 'আমি কে তা ওকে বলার দরকার নেই'।

বললাম সে ভাষাতেই 'সে কি! আমার চাপরাশিকে দেখে আন্দাজ করেনি?'

ম্যাজিস্ট্রেট হেসে বলল, 'লোকটির স্বাভাবিক চেহারা তাহলে দেখতে পাবো না।'

'তাই কি'।

ছিনাথের দিকে ফিরে বললুম, 'তা বেশ, সরকারি চাকরি যখন করো তখন তো মাইনাও পাও'।

'কী একটা কইছেন, বাবু, আজ দু সন হলো মাইনা পাই না'।

'তাহলে আর কি চাকরি করো?'

'জবাব তো দেয় নাই।'

'থানায় যাও নাকি?' ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করল।

'প্রায় ছ মাস তার যাই না'।

বললাম, 'ছিনাথ চাকরি করে মাইনা পাও না, চাষবাসও করো না। দিন চলে কী করে?'

'ফাইফরমাস খাটি বাবু।'

'মহাতরবাবুর গেস্ট হাউসে বুঝি এখন কাজ করছ?'

'আজ্ঞা না। মধু দিতে গিছলাম'।

'মধু'?

'আজ্ঞা, আমরা গুণিন'।

'কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো, ছিনাথ, গুণিন কাকে বলে?'

'আজ্ঞা, মন্ত্র ঝাড়ফুঁক এইসব'।

'আচ্ছা'? ম্যাজিস্ট্রেট বলল। লোকটির দিকে ওর যে কৌতূহল আকৃষ্ট হয়েছে। মধু যোগাড় করো নাকি? তাতেই মন্ত্র লাগে?'

ছিনাথ বলল, 'আজ্ঞা, না। ওটা ভেলকি। লোককে বলি মন্ত্র, কিন্তু আসলে ভিজে খড়ের ধোঁয়া'।

কখনও কখনও মনের একটা বিশ্রাম উপভোগ করার ভঙ্গি দেখা যায়। স্বভাবতই সেদিন আমাদের মনেরও তেমন হয়েছিল। ছিনাথের সঙ্গে এ রকম তুচ্ছ ব্যাপারে আলাপ করতে উৎসাহ বোধ করেছিলাম—এটাই তার প্রমাণ।

বললাম, 'আসল মন্ত্র তাহলে কী'?

সে বলল, 'প্রেত পিশাচের মন্ত্র, সাপ বা ভর মন্ত্র'।

'তুমি ওঝা নাকি? বাণ টান মারতে জানো?' ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করল।

'আজ্ঞা আমার ঠাকুরদার বাবা উড়ে যেতে পারতেন। কিছু কিছু শিখেছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'ইন্টারেস্টিং'।

ছিনাথ ওঝা বা গুণিন হিসাবে কতদূর সার্থক তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলল না, কারণ ইতিমধ্যে আমরা বিলের জলরেখা দেখতে পেয়েছি দু-তিন সারি বাবলা আর জঙ্গল গাছের মধ্যে দিয়ে। বিলে অজস্র পদ্ম, তেমনি অপর্যাপ্ত শাপলা। আর তাদের মধ্যে অসংখ্য পাখি। মাছরাঙা বক কাদাখোঁচা তো বটেই, অনেক বুনো হাঁস এবং দু দশটা সারসও বটে।

সেদিন আমরা শিকার ভালোই করেছিলাম। পাঁচ ছটি হাঁস, একটি সারস, দু তিনটি ডাহুক যোগাড় হয়ে গেল। এ পাখিগুলো বোধ হয় মানুষের সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়। বন্দুকের শব্দকে হয়তো বাজের গর্জন মনে করে থাকবে। যে গর্জনের নিচে এরা বর্ষাকালেই স্নান করে। নতুবা আমরা এলোপাথাড়ি তাদের প্রাণ কুড়োবার সময় পেতাম না। একবার গুলি চলবার পর এরা উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই আবার ফিরছিল দলে।

আর ছিনাথ কাজের লোক বটে। জলে সাঁতার দিয়ে, কাদায় পা টেনে টেনে চলে সে রক্তাক্ত পাখিগুলোকে সংগ্রহ করল। শাপলা তুলে এনে তার লতা দিয়ে পাখিগুলোকে একটা ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বাঁধল।

উৎসাহে এবং উত্তেজনায় আমরাও জলে কাদায় নামতে ছাড়িনি। আমরাও কিছু কিছু রক্তাক্ত ও কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছি। সে অবস্থাতেই আর্দালির কাছ থেকে নিয়ে ফ্লাস্ক নিয়ে কফি খেয়ে নিলুম।

আর এক দফা শিকার করব কি না ভাবছি, ম্যাজিস্ট্রেট বলল তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এগারোটা হয়েছে। এতক্ষণে অন্য সব অতিথিদেরও এসে পড়ার কথা। আর যদি সন্ধ্যার পরে শিকারে যেতে হয় জঙ্গলে, লাঞ্চটা সকাল সকাল মিটিয়ে বিশ্রাম করে নিলে মন্দ হয় না।

ইতিমধ্যে ঘণ্টা চারেক হয়ে গিয়েছে। তার অর্থ বিলের ধারে ধারে আমরা ঘণ্টা তিনেক চলেছি ফিরতেও কিছু সময় নেবে।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'এ রকম অভিজ্ঞতা কিন্তু আমার নতুন'।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলুম। বানিয়ে একটা গল্প বলে তাক লাগিয়ে দেব নাকি? কিন্তু মনে হল এখানে সেন তা মানাবে না। বললুম, 'আমারও তাই'।

সিগারেট ধরাল ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু ধরাতে গিয়ে কিছু না বলে হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে

দেশলাইটা নিল। নিজের সিগারেট ধরিয়ে আমার মুখের কাছে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে এসে আমার সিগারেটও ধরিয়ে দিল। ভঙ্গিটা লক্ষ্য করার মতো।

বলল, 'বেশ লাগছে, না'?

'এক্স্কারশনের ভাবটাই যেন'।

বলল, 'আমাদের মনে যে আদিমতা থাকে, মাঝে মাঝে তাকে সুযোগ দিলে সে খুশি হয়'।

'শুধু তাই কি'?

'সে খুশি হলে আমরাও খুশি হয়ে উঠি বোধ হয়'। ম্যাজিস্ট্রেট তার সানগ্লাসটা চোখ থেকে সরিয়ে মুছল। দেখলুম তার চোখ দুটোতে খুশি হাসছে।

আমরা যখন গেস্ট হাউসের কাছাকাছি এলাম তখনই অনুভব করলুম যেন সকালের তুলনায় অনেক বেশি লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। লনের উপরে জিপের পাশে নতুন আর একটি জিপ, আর মহাতবের নিজের কারের পাশে তার ল্যান্ডরোভারটাও দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িবারান্দায় উঠতেই মহাতবকে দেখা গেল। সে একখানা আরামকেদারায় বসে কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করছে।

'শিকার হল' সে বলল।

'মন্দ নয়'। বলল ম্যাজিস্ট্রেট। 'কিন্তু আর কেউ আসেনি তো'।

মহাতব খুশি হল এই খোঁচায়। বলল, 'সবাই এসেছেন। অমিতাও। স্নান করতে গেছে'।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল মহাতব, 'শিকার কোথায়'?

'আনছে ওরা, ছিনাথ আর আর্দালি'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'আমরাও স্নান সেরে নিই'। এই বলে সে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

আমার বরং সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালো লাগল। যদিও আমার কাপড়চোপড় ও জুতোয় যথেষ্ট কাদা ছিল, যদিও পিঠের কাছে জামাটা ঘামেও অনেকটা ভিজে, স্নানের তাগিদ অনুভব করলুম না। মহাতবের হাতের মুঠোয় সিগারেট কেসটা ছিল। বললুম, 'সিগারেট দাও'। সিগারেট ধরাতে ধরাতে দেখলুম শিকার নিয়ে আর্দালি আর ছিনাথ পৌঁছে গিয়েছে। মহাতবকে দেখানোর জন্য উঁচু গলায় ডাকলুম তাদের।

মহাতব দেখে বলল, 'ভালোই হয়েছে। সারস দিয়ে কী হবে আমি জানি না। তবে হাঁস আর ডাহুকের রোস্ট লাঞ্চেই দিতে পারে যদি বলো'।

বললাম, 'মন্দ কী। বলে দাও'।

মহাতবের কাছে যে কর্মচারীটি ছিল তাকে বলল মহাতব বাবুর্চিকে ডাকতে।

এই সময়ে সারসটা একটু নড়ে উঠল।

'বেঁচে আছে দেখছি'।

মহাতব হেসে বলল, 'বরং বলো একেবারে মরেনি'।

আমরা যখন কথা বলছি, করিডর দিয়ে স্নান শেষ করে একজন ফিরল। শিকার দেখে সে থেমে দাঁড়াল। হাসি মুখে বলল, 'বাঃ, বেশ শিকার তো। কে করল'?

মহাতব আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি আর ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আপনাদের পরিচয় করে দিই। ইনি মিস্টার বোস ডাক্তার সাহেব। ইনি আমার কলেজ ফ্রেন্ড, সাহিত্যিক লোকেন্দ্র'। আমরা দুজনেই নমস্কার করলাম।

এমন সময়ে বাবুর্চি এল। কিন্তু মহাতবের কাছে রোস্টের নির্দেশ নেওয়ার জন্যই নয়। মহাতব এর আগে তাকে খবর দিয়ে থাকবে। সে এল হাতে একটা ট্রে নিয়ে। তার উপরে দু-তিনটি গ্লাসে বিয়ার—ফেনা উপচে পড়ছে। মহাতব একটা গ্লাস তুলে নিয়ে বাবুর্চিকে রোস্টের কথা বলল।

কিন্তু তা করতে করতে যেন সে আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করল বিয়ারের দিকে।

তেমন অভ্যস্ত নই আমি, কাজেই দ্বিধা করতে লাগলুম।

আমার মনে হয় আর্দালি ও ছিনাথের শিকার বয়ে আনাটা সকলেই যে যার ঘরের জানালা দিয়ে দেখে থাকবে।

ম্যাজিস্ট্রেট এল। তার পায়ে স্লিপার। কাঁধে তোয়ালে। হাতে সোপকেস। স্নানে যাচ্ছিল তা বোঝা যায়।

শিকার কবা পাখিগুলোকে সে আর একবার দেখল। নিজের সংগ্রহে সে যেন একটু গর্বই অনুভব করছে। একটা খয়েরি রং-এব হাঁসের গলাটা অদ্ভুতভাবে বাঁকা হয়ে ছিল। তাকে সোজা করে দিতে গেল বোধ হয়— হাতে খানিকটা রক্ত লেগে গেল।

বলল সে. 'মন্দ নয়, কি বলেন'?

একটু সরে দাঁড়াল সে, যেন অন্য সকলকে পাখিগুলোকে দেখার সুযোগ করে দিতে। মরা বক্তাক্ত পালকের পাখি অদ্ভুত চেহারার ফলের মতো ঝুলছে ডালটায়। আর এবার তার চোখ পড়ল ট্রের উপরে উপচে-পড়া বিয়ারের গ্লাসে। এক হাতে সোপকেস অন্য হাতে রক্ত, স্নানে যাচ্ছে, আদুড় গায়ে কাঁধে তোয়ালে— এসবই বোধ হয় তার চিন্তাব কারণ।

তারপর সে বলল, 'বিয়ার নাকি'? এই বলে সে একটা গ্লাস তুলেও নিল।

আর তাব দেখাদেখিই যেন ডাক্তার সাহেবও তৃতীয় গ্লাসটা তুলে নিল।

তখন মহাতব তাব কর্মচারীদেব হুকুম দিল খানকয়েক চেয়াব বার কবতে। চেয়াব এল। সেই গাড়িবাবান্দাতেই মহাতবের আরামকেদারাব পাশে বসল তারা।

মহাতব ইশারায় হুকুম দিয়ে থাকবে কিংবা বাবুর্চিই বুঝতে পেবেছিল, ট্রেতে এবার সে পাঁচ-ছটি টইটম্বুর বিয়াব গ্লাস সাজিযে নিযে উপস্থিত হল।

মহাতব বলল, 'নাও লোকেন্দ্র'।

'স্নানের সময় নয এখন'?

'তা হোক না'। বলল ডাক্তাব সাহেব।

নিলুম একটা গ্লাস।

এমন সময় মৃদু একটা পদশব্দ, মৃদু একটা সুগন্ধও পেলাম।

'এই যে আসুন', বলল ডাক্তাব।

দেখলাম একজন মহিলা। সদ্যস্নানেব পবে এক পিঠ ফাঁপানো চুল। চোখ দুটো বড বড়। ঠাহর কবলুম এই অমিতা। সিনেমাব ছবিতে দু'একবাব দেখেছি। তখন তাকে যেন আরো বেশি সুন্দর দেখায়। এখন মেকআপ ছাড়া তার মুখে, ঠোঁটের পাশে, চোখের কোলে বযসেব ছাপ বোঝা গেল। ত্রিশ পাব হয়ে খানিকটা এগিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাব সান্নিধ্য যেন সিনেমার পর্দার চাইতে অনেক বেশি উষ্ণ।

হাসল সে। গালে তার টোল খেল।

মহাতব বলল, 'আসুন'।

'শিকার দেখতে এলাম'।

'বসুন'। এই বলে আমাদের সকলের সঙ্গেই অমিতাব আলাপ কবিযে দিল। ডাক্তাব সাহেব এই সময়ে একটা কাজ করল। ফেনিল এক গ্লাস বিয়ার তাব দিকে এগিযে ধবল।

'সে কী, আমি'? খিলখিল করে অনুচ্চ হাসি হাসল সে, আর ঠিক যেন একটা পবিমিতির বোধ থেকে থেমেও গেল মাঝপথে।

'কেন নয়'? ডাক্তার বলল।

'স্নান কবেছি এইমাত্র, তা ছাড়া লাঞ্চের আগে'।

'অসময়? তাতে দোষ কী'? ডাক্তার হাসিমুখে বলল।

ঝকঝকে বালা-পরা একখানা হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল অমিতা।

আর তখন আমি অনুভব করলুম লাঞ্চের অনেক দেরি হয়েও যদি যায়, এই বিয়ার পার্টি যা হঠাৎ শুরু হল তা কিছুক্ষণ সময় নেবে।

ইতিমধ্যে বাবুর্চি তার একজন সহকারী নিয়ে এসেছিল। আরো চেয়ার এসেছে। টিপয় এল বিয়ারের ট্রে রাখবার। আমিও বসলুম।

মহাতবকে লক্ষ্য করলুম। বিয়ার তার কাছে জল বললে উপমা ঠিক হয় না। কারণ জলের তৃষ্ণা মিটে যায় এক গ্লাসেই।

ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ্য করলুম। ইতিমধ্যে সে সিগারেট ধরিয়েছে। কাঁধের তোয়ালে ট্রাউজার্সের হাঁটুর উপরে বিছানো এখন। সোপকেসটা পায়ের কাছে। বিয়ারের ফেনা গড়িয়ে এসে তার হাতের রক্তকে ধুয়ে কিংবা ঢেকে দিয়েছে। এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে বিয়ার-গ্লাস। আর তাকে দেখাচ্ছেও সুন্দর। ধানরঙের চামড়ার নিচে ছোট ছোট পেশির ঢেউ। বেল্টে বাঁধা কোমরটা যেমন সরু, ঈষৎ লালচে রঙের অল্প অল্প লোমে ঢাকা বুকটা তেমনি চওড়া। কতই আর বয়স হবে— এই মনে হয় তাকে দেখে।

বোধ হয় দ্বিতীয় গ্লাসটাই তার হাতে। তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল অমিতা, 'মোস্ট ইনফর্মাল'।

উকিলবাবু বলল, 'আইনত তাই। আমন্ত্রণের পিছনে যদি উদ্দেশ্য থাকে— যেমন বিয়ে কিংবা পিতার শ্রাদ্ধ, আমন্ত্রিতরাও আলাপ-বিলাপের একটা ফর্ম নিতে পাবে। এক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই'।

'নিছক আনন্দ, নিছক খেয়াল'। বলল ডাক্তার।

'সুতরাং...' ম্যাজিস্ট্রেট তার গ্লাসটাকে চুমুক দিয়ে শেষ করে একটু শব্দ করেই নামাল ট্রেতে।

অমিতা একটু যেন চমকে তাকাল তার দিকে।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'কিন্তু স্নানে যাব বলে বেরিয়েছিলুম'।

মহাতব বলল, 'অতীত ভবিষ্যৎ একাকার। স্নান যার অতীত আর তা যার ভবিষ্যৎ সবাই এখানে'।

কে যেন হাসল। বিয়ার তার হাসির ধ্বনিটাকে পরিস্ফুটতর করেছে মনে হয়।

মহাতব বলল আমাকে, 'বিয়ার তুমি তেমন পছন্দ করো না'?

'কদাচিৎ'। এই বলে অনেকক্ষণ থেকে ধরে থাকা গ্লাসটা মুখের কাছে তুললুম। ফেনার মধ্যে দিয়ে মহাতবের দিকে চাইলুম। তার চোখমুখের ফুলো ফুলো ভাবটা আবার চোখে পড়ল। প্রথমবার দেখা হতেই মনে হয়েছিল সেটা তার অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। এখন মনে হল— কী জানি হয়তো বিয়ারেরও হতে পারে।

এই বিয়ারের আসরের একান্তে আর একবার বাবুর্চিকে দেখা গেল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হল, সে যেন লাঞ্চের কথা মনে করিয়ে দিতে চায়।

বললুম, 'লাঞ্চের কথা কিছু বলতে এসেছে।'

'একটার লাঞ্চ দুটোতে হলেই-বা কী ক্ষতি'? বলল ডাক্তার। হো হো করে সে হাসলও নিজের কথায়।

লাঞ্চে বসতে একটু দেরিই হয়ে গেল। দুটো তো বটেই। তারও কিছু পরে। ড্রয়িংরুমে টেবিল পড়েছে। সাদা টেবিল ক্লথের উপরে চীনেমাটির বাসন। এখানে ওখানে ফুলদানিতে ফুল। যখন এসে পৌঁছলুম গেস্ট হাউসের ঝলমলে আলো চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখে যে মনোভাব হয়েছিল, টেবলটাকে দেখেও তেমন কিছু হল। কিন্তু উপমাটা মনে এল না। মরুভূমির মাঝে হলে ওয়েসিস বলা যেত কিন্তু

জঙ্গুলে দেশের মধ্যে এই পরিস্থিতিকে কী বলব?

টেবলটা গোল। ডানদিক দিয়ে ঘুরছে বাবুর্চি আর তার সহকারী। সে অনুসারে মহাতর থেকে শুরু করলে বলা যায়– মহাতরের ডাইনে ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর ক্রমশ উকিলবাবু, আমি, ডাক্তার সাহেব, তারপরে পরিধিটা ঘুরে গিয়ে মহাতরের বাঁ দিকে অমিতা।

আহারের আয়োজন সুপ্রচুর। দিশি ও বিলিতি কায়দায় রান্না। তালিকাটায় কিছু বাড়তি যোগ হয়েছে। বুনো হাঁসের রোস্ট যোগ হওয়ার ফলেই।

আলাপের আবহাওয়ায় বিয়ার আসবের ঝোঁকটাই আছে দেখা গেল। শুধু তাই নয়, আলাপটাও শুরু হল তাকে নিয়েই।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'এখানকার আবহাওয়ার একটা বিশিষ্টতা আছে'।

উকিলবাবু বলল, 'মনোরম'।

ডাক্তার বলল, মনোরম, বিশিষ্ট আর প্রভাবশীলও বটে'।

অমিতা বলল, 'প্রভাবশীলও বলছেন'?

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'কথাটা ঠিক। নতুবা এমন বিয়ার পার্টি আমি কল্পনাও করতে পারি না'।

ডাক্তার বলল, 'স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায় না। করলে আমাদের আবহাওয়াটায় ধর্ম এসে পড়বে। তার ফলে খোলা আকাশে পায়রার পাখার লুটোপুটির বদলে বন্ধ দেউলের চামচিকের চমকানি লাগাবে। আমরা এখানে অনেক কিছু যেন করতে পারি যা অন্য কোথাও অস্বাভাবিক বোধ হবে– এই বোঝাতে চাচ্ছি'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'কিন্তু তা কি পরিবেশের প্রভাব যদি মনে করি– পরিবেশের প্রভাব আছে এই ধরে নিয়ে আমরা এমন সব বিয়ার পার্টিতে বসি আর তাতেই পরিবেশটা তৈরি হয়'।

উকিলবাবু বলল, 'পরিবেশটা আমরাই তৈরি করেছি বলছেন'?

ডাক্তার সাহেব বলল, 'অন্য জায়গায় আমরা এমন পরিবেশ তৈরি করি না, এখানে করছি। এটাই এই পরিবেশের প্রভাব হতে পারে'।

অমিতা বলল, 'চার্মিং'। তার ঠোঁট দুটোতে হাসি খেলে গেল।

তাকে দেখলুম আবার। ইতিমধ্যে চোখে সরু করে কাজল দিয়েছে সে। আর চুল যেখানে সরু সিঁথিতে ভাগ হয়েছে– সেখানে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। বিবাহিত সে?

বললুম 'ডাক্তারবাবুর ধর্ম আনতে আপত্তি। আমারও তেমন সম্মতি নেই। কিন্তু দেবতারা– তাদের কথা বলা যায়। দেবতারা নিজেরা কিন্তু খুব ধার্মিক নয়– বার ব্রত ইত্যাদি বোধ হয় মানে না'।

মহাতর বলল 'ধার্মিক হতে হলে তোমার গিয়ে দেবতার শাসন দরকার। দেবতাদের শাসন করার মতো কেউ নেই বোধ হয়'।

উকিলবাবু বলল, 'আমরা কি দেবতাদের মতো সময় উপভোগ করছি বলছেন'?

হাসিমুখে ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'বিয়ারের সময়ে কেউ আমাদের দেখে থাকলে সে রকম মনে হতে পারত তার'।

অমিতা বলল, 'হলে অন্তত অন্যায় হতো না'।

বললুম, 'আমি একটি সৃজনশীল দেবতার কথা বলতে পারি। মনে করুন একটি অরণ্য আছে, কিন্তু প্রাণী নেই তাতে। কিছু হয়তো কীটপতঙ্গ আছে। ঝিঁঝি ডাকে কিন্তু বাঘের গর্জন নেই। পাখি ডাকে কিন্তু হরিণ দৌড়ে যায় না। জলা আছে কিন্তু বুনো মোষ নেই তাতে। তারপর একজন বললেন– হরিণ হোক, হরিণ হল। বললেন বুনো মোষ হোক, হল তা। তারপর বাঘও এল।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'এটা কি আদিবাসীদের কোনো উপকথা হতে পারে। এদিকে এ রকম উপকথা আছে নাকি'।

বললুম, 'এই দেবতাটি আমাদের হোস্ট'।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'বলেন কী'?

হেসে উঠে মহাতব বলল, 'থ্যাঙ্কু'।

তখন আমি মহাতবের জ্যাঠামশায়ের বনে হরিণ আনার কথা মহাতবের নিজের মোষ আনবার কথা বললুম। বললুম, 'তারপর একসময়ে বাইসন এনেও ছেড়েছে বনে'।

উত্তেজনা, আনন্দ, বিস্ময়ে সবাই প্রায় একইসঙ্গে কথা বলে উঠল।

অমিতা বলল, 'তাহলে সিং মশায়কে আমরা...

ম্যাজিস্ট্রেট তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'দেবতাই বলব একটু উদার মতের, একটু আধুনিক ধরনের দেবতা; পেটের কাছটায় একটু মোটা হলেও দেবতা হতে আটকাবে না'।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'আমরা ভোট দিচ্ছি'।

সবাই প্রায় একই সঙ্গে হেসে উঠল।

মহাতব বলল, 'সব দেবতাকেই তরুণ হতে হবে, কৃশ কটি হতে হবে— এমন কথা নেই। তা ছাড়া যদি তিন হাজার টাকায় দেবত্ব কেনা যায়, আমার আপত্তি নেই'।

'তিন হাজার'? ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করল।

'মোষগুলো কিনতে আমার দু-হাজার লেগেছিল। আর বাইসনটা প্রায় সাতশো'।

'আর হরিণ'?

'সেটা জ্যাঠামশায় জানতেন। তখনকার দিনে পঞ্চাশ-ষাটটা হরিণের দাম তিন হাজারের কমই ছিল'।

দুপুরের আলো টেবলের বাসনগুলো থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। নানা রঙের আহার্যগুলো স্বাদের দিকে যেমন, সজ্জার দিকেও তেমনি আকর্ষণের। আর অতিথিদের সাজসজ্জাও। উকিলবাবুর লখনৌ ঢঙের লেস-বসানো পাঞ্জাবি, ম্যাজিস্ট্রেটের গাঢ় লাল রঙের গায়ে সোনালি ফুল আঁকা টাই, কিংবা অমিতার জামরঙের ঢাকাই শাড়ি—সবকিছুতেই দুপুরের পরিচ্ছন্ন আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অমিতাকে লক্ষ্য করলুম। এটা আগে নজরে পড়েনি। ব্যাপারটা বোধ হয় ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে, আর স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী ঘোড়াদের মধ্যে দেখা যায়— মাথাটা ঝাঁকানো মাঝে মাঝে। অমিতার বেলায় অবশ্য কপালে চুল এসে পড়ছে কখনও কখনও তাকে পিছনে ঠেলে দেয়াই কারণ। সে হাত বাড়িয়ে কাচের জাগটা থেকে গ্লাসে জল নিল— আর তখন চোখে পড়ল তার বুকের গড়ন। বয়স ত্রিশ পার হলেও, তুলনা দিতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের চাইতে অনেক পরিণত বয়সের হলেও, এখনও তার স্বাস্থ্য ভালো আছে— এই মনে হল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'সে বনে কি শিকার চলে না'?

'অবশ্য, অবশ্য', মহাতব বলল, 'আমার প্রস্তাব তাই। রাতে ডিনার শেষ করেই যেতে পারি, যদি শিকারই উদ্দেশ্য হয়। আর যদি বনে বনে খানিকটা ঘুরে বেড়ানো হয় ইচ্ছাটা, তাহলে এখন গিয়ে ডিনারের আগে ফিরতে পারি'।

এরপরে আমাদের আলোচনা শিকারের দিকে চলে গেল। শিকারই আমাদের ইচ্ছা। তার কমে আমরা সন্তুষ্ট হব না মনে হল। তখন শিকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প করলুম আমরা। দেখা গেল অপেক্ষাকৃত নিরীহ চেহারার উকিলবাবু প্রায়ই শিকার করে থাকেন। ডাক্তার সাহেবও রাত্রির অরণ্যে শিকার করেছেন এর আগে একবার। ম্যাজিস্ট্রেট রাত্রির অরণ্যে শিকারের সাথী হয়েছেন, নিজে কিছু শিকার করেননি। মহাতব নিজে শিকারী। রাত্রিতেই যাব আমরা ডিনারের পরে।

অমিতা বলল, 'আমিও যাচ্ছি কিন্তু'।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'নিশ্চয়'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'বাঘও পাওয়া যাবে তো'?

মহাতব বলল, 'চিতা অন্তত আছে'।

রাত্রির অন্ধকার অরণ্যের পদশব্দগুলি যেন কল্পনায় শুনতে পেলুম। মহাতব আমাদের কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে ছুটি নিয়ে চলে গেল। শিকারের যোগাড় করবে সে। বন্দুকগুলো সাফসুতরো করাবে। গুলি বাছাই করে সাজানোর ব্যবস্থা করবে। আর সবচাইতে বেশি নজর দিতে হবে চিতার চলাচলের পথের ধারে টোপ বেঁধে রাখার ব্যাপারে। উপযুক্ত লোক পাঠাতে হবে, উপযুক্ত টোপ দিয়ে।

লাঞ্চের পরেই সিগারেট ধরিয়ে বসেছিলুম আমরা। মৃদু একটা বাতাস আসছিল সেখানে। অনুভব করছিলুম সকালের সেই বিলের উপর দিয়েই আসছে সেটা। একসময়ে অমিতা উঠে ঘরে চলে গেল; আমি একটা পুরনো পত্রিকা উল্টোতে লাগলুম। তখন মহাতব, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার সাহেব আর উকিলবাবু কাছাকাছি চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল– যেন তাস খেলবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা গল্পই করল। শিকার থেকে বনের কথায়, তারপরে মহাতবের এই প্লাইউডের কারখানার ব্যাপারে আলাপ পৌঁছাল তাদের। কিছুক্ষণ যেন ব্যবসায়ের কথার মতো জটিল এবং দৃঢ় ধরনের কথাবার্তাই তারা বলেছিল। কাজের কথা, অবসর যাপনের মধ্যে যা হঠাৎ এসে পড়েছে, যে ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট মহাতবের আলাপকে সাহায্য করতে পারে।

তারপরই মহাতব বাড়িতে গিয়েছে বন্দুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে। তারপর একে একে ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার সাহেব, উকিলবাবু নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

আবার সিগারেট ধরিয়ে ছবির পত্রিকায় চোখ দিতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। ঘুঘু ডাকছে যেন। চেয়ে দেখলুম গেস্ট হাউসের লনের পুব কোণে চারাগাছটার নিচেই যেন পাখি দুটি। ওদিকে ল্যান্ডরোভার আর জিপগুলোর পাশে একটু ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ায় একটা কুকুর ঝিমোচ্ছে। একেই বোধ হয় স্তব্ধ অলস দুপুর বলে। অথবা দুপুরের সবচাইতে গভীর অংশ এটাই, যখন বিকেল হতে আর দেরি নেই। যখন সুস্বাদু লাঞ্চ রক্তে সুখদায়ক কবোষ্ণতা সঞ্চার করে।

গেস্ট হাউসের পিছন দিকে এতক্ষণ তবু পোর্সিলেন ধোয়ার শব্দ হচ্ছিল। সেটাও থেমে গেল। অন্যান্য অতিথিরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে দিবানিদ্রাও আরামের হতে পারে

কিন্তু সবাই দিনের বেলায় ঘুমোয় না। চায়ের সময়ও হয়। উঠে বসলুম আধশোয়া অবস্থা থেকে। খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ম্যাজিস্ট্রেট তার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছে। কিংবা তার পায়ে বোধ হয় রবার সোলের স্লিপার। একটা হালকা বেতের চেয়ার টেনে আনল সে, বসল আমার পাশেই। সিগারেট কেস এগিয়ে দিলুম। সিগারেট নিয়ে ধরাল। তার পরনে সাদা সিল্কের পায়জামা, গায়ে গেঞ্জি।

তখনই ট্রেতে পিরিচ-ঢাকা চায়ের কাপ নিয়ে বাবুর্চি। বোধ হয় এ রকম প্রথা, এই চা টেবলে টিপটে না হয়ে, যে নেয় নেবে এভাবে বরং ঘরে পৌঁছে দেয়। আমার আর ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে টেবল থাকায় বাবুর্চি সেখানে দু-কাপ পাতলে, ম্যাজিস্ট্রেট অলসভাবে থ্যাঙ্ক বলল।

ঘুঘু-ডাকা অলস সময়ই তো। চোখ সেজন্য বাবুর্চিকেও অনুসরণ করে। বাবুর্চি ডাক্তারকে চা দিতে পারল না। দরজা খোলা পর্দা ফেলা। দাঁড়িয়ে থেকে ট্রে নিয়ে সে অমিতার ঘরের দিকে মোড় নিলে। কিছু পরে সে চা দিতে না পেরে কাপগুলোসমেত ফিরে এল। আমাদের টেবলের সামনে দাঁড়াল, পরে নিজের প্যানট্রিতে গেল।

চা নিয়ে বললুম, 'ঘুমুলেন না'?

ম্যাজিস্ট্রেট নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ল। মনে হল সে হাসছে। অন্তত হাস্যরসের গল্প পড়তে পড়তে মুখের যেমন চেহারা হতে পারে তেমন দেখাচ্ছে তার মুখ। একবার ধোঁয়া ছাড়ার অবকাশে সে যেন

কিছু বলল।

'বললেন কিছু'?

'কই? বলিনি'। নিচু গলায় বলল সে।

'কী'?

চা নিল না কেউ।

ওদিকের যে ঘরখানার জানলায় নীল নেটের পর্দা তার জানলাটাই শুধু চোখে পড়ে। সেদিকে সে হাত দিয়ে ইশারা করল। সেদিকে মন যেতে এবার মনে হল কারা যেন কথা বলছে নিচু স্বরে। তা কখনও হতে পারে। কিন্তু ও ঘরখানায় তো অমিতাই থাকছে।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'একটু নির্দোষ ফ্লার্টিং বা'।

'কী? ঘুঘু ডাকছে না'?

'ডাক্তার সাহেব'।

'কিন্তু বয়স হয়েছে...। ও'।

ম্যাজিস্ট্রেটের ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি কলরব করে উঠল। ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে সে বলল, 'শ্। একটা সিগারেট দিন। বরং আমি আমার কেসটাই নিয়ে আসি। একটা কড়া টার্কিশ ব্লেন্ড আছে। আনি'।

তাই নিয়ে এল সে। এবার আসতে আসতে তার স্লিপারের শব্দ হচ্ছে। যেন গুনগুন করে গানও করছে সে। বলল এসে, 'তা ষাট হয়েছে'।

তার দেয়া সিগারেট ধরালুম। ভালো স্বাদ— একটু যেন ভাজা তামাকের গন্ধ।

বললুন, 'মহাতবকে ধন্যবাদ'।

সে একমত হল। বলল, 'পরিবেশটা বিশিষ্ট, কম করে বললেও। জমিদারি লোপের সময়ে ফরেস্টটা পাছে হাতছাড়া হয় এমন দুর্ভাবনা আছে ওঁর। তা থাকা স্বাভাবিক। আমাদের কিন্তু মনে হচ্ছে এটা মানে ফরেস্ট কারো থাকা উচিত'।

কিন্তু মহাতবের অরণ্য নিয়ে দুর্ভাবনা করার চাইতে বরং অন্যদিকে দৃষ্টি গেল আমাদের। সকালের সেই ছিনাথ আসছে। তার হাতে একটা বালতি। আমরা যেখানে বসেছিলাম তাব পাশ দিয়েই তার পথ। কাছে আসতে বললুম, 'কী খবর ছিনাথ? কী আছে ওতে'?

'মধু'।

'সকালে মধু দিয়ে গিয়েছিলে, আবার এখনই'।

'সেটার চাইতে এটা আরো ভালো'।

'আচ্ছা মধু দিয়ে এসো, তোমার সঙ্গে গল্প করি'।

ওদিকে বোধ হয় ছিনাথের কিছু কাজ থেকে থাকবে। সে এল কিন্তু একটু দেবি করে। ততক্ষণে গেস্ট হাউসের দিবানিদ্রা ভাঙল। লনের উপরে রোদটার প্রখরতা কমে এল। অমিতা বেরুল তার ঘর থেকে। ডাক্তার দেখা দিল, নিজের ঘরের দরজার কাছেই দুখানা চেয়ার পাতল ডাক্তার সাহেব। নিজের হাতে। দুজনে বসল সেখানে।

ছিনাথও এল আমাদের কাছে।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'আচ্ছা ছিনাথ, এ মধু তুমি কোথায় পেলে'?

'আজ্ঞা, জঙ্গলে'।

'এর মধ্যেই জঙ্গলে গিয়েছিলে আবার? তোমার স্নান খাওয়া-দাওয়া হয়েছে'? এ কথাটা জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল। মনে হল সকালে বিলে গিয়ে তার গায়ে যে কাদা লেগেছিল সেগুলো যেন এখনও তার গায়ে শুকিয়ে আছে।

ছিনাথ বলল, 'আজ্ঞা, এখানেই খেতে দিচ্ছিল চারটি'।

বললুম, 'আমার কিন্তু তোমার মন্ত্রের গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে। তুমি কি সত্যি মন্ত্র জানো'।

'আজ্ঞা তা জানি।

'সাপের মন্ত্র, ভূতের মন্ত্র'?

'ধুলো পড়া, বাণ মারা তাও জানি'। ছিনাথ বলল যেন এগুলো খুব সাধারণ ব্যাপার।

'তোমার যদি এখন কাজ না থাকে, তোমার কাছে শুনতুম মন্ত্রের গল্প। বললুম।

ছিনাথ বিনয়ের হাসি হাসল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'ভালো করে উঠে বসো ছিনাথ। এই নাও সিগারেট খাও।

ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সিগারেট দেশলাই এগিয়ে দিল। একটু সংকোচ করে সে নিল তা।

উকিলবাবু এই সময়ে বেরুল তার ঘর থেকে। এদিক-ওদিক দেখে অমিতারা যেখানে বসেছিল সেদিকে না গিয়ে আমাদের দিকেই এল।

বলল সে, 'কী খবর'?

হাসিমুখে ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'আমরা এখন মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি'

উকিলবাবু বললেন, 'ছিনাথের মন্ত্র তো'?

'আপনি জানেন দেখছি'।

'হ্যাঁ, ওসব গল্প শুনেছি। বিশ্বাস করা যায় না কি বলো, ছিনাথ'।

ছিনাথ মুখ নিচু করে সিগারেট টানতে লাগল।

উকিলবাবুর এটা ছিনাথকে উস্কে দেয়ারই চেষ্টা। সে বলল, 'আমরা বিশ্বাস না করলেই অবশ্য মন্ত্র মিথ্যা হয় না। যদি ছিনাথ প্রমাণ করতে পারে আমরা মানবো'।

'আজ্ঞা কর্তা, ঠাকুরদার সময় থেকেই মন্ত্রটা আমাদের ঘরে আছে।

মহাতরও এল। তার সঙ্গে বন্দুক ইত্যাদিও এসেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

মহাতর বলল, 'যোগাড়যন্ত্র করা হয়েছে সবই, কিন্তু শিকার পেলে হয়'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'সে কি শিকার যাবে কোথায়'?

মহাতর বলল, 'বনটা একটু ডিস্টার্বড। একটা বড় রকমের কোনো মারামারি হয়েছে সেখানে বলছে ওরা। হরিণগুলো ওদিকের জঙ্গলে পালাচ্ছে। সাধারণত জঙ্গলের জলটার এক মাইলের মধ্যেই ওরা থাকে দেখেছি। সমস্ত জঙ্গল রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতে হতে পারে ওদের খোঁজে'।

উকিলবাবু বলল, 'জল খেতে আসবে না রাত্রিতে'?

'হয়তো মাঝরাতে— তার মানে সারারাত জেগে থাকা, আপনাদের কষ্ট হবে। পার্টির আনন্দের চাইতে শিকারের ব্যাপারই বড় হয়ে উঠবে'। মহাতর বলল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'কিন্তু ছিনাথ থাকতে আমাদের ভয় নেই। ও তো মন্ত্র দিয়ে জানোয়ারদের বশ করতে পারে। তাকে সঙ্গে নেব'। ম্যাজিস্ট্রেট মুচকে মুচকে হাসল।

মহাতর বলল, মুশকিল হল বাঘ যদি না পাওয়া যায়'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'টোপ পাতছে না? অবশ্য টোপ পাতলেও তো সবসময়ে বাঘ আসে না'।

উকিলবাবুও প্রবোধ দেয়ার সুরে বলল, 'বাঘ নাও যদি আসে, হরিণ আছে, শুয়োর আছে, বাইসনও দেখা দিতে পারে'।

মহাতর বলল, 'দেখা যাক। লোক পাঠিয়েছি'।

উকিলবাবু বলল, 'এ বিষয়ে ছিনাথের মত কী'?

ছিনাথ কিছু বলল না। মহাতরকে দেখে থেকেই সে উশখুশ করছিল। সে এবার উঠে পালাল।

তখন আমরা মন্ত্র আর তার শক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করলুম। সে সম্বন্ধে যত রকমের আজগুবি গল্প আছে তা উদ্ধার করা হল। দেখলুম মন্ত্রের শক্তি থাক আর নাই থাক তা নিয়ে অনেক ভালো ভালো

গল্প নানা দেশেই চালু আছে। আর সেসব গল্পের মধ্যে হাসির খোরাকও থাকে অনেক।

একসময়ে এই হাসিখুশির মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'আমরা কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। মহাতববাবুর কমন ফ্রেন্ড আজই আমরা পরস্পরের পরিচিত হয়েছি, কিন্তু এরই মধ্যে প্রথম আলাপের জড়তা কেটে গিয়েছে'।

'পরিবেশের প্রভাবের কথাই বলতে হয়'। বলল উকিলবাবু হাসিমুখে।

বললুম, 'কিংবা আমাদের লাঞ্চের সেই দর্শন আলোচনার অনুকরণ করে বলতে পারি...

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'তখন কিন্তু বিয়ারের আমেজ ছিল'।

উকিলবাবু বলল, 'এখন কিছু চাই নাকি'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'না মশায়, এখন যদি চলে ডিনারে অচল হবে'।

বিয়ার না হোক, চায়ের সময় হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটায় চলা বাবুর্চির ঘড়িতে তখন ছ'টা বাজে। পার্টিশন ডোরের কাছে তার মুখ দেখা গেল। চা আর কফি দুই ই এসে গেল— যা ইচ্ছা যার। এবারে পটে পটে।

কফি শেষ হতেই সন্ধ্যা নেমে আসবে মনে হল। কিন্তু তা হল না। গেস্ট হাউসের লনে তখনও অস্পষ্ট আলো রইল। যদিও ঘরে ঘরে হ্যাজাকের টেবল ল্যাম্প রাখতে শুরু করেছে চাকররা।

সিগারেট আনতে ঘরে উঠে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখলুম উকিলবাবুও উঠে গিয়েছে। মহাতব আর ম্যাজিস্ট্রেট গল্প করছে— প্লাইউডের কথার দিকেই ঝুঁকেছে তারা।

শিয়াল রঙের আলো তখনও আকাশে। মেঘগুলোর রং বদলাচ্ছে। হয়তো এমন মেঘের রং বদল আকাশমাত্রেই হয়ে থাকে। কিন্তু রোজ এমন দেখি না অলস ভঙ্গিতে।

লনের উপরে ঘাসগুলোর রং এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। মনে হল কারা যেন পাশাপাশি পায়চারি করছে। লনের বেড়ার পাশ ঘেঁষে।

মহাতব বলল, 'ডাক্তার সাহেব কোথায়? অনেকক্ষণ দেখছি না'।

ডাক্তার সাহেব তার সুপরিসর দেহ নিয়ে হারিয়ে যেতে পারে না। মহাতব বলল, 'আমার চাইতে মোটা নয়'। আমরা পরস্পরের দিকে চাইবার সময়ে মুখটাকে হাসি হাসি রাখব না গম্ভীর করব এই হল সমস্যা। ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যাস করে দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল। আর তা করতে গিয়ে সিগারেটে, হাতের আড়ালে ধরা দেশলাই-এর আলোয় তার ঠোঁট, মুখ ঢাকা পড়ল। এতে তার সমস্যাটার সমাধান করা সহজ হল।

কিন্তু সে আলোটা নিবে যেতেই মনে হল লনে অস্পষ্ট আলো থাকলেও এখানে বারান্দায় ছাদের নিচে বলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলো দিলে ভালো হয়।

বেয়ারারা একটা পেট্রোল ল্যাম্প রেখেও গেল।

ডিনার আটটায় কথা ছিল। সাতটার কিছু পরে উঠেই স্নানে যাব ভাবছিলুম। অনুভব করছিলুম একটু তাজা হওয়া দরকার।

কিন্তু এই সময়ে দুঃসংবাদ এল চার-পাঁচজন গ্রাম্য লোকের মুখে। নতুন নয়, মহাতব যেমন আন্দাজ করেছিল। এরা সেটাকেই আরো স্পষ্ট করে বলল। এদেরই হয়তো মহাতব টোপ পাততে পাঠিয়েছিল।

মহাতব বলল, 'সব ঠিক করে এসেছ তো? আমরা নটায় বেরুব ভেবেছি'।

'আজ্ঞা না। জলার দিকে যাওয়ার উপায় নেই। দুপুর থেকেই খুব একটা দৌড়ঝাঁপ তোলপাড় হচ্ছে সেদিকে। বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ সেদিকেই, কিন্তু সেদিকে যাওয়া যাবে না'।

মন খারাপ হওয়ার কথাই মহাতবের। এরা যখন ফিরে এসেছে, তখন আর কাউকেই বনে ছাগল বাঁধতে পাঠানো যাবে না। সে গম্ভীর হয়ে রইল। একবার শুধু বলল, 'তোমাদের জঙ্গলে হিমালয় থেকে হাতি নেমে এসেছে, তাই নয়'?

এই বিদ্রূপের উত্তরে তারা কিছু বলল না। সহ্য না করে উপায় নেই।

ডিনারে বসে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সাহেব আর অমিতা এল। তখন ডিনার দিতে ইঙ্গিত করল মহাতব। ইতিমধ্যে পোশাক বদলেছে অমিতা— রাইডিং ব্রিচেস আর বুশকোট। চুলগুলো কালো জালে জড়ানো। শিকারের জন্যই প্রস্তুত হয়েছে সে। শুধু সে নয়। মনে হল ম্যাজিস্ট্রেটও অন্তত জুতোটা পালটেছে। ভারী একটা বুট পরেছে যেন।

আমাদের আলাপও শিকারের দিকেই একমুখী হয়ে রইল।

বললুম, 'টোপ পাততে পারেনি বলে ভাবনার কী আছে বুঝি না। জলার ধারে শুয়োর, হরিণ, বুনো বাইসন আসবে কি না— এসবের চাইতেও বেশি সেখানে রাত্রির অরণ্য থাকবে। ঝিঁঝির একটানা ডাকের মধ্যে জোনাকির ঝাঁক ওঠানামা করছে— অন্ধকারে গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে, খ্যাঁক খ্যাঁক করে কেউ ডেকে নিঃশব্দ হয়ে গেল। মনে হল পাতার উপরে শব্দ হচ্ছে ভারী সাবধানী থাবার। তারপর আবার ঝিঁঝি ডাকছে। ভেবেছ, যারা এসেছিল তারা চলে গিয়েছে। হঠাৎ একজোড়া মরকত জ্বলে উঠল খুব কাছে। শুধু মরকত অত উজ্জ্বল হয় না। বনের চোখ তোমাকে দেখছে'।

মহাতব বলল, 'সাহিত্যিক এমনই বলে'।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল 'কিংবা এমন না হলে কি সাহিত্যিক'?

অমিতা বলল, 'শিকারের আশা না থাকলেও আমরা কিন্তু জঙ্গলে যাচ্ছি'।

তার চোখ দুটি ঝকঝক করল। কতখানি উত্তেজনা কতখানি তার অভিনয়ের অভ্যাস বলা শক্ত।

কিন্তু মহাতব উশখুশ করতে লাগল। সে যেন শান্তি পাচ্ছে না।

এমন সময়ে একজন বয় এসে বলল ছিনাথ এসেছে।

মহাতব উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আচ্ছা। ডাকো, ডাকো'।

ছিনাথ এল।

'কি ছিনাথ, তুমি কি মন্ত্র জানো সত্যি, জানোয়ার বশ করা মন্ত্র? এখন আর জানো না, কি বলো? তোমার ঠাকুরদা হয়তো জানত। কিন্তু তুমি'?

'তেমন মন্ত্র আছে, আজ্ঞা'।

'থাকলেও তুমি কি আর জানো? এই বাবুরা বিশ্বাস করবেন না। আর এরা না করলে, কেউই করবে না।'

কী বলা উচিত ভাবতে লাগল যেন ছিনাথ।

মহাতব বলল, 'তুমি জঙ্গলের পথঘাট চেনো। মন্ত্রও জানো। তবে তোমার জঙ্গলে যেতে কোনো ভয় থাকতে পারে না— সে রাত কিংবা দিন হোক'।

'কী ভয়'? মুখ নিচু করে বলল ছিনাথ।

'তবেই দ্যাখো'। মহাতব বলল, 'তুমি জলার কাছে কিছি বাঘের পথে ছাগলের টোপ বসাতে পারো কয়েকটা। তুমিই পারো। তুমি ছাড়া আর কেউ-ই বা পারে'?

'অনেক রাত হল না, বাবু'?

'মন্ত্রের কাছে আর রাত কি?' বলল অমিতা। তার ঠোঁট দুটি হাসল। চোখ দুটি ডাগর হয়ে ফুটল।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'তোমার মতো গুণী থাকতে বাঘ পাব না শিকারে গিয়ে তাও কি হয়'?

ছিনাথ বলল, 'আজ দিনটা ভালো নয়'।

'তাই বলো, তাই বলো,' বলল উকিলবাবু, 'আজ মন্ত্র না-ও ধরতে পারে'।

হাসল উকিলবাবু।

যেন বিব্রত হয়ে মুখ নামাল ছিনাথ।

কিন্তু মহাতব কাজের মানুষ। হঠাৎ সে কাঁটা চামচ রেখে তার জামার জেবে হাত দিল। একটা

কী বার করেও আনল। বলল, 'নাও এটা'।

ছিনাথ ইতস্তত করতে লাগল।

মহাতব বলল, 'দ্যাখো। এর আগে বোধ হয় দ্যাখোনি, না? একশো টাকার নোট'।

মহাতব অবশ্যই খরচ করতে জানে, ঝোঁকের মাথায় সেটা যে কোনো অঙ্কেরই হতে পারে।

ছিনাথ চেয়ে চেয়ে দেখল নোটটাকে।

মহাতব বলল হাসিমুখে, 'কি এখনও পারবে না বলছ'!

ছিনাথ বিড়বিড় করে কী বলল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'বাহ্, এই তো এখনই মন্ত্র পড়ছে আমাদের ছিনাথ'।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'বাঘ যদি আসে টোপে— আরো পাবে'।

ছিনাথ হঠাৎ যেন এগিয়ে গেল। তার এই যাওয়াটাকে হঠাৎ বলেই মনে হল অন্তত।

নোটটা নিল সে মহাতবের হাত থেকে।

মহাতব তৃপ্তির সুরে বলল, 'আ, ছিনাথ'!

ম্যাজিস্ট্রেট কী ভাবল। পরে পকেটেই হাত গলিয়ে তার সেই টার্কিশ সিগারেট এক প্যাকেট বার করে আনল। বলল, 'এই নাও ছিনাথ পথে খেয়ো, যদি একা একা লাগে। নাও, লজ্জা কী'?

মহাতব বয়কে ডেকে বলে দিল গোটা তিনেক ছাগল আর ছিনাথকে নিয়ে ল্যান্ডরোভারটা এখনই চলে যাক। ছিনাথকে জঙ্গলের ভিতরে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে গাড়ি ফিরে আসবে।

একশো টাকাব নোটখানা নিয়ে চলে গেল ছিনাথ।

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'ম্যানার্স যাই হোক, চিয়ার্স টু ছিনাথ'—এই বলে সে একটা ওয়াইনের বোতল আলোতে উঁচু করে ধরল।

আমরা হাসলুম। বোতলটা খুলে দিল বাবুর্চি।

ডাক্তার সাহেব অমিতার দিকে সল্টসেলারটাই এগিয়ে দিল যেন।

অমিতা বলল, 'বাপ রে, কী অন্ধকাব! আচ্ছা ও কি সত্যি মন্ত্র জানে'?

ডাক্তার সাহেব বলল, 'তা খুব ভালোনকমে না জানাই ভালো। বেশি মন্ত্রে বাঘ ভিজে ন্যাকড়া হয়ে গেলে মেরে সুখ নেই'।

মহাতব হো হো করে হাসল।

এই হাসি থেকে মন্ত্র আর তার শক্তি নিয়ে আমরা বিকেলে যে হাসিব গল্পগুলো উদ্ধার কবেছিলাম তার কথা মনে পড়ল।

মহাতব বলল, 'ডিনার আর কিছুক্ষণ চালাতে পারি আমরা। কারণ টোপ পাতার পর বাঘকে আসাব সময় দিতে হবে।'

'কিন্তু বেশি দেরি করলে বাঘ টোপ নিয়ে পালাতে পারে— ছাগল তো'! বলল উকিলবাবু।

মহাতব বলল, 'তাই বলে বেচারিকে খাওয়ার সময়ও দেবেন না'?

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'বাঘের উপরেও আপনার দয়া থাকা স্বাভাবিক'।

ডাক্তার সাহেব বলল, 'আমরা টোস্ট ড্রিঙ্ক করতে চাই। চিয়ার্স টু অনারেবল মহাতব সিং, গড অব দ ফরেস্ট'। তার ষাট বৎসর সত্ত্বেও বাত নেই মনে হল।

বয় এসে টেবলের উপরের হ্যাজাক ল্যাম্পগুলোকে পাম্প করে দিয়ে গেল। আমরাও যেন পরস্পরের কাছে উজ্জ্বল দেখাতে লাগলুম।

বিশ্রাম করে, সাজপোশাক করে, শিকারে বেরুতে রাত প্রায় এগারোটা হল। শিকারে গিয়ে কী হল, শুনতে আপনাদের ভালো লাগবে না। পুরনো মনে হবে। জিম করবেটের সেই খোঁড়া বাঘের পিছনে ঘোরার মতোই স্তব্ধ অন্ধকার অরণ্যপথ। তফাত শুধু ল্যান্ডরোভার আর জিপের হেড লাইটের আলোতে

আলো-অন্ধকারের পার্থক্যটাকে যেন আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলেছিল। আলোতে বিভ্রান্ত বনের চোখগুলো এখানে-ওখানে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল পথের ধারে। অবশ্য সেই বাঘ নয়।

শিকারে ভাগ্য বলে একটা কথা আছে। বাঘ পাওয়াকে ভাগ্য বলে। বাঘ আমরা পেয়েছিলুম। অবশ্য খুঁচিয়ে বলতে গেলে বলতে হবে একটি পূর্ণবয়স্কা মাদী চিতা।

এবার যা ঘটেছিল তাই বলি। শিকার থেকে যখন ফিরলুম রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। এ চাঁদ এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না। পাণ্ডুগ্রস্ত দেখালেও পথে আলো হয়েছে। গেস্ট হাউসের লনে প্রথমে আমাদের জিপটাই ঢুকল। ডাক্তার সাহেব, উকিলবাবু, অমিতা আব আমি নামলুম। বারান্দায় হ্যাজাকগুলো জ্বলছে। একজন বয় ঘুম চোখে উঠে এল। দেয়ালের গায়ে বন্দুকগুলো ঝুলিয়ে রেখে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম। তারপরে বেতের চেয়ার টেনে টেনে নিয়ে বসলুম। মহাতব আর ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারা ল্যান্ডরোভাবে আসছে।

অবশেষে তারা এল। ইতিমধ্যে গেস্টহাউসেব বাবুর্চি আর কয়েকজন সহকাবী উঠে এসেছে। তারা আমাদের ইঙ্গিতে এগিয়ে গেল। ল্যান্ডরোভাবটাব পিছন দিকে যেখানে মালপত্র বাখা যায় সেই দরজাটা খোলা হল। বাঘিনীর মৃতদেহটা নামাল তাবা। আর দ্বিতীয়বাব গিয়ে— হযতো তারা প্রস্তুত ছিল না— ছিনাথেব দেহটাকেও নামিযে আনল। বাবান্দায় আলোব নিচে তাদের বাখা হল। বাঘটার শরীর এর মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে এসেছে, তবু তাব ল্যাজটা যেন নড়ল। ওদের শরীরের পেশিগুলো স্প্রিংয়ের মতো বোধ হয। ছিনাথেব শবীরও শক্ত হয়েছে কিন্তু হঠাৎ তার মুখে আলো পডায মনে হল সে যেন ঘুমের মধ্যে পাশ ফিবল।

এ কথা বললে আদৌ মিথ্যা বলা হবে না যে আমবা খুঁজেই পাচ্ছিলুম না আমাদের কী করা উচিত। ডাক্তাব সাহেব একবাব উঠে গিয়ে-ছিনাথেব গায়ে জডানো ন্যাকডাগুলো একটু সবালো। বুকেব কাছে পুরনো টিনের একটা টুকবো দেখা গেল। সেকালে যোদ্ধারা বর্মে ইস্পাতের বক্ষত্রাণ পরত। ছিনাথ বুকে টিনের টুকরোটা বেঁধে. তাব উপরে অনেক ন্যাকড়া জডিয়ে বর্ম তৈবি কবেছিল। মাথায় একটা পুবনো শোলাব টুপি ন্যাকডা দিযে জডিযে পাগডিব মতো কবা, মুখ আব গলাও তারই সঙ্গে ব্যান্ডেজেব মতো কবে বাঁধা। শিরস্ত্রাণ হতে পাবে।

অমিতাব চোখ দুটি ডাগব হয়ে ফুটল, আব সেই চোখ দিয়ে বড বড কযেক ফোঁটা জল গড়িয়ে পডল। আমাব মনে হল কোনো ছবিতে তাব ঠিক এ বকম একটা ভঙ্গি দেখেছি। ছবিটি মনে পডল না- দুঃখেব ভাবটা এল। ডাক্তাব সাহেব তার ঘরে উঠে গেল।

মহাতব বলল অমিতাকে বিশ্রাম নিতে।

তখন মহাতব, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিলবাবু আর আমি ডাইনিং রুমে গেলুম। তখনও ডিনাবেব টেবল পুরো সাফসুতরো হয়নি। ডিস, প্লেট, এসব সবেছে মাত্র, হ্যাজাকের আলোটা লালচে হয়ে এসেছে। সাবাদিনেব খাটুনিতে বাবুর্চিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলেই হয়তো এমন অবস্থা। তবু একজন বয় এগিয়ে এল। মহাতব তাকে হাতেব ইশাবায় বিদায় দিল।

টেবলের একধারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম আমবা। সিগারেট ধবাল উকিলবাবু। পিপাসা পেয়েছিল। দেখলুম জাগে জল আছে। একটা গ্লাস বেছে নিযে, জাগ থেকে জল ঢেলে নিলুম। এটা হয়তো পথ দেখাল। টেবলে একটা আধখানি ওয়াইনেব বোতল ছিল। মহাতব উঠে গিয়ে কাছে নিযে এল।

ভোরেব আলো দেখা দেবে মনে হল জানলা দিয়ে। হ্যাজাকের আলোটা নিবিয়ে দিল ম্যাজিস্ট্রেট। তাতে কিন্তু বোঝা গেল, ভোবের আলো তখন শুধু আকাশের গায়েই। ঘরেব মধ্যে জামাকাপডই বোঝা যাচ্ছে, মুখ চেনা যাচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেট উঠে পায়চারি কবছে। লোকটি যেন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

মহাতব একবাব হাসল। বলল, 'আমার সিগারেট কেসটা বোধ হয় জঙ্গলে পড়ে গিয়েছে'।

সিগাবেট দিলুম তাকে।

জামাকাপড বদলালে ভালো লাগবে মনে হল। 'আসছি', এই বলে উঠলুম।

ঘবে গিযে জামাকাপড খুলবাব আগে ইজিচেযাবে বসেছিলুম বোধ হয। আর একটু তন্দ্রাও এসেছিল তখন। হঠাৎ মনে হল অনেক বেলা হযেছে। উঠে বাইবে এলুম। তখন সত্যিই ভোর হযেছে। তারই অস্পষ্ট আলো ফুটেছে বাবান্দায। যদিও লাল হয়ে আসা নিভন্ত হ্যাজাকও একটি জ্বলছে। কিন্তু কিচ কিচ কবে পাখি ডাকছে।

যেটা স্বপ্নেব মতো মনে হচ্ছে, সেটা স্বপ্ন নয। খুব খাবাপটাকে বিশ্বাস কবতে প্রবৃত্তি হয় না বলেই স্বপ্নেব মতো মনে হয তখনও। বাঘিনীব দেহেব ছাপগুলো হলুদেব উপবে ইতিমধ্যে স্পষ্ট দেখাচ্ছে ভোবের আলোতে। তাব পাশে ছিনাথেব মৃত দেহটাকে কিম্ভুত দেখাচ্ছে। হাস্যকব বলাটা উচিত হবে না মানুষেব মৃতদেহ সম্বন্ধে।

তখন খেযাল হযনি। ওখানে নামানো উচিত হযনি। অমিতাব ঘবেব দরজা খুললেই চোখে পড়ে। মনে হল অমিতাই যেন দবজাব কাছে দাঁড়িযে আছে। এ অবস্থায নার্ভাস হযে পড়ে মানুষ।

ডাইনিং রুমে আবাব এলুম। মহাতব সিগাবেট টানছে চেযাবে আড হযে বসে। ওযাইনটুকু শেষ হযে গিযেছে। ম্যাজিস্ট্রেট ঘুমাতে গেল। উকিলবাবু চুপ কবে বসে আছে। ঘুম পেযেছে তাব বোঝা যায। ঘবটাকে নিষ্প্রভ চোখেব কোটবেব মতো দেখাচ্ছে অস্পষ্ট আলোতে।

বোদ উঠে পড়েছে। স্নান কবে নিলে হয। তোযালে কাঁধে ফেলে বাব হলুম।

স্নানটাই [illegible] এখন। [illegible] চাইতে ববং বেশি গবম। কিংবা [illegible] না। [illegible] যে স্নানগুলি সেগুলিকে চানকে দিতে পাবলে ভালো হতো না।

[illegible] বাবান্দাব [illegible]। সেদিকেই যেতে হবে। যেতে যেতে আবাব সেই মৃতদেহ দুটি চোখে পড়ল [illegible] পাবিনি। পিওনদেব জানাজানি হযেছে। আব কিছুটা বিবৃতি [illegible] দেখাচ্ছে।

স্নানটা [illegible] ভালো হবে। সকালে [illegible] যে স্নিগ্ধ বাতাস ছিল আজ যেন তা নেই। আকাশে মেঘ আছে। [illegible] মেঘে বৃষ্টি না হলেও গুমোট হতে পাবে। কিংবা পাযচারি কবতে হয।

[illegible] পর্দা জানলায। এ ঘবখানিতেই অমিতা থাকছে। মহাতবেব রুচি আছে। দূব থেকে সাদাসবে নীলাভ বঙেব মেঘ বলে মনে হয। এখন দেখছি নেটেব গাযে লখনৌ চিকনেব মতো বা মাকড়সাব জালেব ভঙ্গিতে সাদা সুতোয ডিজাইন তোলা। এটা অবশ্য মশাব উপদ্রব কমানোব জন্যই যে জানলায এমন নেটেব পর্দা। কিন্তু এ সত্ত্বেও ঘবে মশাবি ব্যবহাব কবতে হয। চকচকে পালিশ কবা দাঁড়া থেকে ধবধবে নেটেব মশাবি। অমিতাব ঘবই [illegible]। কিন্তু বিছানায আবো কেউ

ডাক্তাব সাহেব হবে। আব তা যদি, এটা কালকেব শাবা দিনেব পবিণতি। যদিও এখন অনেকটা দিনেব আলো— আব জানলাটাও বন্ধ নয।

অমিতাব ঘব পাব হতেই ডাক্তাব সাহেবেব ঘব। দবজাটাও খোলাই। কিন্তু দেখলুম ডাক্তাব সাহেব সিগাবেট ধবিযে পাযচাবি কবছে ঘবেব মধ্যে।

বলল, 'স্নানে চলেছেন? আমি একটু বেলা না হলে স্নান করি না। যদিও আজ কবতে পাবলে মন্দ হতো না'।

নীল পর্দাব ঘবে তাহলে ডাক্তাব সাহেব নয।

আব ব্যাপাবটা তাহলে কালকেব পবিণতি বলা যাচ্ছে না।

তখন বেলা প্রায় দশটা হল। শরতের পরিচ্ছন্ন রৌদ্রে গেস্ট হাউসের লনটা ঝকঝক করছে। গেস্ট হাউসের পরিধির বাইরে পথটা পার হয়ে আর একটি টিলাতে গ্রাম্য গাছপালার একটা বৃত্ত। সেগুলির গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে আলো ঢুকে পড়েছে। গুঁড়িগুলো পৃথক পৃথক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জঙ্গলটার কথা মনে হল। কাল রাত্রিতে অনেকক্ষণ কেটেছে সেখানে। সেখানেও হয়তো রাত্রির অন্ধকারকে ঠেলে ঠেলে দিনের আলো ঢুকছে।

আগে চোখে পড়েনি। এবার দেখলুম লনের উপরে রাখা মহাতরের ল্যান্ডরোভারটার ছাদে একটা দোয়েল এসে বসেছে, ল্যাজ নাচাচ্ছে।

বাবুর্চির সহকারী এসে সেলাম করল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ব্রেকফাস্টের কথাই সে বলতে চায়। তারা তো ঘড়ির কাঁটাতেই আয়োজন করেছে। জুড়িয়ে যাচ্ছে সব। নতুন করে ডিম সিদ্ধ চড়াবে কি না বুঝতে পারছে না।

বললুম 'মহাতরবাবু তৈরি হয়েছেন'?

'চুল ব্রাশ করছেন'।

'চলো যাচ্ছি'।

টেবিলে বসবার জন্য উঠলুম, হাতের ছবির পত্রিকাখানা চেয়ারের উপরে রেখে। টেবিলের কাছে পৌঁছে দেখলুম উকিলবাবু আর ডাক্তার সাহেব এসেছে আমি ঢুকতে ঢুকতে মহাতরও অন্য দরজা দিয়ে এল। আর তার পিছনে পিছনে ম্যাজিস্ট্রেট। রাত জাগার ক্লান্তির কালো উকিলবাবুর চোখের কোলে। ডাক্তার সাহেব শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছে। চিবুকের উপরে একটা ছোট ক্ষতে খানিকটা রক্ত শুকিয়ে আছে। মহাতরের গলায় গালে অনেক পাউডার। তা দেখে মনে হল পাউডারের মসৃণ ঠান্ডা পাফ বুলিয়ে বুলিয়ে সে শরীরটাকে স্নিগ্ধ করার চেষ্টা করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট আমার আর মহাতরের মাঝখানে বসল ম্যাজিস্ট্রেট বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি করেছে। শার্টের একটা আস্তিনের বোতাম খোলা। বাহুর ভিতরের দিকের খানিকটা চোখে পড়ছে। তার ধানী রঙের চামড়ার মসৃণতাই আবার চোখে পড়ল যদি বালকের সেই দেবতাদের তুলনাটা মনে আনা যায়— এলই মনে— ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই তরুণতম দেবতা এই দলের। ছাব্বিশ সাতাশ হবে। অমিতার ছত্রিশ সাইত্রিশ থেকে তরুণ।

চোখে চোখ পড়তেই ম্যাজিস্ট্রেট যেন একটু হাসল। এটা হয়তো আমার অনুমানই, ব্যাপারটা জানি বলে, তার ভঙ্গিতে একটা পরিতৃপ্তির ভাব আছে।

বাবুর্চি এসে মহাতরকে জিজ্ঞাসা করল ব্রেকফাস্ট আনবে কি না।

'অমিতা আসবেন না ?

'না। উঠেছেন ঘরে পাঠাতে বললেন ব্রেকফাস্ট ক্লান্ত বোধ করছেন বললেন।

'পাঠিয়েছ? আনো তাহলে আমাদের'।

ব্রেকফাস্ট এল।

প্লেটগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। জানলার পর্দা দিয়ে স্কাইলাইটের কাচ দিয়ে আলো এসে পড়েছে টেবলে। সে আলোয় ধোঁয়ার রং সিগারেটের ধোঁয়ার মতো স্পষ্ট দেখাচ্ছে।

ডিমে চামচ দিয়ে মহাতর গলাটা সাফ করল, মৃদুস্বরে কেশে, যেন বলবে কিছু কিছু বলল না সে।

টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে ডাক্তার সাহেব মাখনের ছুরিটা দোলাতে দোলাতে ইতস্তত করতে লাগল। তার এই ছুরির দোলানোর ভঙ্গি আর কথা বলার ভঙ্গিতে যেন একটা মিল আছে বলে মনে হয়। অবশেষে বলল সে, 'বাঘটা কিন্তু প্রেগন্যান্ট ছিল'।

কেন এ-কথা বলল সে? ডাক্তার সাহেব বিপন্না গর্ভবতীদের অবশ্যই সাহায্য করে থাকে

সদরের হাসপাতালে। তাদের জন্য তার মনে কিছু করুণা থাকা স্বাভাবিক। মৃতা বাঘিনীকে দেখে কি তার সেই করুণাই জেগেছে?

ডাক্তার সাহেব বলল তখনও মাখনের ছুরিটা দোলাতে দোলাতে, 'যৌবন পার হলেও নারী হিসাবে এখনও যুবা। মহাতরবাবু জানলে হয়তো গুলি করতেন না। কারণ বাঘটাকে তো তিনি এর আগেই মেরেছেন। কাজেই জঙ্গলে আরো বাঘিনী থাকলেও নতুন প্রাণ তৈরি হবে না'। সে হাসলও একটু।

ম্যাজিস্ট্রেট রুমাল বার করে তার কপালটা মুছল মুখ নিচু করে। তার মুখ আড়াল হল তার ফলে। কিছু কি ভাবল সে, কোনো ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে? কোনটা আগে কোনটা পরে খাব তা খেয়াল ছিল না। টি পট থেকে চা ঢেলে নিলুম, আর তখন এটা ধরা পড়ল।

রাত্রিতে ঘুম হয়নি। কবোষ্ণ জলের টাবে খানিকটা সময় কাটিয়েছিলুম। তাতে শরীরের ভিতরটা ঝরঝরে হয়নি, ত্বকটাই মাত্র হয়েছিল, হাই উঠল। ভিতরের ক্লান্তিটাই ফুটে বেরুচ্ছে।

সঙ্গীদের দিকে চাইলুম। মহাতর একমনে খাচ্ছে। মনে হল তার নিঃশ্বাস একটু জোরে জোরে পড়ছে। আহার্যের ব্যাপারে বেশি আগ্রহের ফল?

কী জানি কী হয়।

টেবলে সাইডারের বোতল ছিল। অনেকে বলে সকালে সাইডার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

সাইডারের বোতল একটা টেনে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মুখ খুলবার ফিকিরের জন্য এদিক ওদিক চাইতে লাগল। বাবুর্চিই এগিয়ে এল ওপ্‌নার নিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট বোতলে মুখ দিয়েই খেতে শুরু করল সাইডার।

আমাদের সামনে গোলাপি রং করা পোর্সিলেনের বাউল দিয়ে গেল বাবুর্চির সহকারী। তাতে নতুন ধরনের কোনো মাংসের রান্না বলেই মনে হল। ঘিয়ের রঙের পাতলা রসে মরচে রঙের ভাজা মাংস ভাসছে। মৃদু হলেও শ্যাম্পেনের গন্ধ পাচ্ছি তা থেকে। ধোঁয়াও উঠছে।

মহাতর বলল, 'খেয়ে দ্যাখো, হানিড লার্ক বলে।'

ভালোই লাগল ভাজা মাংসের গন্ধ, মধুর গন্ধ, শ্যাম্পেনের গন্ধ। আর তাদের স্বাদও।

দেখলুম ম্যাজিস্ট্রেটের ডান হাতের উপরে রোদ এসে পড়েছে। সে হাতে কয়েকটি আঙুল একটা প্লেটের উপর টোস্টের টুকরো গুঁড়ো গুঁড়ো করে চলেছে।

চামচ দিয়ে হানিড লার্ক তুলে খেতে খেতে আমার মনে হল বড্ড চুপচাপ করে আছি আমরা। বললুম, 'ব্রেকফাস্টের পরে একবার হরিণের খোঁজে গেলে হয় না'?

'মন্দ কী'। বলল মহাতর।

সে হানিড লার্কের বউলে কাঁটা ডুবিয়ে এক টুকরো মাংস টেনে তুলল। মনে হল ডাহুক জাতীয় কোনো মাংসের বুক।

চিবোতে চিবোতে চুষতে চুষতে সে বলল, 'ভালোই হয়। তা ছাড়া বাইসনটাকে কেউ গুলি করেছিল বলে মনে হচ্ছে। সেটা

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, 'আমাকে কিন্তু এখনই ফিরে যেতে হবে সদরে'।

কিন্তু বলল মহাতর।

ডাক্তার সাহেব কাজটা হঠাৎ করল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'নতুন বিয়ে করেছে কিনা। এ সময়ে, কী বলব, আদর্শের মতোই কিছু থাকে যেন

ম্যাজিস্ট্রেট রুমাল দিয়ে কপালটা মুছল আবার মুখ নিচু করে।

সে শুনতে পেয়েছে কি? বিব্রত বোধ করলাম।

রুমালে আড়াল করা ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে না চেয়ে বরং আমার হানিড লার্কের বউলের দিকে চাইলুম।

ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হলেই স্বাদে কম হয়ে যাবে। ভাজা মাংসের টুকরোগুলো মিইয়ে যাবে। অবশ্য

চর্বি আর শ্যাম্পেনের ঝোলটা তখনও মুখরোচক থাকবে।

চামচ দিয়ে মধুর ঝোলটাকে নাড়তে নাড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল এক টুকরো গ্রেভি যেন ভাসছে। তাই কি ভাসে? চামচ দিয়ে তুললুম আর সেদিকেই নজর আটকে রাখলুম, কারণ তখনই আমার অনুমান হল ডাক্তার সাহেব উকিলবাবুকেও যেন কিছু বলছে ফিসফিস করে, আর তা ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধেই।

কিন্তু গ্রেভি নয়। স্বচ্ছ, কোনো পতঙ্গের পাখার মতো। মৌমাছির পাখা? তাই হলে তাই তো সম্ভব। মধু তো।

আমার তখন মনে হল মধুর কথা থেকে ছিন্নাথের কথা। সেই মধু সংগ্রহ করত মহাতবের। এটাও তারই সংগ্রহ হবে। সে ছাড়া আর কে?

যদিও সে এখন

কে যেন হো হো করে হাসল। উকিলবাবু। আচ্ছা? লখনৌ এর ঢঙে পাঞ্জাবি পরা সত্ত্বেও তাকেই তো সবচাইতে সাদাসিধে মনে হয়েছিল। তার এমন হাসি?

চামচটা নামিয়ে রাখলুম। গার্নিড লার্কের বাকিটুকু খেতে প্রবৃত্তি হল না। আর তা জুড়িয়েও গিয়েছে যেন। জুড়িয়ে গেলে স্বাদে কম যায়।

সে যাই হোক, এখন আমবা এই ইযাটে একটা ছোট দ্বীপেব চাবিদিকে পাক খাচ্ছি। এটি তেমন সব দ্বীপেব একটি যেগুলিকে মানচিত্রে দেখা যায না অথচ এই অঞ্চলেব সমুদ্রে যেগুলি অসংখ্য বিন্দুব মতো অবস্থান কবছে।

আমাদেব দলেব আশাবাদী ছিল জ্যাক। সে বলল, 'এটাই, ইন্দব, দেবতাদেব বীতি। এই ঘুবে ঘুবে বেডানো, অথচ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বাতাসটায সুগন্ধ আছে। আব সমুদ্রেব যত দোষই থাক, তাকে আজ পর্যন্ত কেউ ধূলিধূসব বলেনি'।

ইন্দব দু-হাতে নিজেব হাঁটু জডিযে ধবে বসে বসে দুলতে লাগল। 'কিন্তু দ্যাখো, আকাশেব ব' শ্লেটেব মতো হযেছে। এই শেষেব আধঘণ্টায অন্তত আমবা এতটুকু এগোতে পাবিনি'। বললুম, 'ঘডিতে সাডে তিনটে হল'।

জ্যাক কোমব পর্যন্ত নিবাববণ। বংদাব চন্দ্রাতপেব নিচে উপুড হযে শুযে সে চন্দ্রাব সঙ্গে লুকোচুবি খেলছিল অন্তত শেষেব একটি ঘণ্টা। আব তাব বন্ধু এবং সহকর্মী সাসেক্স পোস্টেব ম্যাকগ্ল চন্দ্রাতপ আব ছ'ফুট পবিধিব একটা খডেব টুপিব ডবল ছাযাব তলায বসে, খড দিযে চুযে চুযে বিযাব খাচ্ছে।

ম্যাকগ্ল বলল, 'চালু থাকলেই হল'।

পিযেবেব মুখ থমথম কবছে, এটাই তাব স্বাভাবিক ভঙ্গি সে বলল, 'পাক খাওযাটাও একবকমেব গতি, কিন্তু সেটা তোমাকে অন্য কাবো উপগ্রহ কবে। আব উপগ্রহ হওযা মানেই প্রভাবে আসা।' 'কিন্তু, ম্যাকগ্ল গম্ভীব হযে বলল, 'এটাকে ইযাট বলতে চাও বলো— কিন্তু জেনে বেখো এটাকে এমন গতিব জন্যই তৈবি কবা হযেছে'।

বললুম, 'বুঝতে পাবছি এটা তোমাব আব একটা আবিষ্কাব। সাধাবণত তোমাব আবিষ্কাবগুলোব জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদই দিচ্ছি, কিন্তু এটা ' ম্যাকগ্ল অলসভঙ্গিতে তাব ভ্রূজোডা নডাল। বলল, 'বেবিকে জিজ্ঞাসা কবো। সাম্রাজ্যবাদী যুবোপিযানবা ইযাট ভাডা কবত। ভাডা দিত না, ইযাটও ফেবত দিত না। পবপব কযেকবাব এ বকম হওযাব পবে এটাকে তৈবি কবা হল, গোল হযে পাক খাওযাব উপযুক্ত কবে। নিযে কেউ ভাগবে এমন উপায নেই। বাজি ধবো। যে বোতামটা খুশি টেপো যে ডাণ্ডা ইচ্ছা টানো— এটাব পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই কববে'।

একটু উঁচু গলাতেই ডাকলুম, 'বেবি'।

একটা আলো চমকাল। জ্যাকও চেঁচিযে ডাকল, 'সন'।

'আঃ, আবাব ওটা নিযে খুটখাট কবছ' পিযেব বলল। সে একটু বিবক্তই হযেছে মনে হল।

'এবাব ক্যামেবা নয' সে অপবাধীস্ববে বলল, 'চশমা'।

হাসলুম সবাই।

অগ্রসব হতে পাবছি না, ঘুবপাক খাচ্ছি, তা সত্ত্বেও আমবা বেশ একটি ভালো আড্ডাই জমিযেছিলুম ইযাটেব উপবে। যদিও পবিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত হযে উঠছে।

কিন্তু যাঁবা আমাদেব ইতিমধ্যে চিনতে পেবেছেন, আব আমাদেব এদিকে আসাব উদ্দেশ্যেব কথা জানেন, তাঁদেব অন্তত ব্যাপাবটা ভালো লাগাব কথা নয। ঠিক যখন আমবা টাইপবাইটাবেব উপবে পাগলেব মতো ঠকাঠক কবে সংবাদ ঠুকে যাচ্ছি বলে তাবা আশা কবেন এখানে তখন আমবা মূল্যবান

সময় নষ্ট করে একটা অনুল্লেখযোগ্য দ্বীপকে বেষ্টন করে ঘুরছি। এর একটা কৈফিয়ত দেয়া দরকার।

মালয়ের স্বাধীনতা লাভের উৎসব হবে। এ রকম কিছুর উপলক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে সাংবাদিক আসার কথা, এসেছেও তা। কুয়ালার হোটেলগুলো খুব উঁচুদরের নয়, কিন্তু আমাদের মতো সাংবাদিকদের পক্ষে সেগুলি ভালোই। বিশেষ করে তারা যে বিয়ার দিত আর রিসোটোর মতো যে পোলাউ। আমরা কয়েকজন একটু আগেই এসেছি, আমাদেব পরিভাষায় যাকে ব্যাকগ্রাউন্ড বলে তাই সংগ্রহ করছি। আমি, ইন্দর, ম্যাকগ্লু, পিয়ের এবং জ্যাক। একসঙ্গে আসিনি আমরা। এখানেই দেখা হয়েছে। কিন্তু দিল্লির সাংবাদিক হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে একই আড্ডায় আমরা জড়ো হয়েছি। বিস্তর গবেষণাও, যেমন কুমার রায়পুর থেকে কী করে কুয়ালালামপুর হয় বা।

যাই হোক, ম্যাকগ্লু শুরু করল। সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক ছিল। তার মনে পড়ল— একটা খুব ছোট দ্বীপ, তা থেকে কিছুদূরে তেমনি ছোট একটি শহর— তারই কাছে একটি ল্যান্ডিং অপারেশনে বহু রক্তপাত হয়েছিল। সেমবেলাং কিংবা সেমলাং, নামটা ঠিক মনে করতে পারল না সে। আর তা পারা সম্ভবও নয়। নারিকেল গাছের সারির আড়ালে ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নামহীন এইসব জনপদ কামানের গর্জন আর মেসিনগানের ঘেটঘেট-এর সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের ব্যানার হেডিং-এ মুহূর্তে বিখ্যাত হয়ে পড়ে ; আর তারপর দুদিন না যেতেই রক্তে পিছল পথেই আবার অখ্যাতি ও বিস্মৃতিব খাদে নেমে যায়। কখনও কখনও লাঙ্গলের ফলায় করোটি কপাল বেরিয়ে পড়ে ধানক্ষেতে, কোথাও বোমারের আগুনে পোড়া কঙ্কাল অনেকদিন ধরে মাটিয়ে যেতে থাকে। ম্যাকগ্লুর যেন বিশেষ করে মনে পড়ছে এই সেমবেলাং-এর কাছেই একটা ছোট পাহাড়ে বা বালিযাড়িতে পঞ্চাশটি ব্রিটিশ-মেরিনকে চির-বিশ্রামের ব্যবস্থা কবে দেয়া হয়েছিল— আব তাদের মধ্যে অন্তত তিনজন ছিল ম্যাকগ্লুর নিজের পাড়াব ছেলে।

এরপর পিয়ের বলল, সেমলাং-এব কাছে খুব পুরনো একটা বৌদ্ধমন্দিব আছে। আর সে যেসব রিপোর্ট পেয়েছে, তাতে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে মন্দিরটির গর্ভগৃহ মালয়ী কম্যুনিস্টদের একটা গোপন আড্ডা। তাব একটা আগ্রহ হয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা কবার। আর দেখা হলে সে তাদের সম্বন্ধে কাগজে কয়েক কলম লিখতেও পারে।

সেমলাং কিংবা সেমবেলাং, আর দুই যদি এক হয়, তবে তো কথাই নেই। জ্যাক অবশ্যই ম্যাকগ্লুর অভিন্নহৃদয় সহযোগী কাজেই সে তার সঙ্গে যাবেই। বিশেষ করে জ্যাক আশাবাদী, আব আশাবাদী মানুষেব একটা ঝোঁক থাকে বিষম পরিস্থিতিতে কিংবা অসুবিধায় পড়াব দিকে।

ইন্দব এবং আমি, আমবা অবশ্যই সাবোংপরা প্রকৃত এবং আদিম মালয়েব যা অবশিষ্ট থাকতে পারে, তার সঙ্গে পরিচয় কবার জন্য উৎসুকই ছিলাম।

কিন্তু এসবে কিছুই হতো না, যদি না একটা সুযোগও এসে জুটত। এই সুযোগটাই হল বেবি। কুয়ালার মালয়ী-ডাচ হোটেলওয়ালা এ দু-দিন আমাদের পথ প্রদর্শকের কাজ কবেছে। ম্যাকগ্লু যখন তাকে সেমলাং-এব কথা বলল, তখন সে বেবির সঙ্গে আমাদেব আলাপ করিয়ে দিল।

হোটেলওয়ালা বলল, 'ইনিও আমাদেরই একজন, আর বিশেস সেমলাং এই এঁব বাড়ি'।

ম্যাকগ্লু বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই নাকি, চমৎকার'।

নতুন পরিচিত সাংবাদিক বলল, 'এখনও পুরোপুরি নয়, ক্যামেবা-চালিয়ে বলতে পারেন'।

'খববের কাগজেব জন্য'? জ্যাক জিজ্ঞাসা করল।

সে বলল, 'সেমলাং নিউজ্'।

'বেশ কথা। আপনি কি আমাদেব সেমলাং-এর চারিদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাতে পারেন, বিশেষ করে একটা বালিয়াড়ি, যাকে পাহাড় বলে মনে হয়'? ম্যাকগ্লু বলল।

'কিংবা একটা পুরনো বৌদ্ধ মন্দির'? পিয়ের প্রশ্ন করল।

'কখন রওনা হচ্ছি'? বলল বেবি। আর তা থেকেই আমরা বুঝতে পারলুম ম্যাকগ্লু আর পিয়ের দুজনেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

জ্যাক খুশি খুশি মুখে বলল, 'পথ খুব সুবিধা হওয়ার কথা নয়'।

ইন্দব চুপ করে রইল। প্রকৃত মালয়ের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই।

তারপর আমরা সোলতানকে সঙ্গে করে সেমলাং-এ এসেছিলুম। সেমলাং-এর সোলতান নয়। সেমলাং নিউজের ক্যামেরা-চালিয়ে, যাকে আমরা বেবি বলছি, সোলতানই ছিল। বেবি বলার কারণ তার চেহারা এবং বয়স।...

সেমলাংকে শহর বলা হবে কি না তা বক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেমলাং-এর নিজস্ব একটি দৈনিক সংবাদপত্র আছে, একটি ছোট পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, গোটা কুড়ি-পঁচিশ শয্যার একটা হাসপাতাল, একটা বাস স্টেশন যা রেল স্টেশনের কাজ করে, আর আছে একজন ইংরেজ এস. ডি. ও-র সদর দপ্তর। এস. ডি. ও. দেওয়ানি ফৌজদারি দু'রকম মামলারই বিচার করেন, কিছু পরিমাণে মিলিটারিসুলভ ক্ষমতাও আছে তার। শহরের জনসংখ্যা দশ থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে কোথাও হবে। আর আছে ধুলো। ধুলো ঢাকা সরু সরু পাথরের রাস্তার দুধারে ধুলোয় ধূসর নিচু নিচু বাড়ি। ধুলোর রং ছাড়া অন্য যে রং চোখে পড়ল তা একরকমের ময়লাটে হলুদ। সেটাই যেন রং-এর সাধারণ পরিকল্পনা। আর এ সবকিছুই যেন প্রখর সূর্যের আলোয় অনবরত ঝলসে যাচ্ছে।

সোলতান আমাদের সমুদ্র সৈকতে নিয়ে গেল। ম্যাকগ্লুর ধারণা অনুসারে এই সৈকতেই গত মহাযুদ্ধে একটি ল্যান্ডিং অভিযান হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কিছু চোখে পড়ল না। সৈকত বলতে বিশেষত্বহীন এক ঢালা লালচে বালির বিস্তার ছাড়া আর কিছুই নয়— যদি না জোয়ারের ময়লা জল আটকে আছে এমন সব এক হাঁটু বা তার চাইতে অগভীর খাতগুলোর কথা ধবা হয়।

ম্যাকগ্লু, অবশ্য, একটা জায়গাকে নির্দিষ্ট করে বলল, সেখানেই তাদের প্লেটুন একটা জাপানি পিলবক্স ভেঙে সাব-মেশিনগান চালাতে চালাতে অগ্রসব হয়েছিল।

পিযেব বলল, 'সময়মতো লাগসই একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন দেখাতে না পারলে, এসব গল্প জমে না।'

ম্যাকগ্লু তারপর তার সেই পঞ্চাশজন সঙ্গীর কথা বলল। আমরা একটা খণ্ড পাহাডেব মতো কিছু পেলুম খুঁজে, কিন্তু তার উপরে এমন গভীর আগাছার জঙ্গল, যে দেশি নৌকাব ভাঙা মাস্তুলের কাঠ দিয়ে কববেব উপরে যে ক্রুশ কবে দেয়া হযেছিল, তাব কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না। দেশি নৌকাও নাকি সেই ব্রিজহেড অবতরণের কাজে লাগানো হয়েছিল।

পিয়েরেব সৌভাগ্যই বলতে হবে। একটা অতি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরেব লতাগুল্মে ঢাকা লোনা-ধরা ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু মালয়ী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তার প্রত্যাশিত দেখা সাক্ষাৎটা হল না।

ম্যাকগ্লু মন্তব্য করল . পিয়ের সংবাদটা ঠিকই পেয়েছে, কিন্তু তার মালয়ী বন্ধুরা কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ কবার ব্যাপারে অত্যন্ত লাজুক।

আমবা সেমলাং নিউজের সম্পাদক মশায়ের সঙ্গে লাঞ্চ করে আমাদের অভিযান শেষ করলুম। একটি কোলকুঁজো বেঁটেখাটো মানুষ। নিখুঁত করে দাড়ি কামানো। কয়েকটি ইউরোপীয় জাতির সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া মত পোষণ করলেও ব্যবহারটা বেশ নম্র এবং মধুর।

সোলতান, অবশ্য, কফি খাওয়ানোর নাম করে তার ডেরায় নিয়ে গেল আমাদের। একটা দেশি হোটেলের কাঠেব তৈবি উপরতলায় একটা ঘর নিয়ে সে থাকে। বেশ কিছুদিন থেকেই সে যে এই অঞ্চলেই বাস করছে তা বোঝা গেল। পথে যতজনের সঙ্গে দেখা হল, সকলেই প্রায় তার নাম ধরে

ডেকে আলাপ করল। তার জনপ্রিয়তার আর একটা প্রমাণ পেলুম। মালয়ী মহিলাদের সঙ্গে যেভাবে তার আলাপ হল, তা থেকে মনে হতে পারে, অন্তত সেই দশটি মহিলার প্রত্যেকেরই সে কোলের ছেলে। সে যেন প্রত্যেককেই মা, মাগো, বা সে রকম কিছু বলে সম্বোধন করল। আমি জানি না ওগুলি মালয়ী ভাষায় মাদাম কথাটার প্রতিশব্দ কি না?

সোলতানের হোটেলের মালিক একজন মহিলা। গায়ের রংটা ফরসা। বছর চল্লিশ বয়স। একটু মোটার দিকেই গড়ন। এ অঞ্চলের গ্রীষ্ম সহজেই ফুলকে শুকিয়ে দেয়। তাহলেও কোনো কোনো মুখের আদরায় এমন কিছু থাকে, যার জন্য সে মুখটিকে সহজে ভোলা যায় না। সোলতানের হোটেলওয়ালির মুখটিও এই ধরনের। তার হালকা সবুজ রং-এর সেমিজের মতো ঢিলেঢালা গাউন, পরিচ্ছন্ন করে আঁচড়ানো চুল, টিকলো নাক, আর বিষণ্ণ ঠোঁট দুখানির সমষ্টিগত একটা প্রভাব ছিল। সে আমাদের জন্য কফি নিয়ে এল। তখন সোলতান তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছিল। সোলতান অন্যান্য মহিলাদের বেলায় যে রকম— এর বেলাতেও দেখলুম তেমনি সম্বোধন করল মা বলে। অবশ্যই মালয়ীতে।

এসব পরিচয়গুলো বেশ— (কী বলব?) কৌতুকের মতো। জীবনে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। পনেরো মিনিট বা আধ ঘণ্টার পরিচয়, চেনা হল। ভাবতে গেলে খুব হালকা ধরনের একটা বেদনাবোধ হয়। সে কি মালয়ী— কিংবা মালয়-ডাচ অথবা মালয়-ইংরেজ। কে জানে কী ছিল সে। সোলতান আর তার হোটেলওয়ালি সম্বন্ধে আর খোঁজ করার কিছু নেই। কিন্তু কুয়ালালামপুরেই আমাদের কাজ ছিল। ফেরার কথা উঠে পড়ল। তখন ম্যাকগ্লুই বলল, তার মনে পড়েছে সমুদ্রের কূল দিয়ে লঞ্চে গেলে ধুলো পথের চাইতে তাড়াতাড়ি হবে, আরামেরও হবে। সোলতান আর অতিথিদের সন্তুষ্ট করতে সবকিছুই করতে পারত, কাজেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এই ইয়াটটাকে যোগাড় করে ফেলল।

আর তারপর এখন আমরা কোথায় তা গোড়াতেই বলেছি। কুয়ালা থেকে প্রায় পঁচিশ সামুদ্রিক মাইল দূরে দ্বীপ প্রদক্ষিণ করছি, যদিও দুপুর পার হয়ে এখন বিকেল হচ্ছে। সন্ধ্যা হতে আর কত দেরি?

'চশমা? ক্যামেরা নয়, চশমা বলছ? কোথায় ছিল এতক্ষণ'? ম্যাকগ্লু বলল।

'কিছু দরকার আছে'? সোলতান তার সমব্যবসায়ী সিনিয়রদের মান্য করে চলে।

এটাকে তার প্রাচ্যসুলভ বিনয়ও বলা যেতে পারে। যদিও তার হোটেলওয়ালি তার সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করে। কালক্রমে সোলতানই যে সেমলাং নিউজের সম্পাদক হবে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তারই মতো সেমলাং-এর মেয়রও এ বিষয়ে হোটেলওয়ালির কোনো সন্দেহই ছিল না।

জ্যাক বলল, 'আছে বইকি দরকার। বিয়ার'।

সোলতান ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু পিয়ের থামাল তাকে।

পিয়ের বলল, 'দ্যাখো বাপু, তুমি বরং এখান থেকেই স্টুয়ার্ডকে ডাক দাও। তুমি অনেকক্ষণ থেকে সারেং-এর কাছে ঘুরঘুর করছ'।

সোলতান হেসে বলল, 'আপনি কি মনে করেন, মসিয়ে, আমিই ইয়াটটাকে চালাচ্ছি'?

আমরা শিউরে উঠলুম। এমনকী জ্যাকও উঠে বসল।

'মাই...' শপথটাকে গিলে ফেলল ম্যাকগ্লু। ইন্দর বলল, 'তোমার দুধি-দাঁত হাসি—' সোলতান হাসিমুখে বলল, 'বেশ তাহলে আমি আপনাদের কাছেই বসছি, আর যদি বলেন আপনাদের গল্প বলার খেলাতেও যোগ দিতে পারি'। এই বলে সে চন্দ্রাতপের নিচেই বসে পড়ল।

জ্যাক বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম তুমি দূরে আছ'।

'ক্যামেরার সাটারের দিকে চোখ রাখতে রাখতে কান খুলে রাখার অভ্যাসও আমি করছি! দূরে থাকলেও আপনাদের গল্প আমি শুনেছি। ভালো কথা, আমি কেন এতক্ষণ এখানে ছিলাম না তাও বলি -

আমি স্টুয়ার্ডকে সাপারের বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছিলাম'। সোলতান বলল।

'সাপার'? দ্যাখো, আমাদের নিশ্চয়ই ইয়াটে রাত্রিতে খেতে হবে না, কি বলো'? পিয়ের বলল। সে বোধ হয় তখনও কুয়ালায় পৌঁছেই সাপার করার আশা পোষণ করছিল।

জ্যাক আশাবাদীর মতো বলল, 'বলেছিলাম না? সে যাই হোক, দ্যাখো, এখানে সাপার যোগাড় হচ্ছে'।

সোলতান বলল, 'এখনও আমাদের ঘণ্টাকয়েক লাগতে পারে— কাজেই আমি আমার গল্পটা বলতে পারি'।

'বলো তাই। কয়েক ঘণ্টা তার বেশি নয়তো'? এই বলে জ্যাক আবার শুয়ে পড়ল।

ইন্দর বলল, 'কিন্তু যুদ্ধের কথা বলতে হবে, আমরা সকলেই তাই বলেছি'।

সোলতান মুচকে মুচকে হাসল, 'বেশ যুদ্ধের কথাই। একটি ছেলে ছিল, আর একটি মেয়েও ছিল'।

'আ', ম্যাকগ্লু বলল, 'কেউ কেউ তাকে এক ধরনের যুদ্ধ বললেও যুদ্ধ বলা যায় না ঠিক। সোলতান, আমরা যখন এইসব সৈকতে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন তুমি জন্মাওনি বোধ হয়'।

সোলতানের চশমাব কাচে আলো চকচক করল, সে বলল, 'বেশ, সেই ছেলেটি আর সেই মেয়েটি দুজনেই যুদ্ধে গেল। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতাও হল তাদের। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার আগে দুজনের কমনফ্রেন্ডরা যেসব ছোট পার্টির ব্যবস্থা করত তাতে, এমনকী তারা দুজনে তার চাইতেও ছোট যেসব পার্টির ব্যবস্থা করতে পারত সেখানে তাদের আলাপ হচ্ছিল, তাদের পরিচয় ক্রমশ গভীর হল। ভালোবাসা বলব না। বন্ধুত্বই ববং, আদর্শের ঐক্যের এবং অনৈক্যের উপরে গড়ে ওঠা সৌহার্দ্য। এসব কখনও কখনও অদ্ভুত কাজ করে। দূর দূরান্তরের মানুষকে কাছে টানে। এক-এক অন্যের পরিপূরক করে। ছেলেটি ছিল একজন ব্রিটিশ সৈনিক, আর মেয়েটি ভারতীয়। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মূলে'। দিল্লির ব্রিটিশ সাংবাদিক ম্যাকগ্লু অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে বলল, 'বন্ধুত্ব বলছ'?

দিল্লির ফরাসি সাংবাদিক পিয়ের বলল, 'বাধা কোথায়। এর চাইতে কম মিল থাকলেও ভালোবাসায় পড়তে দেখা গিয়েছে। প্রেম নয় কেন'?

দিল্লির ভারতীয় সাংবাদিক ইন্দর বলল খুঁতখুঁত করে, 'ভারতীয় মহিলা বললে না সোলতান'?

বললুম, 'ইন্দব এটা তোমার একটা কমপ্লেক্স। ভাবতীয় সৈনিক ব্রিটিশ মেয়েকে ভালোবেসেছে বললে কিন্তু তুমি এমন খুঁতখুঁত কবতে না। বলবে সে রকম হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু এ রকমও হচ্ছে না দু'এক ক্ষেত্রে? ভারতীয় পুরুষ ব্রিটিশ মহিলাকে যতগুলি ক্ষেত্রে ভালোবাসে ঠিক ততগুলি ক্ষেত্রে হয়তো ভারতীয় মহিলা ব্রিটিশ পুরুষকে ভালোবাসে না। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কি হৃদয়ের ব্যাপারে প্রমাণ করা যায়'?

জ্যাক বলল, 'সে সময়ে কিছু ব্রিটিশ যুবক দিল্লিতে নাকি রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত'।

সোলতান বলল, 'যদি আপনারা তা বলতে চান, বলুন। আমি মনে করি না ভারতের কোনো শহরে তারা প্রেমের উত্তাপ অনুভব করেছিল। পবস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা— নিশ্চয়, বন্ধুত্ব— তাও বলতে পারেন। কিন্তু প্রেম নয়— আমি যা বলতে চাচ্ছি তা যদি বুঝে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধই তাদের দূরে দূরে ঠেলে দিয়ে তাদের হৃদয়কে কাছে কাছে এনে দিল। সৈনিকটি দু'বার ছুটির দরখাস্ত করল কিন্তু পেল না ; সে যে চিঠিগুলি লিখল তার জবাব এল না'।

'কারণ'? ইন্দর জিজ্ঞাসা করল।

সোলতান বলল, 'তখন মেয়েটিও যুদ্ধের উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। একটা কমিশন পেয়েছে; যুদ্ধের অন্য এক পরিমণ্ডলে পাঠানো হয়েছে তাকে'।

জ্যাক ঠাট্টার সুরে বলল, 'তরুণ দুটির হৃদয় হল ছিন্ন। অথবা মেয়েটি অভিজ্ঞতাতে এক হতে চেয়েছিল'।

'আরো সংলগ্ন হল, আমি বলতে চাই' বলল সোলতান। 'কারণ সৈনিকটি পিছনে ফেলে আসা শান্তির দিনগুলিকেই কামনা করত। সে দিনগুলির স্মৃতি কখনও কখনও একটিমাত্র মেয়ের চোখের আলোয় উদ্ভাসিত, ঠোঁটের কোমলতায় রঙিন, যে মেয়েটির রং কিছু চাপা'।

ম্যাকগ্ল ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস নিল।

পিয়েরে বলল, 'ম্যাকগ্লু, প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমতী এমন কোনো এশীয় তরুণীর সঙ্গে এখনও তোমার আলাপ হয়নি'।

সোলতান তার গল্প বলে গেল হয়তো এ ব্যাপারে দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতে হৃদয়ের আদর্শই বড় ছিল। আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাব সৈনিকটির হৃদয় একটু অদ্ভুত ধরনেরই ছিল। তা ছাড়া যুদ্ধে, কিংবা যুদ্ধের আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। এই সৈনিকের দলটি তখন সেমলাং-এ ছিল। সেই ব্রিজহেডকে পোক্ত করতে একদিন উড়োজাহাজে কয়েকজন ডাক্তার-নার্স, কিছু সৈন্য, অন্তত একদল এক কামানওয়ালা একদল ওয়াকি এসে পড়ল। তদের মধ্যে এই মহিলাটি ছিল। ব্রিজহেডে তাদের দেখা হল। আর দেখা হওয়ার এই আকস্মিক উত্তেজনাতেই বোধ হয় সেদিন সন্ধ্যাবিদায়ের সময়ে পরস্পরকে চুমু খেতে দেখা গেল। একটা পক্ষ, যেন আনন্দের তরঙ্গায়িত স্বপ্ন। যুদ্ধের হৈ হল্লা শোরগোলের মধ্যে তারা পরস্পরকে খুঁজে বার করত। অফিসে, অফিসারদের মেসে, তাদের দেখা হতো। সন্ধ্যায় অন্ধকার হয়ে আসা ধূলিমলিন কিন্তু স্নিগ্ধ এবং নির্জন সেমলাং-এর পথে পথে তারা ঘুরে বেড়াত। অবশেষে তাদের কাছে ধরা পড়ল প্রেমের ব্যাপারটা। আর তাতে তারা লজ্জার কিছু দেখতেও পেল না। মহিলাটির যেন কোমলতর, সদয়তর হওয়ার কিছু কারণ ছিল। সে যেন ব্রিটিশ সৈনিকটির শান্ত কটা রঙের চোখে অদ্ভুত ধরনের একটা দুঃখের ছায়া দেখতে পেত, আর সেই ছায়াটাকে মুছে দেবার জন্যই যেন সে তার মধুর চুমুগুলোকে ব্যবহার করত। তারপর হঠাৎ সেই ব্যাপারটা ঘটল। এক সকালে সৈনিকটি একটি পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়েছিল, যেন হঠাৎ আক্রমণ হলে কী ভাবে এই পাহাড়টাকে রক্ষা করা যাবে তাই চিন্তা করছে। তারপর সে ধীরে ধীরে নিজের সার্ভিস রিভলবারটা খাপ থেকে খুলে আনল, কপালে চোংটা লাগাল, ঘোড়াটাও টানল। তার দেহটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেয়ে নিচের খাদে গড়িয়ে পড়ল।

'আঃ—' বলল ম্যাকগ্ল।

সোলতান বলল, 'আর তার দুদিন পরেই জাপানিরা এসে সেমলাং দখল করল। এসব কথা আমি সেমলাং নিউশের সম্পাদকের কাছে শুনেছি আশ্চর্য এই সেমলাং-এর লোকটি। একবার জাপসৈন্য একবার মিত্রপক্ষ কপাটের মতো সেমলাং-এর উপর দিয়ে যাওয়া আসা করেছে কিন্তু আপনাদের এই সম্পাদক কারো সঙ্গে কখনও সহযোগিতা করেনি, শত্রুতাও করেনি। অথচ অন্য সবাই জলের উদ্ভিদের মতো জোয়ারের সঙ্গে ওঠাপড়া করেছে—যখন যে জোয়ারই হোক। তার কাছেই শুনেছি পাহাড়ের উপরে ব্রিটিশ সৈন্যরা এই দুর্ঘটনায় বিচলিত হল। তারা একটা তদন্ত করবে বলে মনে হল। পরে অবশ্য সৈনিকটির ঘনিষ্ঠ মহল থেকেই আন্দাজ করা হল। সে আত্মহত্যাই করেছে। কারণ তারাও তার শান্ত খয়েরি চোখ দুটিকে মাঝে মাঝে যেমন কঠিন হয়ে উঠতে দেখেছে, এখন কারো কারো মনে পড়ল, সে দৃষ্টিতে কখনও কখনও গভীর বেদনার ছাপও তেমনি তারা দেখে থাকবে। কবি ভাব ছিল সেই ক্যাপটেনের'।

ম্যাকগ্ল বলল, 'আমার মনে পড়ছে, আমরাও এ রকম একটা ঘটনা শুনেছিলাম বটে। কিন্তু তাকে জাপদের চোরাগোপ্তা লক্ষ্যভেদ বলে মনে করেছিলাম। ওদের ভালো শার্পশুটার ছিল'।

সোলতান বলল, 'অন্যায় করেননি। কারণ এর দু'একদিন পরেই জাপরা সেমলাং দখল করেছিল, আর মাসকয়েক অন্তত দখলে রেখেও ছিল'।

ম্যাকগ্ল বলল, 'হ্যাঁ, মার্চ পর্যন্ত, তারপর আমরা ল্যান্ড করি'।

আর এসবই হয়তো জাপানি মূলকাহিনী তোমাদের তাড়িয়ে মালয় তাড়িয়ে বর্মা দখল করার আগে'। জ্যাক বলল।

পিয়ের বলল, 'অদ্ভুত তো'।

বললুম, 'কিন্তু ভারতীয় মহিলাটির কী হল'?

সোলতান বলল, 'জাপরা ব্রিটিশ বা ভারতীয় সৈন্য কাউকে রেহাই দেয়নি। যুদ্ধ হয়েছিল ঘণ্টা পাঁচেক। তাতে যারা মরেছিল তারা ছাড়া আর সকলে বন্দী হল। ভারতীয় মহিলাটিকে জাপরা একটি ঝোপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করেছিল। তখন তার একটা পা মচকে এমন ফুলে গিয়েছিল যে বুট থেকে আলাদা করা যাচ্ছিল না। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাপ সৈন্যদলের সেই স্কাউট কয়েকটি এও আবিষ্কার করল, সে স্ত্রী জাতীয়। তাদের পরেও এ আবিষ্কার আরো কয়েকবার করা হয়েছিল— তারা অবশ্য জাপ অফিসার। একজন জাপ অফিসারের কোয়ার্টার্সের লাগোয়া একটি ঘরে তাকে শেষ পর্যন্ত নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। যখন অন্য অনেক পলাতক ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য-অফিসারকে প্রায় রোজই গুলি করে মারা হচ্ছিল।

পিয়ের বলল, 'স্ত্রীলোক বলে'?

সোলতান বলল, 'এ রকম একটা গল্প আছে [illegible] সম্পাদক তা সমর্থনও করেন যে জাপরা এই যোদ্ধনারীকে দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে [illegible] চেষ্টায় ছিল। কিছু ভালো ব্যবহার সম্ভবত সে পেত।'

পিয়ের বলল আবার, 'ম্যাকগ্লুদের বাহিনী যখন [illegible] পারলে তখনও কি এই মেয়েটিকে তারা উদ্ধার করেনি।

ম্যাকগ্লু বলল 'আমি কিন্তু সে রকম কথা [illegible] মনে পড়ছে না। অবশ্য বলতে পারেন সেনাবাহিনীর একাংশ যা করেছে অন্যসব অংশে সে খবর পৌঁছায় না।

সোলতান বলল, 'না জানায় আপনার [illegible] নেই। কারণ আপনারা সেখানেও [illegible] দিনই থাকতে পেরেছিলেন। আর আপনারা চলে যাওয়ার [illegible] বেশ কিছুদিনের জন্য, সেটা নো ম্যানস ল্যান্ড হয়ে ছিল। আপনারা যখন জাপাদের আক্রমণ করেছিলেন, তারা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। রাগের মাথায় বেশ কিছু যুদ্ধবন্দীকে তারা [illegible] কিন্তু কেউ কেউ পালিয়ে যেতেও পেরেছিল।

সেই যোদ্ধনারী'।

সোলতান বলল 'সে পালাতে পেরেছিল, কিন্তু মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সে যোগাযোগ করেনি কারণ সে অসুস্থ। তার দেহ অপটু মন ক্লান্ত। একটি হরিণীকে অনেকদিন বন্দী করে রাখার পর, সে যদি হঠাৎ মুক্তি পায়— প্রথমেই জান্তব প্রেরণায় সে খানিকটা দৌড়ে যাবে। তারপর অবসন্ন বোধ করবে, বিশেষ করে সে যদি বন্ধনদশায় রুগ্ন হয়েও থাকে। তখন যদি সে দলের দেখাও পায়, সেই দৌড়ে পালানো দলের সঙ্গে না গিয়ে, বরং যে কোনো ঝোপের আড়ালে ক্লান্ত ভঙ্গিতেই বসে পড়বে। আমাদের এই মেয়েটির অবস্থাও তেমনি হয়েছিল। আর, বিশ্রামে তার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সে তখন বুঝতে পেরেছিল যে সে গর্ভবতী। আর তখন তার মনের অবস্থা কী রকম ছিল? বোধ হয় মেয়েরাই বলতে পারে— যদি আদৌ বলা সম্ভব হয়। সেমনাং এর বাইরেই তখন বন্য গ্রাম ছিল— এখন অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। সেই বনে সে কিছুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাটাল। সেই বনে কত অনুশোচনাতেই না তার মুখ কালো হয়ে উঠত, চোখের মণি বাষ্পের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ত। কোথায় স্বদেশ- আর কোথায় সে? কোথায় বাপ ভাই আত্মীয়স্বজন আর কোথায় সে? নিজের জীবনের শেষ পাঁচ বছরের কাজগুলোর জন্য কত অনুতাপই না সে করে থাকবে। কারণ এই শেষ পাঁচ বছরেই তো সে নিজের মত নিয়ে চলার চেষ্টা করেছে, বাপ মায়ের উপদেশের গণ্ডির বাইরে এসে। কী

অবিমৃশ্যকারিতা— এই ভাবতে গিয়ে তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

'অন্য কখনও তার মনে পড়ত সেই সৈনিকটির কথা যে আত্মহত্যা করেছিল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত এক কবি মন ছিল না তার?

'আত্মহত্যার কথাও মনে হতো। গাছের পাতাগুলো যখন ঝরে পড়ত, তখন তাদের মতো ঝরে পড়ার। ম্লান হতে হতে চাঁদ যখন মুছে যেত দিগন্তে, তার মনেও তখন মুছে যাওয়ার ইচ্ছা দেখা দিত। কী হবে এরপরে বেঁচে থেকে আর'?

তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। সমুদ্রের জলে আমাদের ইয়াটের ছায়া যেমন পড়েছে, ইয়াটের পালের ছায়াও তেমনি পড়েছে আমাদের চন্দ্রাতপের নিচের আড্ডার গায়ে। তাতেই বোধ হয় আড্ডাটাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সমুদ্রের জলের রং বদলাচ্ছে এখন। কিছুক্ষণ পরে কালো হয়ে উঠবে।

পিয়ের বলল, 'এমনিই ঘটে। জীবন-গল্পটার শেষ পংক্তিগুলো গল্পের গোড়ার কথাগুলোর উপরে নির্ভর করে না'।

ম্যাকগ্লু কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল।

সোলতান বলল, 'একদিন কিন্তু মেয়েটি সেমলাং-এ ফিরে এল। তখন সেই অরাজক অবস্থাটাই চলছে। কেউ কারো দিকে নজর দিচ্ছে না। অনেক উদ্বাস্তু এসেছে আবো উত্তরের শহর থেকে। সে সেই উদ্বাস্তুর দলে মিশে গেল। বেঁচে থাকাটাই হঠাৎ যেন দবকারেব হয়ে পড়ল তার। কারণ হঠাৎ তার মনে এসেছিল কথাটা— সে হয়তো সেই কবি-সৈনিককেই বহন করছে। সেই ব্রিটিশ সহপাঠী যে কবি হতো হয়তো: অথবা কবির কী জাতি! হয়তো কেন— তাই কি হওয়া উচিত নয়'?

'সে যাই হোক, উদ্বাস্তুদের দলে সে মিশে গেল। ভাষার এবং আচার ব্যবহারের অসুবিধাগুলোকে ঢাকবার জন্য সে কী করেছিল, কী পরিচয় দিয়েছিল নিজের, তা জানা যায় না। সেমলাং নিউজের সম্পাদক অন্য অনেক উদ্বাস্তুকে সাহায্য করেছিল— তাকেও করল।'

সোলতান এতক্ষণে একটা সিগারেট ধবাল।

ইন্দব বলল, 'তারপব'?

পিয়ের বলল, 'গল্পটাকে এখানেই শেষ কবে দেওয়া যেতে পারে। দুঃখের মধ্যেও একটা প্রেম সার্থক হয়ে উঠবে এমন ইঙ্গিত আছে। আর সেদিক দিয়ে এমন সত্যিকাবের পরিণতি আমি শুনিনি। কবি সৈনিক নিজের আত্মহত্যার মধ্যে কি এই আকুতিই জানায়নি যে সেই জীবন তার দুর্বহ হয়েছে পৃথিবীর এই সৌন্দর্যের পাশে? আর সে আকুতির অন্যদিক কি এই নয়, যে, সে নতুন হয়ে উঠতে চেয়েছিল? তা সে হচ্ছে তার বন্ধুর গর্ভে।

সোলতান বলল, 'কী হল তা কি আমরা জানি'?

'জানার কথাও নয়'। কেউ বলল।

সোলতান বলল, 'যোদ্ধৃনারী স্থির করেছিল— সেই মুহূর্তেই সে দেখবে, তীব্র বেদনায় তার সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ হলেও, সে কিছুতেই মুহ্যমান হবে না। স্থির দৃষ্টিতে চোখের রং, ঠোঁটের গড়ন সবকিছুই সে পরীক্ষা করে দেখবে, যাচাই করে নেবে। সেই দু'এক মুহূর্তেই তাকে একটা কিছু বাছাই করে নিতে হবে'।

'সে কি নিঃসন্দেহ ছিল না'? জিজ্ঞাসা করলুম।

সোলতান বলল, 'তা কি সম্ভব ছিল বন্দিনীর'?

'তারপর'। ম্যাকগ্লু গল্পকে তাগিদ দিল।

'সেই মুহূর্তে পারেনি—এ তো বোঝাই যাচ্ছে। তারপরেও এই পনেবো-ষোল বছর ধরে যে ছেলেকে সে মানুষ করে তুলেছে— তাকে দেখে দেখেও কি তার সন্দেহ দূর হয়েছে সব? তার মন কি শান্ত হতে পেরেছে? কারণ হিসাবে বলা যায় তার সন্তানের চোখ, মুখ, ঠোঁট গায়ের রং, চুলের রং এসবই তার

নিজের মতো। অন্যপক্ষ, সে যে হোক, তার কিছুমাত্র ছাপ পড়েনি। হয়তো-বা গায়ের রং তুলনায় ফর্সা। আর বাহ্যদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, যে যখন তার সবজেটে রঙের ঢিলেঢালা গাউন পরে, কপালের ওপর থেকে টেনে তোলার কায়দায় চুল বেঁধে তার হোটেলের টেবলের সম্মুখে বসে থাকে, তখন তাকে স্থির শান্তই দেখায়। হয়তো তার ঠোঁট দুটিতে কিছু বিষণ্ণতা থাকে। প্রথম প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়ায় সে কিছু মোটা হয়ে পড়েছে, গায়ের রং মাখনের মতো দেখায় এখন, এদেশের উত্তাপে জ্বরে। শান্ত এবং সুন্দর দেখায় তাকে। কিন্তু তার মনে কি শান্তি এসেছে'?

ইয়াটে আলো জ্বলেছে।

অনেকটা সময় আমরা চুপ করে রইলুম।

অবশেষে পিয়ের বলল, 'এটা প্রেমের সার্থক হয়ে ওঠার গল্পই হোক ; কিংবা তত্ত্বের দিক দিয়ে এ-ও হতে পারে— মাতৃস্নেহ পিতৃত্বের কৌলীন্যের উপরে নির্ভর করে না ; কিন্তু, সোলতান, আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি। যদি তুমি গল্পটা আমাকে আমার কাগজে লিখবার অনুমতি দাও, আমি তোমাকে একশোটা টাকা দিতে রাজি আছি'।

সোলতানের ঠোঁটে একটা হাসি দেখা দেবে মনে হল। কিন্তু তার চোখ দুটি যেন সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ম্লান হয়ে রইল।

সাপার শেষ হয়েছে। ভালোই আয়োজন করেছিল স্টুয়ার্ড। সমুদ্রের জল কালো, কারণ চাঁদ ওঠেনি। হঠাৎ এমন সময়ে মনে হল বাঁ দিকে কিছুদূরে কতগুলি আলো নাচছে। ওগুলি তাহলে কুয়ালার জেটির আলো!

হঠাৎ মনটা কুয়ালার আলোর দিকে গিয়েছিল। এ রকম অবস্থায় যা হয়, চমকানিটা লাগবার আগে কী ভাবছিলাম তাই খুঁজল যেন মন।

পাশের দিক থেকে সোলতান এসে বলল, 'কুয়ালার আলো'। এই বলে সে চলে গেল। বোধ হয় সারেং আর তার ছোকরাদের সঙ্গে গল্প করতে। কুয়ালার আলো দেখবার আগে যা ভাবছিলাম, তা খুঁজে পেলাম। বলবার মতো কিছু নয়। আনমনে যে কল্পনা করা হয় তা স্বপ্নের মতো অবাস্তব হয়ে পড়ে, কিন্তু তা স্বপ্নের মতোই গভীরভাবে মনকে প্রভাবিত করতে পারে। সোলতান যে হোটেলে থাকে তার মালিক সেই ম্লান রূপবতী প্রৌঢ়া হোটেলওয়ালি, আর সোলতানকে কল্পনায় যুক্ত করেছিলুম। এ কল্পনাকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করানোর কী-ই বা আছে! সোলতান, বোধ হয়, মালয়ের সব প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককেই মা বলে ডেকে থাকে। যদিও এ যুক্তি আছে যে সোলতানকে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবকের মতো দেখালেও ম্যাকগ্লুদের সেই ব্যর্থ ব্রিজহেড অভিযানের পরেই তার জন্ম হয়ে থাকতে পারে।

কুয়ালার আলোগুলি আরো বড় দেখাচ্ছে। যথাসময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছাব। অস্পষ্ট আলোতে দু'একজন সেদিকে মুখ করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে সোলতানও আছে। অবশ্য এটা আমার কল্পনাই হতে পারে যে তার ভঙ্গিটাকেও স্তব্ধ দেখলুম।

একটি মহিলা যে স্বদেশ থেকে অনেক দূরে, যার মনের সন্দেহ এখনও দূর হয়নি, কোনোদিনই হবে না, তার কথাই মনে হল। আর সোলতান— সে কি এক দ্বিধার ম্লান অবসাদ তার হৃদ্‌পিণ্ডে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে?

একটি বিপ্লবের মৃত্যু

ভূমিকা : কোনো কোনো ঘটনা এমনভাবে ঘটে যে গল্পের চাইতে বিস্ময়কর না হয়ে বরং ঠিক গল্পের মতোই হয়ে থাকে। যেমন এই ঘটনাটি যা আমি আমার পুলিশ বন্ধু অভিলাষ দত্তর কাছে শুনেছিলাম। পুলিশের গল্প, সুতরাং কিছু পরিমাণে গ্রাম্যতা দুষ্ট আর আমার সন্দেহ আছে, যাকে সে নিজের বাহাদুরি বলে বোঝাতে চেয়েছিল সেটা আসলে তা ছিল না, এমনকী তার সৌভাগ্যের প্রমাণও নয়। স্ত্রীকে খুন করে সাধুচরণ পনেরো বছর বনে লুকিয়ে থেকে অবশেষে ধরা পড়েছিল শশী নামক আর একটি মেয়ের মৃতদেহ থানায় পৌঁছে দেয়ার সৌজন্য দেখাতে গিয়ে এ ঘটনার যে অর্থই করা যাক, যে গল্পটা সে বলতে চাইছিল তার পক্ষে তা অবান্তর।

মাইলের পর মাইল বিস্তৃত জল। কোথাও হাঁটু ডোবে না, কোথাও বা মৈনাক তলিয়ে যেতে পারে। কোথাও বা ভাসমান অরণ্যের মতো দাম জমেছে যার উপরে মানুষ অনায়াসে চলতে পারে, কোথাও বা কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল। তীরে কোথাও ঘন হাতিঘাসের বন, অন্য কোথাও যাকে তীর বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা হাতি তলিয়ে যাবে এমন দলদলে কাদা। আর এই বিলকে জীবন্ত কিছু বলে মনে হতো। তীরে তীরে গাছের পাতা কাঁপছে, জল সর সর করছে, দামগুলো নড়েচড়ে জায়গা বদলাচ্ছে, শালুক শাপলা পদ্মের বনে বাতাস ছাড়াও অন্য কিছু নড়ছে চড়ছে। এসবের জন্যও বটে, কিন্তু এসব থেকেই জীবন্ত বলা হচ্ছে না, কিংবা ডাহুক আর সাইপের যাওয়া আসা, বুনো হাঁস আর পানকৌড়ির পাখা ঝাড়া থেকে মাত্রই নয়, বিলের যেন সাড় কারণ দামের আড়ালে কোথাও দ্বীপ তৈরি হচ্ছে, কোথাও অনেকদিনের পুরনো মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধসে পড়ে। তারপরে রক্তারক্তি দাঙ্গা, হাকিম পুলিশ, কোর্ট কাছারির মাধ্যমে সেই দ্বীপ সভ্যজগতের আওতায় এসে যায়। কিন্তু এটাই সব নয়—এমন অনেক জায়গা আছে এই বিলের পারে যেখানে অরণ্যকে আদিম বলে মনে হবে। সেখানে তীরের মাটি উঁচুনিচু, বোধ হয় বিল যখন নদী ছিল তখনকার ভূমিক্ষয়ের ফলে, আর সেই অনতিসমতল মাটিতে গভীর বন। সেখানে জলের ধারে বুনো মোষরা দল বেঁধে চলে, শুয়োর চিতায় সম্মুখ সংগ্রাম হয়ে যায়, কখনও কোনো দুঃসাহসিক শিকারি দু চার বছরে একবার, শিকার করতে আসে।

বনের এ রকম এক অংশ ফৌত হয়ে যাওয়া একটা গ্রামের আভাস দেন। অনেক আশা নিয়ে যারা এসেছিল তারা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয় কিন্তু। যুদ্ধের সময়ে থারটিফু আর্মির মুভমেন্ট কন্ট্রোল হেড কোয়াটার্স বসেছিল এখানে। সিমেন্টের একটা আস্তর মেঝের উপরে বিছিয়ে তারা ঘর তুলেছিল, নলখাগড়া আর বাঁশের বেড়ার উপরে সিমেন্ট দিয়ে কংক্রিটের চেহারা দিয়েছিল। এখন সিমেন্ট কোথাও আছে সেখানে দেয়ালের সাদা গায়ে শ্যাওলা জমেছে হলুদে সবুজ রঙের। কিন্তু ঘরগুলো বনে ডুবে যাচ্ছে। বুনো ঘাস উঠেছে বুক সমান উঁচু হয়ে। দেয়াল বেয়ে, দেয়ালের ফাটলের মধ্যে দিয়ে, দেয়াল আর ছাদের ফাঁক গলিয়ে কচুর পাতার মতো পাতাওয়ালা একরকম লতা ক্রমশ সবুজ একটা আবরণ দিয়ে ঘরগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে। অনেক ঘরের চাল ঘরের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। মেঝের ফাটলে আশশেওড়া, আর ভাঁটের ঝোপ জন্মেছে ঘরের মধ্যে। ঘরগুলোর অবস্থানই যেন বনকে গভীরতর করেছে নির্জনতার দিক দিয়ে।

এই ঘরগুলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সে বসেছিল। ঘড়ি নেই, কাজেই সময়ের কোনো আন্দাজ নেই। গাছের ফাঁকে আজ রোদও আসছে না।

তার নাম ছিল হিরণ্ময়, কিন্তু তাকে দেখে এখন তা মনে হয় না। গায়ে বোতামখোলা একটা শার্ট, ছেঁড়া নয়, অত্যন্ত ময়লা। জট-পাকানো রুক্ষ চুল কপালের উপর এসে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে মুখটা নোংরা। মুখের ত্বক যেটুকু দেখা যাচ্ছে এবং কপালের সবটুকু ন্যাবার মতো হলুদ। ময়লাও বটে। বেশ কয়েকদিন স্নান হয়নি। হিং-এর মতো একটু কটু গন্ধ তার জামাকাপড় থেকে উঠছে। গায়ে পুরনো ঘা থাকলে যেমন হয় তেমন একটা গন্ধও আসছে মাঝে মাঝে। তা সত্ত্বেও মুখে একটা কোমলতা আছে। কারণ তার বয়সই কুড়ির কোমল বেখা পার হয়নি এখনও। তার কাঁধে একটা ঝোলা। হাতের কাছে একটা লাঠি। তার বাঁ পায়ের পাতা থেকে গিরে পর্যন্ত ময়লা ব্যান্ডেজে জড়ানো ডান পায়ে জুতোটা সৌখিন।

তার ডানদিকে একটা ছোট ভাঁটের ঝোপ। বাঁদিকে ঝড়ে আধ-ভাঙা একটা পিটুলি গাছ। গাছটাব মাথায় একরকমেব স্বাস্থ্যহীন বেগুনি রঙের ফুল। ঝোপ আর গাছটার মধ্যে হোগলা জাতীয় বড় ঘাসগুলো যেন তার চলাফেবাতেই ভেঙে ভেঙে গিয়েছে। একটা গুবরেপোকা তাব পায়েব কাছে মাটি খুঁড়ছে। চিক্ চিক্ করে ডেকে একটা পাখি উড়ে গিয়ে তাব দিকেই মুখ কবে বসল—সামনেব বনকাঁঠালের ডালটায়। বোধ হয় ভাঁটের ঝোপটায় ঝিঁঝি ডাকছে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই মনে হচ্ছে অনেক দূরে।

গত কয়েকটি দিনের কথা আবার মনে এল তার। কোন পথ দিয়ে সে এই বনে ঢুকে পড়েছে তা এখন আর বলা যাচ্ছে না। যেন বন ফাঁকা পথ কবে দিয়েছিল, তারপব সেই ফাঁকটা জোড়া লেগে গিয়েছে। এই উপমাব কথা এই, হিরণ্ময় ভাবল, তাব পায়ের অবস্থা এমন বলেই তার পক্ষে এই বনের সবকিছু জেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এখন খুব খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে, ক্লান্তও বোধ হচ্ছে। জ্বরটাও এসে গিয়েছে হয়তো। এই জ্বরটা অদ্ভুত; দু-চারদিন খুব বেশি হল, দু-চারদিন একেবারেই নেই মনে হয়। কয়েকদিন পবে গতকাল খুব কম ছিল। কয়েকদিন এমন চলবে। তারপব ছেড়ে যাবে। কিন্তু সত্যি কি ছেড়ে যায়? হয়তো প্রতিদিন যে মৃদু জ্বরটা আসে তা এখন আর বুঝতে পারে না সে। ক্ষুধা, ক্লান্তি, স্নায়ুব উপরে চাপ, এসবের মধ্যে মৃদু জ্বরটা নিজের প্রভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না হয়তো।

কাল সে রান্না করেনি। তার আগের দিন, কিংবা তারও আগে অন্য একদিন যা ঠিক মনে পড়ছে না তার, বিলের ধারে একটা গাছতলায় প্যানে খানিকটা চাল ফুটিয়ে নিয়েছিল সে। চালের সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা শুঁটকি মাছও সিদ্ধ কবে নিয়েছিল। কিন্তু খেতে বসতে গিয়ে চমকে উঠেছিল সে। প্যানের সিদ্ধ চালগুলোই বরং যেন তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল, সবৎসা হরিণী দেখলেও এমন চমকে উঠতে তুমি। আসলে সেটা তার ক্ষুধাকাতব মনেব কথা যা ক্ষুধাকেই অন্য সবকিছুর বেশি মূল্য দিচ্ছিল। হরিণী দেখে চমকে ওঠার পরে আনন্দ হয়, মন শান্ত হয়। এক্ষেত্রে খেতে খেতেই তাকে উঠে পড়তে হয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে জ্বলন্ত একটা শলা পায়ে বিঁধে শিরদাঁড়া দিয়ে তার বেদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে নতুন একটা হাড় যেন ভেঙে যাচ্ছে। চোখে জল, দাঁতে দাঁত চেপে বলতে গিয়ে কশ বেয়ে লালা পড়ছে, বেদনাব জন্যই দু-পা চলে হাঁপাচ্ছিল, আর থামছিল। তাহলে এ বনেও মানুষ আছে! মানুষ! মানুষ! যেন ও শব্দটার অর্থ একটা নৈর্ব্যক্তিক অনির্ধারিত আতঙ্ক যা থেকে সে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল।

হায় ব্যর্থতা! সব বনই যেন টিসু কাগজের মতো পাতলা। কিংবা কী অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখো এ যেন মানুষের আশার মতোই ব্যাপার। ঠিক যখন আশাকে গভীরতম বলে বোধ হয়েছিল তখনই

তার ধারা শুকিয়ে উঠেছে। ঠিক ওদিকটাতেই বনকে আদিমতম ভাবা গিয়েছিল। এদিকেই সে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু তা যেন বনের ছবি আঁকা একটা পর্দা যার ওপারে লোকালয়।

ব্যাপারটা হঠাৎ চোখে পড়ল। একটা খরগোশের মৃতদেহ। এতক্ষণ নিজের মনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলেই সে দেখতে পায়নি, নতুবা পচা মাংসের গন্ধটা অন্তত আসত। পশমগুলো ইতিমধ্যে থোবা থোবা তুলোর মতো হয়ে ঘাসের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে, গলিত মাংসের তরলতার উপরে ভাসছে যেন।

ঠোঁটটা শুকিয়ে উঠছে। পিপাসা পেয়েছে আবার।

জ্বরটা তাহলে আবার আজ বেশি হবে? দু-হাত তুলে সে কপালে রাখল। অপরিসীম ক্লান্তিতে তার ফুসফুসটা হাঁপাচ্ছে।

(ঘরগুলো থেকে পালানোর জন্য ছটফট করতে করতে সে কিছুদূর পিছিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপর একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছিল। ঘবগুলোর দিকে মুখ ক'রে। অনেকক্ষণ ধরে বসে থেকে সে বুঝতে পেরেছিল—ঘরগুলি পরিত্যক্ত। তখন তাব মুখে একটা হাসি ফুটেছিল। আশ্রয়? কিন্তু ছলনাও তো হতে পারে।

বোঝা উচিত ছিল, বোঝা উচিত ছিল। এই বনে একটা অতীতের ঘরে শুকনো খড় পুরু করে বিছানো থাকে না যদি না মানুষ থাকে সেখানে। অনেকক্ষণ সে বসেছিল সেই অন্ধকারে। কী আশ্চর্য মাথার উপরে ছাদও আছে। অবশেষে ক্লান্তিতে, জ্বরের ঘোরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। দরজাব ফাঁকটার কাছে অন্ধকার ঘরেব ভিতরের চাইতে হালকা। আর সেই হালকা অন্ধকার যেন কার যাওয়া আসায় নড়ছে। মানুষ? মানুষ। কী করবে, কী করতে পারে সে? তাব ভাবা উচিত ছিল। শরীব দুর্বল হযেছে, কিন্তু মাথাব কী হল? উঠে দাঁড়াতে সে পাবে, কিন্তু রুগ্ন পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে সে একটা শিশুরও সমকক্ষ নয়। এক যুদ্ধটা যদি জানু পেতে বসে করা যায় হয়তো তার বলশালী বাহুদুটোয় রোগ এবং অনাহার কিছু অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে কি না বুঝতে পারে।

যে এসেছিল সে হয়তো তার মতোই বুদ্ধিহীন তখন, কিংবা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে বিছানো খড়গুলোব উপবে বসল, তাবপর শুয়েও পড়ল। ঠিক তখনই হাঁটু দুটোর উপরে ভব রেখে উঠে বসেছিল হিরণ্ময়। অন্ধকারে ঠাহর করে প্রতিপক্ষের উপবে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথম পেষণেই তার শ্বাসরোধ করে দেয়ার জন্য কঠিন মুষ্টিতে চেপে ধরেছিল তাকে। কিন্তু প্রায় তখন তখনই ছেড়েও দিতে হল।

প্রতিপক্ষ স্ত্রীলোক। তা শুধু হাতের তলায় মাংসের কোমলতায় বোঝা যায়নি। হিরণ্ময় নিষ্ঠুর গলায় যখন গর্জন করে উঠেছিল—কে তুমি, কে? সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল—আমি শশী)।

খরগোশের মৃতদেহটার উপরেই আবার চোখ পড়ল হিবণ্ময়ের। গুবরেপোকাব মতো একটি পোকাকে যেন দেখা যাচ্ছে, এ পোকার কথা জানে হিরণ্ময়। প্রকৃতির মুদ্দফরাশ। মৃতদেহটার চারিদিক থেকে এবং তলা থেকেও মাটি সরিয়ে দিয়ে মৃতদেহটার যা অবশিষ্ট আছে তাকে মাটির নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। কবর হবে জানোয়ারটার। কলেজের পড়া ইংবেজিতে ওদের সেক্স্টন বিট্‌ল্ বলা হয়।

কিন্তু পায়ের ব্যথাটাও আজ বেড়েছে যেন। পায়ের ব্যথা—

(প্রত্যুৎপন্নমতি বলে নাম আছে হিরণ্ময়ের, অন্তত নিজের দলে। এটা বোধ হয় তারই ফল যে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল : যেমন আছো তেমনি থাকো। উঠবার চেষ্টা করলে সর্বনাশ হবে। পাশাপাশি দু-হাত তফাতে দুটো মানুষের ভয় বিমূঢ় বিচলিত আবেগের নিঃশ্বাস পড়ছে। থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে। সে বলেছিল : আমাব হাতের জোর খানিকটা বুঝলে। আমার সঙ্গে

দৌড়ে হরিণও পারে না। আমাকে ডিঙিয়ে পালানোর চেষ্টা না করলেই আমি খুশি হব। আমার কাছে বোমা আছে, রিভলবারও আছে।

কিন্তু হিরণ্ময় কাল জানতে পেরেছে, প্রমাণ পেয়েছে বুদ্ধি যে নিয়মে চলে শরীরটা সে নিয়মে চলে না। শরীরের নিজের নিয়ম আছে। নতুবা কী করে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল? ক্লান্তি, অবসন্নতা, জ্বরের উত্তাপ, বিপদের আশঙ্কা, অর্ধচেতন কামনার উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা অবসাদ। সকাল যখন হচ্ছে তখন ঘুম ভাঙার পরও কিছুক্ষণ সে আলসেমি করে শুয়েছিল। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল। ওদিকে শশী জেগেছিল। কিন্তু ভয়ই তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে থাকবে। কিংবা তেমন করে চোখ দুটো আধখোলা রেখেই কি শশী ঘুমোয়?)

পায়ের দিকে চোখ পড়ল তার। মনে হল সে বলবে—হায় হতভাগ্য! পায়ের এই ব্যাপারটার জন্য একটা ডাক্তারি পরীক্ষা কিংবা একটা অপারেশন দরকাব ছিল। তার অন্য দিকটা এই হাসপাতালে দু-চার সপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকা। হাসপাতালে দিন দশেক ছিল সে। ডাক্তাররা তার জ্বরের চিকিৎসা করেছিল। পায়ের ব্যান্ডেজ খুলে তারা বুঝেছিল পায়ের চিকিৎসা দরকার। উপরন্তু বুকে যন্ত্র বসিয়ে তারা অন্য কিছু শুনে থাকবে। কাজেই তারা বুকের এবং পায়ের এক্সরে ছবি নিয়েছিল। যত্নের জন্য হোক, বিশ্রামের জন্য হোক, কিংবা ওষুধেব ফলে জ্বরটা খুব কম হচ্ছিল তার। তারপর সেই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করল যেদিন তাকে দোতলার এক্সরে ঘর থেকে নামিয়ে আনল ফটো তোলাব পরে তখন থেকেই শুরু। তখন দুপুর। এ সময়ে কাতরানি যেন কমে যায় রোগীদের। আইডোফর্মের গন্ধের মধ্যে দিয়ে একটা স্তব্ধতা আসতে থাকে হাসপাতালেব ময়লা হলুদ রঙের দেয়ালের মধ্যে। দরজা দিয়ে সে অ্যান্টিরুমে একজন নার্সকে দেখতে পেয়েছিল। হাত দিয়ে ইশারা করে ডেকেছিল তাকে। সে কাছে এলে বলেছিল—বসুন একটু, আমার ভয় করছে—ভয়, কেন ভয়? নার্স দেয়ালে টাঙানো চার্টটা পড়ল। ভয়ের কিছু নেই—বলল সে—বুকে কিছু পেয়েছে?—কিছু নয় তেমন।—পায়ে? একটা হাড় ভেঙে আছে।—ও। এইভাবেই শুরু। তার পরদিনও সে তেমন সময়ে ইশারা করে ডেকেছিল সেই নার্সকেই। কী? পায়েব ব্যথার কথাই। পরপর তিন-চারদিন রোজই ঠিক এক সময়ে সে ডাকত নার্সটিকে। কিন্তু তারপরের দুপুরে হঠাৎ যখন তাকে দেখা গেল না তখন রোগশয্যায় সে অস্থির হয়ে উঠল। সে অস্থিরতাকে ভাষায় রূপ দেয়া যায় না। বিকেলের রাউন্ড দিতে এসে ডাক্তার বলেছিল, কী হয়েছে আপনার?—কেন, কী করেছি, কী বলেছি? এই বলে সে যেন কঠিন হয়ে গিয়েছিল, সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। সে রকমটা হওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহলে তার সে অস্থিরতা কাল্পনিক নয়, অন্যের চোখে তা ধবা পড়েছিল যদিও তার উৎপত্তি কল্পনা থেকে। সেই ভালো, সে সতর্ক হয়ে থাকবে। পায়ের ভাঙা হাড়টা ওরা অপারেশন করে বার করে দিক। ততদিন পর্যন্ত সে অন্ধ সৌভাগ্যেব উপরে নির্ভব করে থাকবে। জাহাজে যাত্রী ওঠার ব্যাপারে অত কড়াকড়ি, নাবিক খালসিদের সাফসুতরো করার ব্যাপারে অত পরিপাটি যত্ন, তা সত্ত্বেও কখনও কখনও কেউ কেউ লুকিয়ে বেশ কিছুদূর যেতে পারে ধরা না পড়ে। এই হাসপাতালকেও তেমন একটা জাহাজ বলে কল্পনা করা যায়। তার পায়ের ভাঙা অকেজো হাড়টাকে অপারেশন করে ওরা বার করে দিক। ততদিন পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না তাকে। রাত তখন দশটা হবে। ঘুম আসছিল না। মৃদু আলো জ্বলছে হাসপাতালের সেই ঘরে। দু-একজন রোগী কষ্টের তন্দ্রায় এপাশ-ওপাশ করছে। আর সবই যেন নিঃসাড়, অ্যান্টিরুমের অস্পষ্ট আলোর দিকে চেয়ে শুয়েছিল হিরণ্ময়। হঠাৎ সেই নার্সটিকে আবার সে দেখতে পেয়েছিল। ডাকবে না, ডাকবে না ভাবতে ভাবতে সে হাতের ইশারায় ডেকেছিল তাকে। দিনের বেলায় যেমন—রাত দশটাতেও তেমন রোজই সে ডাকতে লাগল সেই নার্সকে—একদিন দুদিন চারদিন। কী অসুবিধা হচ্ছে?—কিছু না। নার্স বসতো। এ রকম সময়ে একদিন তার মনে হয়েছিল—সে বলবে তাকে নিজের কথা।

হিরণ্ময় সামনের দিকে তাকাল।

প্রত্যুৎপন্নমতি বলে তার প্রশংসা আছে। হাসপাতাল থেকে সে পালিয়েছে শেষ রক্ষা করার তাগিদে।

জ্বরটা এসেই গিয়েছে। আর, বুকে যেন চাপ লাগছে আবার। তার পা ঠোঁট দুখানা যেন জ্বরেব শীতে কেঁপে উঠল—আজ সকলে ব্যান্ডেজের তলা দিয়ে সবুজ রঙের পুঁজ গড়িয়ে পড়তে দেখেছে সে। হায়রে, হরিণের মতো দৌড়নো।

কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে এখন। অকেজো পা-টাকে মাটিতে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে চলার চেষ্টা করে সে বরং নিজেকে ক্লান্ত করেছে। হামাগুড়ি দিয়ে চলা বরং ভালো। তা ছাড়া ওভাবে ভাঙা পায়ের সহ্যশক্তিতে বাড়িয়ে নেওয়া যায় না। উপরন্তু ভাবতে গিয়েই বেশ কিছুটা দেরি করে ফেলেছে।

(কালও সে ভেবেছিল যেন। সকাল হল, ঘরে আলো এল। শশী ঘর-বার করল তার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। একবার এসে শশী হিরণ্ময়ের ঝোলাটাকে হাতে নিল। শশী যেন অবাক হয়ে দেখছে আর আবিষ্কার করছে—চাল আছে? এটা কাগজে জড়ানো। মাছ? আশ্চর্য! নুন? দেশলাই। এরপরে শশী আবার বেরিয়ে গিয়েছিল ঝোলা রেখে। সে বোতল করে জল নিয়ে ফিরল। আবার বেরিয়ে গিয়ে কিছু ডালপালা নিয়ে এসেছিল। এরপরে শশী রান্না করেছিল তিনটে কাঁচা ডাল মাটিতে পুঁতে। তার উপরে হিরণ্ময়ের প্যান বসিয়ে হিরণ্ময়েব কায়দায়। এ অবস্থায় সকলেই তাহলে ওভাবেই রান্না কবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়টা একটু আশ্চর্য না হয়ে হিরণ্ময় সেই খড়গুলোর উপরে পড়েছিল। তাব ঘুম পাচ্ছিল যেন। হয়তো শশীও ভেবেছিলে সে ঘুমচ্ছে। আর সে চিন্তা করেছিল, এটা শশীর ঘরই যদি হয় তবে তাব রান্নার উপকরণই-বা কোথায়? কী মূল্যবান চিন্তা! আব তারই ফলে দুপুব পর্যন্ত দেবি হযে গেল। তাবপর হঠাৎ ভযংকর ঝড় বৃষ্টি শুরু হল)।

ঘাসগুলো এখনও ভিজে আছে।

ওরা বলেছিল—আশ্চর্য, এর আগে বুকে কখনও ব্যথা টেব পাননি? স্কিয়াগ্রামে দেখা গিয়েছে, এখনও সবটুকু সারেনি। প্লুরিসি হয়েছিল।

উঃ কী ব্যথা কবছে পায়ে—এর আগে যেন কোনোদিনই করেনি এমন। চলতেও সে আর পারবে না। জ্বরটা এতক্ষণে বেশ এসে গিয়েছে।

তুলনাটা হঠাৎ মনে পড়ল। ওই খরগোশটা, ওই খরগোশটাব মতোই তাবও সমাপ্তিটা হবে এ বনে। হিরণ্ময়ের বুকটা ওঠাপড়া করতে লাগল।

খানিকটা দূর সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। পা-টা কী বিশ্রীভাবে ফুলেছে। গোড়া থেকে হামা টেনে চললে এমন হতো না। সে হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে আকাশের দিকে তাকাল—খরগোশটাব দিকে সে আর চাইবে না।

এ কী? আবার বৃষ্টি হবে নাকি? শ্লেটের মতো রং হয়েছে আকাশের। ঝড়ও হতে পাবে। ঝড়ে কি ডালপালা ভেঙে পড়ে না বনের! প্লুরিসি এখনও সাবেনি। হাসপাতাল থেকে পালানোর দিনও ডাক্তাররা তাকে ইনজেক্‌শন্‌ দিয়েছে। খবগোশটার মৃতদেহটার দিকেই আবার চোখ পড়ল। ঠোঁট কামড়ে ধরল হিরণ্ময়। শশী এতক্ষণে তাদের পাড়াব কত লোককে খবর দিয়েছে কে জানে?

ঝোলাটাকে কাঁধে দীর্ঘ পথ চলার মতো করে নিল, লাঠিটাকে টানতে টানতে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। কিছু সে বলতে বাকি রাখেনি শশীকে। তাকে ভয় দেখাতে গিয়ে নিজের স্বরূপই সে উদ্‌ঘাটন করেছে। কিন্তু এমন তীব্রভাবে আসছে কেন জ্বরটা! ধনুষ্টংকার জাতীয় কিছু হবে। অপারেশনের ঘা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। হাঁপাতে লাগল সে। অনেক দূর এসে পড়েছে ঘরগুলো থেকে, সুতরাং মানুষ থেকেও। হঠাৎ দু-চোখ ভরে জল এল তার। দূরে, অনেক দূরে একটা পাখি

ডাকছে, পিপ্ পিপ্ কক্ কক্। আর পারি না, আর পারি না। একটু বিশ্রাম করে নেব। হ্যাঁ, তারপরে নিশ্চয় চলব আবার। ঘাসের উপরেই শুয়ে পড়ল সে।

খানিকটা অবান্তর হলেও শশীর সম্বন্ধেও দু'একটা কথা বলতে হবে এখানে।

বনে আসার তারও একসপ্তাহ হল। গুনাইগাছা গ্রামের মাখন গোয়ালের বউ সে। গ্রামে সংবাদটা পুলিসই রটিয়েছিল। অপরাধটা নাকি অস্বাভাবিক। মাখনের আগের পক্ষের ছেলেটা যদি বেঁচেও ওঠে, হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু কতদূরই-বা যেতে পারে শশী? কোলে একটা ছ-সাত মাসের ছেলে। অন্যদিকে, সাতাশ-আটাশ বছরের একটি স্ত্রীলোক। স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহ, গায়ের রংটা তামাটের চাইতে উজ্জ্বল। নাকটা ওরই মধ্যে খানিকটা টিকোলো। নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও তার চারিদিকের মানুষের মধ্যে যে চঞ্চলতা দেখা দেবে তা থেকেই অবশেষে সে ধরা পড়বে। বাপের বাড়ি চুয়োডাঙায়, সে ইংরেজি স্কুলের পাঁচ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল, সেলাই করে নকশা তুলতে জানে—এসব আর কতটুকু ভরসার বিষয় হতে পারে?

এ রকম যখন আলাপ-আলোচনা হচ্ছে গ্রামে, শশী তখন বিলের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক নিবিড় বনে ঢুকে পড়েছিল, কিংবা বন বাঁচিয়ে যে পথ সেটা তার জানা ছিল না বলে পথের উপরেই বনটা নিবিড় হয়ে উঠল। কোলে ছেলে, পিঠে ছোট পুঁটুলিতে চালের গুঁড়োর ঝাল রুটি কয়েকখানা, একখানা বাড়তি শাড়ি।

দারোগা বলেছিল—শশী, মাখনের জেল হয়েছে এক বছরের উপর। তারও আগে মাস পাঁচ-সাত ফেরার ছিল, হাজতে ছিল। ফেরার থাকাব সময়ে তোমাদের এদিকে সে আসেনি, না?

—না।

—এ ছেলেটা কার, তোমার নাকি?

জেরা এরপরে এগোয়নি। দারোগা বলেছিল—আচ্ছা পবে শুনব। কিন্তু তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই শশী হাঁটতে শুরু করেছিল। তার কি কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল, কিংবা এই বনই কি তার ভবিষ্যৎ কালেব প্রতীক? দত্ত দারোগা বেশ ভালো একটা কথা বলেছিল—আত্মহত্যা যারা করে, ধরো তারা কি পরে কী হবে চিন্তা করে?

কিন্তু বিকেলের জালিকাটা ছায়াগুলো মিলিয়ে যেতেই অন্ধকার নেমে এল। শশী একটু বিশ্রাম নিতে বসেছিল। অন্ধকারের দিকে খেয়াল ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার স্পর্শে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গায়ে। উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চলার ভঙ্গিতে চলেছিল সে। দু-একবার গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, ঝোপঝাড়ে জড়িয়ে পড়ে গিয়ে। শশী থেমেছিল। একটা বড় গাছের গোড়ায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। সারারাত দূরে দূবে শেয়াল ডেকেছিল। বুনো মোষ দুড়দাড় করে দৌড়ে গিয়েছিল পাশ দিয়ে। সকালের আলোয় তার মনে একটা আবেগ দেখা দিল—সামনে এগিয়ে গেলে বিপদ এড়ানো যাবে। পরের দিন এই ঘরগুলোকে দেখতে পেয়েছিল শশী। ঘর মানেই তো মানুষ। দিনমান সেও বনে বনে লুকিয়ে ঘরগুলোকে লক্ষ্যে রাখল, কিন্তু সারাদিনেও যখন কেউ এল না তখন সবচাইতে কাছের ঘরখানায় ঢুকে রাত্রির আশ্রয়ের সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলল।

চালের গুঁড়োর রুটি যা সে সঙ্গে এনেছিল, বনে আসার তৃতীয় দিনের সকালে দুখানা মাত্র অবশিষ্ট ছিল তার। দার্শনিকতা যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক তার প্রমাণ দিল সে। ভাবল : আজ দু'খানাতেই দিনমান কাটাতে হবে। গত দু-দিন তা করলে রুটিগুলো আরো দু-দিন চলত। কী বোকা! বোকা অংশটা উত্তর দিল, কিন্তু তাহলেও দু-দিনের পরে এই অবস্থাতেই পৌঁছুত আবার। একবার সে ভাবলে আরো বেশি রুটি আনা উচিত ছিল। কিন্তু কত বেশি আনতে পারো? এক বছরে

যত রুটি দরকার হয়?

সেদিনের রুটি দু'খানা খেয়ে সে জল খেতে জলার ধারে গিয়েছিল। আর তখন সে আবিষ্কার করল বিলের জলে অজস্র পানিফল ফলে আছে। তখন তার মনে হল চিরকালের মতো এই বনে এই ঘরে থাকতে পারবে সে। ছেলে বড় হলেও পানিফল খেয়ে বাঁচবে।

পরদিন সকালে সে পানিফল সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। এতক্ষণ পাখিগুলো অনেক ডাকাডাকি করেছে। এখন তারা আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। ক্বচিৎ কেউ পিপ্ পিপ্ করছে, কখনও একটা ব্যাং মক্ মক্ করছে। একটা সাপ, কিংবা খরশোলা মাছ, তিরতির করে জল কেটে চলেছে। হঠাৎ শশীর মনে হল একটা পাখি উড়ে গেল ওদিকে দাম থেকে। পাখি মনে করেই চোখ তুলে চেয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের কাছে সব রক্ত যেন জমে গেল। একজন মানুষ। মাথায় টাক পড়তে পড়তে কানের কাছে কয়েক গোছা চুল অবশিষ্ট আছে। সারা মুখে বসন্তের দাগ। গলায় ছেঁড়া ছেঁড়া তুলসীর মালা। এক কাঁধ জলে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে শাপলার লতা টেনে টেনে কী সংগ্রহ করছে সে।

ছেলে কোলে করে দৌড়ে পালাল শশী। ভয় পেয়ে পাখিগুলোও যেন আর্তনাদ করে উঠল, কক্ কক্, কোবাক্ কোবাক্ কোবাক্।

কিছুক্ষণ বাদে শশী ঝোপের আড়ালে পা টিপে টিপে এদিকেই ফিরে এল। লোকটি তখন কাঁধের উপরে এক বোঝা শাপলার ফল নিয়ে পথ চিনে চিনে চলেছে। লম্বা, কালো, রোগাটে লোকটা। সারা গা থেকে জল গড়াচ্ছে তখন, হাত পায়ের পেশিগুলো যেন সেজন্যেই স্পষ্ট ; গোল নয়, দড়ির মতো পাকানো লম্বাটে। আর এই সকালেই যেন সে ক্লান্ত।

তাহলে এ লোকটাও কিছু অন্যায় করেছে এই ভাবল শশী। চতুর্থ দিনে পানিফল তুলে খেল শশী। কিন্তু পঞ্চম দিনে পানিফলগুলো বিস্বাদ লাগছিল তার মুখে। পেটেও সহ্য হয় না। তা ছাড়া কাঁটায় কেটেও গিয়েছে মুখ। সারাদিন সে বনটাকে যেন আবিষ্কার করে বেড়াচ্ছে। তখন দুপুর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে তখন আর তার চলতে ইচ্ছা করছে না। একটা গাছতলায় বসে পড়লে সে। আহার্য কিছু সংগ্রহ করতে হবে। চাল কিছু সংগ্রহ হলে সে রান্না করতে পারে। তুলসীমালা যখন বনে থাকে তখন সে বোধ হয় রান্নাও করে। ঠিক এমন সময়েই শশী চমকে উঠল, কে যেন কথা বলছে।

—আর পারিনে, সাধুচরণ।

তারপরে কে কাশল। সর্দি জড়ানো গলায় কে বলল—এ জেবনটাকে।

এ জেবনটাকে আর পারিনে—এই দাঁড়ায় কথাটা।

ভয়ে চনমন করে শশী সামনের ঝোপটার আড়ালে ঢুকবার চেষ্টা করল। কাঁটায় চামড়া কেটে কেটে গেল তার। সে দেখতে পেল এ সেই তুলসীমালাই, নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। একটা হাসির রেখা ফুটল শশীর মুখে।

কিন্তু এখানে বসে থেকেই-বা কী হবে? শশী আবার চলতে শুরু করেছিল। চলতে চলতে একসময় তার মনে পড়তে লাগল, পাড়াপড়শির কাছে এক-আধ কুনকে চাল অনেকসময়ে সে ধার করেছে। মাখমের সংসারই তেমন ছিল। তার মনে কোনো কোনো পড়শির মুখ ফুটে উঠল যাদের কাছে কখনও কখনও সে চাল ধার করেছে। কিন্তু এখানে সে চাল শুধবে কী ক'রে?

সে বিস্মিত হয়ে থেমে দাঁড়াল। এখানেও আর একটা ঘর আছে দেখছি।

অন্য রকম ঘর। গ্রামের লোকরা যেমন হোগলা বা খড় দিয়ে তোলে তেমন কিছু। আর সাধুচরণ সে ঘরে ঢুকল। তাহলে সে এই লোকটার পিছন পিছনই এতক্ষণ চলেছে। আর চাল চাইবে না কি? বোকার মতো হাসলে যেমন হয় তেমনি হলো শশীর মুখের চেহারা।

পরের দিনই আবার তাকে বার হতে হয়েছিল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আর একটি স্ত্রী পশুর সঙ্গে তখন যেন তাকে তুলনা দেয়া যায়। কিন্তু উপমাটা ঠিক হয় না—তেমনি সতর্কতা হয়তো, কিন্তু ঘ্রাণ, স্পর্শ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যা পশুদের আছে তা কি কল্পনা করা যায় তার ক্ষেত্রে। সাধুচরণের ঘরে ঢুকে সে হাঁড়ি হাঁটকে দেখেছিল। কিন্তু চাল ছিল না।

ঠিক তখনই একটা অশরীরী ভয় যেন শশীকে পেয়ে বসল। যেন চাল পাওয়া যাবে এই ঘরে এমন একটা আশ্বাসেই সে বনে এসেছিল, আর সেই আশাটা এখন মুচড়ে মুচড়ে কেউ ছিঁড়ে দিল। কী করবে সে এখন? গ্রামে ফিরে যাওয়া ছাড়া কী উপায় আর তার? দু-একদিনের অনাহারে শরীর যতটা অবসন্ন হতে পারে তার শত গুণ বেশি অবসাদে তার পা দুটো যেন ভেঙে পড়ছে। নিজের পেটে হাত চাপড়ে চাপড়ে যেন সে কাঁদবে এই হতাশায়। ছেলেকে কোনোরকমে কোলে রেখে টলতে টলতে সে চলেছিল ঠিক এমন সময়েই সে দূরে আগুন দেখতে পেয়েছিল। হিরণ্ময়ের রান্নার আয়োজন চোখে পড়েছিল। তার মনে হল পুলিস তাহলে। সে কি এখন আঁ আঁ করে কাঁদবে? কেঁদে কেঁদে বনের সকলকে সাবধান কবে দেবে? কিংবা তা হযতো নয়। পুলিসের চাইতেও ভয়ংকর কিছু। শশী তাহলে সেসবই দেখতে পাচ্ছে যা মানুষ চূড়ান্ত বিপদে দেখতে পায। ভুল দেখতে শুরু করেছে সে। খেতে না পেয়ে মরতে বসেছে বলে রান্নার মরীচিকা দেখছে? এই ভুল দেখার আতঙ্ক থেকে শশী ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল।

কিন্তু রাত্রিতে যা ঘটল তার চাইতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শশী নিশ্চিত জানতে পেরেছিল সে মরে যাচ্ছে. তখনই তার গলা টিপে ধরেছে অন্ধকারের সেই আতঙ্ক।

কিন্তু পরের দিন? শশী আজ আর একবার চালের চেষ্টায় গিয়েছিল। অন্তত তুলসীমালার কাছে সে জানতে পারবে এই বনে চাল পাওয়ার কী উপায় আছে। সে ভাবতে ভাবতে ফিরছিল হিরণ্ময়ের কথাই। লোকটার ঝোলাতে যা ছিল সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। তা না করলেও চলত। সাধুচরণের ঘরে চাল ছিল না. সাধুচরণও নয়। হিরণ্ময়ের ঝোলায় চালটুকু ছিল বলেই আজ সে চলতে পারছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলে হয় না চালের কথা?

হিরণ্ময় উঠে দাঁড়িয়েছিল একটা গাছ ধরে। সে ভাবছিল গাছ ধরে ভাঙা পা মাটিতে না ছুঁইয়ে চলা যায়! এমন সময়ে তার চোখ পড়ল তার নিজের পায়ের দিকে। শিউরে উঠল সে। জোঁক! দুটো জোঁক ব্যান্ডেজের ঠিক উপরে পায়ের গোছা কামড়ে ধরে আছে। সে দুটোকে টেনে ফেলে দেবার ইচ্ছা থেকে তার ডান হাতটা সেদিকে খানিকটা এগিয়ে আবার গুটিয়ে গেল। দু-এক মুহূর্ত সে ফ্যাকাশে মুখে বসে রইল। তারপর হাসি পেল তার। পিছনে রবারের মতো পোকা দুটিকে টেনে তুললে সে গা থেকে। বলল—ড্যামিট্। কিন্তু তারপরে সে হাঁফাতে লাগল উত্তেজনায়।

আর কথাটা সে আজ নিজের কানে শুনে ফেলেছে। ওটাকে ছাড়তেই হবে। ড্যামিট্ বলাটা তার বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডায় জন্মানো মুদ্রাদোষ। পুলিসের খাতাতেও নাকি উল্লেখ আছে। তা যদি থাকে তবে তার জন্যও কি নিরঞ্জনই দায়ী? আহা নিরঞ্জন! তার মৃতদেহের অন্য কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না, শুধু পায়ের পিছন দিকের মোটা রগ দুটো কাটা ছিল। রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে তিলে তিলে সে নিঃশেষ হয়েছিল।

কিন্তু এটা তো পায়ের একটা ভাঙা হাড় সারানোর জন্যে অপারেশনের ব্যাপার মাত্র। আর দুর্বল লাগার কারণ জ্বর। একটু জল পেলে হতো।

নিরঞ্জন ইকোনমিক্সের ভালো ছাত্র ছিল। ভয় পেয়েছিল নাকি সে, ভয় পেয়ে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?

কিন্তু কিছুই সে ভাবতে পারছে না আর। চোখের সামনে বন দেখতে পাচ্ছে। গাছের গুঁড়িগুলোর

আড়ালে লাখ পথ দূরের এক ভুল-ভুলাইয়ায় মিশে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার জমে যাচ্ছে। খানিকটা হাঁপাচ্ছে, খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করছে। কী করবে, কী ভাববে তার ঠিক থাকছে না।

হঠাৎ যেন সামনের ঝোপটা দুলে উঠল। হিরণ্ময় ঝোলার উপরে হাত রাখল। শক্ত লোহার নলটা হাতে লাগল তার। ঠিকই আছে সেটা। ঝোপটার আড়াল দিয়ে একটা মানুষ যেন চলছে।

শশীও ভাবেনি এখানে হিরণ্ময় আছে। সে-ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—শোনো, শোনো, শশী। তোমার নাম শশী নয়?

শশী নড়ল না।

—শোনো, শশী। (হাঁপাতে লাগল হিরণ্ময়) আমি জোড়হাতে মিনতি করছি। আমার খুব জ্বর, খুব জ্বর।

—কী করব?

তাই তো, কী কববে শশী? কেন সে ডাকছে তাকে? হিরণ্ময় গাছেব গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। সে ভাবতে চেষ্টা করল যুক্তি দিয়ে দিয়ে--কেন সে ডাকল শশীকে।

অপ্রতিভ মুখে সে বলল—যদি তুমি আমাকে কোনো একটা ঘরে যাওযাব পথ চিনিয়ে দাও ভালো হয। খুব জ্বর। আকাশে মেঘ, জল হতে পাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে হিবণ্ময একবাব শুযে পড়েছিল ক্লান্তিতে। বলেছিল—তুমি যাও, তুমি যাও, আমি আব চলতে পাবছি না।

কিন্তু চলে না গিয়ে, কিছু না বলে শশী স্তব্ধ হযে দাঁড়িযেছিল হিবণ্ময আবাব উঠে না বসা পর্যন্ত।

২

জ্বরটা ফুসফুসেব প্রদাহেব জন্য নয। শশীব মতে তাড়সেব জ্বব. কাল শেষ বাতে খুব ঘাম হয়ে জ্বরটা ছেড়েছে। এমন কি হতে পাবে আজ আব জ্বব আসবে না?

তাবপব হিবণ্ময ভাবল, এখন বোধ হয় দুপুর হবে। সকালের দিকে শশী একবার তাকে জিজ্ঞাসা কবেছিল—পানিফল খাবে?

হিবণ্ময় কী উত্তর দেযা যায় ভাবছিল। শশী তাব হাতেব কাছে কযেকটা পানিফল রেখে বোধ হয গিয়েছে। আর কী ভাববে এই যেন খুঁজল সে ছাদেব দিকে চেয়ে চেয়ে। বনেও তাহলে মাকড়সা আছে? নতুবা ওখানে অমন ঝুল হবে কেন?

কাল বাত্রিব কথা মনে হল হিরণ্ময়েব। তখন সে ভেবেছিল—এই রাত্রিটাও যদি শশীর কুঁড়েতে কাটে তবে একটা কৌতুকের ব্যাপার হয় না? পর পর তিন রাত হয় তাহলে। কোথাও যেন এ রকম একটা লেখা পড়েছে? এক কুষ্ঠী নারী আর এক অন্ধ ভিখিবি থাকত এক পোড়োবাড়িব সিঁড়ির খিলানের তলে। কী কববে না থেকে, অনেক পোড়োবাড়ির অনেক খিলান তো ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। কিন্তু শশী তো কুষ্ঠী নয। কাল সে শশীকে জিজ্ঞাসা করেছিল—

শশী, তোমাদেব গ্রামের আর সব লোকজন কোথায়? তোমার নিজের ঘরের লোকই-বা কোথায়? শশী সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিল—এটা তো গ্রাম নয়, বন। আর লোকজন বলতে আমার এই ছেলে। এখন হিরণ্ময় ভাবল : শশী কি আর সত্যি কথা বলবে? কেউই বলে না। এটা গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা নয়। তাহলেও শশী যখন এখানে থাকে তখন অন্য কারো এখানে থাকা সম্ভব। শশীর

স্বামী কি হাটে গিয়েছে? স্বামী না হয়ে অন্য কেউ হতে পারে। মানুষের সাড়া পেয়ে দূরে দূরে থাকছে।

কিন্তু দ্যাখো এরই মধ্যে শীত শীত লাগছে। আশা করেছিলে আজ জ্বর হবে না।

অতীন একবার এ রকমের একটা পরিস্থিতির কথা বলেছিল। বিলাসপুরের জঙ্গলে সে এক গ্রামে অতিথি হয়েছিল আর তাকে শালপাতায় করে জোয়ারের ছাতু খেতে দিত এক গৃহস্থ। কিন্তু একদিন পালাতে হয়েছিল তাকে, কারণ হঠাৎ ফরেস্ট রেঞ্জের এক চৌকিদার সেই গ্রামে এসেছিল। সৌভাগ্য সে সর্বপ্রথম অতীনের চোখেই পড়েছিল।

অতীন এসব বিষয়ে ভাগ্যবানই ছিল কিন্তু ভাগ্যবানের ভাগ্যও বসে ভোগ করলে ফুরিয়ে যায়। দশ বছর তার ভাগ্য তাকে সাহায্য করে অবশেষে একদিন ফুরিয়ে গেল। ত্রিশ বছরের জেল হয়েছে অতীনের। একটু যেন ভাগ্যনির্ভর হয়েছিল অতীন ইদানীং।

বিলাসপুরের গল্পটা অতীন কিন্তু নিজেই বলেছিল, আর তা বলতে বলতে স্বপ্নের মতো কিছু যেন তখন তার চোখের মণিতে দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু এটা তেমন কোনো গ্রাম নয়। এ তো খুব সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যুদ্ধের তাগিদে তৈরি এ ঘরগুলোর কথা পৃথিবীর সব লোকই ভুলে গিয়েছে। আর সে যে অতীনের মতোই সৌভাগ্যবান তাও প্রমাণিত হয়নি।

শুধু অতীন নয়, ফটিক, নিরঞ্জন, সুবর্ণ, শ্যামল। আর তাদের পিছনে অন্য অনেকে।

ফটিকই কথাটা বলেছিল। অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তার প্রশ্নগুলো অনেকসময়েই ছেলেমানুষের মতো হয়ে থাকে। অতীনের যখন বিচার হচ্ছে তখন একদিন ফটিক বলেছিল—অতীনের জ্বর আর আমাশা কোনোটাই কমছে না। ডকে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে দেখছেন না? উকিল অতীন সম্বন্ধেই তার চাইতে জটিলতর সমস্যায় ব্যস্ত ছিল। সে বলেছিল—জেল হাসপাতালে বরং ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিশ্রামও আছে। উকিল নিশ্চয় এটাকে একটা বেয়াড়া রকমের রসিকতা মনে করে বলেনি।

এতদিনে বিশ্রাম পেয়েছে নাকি অতীন? সারা ভারতের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, পুলিসের হাত থেকে নিজেকে আড়ালে রাখার অহর্নিশ চেষ্টা আদর্শকে ব্যর্থতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার অবিরত পরিশ্রম—এসব থেকে ত্রিশ বছরের জন্য?

হিরণ্ময় নিজেই চিন্তাটার সামনে এসে খানিকটা অবাক হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় তবে উল্টোডিঙির খালটার জলে নামতে দ্বিধা করছিল কেন? পুলিসের চোখকে ফাঁকি দেবার মতো অন্ধকার ছিল, নৌকার ছায়া ছিল। জ্বর ছিল গায়ে। জ্বর গায়ে জলে নামতে হঠাৎ ছ্যাঁক করে একটা শীত লাগে বটে। আর শরীর তাতে আপত্তি করে।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত শীত! এ কি তার মনের উপরে কোনো চিন্তার ফল? শরীর তাহলে সেই সন্ধ্যায় অতীনের মনকে অগ্রাহ্য করেছিল। অবশ্য ফটিক বলেছিল : উল্টোডিঙির নৌকা থেকে পালানোর ব্যাপারে নয় শুধু অনেক কাজেই অতীনের সেই শাণিত ভাবটায় মরচে পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল। আর (গলা নিচু করে কথাটাকে ইশারায় পরিণত করেছিল ফটিক) এর সঙ্গে নিরঞ্জনের ব্যাপারটার কি যোগ আছে? অতীনকেই হুকুমটা দিতে হয়েছিল।

হিরণ্ময় খড় সরিয়ে সরিয়ে খড়ের মধ্যে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। শীত আর তার সঙ্গে পিপাসাও। একটু জলও কি পাওয়া যাবে না?

কিন্তু নিরঞ্জন অমন করতে গেল কেন? বই, পড়া, শান্তিপূর্ণ জ্ঞানময় একটা জীবন? এই পুলিস এড়িয়ে বেড়ানো কি তার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাহলে সে তো পুলিসের কাছেই কিছুদিনের জন্য আশ্রয় চাইতে পারত, দলের কোলেই আবার ফিরে এল কেন? ধৈর্যের বাঁধে হঠাৎ

একটা ফাটল দেখা দেয়া?

বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে নিরঞ্জন। এই কথাটা নিজের মনে উচ্চারণ করেই হঠাৎ একটা অট্টরব করে ওঠার মতো মনের অবস্থা হল হিরণ্ময়ের। কিন্তু কতকটা শুকনো কান্নার মতো শোনাল তা। নিরঞ্জন তার বন্ধু ছিল। ইকোনমিক্সের ভালো ছাত্র ছিল সে। রক্তের সঙ্গে সঙ্গে তার সে জ্ঞানও কি চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিঃশেষ হয়েছিল। আর শীতে, হ্যাঁ শীতের কথাই তো। নিরঞ্জনের সেই অবস্থায় যারা তাকে পাহারা দিচ্ছিল তাদের একজনই পরে বলেছিল—নিরঞ্জন নাকি হঠাৎ কেঁদে উঠেছিল শীত করছে বলে। নিরঞ্জন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল তার পায়ের কাটা দুটো রগ বেয়ে তার প্রাণের সবটুকু উত্তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে রক্তের সঙ্গে. তবু তার রক্তহীন দেহে শীত-বোধ কি সত্যি এমন প্রবল হয়েছিল! গলার কাছে কিছু একটা অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল হিবণ্ময়ের।

শরীরেরও কি তাহলে একটা কথা আছে? আমি মরে যাচ্ছি এ জেনেও শীত করছে বলে যে চেঁচায়?

হঠাৎ যেন মন তার ফাঁকা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কিছু না ভেবে হিরণ্ময় শুয়ে শুয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। শীতে কাঁপা ছাড়া আর কিছুই তার মনে রইল না।

শশী প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ফিরল। সাধুচরণ ফিরেছে আর শশী তার হাতে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল।

সাধুচরণের ঘরে মাচার উপরে নতুন হাঁড়িতে চালও ছিল। শশী যখন চাল নিতে যাবে হঠাৎ একটা ছায়া পড়েছিল যেন তার গায়ের উপরে। চমকে উঠে সে দেখতে পেয়েছিল ঘরের দরজা জুড়ে সাধুচরণ দাঁড়িয়ে আছে। রাগে তার চোখ দুটো পাক খাচ্ছে। হাতে উঁচু করে ধরা মাছধরা কোঁচা। কিন্তু শশী কিছু করার আগে, কিছু বলার আগেই নিবে গেল সাধুচরণ। দরজা থেকে সরে গেল সে। আব তার কালো মুখটাও যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাতের কোঁচাটা নামিয়ে ভয়ে ভয়ে যেন সরে গেল সে নিজেব ঘরের দরজা থেকে।

বিলের ধার দিযে শশী দৌড়ে চলতে লাগল। কিন্তু থামতে হল তাকে। আজ প্রায় সাতদিন অনাহারে চলছে—অখাদ্য পানিফলগুলো আর হিরণ্ময়ের ব্যাগ থেকে পাওয়া চালের দু-মুঠো ভাতের কথা ছেড়ে দিল। বুকের মধ্যে খচখচ করছে যত আইঢাই করছে বুক।

একটু বিশ্রাম করে নেবে নাকি? বসে পড়ে শশী হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ছেলেটাকে কোলে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। একটা পাখি ডাকছে। জলের ধারে একটা শাপলার লতা। পিপ্ পিপ্। একটু জল খেলে হতো। হাত বাড়িয়ে লতাটা ধরে সে টানল। কক্ কক্ কক্। ডাহুক! খুব ডাকছে তো?

ও তাই নাকি! ব্যাপারটা শশীর অজানা নয়। বাঁশের তৈরি একটা খাঁচার মধ্যে একটা পাখি অনবরত ডাকছে। আর খাঁচার কাছাকাছি গোটা দুয়েক। দেখতে দেখতে একটা বড় মোটাসোটা পাখি ঢুকে পড়ল খাঁচায়। দরজাটাও পড়ে গেল।

কী করবে? খাঁচাটা খুলে দেবে শশী?

সে উঠে গেল খাঁচার কাছে। খাঁচার দরজাটা খুলে হাত বাড়িয়ে সে খাঁচার মধ্যে থেকে পুরুষটাকে ধরে আনল। যেন ছেড়ে দেবে। কিন্তু হঠাৎ তার মতটা বদলে গেল! হাত বাড়িয়ে একটা শাপলার লতা টেনে এনে পাখিটার পা দুটোকে শক্ত করে বাঁধল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাখিটাকে হাতে নিয়ে চলতে শুরু করল।

কিন্তু খাঁচা পাতল কে? সাধুচরণ নয়? চুরিই সে করেছে তাহলে। আবার দৌড়তে শুরু করল শশী।

দরজা দিয়ে যে আলোটা আসছে তাকে রঙিন বলে বোধ হয়। তার রঙ ঝরাপাতার মতো বাদামি। শশী যখন ঢুকল তখন তাকেও বাদামি রঙের মনে হল।

সে ঘবে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। হিরণ্ময়কেও দেখতে পেল সে। শশী বলল—চাল নাই, ও মানুষ শুনছ?

—তা নেই তা তো আমিও জানি। আমি ভাবছিলাম, একটু জল দিতে পারো?

—জল আনতে হবে। ছেলেটাকে তোমার কাছে বসিয়ে রেখে যাই।

শশী হিরণ্ময়ের জলের বোতল আর প্যানটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে শশী ফিরল জল নিয়ে। হিরণ্ময় তখন জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে আবার।

৩

হিরণ্ময় স্থির করল আজ খানিকটা সময় সে পরিচ্ছন্ন করে চিন্তা করবে। কাল রাত্রির কথাটা সে সংক্ষেপে বুঝে নিতে পাবে। সংক্ষেপের একটা সুবিধাও আছে তাতে ভুল কম হবে, কারণ সব খুঁটিনাটি ব্যাপাব মনে আসছে না। সে কিছু ভাবছিল কিংবা জ্বরেব ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল। তখন শশী বোধ হয় তাকে জল খেতে দিয়েছিল। কিংবা তা স্বপ্নের ঘোরেই পিপাসার নিবৃত্তি হতে পাবে।

তারপর শশী একটা পাখি ভেজেছিল। আগুন জ্বেলে তার উপরে একটা ডাল পুঁতে তাতে পাখিটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপাবে হিরণ্ময় তাকে বুদ্ধি যুগিযেছিল, ঝোলা থেকে ছুরিটাও বাব করে দিয়েছিল। কিন্তু একটা বিষয প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পাখিটাকে মারা, তার পালক ছাড়ানো এসব শশীকেও কবতে হয়েছিল, আর হিরণ্ময় জ্বরের জন্যই যেন বিবর্ণ মুখে বসেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে কি ভীরু?

এই কোমল অবস্থাটা অবশ্য সে কাটিয়ে উঠেছিল। আর তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য কবেছিল আব একটি স্মৃতি। ফটিকই এসব বিষয়ে সবচাইতে ওস্তাদ ছিল। তাকে অনেকসময়ে কাট্‌ বলা হতো বোধ হয় কোনো উপন্যাসের রাঁধতে ওস্তাদ এমন কোনো চরিত্রের অনুকরণে। একবাব চুরি কবা একটা হাঁস একটা রেলের কালভার্টের নিচে রান্না করেছিল সে।

কিন্তু খেতে গিয়ে হিরণ্ময়ের মনে হলো বমি আসবে তার। জোর করে সে-ভাবটাকে সে দমন করতে চেষ্টা করতে লাগল। সে ভাবতে চেষ্টা কবল—রক্ত, রক্ত হবে। পাখিটা পেটে গিযে রক্ত হবে। আর তা দরকাবও। রক্ত ছাড়া আর কী আছে যা রোগের সঙ্গে যুঝতে পারে।

শশী একটু দূরে বসে আছে। আগুনটা তখনও নিবে যায়নি। সেই আলোতে শশীকে দেখা যাচ্ছে। হিরণ্ময় নিজের প্যানটাকে শশীর দিকে এগিয়ে দিল। বলল—তুমি খাও শশী, আমি আব পারছি না।

শশীর খাওয়া হয়েছিল। ভাজা পাখিব চর্বি লেগেছিল হাতে। খড় তুলে তুলে মুছল। সবটা গেল না তাতে। তখন রুক্ষ চুলে হাত মুছে মুছে চুলগুলোকে যেন পালিশ করতে লাগল সে।

বোতল থেকে আর একটু জল খেয়েছিল হিরণ্ময়। তারপর শুয়ে পড়েছিল। এই সামান্য পরিশ্রম করেই তার বুকের ভিতরে ফুসফুস কিংবা হৃৎপিণ্ড হাঁপাচ্ছে। কপালে ঘাম ফুটে উঠল। না খেয়ে থাকারও তৃতীয় দিন সেটা।

কিন্তু একটু পরে বলেছিল : শশী, আচ্ছা, শশী। শশী ফিরল।

—তুমি যদি এ বনে একলা এসে থাকো তবে কেন এসেছ? একা কি এই বনে বাঁচা যায়?

কথা বলার জন্য শশীর ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কী বলল তা বোঝা গেল না।

—বলতে চাও না? তা বটে। কিন্তু শশী এ বনে আরো লোক হয়তো আছে। যাদের সাহায্যে তুমি বাঁচতে পারো। দোহাই তোমার, শশী, আমাকে বাঁচতে দাও, আমার কথা কাউকে বোলো না; একটু সুস্থ হলেই আমি চলে যাব।

তখন হিবণ্ময ফোঁপায়নি। তাব ঠোঁটও কাঁপেনি। কিন্তু তার জ্বরতপ্ত গালের উপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

সকালে শশীই বেরিয়ে গিয়েছে। সে নাকি চালের চেষ্টা করবে। পাখি একটা সে এনেছিল, কিন্তু চাল অন্য ব্যাপার। এ বনের সীমান্তে কোনো গ্রাম আছে কিংবা এই বনেরই অন্য কোনো অংশে! শশী যাওয়ার সময়ে তার কাছে টাকাব কথা তুলেছিল। ঝোলার চোরাপকেট থেকে দুটো টাকা সে বার করে দিয়েছে। কিন্তু গ্রাম যদি থাকে সে গ্রামে কি গল্প কবার মতো মানুষ নেই। শশী অনিচ্ছাতেও কি গল্পে গল্পে তার বনে উপস্থিতিব কথা প্রকাশ কবতে পাবে না?

হিরণ্ময ভেবেছিল সে কিছুক্ষণ যুক্তি দিয়ে দিয়ে চিন্তা কবে যাবে কিন্তু তা না করে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রইল। চিন্তা যেন তাকে একেবারে ত্যাগ করে গেল। বরং যেন ঘরখানাই তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার বিষয় হল। দেয়ালের ফাটল দিয়ে লতাগুলো ঢুকে পড়ছে ঘরে। ঘরেব মেঝেতে শশী আগুন জ্বেলেছিল সেখানে ছাইগুলোব পাশেই একটা বুনোগাছের চারা ঝলসে গিয়েও এখনও খাড়া আছে।

হিরণ্ময়ের চোখ দুটো আবো বসে গিয়েছে। মুখেব দাড়িগোঁফ আরো বেড়েছে। কপাল আবো বিবর্ণ হযেছে। সে ভাবল · কাল রাত্রিতে তার চোখের জল কি শশী দেখতে পেয়েছিল? আর একবার ভাবল তার কিছু ভাবা উচিত। একেবাবে চুপ কবে সময় কাটে না। নানা দুশ্চিন্তাও আসে মনে।

আজ যদি তার জ্বর না আসে কী ভালোই হতে পারে।

হিবণ্ময় যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। তাই তো, শশী আসেনি? অনেক বেলা হল না? যদি সে না ফেরে? হয়তো সে ভয় পেযেছে। ইঁদুবের বাসায সাপ ঢুকলে ইঁদুর কি সে বাসায় আর ফেবে? এখন তবে কী করবে হিরণ্ময়? অজ্ঞাত একটা ভয যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে মুঠো কবে চেপে ধরল। তাহলে সেই-বা কী করে থাকবে এই ঘরে? জ্বর নেই এখন। হামাগুড়ি দিয়ে সাবাদিন সাবা রাত চলে সে কি বনের বাইরে যেতে পাবে? তাহলেই কি কেউ তাকে খেতে দেবে? চলার কথা মনে হতেই পায়ের দিকে দৃষ্টি ফিরল তার। এ পা কি আর কখনও সারবে? অনেক কাল সে ভবঘুরের মতো ঘুরেছে, কিন্তু এখন তো ঘোরার শক্তিও আর অবশিষ্ট রইল না। এই পা, এই পা—আজ যেন ব্যথাও করছে না। ব্যথাটা তার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিংবা এ কি গ্যাংগ্রিনের পচন ধরার ফল যে ব্যথাটা আর লাগছে না?

চোখের জল চেপে রাখার জন্যেই হিরণ্ময় তার চোখের উপরে হাত দুখানা রাখল।

শশী ভয়ে ডুবতে ডুবতে যেন সাধুচরণের ঘরের দিকে তখন যাচ্ছে। হিরণ্ময় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন তুমি বনে এলে?

শশী ভাবল : এ কি বলা যায়? আর সে নিজেই কি জানে কী কবে শুরু হল? মাখন আর তার ছেলে দুজনেই প্রায় তিন-চার মাস বাড়িতে ছিল না, ফেরার ছিল তারা। তারপর এক রাতে ছেলে ফিরল। খবর দিল অসুস্থ মাখন এখন হাজতে। বিচার হবে। দু-পাঁচ বছর জেল অবধারিত। অনেক দুঃখে কাটিয়েছে শশী এতদিন। খেতে পায়নি, পরতে পায়নি। জমিদারের আমলারা শাসিয়েছে। অনেক অভিমানে কান্না এসেছিল তার। কিন্তু সেটা হঠাৎ কিছু ছাড়া আর কী হবে, নতুবা অত কান্নার মধ্যে কী করে ঘটবে! ঘৃণায় সারাদিন আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল শশী। কিন্তু তারপর রাত্রি এল পা টিপে টিপে। যেন বাঁধ যখন ভেঙে গিয়েছে তখন বন্যায় ভেসে যেতে আর কোনো বাধা

নেই। পরে কখনও মনে হয়েছিল অস্পষ্টভাবে, মাখন ফিরলে আবার বাঁধ উঠবে। কিন্তু বাঁধটা কি নিজে থেকেই ধীরে ধীরে উঠছিল? অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে তখন, এই ছেলেটার বয়সও পাঁচ-ছ মাস হয়েছে, শশী একদিন ন্যায়-অন্যায়ের পাপ-পুণ্যের কথা বলল। মাখনের ছেলের মন যেন কেমন হয়ে গেল। হতাশায় যেন বুদ্ধিনাশ হল তার। হতাশাতেই কি ধুতরার বিষ খেল?

কিন্তু এ কি বলা যায়?

শশী কি এখন কাঁদবে? এই বনে কি না খেয়ে মরতে হবে তাকে?

অন্তর্গূঢ় কান্নায় তার মন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটা কথাকে ধরার চেষ্টা করছে। যেন সে বলবে—আমি বিষ দিইনি, আমি মরব না।

সাধুচরণের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নিলে হয়। পানিফল তুলে দেবে সে, পাখি ধরে দেবে। তাব বদলে সাধুচবণ তাকে চাল, হাঁড়ি, দেশলাই এসব এনে দিতে পারে না?

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চাপা কান্নায় কেঁদে উঠল শশী। বলো কী করবে সে?

৪

স্বপ্ন নয় সবটুকু। তার প্রমাণ শশী ঘরের কোণে মাটির হাঁড়িতে চাল ফোটাচ্ছে। কাল হিরণ্ময়ের প্ল্যান ছিল সম্বল, আজ তার চাইতেও ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। এ রকম মনে হচ্ছে না খেয়ে মরতে হবে না।

এখানে দত্ত দারোগাব কথাটা আবার বলা দরকার। সাধুচরণ হাজতের ডে-লাইটের চোখ ধাঁধানো আলোয় হাঁ করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি, ছল-চাতুরি তার সম্বন্ধে চিন্তাও করা যায় না। সে-ই বলেছিল। সাধুচবণই হঠাৎ দেখে ফেলেছিল শশীকে, আর তখনই কথা হয়েছিল।

সাধুচরণ বলেছিল—কোন গাঁয়ের লোক তুমি? বনে এসেও পাখি চুরি করো, চাল সবাও? বনবিড়াল?

শশী বলেছিল—সে এই বনেই থাকে। না-খেয়ে মরে যাচ্ছে।

সাধুচবণ বলেছিল—একা থাকো? কী দেবে চাল দিলে?

শশী কেঁপে উঠেছিল। পবে বলেছিল—টাকায় চাল হয়? ঢ্যাপ তুলে দিলে?

সাধুচরণ এক টাকার চাল আর একটা হাঁড়ি দিয়েছিল শশীকে।

পরপর দু'দিন ভাত। কাল মান জাতীয় বড় একরকমের কচুপাতা কেটে এনেছিল শশী। তার উপরে ভাত বেড়ে দিয়েছিল হিবণ্ময়কে। গায়ে জ্বর সবসময়েই আছে। কিন্তু শশীর বাড়া ভাত সে নিঃশেষে খেয়েছিল। তারপরই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হিরণ্ময়। কিন্তু তাহলেও জ্বরটা যেন খানিকটা সহ্য করা যাচ্ছিল তারপবে।

শশী এসে বলল—হাত মুখ ধুয়ে নাও। ভাত হতে হতে আমি জল নিয়ে আসব।

হাত মুখ ধুয়ে নিল হিরণ্ময়। শশী জল আনতে গেল। যাবার সময় সে বলে গেল হিরণ্ময় যেন ছেলেটাকে দেখে, সে যেন আগুনে হাত না দেয়।

নিজের পায়ের দিকে তাকাল সে। পাশাপাশি পা দুখানা সে রাখল। পায়ের ফোলাটা যেন একটু কমেছে। বনে মাছি নেই এটা ভালো। নতুবা পোকা পড়তে পারত। ফোলাটা কমার এই একটা অর্থ হতে পারে ঘা-টা শুকিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। বোধ হয় হাইজিনে সে পড়েছিল, জ্বরের উত্তাপ শরীরের আত্মরক্ষার কৌশল। এ যদি তত্ত্ব হয় তবে তার পা জ্বরের আগুনে পুড়ে পুড়ে আরোগ্য লাভ করতে পারে, আর তারপরে জ্বরও সেরে যাবে।

শশীর ছেলেটার চেহারা কিন্তু শশীর মতো নয়। আর তা ছাড়া কেমন যেন বোকাও। কাল শশী ওকে খানিকটা ফ্যান খাইয়েছে। ও যে নড়েচড়ে আগুনের দিকে যাবে তা মনে হয় না। একটা খড়ের ডাঁটা তুলে নিয়ে চুষছে ছেলেটা।

আঃ, কতদিন পরে তার জ্বরটা ছাড়বে।

শশী ঘরে ফিরে বলল—ও মা উনুনটা নিবে গেছে দ্যাখোনি?

হিরণ্ময় খড়ের উপরে শুয়ে পড়ল। বলল—ও আমার পোষাবে না।

ঠিক যেন একটা স্বপ্নে দেখা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে।

অবশ্য, কাল রাত্রিতে হিরণ্ময় একবার বিচলিত হয়েছিল। খুবই বিচলিত হয়েছিল।

দুপুরের ভাত খাওয়ার উত্তেজনাটা কমার পর থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা হিরণ্ময় ধীরে ধীরে মনের ভিতরে নিচ্ছিল। হঠাৎ সে চমকে উঠে বসেছিল যেন। কৌশলে প্রশ্ন করার মতো মনের অবস্থাও তার রইল না। কী বললে—চাল পাওয়া যাবে? মানুষ আছে, আরো মানুষ আছে এই বনে? তার মনে হতে লাগল—এখনই এই মুহূর্তেই শশীকে চিরকালের মতো নীরব করে দেয়া দরকার। উত্তেজনা উৎকণ্ঠায় সে হাঁপাচ্ছিল তখন।

কিন্তু তারপর বসে থাকতে থাকতেই একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

শশী বলল—খাওয়ার পরে শুকনো লকড়ি কুড়িয়ে আনব।

—তা এনো।

হিরণ্ময় অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

এ ছাড়াই বা কী উপায় ছিল, কী উপায় আছে? আত্মঘাতী হওয়া যায় শশীর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে।

খাওয়ার পরে শশী বিশ্রাম করল না। হিরণ্ময়ের ছুরিটা নিয়ে সে খড় সংগ্রহ করতে লাগল। শুকনো খড় কেটে এনে বিছানাটাকে ভালো করল সে। হিরণ্ময় বাইরে গিয়ে বসেছিল। তার চোখের সামনেই দিনের আলো নিবে এল। বনের শব্দগুলো সোচ্চার হয়ে উঠল।

—ঘরে যাবে না?

ঘরে গিয়ে নতুন বিছানো খড় নরম লাগল হিরণ্ময়ের।

—রাত্রিতে রাঁধবে নাকি শশী? হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করল।

—না। যে চাল আছে, একবেলা করে দু দিন যায়।

—শশীর আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। তাহলে আমরা এখন ঘুমব? আচ্ছা, শশী তুমি তো বনে একা ছিলে। ভয় করত না?

শশী বলল—করত ভয়।

শশী ভাবল। আগে সে ভেবে দেখেনি-কিন্তু ভয় করাই তো স্বাভাবিক। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

—আচ্ছা, শশী, এ চাল ফুরলেও চাল পাওয়া যাবে? হাই তুলল হিরণ্ময়।

—তা যাবে।

শুয়ে পড়ে হাই তুলতে তুলতে হিরণ্ময় বলল—আমি কেন বনে এসেছি, জানতে ইচ্ছা করে না?

শশী তখনও বসে আছে। সে ভাবল—আমার মতোই কোনো কারণে পুলিসকে এড়াতে চাও।

সকাল সকাল রান্না করে খেয়ে শশী বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। শশী সাধুচরণের জন্য শাপলার ফুল তুলতে গিয়েছে। তার বদলে সে চাল পাবে।

হিরণ্ময় ঘরের দরজার পাশে গিয়ে বসল। এ কখনও আশা করা যায় না জ্বরটা একেবারেই

ছেড়ে যাবে। একটু কমেছে তা বোঝা যাচ্ছে।

আর জ্বরের উপরে ভাত খেয়ে যত অপকার হয় বলে তার ধারণা ছিল তা হয় না। বোধ হয় বনের নিয়মই আলাদা। একটু বল পাচ্ছে যেন সে।

আর বল পাওয়াই দবকার।

হিরণ্ময়ের মুখে হাসি দেখা গেল। এখন নিরঞ্জন নেই, অতীন অপসৃত। এই মুহূর্তে তার অনেক বন্ধু, অনেক সহচব অসংখ্য প্রতিরোধ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সমাজেব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সে নিশ্চয়ই এ বনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকতে পারে না। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এখন সে আগের চাইতেও উপযুক্ত। বনে ঢুকবার সময়ে তাব শরীরেব অবস্থা এর চাইতে যেন দুর্বলই ছিল।

অন্যদিক দিয়েও ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে এখানে। সাধুচরণ আর শশীর পরিচয়টা ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। শশী যদি পবিশ্রমই করবে আহার্য সংগ্রহ করতে তবে সে আহার্যের অংশ কেন দেবে হিরণ্ময়কে? বরং সাধুচরণের পক্ষপাতী হওযাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর তা ছাড়াও মনের দিক থেকেও ওদের যতটা কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব ততটা হিরণ্ময়েব মনের কাছে আসা সম্ভব নয় শশীর।

হিরণ্ময় নিজের ডান হাতখানাকে উল্টেপাল্টে দেখল। কিছু মাংস যেন এখনও আছে। এমন কি সম্ভব হতে পারে যে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য যোগাড করা যাবে এই বনে। একদিন একটা পাখি এনেছিল বটে শশী।

সে হামাগুড়ি দিয়ে বাইবে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ বনেব শব্দগুলো সে শুনল। পাখি ডাকাডাকি কবছে। বড বড় ঘাসগুলোব মধ্যে খরগোশেব মতো কোনো প্রাণী দৌড়ে পালাল।

সে নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন জ্বরের তাপটাকে বুঝতে চেষ্টা করল। নিশ্চিন্ততাব একটা দীর্ঘশ্বাস পডল তাব।

মন্দ নয এই অভিজ্ঞতা।

তার সামনের বড ঘাসগুলোর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রাণী আর্তনাদ করে উঠল। তেমনি ক্ষুদ্র আর একটি হিংস্র প্রাণী ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে উঠল। বনবিড়াল? বুনো ইঁদুব ধরেছে?

খায় কী বুনো ইঁদুবগুলো? যুদ্ধেব সময়ে এ ঘবগুলোতে যখন লোক ছিল তখন থেকেই থেকে গিয়েছে?

জীবনটাও অবশ্য হিংস্রতায় পবিপূর্ণ। বিপ্লবেব জীবনে তার একটু আধিক্যই থাকে।

গাছেব ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে হিবণ্ময়ের বাঁ দিকে। হিবণ্ময় আস্তে আস্তে তার আহত পা-টাকে সেদিকে এগিয়ে দিল।

অনেক দিন পরে যেন সে জীবনকে অনুভব কবতে লাগল।

পবপর তিনদিন ভাত খেযেছে সে। শশী বলেছে, হাঁস নামছে, পাবলে একটা হাঁসও আনবে। মন্দ হয় না হাঁস ভাজা আব ভাত।

কিন্তু বনের জীবন ঠিক রূপকথার মতো হয না। এ বনে যেমন আকস্মিক শিলাবৃষ্টি হতে পারে তেমন অন্য ঘটনাও। সেদিন শাপলাব ফুল সংগ্রহ করতে জলে নেমেছিল শশী, কিংবা, আরো বিশেষ কবে বলতে হলে তীরের কাছে কাছে জল যেখানে কম সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাপলার ফুল তুলেছিল শশী। হঠাৎ তার পা পিছলে গেল যেন, কিন্তু ব্যাপারটা পিছলে যাওয়া নয়। পায়ের পাতা, গোছা, উরু দেখতে দেখতে ডুবে যেতে লাগল মাটিতে। চোরাকাদা, চোরাকাদা। ভয়ে শশীর বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। মরণ. মরণ, আর্তনাদ করে উঠল সে। তীরে শশীর ছেলেটা বসেছিল, সে-আর্তনাদে ভয় পেয়ে সে-ও কেঁদে উঠল। ঝর ঝর করে কাঁদছে শশী। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ধরবার চেষ্টা করছে সে, আব সেটাও সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে আসছে হাতে। তলিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে

যাচ্ছে সে? উরু ছাড়িয়ে তলপেট স্পর্শ করেছে ঠাণ্ডা কালো মৃত্যু। এক মুহূর্ত যেন সে সেই স্পর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু সেটা ক্লান্তি। পরের মুহূর্তে যেন সেই ধর্ষণকারী মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে দু-হাত দিয়ে, বুক দিয়ে, এমন কী দাঁত দিয়েও সে একটা ময়না কাঁটার ঝোপকে আঁকড়ে ধরল। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় যখন সে কূলে উঠল তখন সে দাঁড়াতে পারছে না। ঠোঁটের কোনায় বুদ্‌বুদের মতো ফেনা। শশী কূলে উঠেই মূর্ছিতার মতো পড়ে রইল। কর্দমাক্ত, কাঁটায় ছিন্নভিন্ন।

শশীর ছেলেটা, অবশ্য, আর কাঁদল না। সে এগিয়ে এগিয়ে এসে স্তন খুঁজে নিল। শশীর পাশেই সে-ও শুয়ে পড়ল।

নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখল হিরণ্ময। জ্বর তাহলে কি সত্যি আসেনি? কিন্তু তা হয় না। হাতের উত্তাপ আর গায়ের উত্তাপ সমান হলে এ রকম ভুল হয়। জ্বর এসেছে তবে কম এসেছে।

কিন্তু বিকেল হতে চলল না? হ্যাঁ, দু চার বার অন্তত পেট ভরে খাওয়া দরকার এই বনেই। শশী কি আজ ফিরবে না?

দ্যাখো, বিশ্বাস করা কঠিন। সাধুচরণ চাল দেবে আর হিরণ্ময়কে সে চাল বেঁধে খাওয়াবে এ ব্যবস্থাটাই একটু গোলমেলে। সাধুচরণ লোকটাই বা কী রকম? শশী বলেছিল শশীকে সে ভয় পায়। সেটা কি স্বাভাবিক? রান্না করে খেলে হয়। চাল রয়েছে। এত চাল যে তার ব্যাগটা ভরে দিলেও কিছু থাকবে শশীর হাঁড়িতে।

কাল ভাজা মাংস আর ভাত খেয়েছে। বিবেচনা করতে গেলে বর্তমান অবস্থায় তারপরে এক বেলা না খেয়ে থাকলেও ক্ষতি নেই পুষ্টির দিক থেকে। তা ছাড়া রান্না করতে হলে জল লাগবে। শশী তাড়াতাড়ি ফেলে বটে জল নিয়ে, কিন্তু সে কি তা পারবে?

এমন সময়ে শশী ফিরল।

হিরণ্ময় হাসল। বলল—এত দেরি যে শশী?

শশী কথা বলল না। তার যেন অভিমান হয়েছে। চোখে জল আসবে এ রকম মনে করল সে। যদিও তার কী কারণ আছে তা সে নিজেই খুঁজে পেল না। কারণ সে ভেবেছে মাটিতে শুয়ে শুয়ে। সে যদি না উঠতে পারত কী করত হিরণ্ময়? জানতেও পারত না। হয়তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করত তারপর চলেও যেত এ বন থেকে। তার পা তো এখন অনেকটা সেরেছে।

তা সত্ত্বেও শশী বলল—মরছিলাম।

হিরণ্ময় বলল,—পালোয়ান তো।

সে হাসল।

রান্না শেষ হতে রাত্রি হল।

বিছানো খড়ের উপরে শুয়ে মাথার তলায় দু হাত রেখে হিরণ্ময় ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে রইল। শশীর উনুনের ম্লান আলোটা কাঁপছে সেখানে। বেশ একটা হালকা খুশির ভাব লাগছে। তার মনে পড়ল অনেক দিন আগে সে একটা সন্ধ্যা এ রকমভাবে কাটিয়েছিল এক হোটেলের ঘরে সিগারেট টেনে টেনে।

--কি শশী, রান্না হল?

পাশ ফিরে সে শশীকে দেখল। শশীর মুখের একপাশে আগুনের আভা লেগেছে। আরে! ওর নাকে একটা নাকফুল আছে নাকি? কিন্তু তার মন নাকফুলের পাশ দিয়ে চলতে চলতে আবার হোটেলে গিয়েই পৌঁছল। সেই হোটেলেই সুবর্ণের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। সুবর্ণ তখন স্কুলের মাস্টার এবং সেখের ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। সুবর্ণর কাছেও হিরণ্ময় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নব এবং

সখের ট্যুরিস্ট বলে মনে হয়ে থাকবে। পরে পার্টির সাব-কমিটিতে দেখা হয়ে পরস্পরকে চিনতে পেরেছিল।

শশী ভাবল—কীই-বা এসে যায় হিরণ্ময়ের যদি শশী তাকে না-ই বলে আজকের দুর্ঘটনার কথা। হিরণ্ময়কে যেন সে চিনতে পেরেছে। এ কখনই সত্য নয় যে হিরণ্ময় কোনো গভীর অপরাধে অপরাধী। তার মুখ দ্যাখো, তার চোখ দ্যাখো। আর সাধারণ মানুষও নয়। তার সবচাইতে বড় প্রমাণ—শশীর মতো কে পারে সে প্রমাণ দিতে—একই ঘরে একই বিছানায় আট-ন দিন নতুবা এমন করে কাটে?

খাওয়া শেষ হতে হতে রাত গভীর হল। ছেলেটাকে ফ্যান খাইয়ে ঘুম পাড়াল শশী।

ঘরের কোণে আগুনটা কখনও জ্বলছে, কখনও ধোঁয়াচ্ছে।

হিরণ্ময় বলল—রোজ তুমি আগুন নিবিয়ে দাও।

—না-হলে রাতে হঠাৎ আগুন লাগতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু ধোঁয়া থাকলে মশা কম হয়।

শশী উঠে গিয়ে উনুনে কয়েকটা পাতা দিয়ে এল।

খড়ের বিছানার নিজের কোণটিতে ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন তার মনে আবার একটা অভিমান হল।

সে বলল—দেখেছ আমার সারা গা কেটে গিয়েছে?

—সে কী, সাধুচরণ...

—না। মরতে বসেছিলাম। চোরাকাদায় ডুবে যাচ্ছিলাম।

হিরণ্ময়ের দিকে সরে এল শশী।

—এই দ্যাখো হাতটা ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে।

—আহা, তাই তো!

শশী এই কথাটার জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিল। শশী খিলখিল করে হেসে উঠল।

—চোরাকাদায়? সে তো মানুষ মরতেও পারে।

শশী বলল—আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, নেশার মতো লাগছে, জানো? শশী বুঝতে পারছে না। সে অনুভব করতে লাগল—বেঁচে আছি, বেঁচে আছি। আর সবই নিছক মিথ্যা। আর 'বেঁচে আছি' এই শব্দ দুটিই যেন তরঙ্গ যা তার রক্তে ফুলে ফুলে উঠছে, হাসি হয়ে ভাঙছে।

শশী বলল—একটু সরো, শুতে দাও।

শশী হিরণ্ময়ের বুক ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।

৫

কোনো দুটি ঘটনাস্রোতের আকাঙ্ক্ষাহীন সংযোগকে আমরা আকস্মিক বলি। পৃথিবীতে যেহেতু অনেক মানুষ, ঘটনাস্রোতও সুতরাং অনেক হতে পারে। এবং যে-কোনো সময়ে দুটি ঘটনাস্রোত এক জায়গায় এসে মিশে যেতে পারে।

সকালে উঠে শশী সাধুচরণের ঘরের দিকে চলেছিল। সে চাইছিল শাপলার ফুল তুলে দেয়া ছাড়া সাধুচরণের অন্য কোনো কাজ করে দিয়ে চালের ব্যবস্থা পাকাপাকি রকমে করে নেয়া যায় কি না। হিরণ্ময় কি সাধুচরণের সঙ্গে হাটে যেতে পারে? তাহলে ভালো হতো। এরপরে শাড়ি কিনতে

হবে। তা কি আর সাধুচরণ এনে দেবে? সাধুচরণের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে জাল পেতে হাঁস ধরবার কায়দা সে জানে কি না। হাঁস নামছে আকাশ থেকে। কালও বোধ হয় নামছিল। হাঁসগুলো যদি থাকে তবে অনেক পাখি ধরা যেতে পারবে।

বেশ লাগছে না আজকের বাতাসটা? কিন্তু হিরণ্ময় যদি হাটে পৌঁছুতেই পারে তবে সে আর ফিরবে কেন? সে যে ভদ্রলোকের কমবয়সী একটি ছেলে তা তো তাকে দেখলেই বোঝা যায়। মূর্খতা, শশী, আবার আহাম্মুকের মতোই...। তুমি বেঁচে গিয়েছ একটা বিপদ থেকে তারই আনন্দে অমন হলে কেন? বেঁচে যাওয়া কি মদের নেশা?

কিছুটা পথ শশীর মন নৈরাজ্যের মতো অন্ধকার হয়ে রইল। আর নৈরাজ্যের ফল যা হয় চারিদিকের গাছ, লতা, ঝোপ, পাখির ডাক, ঝিঁঝির ডাকে তার মনকে দখল করে রাখল।

সাধুচরণের ঘরে সাধুচরণ সবসময়ে থাকবে এমন কথা নয়। তা সে ছিলও না। বিলের ধার দিয়ে শশী এগিয়ে যেতে লাগল। কিছু দূরে গিয়ে সে সাধুচরণের ডোঙাটা দেখতে পেল। তাহলে এদিকেই কোথাও সে আছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে হয়।

সাধুচরণ তখন জলে নেমেছিল। একটা জলজ-উদ্ভিদের ঝোপ ভেসে যাচ্ছে। হাঁসগুলো বিলের জলে এই উদ্ভিদ ভেসে বেড়ানোর ব্যাপারে অভ্যস্ত। তারা ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু জলজ উদ্ভিদ চলছে সাধুচরণের কৌশলে। ঝোপের পিছনে শুধু মাথাটা জেগে আছে তার। যে হাতখানা উদ্ভিদ ঝোপকে ঠেলে নিয়ে চলেছে বলে মনে হয় তাতে ধরা আছে পাঁচ ছ হাত লম্বা একটা সোজা সরু কঞ্চি আর মাথায় বঁড়শির মতো আলওয়ালা সরু ছোট একটা বর্শার ফলা। বিদ্যুতের মতো কঞ্চিটা এগিয়ে গেল। একটা হাঁস অবাক হওয়ার আগেই বিদ্ধ হয়ে আকাশের দিকে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সাধুচরণের হাতে এসে পড়ল।

হিরণ্ময় ঘরের বাইরে বেরিয়ে ভাবল আজও খানিকটা সে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে বসল সে। কিছুক্ষণ যেন বনের শব্দগুলোই শুনল। অনেক দূর থেকে একসঙ্গে অনেক পাখি ডাকাডাকি করছে এমন শব্দও ভেসে এল।

একটা খরগোশই বোধ হয়। এক ঝোপ থেকে অন্য আরেকটিতে লাফিয়ে পড়ল। ওটা কী? কী তাড়া করেছে ওকে? এই সকালেই? বনবিড়াল হবে। ঠিক তাই। মাপ্ মাপ্ করে ডাকছে। শশী কাল রাত্রিতেই এই ডাক যে বনবিড়ালের তা চিনিয়ে দিয়েছে হিরণ্ময়কে।

হিরণ্ময়ের মুখের উপরে একটা আবেগের স্মৃতি খেলে গেল। কাল ঘুমটা ভালো হয়নি।

এই খরগোশই—তা ঠিক নয়, একটা পচা মরা খরগোশ, কী ভয়ই না তাকে পাইয়ে দিয়েছিল একদিন। কী তা কি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভয়। সে তো জানে মৃত্যুর পরে ইজিপ্টের রাজা ওজিম্যানডিয়াস আর এই মরা খরগোশ দুই-ই সমান! মমতাজ আর শশীতে মৃত্যুর পরে পার্থক্য নেই—তাও তো অজানা নয়। বোধ হয় ফরাসি গল্প—সেই যে প্রেয়সীর কফিন খুলে হাড়ের চারিদিকে কিলবিল পোকার স্তূপ দেখেছিল কোন প্রেমিক। শশী—দেহমাত্রই বোধ হয়—কিন্তু এটা কি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার? একটু দৃঢ় হওয়াই ভালো ছিল না? আশ্চর্য, তখন কোনো যুক্তিই মাথায় এল না। কিন্তু ভয়ের কথা হচ্ছিল। আগুনে দেহটা পুড়ে যাবে, আর দেহটা ধীরে ধীরে মাটি হয়ে পচে যাবে—এ দুয়ের মধ্যে কোনটা বেশি কষ্টের? প্রথম কথা কষ্ট তখন কে অনুভব করবে? দ্বিতীয় কথা কবর দেয়া আর দাহ করা দুয়ের পক্ষেই যেমন সামাজিক যুক্তি দেখানো যায়, তেমনি দুই নিয়েই কাব্য করা যেতে পারে। কথা হচ্ছে, এসবই যখন জানা ছিল তখন ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না চিন্তার দিক দিয়ে। ভেবে দ্যাখো, আদর্শ সম্মুখে রেখেই তো ছুটে চলেছে সে। আদর্শ থেকে এখনও সে বিচ্যুত নয়। ছুটতে ছুটতেই যদি তার মৃত্যু হয় সে তো আদর্শের জন্যই মৃত্যু।

আর তা যেমন সার্থকতায় চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারে, তেমনি পাহাড়ের কোনো অখ্যাত উপত্যকায় হওয়াও সম্ভব।

কিন্তু ভয়ংকর ভয় পেয়েছিল সে. তাও তো মিথ্যা নয়। কে ভয় পেয়েছিল তাহলে, শরীর? সাহিত্যিকদের মতো ভাষাজ্ঞান থাকলে বলতে পারত সে আরো ভালো করে। কথাটা শরীর নয়। শরীরের সর্বত্র বিরাজ করে এমন একটা অনুভব যেন। একটা গোপন সভার পরিচালক যেন সে। গোপনে পরামর্শ দেয়, চিন্তার বাইরে বুদ্ধি যোগায়। তার বুদ্ধিতে কাজও হয় চিন্তার পরিচালনার বিপক্ষেও কখনও কখনও। আর এ জিনিসটা যাদের দেহ আছে তারই আছে—গাছপালা, খরগোশ, জলপিপি, সে এবং শশী।

আর খরগোশের মৃতদেহ দেখে যে ভয়টা হয়েছিল, চিন্তার ভাষায় তা ভয়, কিন্তু সেই আদিম চেতনার কাছে তা হয়তো একটা বিবেচনা যা তাকে আত্মরক্ষার তাগিদে শশীর ঘরের দিকে উন্মুখ করেছিল। আর বিবেচনার ফল ভালোই হয়েছে। বনে ঢুকবাব সময়ে যেমন ছিল সে এখন তার তুলনায় অনেক সুস্থ।

শশী ভাবছিল সে কি সাধুচরণকে ডাকবে। এমন সময়ে সে শুনতে পেল। বজ্রের মতো সে শব্দ ফেটে পড়ল বনের গাছে গাছে প্রতিধ্বনিত হয়ে, বন্দুক—বন্দুকের শব্দ। তার বুকেই যেন গুলি বিঁধেছে এমন, বিবর্ণ মুখে সে থমকে দাঁড়াল। আবার শব্দ হল। একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে সে বসে পড়ল। সে যেন ধোঁয়াও দেখতে পেল। বিলটা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে। তার ফলে বিলেব ধারের অবিভক্ত বনের রেখাকে কোনো কোনো জায়গা থেকে এপারের বন ওপারের বন বলে মনে হয়। শশী ওপাবের বনের গাছের আড়ালে মানুষ দেখতে পেল। তিন-চাবজন মানুষ। তাদের হাতেব বন্দুক, কার জামার খানিকটা, কারো টুপি। পুলিস? অ্যাঁ? পুলিস?

(দত্ত দারোগাব সাক্ষ্য এই, তাবা পুলিসই বটে। পুলিস সুপার, তার আর্দালি। সবচাইতে কাছের গ্রামের মাতব্বর বরকতুল্লা। হাঁস নামার সংবাদ তারাও পেয়েছিল। আর শিকার করতে এ বনে লাইসেন্স লাগে না। আর্দালির পোশাকের সঙ্গে কনস্টেবলের পোশাকে পার্থক্য ছিল না)।

শশী দাঁড়িয়েছিল কিন্তু নড়তে পারল না। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল। কোথায় পালাবে সে? কোথায়? হিরণ্ময়ের কাছে ঘরে? ছেলেটাকে নামিয়ে দেবে? তাহলে আরো বেশি দৌড়াতে পারা যায়। মাখনের ছেলে তবে তার নামই বলে দিয়েছে। কিন্তু ওরা গুলি ছুঁড়ছে কেন? তার কি বিচাবও হবে না? সাধুচরণইবা গেল কোথায়! এ বন থেকে পালানোর পথ সে হয়তো জানে। শশী বিলেব তীর ধরে দৌড়তে লাগল। হাঁপাচ্ছে সে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। গাছের আড়াল থেকে আড়ালে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে সে। অত গুলি ছুঁড়ছে কেন ওরা। কী যেন একটা তার গায়ের পাশ দিয়ে শিশ্ করে ছুটে গেল।

একটু থেমেছে ওবা। এই ফাঁকে সে পালাবে। নিশ্চয় পালাবে। সাধুচরণই পারবে। সে-ই জানে এই বনের অলিগলি। তার ডিঙিটায় কবে সে যেমন হাটে যায়। শশী আবার ছুটল। ডিঙিটা দেখা যাচ্ছে। আর পারছে না সে। এত জোরে সে কোনো দিনই দৌড়ায়নি। ও কী, আবাব গুলি ছুঁড়ছে ওরা।

হঠাৎ শশী ও-ও-ও অব্যক্ত একটা শব্দ করে একটা পাক ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। ছেলেটা কোল থেকে ছিটকে পড়ল। শশী ভাবল গাছে গুঁতো লেগেছে। উঠে দাঁড়াতে গেল। পারল না। হাত বাড়িয়ে মাটিতে ভর রেখে এগোবে ভাবল—তার আঙুলগুলো আঁচড়ানোর ভঙ্গিতে মাটির উপরে দু-একবার চলল—তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

সাধুচরণ বুঝতে পেরেছিল হাঁস শিকার করছে আনাড়ি কোনো সাহেবসুবো। যেভাবে গুলি ছুঁড়ছে

একটা পাখি কেন ফড়িংও পাবে না। কিন্তু এখানে থাকা বিপজ্জনক। আনাড়ির গুলি কাকে বিঁধবে বলা যায় না। সে ডুব সাঁতার দিয়ে পারের দিকে চলল। ডিঙির কাছে যাওয়া দরকার। এর আগে যত শিকার হয়েছে ডিঙি নিয়ে সে দূরে গিয়ে থেকেছে।

(দত্ত দারোগা বলেছে—সাধুচরণ মনে করতে পারেনি সে যখন শশাকে ডিঙিতে তুলেছিল সে জীবিত কিংবা মৃত ছিল)।

বন্দুকের শব্দে হিরণ্ময় চমকে উঠল। শিকার? আচ্ছা ব্যাপার তো!

—কী শিকার করছে? এ বনে বিগ গেম কিছু আছে? পাখি হতে পারে। কিন্তু এত গুলি ছুঁড়ছে কেন? খণ্ডযুদ্ধ নাকি? বিপ্লবী একজন আছে বটে এ বনে সে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে চায় না।

হিরণ্ময় হাসল। বরং তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি- এ রকম একটা মনোভাব হল। গিয়ে বললে হয় আমি একজন শিকারী। পথ ভুলে, আহত হয়ে এই বনে একপক্ষ সময় আটকে পড়ে আছি। আর তারপরে ওরা যদি ওদের গাড়িতে করে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যায়।

গাড়ি পেলে তো মুশকিল আসান হতেই পারে। আশ্চর্য তো এইবার নিয়ে শেষ হয় দশ রাউন্ড হল। পাখি যদি মারবে—দশ মাইলের মধ্যে কি আর পাখি আছে?

কিন্তু ঘরে উঠে যাওয়াই ভালো। হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে অপ্রীতিকর প্রশ্নোত্তরের ব্যাপার ঘটতে পারে।

হিরণ্ময় উঠে ঘরে গেল।

বন্দুকের শব্দের পর বনের স্বাভাবিক গভীরতা যেন ফিরছে। খুব দূরে একটা কাঠঠোকরা ঠক ঠক করে ঠোঁট ঠুকছে।

গাড়ি করে গ্রামে পৌঁছানো বেশ একটা গল্প হতে পারে। পথ হারিয়ে যাওয়া শিকারী তাই নয়? হিরণ্ময় হাসল। পা ই সম্বল। দুটো পাশাপাশি মেলে দিয়ে কিছুক্ষণ সে দেখল। বাঁ পা-টাকে গুটিয়ে আনল সে। দু হাতে তুলে নিয়ে ডান হাঁটুর উপরে রাখল। ময়লা ব্যান্ডেজটা এখনও আছে। কিন্তু হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছে এমনভাবে পা টাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে। আর দু-একবার চলে দেখলে হয় না? না না। তুলনা করার কিছু নেই। তাহলেও স্বাভাবিক জীবনে—কথাটা ঠিক স্বাভাবিক জীবন নয় বোধ হয় বরং বলা যেতে পারে হিরণ্ময় যদি অধ্যাপক বা তেমনি কিছু একটা হয়ে পুরোপুরি শহুরে জীবন যাপন করত—তাহলে এ রকম অবস্থায় ডাক্তার তাকে বিছানা থেকে নামতে দিত না।

আচ্ছা, পা নিয়ে কেউ কাব্য করেছে? সিন্ডারেলার গল্পটা অবশ্য কোনো এক রানীর সুন্দর পদযুগলের স্তাবকতা হতে পারে। একজোড়া পায়ের কথা মনে পড়ে বটে। কনিষ্ক? না বোধ হয়। ওজিম্যান্ডিয়াস, রাজার রাজা ওজিম্যান্ডিয়াস। সে পা দিয়ে কার কী লাভ এখন? বরং এই ভাঙা পায়ের দাম এখনও আছে কিছু, কী হতে পারত না ভেবেও কারো লাভ নেই। হিরণ্ময় একটু ভাবল কথাটাকে মনে করতে। কথাটা এশিয়ার না ইওরোপের? মরা সিংহের চাইতে জীবিত কুকুর হওয়া ভালো।

পায়ের উপরে সে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল।

বনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এখন সে চোখ বুঁজলেও বনকে দেখতে পায়। ঘরে বসেই সে যেন বাইরের বনকে দেখতে পেল চোখের সামনে। কালচে ধূসর রঙের কালচে সবুজ রঙের গাছের সারি, মাঝে মাঝে গলিপথ। আঁকাবাঁকা, ভাঙাচোরা। একটা সীমায় পৌঁছে যেন সবগুলি পথ একটা পর্দার গায়ে মিশে গিয়েছে। পর্দা কিংবা একটা তন্দ্রার মতো কিছু। আর তার ওপারে পৃথিবী। পৃথিবীই বলতে হয়। এ বনকে নানাদিক দিয়ে কি অপার্থিব মনে হচ্ছে না? ওদিকে হিরণ্ময়ের অনেক পরিচিত মুখ আছে। ফটিক, অজয়, সুবর্ণ। সেখানেও অবশ্য পর্দা আছে, আর আড়ালে

নেপথ্য নাটকের মতো তাদের জীবন। নিঃশব্দ তাদের যাওয়া-আসা। চাপা ক্রোধের উত্তেজনায় তাদের সমস্যাগুলো কাঁপে। হতাশায় শুকিয়ে যাওয়া, উৎসাহে তরুণ হয়ে ওঠা মুখগুলি। কিন্তু তারা হাসেও। সুবর্ণের চাপা বিদগ্ধ হাসি, সুরেনের প্রাণখোলা অট্টহাস।

কিন্তু...

কিন্তু অতীনকে আর পাওয়া যাবে না।

অনেকগুলি কথার চাইতে এই একটি কথা যেন অনেক বেশি গভীর। হিরণ্ময়ের চিন্তাও যেন থেমে দাঁড়াল। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে তারাই-বা কতদিন থাকতে পারবে? ফটিক, অজয়, শ্যামল, সে নিজে? কিন্তু, না, এসব কথা সে ভাবতে বসেনি আজ। কিংবা কোনো দার্শনিক তত্ত্বও নয়। হিরণ্ময় হাসল। শরীরের কথা নিয়ে সে এরই মধ্যে কবে একদিন খুব ভেবেছিল। অতীনের ধরা পড়া ব্যাপারেও শরীর আর মনের পৃথক আগ্রহ নিয়ে চিন্তা করেছিল। যদিও তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

একটু ভেবে সে নিজের চিন্তাকেই নিজের উপরে ঘুরিয়ে দিল। এ কয়েকদিন আদর্শের কথা খুব কমই মনে পড়েছে। আজ শরীর কিছুটা সুস্থ, তাই। এ থেকেই তো শরীরের যুক্তির কথা প্রমাণিত হয়? অন্য প্রমাণের কী দরকার?

কিন্তু ঠিক তা নয় যদিও। ওটা খুব স্থূল উদাহরণ হল। বরং শরীর ও মনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে মন শরীরের বিপন্নতার কথা ভেবে বিমর্ষ নয়। মন যেখানে আদর্শের কথা ভাবতে পারে তখনও শরীর—যেমন ধরো হাসপাতালে। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে গেলে তা রোগক্লিন্ন আসঙ্গলিপ্সা হতে পারে, কিন্তু শরীর যেন স্নিগ্ধ হত সে এলে, যদিও মস্তিষ্ক কখনই তাকে সত্যি কিছু বলে মনে করেনি।

শশী আজ কী করছে কে জানে? সময়ের কোনো মাপ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু দুপুর হ'যে গেল মনে হচ্ছে। এটা খুব সহজ সত্য শরীরে আর একটু জোর হলে তুমি আরো চিন্তা করতে পারবে। শশী বোধ হয় অন্যান্য দিন এমন সময়ে রান্না করে।

কাল এবং তার আগের রাতেও ভালো ঘুম হয়নি। এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে চলে। আহত প্রাণীরা নিজের গুহায় নিশ্চয়ই ঘুমোয়। শশী একটু অবাকই হবে দিনদুপুরে তাকে ঘুমোতে দেখলে।

শুয়ে থাকতে থাকতে হিরণ্ময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। গরমে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার। রোজকার জ্বরটা এসেছে তাহলে, একটু বেশিই হবে। ও একদিনে যাওয়ার নয়।

কিন্তু তখন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আশ্চর্য, শশী কোথায়? তার কি কোনো বিপদ হল? চোরাকাদায় ডুবে যাওয়ার মতো? কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠায় তার মন ম্রিয়মাণ হয়ে রইল। তার মধ্যে একবার মনে হল—বন্য প্রাণীদের জীবনে এমন হয়। কোথায় একটি ফাঁদে পড়ে যায়, কিংবা শিকারীর গুলিতে প্রাণ দেয়, অন্যটি কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে।

হিরণ্ময় উঠে গিয়ে দেখল প্যানে একটু জল আছে। উনুনের পাশে তাই ছাই উড়ে পড়েছিল। কিন্তু এর চাইতে পরিষ্কার জল এখন কোথায় পাওয়া যাবে।

রাত হল। শশী ফিরল না। হিরণ্ময় যেন বিস্ময়ে কাঠ কাঠ হয়ে গেল। সে কি নিজে রেঁধে খাবে? এই বনে কি তার এই ঘরখানি নিজের হল কিন্তু শশী? তাহলে শেষ পর্যন্ত শশী কি সাধুচরণের দলে যোগ দিয়েছে, এটা যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয়ে দেখা দিল। অনেক রাত অবধি তাকে জাগিয়ে রাখল।

ভোর হল। হিরণ্ময়ের ঘুম ভাঙল। সকালের স্নিগ্ধতায় কিছু ছিল যা তার আশাকে ফিরিয়ে আনল। হাঁড়িতে চাল আছে। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তারপর শশীকে খুঁজবে। খুঁজে দেখা

দরকার। সে যদি সাধুচরণেব দলে যোগ দিয়ে থাকে তাহলেও সেটা জেনে নেওয়া ভালো।

ঘরখানিকে বৃত্তের কেন্দ্রে রেখে পরিধির উপরে সে চলে চলে বেড়ালো। দুপুরে ঘরে ফিরল সে। রান্না করে খেতে হবে। কিন্তু জল? জল আনতে হবে তো। বৃথা পরিশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জ্বরটাও এসে গেল যেন।

আন্দাজ করে কবে বিল খুঁজে বার করল সে। জল নিয়ে এসে চালটুকু ফুটিয়ে নিল। খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিল সে।

আশ্চর্য, দ্যাখো, দ্বিতীয় দিন হল না আজ শশী না ফিরবাব?

ভয়ের সঙ্গে রাত্রির অন্ধকাবেব যোগ আছে। ঘব-বাব কবতে করতে রাত হল হিরণ্ময়ের ঘরেব মধ্যে। তাহলে সে ভাবল, সেই সন্ধ্যার নেমে আসা অন্ধকাবেব দিক চেয়ে চেয়ে, তাহলে শশী কি যারা শিকার করতে এসেছিল তাদের চোখে পড়ে গিয়ে ভয়ে এই বন ছেড়ে পালিয়েছে।

অনেক রাত পর্যন্ত বসে থেকে হিবণ্ময় নিজেব মনকে দৃঢ় কবে নিল। কাল সকালেই এ বন থেকে সে বেরিয়ে পড়বে। শশী আসুক কিংবা না আসুক।

শশী চলে যাওয়ার পরে আজ তৃতীয় দিন হল। দিনের সূচনাটা আজ শুভ হয়নি। কিছু খেয়ে নিয়ে পথ চলতে শুরু করা ভালো। কিন্তু তোমাব কি এখন ভালো-মন্দ বিচার করাব সময়? ঝোলাটাকে সে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। হামা টেনে টেনে সে পথ চলতে শুরু করে দিল।

কোনদিকে যাবে সে? সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে বনেব সরু সরু গলিপথ। একটা গাছের গুঁড়িব উপবে বসে সে ভাবতে শুরু কবল। কোন দিক দিয়ে সে বনে ঢুকেছিল তা ঠাওর করা কঠিন। একটা বিষয় শুধু অনুভব করা যাচ্ছে। শিকারীরা যেদিকে বন্দুক ছুঁড়েছিল সেটা ডাইনে হবে। সেদিকে কি সে যাবে? আন্দাজ করা যাচ্ছে সেদিকে তাহলে কোনো বড় গ্রাম কিংবা সেই শহরই আছে যেখান থেকে সে পালিয়েছে। ববং ছোট গ্রাম ভালো। সেখানে কৌতূহল যেন কম।

হিরণ্ময় বাঁ দিকেই চলতে শুরু করল।

তখন দুপুর হবে। প্রথম ক্লান্তিতে সে যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ল। হাঁটুব চামড়া কেটে গিয়েছে। ফোস্কাও পড়েছে যেন। একটু শুয়ে নিলে হয়। ঝোপঝাড় আগাছার মধ্যে শুতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার মন যেন তাকে টেনে তুলল। না না, সন্ধ্যার আগে বিশ্রাম করা যেতে পাবে না।

খানিকটা দূর চলার পর তাঁর মনে পড়ল। ক্ষুধা। বাড়তি ক্লান্তিটা ক্ষুধার। চাল নেই। কাজেই—হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

বিকেলের দিকে থামল। হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ছে। খানিকটা আলগা চামড়া শুকনো খড়ের কুচি, মাটি, শুকানো রক্তে জড়িয়ে ডান হাঁটুর উপবে বিশ্রী একটা ঘাযেব মতো হয়েছে। মুখেব ভিতরটা আঠার মতো লাগছে। একটু জল পেলে হতো। আচ্ছা, হিরণ্ময়, যুক্তি দিয়ে বিচার করে চিন্তা করো—এই বলল সে নিজেকে। এখানে এখন জল তুমি কোথায় পাবে? আর ক্ষুধা? চাল তুমি কোথায় পাবে? বিশ্রাম তুমি একটু করতে পাবো। আর জ্বর—আলাদা জ্বর বলে কি কিছু আছে আর? সবটাই তো জ্বর। হাঁপাতে লাগল সে।

কিন্তু এখনই কি বিশ্রামের সময়? আর পারছি না। এটা তো সাবা রাত ভাবতে পাবা যাবে শুয়ে শুয়ে। ভাত কাল কিছু খেয়েছিল। আজ জোর আছে। আজ না খেলে কাল এ জোর থাকবে কি?

হঠাৎ খানিকটা তাড়াতাড়ি হামা টেনে চলল সে। অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে এমন করে চলতে হবে। তারপর বিশ্রাম। কিন্তু খানিকটা দূর গিয়েই আবার সে থামল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল যেন, এ ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। পড়ে গিয়ে চোট পেলে হবে না।

এখন কিছুটা বিশ্রাম করে নিলে হয় না?

হিরণ্ময় মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। কোথায় যেন সে পড়েছে একটানা পরিশ্রমের চাইতে বিশ্রাম করে করে কাজ করলে পরিশ্রমটা বেশি করা যায়।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। এখন একটু ঠাণ্ডা হবে। ভালোই লাগবে তা ক্লান্ত দেহে। কিন্তু হঠাৎ ফোঁপানোর মতো ওঠানামা করতে শুরু করল তার বুক। এ কি তার চোখে জল আসছে কেন? ঢোঁক গিলল সে। না না, ভয়। অকারণে ভয় পাচ্ছে সে। মিথ্যা ভয় সম্পূর্ণ অহেতুক। সে নিজেকে বেশ পরিষ্কার করে বলল : তুমি আশঙ্কা করোনি। হঠাৎ জ্বরটা এসে গিয়েছে আবার, তাই। বেশ তাহলে আজ বিশ্রামই করো।

আজ বোধ হয় পঞ্চম দিন হল। পঞ্চম দিন? কাছের একটা গাছ থেকে কয়েকটা কচি পাতা তুলে সে চিবোল। তারপব থু থু করে ফেলে দিল।

কাল জল খেতে গিয়ে এক বেতের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল সে। কাল? বেতগাছ প্রায়ই নালার ধারে হয়। জলের আশা ছিল কিন্তু ওভাবে বেতের ঝোপ পার হওয়া যায় না। নিজের হাত দুটো চোখের সম্মুখে তুলে ধরল সে। মাথা নাড়ল। যেন সে ব্যাপারটাকে পছন্দ করছে না। হাতের তলা দুটোয় ফোস্কা পড়েছে, ঘা হয়ে গিয়েছে। আর বেতের কাঁটায় তা থেকে মাংস উঠে উঠে গিয়েছে। হাত দুটোকেই বাঁধতে হবে। সে দাঁত দিয়ে কামড়ে জামা থেকে খানিকটা ছিঁড়ে আনল। ডান পা দিয়ে চেপে ধরে সে এক হাতের চেষ্টায় অন্য হাতে ন্যাকড়া জড়াতে চেষ্টা কবল। জল খেতে হবে তো? আর জল খেতে হলে বিলেব দিকেই তো যেতে হবে। চলতে হবে। না চলে কোনো উপায় নেই।

সে মুখেব মধ্যে থুথু জমা করার চেষ্টা কবল কিছুক্ষণ। থুথু জমা কবে সেটা গিলে পিপাসার নিবৃত্তি করা যায়! কিন্তু আজ থুথু আসছে না। আজ ক'দিন হল, ওটা বোধ হয় ফেজ্যান্ট! কী জানি কী নাম ওই পাখিব। পাখি কিন্তু উড়তে পারে বিল পর্যন্ত। কিন্তু ওদেব জলের দরকার খুব কমই।

চালই-বা সে কোথায় পাবে? এই বন থেকে এটাই কি বাইবে যাওয়ার পথ? এই বন থেকে বেবিয়েই-বা কোথায় যাবে সে? ঝোলাটাও খালি, একটা চালের দানাও নেই। ঢোঁক গিলল হিবণ্ময়।

গড়িয়ে গড়িয়ে চলা যায় না? তাহলে হাত পা বাঁচে। বসে বসে ঘসটে ঘসটে চলতে লাগল হিরণ্ময়।

এখন কি দুপুর? একটু থামল সে আবার। আজ ক'দিন হল কে জানে।

কিন্তু একটু জল খেতেই হবে।

হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল—জল, জল। তার ভাঙা গলায় শব্দ তেমন হল না। বরং পরিশ্রমে সে হাঁপাতে লাগল। তার গাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। ঢোঁক গিলল আবার সে। জলে ডুবতে থাকলে যেমন নিঃশ্বাস নেয় দমকে দমকে মানুষ, তেমন কবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে।

বিল থেকে কি সে অনেক দূরে চলে এসেছে?

হঠাৎ কিছু একটা যেন পাশের ঘাসের জঙ্গলে লাফিয়ে উঠল। খরগোশ? হ্যাঁ খরগোশ যেন কী? কী যেন খরগোশ...

হিরণ্ময় হঠাৎ তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল।

কিন্তু কিছু খেতে হবে। এখনই কিছু খেতে হবে। হিরণ্ময়, তুমি কি উদ্ভাবন করতে পারো না কিছু।

হিরণ্ময় থামল আবার।

হঠাৎ সে হু হু করে কেঁদে উঠল।

বিকেল হল। তখনও হিরণ্ময় থেমে থেমে ঘসটে ঘসটে চলছে। কিছুক্ষণ আগে সে হোগলা জাতীয় একগোছা ঘাস তুলে তার নবম গোড়াগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে।

কিন্তু এখন কী কববে সে? কী যেন সে ভাবছিল! ও, হ্যাঁ। শবীরের কথা। হ্যাঁ, তিনদিন হয়ে গেল সে এই উল্টো দিকে চলেছে। তাতে কী? না, এই কথাই তো ভাবছিল। আচ্ছা এই বন কি সেই বন যা যশোর জেলাব উপর দিয়ে সমুদ্রেব ধাবে সুন্দরবনে গিয়ে মিলেছে। তাহলে? তা হলে?

আ—হিরণ্ময়—আ। তুমি কি হাল ছাডবে? হাল ছাড়াব লোক তুমি? তাহলে তুমি এই বনে এলে কেন? বুকে ব্যথা কবছে। বাত হল। কিন্তু এব চাইতে পরিষ্কার কবে ভাবা ভালো। আর একটু চলো। কাল সকালে হয়তো বন শেষ হবে।

যেন ঘুমে ঢলে পড়েছিল সে। মাথাব মধ্যে, চোখের সামনে সর্বকিছু কালো হয়ে উঠছিল। যেন ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

কিন্তু সবই কি স্বপ্ন? অতৃপ্ত দেহই কি তাকে শবীব স্বপ্ন দেখিয়েছে—যেমন সেই হাসপাতালের নার্স। স্বপ্ন! তাহলে—

গায়ে হাত বাখল সে। দ্যাখো, জ্বরটা বোধ হয় ছেড়েই গিয়েছে। ঘাসেব গোড়া খেয়ে বমি হয়নি। এ দুটো খুবই আশাব কথা।

কিন্তু ঠোঁট চেপে ধরল সে ঠোঁট দিয়ে, আর তা সত্ত্বেও বুক বুক কবে একটা চাপা শব্দে তাব ফোঁপানিটাই প্রকাশ পেল। সে নিজেব ক্ষত-বিক্ষত কাঁচা মাংস থেকে রক্তঝবা হাত দুখানা চোখেব সামনে মেলে ধবল। দ্যাখো। দ্যাখো।

কেন পালাল না সে সময থাকতে? তখন চাল তো ছিলই শশীব বাড়িতে ঝোলায ভরে নেযাব মতো। আব শবীবও নিশ্চয বনে ঢোকাব সমযে যেমন ছিল তাব চাইতে সুস্থ হয়েছিল।

তাহলে ক্লান্তি? তুমি কি খুব ক্লান্ত। তুমি তো নয—ওটা তো শবীব যে হাঁপাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে লাভ কী বলো। অতীনেব শবীব ক্লান্ত বোধ কবেছিল। তাব ফল? ভেবে দ্যাখো, আর একটু বিশ্রাম নিলেই তুমি এগিয়ে যেতে পাববে।

ববং আব না এগিয়ে এখানে একটু ভাবা যাক।

ধবো অতীনেব কথাই। ওটা কি শুধু দেহের ক্লান্তি। জ্বব গায়ে জলে নামতে ছ্যাঁক করে ঠান্ডা লাগবে। জল পেলে এখন আমি জ্বর গায়ে নেমে পড়তাম। অতীনেব মনও ক্লান্ত হয়েছিল। মন ক্লান্ত বলেই জলকে ভয পেয়েছিল।

কিন্তু কথাটা কি মন? না, শবীবও নয়। যেন অর্ধস্ফুট কিছু। শবীবেব খুব কাছাকাছি একটা অস্তিত্ব। বোধ হয় চিন্তা আর শবীবেব মাঝামাঝি কিছু।

কিন্তু তোমাব মন তো ক্লান্ত নয। আ—হিবণ্ময। তাহলে কি হাসপাতাল থেকে তুমি এই বনে পালাতে? অতীন জলে নামেনি। তুমি এই বনেব ঝুঁকি নিয়েছিলে।

দ্যাখো, কী সুন্দর স্বচ্ছ চিন্তা কবছি। দ্যাখো।

হিবণ্ময়ের মুখে একটা হাসির মতো কিছু যেন প্রকাশ পেল।

না—আমি মরব না, না না।

ববং আব একটা ঝুঁকি নেবে এই স্থির কবল সে। যেদিকে শিকাবীব বন্দুকের শব্দ শোনা গিয়েছিল সেদিকেই সে যাবে। সেদিকে মবে থাকে যদি তাও ভালো।

হিবণ্ময ঘুবে বসল। যে পথে সে এসেছে সে পথেই সে ফিরবে। এবার সে পালাবে শশী

ফিরলেও। কাল সকালেই হয়তো সে ফিরবে। আর সে ফিরলে বন থেকে বেরনোর সহজ পথ শরীরের জোর অকারণে ফুরিয়ে না দিয়েও বোঝা যাবে।

বনে রাত এসেছিল। এখন আবার দিন হচ্ছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল হিরণ্ময়। তার চেহারার আরো পরিবর্তন হয়েছে। গায়ের জামাটার অধিকাংশ নেই। খানিকটা গায়ের সঙ্গে ঝুলঝুল করছে। ডান চোখটা ফুলে বন্ধ হয়ে আছে ; ডান গালের উপরে জল আর ফ্যাকাশে রক্ত গড়িয়ে আসছে। বাঁ চোখের দৃষ্টিটা ঘোলাটে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে হিরণ্ময়। অদ্ভুত অসহায় একটা জ্বালা বোধ করছে সে শরীরের ভিতরে। সে কি মরে যাচ্ছে?

সে বরং নিজের চারিদিকের বনকেই দেখতে লাগল। সে তো শশীর ঘরের দিকেই আন্দাজ করে চলেছে। এই সকালেই সব ঠিক করে নিতে হবে। এখন কি সকাল? ঠিক করে নিতে হবে—আস্তে আস্তে চলবে সে। বিলের দিকে যেতে হবে। পানিফল আছে, জল আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলা যাবে না। পানিফলের রস আছে। জল না পেলেও তাতেই...

হিবণ্ময় চলতে শুরু করল। দু-একবাব ঘসটে চলেই সে থামল। তার মনে হল অনেকক্ষণ সে একবাবে চলেছে—এখন বিশ্রাম নেবে। হাঁ করে করে নিঃশ্বাস নিল সে। জিভটা কালো হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তা বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে। মাথাটা কাঁধের উপবে ঝুঁকে আছে। তাব ডান চোখের ব্যথা সে আর অনুভব করতে পারছে না। হাত, এমনকী পায়ের কথাও আর মনে আসছে না। একটা উদাসীনতাই যেন। কিন্তু, সে ভাবল, এখন ভবিষ্যৎটাও ভেবে নেয়া দবকার। ...আদর্শই বোধ হয় কথাটা। হ্যাঁ, তাই হবে। আদর্শের জন্যই সে বনে এসেছে। নতুবা হাসপাতালে ধবা দিতে পারত। আব তারপর অতীনেব মতো ত্রিশ বছরের বিশ্রাম। কী যেন ভাবছিল সে? নিবঞ্জনেব জেল হয়েছে। সেও বিশ্রাম ·হিরণ্ময় চমকে উঠল। সে কি ভুল ভাবতে শুরু কবল? না না, সে সাংঘাতিক কথা। মস্তিষ্ক হার মানতে শুরু কবলেই শবীরও ঝিমিয়ে পড়ে।

হিরণ্ময়ের মস্তিষ্কে আবার যেন সুস্থ চিন্তা ফিরে এল। আলোগুলো মৃদু হয়ে হযে অন্ধকাবে মিশে যাচ্ছিল। সেখানে অস্বচ্ছ একটা আলো যেন দেখা দিল আবাব। ··অদ্ভুত ছিল নিবঞ্জন। থিসিসের বারো আনাই ছিল তার বচনা। আব এমন আদর্শবাদীই-বা কে ছিল। নতুবা পুলিসের কাছে ব্যাপারটা জানাজানি হওয়াব পরে নিজের ভুল সে স্বীকার করবে কেন? সে নিজে স্বীকার না করলে প্রমাণ করা দূরের কথা, কারো সন্দেহ করারই সাহস হতো না—পুলিসে খবব সেই দিয়েছিল। হিরণ্ময় তাকে বলেছিল, পাগলের মতো কী বলছ? নিরঞ্জন বলেছিল—আমার শরীরটা ক্লান্ত হয়ে যে ভুল করেছিল তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তখনও আশা ছিল হিরণ্ময়ের। সে ব্যাপারটাকে লঘু করাব জন্যে বলেছিল—শবীর গেলে কী থাকবে, আত্মা? নিরঞ্জন বলেছিল, আদর্শ। নিরঞ্জনের শেষ পরিণতি দেখার জন্য হিরণ্ময় ছিল না। কিন্তু সেই নিরঞ্জন তখন একবার শীত করছে বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সেটা তার ··হিরণ্ময়ের বুক পেট ধক্ ধক্ করে কাঁপছে, শরীরটা দুলছে। তার চোখে জল এল না, কিন্তু সেটা যেন কান্নারই ভঙ্গি। অনেক দূর চলেছে সে ইতিমধ্যে। এবার কি একটু বিশ্রাম নেবে। কালো পোড়া চেহারার জিভটা খানিকটা বেরিয়ে এল আবার—আবার যেন ঠোঁটটাকে ভিজিয়ে দেবে।

বলবে আদর্শ থেকে যাবে। তাই কি থাকে? যারা ফ্যাসিস্ট আদর্শে প্রাণ দিয়েছে? তাদের কাছে তাদের আদর্শ কি কম উজ্জ্বল ছিল? এখন কি সে আদর্শ ধিকৃত নয়। সব আদর্শের ব্যাপারেই কি এমন হতে পারে না? ক্রিশ্চানি ক্রুসেডে কত মৃত্যু ঘটে গেছে—কিন্তু সে আদর্শ কি এখন পরিত্যক্ত নয়?

তখন দুপুর হচ্ছে আবার। হিরণ্ময়ের মনে হল সে অনেক দূর চলেছে ইতিমধ্যে। যদিও সকালে যেখানে দেখা গিয়েছিল তা থেকে আট দশ হাত দূরে তাকে এখন দেখা যাচ্ছে। মৃত্যুর ছায়া তার সমস্ত দেহের উপরে। তাঁর বাঁ চোখটাও বুঁজে আসছে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লা হিরণ্ময় ভাবতে চেষ্টা করল খুব ক্লান্ত বলেই কি সে এসব ভাবছে আদর্শ সম্বন্ধে? সব যেন ডুবে যাচ্ছে—কী, কী, জলে ডুবে যাচ্ছে নাকি সব? হিরণ্ময় ভাবল সে মাথাটা জলের উপরে তুলছে। তার মাথাটা একটু যেন কাঁপল। শশী ফিরলেই হ্যাঁ ক্লান্তই তো সে, অতীনের মতোই। না হলে এই শহরে কেন সে আসবে? এখানে সকলেই তাকে চেনে। অন্য শহরে পায়ের অপারেশন হয়। মানুষ কি রেলের চাকা যে অন্য লোকে তার পথ ঠিক করে দেবে পয়েন্টস বদলে। পথ বেছে এই শহরে। নার্সকে তাই সব বলতে চেয়েছিল।

হঠাৎ 'মা' বলে যেন কেঁদে উঠল সে। ভয়ে আতঙ্কে তার বাঁ চোখটা একবার খুলল। মরে যাচ্ছি? মরে যাচ্ছি নাকি? ভাবো, ভাবো, তাহলে মরবে না। মৃত্যুর ঠিক আগে যেমন হতে পারে তেমন একটা স্নায়বিক বিক্ষেপে হিরণ্ময় উঠে বসল।

মরার আগে সে কিছু একটা করবে। সে কিছু রেখে যাবে। সে কি মুছে যাবে? কিছু থাকবে না তার? গাছের গায়ে সে লিখে রেখে যাবে। তার নামটা, তার পরিচয়। নিবে আসা মনের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে সে কল্পনা করল সে গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে গভীর করে কেটে কেটে লিখছে। তার ডান হাতের অসাড় আঙুলের মাথাগুলো নড়ছে একটু একটু। হিয়ার লাইজ এইচ বিপ্লবী না মানুষ। ইংরেজি কেন? দোষ কী? ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র শেকস্‌পীয়র হাসব্যান্ড অব শশী। সহজ গেঁয়ো মেয়ে

হিরণ্ময়ের মনের মধ্যে গাছের গায়ে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে উঠতে লাগল। অক্ষরগুলো ঝরে ঝরেও পড়ছে, কাঠের গুঁড়োর মতো, ছুরি দিয়ে কাটলে যেমন পড়ে। একবার একটা ভাম ধরে রেখেছিল কে কাঠের বাক্সে। রাগে, মৃত্যু যন্ত্রণায় সে কাঠের বাক্সটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খানিকটা কাঠ ছাতু ছাতু করে গুড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছিল। কাঠের গুঁড়ো ঝরছে ঝরছে

হিরণ্ময়ের দেহটা এবার ধীরে ধীরে মাটির উপরে ভেঙে পড়ল। তার একটা হাত বুকের একপাশে চাপা পড়েছে। অন্য হাতের আঙুলগুলো এখনও নড়ছে। এখনও যেন নিবে যাওয়া মনের উত্তাপ শীতল হতে হতে কিছু লিখছে। গাছ থেকে মাটির বুকেও। শশী— শশীর শরীর— কালো মাটিটাকে শশীর ঠাণ্ডা শরীর মনে হচ্ছে।

তারপর সব জুড়িয়ে গেল।

অনঘমিত্রা

এমন একজন কী করে চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে তা এখনও আমি বলতে পারি না। বংশ-পরম্পরায় সুন্দরদেহী ও রূপসীদের সংগতিতে এমনটা ঘটে কি না তা বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারে। আমার মনে পড়ছে তার পায়ে দুধের মতো শাদা পশমি চটি ছিল। গায়ে কাঁধকাটা ব্লাউজ ছিল, আর হালকা অথবা সোনালি বাদামি চামরের মতো চুল ছিল অশ্বীপুচ্ছের কায়দায় বাঁধা।

টেলিফোনে যে ডাকছিল সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারল আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না তাকে। তখন সে হাসল, বলল, 'গাড়ি পাঠাচ্ছি। চাক্ষুষ দেখলে মনে পড়বে। আমি অনঘমিত্রা'।

আশ্চর্য, এতদিন পরে। বিশ বছরের আগেকার এমন একটা সন্ধ্যার কথাই মনে পড়ল। এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে চায়ের আসরের পরে বন্ধুর স্ত্রী তাঁর উষ্ণ কোমল করপল্লব আমার হাতের উপরে রেখে বললেন- আমি শুনেছি আপনি ভালো হাত দেখতে পারেন। এই সময়েই উলের কী একটা বুনতে বুনতে পাশের ফ্ল্যাটের একজন মহিলা এসেছিল। তার হাতও দেখে দিতে হল। তা থেকেই সূত্রপাত। এ রকম একটা স্মৃতি আছে আমার বন্ধুর সেই ঘরে ঘেরাটোপে ঢাকা আলোর নিচে বেতের সেই টেবলটার উপরে অস্থির তরঙ্গের মতো পাঁচ-ছটি করতল কখনও একইসঙ্গে কখনও এক এক করে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। সে ঘরে বয়স্ক গম্ভীর কেউ ছিল না। হাসিখুশির আবহাওয়াই বরং। অবিবাহিতা তরুণী স্বামী কেমন হবে জানতে চাইলেও আর পাঁচজনের সম্মুখে সন্তানের হিসাব জানতে চায় না। ভেবেছিলাম এই কৌশলে হাত দেখা থেকে নিষ্কৃতি পাব কারণ সুন্দর মিথ্যা বানিয়ে বলার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছি তখন। প্রথম যে মহিলা এসেছিলেন তার হাত দেখে বললাম—একটি কিংবা দুটি সন্তানের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তখনই একটা চাপা হাসি তাদের মুখে ফুটে উঠেছিল। সে হাসি চাপাও রইল না, বরং উচ্ছ্রিত হল। বুঝতে পারলাম নিজের মিথ্যায় জড়িয়ে পড়েছি। ভুলে গিয়েছিলাম -কিছুক্ষণ আগে মহিলাটির বিবাহ হবে না এমন কিছু ঘোষণা করে থাকব।

ফ্ল্যাটগুলোর সামনে টানা বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় তাকে আবার দেখেছিলাম। ডেকেছিল। সেই কবোষ্ণ হালকা পরিচ্ছন্নতায় এক কাপ চা এবং ঠিক দু'খানা বিস্কিটের ছিমছাম আতিথেয়তার কথা মনে পড়ছে যে ক্যাবিনেটটার পাশে আমরা বসেছিলাম সেটিকে দেখলে সেকালের প্রকাণ্ড অরগ্যানগুলোর কথা মনে পড়ে। বলেছিলাম তাই। তখন সে আমাকে ঘরের অন্য প্রান্ত দেখিয়ে দিয়েছিল। সেখানে একটা সোফায় গীটার শোয়ানো ছিল। সে হেসে বলেছিল—কাল কিনেছি। তখন মনে পড়েছিল কিছুক্ষণ আগেই হাত দেখার অভিনয় করতে করতে বলেছিলাম—এমন দীর্ঘ সুগঠিত সুন্দর আঙুল। মনে হচ্ছে কোনো তারযন্ত্রের অভ্যাস করে দেখলে হয় না। আমার সন্দেহ হল হাত দেখে যে মিথ্যা বলেছি এই গীটারের ব্যাপারে তা আশ্চর্য রকমে ফলতে দেখেই আমায় এই চায়ের নিমন্ত্রণ করে থাকবে।

আমার যেন মনে পড়ছে সে তার নামও বলেছিল। আর তার চেহারার সঙ্গে নামটা মিলেও গিয়েছিল যেন। অনঘমিত্রা তার নাম। আমি তো নামের শেষে মিত্র' এই টুকরোটাকে প্রথমে উপাধিই ভেবে বসেছিলাম। নামটা যেন মহাভারত থেকে নেমে এসেছে যা তার মতো নায়িকাদেরই মানাত। সে নাম বলেছিল আর আমি বোধ হয় ক্যাবিনেটের উপরে রাখা একটা ছোট ফটোর কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল—আমারই। বছর দু এক আগে তোলা। আমার তখন বিস্ময় বোধ হয়েছিল

ফটোয এবং আসলে গবমিল দেখে।

লাইটপোস্টেব নিচে ট্যাক্সি আসবাব আগে বন্ধুকে বলেছিলাম—অপূর্ব পবিপূর্ণতা নয়?

মিত্রাব কথা বলছ? কিন্তু কাঠিন্যও নয?

আমাব তখন মনে পড়েছিল তাব অদ্ভুত বাঙা ঠোঁট দুটোও যেন শীতল মনে হযেছিল দেখে।

বন্ধু বলেছিল—শুনেছি খুব প্রাচীন কোনো এক বংশেব মেযে। ঝিকে নিযে একলাই থাকে।

বললাম, 'এতদিন পবে ?

বলল, 'আসুন। তাবপবে বলব'।

গাড়িটা পথেব ধাবে দাঁড়াল আব সেখানেই সে অপেক্ষা কবে ছিল।

দু-বছবে ফটো আব আসলে যাব অত গবমিল হযেছিল বিশ বছবে? ধাবণা হল বযসেব সঙ্গে রূপেব যে পবিবর্তন হয মেযেদেব, তাব সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমাব। তাব বযস তখন কুড়ি হযেছিল নিশ্চয। এই বিশ বছব বাদে তা বড়জোব চল্লিশে পৌঁছেছে। শুধু চুল আব অশ্বীপুচ্ছ নয। ববং ঈষৎ রুক্ষ আব আগেব চাইতে গাঢ় বং ধবে এমন একবাশ চুল যেন খোঁপা খুলে ভেঙে পড়েছে কাঁধেব উপবে। চোখে একটা চশমা উঠেছে। আব তাবই ফলে যেন তাকে একটু কোমল এবং অনেকটা উষ্ণ মনে হচ্ছে যদিও বক্ষ, উরু এবং নিতম্ব তেমন নিটোল নয আব।

তাব সামনে দাঁড়াতেই অনর্ঘামত্রা বলল 'আপনি না এসে পাববেন না আমি জানতাম। এখন চিনতে পাবছেন'?

স্বীকাব কবতে হল। কিন্তু অবাকও লাগল। মনে হল একে কিছুদিন আগেও দেখেছি। অনন্যা বলে চোখেও পড়েছে কিন্তু চিনতে পারিনি। মনে হল সেবাব সেই বিদেশি বৈজ্ঞানিকেব বক্তৃতাব সভায প্রথম সাবিব শ্রোতাদেব মধ্যে তাকে দেখে থাকব।

সে বলল, কিন্তু আবাব গাড়িতে উঠুন। চলুন, স্টেশনে যাব'।

'স্টেশনে'?

'সান্টানাযা আসছে আজ বোম্বে থেকে গাড়িতেই। পথে সব বলব'। আচমকা কিছু ঘটিযে দেযাব কৈফিযতে সে বিনীত হল।

'কিন্তু'।

'কিন্তু না'। তাব বক্তাক্ত ঠোঁট দুটো, আগেব মতো উজ্জ্বল লাল নয, শুধু ঠোঁট দুটিতেই যেন অনুনয ফুটিফুটি কবল। 'আপনাকে ছাড়া আব কাউকে ডাকতেই আমাব ভালো লাগল না।

সে হাসল। তাব গালে টোল খেল। এমন আগে দেখিনি।

গাড়িতে সে ঘনিষ্ঠ হযেই বসল, আব তখন তাকে দেখে মনে হল সে তাব হাতখানা হযতো হাত দেখানোব ভঙ্গিতে আমাব দিকে বাড়িযে দেবে। এ কথাটা মনে আসতেই আমাব মুখে হাসি ফুটে থাকবে। মিত্রা তা লক্ষ্য কবে বলল, 'হাসছেন'?

বললাম, 'সেই হাত দেখাব কথা মনে পড়ে গেল।

সে আমাব দিকে কিছুক্ষণ চেযে থাকল। পবে বলল, 'আমাব কিন্তু আশঙ্কা ছিল আপনি চিনতে পাববেন না'।

বললাম, 'তা হযতো হতো যদি সেদিন চাযেব নিমন্ত্রণ না কবতেন। ফটোটাব কথা আমাব মনে ছিল'।

'ফটো'?

'হ্যাঁ। আমাব মনে পড়ছে আপনাব টেবলে বোধ হয একটা রুপোব ফ্রেমে বাঁধানো আপনাব ফটো ছিল যাব সঙ্গে আপনাকে মিলিযে নেযা যাচ্ছিল না।

মিত্রা যেন লজ্জিত হযে মুখ নামাল। একটু দ্বিধা কবল সে। অবশেষে বলল, 'আবো দু-একজন

বলেছে। চশমাটার জন্যেই অমন হয়। সার্জারির আগে যেমন ছিল তেমন দেখায়। বরং যেন ফটোটার মতো'।

'সার্জারি'?

'আ, দৈবজ্ঞ, সবকিছুই জানতে হবে নাকি'? লজ্জায় এবাব তার গালে আরক্তিমতা দেখা দিল, 'আমাব নাকে আব চিবুকে কিছু খুঁত ছিল'। সে আবাব যখন মুখ তুলল তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিয়েছে। বলল সে, 'আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে যা আধুনিকতম মনোবিজ্ঞানে নির্ভুল সূত্র হতে পাবে। আমি দৈবজ্ঞদেব কথা বলছি'।

'বলুন, শুনছি'।

'দৈবজ্ঞেব ব্যাপাবেও মানুষের নিজেব যা ভাবনা তাই তাব সিদ্ধি। তাই বলেনি'?

লজ্জিত হয়ে বললাম, 'আপনাকে বলে বাখা দবকাব এখন আমি আব হাত দেখতে জানিনে।'

সে কিছু ভাবল মুখ নিচু ক'বে। আব তখন বিষয়টা আমার চোখে পডল। তার গাঢ় বাদামি চুলের মধ্যে একটি-দুটি কপোব আঁশেব মতো প্রবীণতার চিহ্ন। আব কী আশ্চর্য, এতেই যেন তার রূপ আমার চোখে আরো শ্লাঘার বিষয় বলে মনে হল।

বলল সে, 'ক্রিশ্চানদেব একটা বিধি আছে। তাবা ধর্মেব লোকদেব—তা তাব যাই বযস হোক—ফাদাব বলে। আমি ক্রিশ্চান নই। কিন্তু আপনাকে ফাদাব বলতে আমরা ভালো লাগবে। আমি ওদেব দেশে আপনার মতো ফাদাব দেখেছি'।

তাব এই অনুবোধে বাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

কিন্তু সান্টানাযা সে গাডিতে এল না। আমবা সব প্যাসেঞ্জাব চলে যাওযা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। মিত্রার মুখে হতাশাব চিহ্ন দেখা দিল।

কাজেই আমাকেই আলাপেব নেতৃত্ব দখল কবতে হল।

বললাম, 'অনেকদিন এদিকে আসা হয় না। এসেছি যখন দু একটা কর্তব্য সেবে যাই। আপনি তো বাসায় ফিববেন'?

মিত্রা বলল, 'নিশ্চয। কিন্তু এদিকের কর্তব্যগুলো তো অনেকদিনই ভুলে ছিলেন। এখন আমাব বাসায় চলুন। এক কাপ কফিব পক্ষে গভীব হয়নি রাত'। সে ঝিরঝিব কবে হাসল।

প্রকাণ্ড হলুদ রঙেব বাডি। জানলা দবজাগুলোয সাদা বঙ কবা। ফুটপাত ঘেঁষে তিন ফুট উঁচু প্রাচীব। প্রাচীরের ওপাবে দশ-বারো ফুট চওডা লন। বাডিটার তিন-চতুর্থাংশ আপিসকে ভাডা দেযা হয়েছে। সাইনবোর্ড তাব প্রমাণ। টেনিস লনের মতো তারের জালের উঁচু প্রাচীব দিয়ে পৃথক কবা। তাব সঙ্গে লনটুকুর উপবেও কোনো এক তেলের কোম্পানির বিজ্ঞাপনেব বোর্ড।

মিত্রা বলল, 'এটাকে তুলে দেব। লিজের আব ছ'মাস বাকি'।

বাডিটা আগাগোডাই প্রকাণ্ডের মাপে গডা। কিছুই ফাঁপা অথবা হালকা নেই। অভিনয় মঞ্চেব উপযুক্ত পর্দাগুলো রঙিন ব্রকেডের। শক্ত নিরেট কাঠের আসবাব। সোফাগুলো তেমন গভীব। সবকিছুতে সেকালে জাঁকালো এক ভারী আধুনিকতা। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে কলোনিয়াল হাউসেব ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কর্নিস, ফ্লুটিং, বাট্রেস, ফ্রিজ।

কিন্তু সবচাইতে ভালো লেগেছিল দোতালার সেই টেবেসটা যার উপরে একটা ক্যানপি ছিল সিমেন্টের তৈবি। লক্ষ্য করলাম বাড়িটার সম্মুখ দিয়ে ট্রামের পথ থাকলেই সেই সংঘট্ট কানে আসার পক্ষে অনেক দূর যেন। সেখানে কফি আনলে চাকর।

কফি বানাতে বানাতে মিত্রা বলল, 'এই চাকর আর একটি ঝি নিয়ে আমার সংসার। কী কবে সান্টানায়াব চলবে তাই ভাবছি'।

কফির শেষে উঠে সে তার ঘরগুলোর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করালো কখনও পর্দা সরিয়ে, কখনও

দরজা খুলে খুলে। কোন ঘরে সে শোয়, কোনটি বসার। কোনটিতে সান্টানায়া থাকবে, কোনটিতে তার বসতে ভালো লাগবে। এমন করে অনেক ঘর যা মৃদু আলোকিত, অনেক ঘর যেখানে সে আলো জ্বালল। আর এসবের মধ্যে সান্টানায়ার আসার ব্যাপারটা তার কাছে কতটা আনন্দের ব্যাপার তার প্রমাণ থেকে গেল।

সে আনন্দ উচ্ছ্বসিত বটে। চার-পাঁচ দিন পরে টেলিফোনে তার কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারলাম। বাকিটুকু প্রমাণ পেলাম যখন দেখলাম আমাকে অভ্যর্থনা করতে সে তার বাড়ির লনে নেমে এসেছে। সে গাড়ি পাঠালেও আমার যেতে কিছু দেরি হয়েছিল। সেটা তার সহ্য হচ্ছিল না যেন।

বললাম, 'সান্টানায়ার খবর পেয়েছেন'?

সেজন্যেই বিশেষ করে ডেকেছি আপনাকে। দেখুন তো। কাল সন্ধ্যায় ঠিকে ফিটন ভাড়া করে এসেছে। নিজের মালপত্রের পাহাড়ের উপরে চেপে। তার সঙ্গে আজ আপনার পরিচয় করে দেব।

অনঘমিত্রা হাসল।

তার বাড়ির সেকেলে সেই চওড়া সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠে উঠে আবার সেই টেরেসে গিয়েই বসলাম সেখানেই চায়ের টেবল পাতা। আমার মনে হল এ জায়গাটাই মিত্রার সবচাইতে প্রিয়। লক্ষ্য করলাম আলসের ধার ঘেঁষে একটা কাঠের বাক্সে মাটি বোঝাই করে রাখা হয়েছে। অনুমান হল- ফুলের কি বা লতাবাহারের চাষ হবে। টেরেসে যে দরজাটা খোলা—তার পর্দাটা সোনালি হলুদ। আমাদের ডান দিকে হুগলী নদীর উপরে আকাশে তখন কোথাও কোথাও হলুদ রঙের ছাপ লেগেছে একটা মালটানা জাহাজের চিমনির কাছাকাছি রং।

অনঘমিত্রা বলল, 'ও ঘুমিয়ে ছিল। উঠেছে। পোশাক পরে আসবে।

তারপরে সে হাসল। বলল, 'কী কাণ্ড। বলে কি প্রাচ্যের দুপুরে ঘুমানো নাকি ইওরোপের সকাল দশটা অবধি ঘুমানোর প্রথার চাইতে ভালো।

'ওদের অনেক শহরে রাত তিনটেতে পার্টি ভাঙে। কাজেই দশটা অবধি ঘুমাতে হয়।

এসব ওর কাছে কোনো যুক্তিই নয় আর। যা কিছু দেখছে তা সবই যেন চিৎকার করে বলার মতো। এত সুন্দর, এমন অবাক করা পৃথিবী যেন কল্পনাও করতে পারেনি। রাত্রিতেই বলেছে তার একটা বাংলা নাম রাখতে হবে।

বাংলা নাম'?

'হ্যাঁ। আমি বলেছি ভেবে বলব। একটা ঠিক করে দিতে পারেন'?

তার নামের সাদৃশ্য থেকেই মনে পড়ে থাকবে আর মিত্রার সেই খুশির পরিবেশের প্রভাবেও বোধ হয়। বললাম, 'শান্তনু রাখা যেতে পারে। অনঘমিত্রার আনন্দ গোপন রইল না। তার মুখ যেন আলোয় ঝলমল করে উঠল। বলল সে, সবদিক দিয়ে এত সুন্দর নাম—এ আপনার হাত দেখার মতোই আশ্চর্য ব্যাপার। বলতে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোককে না দেখে বলতে পারছি না নামকরণের জন্য প্রশংসাটা নেয়া উচিত কি না। কিন্তু তা বলার আগেই তাকে দেখতে পেলাম।

আগে কারো নাম শুনে পরে পরিচিত হলে প্রায়ই দেখা যায় কল্পনার সঙ্গে কিছু মেলে, কিছু অমিল থেকে যায়। সান্টানায়ার বেলায় তেমন কিছু হল কি না তা নিজেই বুঝতে পারলাম না। তার দৈর্ঘ্য এবং পোশাকই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চার হাত উঁচু, এবং তার দরুন গড়নটা হালকা। পরনে সর্টসের চাইতেও ছোট সর্টস। গায়ে হালকা সবুজে সোনালি বুটি তোলা ম্যানিলা শার্ট পায়ে গ্রিসিয়ান স্লিপার সোনালি-বাদামি রঙের। সর্টসের প্রান্ত থেকে স্লিপারের শুরু পর্যন্ত হালকাভাবে লালচে রোমে ঢাকা দৌড়বীরের উপযুক্ত উরু, জানু, গুল্‌ফ। কিন্তু তারপর তার মুখের দিকেই আমি চেয়ে রইলাম। এক মাথা হালকা বাদামি চুল, যার রেশমের মতো জুলপি গালের উপরে অনেকটা নেমে এসেছে। ঠোঁটের উপরে আরো হালকা রঙের গোঁফের চিহ্ন। কিন্তু তার নীলাভ চোখ দুটিতে এবং আপেলের মতো লাল ঠোঁট দুটোতে এমন একটা তাজা ভাব ছিল যা শুধু তামাকের পাইপ থেকে দূরে থাকার ফল হতে পারে না।

অনঘমিত্রা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এসো, শান্তনু, এসো। আমি তোমাকে ফাদারের সঙ্গে পরিচয় করে দিই। সুন্দর নয় শান্তনু'?

তার পোশাক যাই হোক শান্তনুকে দেখে আমার ভালো লাগল। সান্টানায়া যে বিদেশি তা আন্দাজ করেছিলাম। এখন জানতে পারলাম এই প্রথম সে দেশের বাইরে বেরিয়েছে।

চায়ের বৈঠকে যেমন হতে পারে আমাদের আলাপ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। কিন্তু তারই মধ্যে একবার শান্তনু উঠে প্রায় দৌড়ে গেল তার ঘরে, ক্যামেরা নিয়ে ফিরে এল। হুগলীর উপরে যে সামান্য রঙিন মেঘের কুণ্ডলী দেখা দিয়েছিল তার ফটো তুলল। তারপর অবশ্য চায়ের বৈঠকে ফিরে এসে বলল— তাকে সেই চপলতার জন্য ক্ষমা করতে হবে।

এ কথা যখন সে বলল তার গালে বরং মেয়েদের মতোই লজ্জার ছাপ পড়ল। বলল সে বিদেশি ভাষায়, এমন সুন্দর দৃশ্য যে পৃথিবীতে দেখা যেতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি।

তার আবেগের আতিশয্য এমন যে আমাকে হুগলীর সান্ধ্য আকাশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে নতুন ধারণা করার কথা ভাবতে হল।

কিন্তু তারপর সে বোধ হয় সামাজিকতার কথা স্মরণ করল। আমাকে বলল, 'আপনাকে ফাদার বলা হচ্ছে, কিন্তু ক্যাসক, ব্যান্ড, সারপ্লিস কিছু নেই। আপনাদের দেশে ফাদারদের বুঝি সাধারণদের মতোই পোশাক পরতে হয়'?

এই বলে সে হাসল।

তার সলজ্জ হাসিটার বিনিময়ে হেসে বললাম, 'আমি ঠিক পুরোপুরি ফাদার নই'।

অনঘমিত্রা বলল, 'দৈবজ্ঞ'।

শান্তনু বলল, 'অদ্ভুত'!

বললাম, মিথ্যা করে বললাম, এবং আশা করলাম শান্তনু তাকে একটা রসিকতা হিসেবে নেবে, 'জন্মের সঙ্গে ক্ষমতা পেয়েছিলাম, এখন বয়সের সঙ্গে একেবারে হারিয়েছি'।

শান্তনু আর এক দফা প্রশস্তি শোনাল ভারতীয় দৃশ্যপটের। বোম্বে থেকে আসতে আসতে যা তার চোখে পড়েছে। সেই দৃশ্যপটে ফুটে ওঠা নরনারী, তাদের ভাষা—সবকিছুই তার কাছে অমৃতময় মনে হয়েছে। মৃদু নেশার ঘোরে যেমন হতে পারে তেমনি আবেগবহুল ভাষায় সে তার অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করল। একসময়ে সে প্রস্তাব করল সন্ধ্যায় কেমন দেখায় কলকাতা তা দেখতে যাবে।

অনঘমিত্রা বলল, 'চলো, তৈরি হয়ে এসো'।

শান্তনু উঠে গেল।

মিত্রা বলল, 'কেমন দেখলেন'। তার মুখে একটা শান্ত আনন্দ খেলা করছে।

বললাম, 'ট্যুরিস্টদের মতোই'।

এক মুহূর্তের জন্য মিত্রার চোখের পাতা দুটোকে বিষণ্ণ বোধ হল। আর তা দেখে আমার মনে হল কথাটা তার আশানুরূপ হয়নি।

সংশোধন করে বললাম, 'কিন্তু ওর এই আশ্চর্য হওয়াটায় নকল কিছু নেই। হৃদয়টায় ভালোবাসার ক্ষমতা সাধারণের চাইতে বেশি আছে মনে হয়'। মিত্রার চোখ দুটো উজ্জ্বল হল, বলল সে, 'আপনার ভালো লেগেছে, বলুন'।

বললাম, 'তা নিশ্চয় লেগেছে। আর একটা ধারণার কথাও বলতে পারি। শান্তনুর মুখ দেখেই ধারণা হয়েছে চার হাত উচ্চতা বটে, কিন্তু বয়স তেমন নয়'।

মিত্রা বলল, 'হ্যাঁ, সুন্দর গড়ন। তাই নয়'?

শান্তনু তৈরি হয়ে এল। তৈরি হওয়া বলতে সে শুধু ক্যামেরাটা বদলেছে। কিংবা বলা উচিত রাত্রিতে ফটো তোলার জন্যে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্ লাগিয়ে এসেছে।

তার পোশাক দেখে মিত্রা একটু ভাবল, অবশেষে দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠল। নিজে উঠে গিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে এল। ব্যাগ খুলে চিরুনি বার করল। দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিল। তারপর শান্তনুর চিবুক ধরে তার সেই নরম হালকা বাদামি চুলের ডগাগুলোকে কপালের উপরে গুছিয়ে দিল। আর আমি যদি ভুল না দেখে থাকি, সে সময়ে মিত্রার চোখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছিল তাকে ঐকান্তিকতা বলা যায়।

বলল, 'আহা, শান্তনু তুমি—

টুরিস্টরা কলকাতার বর্ষায় থাকে না এটা আমার জানা ছিল কাজেই শান্তনু ফিরে গিয়ে থাকবে।

পর পর কয়েকদিন বৃষ্টি হয়ে সেদিন সকালে বৃষ্টি ধরেছে। কদিন বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। রোদ উঠতেই বেরিয়ে পড়লাম। এবং পুরস্কৃতও হলাম। যেন ভোররাতের কলকাতা দেখছি এমন জনবিরল পথ। এমনকি আকাশে পায়রা পাক খাচ্ছে, ফুটপাতে এসে বসছে এমন দৃশ্যও দেখতে পেলাম। এ দৃশ্যটাই যেন হালকা করে দিল মনকে। অথবা সাধারণত কলকাতায় যা অনুভব করা যায় না তেমন একটা খোলা আকাশে বয়ে যাওয়া বাতাসের স্বাদ পেলাম সেটাও কারণ হতে পারে।

এমন সময়ে কেউ যেন ডাকল কাউকে, মনে হল। তারপর ডাকটা পরিষ্কার কানে এল। ফাদার বলেই ডাকছে যেন। ডাকটা শুনে যত বিস্মিত হলাম, ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে বিস্ময়ের সীমা রইল না। ফুটপাতের ধারে পুরনো বাড়ির খিলানের নিচে একরকম চায়ের দোকান দেখতে পাওয়া যায়। নল লাগানো পিতলের ঘড়ায় চা তৈরি হয়। সে রকম একটা দোকানের সামনেই শান্তনু মাটির ভাঁড়ে চা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হয়তো আমাকে দেখেই।

দু'পা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে আমার বিস্ময়টা প্রকাশ করলাম। কারণ শুধু মাটির ভাঁড়ে পথের ধারের চা খাওয়া নয়। তার পোশাকও মলিন। জামাটায় কয়েকটা বোতাম নেই।

'এ কী? এখানে কেন'? এই বলেছিলাম।

চা শেষ করে পথের ধারের একটা ডাস্টবিনে ভাঁড়টাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল সে, 'চলুন, আপনার সঙ্গে যাই'।

'তুমি তো টুরিস্ট। পথ হারানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়'।

'পথ হারাইনি'। হাসল সে 'একটা দিন বাইরে কাটালাম বইতো নয়। মিত্রাকে বলে যদিও আসিনি'।

'আর কী-বা বলার আছে'। বিদায় নেবার সৌজন্য জানালাম।

কিন্তু পা বাড়াতেই বলল সে, 'কাজে যাচ্ছেন'?

'না'।

'আপনার সঙ্গে হাঁটি'।

'এসো'।

শান্তনু আমার পাশে পাশে চলতে লাগল।

সে কিছু ভাবছে বুঝতে পারলাম। সে বলল একসময়ে, 'আপনি গঙ্গা ধরে হেঁটেছিলেন'?

'সে কী? কেন'?

'আপনাদের তো এমন নিয়ম আছে। লেখাপড়া শেষ করে শুধু একটা লাঠি হাতে করে গঙ্গার পাড় ধরে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়'।

'কেউ কেউ হয়তো যান, তাঁরা সন্ন্যাসী। সকলকেই যেতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই'।

বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে কেউ ভুল সংবাদ দিয়েছে।

কিন্তু তার আগেই সে বলল, 'নিয়মটা থাকা উচিত ছিল। এত ভালো নিয়ম কেন থাকে না সেটাই আশ্চর্য'।

একটুপরে সে নিজেই বলল, 'বাছাই করার ব্যাপারেই গোলমাল। কয়েকটা বছর তো সময়, তার

মধ্যেই সবকিছু শেষ করে নিতে হবে। একটা পাতাকে ভালো করে দেখে নিলেই সে বনের সব কথা জানা যায় তা মনে থাকে না। বন উজাড় করে দেখতে হচ্ছে'।

'তা হচ্ছে'। বললাম, 'তুমি কি গভীর করে বাঁচা আর বিস্তারিত করে বাঁচার পার্থক্য করছ'?

সে ভাবল। বলল, 'ওভাবেও বলা যায় কথাটা'। তারপরেও আবার ভাবল।

আমরা পথে পথে প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটলাম। সে সময়ের মধ্যে পথে ভিড় হতে শুরু হয়েছে। ব্যস্তসমস্ত মানুষ পায়ে হেঁটে এবং নানা যানবাহনে।

বললাম, 'তোমার কি ব্রেকফাস্ট হয়েছে?'

সে বলল, 'ব্রেকফাস্টে কি আপনি বিশ্বাস করেন'?

ওটাকে কৌতুক মনে করে বললাম, 'তুমি করো না বুঝি'?

সে বলল, 'ঠিক ধরেছেন। সাধারণত আমি ব্রেকফাস্ট আমার ঘরেই খাই। যখন খিদে পায়'।

'টেবলে বসতে আপত্তি'?

'আব ঘড়ি ধরে'।

কথাটা উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে আমাব সেদিন তখনও চা খাওয়া হয়নি। কাছাকাছি কোনো চায়েব দোকানে সেবে নেব নেশার তাগাদায় এ রকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু কাছাকাছি ভদ্রগোছেব কোনো দোকান পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ এটা হোটেলপাড়া নয়।

বললাম, 'তার ফল ভালো হয় না। দ্যাখো এখন মনেব মতো একটা চায়ের দোকান পাচ্ছি না'।

সে বলল, 'চলুন তাহলে, খুঁজে দেখি'।

এই উৎসাহ যেন তাব পায়ে গতি এনে দিল। সে কখনও কখনও কয়েক পা আমাব আগে আগে চলল। এ একম একবার আমি লক্ষ্য করলাম ওর পায়ে এখনও সেই গ্রিসিয়ান স্লিপারটাই, কিন্তু একটার রং আলগা হয়ে গিয়েছে, হিলটাও বাঁকা। ওর বোতাম ছেঁড়া জামার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই।

একটা গলির মাথায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাসিমুখ আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'গ্রিল'?

হালকা ধোঁয়ার সঙ্গে পোড়া তেল এবং আমিষ ভাজার গন্ধ আসছিল। একটা ধোঁয়ায় ধূসর সাইনবোর্ডও চোখে পড়ল তিন হাত চওড়া সেই গলির মাথায়।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে সে-ই এগিযে গেল।

টেবল-চেয়ারের বদলে স্কুলের মতো ডেস্ক ও বেঞ্চ পাতা। সেগুলো ব্যবহাবে কালো। দেযালেব সাদা বং ধোঁয়ায় হলুদ। পাশের রান্নাঘর থেকে তখনও ধোঁয়া এবং বাষ্প আসছে উগ্র রান্নার গন্ধ নিয়ে।

আমি শুধু চায়ের কথা ভেবেছিলাম। শান্তনু ডিম এবং রুটি চেয়ে বসল।

অসুখের ভয়ে সে নির্বিকাব। আর রুচির কথায মনে হল পথের ধারে মাটির ভাঁড়ে ইতিপূর্বেই চা খেতে দেখেছি তাকে।

কিন্তু ঠিক রুচির কথা নয় হয়তো। সেই বাসি শক্ত রুটি এবং পুরনো ডিমের স্বাদে যে নতুনত্ব তাই যেন সে উপভোগ করল।

খেতে খেতে সে কথা বলছিল। বলল একবার, 'এটাই কি আপনার প্যারিস? তাহলে আপনার প্যারিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন'।

বললাম, 'তেমন ফাদার আমি নই। আমি কাউকে পবিত্র হতে সাহায্য করি না'।

'তাহলেও আমি ঠিব করেছি, আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা আপনাকে বলব'।

'বলো। শুধু কনফেস করতে চেয়ো না'।

শান্তনু হেসে উঠল।

সে বলল, 'সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপই হয়নি'।

'এখন কবতে পাবো। তুমি কোথা থেকে এসেছ, কী কবো, এসবও বলতে পাবো।'

আমি যেমন প্রশ্ন কবেছিলাম সে ও ঠিক তেমন উত্তব দিল হাসি হাসি মুখে।

'আমেবিকা, বাবা-মা নেই। এবোনটিক্যাল সার্টিফিকেট আছে। ছবি আঁকা শিখছি। বযস উনিশ।'

উনিশ। তা হোক। মিত্রাব সঙ্গে পবিচয–

সে বলল, 'এখানেই প্রথম। মিত্রাব চিঠি পেযেই এসেছি এদেশে যদিও। আব মিত্রাব তুলনাও হয না। এমন ফ্রেন্ডলি আব আমি কাউকে দেখিনি। আব কী সুন্দব'।

'হ্যাঁ। মিত্রা সুন্দবী'।

সে হাসল। বলল, 'ফাদাব, তুমি বড কৃপণ। আমাব ফ্রেন্ড সম্বন্ধে তুমি বড নিরুত্তাপ। নাকি ফাদাবদেব নিয়মই তাই'।

বললাম, 'মিত্রাব মতো সুন্দবী এদেশে বিবল'?

'এদেশে'? ধর্মেব মতো পবিত্র কিছু বলছে সে, এমন সুবে বলল শান্তনু 'একটা সোনাব বল নিশ্চয়ই সুন্দব। একটি আপেলও। মিত্রা আপেলেব মতো, কাবণ তাতে বসেব আশ্বাস আছে—যা সোনাব বলে নেই'।

কিন্তু আমাদেব আলাপে বাধা পডল। সস্তা গ্রিলে যেমন আসতে পাবে ঠিক এমন সমযে তেমন একজন নতুন ক্রেতা সেখানে ঢুকল। সে শ্রমিক তা তাব আকৃতি এবং পোশাক দেখেই প্রকাশ যদিও তাব বযসটাও নজবে এল। মুখে কযেকদিনেব পুবনো পাকা দাডি। এ [illegible] তাব নাক [illegible] আব তাব এই নাকটাই বিশিষ্ট তাব সর্বাঙ্গে উপমাটি [illegible] শুকচঞ্চু। চা চাইল [illegible]

এ সত্ত্বেও শান্তনু যা কবল তাতে বিব্রত বোধ না কবে পাবলাম না। দু একবাব [illegible] যখন দৃষ্টি আকর্ষণ কবাতে পাবল না শ্রমিকটাব [illegible] কাছেই তখন উঠে গেল। [illegible] যে-বেঞ্চে বসেছিলাম সেটাব জাযগা আছে তা দেখিযে দিল।

কিন্তু শ্রমিকটা তাব এ ব্যবহাবে এত হতচকিত হযেছিল যে নবম হাত ছাডিযে নিযে [illegible] দিকে অবাক হযে চেযে বইল।

শান্তনু অবাক এবং বোধ হয কিছুটা লজ্জিত হযে ফিবে এল।

দবজাব পাশে একটা টুলে শ্রমিকটা কাচেব গ্লাসে চা আব হাতে একটা গোল রুটি নিযে বসল [illegible] গ্লাসে ডুবিযে নবম কবে কবে রুটিটা খেল। কোঁচডেব কাপডে মুখ তুলে কপাল মুছে শ্রমিকটা বেবিযে গেল দোকান থেকে।

কিছু দূবে আমবাও বেবোলাম

কিন্তু তখনও আমাব চিনতে বাকি ছিল শান্তনুকে।

কিছু দূবে গিযে ভেবেছিলাম সামনেব স্ট্যান্ড থেকে অমনিবাস ধবব, একটা পানেব দোকানেব সামনে থমকে দাঁডাল শান্তনু। সেই শ্রমিকটাই সেখানে বিডি ধবাচ্ছে। শান্তনু দাঁডিযে আমাকেও দাঁডাতে ইশাবা কবল।

শ্রমিকটি ঠেলাওযালা। ফুটপাতেব ধাবেই মালবোঝাই তাব ঠেলাটা ছিল। সে গিযে ঠেলাটাব ডাণ্ডা ধবে যখন তুলছে শান্তনুও একশো মিটাব দৌডেব প্রতিযোগীব মতো দৌডে গিযে ডাণ্ডাটাকে চেপে ধবল। কিছুক্ষণ নির্বাক দ্বন্দ্ব—এ ওব হাত ঠেলে দেয। তাবপব শান্তনু তাব বিদেশি ভাষায এবং ভাঙা উর্দুতে কী বোঝাতে লাগল। ঠেলাওযালা যত তাকে ছেডে দিতে বলে, শান্তনু তত তাকে নিবস্ত কবাব চেষ্টা কবে। আব সর্বক্ষণই সে হাসছে। দু-চাব জন কবে লোক জমে ভিড হযে যাবে মনে হল। আমি কিছু বলতে যাব ভাবছি ঠিক এমন সমযে দেখলাম হঠাৎ ঠেলাটা নডে উঠল। ডাণ্ডায যে দডি লাগানো থাকে তাতে বুক দিযে দু-হাতে ডাণ্ডা আঁকডে ধবে ঠেলা নিযে চলতে শুরু কবেছে শান্তনু। এবপবে বোধ হয মাল এবং ঠেলা লোকসান হওযাব ভযে ঠেলাওযালা ঠেলাব পিছন দিক ধবে গাডিব গতি

নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল।

সেদিনও অনঘমিত্রার ফোন এল। তখন দুপুরের রোদ ভালো করে পড়েনি।

তার কথা শোনবার আগেই আমার অনুমান হল সে যেন বিশেষভাবেই উৎকণ্ঠিত।

বলল সে, 'মুশকিল হয়েছে'।

বললাম, 'শান্তনু সম্বন্ধে কিছু নাকি'?

'আমার দুর্ভাগ্য, তাই। সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য ডাকতে গিয়ে তাকে দেখিনি, তারপর এত বড় দুপুরটা গেল—এখনও ফেরেনি'।

একটু চিন্তা করে নিতে হল সংবাদটা দেয়ার আগে। তারপরে বললাম কোথায় তাকে শেষ দেখেছি। কথাটা কোমল করে বলা সত্ত্বেও আমার নিজের কানেই ঠাট্টার মতো শোনাল।

কিন্তু উত্তর এল, 'আপনি দয়া করে থাকবেন। আমি এখনই আসছি'।

এটা বোধ হয় আমার দুর্বলতাই যে তাকে বিমুখ করতে পারলাম না। তার বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে আসতে যতটা সময় লাগতে পারে তার চাইতে অনেক কম সময়ে সে পৌঁছে গেল। তাকে সঙ্গে করে সেখানেই গেলাম। যেখানে শেষ দেখেছিলাম শান্তনুকে। পথের ধারের দোকানদাররা, দেখা গেল, তাকে ভুলতে পারেনি, তাদের কাছে সন্ধান নিয়ে চলতে চলতে ঠেলাওয়ালা যেখানে মাল নামিয়েছিল সেই দোকানে পৌঁছোনো গেল। তারা ঠেলাওয়ালার নাম জানে। কিন্তু তার নাম জেনে কী লাভ? শান্তনুকে পাওয়া গেল না।

সেদিন যে অনঘমিত্রা ফিরে গিয়েছিল তার মতো ক্লান্ত আর কাউকে খুব একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ফেরবার পথে বলল, 'আপনার কি কোনো জরুরি কাজ আছে'?

এ যেন সে নয় যে ফোনে হাসতে হাসতে ঘোষণা করে—চাক্ষুষ দেখুন, মনে পড়বে।

উত্তর পাওয়ার আগেই বলল, আবার, 'ফিরে গিয়ে খুব একলা লাগবে'।

তার বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন রাস্তায় প্রথম আলোগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। বাড়িগুলোর মাথায় দিনের দু'একটা রশ্মি তখনও দেখা যাচ্ছে।

মিত্রার বসবার ঘরে বসলাম। ঘরটা অন্ধকার ছিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে সে আলোটা জ্বালল। একবার অভ্যাসবশে জিজ্ঞাসা করল কফি কিংবা চায়ের দরকার আছে কি না। তারপর স্তব্ধ হয়ে বসল।

এই সময়েই শব্দটা আমাদের কানে এল! কতকটা শেয়ালের ডাকের মতো কতকটা বা শিসের মতো।

অনঘমিত্রাই প্রথম। সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর আঁচলটা লুটিয়ে চলল মাটিতে সে যখন ছুটে বার হল। করিডোরটা ঘুরে যেখানে একটা ঝুলবারান্দার মতো ভাঁজ নিয়েছে সেখানে তার কাছাকাছি যেতে পারলাম। কিন্তু সে আবার আমাকে ছাড়িয়ে গেল।

তার ফলে আমি পর্দার কাছে পৌঁছোনোর আগেই সে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে কথা বলতে শুরু করেছে।

'কোথায় ছিলে'?

উত্তর নেই।

'খেলে কোথায়'?

'কেন? বাড়িতে ফিরে। রান্নাঘরে তোমার ফ্রিজিডেয়ারে আমার মতো তিনজনের খাবার এখনও আছে'।

তখন আমি ঘরে ঢুকে শান্তনুকে দেখতে পেলাম।

পশ্চিমের জানলা দিয়ে ডুবন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে। আর ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে সে। মনে হল গালে হাতে এবং জামাতেও অনেক কয়লার কালি।

হেসে বললাম, 'কয়লাও রয়েছে নাকি'?

সে-ও হাসল। বলল, 'না। দ্যাট ওয়াজ রিঅ্যাল ওয়ার্ক'।

তার সর্টসের পকেটে হাত দিল সে। কিছু খুচরো পয়সা বার করে আনল। বলল, 'সব দেখাতে পারব না। কিছু খরচ করেছি। এক টাকা ছ' আনা পেয়েছিলাম'।

'বেশ করেছ। কিন্তু পয়সাটা কে দিল? ঠেলাওয়ালা'?

'স্যুয়োর'।

'ভালো করোনি, আজ তার উপার্জন এক টাকা ছ-আনা কম হল'।

'হোয়াট'? শান্তনুর উচ্ছ্বাস যেন স্তম্ভিত হল।

মিত্রা বলল, 'আ, ফাদার, এরপর তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে দশগুণ দিয়ে দেবে শান্তনু'।

কথাটা ঠিক হল না শান্তনুর কাছে। সে নিঃশব্দে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল।

তখন আলো জ্বালল মিত্রা।

বলল সে, 'হয়েছে। এখন বোসো। তোমাদের জন্য কফি আনতে বলে আসি'।

আলোটা উজ্জ্বল। ঘরের মধ্যে আমি এবং শান্তনু। আজ সারাদিন জামা আর সর্টস বদলানোর সময় পায়নি। ঠেলাওয়ালাদের কাজ করলে যেমন নোংরা হতে হয় তেমন নোংরাই বটে।

বললাম, 'কফি আসবার আগে মুখ হাত ধুয়ে এলে হতো না'।

সে তখনও কিছু ভাবছিল, বলল, 'পয়সা না নিলে কাজ হয় সেটা'?

প্রশ্নটার উত্তরের জন্য আমার দিকে চেয়ে রইল সে।

তারপর সে ঝিমঝিম্ করে হাসল। বলল, 'অন্যায় করেছি। কিন্তু জানো, ফাদার, ভালো অন্যায়। এক টাকার কাগজ আর ক্লিপ কিনেছি। আর, কী আশ্চর্য দেশ তোমাদের, পথের ধারে টিন থেকে চারকোল ঢালছে দেখলাম এক বুড়ি। বেছে বেছে মাঝারি নরম এক থাবা কুড়িয়ে এনেছি পকেটে পুরে। কাজেও লাগিয়েছি'।

শুনেছিলাম বটে কথাটা ওরই কাছে। এদিক-ওদিক চাইতেই দেয়ালের গায়ে আঁটা কাগজটাকে দেখতে পেলাম। তার উপরে কাঠকয়লার অনেক আঁচড়। একটু কাছে যেতেই তা ছবি হয়ে ফুটল।

ছেলেরা পথের উপরে ফুটবল খেলছে, দূরে ধান গাছের ঢেউ, আর তারই মাঝখানে একটা বিরলপত্র ভ্রষ্টশ্রী গাছের গায়ে তুলে দিয়ে রাখা একটা ঠেলাগাড়ির কঙ্কাল। আর তারই গায়ে কেউ যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। না, ঠিক হল না। যেন ক্রুশে আবদ্ধ কেউ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে গ্রোটেস্ক।

কফি আনল ঝি। তার সঙ্গে এল মিত্রা।

তার বসবার ভঙ্গিতে বোঝা গেল সে খুব ক্লান্ত। কাঁধ দুটো নুয়ে পড়েছে। মিত্রা একবার তার চশমাটা মুছল। আর আমার তখন মনে হল তার চোখ দুটো যেন লাল হয়ে আছে।

কফি পানের সমস্ত সময়টাই টেবলের এটা-ওটা নাড়তে লাগল শান্তনু। অবশেষে একবার খুলে একবার গুটিয়ে যায় এমন করে সে বলল, 'এ নয় সে। আকাশেও এমন দেখেছি। এ শুধু জড় জাগতিক। এমন উচ্চাশা হয় যখন শব্দবেগ পার হওয়া যাচ্ছে তখন হয়তো অন্য কোথাও পৌঁছে যাব কিন্তু. সে কী বলল তা বোঝা গেল না এরপরে।

আমার অনুমান হল সে বোধ হয় বৈমানিকদের সেই অনুভূতিটার কথাই বলছে · শব্দের গতিবেগ পার হওয়ার সময়ে বজ্রের মতো শব্দ শুনে মনে হয় শব্দের বেড়া পার হয়ে তারা কোথাও এসেছে। কিন্তু গতি একটু কমার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা বজ্রনাদ তাদের মনে করিয়ে দেয় সম্মুখগতি সত্ত্বেও আবার তারা বেড়ার মধ্যেই ফিরে এল। শান্তনু বলল, 'কফিটা ফিকে হয়েছে, মিত্রা'।

আর তখন আমার মনে পড়ল সকালের সেই কলসিপক চা খাওয়ার ঘটনা আর তার সকালের সব ব্যবহার শব্দবেগ অতিক্রমণের চিত্রকল্পের পাশাপাশি।

ভুলে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বোধ হয় অনাকাঙ্ক্ষা। নিরপেক্ষতার দরুন ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনাটার প্রায় একঘণ্টা আগে যার জন্মদিন সেই এসে উপস্থিত।

শান্তনুকে দেখে নিমন্ত্রণটার কথা নিশ্চয়ই মনে ফিরে এল। বরং বিব্রতই হলাম সে নিজেই এসেছে দেখে।

বললাম, 'তুমি নিজেই এলে? ফোনে বললেই হতো'।

কিন্তু তা বলেই মনে হল নিমন্ত্রণের কথা ফোনেই-বা মনে করিয়ে দিতে হবে কেন? সুতরাং তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'আজ আবার তোমাকে ঘিরে উৎসব। কিছু জানবার ছিল নাকি'?

সে বলল, 'সকাল থেকে আমাকে ভুলে গিয়েছে মিত্রা। অথচ আমারই নাকি জন্মদিন। কাজ আর কাজ। সে যা আয়োজন করছে মনে হল বিভিন্ন দেশের অ্যাম্বাসাডররা আসবে। আমি তাকে সাহায্য করতে গিয়ে অসুবিধাই ঘটাচ্ছিলাম বরং'। এই বলে সে হাসল। এবং উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বিশেষ করে বইয়ের তাকের পাশে এবং কুলুঙ্গিতে রাখা মাটির পুতুলগুলোই তার খুব ভালো লাগল যেন।

'বলে এসেছ তো'?

শান্তনু বলল, 'এখন মনে পড়ছে বেরুতে নিষেধ করেছিল। তার চাইতে চলুন আমরা আমার ঘরটাতে বসে গল্প করব। মিত্রার অ্যাম্বাসাডররা না আসা পর্যন্ত'।

তাই যেতে হল।

মনে পড়ছে এ রকম কোনোসময়ে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এসেছিল। কিন্তু তার কাছাকাছি অকৃত্রিম হাসির শব্দও। সুতরাং সেটার কারণ বলা শক্ত লঘু উচ্ছ্রিত সন্তোষের গভীর অন্তঃস্থলের কোন অসন্তুষ্টি সেটা।

শান্তনুর ঘরে পৌঁছে মনে হল সেখানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। জানলার পর্দাগুলো নামিয়ে রাখা। সেকেলে সেই বিরাট পালঙ্কটি স্থানচ্যুত না হলেও স্থান পরিবর্তন করেছে। বসবার আসনগুলো যেন এককোণে যড়যন্ত্র করছে। ফলে ঘরখানাকে—সে বাড়ির ঘরগুলোকে আধুনিক মাপে হল্ বলা যেতে পারে—শূন্য বলে মনে হচ্ছে।

বললাম 'পায়চারির জায়গা করে নিয়েছ'?

তারপর বিষয়টা চোখে পড়ল। দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখা দু-একখানা ক্যানভাস, এবং তাদের কাছাকাছি ছোট একটা টিনভর্তি কাঠকয়লাও দেখতে পেলাম।

বললাম, 'স্টুডিওর পক্ষে আলো কম হবে না তো'।

লক্ষ্য করলাম শান্তনু যেন বিশেষভাবেই অন্যমনস্ক। তার চোখ দুটোতে যেন অনেক দূরের কোনো মেঘের ছায়া ভাসছে।

তার স্কেচগুলো চোখে পড়ল। কোথায় যেন শুনেছিলাম একজন চিত্রকর একটা কফি কাপের ছবি আঁকতে বসেছিল। একের পর এক স্কেচ এঁকে সে চেষ্টা করেছিল কফি কাপের আত্মাকে ড্রয়িং-এর রেখা থেকে মুক্তি দিতে। এটা হয়তো একটা 'অপ্রিয় সমালোচনা যাতে শ্লেষও আছে। তার স্কেচগুলো দেখে এই সমালোচনার কথা মনে পড়ল আমার। পাগল নাকি।

বললাম, এর আগের জন্মদিনে তুমি কোথায় ছিলে'।

'আমেরিকা'।

'তার আগে ।

'ওই'।

'জন্মদিনটার কথা তো তুমিই বলেছিলে ।

'আদৌ না। মিত্রা, এখন দেখছি, আমার বিষয়ে আমার চাইতে বেশি জানে'।

'বুঝলাম না'।

'ঠিক তাই। আমি কোন বছর কোন স্কুলে পড়েছি, কোন হস্টেলে থাকতাম -আমার সন্দেহ হয় হয়তো এসবও তার অজানা নেই।

কিন্তু এ কথাগুলো বলতে বলতে সে অন্য খাতে চলে এল। আর তা থেকে বোঝা গেল এ আলাপে তাকে টেনে এনেছি বটে কিন্তু সে অন্য কিছু ভেবে চলেছে।

বলল সে, 'রিডিকুলাস'।

'কী'?

'আমার সেদিনের ব্যাপারটা। ঠেলাওয়ালার ভোকাব্যুলারি আর আমার ভোকাব্যুলারি এক নয়। এটা একটা মূল পার্থক্য। সে আমার ভোকাব্যুলারির কিছু শিখতে পারে, আমি ধার নিতে পারি কিছু তার থেকে। কিন্তু হোম বা সুখ বলতে আমি যা বুঝি সে কি তা বোঝে? সেদিন আমি কাউকে অনুকরণ করে থাকব। বরং আজকের এই ব্যাপারটাই আমাদের পক্ষে ঠিক। আমার অনেক দিন মনে থাকবে আমার সেই ছেলেমানুষির জন্য লোকটার কিছু লোকসান হয়েছিল।

আমার তখন মনে হল তার চোখ দুটো আদি বটের অন্ধকার থেকে ডুব দিয়ে এল।

এমন সময়ে মিত্রা এল সেখানে।

তাকে অনেকবার খুশি হতে দেখেছি ইতিপূর্বে। কিন্তু এমন বোধ হয় আর কখনই নয়। তার সেই খুশি যেন তাকে বদলে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। তার চুলের কথাই ধরো। কী দিয়ে মেজেছে সে-ই জানে, কিংবা মাজলেই শুধু তেমন হয় না—গাঢ় বাদামি চুলগুলো যেন কচি পাতার মতো চিকন। আর সম্ভবত তার দিকে নিমেষহীন হয়েই চেয়েছিলাম। তার গালে রক্তিমা খেলা করল।

সে বলল, ওরা সবাই এসেছেন, শান্তনু তুমি পোশাক পরে এসো'।

'পোশাক'

'তুমি আমাকে কথা দিয়েছ শান্তনু।

জন্মোৎসবের সভায় আমরা সেদিন ঠিক দশজনই ছিলাম। আমি, শান্তনু এবং মিত্রা ছাড়া আর সাতজন। সকলেই আমার পরিচিত নয়, কিন্তু অন্তত তিনজনকে চিনেছিলাম। মাথায় টাক, হাস্যময় মুখ, এবং যিনি অত্যন্ত বেশি ক্রিকেট খেলেন তাঁকে এ অঞ্চলের সবশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত স্থূলদেহ, ঠোঁটের কাছে শ্বেতি, চুরুটখোর রক্তহীন লোকটাকে সংখ্যাতত্ত্বের দিকপাল হিসেবে জানতাম। আর মুখে সাদা দাড়ি চোখে সোনার চশমা পরা শান্ত লোকটি শারীরবিতত্ত্বের জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিশ্চয়ই সুপরিচিত।

এসব দেখে আমার ইতিপূর্বে যেমন হয়েছিল একদিন, মনে পড়ল সেই বিজ্ঞান সভার কথা যেখানে সেই বিদেশাগত অধ্যাপকের বক্তৃতা হয়েছিল এবং যেখানে প্রথম সারির শ্রোতাদের মধ্যে অনঘমিত্রাকে দেখেছি এমন একটা স্মৃতি আছে আমার। আর সে জন্মোৎসবে একজন মাত্র মহিলাই ছিল যাকে মিত্রা তার বোন বলে পরিচয় দিয়েছিল। একটিমাত্র আলোতে কিংবা একটি ফুলে যে কোনো গৃহই সুন্দরতর করা যায় তা মিত্রা জানত তার প্রমাণ সেই একটিমাত্র নিমন্ত্রিত মহিলা

জাদুঘরে কিছু কাজ ছিল সেই শনিবারে। প্রায় দুপুর দুটোর এসে তবে কাজ শেষ হল। তখন শীত এসেছে কলকাতায়। কাজটার কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম ফুটপাত ধরে। কাজেই অমনিবাস ধরবার কথা মনে আসেনি। কিন্তু পথের সেই দুপুরের জনবিরলতা এখানে এসে হঠাৎ যেন একটা ভিড়ে পরিণত হয়েছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য ফুটপাত থেকে পথে নামলাম। অপরিস্ফুটভাবে মনে হল এটা বোধ হয় সেই সিনেমা হলটা যেখানে একটা নাটক অভিনীত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। কোনো এক

শেক্‌স্‌পীয়র সোসাইটিই—যদি ঠিক মনে করতে পেরে থাকি। যাচাই করার জন্য চোখ তুললাম। আর তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। খানিকটা অবিশ্বাসের পর বিস্মিত হলাম। তারপর আনন্দিত। দর্শকরাই অপেক্ষা করছে। এবং তারা ফ্যাশানেবল সোসাইটির সুবেশ সুন্দর নরনারী। আর তাদের মাঝে বরং তাদের কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শান্তনু এবং মিত্রার বোন বলে পরিচিতা সেই মহিলাটি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা করছে। একটি অসাধারণ সৌন্দর্য অনুভূতির স্পর্শেই যেন আমার সমস্ত অন্তর পুলকিত হয়ে উঠল। ভোরের আলোয় শার্সির উপরে চড়ুই পাখিকে ঠোঁট ঠুকতে দেখলে যেমন হতে পারে। কিন্তু এই সুখবোধের কারণটা ঠিক কোথায় তা খুঁজে পেলাম না। কখনও মনে হল সেই পাড়ছাড়া নীল রেশমের শাড়িটা, আবার কখনও মনে হল শান্তনুর সোনালি-বাদামি চুলের স্তবক। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই মনে হল ওটা তাদের পাশাপাশি দাঁড়ানোর এক বিশেষ ভঙ্গি, কিংবা তাদের মুখের সেই উজ্জ্বলতা যা সকলের আলোর মতোই তাজা কিছু।

পাশ কাটিয়ে চলে এলাম। আর তখন আমার অনুভব হল এতদিনে মিত্রার স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠেছে শান্তনুতে।

আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোরটা পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলাম মনের আনন্দে। এবং এই আনন্দ থেকেই টাটকা তামাকের স্বাদের কথা মনে পড়ে থাকবে। বোধ হয় সেই আনন্দ এবং সেই স্বাদের স্বাজাত্য ছিল।

দোকানটায় যখন ঢুকছি, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেউ যেন আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, বিস্মিত হল, প্রকাশ করল তা।

অনঘমিত্রাই। তার চোখের কালো সানগ্লাস, গলা পর্যন্ত বোতাম বন্ধ করা কর্কশ টুইডের সেই জামা আর মাথায় উপরে চূড়া করে বাঁধা চুলের জন্যই তাকে চিনতে পারিনি। এ যেন আর কারো মেক আপে চলেছে।

সে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে'?

'জাদুঘরে, কাজ ছিল। তুমি'?

মিত্রা তার হাতের সিগারেটের টিনটা দেখাল।

সিঁড়ির উপর থেকে বললাম, 'দাঁড়াবে'?

'কাজ আছে'।

সে চলে গেল।

একটা টাটকা স্বাদের স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তামাকের যে বিশেষ ব্লেন্ডটার স্মৃতি মনে এসে তামাকের দোকানে টেনে এনেছিল সেটা তখন উপস্থিত ছিল না। দোকানদারকে মৃদু অনুযোগ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ট্যাক্সি খোঁজবার দিকে মন ছিল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাকে দেখতে পেলাম। যে লোকটা চলে গেছে বলে জানি তাকে উপস্থিত দেখলে বিস্ময়বোধ হয়।

চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে মিত্রা যেন অপেক্ষা করছে একটু সরে গিয়ে বরং যেন দেয়াল ঘেঁষে।

'আমার জন্যে অপেক্ষা করছ, ধন্যবাদ'।

সে এগিয়ে হাসল। সলজ্জভাবে হাসল। বলল, 'কতক্ষণ বেরিয়েছ বাড়ি থেকে? লাঞ্চ হয়েছে'?

'হ্যাঁ। খবর কী তারপর বল'।

'আচ্ছা, ফাদার, জাদুঘর থেকে এই পথে এলে'?

'হ্যাঁ'।

'দেখেছ ওদের? মানে শান্তনুর কথা বলছি'। সে আবার হাসল।

বললাম, 'আমিও বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে। একটা স্বপ্ন যেন সার্থক হয়েছে'।

'কেমন, সুন্দর নয় শান্তনু'? সে হাসল ঝিরঝির ক'রে।

একটু থামল সে। তার পাশে পাশে ফুটপাতের ধারে থামটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। একটা ট্যাক্সি ভিড়বে মনে হল। মাথা নেড়ে নিষেধ করল সে। বলল, 'ভারি প্লেজ্যান্ট'।

তার হাতের ব্যাগটা দোলাতে লাগল সে।

বলল, 'আচ্ছা, ফাদার, তুমি রেসে গিয়েছ কখনও, মানে হর্সরেসিং'?

'না'।

'শুনেছি, ভারি একসাইটিং'।

'বোধ হয়'।

সে ইতস্তত করল। তার চোখ দুটো দেখা গেল না সানগ্লাসেব আড়ালে।

গালে রক্তের ঢেউ দেখা গেল।

মৃদুস্বরে বলল, 'যাবে'?

'কিন্তু...

'কিন্তু নয়। এই একবার'।

সে আমার বাহুর উপরে হাত রাখল।

বেসকোর্স সকলের কাছে একসাইটিং কি না জানি না। সেই বাদামি ধাবমান পেশিগুলো, সেই ঘর্মোজ্জ্বল রোমশ ত্বক এসব নিশ্চয়ই উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে কোনো কোনো সময়ে। কিন্তু সেদিন মিত্রা নিশ্চয়ই উত্তেজিত হয়েছিল।

ট্যাক্সিতে সিগাবেটের টিনটা কাটল সে। সিগাবেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে ব্যাগটা খুলে হাঁটকালো।

বললাম, 'লাইটার'?

লাইটার দিলাম। আব তখন সে আবাব হাসল।

বিকেল পর্যন্ত সে বেসকোর্সে কাটাল। সে যে কত উঁচু গলায় আনাড়ি চ্যাঁচামেচি করেছিল তাও বুঝতে পারলাম আবার যখন সে ট্যাক্সিতে এসে বসল। গলাটা ফেটে গিয়েছে। কপালের ঘাম সে মুছে ফেলেছে, কিন্তু চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘামের স্যাঁতসেঁতে ভাবটা তখনও আছে।

খানিকটা দূরে চৌরাস্তায় এসে ট্যাক্সিকে ফুটপাতের ধারে নিল সে।

'নামছ'?

বলল, 'ধন্যবাদ, ফাদাব'।

তারপর হেসে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে লঘুস্বরে বলল, 'পথে খেয়ো'।

বললাম, 'সে কী? তোমারও তো লাগবে'।

'অনেক দিন থেকেই খাই না'।

ফুটপাত ধরে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে মিত্রা এগিয়ে গেল। তাব মাথায় বাদামি চুলগুলো মাথাব উপরে তুলে বেশ একটা বড় এলোখোপায় বাঁধা। লক্ষ্য কবলাম কর্কশ বঙের টুইড কোটটার নিচে শাড়িটা আজ পাড়ছাড়া সাদা খদ্দরের।

তার অদ্ভুত উত্তেজনার সেই তুঙ্গ তরঙ্গের কথাই মনে হল।

জাদুঘরের কাজটা ছিল ছবিব একজিবিশান। সিজনেব প্রথম প্রদর্শনী। যখন অনেক ছবি এসে গিয়েছে আমার একদিন শান্তনুর ছবির কথা মনে পড়ল। তার সেই চারকোল স্কেচটার থেকে যদি বিবর্ণ হলুদ, লাল এবং বটল গ্রীনে গাছেব গুঁড়িতে হেলানো সেই ঠেলার ক্রুশটা এঁকে থাকে তবে তা দেখানোর উপযুক্ত হবে বটে।

কিন্তু শান্তনুকে পেলাম না। চাকর বলেছিল মিত্রা আছে। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ক্যানপির সেই টেরেসটাতে পৌঁছে গেলাম। (এখন মনে পড়ছে শান্তনুর দরজায় ছোট একটা তালা ঝুলছিল

সেদিন, যদিও দেখে থাকলেও তখন সেটাকে আমল দিইনি)।

মিত্রা সেই মাটিভরা কাঠের টাবের কাছে একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। দিনের পড়ে-আসা আলোয় ঝুঁকে পড়ে কিছু সে দেখছিল। মনে হচ্ছে তার দস্তানা-পরা হাতে একটা সন্না, অন্য হাতে একটা বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ছিল।

আমার চলার শব্দে সে বুঝতে পারল না আর কেউ এসেছে।

একবারের বেশি ডাকতেও হল।

তখন সে চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে বসল। ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা রাখল টাবের মাটির উপরে।

চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুছে আবার পরল।

অনেকক্ষণ থেকে বোধ হয় চোখের কাজ করছে, এমন ক্লান্ত দৃষ্টি। প্রস্তাবটা করা সম্ভব হল না। কিছু না বলে বুঝতে পারা যায়। রং জ্বলে যাওয়া একটা শিফন পরনে। গায়ে সোয়েটারটার সাদা রং যেন হলুদে হয়ে গিয়েছে বয়সে। আর সব মিলে তাকে বর্ষিয়সী কোনো অধ্যাপিকার মতোই দেখা গেল।

মনে পড়ল সান্টানায়াকে আনতে যাওয়ার সেই উৎসাহ থেকে সেদিনের সেই উত্তেজনা পর্যন্ত। যদিও থিয়েটারের সামনে শান্তনুকে তার সঙ্গিনীর পাশে দেখে একটা উৎকর্ষতার অনুভূতি হয়েছিল বললাম, 'মিত্রা, শান্তনু নামটা রেখেছিলে তুমি। আর -আর তা ছাড়া সে তোমার নিমন্ত্রণেই এসেছে তো বটে'।

কথাগুলো দিয়ে তার সামনে এই ধারণাটাকে রাখতে চাইলাম, শান্তনু তোমারই বন্ধু ছিল। ভুল যদি করেও থাকে।

সে উত্তর দিল না।

আন্দাজ করলাম সে ফিরে বসে টাবের সেই সূক্ষ্ম রোঁয়া মতো বালবগুলোতেই মন দেবে।

কিন্তু বলল সে, 'এগুলো জানো ফাদার খুব রেয়ার। শীতের বর্ষাতেই অঙ্কুর হয়। আমি জল ছিটিয়ে দেখছি অঙ্কুর ফোটে কি না'।

তারপর সে বলল, 'বোসো।'

একটু হেসে আবার বলল, 'আমার কোন সৌভাগ্য তোমাকে এখানে আনল ফাদার'?

বললাম, 'চলো। ঘরে গিয়ে গল্প করি'।

হাত থেকে দস্তানাটা খুলল সে। দস্তানামুক্ত আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

তারপর সে শান্তনুর কথা উত্থাপন করল।

সে বলল, 'শান্তনু, জানো ফাদার, আমেরিকায় ফিরে যেতে চায়'।

'বেশ তো, তাই যাক না হয়'।

তখন টেরেসে দিনের আলো হলুদে হয়ে এসেছে। শীতের বিকেলের সেই হলুদে আলো অদ্ভুত রকমে বন্ধ্যা অসার্থক কিছু বলে মনে হল। সে তার দৃষ্টিকে আমার মুখ থেকে সরিয়ে নিল। সে কিছুই বলল না। স্তব্ধতাই বরং দেখা দিল। ধূসর ফাঁপা স্তব্ধতা। কিন্তু তা যেন কথার চাইতে স্পষ্টও বটে। আর তখনই বুঝতে পারলাম এটা সে চায় না।

বলল সে, 'ফাদার, শান্তনু শিল্পী তো, কি বলো? গভীর প্রগাঢ় একটা শান্তভাবে, তাকে বোধ হয় শান্তিই বলে, তার মনের পক্ষে নিজেকে বুঝতে পারা সহজ হবে না? এটা কি সব অবস্থাতেই তার সম্বন্ধে বলা যায় না'? মনে হল সে ঠিকই বলেছে।

সেই পরিবেশে দীর্ঘশ্বাস গোপন করা যায় না। যদিও মিত্রা স্তব্ধ হয়েই বসে রইল।

পরে হাসার চেষ্টা করে বললাম, 'আমাদের প্রত্যেককেই শব্দ এবং রেখার বেড়া ভাঙতে চেষ্টা করতে হচ্ছে। আর এখানে নিজের হয়ে নিজেরই চেষ্টা করতে হয়। শুধু গুমগুম শব্দ করে শব্দ-গতিবেগের বেড়া ভাঙা যথেষ্ট নয়'।

তার আসনটা আরামপ্রদ নয়। অনেকক্ষণ ধরে মাথা হেঁট করে কাজ করলে পিঠের পেশিগুলো আড়ষ্ট হয় আর মুখে না বললেও তা দেখেই বোঝা যায়। তেমন ক্লান্ত মনে হল তাকে।

তা সত্ত্বেও আমার কথার পিঠে শান্তনুর বিমান-বাহাদুরির কথা বলল। খানিকটা প্রশংসা, খানিকটা শ্লেষ ছিল সে বর্ণনায়। কিন্তু তা থেকে ছোটখাটো ঘটনাও বাদ গেল না। খানিকটা সময় নিয়ে সে বর্ণনা করল। কিন্তু শেষ দিকে মনে হল তা করে সে নিজেকেই পীড়িত করছে।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে বলল, 'কফি দেয়ার কথা ভুলে গেছি। আনতে বলি এবার'।

সে হাসতে চেষ্টা করল।

বললাম, 'যদি তুমি কিছু মনে না করো, অন্য একদিন হবে'।

এই বলে চলে এলাম।

শীতের তখন মাঝামাঝি, জাদুঘরের প্রদর্শনী শেষ হয়ে গিয়েছে। খুব সার্থক সঞ্চয় ছিল না। তবু দেয়াল খালি হলে শূন্যতার বোধটা অস্বস্তিকর হয়েছিল।

ইতিমধ্যে একদিনমাত্র মিত্রার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ট্রামে। ডালহৌসি স্কোয়ারের ট্রামেও ঠিক দুপুরের হালকা শূন্যতা তখন। ট্রামটা যখন ঘুরছে আমাকে দেখতে পেয়ে তার পাশে আসনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসতে ইঙ্গিত করেছিল।

'কোথায় এসেছিলে?' এই সৌজন্যমূলক প্রশ্ন করলাম।

সে একটা জাহাজ কোম্পানির নাম করল।

এটাই সবকিছু মানে এনে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সে কি শান্তনুর খোঁজ করছে? তবু বললাম 'বিদেশে যাওয়ার সংকল্প আছে নাকি'?

'না। যে কোম্পানির নাম করলাম ওদের জাহাজেই সে এসেছিল।'

'ফিরে যায়নি এখনও'?

'না'।

বললাম, 'কিন্তু অন্য অনেক জাহাজও আছে যা নিউইয়র্কে যায়।'

আমার নামার দরকার ছিল। ওঠবার আগে বলেছিলাম, 'কোম্পানির ঠিকানায় চিঠি রেখে এলে হয়।'

তারপর থেকে মিত্রার ব্যাপারেও একটা শূন্যতাই অনুভব করছি। শান্তনু কোথায় তা সে জানে না এটা বোঝা গেল। তা থেকেই এই শূন্যতাবোধ। মিত্রাকে কেমন দেখিয়েছিল ভাবতে গেলে মনে হয় প্রায় তার স্বাভাবিক দ্যুতিটাই ফিরে এসেছে। আর সেজন্যই শূন্যতাটাকে তার অন্তরে ধারণা করে নিতে হয়।

এখন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। তারিখ দিয়ে বলতে গেলে চারুশে হয়েছে। অন্যদিনের সঙ্গে এ দিনগুলোর তফাত আছে। ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে নিঃশ্বাস নেয়ার বায়ুকে একটা নীল ঘর্মাক্ত বাষ্পে পরিণত করেছে ক'দিন থেকে দেখছি। অনেক ব্যাপারই আমরা সহ্য করে যাই। সহ্য করার সেই শ্লথ ভঙ্গি দেখলে কারো মনে হবে না অন্যতর কিছু কেউ চাইতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও সে দুঃসহতা চরমে পৌঁছয়। সন্ধ্যার কাগজ পড়তে পড়তে মনে হল। কাগজগুলো চব্বিশে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রির কথা উল্লেখ করেছে। আক্ষেপ করে বলেছে এমন দিনেও বায়ু নির্মল হবে না, বলেছে তার স্পর্শে জল সুরায় পরিণত হয়, আকাশ নির্মল হোক। এ থেকে দমবন্ধ-করা আবহাওয়াটাকে মনে আনতে হল। এই স্মগ যেন সেই পৃথিবীর প্রতীক যেখানে আজকের মধ্যরাত্রির পরে এক অদ্ভুতসুন্দর মানবপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। এই প্রতীকটাকে ব্যবহার করে একটা প্রবন্ধ লিখব স্থির করে নিলাম। অবশ্য কী ই বা হবে? এদেশের, এই অখ্রিস্টান দেশে খবরের কাগজ যেমন নিয়মমাফিক পূর্ব-অভ্যাসবশে সেই নবজাতককে স্মরণ করে, প্রবন্ধটাও তার চাইতে বেশি কিছু হবে না। নতুন একটা প্রতীক ব্যবহার

মাত্র।

আর সেই স্মগকে আরো ঘর্মাক্ত করে টিপটিপ করে বৃষ্টি নামল রাত নটাতেই অথচ আমার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল রাত বারোটার সেই ঘণ্টাগুলো শুনব, যদি কোথাও বাজে।

প্রবন্ধটা নিয়ে টেবলে বসেছিলাম। এমন সময়ে একতলার দরজার কড়া কেউ নাড়ল। (এখানে আমার স্মৃতিটা খুব স্বচ্ছ নয়। মনে করতে পারছি না তাকে দরজার বাইরে দেখামাত্র চিনেছিলাম কি না, কিংবা আমার বিস্ময়ের পাশ কাটিয়ে সে তার আগেই ভিতরে চলে এসেছিল। অনেকক্ষণ কিছুই বলতে পারিনি)।

শান্তনু বলল, 'ফাদার, তোমার কথা বারবার মনে হল। আর আজকের খবরের কাগজ তা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। ফাদার, আজকের দিনটা তোমার কথা মনে করার মতোই'।

মানুষকে এমন করে পুড়ে যেতে আমি দেখিনি। কিংবা নবকের আগুনেই তা সম্ভব হয়। তার প্যান্ট কাদা মাখা। তার জামা নানা রঙের এবং তেলকালির ছোপ ধরা। কাঁধের কাছের ছেঁড়াটায় তালি মারা। কালো, হ্যাঁ, তখন তাকে কালোই বলতে হবে।

বললাম অবশেষে, 'বোসো'।

তারপর কথা বলতে ভুলে গেলাম আবার।

শান্তনু বলল। বসে সে যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বলল সে, 'ড্রিঙ্ক আছে, ফাদার'।

'না'।

'কোনো সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক হলেই চলবে'।

'ও তো অনেক হয়েছে, তোমার চেহারাতেই বুঝতে পারি'।

'গডস্‌ ব্লাড, ফাদার, খুব গরম লাগছে'।

'আজকের দিনে অন্তত অমন শপথ কোরো না'।

এই তিরস্কারে তার চোখে জল এল।

সে বলল, 'কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো। আমাদের দেশের তুলনায় তোমাদের এই রাত্রি অনেক গরম। আমাদের শহরে এখন বরফ পড়ছে'।

এই কথাটা বলতে বলতে তার চোখ যেন অনেক দূরে স্নান করে এল। বললাম, 'তোমার কি সত্যি গরম লাগছে'?

সে কিছু ভাবতে লাগল। আর তখন আমার মনে হল কী ভয়ানক ক্লান্ত সে। এতক্ষণ অভ্যাস বশেই তার পেশিগুলো তাকে সোজা করে রেখেছিল। শোফার কোমলতায় তার শরীরের বাঁধন শ্লথ হয়ে আসছে।

'তুমি কি প্রার্থনা করবে, শান্তনু'?

সে হাসির ভঙ্গিতে বলল, 'আমি জানি তোমার চার্চ নেই'।

বললাম, 'ছবির প্রিন্ট যেখানে রাখি সেখানে ক্রুশের কোনো ছবি থাকতেও পারে, যদি তুমি প্রার্থনা করতে চাও'।

একটু দ্বিধা করল শান্তনু।

বললাম, 'মোমবাতিও আছে। যদি বলো জ্বেলে দিই'।

'না'।

একটুপরে সে আবার বলল, 'ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছি। মনে হল তুমি যদি হাত বাড়িয়ে আমাকে আশীর্বাদ করো, ভালো লাগবে। একটা গল্প বলতে পারি। বলব?

'তুমি ফাদার তো, বলা যায়। আঙুল দিয়ে অসীমকে ছোঁয়া যায় ভেবেছিলাম। যেমন করে নদীর

পারে জানু পেতে বসে সেই শীতল গতিতে তর্জনী ডুবিয়ে তাকে অনুভব করি। সে তোমাদের দেশেরই একটি ছেলে। ঈষৎ সবুজ রঙের চোখ তার। আর সে আমার জন্যে তার সব ভালোবাসার কেন্দ্র থেকে সরে এসেছিল'।

হঠাৎ আমার চোখে জল এল।

সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তাকে, সে আমার জন্যে একটা পুরনো বাড়ির খিলানের তলে অপেক্ষা করে আছে। একটা রুটি, আর এক বোতল বিয়ার কিনে নিয়ে যাব'।

কেন কাজটা করেছিলাম তা বলতে পারব না।

বললাম, 'তোমাব আব যাওয়া হবে না'।

সে বসে পড়ল। ভীত কিশোবেব মতো সে আমার দিকে চেয়ে বসে বইল। তারপর দু-হাতে মুখ ঢাকল। বললাম, 'ড্রিঙ্ক দেব'।

আমি তাকে ওয়াইন গ্লাস, কিছু পেস্ট্রি এবং এক বোতল শেরি এনে দিলাম।

সে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'আমাকে ঘুমোতে দেবে, ফাদাব? ববং এক গ্লাস জল দাও। আমি জানি তুমি আমাকে মিত্রাব মতো স্নেহ করো। আমি স্ট্রং ড্রিঙ্ক পছন্দ কবি না। তা ছাড়া ড্রিঙ্ক দিয়ে শব্দের গতিবেগকে ভাঙা যায় না'। আমাকে আবার চোখ মুছতে হল তার এই অসংলগ্নভাবে বলা কথা শুনে।

তাকে মিত্রাব কাছে নিয়ে যাব কিংবা মিত্রাকে আসতে বলব এটাই আমার কাছে সমস্যা হয়ে রইল সাবাটা সকাল, যতক্ষণ শান্তনু পড়ে পড়ে ঘুমোল। অবশেষে মিত্রা এল খবর পেয়ে। ভেবেছিলাম সে হয়তো তাব পোশাক নিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই সে আনেনি। বেলা দশটাবও পবে ঘুম ভাঙল শান্তনুব। আব ততক্ষণ মিত্রা আমাব পড়াব ঘবে একা বসে বইল। মনে পড়েছিল শান্তনুর ঘব থেকে পা টিপে টিপে ফিবে এসে সে বলেছিল আমাকে, একা থাকতে দাও।

অবশেষে মিত্রা এসেছিল আমার সামনে।

চশমাটা খুলে মুছে নিয়েছিল। সে এতক্ষণ কিছু ভেবেছে।

বলল, 'ফাদাব, কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক, আমাদেব এই পৃথিবীকেই আঁকা এমন ছবিও আছে। তেমন কবিও কি নেই'।

বললাম, 'সেই পুবনো কথাই'।

হেসে ব্যাপারটাকে সহজ করার চেষ্টা কবলাম। বললাম আবাব, 'সেই বেড়াভাঙার কথাই। ব্যাফায়েলেব পৃথিবীতে নেই। দেখছ না ওবা শব্দেব, এমনকী আকাশেব বেড়াও ভাঙছে। তাই রেখা শব্দ নিয়েও কেউ কেউ'।

সে খুব মৃদুস্বরে বলল, 'তাব কি খুব যন্ত্রণা'?

আমি জানি না এই কথা কয়েকটি বলতে বলতে কেন মিত্রাব চোখে জল দেখা দিল। সে যেন কারো যন্ত্রণাই নিজেব বুকে অনুভব কবছে। যে যন্ত্রণায় মানুষ উন্মাদেব মতো পথ খুঁজে বেড়ায়, নিজেকেও হয়তো ক্ষতবিক্ষত কবে।

শান্তনু এল।

কালকের চাইতে পৃথক দেখাল তাকে। স্নান কবে কিছু আবর্জনামুক্ত হয়েছে। তারই ফলে হয়তো নাকের দু-পাশে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়েছে।

তাকে দেখে হাসার চেষ্টা কবল মিত্রা।

আমাকে বলল, 'ওর এখন আমেবিকায় ফিবে যাওয়াই ভালো'।

'তাই যাবে'? এই প্রশ্নে তাকে সমর্থন কবলাম।

তাই ভালো, যদি এ বিষম প্রেমের গল্প এখানেই শেষ হয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আবার ফোনে ডাক এল। মিত্রাই ডাকছে। আর সে ডাকে সেই প্রথম দিনের মতো কিছু একটা আবিষ্কারের বিস্ময় এবং আত্মপ্রত্যয়ও। এই সামঞ্জস্য থেকেই আমার সেই হাত দেখার ঘটনাটাও মনে পড়ে গেল। এবং তা থেকে তাকে বিজ্ঞানের সভায় যেমন প্রথম সারিতে দেখেছিলাম তাও। তখন সন্ধ্যা হবে।

সেই ডাকে কিছু ছিল যা আর একবার সে রকম পরিস্থিতিতে কেউ না ডাকলে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। আকাশে মেঘ ছিল তা জেনেও যেন তাকে মূল্য দিতে পারলাম না। গাড়ির কথা মনে হল না।

ট্রামে তার বাড়িতে পৌঁছলে চাকর বলল, 'বাড়িতেই আছেন'। এ সংবাদ নেয়া অবান্তর।

সেদিন আমি সেই পরিস্থিতিতে এমন একটি মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছিলাম যে স্পষ্ট করে মনে আনা কঠিন হচ্ছে কে কী বলেছিল।

এ রকম একটা স্মৃতি আছে আমার শান্তনুর ঘরের পর্দাগুলো তোলা। যেন শীতের অচিরাগত সন্ধ্যার শেষ আলোটাকে ধরবার চেষ্টা। তার ঘরের পশ্চিমমুখো দেয়ালে একটা ছবি। প্রকাণ্ড লাইফসাইজ ন্যুড। গগ্যাঁ যেন, কিন্তু প্রখর রং।

মনে হচ্ছে শান্তনুর এই কথাগুলো সে কিংবা অন্য কেউ আমাকে বলেছিল আমার বাপ-মা নেই। আমি উঁচুদরের অরফ্যানেজে মানুষ। পরে স্কুলে গিয়েছি। ভালো স্কুলেই। বন্ধুরা বাড়ি যেত। তাদের বাবা মা আসতেন। আমি কোনোদিন যাইনি। কেউ আমাকে ডাকত না। আমি শুনেছিলাম আমার চাইতে অনেক বড় একটি মহিলা আমার জন্য টাকা দিয়ে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে আমার সংবাদ নেয়। কেউ প্রশ্ন করলে লজ্জায় লাল হয়ে শুধু বলে আমি ওকে ভালোবাসি। তারই দলে, ফাদার, আমি মিত্রার মতো কাউকে আমার সব প্রেম দিয়ে বসে আছি। কম বয়সের কাউকে ভালোবাসতে পারি না।

অবাস্তব। অকিঞ্চিৎকর অবাস্তবতা বলে মনে হয়েছিল।

মিত্রাকে খুঁজে পেলাম। সেই টেরেসে। আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিচের পথের দিকে চেয়ে। তার পোশাকের রং বোঝা যায় না। তার মুখের অত্যন্ত অস্পষ্ট আলো পড়ছে।

খেয়াল করিনি ঝিরঝির করে শীতের বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেই সন্ধ্যার আকাশ থেকে। আর সেই বৃষ্টিতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মিত্রা।

বললাম, 'এসেছি, মিত্রা'।

আর কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে বললাম, 'শান্তনু আমেরিকায় যায়নি দেখছি'।

'ফাদার'। এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কান্নার ঢেউ উঠবে মনে হল। কিন্তু তা উঠল না। বলল সে ফাদার তোমার হাত দেখাই দায়ী। কিন্তু ও তো আমার আপন গর্ভের সন্তান'।

আগে যাকে এই সন্ধ্যার পক্ষে অবাস্তব ভেবেছিলাম সেটাই মনে ফিরে এল। সেই ন্যুড চিত্র মিত্রাই বটে।

চিন্তা করার মতো কিছু পেলাম না। টাবে রাখা মিত্রার সেই ফ্লেয়ার স্পেসিমেনে এখন শীতের ধারা পড়ছে বটে। তাই দেখলাম।

মিত্রা বলল, 'কিন্তু কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। বলো, ফাদার, একি পাপ'?

বললাম, 'বলোনি তো'?

বলতে যাচ্ছিলাম, 'তোমার স্নেহে ও দৃষ্টি পাক'।

অসংলগ্নভাবে মনে হল মুখের সেই সার্জারি থেকে শুরু করে মিত্রা বিজ্ঞানকেই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে।

কিন্তু মনে হল ওদের গল্প আমার পাশ কাটিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছে। পিছিয়ে এসেছিলাম। শ্লেটের রং-এর সন্ধ্যা। অনঘমিত্রার পরনের উজ্জ্বল শাড়িটাও (উজ্জ্বল হওয়াই সম্ভব তার পক্ষে) যেন মাটি রঙের মনে হচ্ছে। সে সেই শীতের বৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

সুশোভনার কাহিনী

সুশোভনাকে ভূতে ধরেছে।

কিন্তু কিছুটা আনুপূর্বিক বলা দরকার।

সুশোভনার বিয়েটা ভালোই হয়েছিল। ঘর-বর সবই ভালো, সকলেবই খুশি হওযার কথা— কন্যাপক্ষের সকলেরই। এই মফস্‌সল শহরে এমন একটা বিয়ে অনেকদিন হয়নি।

লাখপতির ঘর নয়। বড় জোতদারের ঘর। পাশের শহরে। ট্রেনে যেতে দেড়ঘণ্টা। বড় উকিল। বুদ্ধিমান, চৌখস, বছর বাইশ-তেইশের একটি যুবক।

মেয়েরা যেখানে নানা কাজকর্মে জটলা করছে সেখানে সুশোভনার ঠানদি বলল, 'বুঝলি, কনের মা, আমারই লোভ হয়'।

কথাটা এমন কিছু নয় কোনো ঠানদির পক্ষে। কিন্তু সুশোভনার ঠানদি তাব মায়ের চাইতে বয়সে ছোট, সম্বন্ধে খুড়িশাশুড়ি। তার বয়স এখনও যৌবনের কাছে ঘেঁষা। ঠানদির পদবি নিয়ে এসব সুযোগে তিনি যা রসিকতা করেন তা একসঙ্গে সব বয়সের মেয়েদের বিশেষ করে অবিবাহিতাদের শোনা উচিত নয়।

সুশোভনার মা বলল, 'আ, খুড়ি, মুখ বন্ধ কবো তুমি'।

'বাঃ, যা করলাম, তা বলতেই দোষ। শুধু দেখে মজিনি, চিবুকে হাত দিয়ে সেই হাতে চুমু খেয়ে দেখলাম যে, মধুর মতো লাগল'।

সুশোভনাব মা কপট ক্রোধে বলল, 'ছি-ছি, বুড়ি হলে'।

'বলিস কি? তাই বলে...

সুশোভনার মা তাকে কথাটা শেষ কবতে দিল না, কোমর জড়িযে সে ঘব থেকে তাকে বাইবে নিযে যেতে যেতে বলল, 'চলো ওদিকে, কাজ পড়ে রয়েছে সব'।

ঘরের মধ্যে যেসব মেযেরা কাজ কবছিল তাদের বযস ষোল থেকে ত্রিশেব মধ্যে। তাবাই উপভোগ করছিল ঠানদিব বসিকতা। তাদের একজন বলল সুশোভনার মাকে, 'আপনি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন আমবা শুনলামই না বব কী রকম।'

'বল, তোরাই বল'।

সুশোভনার মা শাসনেব ভঙ্গিতে বলল, তার চোখ ঠোঁট আনন্দে ঝকঝক কবছে, 'তোমবা নিজে গিয়ে দেখে এলেই তো পারো। ও পান নিতে এসেছে, দিয়ে বিদেয় করো। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে'—বলে নিজেই একটা পান তুলে ঠানদির মুখে গুঁজে দিল।

মেয়েদের মধ্যে দু'একজন সম্বন্ধে সুশোভনার মায়েব জায়ের মতো। একজন বলল, 'নিজেরা যাব কি গো বরযাত্রীদের আখড়ায়'।

একটা আনন্দ, উত্তেজনা, কৌতূহলের অদৃশ্য স্রোতে ঘরের মেয়েগুলি যেন ফুলের মতো ভাসছে। একটি সরল নব-বিবাহিতা প্রশ্ন করল, 'দেখতে কী রকম ঠানদি'? পানটা গালেব একপাশে সরিয়ে মুখটা একটু উঁচু করে এক চিমটে দোক্তা মুখে ফেলতে ফেলতে ঠানদি বলল, 'এক কথায় বুঝবি, ঠিক আমাদের রবির মতো'। ঠানদি চলে যাচ্ছে দেখে মেয়েরা বলল, শোনো 'শোনো .

কিন্তু সত্যি সত্যি কাজ ছিল ঠানদির। পোলাউ-এব ভারটাই ছিল তার উপরে। মেয়েরা ঘরের মধ্যে

কাজ করতে করতে আনন্দের উত্তেজনায় ভাসতে লাগল। বাইরে বাঁশি বাজছে। অনেক লোক অনেক কথা তরল স্বরে বলছে। মেয়েদের দু'একজন ঠানদির অনুকরণে বরের স্বাদ নিয়ে আলাপ করল। খুব কমবয়সী যারা তাদের কান লাল হয়ে উঠল মাথা নিচু করে কাজ করার ভঙ্গিতে তা শুনতে শুনতে।

রবির মতো? তাহলে তো ভালো, খুবই ভালো।

ঠিক পাশের ঘরে সুশোভনাকে ঘিরে তার বন্ধুর দল তাকে সাজাচ্ছে। দু-ঘরের মধ্যেকার দরজাটা খোলা। এঘরের কথা ওঘরে যাচ্ছে। সাজানো নিয়ে আলাপ হচ্ছে। বাসরঘরে কী কথা বলবে সুশোভনা এ নিয়েও প্রশ্ন হচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে বন্ধুরা। একজন বলল, 'আমরা একালের মেয়ে। চট করেই কিন্তু প্রিয়তম-ট্রিয়তম বলে বসিস না'। অন্য বন্ধুবা বলল, 'ভারি তোর অভিজ্ঞতা দেখছি'। অন্য একটি মেয়ে সাজাতে বসে সবসময়েই প্রায় সুশোভনাকে ছুঁয়ে থাকছে। এ পর্যন্ত গায়ে পা লাগার ছলে দু-তিনবার চুমু খেয়েছে। সে বলল, 'চট করে কিন্তু গায়ে হাত দিতে দিসনে'।

কিন্তু এঘরে সবাই অবিবাহিতা। এদের কণ্ঠস্বর সেজন্যে অত্যন্ত নিচু। সুশোভনা স্থিব হয়ে বসে আছে। কখনও বিনবিন করে ঘাম ফুটছে তার কপালে। কখনও সে থরথর করে কেঁপে উঠছে।

গাল দুটো অনবরতই যেন লাল হয়ে আছে। হাত দু-খানাব অদৃশ্যপ্রায় লোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে একটা আনন্দের উজ্জ্বলতা।

এমন সময়ে সুশোভনার দাদা ববি এসেছিল। 'আর কত দেরি? বব আনতে যাচ্ছি'।

'আমবাও রেডি'।

'হ্যাঁ রবিদা, বর নাকি তোমাব মতো দেখতে'। সুশোভনার এক বান্ধবী বলল।

'নিজের চেহারা কি দেখেছি। লোকে তাই বলছে। নাকি বদলে নেযা যায়'। সুশোভনাব দাদা ববি এবাবে ডাক্তারি পাশ করেছে। স্বাস্থ্য ভালো রূপবান সে। শহবের অনেক মেয়ের সঙ্গেই তাব বিবাহেব প্রস্তাব উঠেছে। সুশোভনার বান্ধবীদের মধ্যেও তারা ছিল। অনা কোনোসময়ে হলে মেযেবা সরে যেত, রবিও সোজাসুজি চাইত না। কিন্তু আজকের ব্যাপাব অন্যরকম। বব কী বকম তা বুঝবাব জনাই যেন সকলেই রবিকে ভালো কবে দেখল।

বিয়েটা আনন্দেব মধ্যে সুশৃঙ্খল শান্ত সুখেব মধ্যে মিটে গেল। অনেক মেয়েই নিজেব নিজেব বিয়ের রাত্রির কথা স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে পেবেছিল। ও পাড়াব মধু চৌধুবী কিছুদিন ধবে অসুখে ভুগছে। বিযেতে যেতে পারেনি। তাব স্ত্রী বিয়েবাড়ি থেকে ফিবল।

'কী রকম দেখলে'? মধু প্রশ্ন করল।

'খুব ভালো, বেশ'।

'বর কী বকম'?

'ভারি সুন্দর। একেবারে যেন তোমার ববি ডাক্তাব। যমজ বলে মনে হয। শুধু এর রংটা যেন আবো উজ্জ্বল। ফুবফুরে পাতলা ঠোঁটের উপরে সরু একটি গোঁফের রেখা, ববির যা নেই'।

মধুর বউ মশাবি তুলল। মধু বউযেব দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল ঘবের মধ্যে চেয়ারেব উপরে বউয়ের বিয়েবাড়ি যাবার পোশাক জড়ো করা।

মধু বলল, 'ডাক্তার মানা করেছিল'।

মধুর বউ বিছানায় উঠে এল।

২

কোথা থেকে কী হয়ে যায়। দ্বিরাগমনের পরে যখন যাবার সময় হল সুশোভনা বলল, 'আমি যাব না, মা'।

মায়ের চোখও জল, মেয়েরও তাই।

একদিন সুশোভনার বাবা বললেন, 'চিঠি লিখেছি বটে, রাজিও হয়তো ওরা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে'।

'সে কি আর বুঝছি না। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েই আনন্দ, অথচ কাঁদতেও হয়। দুদিন পরে ওরও সে বাড়ির উপরে টান হবে। সব মেয়েরই এমন হয়। সবাই বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে কাঁদে। পরে বাপের বাড়ির কথা মনেও পড়ে না। কিন্তু ওর কান্না যেন একটু বেশি, একটু যেন বেশি মনে হয়'।

বাবা বললেন, 'মেয়েদের কথা মেয়েরাই বোঝে ভালো। তোমারও হয়তো এমনি হয়েছিল। আমার কিন্তু কষ্টই হয় ওর কান্না দেখলে। কী যেন বলতে চায়– না বলে কাঁদে। ওর ছোটবেলার ধরনটাই এমনি ছিল'।

'ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ও তো আর ছোটটি নেই'। বাবার হাই উঠল। ঘুম পেয়েছিল। বেদনা বোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু সে বেদনার ধারেকাছে সুখও ছিল। মেয়েকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করার সার্থকতা বোধ ছিল। বললেন, 'শোবে না'?

প্রায় একমাস থাকল সুশোভনা বাপের বাড়িতে। ও পক্ষ বিবেচক। তারা উচ্চবাচ্য না করেই রাজি হয়েছিল। কিন্তু সে মাসটা শেষ হল। সুশোভনা কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে শ্বশুরবাড়ি রওনা হল। মা ভেবেছিলেন শক্ত হয়ে থাকবেন, কিন্তু মেয়ের কান্না দেখে তিনিও কাঁদলেন। এমনকী রসিকতায় যার মুখে খই ফোটে সেই ঠানদিও। একজন বৃদ্ধা বলল-- আজকালকার মেয়ে এমন কাঁদে, তা তো জানিনে, বাছা। সুশোভনার বাবা বললেন, 'সামনেই পুজো। তখনই আনব, মা। আর কাঁদিসনে, দাদা তো সঙ্গেই যাচ্ছে'।

সুন্দরী সৎ-পাত্রস্থা একটি মেয়ে অন্যান্য বাঙালি মেয়েদের মতোই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। তার বাবা মাও পুজোয় মেয়ে আসবে জামাই-এর সঙ্গে এ আশা নিয়ে রইলেন। সুশোভনা এলও বটে পুজোর দু-চারদিন আগেই, কিন্তু ঘাড়ে ভূত নিয়ে।

বাড়ির সামনে হঠাৎ দরজা বন্ধ পাল্কি ঘোড়ার গাড়ি থামতে দেখে যারা অবাক হয়েছিল, সুশোভনার বরকে নামতে দেখে তারা আনন্দে কোলাহল করতে গিয়ে থেমে গেল। তার উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটার পেছনেই মূর্তিমতী উদ্‌ভ্রান্তির মতো নামল সুশোভনা। তার মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখজোড়া টকটকে লাল। পরনের দামি কাপড়টা অবিন্যস্ত ছেঁড়াখোঁড়া। টলতে টলতে এগোচ্ছে সুশোভনা, তার বর তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আনছে।

সুশোভনার মা ডুকরে কেঁদে উঠতে উঠতে জামাই তাকে ইশারায় নিষেধ করল কাঁদতে। 'ওকে একটু শুইয়ে দিন। পরে সব বলছি'।

সুশোভনাকে শুইয়ে এসে মা বললেন, 'এমন কী করে হল'।

'কাপড়টা গাড়িতে আসতে আসতে ছিঁড়েছে'।

'কী হয়েছে'?

'ঠিক বুঝতে পারছিনে'। মনে হল সুশোভনার বর কান্নার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার।

'তুমি না পারলেই, তোমার বাড়ির লোকেরা'? বিচক্ষণ জেরা করলেন মা। স্পষ্টতই দ্বিধা করতে লাগল সুশোভনার বর। অবশেষে বলল, 'ভূতে ধরেছে'।

'ভূত'?

'তাই বলছে'।

'ভূত'?

'ঠিক কী তাই বুঝবার জন্যই নিয়ে এলাম'।

'ভূত ধরেছে'? সুশোভনার মা মাটিতে বসে পড়লেন।

এসব ব্যাপার কবে কোন মুহূর্ত থেকে শুরু তা বলা যেমন কঠিন, ধাপে ধাপে কী করে এসব হল তা বলাও তেমনি শক্ত।

সুশোভনার বর বাপ-মায়ের কাছে মেয়েকে গছিয়ে দিতে আসেনি। তাদের সাহায্যে স্ত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করাই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই সে কিছুই গোপন করল না।

ব্যাপারটার সঙ্গে শনিবার অমাবস্যা প্রভৃতির যোগ আছে।

প্রথম যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল তা এই রকম :

সুশোভনার আট-ন বছরের একটি ননদ আছে। বউদিকে সে যত ভালোবাসে, বউদিও বোধ হয় তার চাইতে কম ভালোবাসে না। এক শনিবারের বিকেলে সুশোভনা তাকে চড় মেরে বসল। মারটা খুব জোরেই হয়েছিল।

তখন রোদ পড়ে আসছে। সুশোভনার ক্ষুদে ননদ গিয়ে বলল, 'বউদি, চুল বেঁধে নাও।'

'এখনই, কেন রে? আয় গল্প করি। সারা দুপুর কী করে বেড়ালি'? সেলাই সরিয়ে রাখল সুশোভনা।

'মা বললেন, আজ শনিবার'।

'শনিবারে কি আগেভাগে চুল বাঁধতে হয়'?

'বাহ্। তুমি জানো না বুঝি', চোখ বড় বড় করে বলল ননদ, 'শনিবারে এলোচুলে বেড়ালে ভূত ধরে'।

'তা ধরুক। তুই সারা দুপুরে আজ একটা অঙ্ক করিসনি কিন্তু'।

'তা হোক। মা বললেন, তুমি ওঠো। গা ধুয়ে নাও, চুল বেঁধে একটা ভালো শাড়ি দেখে পরো'।

'কোথাও যেতে হবে নাকি'?

'না গো না। কে আসবে তা জানো না'?

'কে'?

'আজ শনিবার। দাদা ফিরবেন সদর থেকে'।

সুশোভনা একটু যেন শিউরে উঠল। (তার ননদ সাক্ষ্য দিয়েছে চমকে উঠল বলে)। তারপর সেলাইটা আবার টেনে নিল।

ননদ বকবক করে চলল, 'তোমার যেন কিছু মনে থাকে না বউদি। তুমি যে বলেছিলে, দাদার একটা ফটো চাও ভালো করে দেখবে বলে, তা আজ আমি যোগাড় করে রেখেছি। কিন্তু কী যে লোক তুমি বুঝি না। লোকটাকে কি তুমি দেখতে পাও না? লজ্জা করে মুখের দিকে তাকাতে, না? আচ্ছা, লোককে মুখ দেখানোর সময়ে তুমি যেমন চোখ বুঁজে থাকো দাদার সামনেও তেমনি করে থাকো বুঝি! তা তুমি আমার দাদাকে না দেখে থাকো নিজের দাদাকে তো দেখেছ। তাহলেই চিনতে পারবে। হুবহু একরকম'।

'কী, যা-তা বলিস'। সুশোভনা ফ্যাকাশে মুখে বলল।

'সত্যি বলছি। তুমি তো দুজনকে দ্যাখোনি তাই বলতে পারো না। আমি দুজনকেই খুব ভালোভাবে দেখেছি। প্রায় একই রকম দেখতে'।

হঠাৎ সেই জায়গায় ননদকে চড় মেরে বসল সুশোভনা। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি। মারের শব্দ দূর থেকে সুশোভনার শাশুড়ি শুনেছিলেন। তারপর ননদ কেঁদে উঠল।

সুশোভনার বর বলেছে; সেটা একটা লজ্জার রাত্রি। নতুন বউয়ের এ রকম রাগটা অনেকের কাছেই

বিসদৃশ ঠেকেছিল। একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়েছিল।

'তুমি কি শাসন করেছিলে'? সুশোভনার মা জামাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'না। এ অবস্থায় শাসন করার কী আছে। ওদের দুজনকে, আমার বোন আর সুশোভনাকে ডেকে এক জায়গা বসিয়ে রেখেছিলাম। একসময়ে লুকিয়ে দেখলাম দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে'।

সুশোভনার দাদার প্রশ্নের উত্তরে জামাই বলেছিল জনান্তিকে, 'নিশ্চয়ই আদর করেছিলাম। পাছে তার মনে কোনো সন্দেহ থাকে ব্যাপারটা মিটে যাওয়া সম্বন্ধে, বরং একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল আদরের'।

'তারপর'?

'প্রতি শনিবারে কিছু না কিছু ঘটতে লাগল। এক শনিবারে মাঝরাতে দেখি বিছানায় নেই। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম রান্নাঘরের বারান্দায় মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এক শনিবার বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে মাথা কাটল'।

'মাথা কাটল'?

'তা অনেকটা। আপনারাই তো খাট-টা দিয়েছেন। ঘরজোড়া খাট। তা থেকেই পড়ে গেল'।

সুশোভনার দাদার কাছে জনান্তিকে জামাই বলল, 'পড়ে যাওয়ার কারণটাকে আমি ভূতের ভর বলতে পারি না। ওর একটা অভ্যাস আছে। পাশাপাশি দুটি মানুষ শুলে ঘুমের ঘোরে অনেকসময়ে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি জেগে থাকতে বরং কাছে থাকে— ঘুমের মধ্যে সে যেন দূরে সরে যায়। নিজে না ঘুমিয়েও আমি পরীক্ষা করেছি। ও ঘুমিয়ে আছে— ওর দিকে আমার হাতটা এগিয়ে দিলাম— উঁ করে ও সরে গেল। এ রকম করে করে ও খাটের ধারে গিয়ে পৌঁছায়। অনেকসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে কাছে টেনে আনতে হতো'।

'কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কবে থেকে হল'? সুশোভনার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি ছুটি করে বাড়িতে আসবার পর'।

'তুমি ছুটি নিয়েছ, মানে কোর্টে বেরুচ্ছ না? সবই ভাগ্য। এখন উঠতি পসার'!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জামাই বলল, 'কিন্তু এদিকে না তাকিয়েই-বা কী উপায়'। সুশোভনার বর বলল, 'ময়লা জিনিসের দিকে ওর একটা টান জন্মেছে। একদিনের ঘটনা বলি। সেদিন ছুটি ছিল। বাড়িতেই ছিলাম আমি। বেড়াতে বেরুচ্ছি, শুনলাম মা ওকে ডাকছেন। ওর উত্তর নেই। শুনতে পাচ্ছে না হয়তো। মনে হল বলে যাই। শোবার ঘরে ছিল না। অন্য ঘরে খুঁজতে যাব এমন সময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। দেখি, ঘরের পিছন দিকে বসে এক ডাঁই গোবর নিয়ে বসে দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে দিচ্ছে ডেকে আনলাম। বললাম— ঘুঁটের এমন কী দরকার হল। 'ঘুটে'? ও যেন অবাক হল। আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। সংসারে ছোট ছোট অনেক ঘটনা ঘটে। সাধারণ সময়ে সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ টেনে বার করা হয় না। কিন্তু এ বেলায় একটার কথায় আর একটার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। এই ঘুঁটে দেওয়ার আগে গোবর নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল। চাকরকে বলেছিলাম আমার ঘরের পিছনের বাগানে সার দিতে। সে কাঁচা গোবর এনে ডাঁই দিয়ে রেখেছিল বাগানে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বাইরে গিয়ে ঘুমিয়েছিলাম সে রাত্রিতে। পরের দিন চাকরকে গালাগালি করেছিলাম। সুশোভনা খুব কৌতুক বোধ করেছিল যেন ব্যাপারটায়। কিন্তু এই শেষ নয়। আর শুধু গোবর নিয়েও নয়। সন্ধ্যায় যখন অন্যান্য মেয়েরা হাত পা ধুয়ে কাপড় ছাড়ছে সুশোভনা যেন সারাদিন পর জেগে উঠল ময়লার টানে। হয় ঘুঁটে দেওয়ার চেষ্টা করে, নয় পুরনো বাসন মাজতে বসে। কিছু না পেলে উঠান ঝাঁট দিতে লেগে যায়। শরীরটাও ভালো যাচ্ছিল না ওর। গাল ভেঙে, চোখ বসে লোকটাই যেন বদলে যেতে লাগল। এরপরে আমি ছুটি করে বাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না, বরং যেন আরও ক্ষেপে গেল। রাগারাগি নয়, অসন্তোষ নয়। বেঁকে বসল, খাবো না। একবেলা নয়, দু-বেলা নয়, পর পর তিনদিন একফোঁটা জল পর্যন্ত খেলো না। তখনই স্থির করেছিলাম এখানে নিয়ে আসব। কিন্তু সেদিন রাত্রিতেই

ঘটনাটা ঘটে গেল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি ওর বিছানায় ও নেই। উঠে বসে দেখলাম দরজা খোলা— ভেজানো, একটু ফাঁক আছে। সেদিকে চেয়ে আছি এমন সময়ে মনে হল সাদা কাপড়-পরা কে একজন সে-ভেজানো দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে। তার দিকে চাইতেই সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার ঘরের মৃদু আলোটা বাইরে গিয়ে পড়েছিল বলেই ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল। বাইরে বেরুলাম। কিছু দেখতে পেলাম না। যে হাতছানি দিয়েছিল সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একটা বেড়াল ডেকে উঠল। উঠানের ওপারের আমগাছটায় একটা পাখি ঝটপট করে উঠল। অন্ধকারে উঠানের এদিক-ওদিক খানিকটা ছায়ার পিছনে ছুটে ঘরে ফিরে এসে আবার টর্চ নিয়ে বেরুলাম। টর্চের আলোয় দেখলাম রান্নাঘরের দরজা খোলা। ঘরে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই সেখানে। আমার মনে হল সুশোভনাকে চিৎকার করে ডাকি। কেলেঙ্কারির ভয়ে নীরবে তাকে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে পেলাম তাকে। বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট ডোবা আছে। সেখানে ছাই ফেলা হয়। আঁস্তাকুড়। ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে সে বসে আছে। শুধু বসে থাকা নয়, কী খাচ্ছে। দেখলাম আঁচলে ভাত— আর— আনসে বাখা কাঁচা কাঁচা মাছ। টর্চের আলোয় সে উঠে দাঁড়াল। একটা অলৌকিক ভয়ে পিছিয়ে আসছিলাম, এমন সময়ে সে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল'।

সুশোভনার মা বললেন, 'আহা তিনদিন খায়নি। কী ক্ষিধেই পেয়েছিল। তুমি তো বকোনি বাবা'?

'না, বকিনি'। সুশোভনার বরের চোখ দিয়ে জল পড়ল, 'কোলে করে তাকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। নিজের হাতে তাকে স্নান করিয়ে দিলাম। ঘরে নিয়ে গিয়ে সারা রাত তাকে বুকে জড়িয়ে রাখলাম। সে একটা রাত্রি গেছে আমার। বেড়ালের চোখ দেখেছেন নিশ্চয়ই— কখনও তার দৃষ্টি তীব্র কখনও অস্পষ্ট পর্যায়ক্রমে এ রকম হতে লাগল। কখনও তার চোখ ঘুমে ভরে আসছে। কখনও কটমট করে তাকাচ্ছে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। এ কথা আমার বাড়ির কেউ জানে না, আপনারাও বলবেন না'।

'কবে এটা হয়েছিল'?

'গত শনিবারে'।

সুশোভনার বাবা বললেন, 'আচ্ছা, রবি দেখেছে ওকে। বলল, জ্বর, একটু ব্রংকিয়াল ট্রাবলও আছে। সেরে যাবে। এখন কিছুদিন আমার কাছে থাক'।

সুশোভনার বর তখন ফিরে যাচ্ছে। সাধারণ যা হয় না, তাই হল। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, চোখে জল দেখা দিল। সে বলল, 'আমি যেন ওকে ফিরে পাই'।

৩

চিকিৎসা রবিই করছিল। জ্বর কমে আসছে, ধীরে ধীরে, বুকের দোষ প্রায় সেরেই গেছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। তারই ঘোরে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। রবি বলে দিয়েছে কেউ যেন ঘুম না ভাঙায়। ঘুম ভাঙলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়, তখন সে দেখে যাবে।

ঘুম ভাঙলেই রবি আসে। রোগী দেখে। পথ্যের ব্যবস্থা করে। ওষুধ পাল্টায়। একদিন বিপদ দেখা দিল। সুশোভনা ক্লান্ত গলায় মায়ের সাথে কথা বলছিল। রবি এল।

হঠাৎ সুশোভনার দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে উঠল। আশ্চর্য উজ্জ্বল সেই কাঠিন্য। কিছুক্ষণ সে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল রবির দিকে। দুর্বল হাত দিয়ে সে মাথায় কাপড় দেওয়ার চেষ্টা করল। যেন উঠে বসবে এমন ভঙ্গি দেখাল।

মা বললেন, 'চিনতে পারছিস না, ও রবি'।

রবি খাটের দিকে আর একটু এগিয়ে এল। 'খুব পারছে চিনতে। দেখি তোর হাতটা'।

'কে, দাদা'?

'হ্যাঁ রে'।

'দাদা'?

'তা নয় তো কী'!

'দাদা? আমাকে ছুঁয়ো না, বলছি ছুঁয়ো না'।

বিচক্ষণ ডাক্তারের মতো রবি বলল, 'ঠিক আছে'।

রাত্রিতে মা বললেন, 'কী হবে'?

'অনেকটা সেরেছে দেখতেই পাচ্ছ। আর একটু ঘুম দরকার। খুব সাবধানে ওষুধ দিতে হচ্ছে তো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেরে যাবে। তা ছাড়া কাল ওকে ভাত দেব। পরশু শুক্রবার সদরে যাব। সেখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে কথা কয়ে যদি তারা ব্যবস্থা দেন রবিবারে ফিরব। আর যদি তারা রোগীকে দেখতে চান, তাহলে শনিবার রাত্রিতে ফিরে রবিবারে ওকে নিয়ে সদরে যাব'।

রবির ওষুধ কাজ করবে বলে মনে হল। সুশোভনা অন্নপথ্য করল। উঠে বসল তো বটেই দু-এক পা করে হেঁটে চলে বেড়াতেও লাগল। মা মনে মনে দক্ষিণেশ্বরের কাছে মানত করলেন। অস্বাভাবিকতা কিছুই যেন আর নেই। সে বৃহস্পতিবারে বলল— বাবাকে বলে একটা ভালো শাড়ি আনাও মা। এটা তো ভালো নয়। মা সুশোভনার ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি বার করে দিলেন। শুক্রবারে সে বললে, 'কী যে হয়েছে বাড়ি। ক'দিন ছিলাম না আমার বইগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। একটা উপন্যাস দাও না মা পড়ি'। সুশোভনার মা উপন্যাস বার করে দিলেন আলমারি থেকে। সবই স্বাভাবিক। শুধু বই পড়তে পড়তে যেখানে শুয়ে সুশোভনা ঘুমিয়ে পড়েছে, বিকেলে তাকে ডাকতে গিয়ে মা দেখলেন— বইয়ের অনেকগুলি পাতা মাঝে মাঝে কুটিকুটি করে ছেঁড়া।

তা হোক, রবি বলে গেছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সে হয় আজ রাত্রিতেই ফিরবে কিম্বা কাল সকালে।

সন্ধ্যাবেলায় সুশোভনাকে একা রেখে মা কোথাও যান না। অন্য একজন রান্না করছে। মা সুশোভনার কাছে বসেছিলেন, সুশোভনা একটা বই পড়ছে। বাবা এলেন, 'ও কি আজই আসবে'?

'ও হ্যাঁ, তাই তো। আজই তো শনিবার মনে ছিল না। আচ্ছা খাবার ঠিক করে রেখে দেব'।

'যে অন্ধকার রাত। আজ আবার অমাবস্যা। কাউকে লণ্ঠন দিয়ে স্টেশনে পাঠাই। কি বলো'।

'তাই ভালো'।

বাবা চলে গেলে সুশোভনা বলল, 'কে আসবে মা'?

'তোর দাদা'।

'দাদা'?

সুশোভনার মায়ের মনে আছে এ ছাড়া সে কিছু বলেনি। একবার শুধু যেন বিরক্তিতে উঁ করে উঠেছিল।

মা বললেন 'কী রে'?

'কিছু না তো।'

কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ সুশোভনা উঠে বসল। ঘরের কোণে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। মায়ের মনে আছে সুশোভনাই যেন তাকে নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছিল।

'কে এল, মা'?

'কে আবার আসবে'।

'কিছুক্ষণ আগে কে যেন এল, বাবা দরজা খুলে দিলেন'।

'তাহলে তোর দাদা'।

'তাই হবে,' বলে সুশোভনা আবার শুয়ে পড়েছিল।

মা বললেন, আধঘণ্টাটেক বাদেই তার ঘুম ভেঙে যায়। দেখলেন দরজা খোলা, বিছানায় সুশোভনা নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় ও বাথরুমে খুঁজে না পেয়ে মা সকলকে জাগিয়ে তুললেন। মা আনুপূর্বিক সব বলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। রবিই এসেছিল রাত্রিতে।

সে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো। আমার মনে হচ্ছিল বটে জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে কে আমার মশারি তুলবার চেষ্টা করছে। ঘরের আলোয় মনে হল বটে অস্পষ্টই মানুষের ছায়া দেখলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল'।

সুশোভনাকে পাওয়া গেল। বাড়ির পিছন দিকে আগাছার জঙ্গলে একটা পিটুলি গাছ ছিল তার ওপরে সে যেন পা দুলিযে বসে আছে। ডাকলে সে কি নামবে? পড়ে যাবে না তো! দু-তিনজন সাহসী ছেলের সাহায্যে দড়ির দোলা তৈরি করে তাতে শুইয়ে সুশোভনাকে নামিয়ে এনেছিল রবি। তখন সে বেহুঁশ।

৪

'আপনি কে'।

'তুমি কে তাই বলো'।

'আমি এই বাড়ির মেয়ে সুশোভনা। আমার বাড়ির লোকেরা কোথায় গেল'?

'অনেক ছেনালি করেছ। এখন বলো তুমি কে'।

'কী ছোটলোক, কী অসভ্য'!

'তুমি কোথায় যাচ্ছ। পালানোর পথ বন্ধ, আগে পরিচয় দাও'।

সুশোভনা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'মা, ঘুম পাড়িয়ে রেখে কোথায় গেলে। মা, মাগো'।

'দ্যাখো এসব কান্না অনেক শুনেছি। ভালোয় ভালোয় পরিচয় দিয়ে বলো কোথায় তোমার পিণ্ডি দিতে হবে'। ওঝা বলল।

'ছোটলোক, ইতর। মা বোন নেই তোমার'।

'ওই তো ভাষা ফুটছে'। ওঝা খুশি হল যেন।

'তুমি এ ঘর ছাড়বে কি না বলো। মেয়েমানুষের লাথি খাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ। ঠিক, ঠিক। তাহলে পরিচয় দেবে না। এই সরার আগুন দেখছ। ওতে মরিচ আর গন্ধকের গুঁড়ো দিয়ে যে ধোঁয়া হবে তার উপরে তোমার মুখ চেপে ধরব। আর হাতে এই কঞ্চি দেখছ ভাঙব তোমার পিঠে'।

বন্ধ ঘর। ঘরের মধ্যে সরায় গনগনে আগুন। দরজার কাছে একজন অচেনা পুরুষ। সুশোভনা একটা মাদুরে শুয়ে ঘুমচ্ছিল তার শোবার ঘরে। সেটারই এখন এই পরিবর্তন। সুশোভনা অন্তত পনেরো মিনিট ধরে মা-বাবা-দাদাকে চিৎকার করে ডেকেছে। সাড়া পায়নি। তারপর হাউমাউ করে কেঁদেছে। অবশেষে সাহসে ভর করে দাঁড়িয়েছে যেন।

'তুমি মনে রেখো, যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তোমার আমি মরে যাবার আগে তা হবে না। চামার, জন্তু কোথাকার'।

'বাহবা। তাহলে মন্তরে বাঁধব। কিন্তু আরো একটা মন্তর আছে আমার। কাপড় কেড়ে নেব'?

সুশোভনা হাঁপাতে লাগল। হাতজোড় করে বলল, 'তুমি আমার বাবা, তোমাকে বাবা বলছি'।

'বেশ কথা। বলো তুমি কে'।

'কী শুনলে তুমি সুখী হও'?

'তোমার পরিচয়'।

'আমি সুশোভনা'।

'আবার'? ওঝা বিড়বিড় করে মন্তর পড়ে সুশোভনার দিকে এগিয়ে গেল।

সুশোভনা দৌড়ে ঘরের অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়াল।

'বুঝতে পেরেছ দৌড়ে বেশি দূর যেতে পারবে না। এ ঘরের দরজা বন্ধ। বাড়িতে কেউ নেই। সত্যি কথা বলো কোনো অমঙ্গল হবে না। মায়ের দিব্য, গুরুর দিব্য। আর যদি না বলো কী করে বলাতে হয় আমি জানি। মনে রেখো যা ইচ্ছে করতে পারি আমি'।

'আমি যদি বলি তাহলে তুমি এ ঘর থেকে চলে যাবে'?

'যাব'।

'কী জানতে চাও'?

'সুশোভনাকে কে ভর করে আছ'।

'তা ঠিক জানি না। কে যেন অন্য একটা মেয়েমানুষ। বুঝি না। এই দেখতে পাচ্ছিলাম। হারিয়ে গেল'।

'হুঁ। কিছু বলে সে'?

'বলে। শ্বশুরবাড়ি থেকে পালাতে বলে'।

'হুঁ। যে বলে তার নাম কী'?

'নাম কী করে জানব। ঘুমের মধ্যে আসে সে'।

ওঝা হো হো করে হেসে উঠল। 'এসব গল্প শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা। স্পষ্ট করে বলো তুমি কে—কোথায় তোমার বাড়ি ছিল। কীসে তোমার মৃত্যু হয় কীসে তোমার মুক্তি হয়। কেন এই মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ'।

'কী করে বলব? আমি জানি না'।

'জানাচ্ছি', বলে ওঝা এগিয়ে গিয়ে সুশোভনাকে চেপে ধরল।

'ছাড়ো, ছাড়ো'। সুশোভনা ওঝাকে আঁচাড় দিল।

'উঃ'। ওঝা হাতের কঞ্চিটা দিয়ে মারল সুশোভনাকে।

দুজনে কিছু দূরে দূরে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। সুশোভনা হাঁপাচ্ছে। কিছুদিন আগে রোগভোগ করে উঠেছে সুশোভনা। দুর্বল বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। হঠাৎ সে ঝপ করে মাটিতে বসে পড়ল। মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেল। খানিকটা সময় চুপচাপ।

ওসব ঢং করে লাভ নেই। আমার কাছে বাঘা। স্মলিং সল্ট আছে'।

ওঝা কী একটা নাকের কাছে চেপে ধরল। সুশোভনার মাথাটা ঝেঁঝে ধরল। তারপর সে এই বেদনার মধ্যে চোখ খুলল আবার।

'দেখলে, ছেনালিপনা করে লাভ নেই। থাক, আমি মন্তর দিচ্ছি। ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি, তোমার উপরে অন্য ওষুধ লাগাব না'।

ওঝা মাটিতে দাগ কেটে বিড়বিড় করতে লাগল।

হঠাৎ সুশোভনা ফুঁপিয়ে উঠল, 'মা, মা, মা, আমি পারছি না। বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে। একটু জল দাও। মা, মা, মা। ও মা। আমি মরে যাচ্ছি, মা।

'আরে রাখ্। এখনই কষ্ট কী। এই তো মন্তর সবে শুরু'।

'মা, তোমরাও কি পিশাচের দলে মিশেছ'।

ওঝা বলল 'এখন পরিচয় দিবি? না দিস তো বল, তোকে নিয়ে শ্মশানে যাই'।

'কী পরিচয় দেব। বিশ্বাস করো আমি খানিকটা অভিনয় যেন করতাম'।

'কে তুই, তাই বল। বাজে কথা রাখ'

সুশোভনা যেন কী ভাবল, তারপর গড়গড় করে বলে গেল। 'আমি পাঁচুর বউ। ছেলে হতে মরেছি। আমি কিছু বলব না আর সুশোভনাকে'।

'এ কথা আগে বললেই হতো। সুশোভনার শ্বশুরবাড়িতে মাহিন্দার পাঁচু। তার বউ ছেলে হতে মরেছে শনিবারে, এসব খবর আমিও জানি। কী করে ছাড়বি সুশোভনাকে তাই বল। মেয়েটার কষ্ট হচ্ছে দেখছিস না? ওর সুখের সংসার পুড়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিস না? কই কথা বলছিস না যে বড়। চুপ করে কেন'?

'মা, ও বাবা, আমার ভয় করছে'। সুশোভনা ডুকরে কেঁদে উঠল। 'কেঁদে কিছু লাভ নেই। পরিচয় যখন দিয়ে ফেলেছ তখন তোমাকে যেতে হবে। বলো যাবে'।

'যাব'।

'কোথায় যাবে'।

'এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে যেতে বলবে'।

'কী করে বুঝব তুমি গেলে'?

'দেখতেই তো পাবে'।

'তা বটে। তাই বুদ্ধি নিয়েই আমি ওঝাগিরি করি, তাই না'।

'কী করব তবে'?

'এই জলভরা কলসি দেখছ ওটা দাঁতে করে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে আঁস্তাকুড়ে যাবে। সেখানে আকাশে উঠবে'।

'আমি ওটা তুলতে পারি না'।

'খুব পারবে। সুশোভনা পারে না, কিন্তু পাঁচুর বউ না পারে কী'?

এরপরে ওঝা দরজা খুলে দিয়েছিল। নিজের কাপড়ের খানিকটা কলসির গলায় জড়িয়ে সেই কাপড় দাঁত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুশোভনা টলতে টলতে বেরুল ঘর থেকে। কিন্তু আঁস্তাকুড় পর্যন্ত যেতে পারল না। উঠানের মাঝামাঝি গিয়ে পড়ে গেল। কলসিতে মাথাটা ঠুকে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুল। ওঝা বলল, 'ওঠ, ওঠ, উঠলি না চাবুক লাগাব'।

কিন্তু ররির বোধ হয় আর সহ্য হল না। সে কারো কথা না শুনে ছুটে বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। বোনকে কোলে করে নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে বলল, 'আমার ডাক্তারি ব্যাগটা আনো, মরে যাচ্ছে শোভা'।

একটা হৈ হৈ উঠল। সুশোভনার বাবা, মা, ররির কম্পাউন্ডার ররির পিছনে ছুটল।

ওঝা মাথা দোলাতে দোলাতে বাড়ির বাইরে থেকে যারা এসেছিল এবং জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল ওঝাগিরি, তাদের বলল, ছোটবাবু কাজটা ভালো করলেন না। গণ্ডিটা কাটতে পারলাম না মেয়েটার চারদিকে। আবার ভর না করে'।

৫

ওঝার ওস্তাদি আছে বলতেই হবে। ররি চিকিৎসা করে আবার খাড়া করে তুলল সুশোভনাকে, কিন্তু এ যেন অন্য কোন সুশোভনা। ধীর-স্থির গম্ভীর মৃদু স্বল্পভাষী একটি মেয়ে। যেন আঠারো-উনিশ থেকে পঁয়ত্রিশে পা পৌঁছে গেছে। কিন্তু অনেক শনিবার এল গেল, কোনো বিকার দেখা গেল না।

একদিন সুশোভনার মা পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে বললেন, 'আজ শনিবার নাকি রে'? কথাটা সুশোভনার সামনে বলাই পরিকল্পনা। সুশোভনা কুলোয় করে ডাল বাছছিল। কোনো বিকার দেখা দিল

না তার মুখে। শুধু কথাটা বুঝতে যতক্ষণ সময় নেযা দবকাব তাব চাইতে সামান্য কিছু বেশি সময যেন লাগল তাব। দিন পনেবো পবে মা বললেন, 'শোভা, শ্বশুববাডিব ওবা চিঠি লিখেছে। তোব বাবা বলেছিলেন, যেতে হয। অনেক দিন এসেছিস'।

সুশোভনা বলল, 'যাব'।

'তুই যেন বাগ কবে বললি'।

'না, বাগ নয তো'।

বাগ নয। মা ভাবলেন। সমান সহজ গলা সুশোভনাব। লজ্জায লাল হল না মেযেব গাল। একবাব অভিমান কবেও বলল না– তুমি যেন আমাকে তাডাতে পাবলেই বাঁচো।

সুশোভনা শ্বশুববাডি এসেছে। তাব চালচলন কথাবার্তায কোনো অস্বাভাবিকতা নজবে পডে না। শুধু সে যেন আগেকাব চাইতে একটু চাপা ধবনেব। পাযেব দিকে চোখ বেখে চলে। যা ঘটেছে তাব লজ্জায যেন কাবো দিকে চোখ তুলে চাইতে পাবে না। ইতিমধ্যে একদিন তাব স্বামী তাব মুখটা তুলে ধবেছিল। সুশোভনা মুখ ঘুবিযে নেযনি, কিন্তু যেন প্রথম বাত্রিব লজ্জায চোখ বুজে বইল। তা হোক। তাব স্বামী বাডিব সবাইকে বলে দিযেছে কেউ যেন সুশোভনাব দিকে বেশিক্ষণ একভাবে চেযে না থাকে। সে যেন কখনও-ই না মনে কবে আমবা তাকে পূবোপুবি বিশ্বাস কবি না।

চাব-পাঁচ মাস পবে সুশোভনাব শাশুডি চিঠি লিখলেন সুশোভনাব মাযেব কাছে- ভালোই আছে। ভালো খবব এই– বোধ হয ছেলেপুলে হবে।

সুশোভনাব স্বামী সদবে যায না ওকালতি কবতে। নিজেব শহবেই মাস্টাবি কবে। সে সুখেই আছে। মাযেব কাছে শুনেছে সে সুশোভনাব ছেলেপুলে হবে। এতে তাব এক আনন্দ। কাবণ নতুন উচ্চাশাব সূত্রপাত হযেছে তাব মনে।

সুশোভনা– হ্যা, তাকে স্বাভাবিকই বলতে হবে। চোখ মুদে থাকে সে এখনও মুখটাকে তুলে ধবলে। এই ব্রীডা ভালোই লাগে তাব। ববং তৃপ্তিব কাবণই যেন। অবশ্য খুব খুঁজলে একটা ঘটনাব কথা সে বলতে পাবে। একদিন হঠাৎ তাব চোখে পডেছিল। ঘবেব বড দেযালপঞ্জিটাতে শনিবাবগুলোয যেন কে ঢেবা কেটে দিযেছে। যেন তাবা নেই।

তাব মনে হযেছিল দেযালপঞ্জিটাকে সাবিযে ফেলাব, কিন্তু তা কবেনি সে। আব একদিন একটা কৌতুকেব ব্যাপাব হযেছিল। শোবাব ঘবেব টেবিলে সুশোভনাব দাদাব একটা ফটো ছিল। এক সকালে দেখল সে ফটো মাটিতে পডে আছে, ফ্রেমটা চুবমাব কবে ভাঙা।

পডে গিযে ও বকম হযনি তাব আব এক প্রমাণ ফটোব চেহাবায গোঁফেব দাগ এঁকেছে কে কালি দিযে। সুশোভনাব স্বামী ফটোটাকে সবিযে ফেলল।

কিন্তু একদিন সুশোভনাব স্বামীকে 'গণ্ডি' এই কথাটাব তাৎপর্য নিযে চিন্তা কবতে হল। শনিবাব সেদিন। সকাল সকাল স্কুল থেকে এসে ছাত্রদেব খাতা দেখতে দেখতে তাব প্রতীক্ষা কবছিল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন কথা বলছে। কতকটা সুশোভনাব মতোই মনে হয। কিন্তু সে কণ্ঠস্বব যেন নিদ্রিত। যেন অনেক দূব থেকে আসে।

'গণ্ডিটা দেযা হযনি বলেই কি কষ্ট দেবে আমাকে। বলো তুমি কে। কী ক্ষতি তোমাব কবেছি আমি'।

তাবপবই চুপচাপ।

সুশোভনাব স্বামী তাডাতাড়ি উঠে এসেছিল। সে দেখতে পেল শোবাব ঘবে এসে সুশোভনা টেবিলেব কাছে দাঁডিযে আছে, যেখানে আযনাটা আছে তাব কাছাকাছি। সব মেযে এ বকম কবে কি না বলা যায না। স্বামীব কাছে যাবাব আগে আযনাব মুখ দেখে নাকি সুশোভনা। কিন্তু সুশোভনাব হাতেব চাযেব কাপ টেবিলে বাখা। চা ছলকে পডেছে টেবিল ক্লথে। সে যেন ক্লান্ত।

সুশোভনাব স্বামী বলল, 'কী হল'।

'কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল'।

'এ সময়ে তা হয়। তুমি কি কথা বলছিলে নাকি'?

'কথা? মনে মনে যেন কী খুঁজছিলাম'।

একটু চুপ করে থেকে সুশোভনার স্বামী বলল, 'কই চা দাও। চলো ও ঘরে গিয়ে বসি।'

আর একদিন গভীর রাত্রিতে ঝনঝন করে একটা শব্দ হল। ঘুম ভেঙে গেছে। আর একটা জিনিস লক্ষ করল। সেটা সুশোভনাব চুল সাজানোর বৈশিষ্ট্য। অন্যসময় এ রকম দেখা যায় না। সেই চা আনবার ঘটনাটার সময়ে এ রকম দেখেছিল সে। চুল দুভাগে ভাগ করে একগোছা কাঁধের ওপর দিয়ে এনে বুকের উপরে ঝোলানো, অন্য ভাগ পিছনে। এখনও চুল সে রকম করেই ছড়ানো।

সুশোভনার বর তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'কী হল'?

সুশোভনার চোখ বোঁজানো। সে যেন ঘুমোচ্ছে।

'শুনছ'।

বরের বুকের উপরে সুশোভনা যেন অজ্ঞান হয়ে গেল।

তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে কিন্তু ঘুম ভাঙল তার।

'কী হল, বলো তো'। প্রশ্ন করল সুশোভনা।

'কিছু না তো'।

'কে যেন ফিসফিস করে ঝগড়া করছিল আমাব সঙ্গে। আমাকে যেন কী সব বিশ্রী কথা বলছিল। খুব রাগ করলাম'।

'স্বপ্ন হবে'।

'তা হবে। তুমি কিন্তু আমাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখো। কী যে পুরুষমানুষ তুমি, কিছু যেন জোর নেই'।

এরপরেও আব একটা আয়না ভেঙেছিল। সুশোভনাব বর জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল'?

'আয়নাটা ভেঙে গেল। কী যেন খুঁজতে এসেছিলাম'।

'তা হবে। এখন অনেক রাত। তুমি বিছানায় এসো'।

সুশোভনার শাশুড়ি সাধের ব্যবস্থা করছিলেন। সুশোভনার মায়ের সঙ্গে পত্রালাপ করে স্থির হয়েছে শ্বশুববাড়ির সাধটাই আগে হবে। তারপর সে বাপের বাড়ি যাবে।

একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল তার, তাতে সাধের আয়োজন পিছিয়ে যাযনি।

স্বামী শুতে এলে সে বলল, 'তাই কি হয় নাকি? আমার গলায় ব্যথা হয়েছে। জ্বরটাও বেশ এসেছে। ছোঁয়াচ লাগবে না'?

'কী এমন হবে'।

'একজনের জ্বর দুজনে ভাগ করে নিযে লাভ কী'?

কাজেই সুশোভনাব বর পাশের ঘরে শুয়েছিল। মাঝরাতে একবার মনে হল, সুশোভনা কার সাথে কথা বলছে যেন। কান পেতে সে শুনল— সে যেন তার দাদাকে তার শরীরের কষ্টের কথা বলছে। সুশোভনার বর উঠে গিয়ে দেখল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে।

'এমন করে মুড়ি দিয়ে শোয়? ঘেমে উঠেছ'।

'না। তুমি শোওগে'।

শেষরাত্রির দিকে সুশোভনার বরের ঘুম আবার ভেঙে গিয়েছিল। এবার যেন সুশোভনা কাকে বকছে মনে হল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল সে। সুশোভনা যেন একই প্রশ্ন করছে বারবার— 'কে? কে তুমি? কেন আমাকে কষ্ট দাও, সুখী হতে দাও না'।

সুশোভনার বর ভাবল উঠে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে আসবে। একটু ক্লান্তিও বোধ করল সে।

অনেকের এ রকম অভ্যাস থাকে ঘুমের মধ্যে কথা বলা। এই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিরক্তির মতো একটা নিষ্ক্রিয়তা এল তার।

সকালে একটু বেলা করে কিন্তু একটা হৈ-রে-রে মধ্যে ঘুম ভাঙল তার। খোলা জানলা দিয়ে আব সকলেই দেখেছে। দরজা বন্ধ বলে তারা ঘরে ঢুকতে পারছে না। সুশোভনা আত্মহত্যা কবেছে।

পাখা লাগানোর জন্য যে লোহাব আঁকড়া ছিল, তাব সঙ্গে চাদর জড়ানো আব তা থেকে ঝুলছে সুশোভনার দেহ।

সুশোভনার বর লক্ষ করল চুল সাজানোর কায়দাটা। একগোছা চুল বুকেব ওপর লুটানো। অন্য গোছাটি পিঠের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে সে সুশোভনার দেহটাকে নামাতে গিয়ে চমকে চিৎকাব কবে উঠল। দেয়ালের গায়ে আব একটি সুশোভনা। যেন বিস্ফারিত প্রশ্নেব দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু সেটা আয়না। আয়নাটা ওখানে ছিল না। তাহলে সুশোভনাই ফটো সরিযে সেই লোহায় টাঙিয়েছে। বেগ পেতে হয়েছে টাঙাতে।

আর একবার দেখল সুশোভনার বর আয়নায় সুশোভনার ছবির দিকে। সে সুশোভনাব ঘাড়টা বাঁকানো কতকটা ঝগড়ার ভঙ্গিতে। কুচকুচে কালো চোখ দুটি বিস্ফারিত হযে যেন প্রশ্ন কবছে—কে তুমি?

রানী ইন্দুমতী

কলকাতা শহরেই বটে ট্র্যামলাইন নেই এমন একটা রাস্তার দু পারের বাড়িগুলোর প্রাচীরে বসে দাঁড়কাক ডাকছে। ভিস্তিওয়ালা এখনও রাস্তা ধুতে আসেনি। দাঁড়কাকগুলোর ডাকাডাকির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কখনও-বা একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসছে। সেটা সকালের প্রথম ট্র্যামের যা ওদিকের ওই বড় রাস্তাটা দিয়ে ছুটছে।

কমলালেবু রঙের প্রাচীরের উপরে তারের জাল, সেই জাল বেয়ে যে লতা উঠেছিল তার কঙ্কাল চোখে পড়ছে। কোনো কোনো ক্লাবের টেনিস কোর্টের পাশে এ রকম উঁচু পর্দা থাকে। আমরা জানি এই পর্দার পিছনে রানী ইন্দুমতীর শোবার ঘর। রাত্রিতে এদিকের জানলাটা খোলা ছিল। প্রায় মাঝরাতে শাদা আলোর পরিবর্তে নীল আলো জ্বলেছিল, এখন আবার এই প্রত্যূষে শাদা আলো জ্বলছে।

রানী ইন্দুমতী জেগেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারিকা সোহাগি মধ্য কলকাতা থেকে রাত চারটের ট্র্যাম ধরে এসে গেছে। সে এখন ইন্দুমতীর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রানী ইন্দুমতী শয্যার উপরে বসে আছেন—তাঁর এক পা সামনের দিকে ছড়ানো, অন্যটি কোলের কাছে গুটানো। তাঁর ডান হাতে একটা ওয়াইন কাপে হুইস্কি। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। অনামিকার আংটিতে নীলা। অত্যন্ত নিচু করে কাটা ব্লাউজের গলার কাছে মুক্তার যে নীলাভতা সেটাই যেন প্রধান রঙ। এই ছবিকে নীল নায়িকা বলে উল্লেখ করা চলে।

এই সকালে হুইস্কি!

বিছানা থেকে নেমে ইন্দুমতী একটা ডিভানে গিয়ে বসলেন। সোহাগি অ্যাস্ট্রে এগিয়ে দিল, তার প্রাত্যহিক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সে বাথরুমে যাবার ঘাসের চটি, তোয়ালে, কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে লাগল পাশের ঘরে গিয়ে।

ইন্দুমতী বললেন, 'সোহাগি, তুমি বাছা ফেকুর মায়ের মতো প্রভুভক্ত নও। সন্ধ্যা হলেই তুমি বাড়ি ফেরার জন্য আনচান করো। তবু তো তোমার ছেলেপুলে নেই'।

সোহাগির নাম শুনে এবং তার চাকরির সংবাদে প্রৌঢ়া একটি ঝি বলে মনে হতে পারে তাকে। তা নয়।

ফিরে এসে সোহাগি জানালার পর্দা সরিয়ে দিল দুপাশে। দিনের আলো বাড়ল কি না বাড়ল, ঠাণ্ডা একটা বাতাস এসে পৌঁছল। সে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল। সে জানে সন্ধ্যা হলেই তার বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা আসল আলোচ্য বিষয় নয়, ফেকুর মায়ের কথাই মনে পড়েছে ইন্দুমতীর, তার থেকেই এই তুলনা। কিছু না বলে অথচ অগ্রাহ্য না করার সুন্দর একটা ভঙ্গি করে কাপড় তোয়ালে চটি ইত্যাদি বাথরুমে গুছিয়ে রাখবার জন্য সে চলে গেল।

সোহাগি ফিরে এলে ইন্দুমতী বললেন, 'কাল থেকে সোহাগি, ড্রিংক আর সিগারেট দুই ই কমিয়ে দেব ভাবছি'।

সোহাগি জানে রানীর এটা স্বগতোক্তি। নিজেকে কেন্দ্র করে এমন সব আকাঙ্ক্ষামূলক চিন্তা করেন তিনি। হয়তো-বা একই চিন্তাধারার দুইটি স্তরে ফেকুর মায়ের কথা এবং তাঁর নিজের ড্রিংকের কথা মনে হয়েছে। মাঝখানের চিন্তাগুলো অনুক্ত থাকায় তাঁর বক্তব্য অসংলগ্ন শোনাচ্ছে। কিন্তু একটা জরুরি কর্তব্য ছিল তার। সে বাথরুমে গিয়ে দেখে এসেছে গরম জলের শাওয়ারটায় এখনও জল আসেনি।

কিছুদিন হল গরম জলের নলটা কোথায় বিগড়েছে। সেটাকে ঠিক কবতে হলে বাড়ির অনেক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি কবতে হবে। কথা আছে ইন্দুমতী এবাব গবমে যখন শৈলাবাসে যাবেন তখন মেবামত হাতে নেওয়া হবে। ততদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা আছে , বান্নাব মহলে বয়লাবে জল গবম হচ্ছে, পাম্প কবে করে প্রধান বাথকমগুলোর ট্যাংকে পাঠানো হচ্ছে। সোহাগি 'আসছি' বলে বান্নার মহলে গরম জলেব তদাবক কবতে গেল।

ইন্দুমতী সিঁড়ি বেযে নামলেন তাঁব শাশুড়িব মহলে। শোবাব ঘবেব সঙ্গে লাগানো ছোট একটা খাবার ঘব। এ ঘবেবই একান্তে স্টোভ আছে, দেযাল আলমাবিতে বাসনকোসন। টেবিলের ধাবে প্রত্যাষেব আহাবেব প্রতীক্ষায সেনবুড়ি ও ফেকুব মা বসেছে। একই টেবিলে বসাটা লক্ষ্যণীয়। (সেনবুড়িব নামের আগে এককালে বানী কথাটা ব্যবহাব কবা হতো। এখন কাগজকলমে তিনি বাজমাতা)। স্টোভেব প্লাগ লাগিযে জল গবম কবে সোহাগিই সেনবুড়ি এবং ফেকুব মাকে হবলিকস্ কবে দিল। ততক্ষণে এ মহলেব বাসিপাট সাববাব জন্য ঝিও এসে কাজে লেগেছে।

সেনবুড়ি তাঁব স্তিমিতপ্রায গলায প্রশ্ন কবলেন, 'আজ কাবো জন্মদিন নয'?

ঝি হবলিক্সেব বাসনগুলো ধুযে এনেছে। সোহাগি সেগুলোকে মুছে দেযাল আলমাবিতে তুলে চাবি দিচ্ছে। চাবি দেওযাব ববস্থাটা হালেব। কিছু রুপো আছে, কিন্তু তা হাবাবাব ভযেই নয। আলমাবিব গাযেই আগে চাবি থাকত। আলমাবি খোলা পেযে হবলিক্সেব শুকনো গুঁড়ো খেযে সেনবুড়ি এবং ফেকুব মা অত্যন্ত অসুস্থ হযে পড়েছিল কিছুদিন আগে। তাবপব থেকেই এই ব্যবস্থা।

ইন্দুমতী শাশুড়িব কাঁপা কাঁপা সুবেব প্রশ্নটা শুনে কিছুটা বিস্মিত হলেন। শাশুড়িব সঙ্গে কথা বলাব সমযে একটা ছদ্ম-গাম্ভীর্য ব্যবহাবে আনেন তিনি। শাশুড়িব মর্যাদা বাখাব এটা একবকমেব চেষ্টা।

ইন্দুমতী বললেন, 'জন্মদিন। ও জন্মদিন? হ্যাঁ, তা বইকি।

ঝিকে দু-গ্লাস জল গড়িযে দিতে বলে ইন্দুমতী নিজেই আলমাবি খুললেন। একটা বড় কৌটোব ঢাকনা সবালেন তিনি। এটায় থার্মোফ্লাস্কেব মতো কী একটি কোশল আছে—মিষ্টি দু-চাবদিন অবিকৃত থাকে। দুটি প্লেটে গোনা দু'খানা সন্দেশ ইন্দুমতী সেনবুড়ি ও ফেকুব মাযেব সম্মুখে এগিযে দিলেন। ডাক্তাবি মাপ।

সন্দেশ দুটি শেষ হতে মিনিট পনেবো লাগবে। ততক্ষণ এ মহলে থাকতে হবে তাঁকে। সে সমযে তিনি এ মহলেব ঘবগুলি পবিদর্শন কবতে বেকলেন। দেযালেব কোনো কোনো জাযগায় নোনা ধবেছে যেন, অন্তত বং ঘামছে বলে মনে হল। সিলিং-এব আস্তব কোথাও কোথাও ফেঁপে উঠেছে--খসে পড়াব আগেকাব অবস্থা। গত বছব যখন মেবামতেব জন্য লোক লেগেছিল তখন সেনবুড়িব শান্তি ব্যাহত কবাব ভযে এদিকে আসেনি তাবা। এবাবে হাত দিতে হবে।

ইন্দুমতী ফিবে এসে দেখলেন এদেব সন্দেশ খাওযা শেষ হযেছে, সোহাগি টেবিল সাফ কবছে। তিনি শাশুড়িব পাশে একটা চেযাবে বসলেন।

সেনবুড়ি বললেন, 'কাব জন্মদিন, বউমা'?

যা তা, মুখে যা আসে তা বলে দেওযা চলে না। মাঝে মাঝে দু-এক মিনিটেব জন্য পবিচ্ছন্ন হযে ওঠা একটি মন থেকে সেনবুড়ি অদ্ভুতভাবে সত্যিকাবেব একটি প্রশ্ন কবে বসেন। তখন অন্যেব কথায অযৌক্তিক প্রবোধ বাক্য থাকলে তা ধবা পড়ে যায তাঁব কাছে।

এক্ষেত্রে সেনবুড়িব প্রত্যক্ষ স্মৃতিব বাইবে বিষযটিকে বাখবাব জন্য ইন্দুমতী বললেন, 'আমাব ভাইযেব এক ছেলেব জন্মদিন'।

সন্দেশ-প্রাপ্ত সেনবুড়িব মনে কোনো প্রশ্নেব উদয হল না। তিনি ফেকুব মায়ের দিকে ফিবে প্রফুল্লমুখে বললেন, 'দেখলে, আমি বলেছিলাম'।

অন্য কারো সম্বন্ধে হলে এবং অন্য কেউ হলে এ বকম একটি প্রশ্ন এখানে উঠতে পাবত সেনবুড়ি

শুধুমাত্র সন্দেশ পাবার জন্যই জন্মদিনের কথা উত্থাপন করেছিলেন কি না।

নিজের ঘরে ফেরার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফেকুর মায়ের কথাই বরং ইন্দুমতীর মনে হল। ফেকুর মা বয়সে সেনবুড়ির চাইতে কিছু ছোট। মাঝখানে প্রায় ত্রিশ বৎসর সে এ বাড়িতে ছিল না। ফেকুর মৃত্যুর পর নাতিপুতির অনাদরে তার ডাভকোরার বাড়ি ও জমি-জিরাৎ ফেলে রেখে সে চলে এসেছে। দু'চোখে ছানির দরুন দশ আনা পরিমাণ অন্ধতা, শনের নুড়ির মতো চুল, মুখে একটিমাত্র কালো অবশিষ্ট দাঁত নিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ের শুকনো রলায় ভর দিয়ে দিয়ে এক অবিশ্বাস্য উপায়ে সে এদেশে ফিরে এসেছিল। তার অনুপস্থিতির সময়ে এ বাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছিল। হাতায় বসে সে ভাবছিল দুষ্টছেলেরা তাকে ধোঁকা দিয়েছে, তখন সেনবুড়ি তাকে দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়েছিলেন। ফেকুর মায়ের এই আসাও প্রায় পনেরো বছর হল।

ইন্দুমতীর হাতে এখন অনেক অবসর। সমাজের হুল্লোড় থেকে এখন তিনি অনেক দূরে অবস্থান করছেন। কোনো পার্টিতেই প্রায় আজকাল তিনি যোগ দেন না, কোনো পার্টির আয়োজনই করেন না। তাঁর রূপ, তাঁর সাজসজ্জা, তাঁর সিগারেট এবং গ্রন্থপ্রিয়তা সমাজের দৃষ্টিতে অভূতপূর্ব। হয়তো তাঁর বৈধব্যও এই হিসাবে ধরা হয়। তিনি যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তো নির্বোধও নন, রাজনৈতিক নেতাও নন যে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সুখী হবেন। তাঁর উত্তর-চল্লিশের দৈহিক আকর্ষণ নিয়ে সুতরাং তিনি একটি মুক্তাফলের মতো আত্মগত, চারিদিকের জলকল্লোলে যদিবা তাঁর পরিবেশের ঝিনুক নড়ে ওঠে।

কাজেই একখানা বই নিয়ে বসলেন ইন্দুমতী যখন তাঁর সংসারের জীবনধারা তাঁর মহলের পর্দার ওপরে প্রবাহিত হতে লাগল।

ইন্দুমতী বই খুলে, না পড়ে, চিন্তা করলেন

ফেকুর মা এবং সোহাগি কখনও এক হবে না। যদিও সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখন আর সম্ভব নয়—এ রকম একটা প্রবাদ আছে এ বাড়িতে . ফেকু, ফেকুর মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও তার স্বামীর নয়। আর সে তখন নাকি নিছক মতি ঝি ছিল না। অন্যান্য দাসদাসীরা তার নামের সঙ্গে বাঈ কথাটা যুক্ত করত। সেটা একটা রূপকথার মোহের মতো ব্যাপার, যা ঘটেছিল। তারপরই ফেকুর মায়ের নির্বাসন ত্রিশ বৎসরের জন্য। ডাভকোরা থেকে ফেকুর মায়ের চিঠিতে সময়ের ব্যবধানে ফেকুর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। সেনবুড়িই ডাভকোরার ঘরবাড়ি জমিজমা করার টাকা নিজের হাতখরচ থেকে পাঠতেন। এর থেকে এবং অন্য দু-একটি কারণে এ রকম একটি সন্দেহ হয়েছে ইন্দুমতীর যে ফেকুর মায়ের ঘটনাটায় সেনবুড়ি খুশিই হয়েছিলেন। তাঁর এ রকম সন্দেহ হয় ফেকুর মাকে বিশেষভাবে এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সেনবুড়ির পরিকল্পনা ছিল। যে বিষয়টি ঠারেঠোরে, গোপন ইশারায়, কথার তলায় লুকানো কথায় চলে চলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মধুময় বোধ হচ্ছিল, যাদুকরের দণ্ড দিয়ে তিনি যেন দেখিয়ে দিলেন সেসব ব্যাপারের সমীকৃত ফল ফেকু, কাব্য নয়।

মানুষ অনেক কিছুই করছে কিন্তু নিজের জীবনরূপ কৌতুক ও রহস্যের যে বিষয়টি তার হস্তগত তাকে নিয়ে খেলা করতে, পরীক্ষা করতে, তার সঙ্গে প্রণয় করতে, বোকা প্রতিপন্ন হয়ে তার মুখোমুখি বসে থাকতে সে যেন চায় না।

ইন্দুমতী ভাবলেন : জীন তত্ত্ব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকলেও বিস্ময় বোধ হয়—গৌরবর্ণ বাপ মায়ের ছেলেমেয়ে কালো হয়ে গেলে। কোনো এক মায়ের ভিলত্ব কত পুরুষ ধরে কলকাতার বনেদি প্রাসাদের চোরাকুঠুরিতে, বস্তির চোরাগলিতে, আর্য-সেমেটিক-মঙ্গোল জাতীয়তার দরজা পার হয়ে হয়ে ফেকুর মায়ে এসে পৌঁছেছিল—তা বলা একান্তই অসম্ভব। কিন্তু ফেকুতে পৌঁছে দেখা গেল ভিলত্ব পরিবর্জিত হয়নি। ফেকুর ছোটমাথা, ভিতর দিকে বসানো কপাল, পুরু ঠোঁট—এসবের কথা ইন্দুমতী

শুনেছেন। তাহলেও এসবগুলি মিলিয়ে তাকে যেমন আর্যেতর টাইপ বানানোর চেষ্টা আছে আসলে হয়তো ততটা নয়, সেনবুড়োর আকৃতি বৈশিষ্ট্যও হয়তো কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছিল।

সোহাগি এসে বললে, 'ব্রেকফাস্ট'।

জীনতত্ত্বের কথা আজকাল ভাবেন ইন্দুমতী। ভাবলেন চলতে চলতে।

টেবিলে বসেই ইন্দুমতীর ছেলে পলাশ যা একটু কথা বলে। সদ্য আসা কাগজটার প্রথম পাতায় একটি ছবি বেরিয়েছে। নীরেন রাহা নামে এক ভদ্রলোকের ছবি—এবং তিনি ইউরোপে যাচ্ছেন তার ঘোষণা। ইন্দুমতী লক্ষ্য করলেন ছেলে ছবিটা এবং তার নিচের লেখা একাগ্র মনে দেখছে, যেন ইউরোপে যাওয়াটা এমন কিছু একটা ব্যাপাব। তিনি তাঁব নিরামিষ প্লেটের ক্রিস্পগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। রমলা টেবিলে ছিল। ইন্দুমতী লক্ষ্য করলেন তাঁর অসন্তুষ্ট দৃষ্টিটা রমলা লক্ষ্য করেছে। রমলার ডান হাতখানা কাঁটা-চামচ রেখে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল আলগোছে, অন্যমনস্কভাবে, যেন সে কিছু বলবে, পলাশের বাঁ হাতখানা ঘেঁষে। মনে হল যেন তাব একটা আঙুল এগিয়ে গিয়ে পাশে-শোওয়া অন্য হাতখানাকে একবার স্পর্শ কবল। অবশ্য রমলার চোখ দুটি সর্বক্ষণ ইন্দুমতীব মুখের উপবে রাখা ছিল, যাদুকর হাতের কাজ করার সময়ে যেমন করে দর্শকের চোখে চোখ বেখে তাব দৃষ্টিতে ব্যাপৃত রাখে। টেবিলে ভাঁজ করা আর একটি কাগজও ছিল। ইন্দুমতী বানী সেটাকে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। দ্বিতীয় পাতায় থামলেন ইন্দুমতী, এটি বোধ হয় নীরেনের পার্টির কাগজ নয়—তবু তাব ছবি না ছেপে পারেনি। তিনি কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। রমলা বললে. 'জন্মদিনের কী হচ্ছে'?

'জন্মদিন? ও হ্যাঁ জন্মদিন'।

'কার আবার জন্মদিন'? ইন্দুমতীর ছেলে প্রশ্ন তুলল।

'তোমার মামাতো ভাইয়ের'। বললেন ইন্দুমতী।

কোনো কোনো সময়ে একটি পলককে সুদীর্ঘ বলে মনে হয। তেমনি একটি ইন্দুমতী লক্ষ্য করলেন—রমলাব বিস্মিত পক্ষ্মগুলি আমেরিকান প্রসাধনেব সাহায্যে দীর্ঘতর হয়েছে, তার চোখের মণিটায় সোনালি আভা আছে, চোখের কোলে হাল্কা প্রসাধিত কালিমা। কিন্তু রানী ইন্দুমতীকেই চোখ নামিয়ে নিতে হল, রমলাকে নয়।

ব্রেকফাস্ট চায়ে শেষ হলে রমলা ও ইন্দুমতীব ছেলে চলে গেল। ইন্দুমতী জানেন তাঁর ছেলে এখন সোজাসুজি তাব পড়ার ঘবে গিয়ে বসবে। বমলার পড়ার ঘর অন্য মহলে। কোনো কোনো দিন রমলা তার পড়ার ঘরে না গিয়ে পলাশের ঘরে একখানা সোফায় গিয়ে বসে। মুখের সামনে খবরের কাগজ ধরে বিড়বিড় কবে নানা বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করে। সেই অজস্র অস্ফুটতা অবশেষে পলাশের দৃষ্টি এবং পরে মনকেও বই থেকে সরিয়ে আনে।

সেই এক শেষরাতে ওরা দুটিতে নাইট ক্লাব থেকে ফিরবার পব থেকে এ ব্যাপারটা নজরে পড়ছে। তার আগে পলাশ সঙ্গে কোনো মহিলা নিয়ে পথ চলতেও আপত্তি কবত। এটা লক্ষণীয় অন্য অনেক ব্যাপারের মতো রমলা ইন্দুমতীর ছেলেকে মোটর চালাতে শিখিয়েছে এবং ঠিক টাই-টা পছন্দ করতে। যদি নীরেন রাহার পার্টির দিকে ঝুঁকে থাকে সে রমলাই তাকে শুধরে আনতে পারবে। ইন্দুমতীর ছেলে পড়ার ঘরে বই মুখে করে বসে থাকত। সেই গণ্ডির বাইরে যদি তাকে কেউ এনে থাকে তবে সে রমলা।

বই! বই দিয়ে কী হবে? অবশ্য তিনি নিজে পড়েন।

ইন্দুমতী রানী সিগারেট ধরালেন।

এ বাড়ির একটি ছেলে যার উপাধি ছিল রাজা এবং ইন্দুমতী যাকে বিবাহ করে রানী হয়েছেন সে ছিল ইন্দুমতীর ভাই বিজয়ের সহপাঠী। সে মেধাবী ছাত্র ছিল না, বিজয ছিল। এজন্যই বোধহয় বিজয়ের প্রতি তার একটা টান ছিল। ইন্দুমতীদের বাসার গলিতে তার গাড়ি ভিড়ত না, বড় রাস্তার ধারে পার্ক করে রেখে আসতে হতো। ইন্দুমতীর বাবা একজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তা থেকে ধরে

নেওয়া যায় কোনো এক চওড়া গলিতে তাঁর বাসা ছিল, কিন্তু রাজার গাড়ি তার তুলনাতেও চওড়া ছিল। বিজয়ের তখন আঠারো, ইন্দুমতীর কুড়ি, এ লোকটিরও না হোক ইন্দুমতীর সমবয়সী হওয়ার কথা। কিন্তু তার টপ্ হ্যাটে এবং স্ট্রাইপ স্যুটে তাকে অন্তত পাঁচ-সাত বছরের বড় বলে বোধ হতো। যদিও এদিকে সিল্কের মতো কোমল দাড়ি গোঁফ ছিল মুখে ; আর কী অপূর্ব সারল্য ছিল তার দৃষ্টিতে, শিশুর মতো কী নিঃশঙ্ক কৌতূহল! ইন্দুমতীকে সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কি স্টে ব্যবহার করেন'? কিন্তু কথা তো শুধু কথা নয়—গলার সুর, চোখের দৃষ্টি এবং বক্তার ভঙ্গি। এরই জন্য ইন্দুমতী নিজের জন্মতিথিটাকে দু-মাস আগে সেপ্টেম্বরে সরিয়ে এনেছিলেন।

তখনকাব দিনে বিজয় একবার বলেছিল, 'দিদি, আর একবাব ভেবে দেখো'।

ইন্দুমতীর তখন ভেবে দেখবার অবসর ছিল না। দামি চিনেমাটির মতো কিম্বা জাপানি ছবির মতো এক ধরনের স্তিমিত কিন্তু আকর্ষণীয় রূপ ছিল তাঁর। তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল।

রাজা একদিন তার রানীকে বলেছিলেন, 'ইন্দু, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণেব মূলে ছিল তোমার মধুর সংযম'।

একদিন চিন্তা করতে বসে ইন্দুমতী অনুভব করেছিলেন, মধুর হওয়ার ব্যাপাবে তাগিদ ছিল আর সংযত হওয়া তাঁর মতো মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। হিসেবি বুদ্ধি ছিল বলেই উৎসব করে সহধর্মিণী হওয়ার মাস ছয়েক আগেই তিন আইনে বিবাহ হয়েছিল তাঁদের।

রানী ইন্দুমতীর ছেলের জগজ্জ্যোতি দিয়ে আরম্ভ করে যে পোশাকি নাম সেটা ছাড়া আব একটা নাম আছে—পলাশ। জানে অনেকেই, কিন্তু, ইন্দুমতীব মনে পড়ল এই 'পলাশ' কথাটা বমলার মতো কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। শুনে মনে হয় কথাটা সে অত ভালো উচ্চাবণ কবতে পাবে বলেই রমলার বক্তব্যে কথাটা বারবার ফিরে ফিবে আসে।

এখনই হয়তো সে আসবে এবং বলবে, 'কিছু বলব'।

'কী বলবে তা আমি বুঝতে পারছি। বলো'।

'পলাশের জন্মদিন, আমি খবর পেয়েছি'।

'তা পেয়েছ, দেখছি'।

'উৎসবটা গত বছর হয়নি'।

'তা হয়নি। এটা কি তোমরা আলোচনা করছ'?

'না। উৎসবটা হয় না'?

'ভেবে দেখি'।

চিন্তা করতে করতে এক হাতের তেলোয় রাখা অন্য হাতের তেলোতে চোখ রেখেছিলেন তিনি। সামনে রমলার চোখ নেই। তাঁর মনে পড়ল তখন কেউই আগে পলক ফেলতে চায়নি, যদিও বয়সের খাতিরে রমলার তা উচিত ছিল।

এই কাল্পনিক কথোপকথন শেষ কবে ইন্দুমতী সুতবাং কিছু ক্লান্ত বোধ করলেন। কিন্তু ক্লান্তিতে সব কিছু শেষ হয় না। তাঁর মনে সম্ভাব্য নিমন্ত্রিতদের তালিকাটা ফুটে উঠল। আজ সকালে দু'বার হয়ে গেছে—একবার সেনবুড়িকে, দ্বিতীয়বার পলাশকে জন্মদিনের কথায় বলেছেন বিজয়ের ছেলের জন্মদিনের কথা।

ইন্দুমতী ফোন ধরলেন নিজের ঘরের একান্তে।

'আপনি কে? ডাক্তারবাবু এখন ব্যস্ত আছেন'।

'আহা। বিজয় ডাক্তারকে বলো আমি যা বলেছি। হ্যাঁ, বলো দিদি ডাকছেন'।

'দিদি?

'হ্যাঁ গো, বাছা'।

লোকটি 'বলছি' বলে চলে গেল।

'দিদি, তুমি ডাকছ'?

'হ্যাঁ, তোর ছেলে বউকে পাঠিয়ে দিবি আজ'।

'হঠাৎ এই ভোরবেলায়'?

'আজ আমার জন্মদিন মনে কর না'।

'আজ জন্মদিন তোমার? আমি তো শুনেছি আমি আর তুমি একমাসে জন্মেছিলাম- ডিসেম্বরে। অবশ্যি পরে তোমার জন্ম তারিখ বদলে নিয়েছ নিজেই'।

'তুই বড় দুষ্টু, বউ-ছেলেকে পাঠাতে তোর আপত্তি কী'?

'কিন্তু তা নয়, আজ কাল কিম্বা পরশু পলাশের জন্মদিন এতদিন যা করোনি এখন যদি তাই করো, মানে ভাগনের জন্মদিনে মামিকে নেমন্তন্ন, তাহলে আমাকেও প্রস্তুত হতে দাও

'উপহার'?

'কাজে কাজেই'।

'আমি দুপুরে গিয়ে বিকেলে নিয়ে আসব বউকে, বলে রাখিস। কার জন্মদিন হবে আমি ভেবে দেখি'।

একটু যেন স্বস্তি বোধ করলেন ইন্দুমতী কিছু একটা করতে পেরে।

কিন্তু পলাশের জন্মতিথিতে নিমন্ত্রিতের তালিকা আবার মনে ফিরে এল। স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দুমতী ছেলের জন্মতিথি পালন করতে পারছেন না। রানী ছেলেকে পদ্মলোচন বলে হৈ হৈ করা নয় তবু কেন তিনি তেমন করে পারেন না, এ প্রশ্নটা স্বামী থাকতেও তাঁর মনে উঠেছে। কিন্তু তখন কোনো কোনো প্রশ্নকে নিবিয়ে দেওয়া যেত, তার স্বামীর ব্যক্তিত্ব নিবিয়ে দিত।

কোনো কোনো সময়ে জন্মোৎসব অবসান হ'ল ইন্দুমতী নিজের বারান্দায় বসে চিন্তা করেছেন কোথাও আটকালো না কেন? সবসময়েই বাধো বাধো লাগছিল অথচ মরচে পড়া স্প্রিংয়ের উপর টাল খেয়ে খেয়ে গাড়িটা গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

অনেক নিমন্ত্রিতের অনেক কথার মধ্যে নহবগড়ের রানীর কথাই ইন্দুমতীর বেশি মনে পড়ে। ইন্দুমতীর স্বামীকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে তোমার শ্বশুরবংশের মতো হয়েছে, নাই নয়'?

তারপর ইন্দুমতীর স্বামী এবং নহবগড়ের রানী আলাপ করতে করতে করিডর দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে চলে গিয়েছিলেন। পথ চলতে চলতে থেমে একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'মিনিট ধরে তাঁরা গল্প করেছিলেন, ইন্দুমতী তখন বসবার ঘরে অন্যান্য অতিথিদের স্বাগত করবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

করিডরটা যেখানে দোতালার ব্যালকনির প্রতিদ্বন্দ্ব হওয়ার জন্য গোল হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে একটা ব্যালকনির আকার তৈরি করেছে সেখানে মোজেইক-করা থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রায়চৌধুরীদের ছেলে একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল।

দেরি করে আসা কোনো নিমন্ত্রিত হল এ পড়ে আছে কি না জানবার জন্য পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইন্দুমতী। রায়চৌধুরীদের ছেলে একবারমাত্র ফিরে চেয়ে ছিল, বলবার মতো কথা খুঁজে পায়নি। অথচ রায়চৌধুরীদের এ ছেলেটির আলাপী বলে নাম আছে। প্রেম নয়, সে মহিলাটি রায়চৌধুরীর প্রেমিকা ছিল না তবু যেন তেমনি মগ্ন হয়ে রইল তারা।

কিন্তু ব্যাপারটা কী?

সংস্কৃতি? ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যাকে সংস্কার বলি, বংশগত ব্যাপারে তাকে সংস্কৃতি বলা চলে? সংস্কৃতিটাই যেন বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ঘটে যাওয়ার পরে চরিত্র, ঘটে যাওয়ার আগে সংস্কৃতি। এ বংশের সংস্কৃতি যাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম সেনবুড়ি। তাঁর চরিত্রের বিশিষ্টতম ঘটনা ফেকুর সম্বন্ধে।

ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে সেটাকে সেনবুড়ির ষড়যন্ত্র বলে

অনুভব হয়। কিন্তু ষড়যন্ত্র তো নয়, লঘুস্পর্শ একটা কিছু। এই লঘুস্পর্শতাই যেন বৈশিষ্ট্য। নীল বলেই নীল নয়, নীলাভতা। ইন্দুমতীর স্বামীর সম্বন্ধের সেই ঘটনাটাও তুলনীয়। ইন্দুমতী বলেছিলেন, 'আমি ভাবছি পাহাড়ের দিকে যাই কোথাও'। এক পলকের চাইতেও কম সময়ে একটা পাল্টা প্রস্তাব : 'আমি ভেবেছিলাম—' তারপরই তাঁর স্বামী বলেছিলেন, 'বেশ তাই যাও'। ইন্দুমতী একাই পাহাড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর না যাওয়া এবং অন্যত্র যাওয়া এত হাল্কা হয়ে ঘটেছিল কেউ লক্ষ্য করেনি।

অন্য উদাহরণও আছে। তাঁর দেওরের মৃত্যুর কিছু আগে স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছিল। একটিমাত্র কন্যা তাদের, তাকে নিয়ে ইন্দুমতীর জা অন্যত্র বাস করত। অথচ মান-অভিমান, মামলা-হামলা নয়, দিনের পর সন্ধ্যা নামার মতো নিঃশব্দ প্রাত্যহিক ব্যাপার যেন। যেন সন্ধ্যার তারার মতো সেই কলঙ্ক মূল বিচ্ছেদও অনুভব করার কিছু।

কথায় ঠিক ধরা পড়ে না। শীতের সকালে ফুলের গায়ে লেগে থাকা উড়ন্ত মাকড়সার জালে যে শিশির তার বিশ্লেষণ করতে গেলে ফুলটাই থাকে। এক্ষেত্রেও থাকবে আর্থিক ঐশ্বর্য। কিন্তু ফুলটাই তো একমাত্র সত্য নয়। ভাবলেন ইন্দুমতী।

একতলার ড্রয়িংরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন রানী ইন্দুমতী, এমন সময়ে সোহাগি এসে বলল, 'ফোন, আপনার ঘরে'। ইন্দুমতীকে উঠে যেতে হল না, সোহাগি এক্সচেঞ্জকে বলে তাঁর হাতের কাছের ফোনে ডাকটা এনে দিল।

'হ্যালো। কে? নীরেন? বাহা। পলাশকে চাই'?

ইন্দুমতীর মনে হল পলাশকে ডেকে দেবেন, তারপর স্থির করলেন তিনি, শুনিই না কেন নীরেন বাহা পলাশকে কী বলতে চায়।

নীরেন বললে, সে পলাশের প্রস্তাবগুলো দেখেছে এবং ইউরোপ থেকে ফিরে এসে পার্টির থিসিসে প্রস্তাবের দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবিষ্ট করা যায় কি না আলোচনা করবে। এই খবরটাই পলাশকে দেওয়া দরকার। নীরেন তার হোটেল ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

ইন্দুমতী উঠে নিজের ঘরে চললেন। যাওয়ার পথে পলাশের স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে নীরেনের খবরটা তাকে দিলেন। লক্ষ্য করলেন পলাশের মুখের আনন্দ উত্তেজনার পরিবর্তন। যেন এতদিন ধরে সে যে লেখাপড়া করেছে, চিন্তা করেছে তার স্বীকৃতি পাওয়া গেল নীরেন রাহার আশ্বাসে।

নিজের ঘরে ফিরে ইন্দুমতী তাঁর নিজের চিন্তাতে ফিরে গেলেন।

ইন্দুমতী নিজের সবটুকু অন্তর দিয়ে যেন ছেলেকে গ্রহণ করতে পারছেন না। পলাশের মুখের চেহারা, দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, স্বভাব—সবই কোনো না কোনো সময়ে এ পরিবারে আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ্যে নয়, সঙ্গোপনে। কিন্তু ইন্দুমতী জানেন। পলাশ যেন কোনো রাজনৈতিক সংস্থার সংগঠন-সচিব হওয়ার উচ্চাভিলাষ পোষণ করে। তার বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকার সার্থকতা যেন নীরেনের আশ্বাস। দূর থেকে রাজনৈতিক দলকে পিঠ-চাপড়ানো নয়, পথে পথে কাগজ ছড়ানো, কথা বলে বেড়ানো। ইন্দুমতীর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। পলাশ যেন উচ্চাভিলাষ দিয়ে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরবে, যেন সেটা তার বাঁচার পক্ষে অপরিহার্য। সেনবুড়ি রাজমাতা হওয়ার আগে রানী ছিলেন, কিন্তু তার চাইতে বড় কথা রাজকন্যা ছিলেন রানী হওয়ার আগে। রমলার মা-ও তাই। ইন্দুমতীরও উচ্চাভিলাষ ছিল।

এবংশের একটি ধারা আছে : ইন্দুমতীর শ্বশুরের বাবা বেঁচেছিলেন আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত, শ্বশুর বেআল্লিশ. ইন্দুমতীর স্বামী চল্লিশ, ইন্দুমতীর দেওর আটত্রিশ। এমনকী, ডাভকোরার খবর, ফেকুও পঁয়তাল্লিশের দাগ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ইন্দুমতীর ছেলে পলাশ কুড়ির কাছাকাছি যাচ্ছে। ইন্দুমতীর মনে হল : পলাশ ষাট বছরে রিটায়ার করে পত্রিকায় লেখা দিয়ে অর্থোপার্জন করবে কি না কে বলবে।

রানী ইন্দুমতী তাঁর প্রসাধন-করা আঙুলের ডগাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন।

'জন্মদিন? হ্যাঁ তা বইকি'।

দ্বিপ্রহরের আহারে বসে রমলার নির্বাক প্রশ্নের এই নির্বাক উত্তর দিলেন ইন্দুমতী। রমলা তার চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করতেই চায়, তার বসবার ভঙ্গিটা সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ভাবলেন তিনি : গেস্ট হিসাবে নীরেন রাহার এ বাড়িতে আসা কী রকম দেখাবে? বিজয় ডাক্তারেব ছেলেমেয়ে সম্বন্ধেই-বা এরা কী বলবে?

ইন্দুমতী বললেন, 'আমি দু-একদিনের জন্য অন্যত্র যাচ্ছি'।

পলাশ বলল, 'আমার পবীক্ষা কিন্তু কাছে'।

ইন্দুমতী ভাবলেন : এ কথাটা ছাড়া বলবার মতো অন্য কিছু কেন তুমি খুঁজে পাও না পলাশ? তাঁর মনে পড়ে গেল নহরগড়ের রানীর উক্তি। মাতুলবংশের মতো হয়েছে পলাশ। উচ্চাভিলাষী।

তিনি বললেন, 'ততদিন দেরি হবে না'।

রমলার নির্বাক প্রশ্নের দ্বিরুক্তিতে এবার তিনি একটু রুষ্ট হলেন। তাঁর চোখে যা ফুটল তা এই : বমলা তুমি সুলতানা রিজিয়া ধরনের মেয়ে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত আমি যে কোনো সময়ে তোমাদের, তোমাকে এবং পলাশকে, মনে করিয়ে দিতে পারি তোমরা ভাই-বোন তুমি পলাশেব নিজের কাকার মেয়ে।

ইন্দুমতী নিজের কার্যক্রম স্থির কবে ফেললেন। কযেকটি পবিকল্পনা পবীক্ষার পবে বাদ দিতে হল। তাঁর ভাইযেব ছেলেব জন্মদিন হলে ক্ষতি কি?

অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, জন্মোৎসব শেষ হওযাব পর যেমনটা হয়ে থাকে। তাঁর মনে হল, অনেক জল ঢেলে অনেক সময় ধরে স্নান কবা দরকাব, বিকেলেব গা-ধোওয়া নয়। সোহাগিকে ডেকে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। নখেব বঙ ঘষে ঘষে তুলল সোহাগি, যেন ইন্দুমতী আর কোনোদিনই রঙ মাখবেন না। এত সাবান ব্যবহার হল যেন কী একটা সর্বাঙ্গ থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে। ঘরে ফিরে নতুন করে বঙ দিলেন নখে ইন্দুমতী, একবাবও ব্যবহৃত হযনি এমন একটি পোশাক পবলেন।

ভাইযের বাড়িতে যেতে হবে।

গাড়ি চালিযে এনেছিল বমলা, আরোহী ইন্দুমতী। পলটনি মাঠের পাশে গাড়ি থামলে ইন্দুমতী নেমে দাঁড়ালেন পথে। বমলা মোটর নিয়ে অন্তর্হিত হল। বানী জানেন, বমলা তাঁকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি কবার সাহস পাবে না, তারও দুর্বলতা আছে।

একটা ঝরঝর লজঝড় বাসে উঠে পড়লেন ইন্দুমতী। হাতে একটা নরম চমড়ার ব্যাগে খানকয়েক কাপড়জামা।

বিজয় ডাক্তাবেব বাড়িব পাড়াটা ঠিক আছে। বাড়িব চেহারা বদলেছে—এতদিন পরে কি রানী ইন্দুমতী চিনতে পারবেন। অবশ্য সোহাগি বলে দিযেছে বিজয় ডাক্তারের বাড়ি সবাই চেনে। রানীর মনে হল বিজয় শুধু অর্থ নয় সম্মানও সঞ্চিত করেছে। উচ্চাভিলাষে তিনি যে পথে এসেছিলেন সে পথ ছাড়াও অন্য পথ আছে বিজয় যেন তারই প্রমাণ। আব তা যদি বলো 'হুজ্ হু' খুলে তিনি আজই নীরেন রাহার পরিচয় সংগ্রহ কবেছেন এব. তাঁব একটা ধারণা হযেছে তাঁব সহপাঠী হাল্কা গড়নের শ্যামল চেহারার একটি ভালো ছেলে ছিল যে নীরেন রাহা, বর্তমানেব নামকরা এম.পি হয়তো তারই পরিবর্তিত রূপ।

ভিড় ছিল। একটি সিটে একজোড়া চলছে। বউটির বোধ হয় প্রথম সন্তান হবে। আনন্দ-বিস্ময়-পুলকে তার স্বামী কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ইন্দুমতী বললেন, 'বসুন'। তিনি বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সেই রড-ধরা হাতে হীরকখচিত চুড় ছিল তা কি কেউ লক্ষ্য করল? কিম্বা আমরা দেখবামাত্রই কি হীরক চিনতে পাবি? অন্তর্বর্ত্নী নাবীটির স্বামীর দৃষ্টিব সঙ্গে দু-তিনবাব রানী ইন্দুমতীর দৃষ্টি ঠেকে গেল। তাঁর উপস্থিতি পুরুষের দৃষ্টিকে এখনও পরিবর্তিত করে? সঙ্গে স্ত্রী থাকলেও তা হয়?

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে বাস বদল করবেন ইন্দুমতী। ট্রামে, বাসে, পায়ে হেঁটে অবশেষে হয়তো একটা ট্যাক্সি করে তিনি ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছবেন। পথে যদি গোয়েন্দা পিছু নিত তবু তাঁর সঙ্গে কোনো বাড়ির যোগাযোগ খুঁজে বার করা সম্ভব হতো না।

বাসের গায়ে বসানো অকেজো কম্পমান একটা আয়নায় তাঁর চোখ পড়ল। কালো সানগ্লাসে তাঁর চোখ ঢাকা, তার তলায় ঠোঁট দুটি লাল টুকটুক করছে। সন্তান-সম্ভাবিতা মধ্যবিত্ত মেয়েটির চাইতেও তাঁকে সন্তানধারণের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত বোধ হয় এখনও। কথাটা তাঁর মনে কিছুক্ষণ আলোচিত হল।

ভাইয়ের সহায়তায় তিনি কি নতুন করে কারো জন্মোৎসব পালন করবেন—নতুন কোনো জন্মের উৎসব?

বাস থেকে নামতে গিয়ে কার পা তাঁর পায়ে লাগল। পায়ে হেঁটে চলতে চলতে তাঁর আকস্মিকভাবে মনে হল—এটা তাঁর রক্তের মধ্যবিত্তয়ানা, এই অদ্ভুত পথচলা। রমলা বোধ হয় কোনো অবস্থাতেই এমন করে চলার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এসব শুনলে হয়তো হেসে বলবে, 'কলকাতায় কি ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না'?

এমন আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে অনেক কিছু হয়। আজ শনিবার, কাল রবি। রবিব সন্ধ্যায় একটা ট্যাক্সি করে ফিরলেও হবে বাড়িতে। কিম্বা একটা গাড়ি দরকার তাঁর দেওরঝি রমলার। প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব একটা গাড়ির অভাব সে বোধ করছে। আর, একটা গাড়ি পেলে সে কিছুকালের জন্য জেঠিমাকে একটু বেশি খাতির করবে বইকি। শুধু খাতির কেন? রমলা রানীমা বলত, ইন্দুমতীই নিজে তাকে উৎসাহ দিয়ে জেঠিমা বলতে শিখিয়েছেন। নতুন কেনা একটা গাড়িতেও ইন্দুমতী ফিরে যেতে পারেন।

পদ্মিনী

একডালা শহরটি কলকাতার তিনশো মাইলের মধ্যে হলেও এখানকার ঋতুবৈচিত্র্য কলকাতায় দেখা যায় না। বর্ষায় এখানে একবেলায় ছ সাত ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়াটা অভূতপূর্ব কিছু নয়। শীতে এখানে বরফ পড়ে না বটে তাহলেও কলকাতার শীতকে শুধু বাড়ালেই এ শীতের তুলনা হয় না। আর আছে কুয়াশা। বিকেলের কিছু পরে দেখে মনে হয় যেন সেটা কলকাতার সান্ধ্য ধোঁয়া, রাত দশটায় পথের আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়, সকালে মনে হয় পৃথিবীতে এক আমিই আছি আর সব লোপ হয়ে গেছে। শহরের পুকুরগুলোর ধারে এবং নদীর বাঁধে এটা বিশেষ দর্শনীয়।

এ শহরে এসে আমার ধারণা হয়েছিল স্বাস্থ্যটা ভালো করা যেতে পারে। সেজন্য আমি নদীর বাঁধে কুয়াশা গ্রহণ করতে যেতাম এবং ছটা থেকে নটা পর্যন্ত বাঁধে ঘোরাফেরা করতাম।

বাঁধে যাওয়ার যে রাস্তাটা আমি ব্যবহার করতাম সেটা যেখানে বাঁধে উঠেছে তার কাছাকাছি একটা পার্ক আছে। কুয়াশাটা নিচে থেকে গুটিয়ে তোলা পর্দার মতো উঠে যায়। সেজন্য বাঁধে এবং রাস্তায় খুব সকালে প্রথমে শুধু নেপথ্যের মতো পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তারপর বুট ও ট্রাউজারের পা। ক্রমশ কাছে মানুষগুলির কাঁধ পর্যন্ত চোখে পড়ে মাথার কাছে তখনো হাল্কা নিঃশ্বাসের মতো কুয়াশা লেগে থাকে। চারিদিকে তাকিয়ে ইয়োরোপীয় পোশাক পরা পুরুষদের দেখতে পাওয়া যায়। তখন এ জায়গাটাকে ভারতের বাইরে কোনো শহর বলে মনে হয়। কিছু পরে অবশ্য শাড়ির উপরে ওভারকোট পরা মহিলাদের দেখে মনে হয় কোনো শৈলাবাসে আছি। তখন পার্কটাও ভালো করে চোখে পড়ে। ত্রিভুজাকৃতি পার্ক -ত্রিভুজের এক-একটি বাহু পঞ্চাশ গজ পরিমাণ। ত্রিভুজটির জমি ঘাসে ঢাকা। দুটি-একটি ফার্ন গাছ আছে। একটিমাত্র সবুজ রং করা পিঠতোলা লোহার বেঞ্চ আছে। আর ফার্ন গাছগুলির মাঝখানে একটি প্রস্তর মূর্তির লাল লোহা পাথরের পাদপীঠ দেখতে পাওয়া যায়। পার্কে দু একটি করে ছেলে মেয়ে এসে তখন ঘুরে বেড়ায়। তারপর কুয়াশার পর্দা আর একটু গুটিয়ে উঠলে খানিকটা হলুদে রোদ যখন ত্রিভুজের ভিজে ঘাসে এসে পড়ে এবং প্রস্তর মূর্তিটার পায়ের দিকটা দৃশ্য হতে শুরু করে, একটি বৃদ্ধ একটি রিকশা থেকে নেমে পাকিয়ে লাঠি করা ছাতাটা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। চিমসে পাকানো বুড়ো। মাফলার দিয়ে মাথা কান গলা সযত্নে ঢাকা। ছাইরঙের প্যান্টটা জুতো থেকে খানিকটা উঁচু। পায়ে জড়ানো খাকি ফ্লানেলের পট্টিটা চোখে পড়ে। বুড়ো ছাতাটা কখনও ঘাড়ে নেয়, কখনও ঝুলিয়ে রাখে কিন্তু ডানদিকে একটু কাত হয়ে ঘড়ির কলের মতো অবিরত হাঁটতে থাকে। প্রায় দশ মিনিট পরে আর একটি বৃদ্ধ আসে পুরনো মভ রঙের ঝলঝলে মোটরে। একটি চাকর এসে তার জন্যে একটা রবারের কুশন পাতে বেঞ্চটার ওপরে, তার উপরে একটা কম্বলের আসন। তার উপরে দ্বিতীয় বৃদ্ধ উঠে বসে। পুরনো ওভারকোটটা দিয়ে যতদূর নিজেকে ঢাকা যায় ঢেকে নেয়।

আমি তখন পার্কের বিপরীত দিকে একটা অত্যন্ত নিচু চায়ের দোকানে বসে দেখতে পাই প্রস্তর মূর্তিটা ততক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মূর্তিটার বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত ছোট ছোট শহরে সেই শহরের কোনো কৃতকর্মা পুরুষের মূর্তি থাকে, কিংবা কোনো লাট-বেলাটের। এটা কিন্তু তা নয়। একটি মেয়ে মাথায় এক ঝুড়ি মাটির ডেলা কিংবা পাথর এবং হাতে একটি ছোট কোদাল নিয়ে যেন অত্যন্ত দ্রুত কোথাও যাচ্ছে। এটা কারো মূর্তি নয়। একটা কাল্পনিক কিছু।

এমন একটি ছোট পার্ক যা শহরের মাঝখানেও নয় তাতে একটা ভাস্কর্য স্থাপন করার যুক্তি খুঁজে

পাওয়া যায় না।

একদিন চায়ের দোকানদার গল্পটা বলল : বিশ বৎসর আগেকার ব্যাপার। নদীটা তখন এমন সংকীর্ণ ছিল না, আসল স্রোতটা ছিল এই শহরের পাশ দিয়ে। এবং এই একডালা শহর তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সেটা তো এই সেদিনের ব্যাপার। যুদ্ধের সময়ে এই শহরে একটা আমেরিক্যান হসপিট্যাল হয়েছিল। সেই আমেবিক্যান আহত এবং রুগ্নদের জন্য শহরটা দ্যাখ-দ্যাখ করে এক পণ্যশালায় পরিবর্তিত হয়েছিল। সেই পণ্যশালার চাকচিক্য যুদ্ধ থামার পরে সরকারকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই আমেরিক্যানবা নেই। দু-পাঁচজন সন্দেহজনক সাদারঙের বাঙালি ছেলেমেয়ে আছে, প্যান্টকোট পরার রেওয়াজটা আছে। তার অনেক আগে, বিশ বছর তো হবেই, নদীর পুরনো বাঁধ এই জায়গায় ধসে যাচ্ছিল, শহরে জল ঢুকতে শুরু করেছিল। ছোট্ট মিউনিসিপ্যালিটি লোকজন নিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। বাঁধের এপারেও তখন এক কোমর কাদাজল। অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটি হাল ছেড়ে দিয়ে ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে বহু দূরস্থিত এক সরকারকে তার করতে লাগল। তখন স্কুল কলেজের ছাত্র ছেলেমেয়ে ঝুড়ি-কোদাল, ইট-পাথর, কুড়ুল নিয়ে এগিয়ে এল। দিন বাত কামাই নেই। পালা করে তারা সারারাত ডে-লাইটের আলো জ্বালিয়ে কাজ করত। মিউনিসিপ্যালিটি ভরসা পেয়ে এগোল। অনেক পরে সরকার থেকে একজন পরিদর্শক এঞ্জিনিয়ার এসেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রাত বারোটায় সাত-আটজন ছাত্রছাত্রীর একটি দল কাজে এসেছিল। ভোর রাতে নতুন দল আসবে। ভোর রাতের দল এসে দেখল বাঁধের মুখে যে জায়গাটায় কাজ হচ্ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর ; নদীর জল হু হু করে ঢুকছে, পাক খাচ্ছে। স্বেচ্ছা-শ্রমিকরা একজনও নেই। তাদের স্মৃতির জন্যই এই প্রতিমূর্তি।

গল্প শুনে মনটা পবিত্র হল।

এরপরে একদিন মূর্তিটিকে দেখবাব জন্য পার্কে গিয়ে দাঁড়ালাম। মূর্তিটা দেখলাম আমার মতো অন্য লোককেও আকৃষ্ট করে। আমি যখন ট্যাবলেটে লেখা সন তারিখ, মূর্তির নাম, শিল্পীর নাম প্রভৃতি পড়ছি আমার পাশে একটি ছোট ছেলে এবং তার বয়েসের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তাদের বেশভূষায় ধনাঢ্যতা আছে এবং তাদের পিতা-মাতার ঠাণ্ডা সম্বন্ধে সতর্কতার চিহ্ন আছে। তারা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জুতোর মাথায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সম্ভবত মূর্তিটার মুখ কিংবা তার মাথার ঝুড়িতে কী আছে, কিছু আছে কি না দেখবার চেষ্টা করছে।

এমন দুটি ছেলেমেয়ে—দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়।

ছেলেটি চকোলেটের বড় একটা টুকরো মুখ থেকে বার করে বলল, 'আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না'?

আমি মাস্টারমশাই নয়, আমার পোশাক দেখে হযতো এদেব ধারণা হয়েছে যে আমি তেমন কেউ। সে যাই হোক আলাপের সূত্রপাতে খুশি হলাম।

'কী দেখতে পাব'?

'দড়ির দাগ'। মেয়েটি বলল।

'সে কী'?

ছেলেটি বোকার মতো মুখ কবে বলল, 'ফাঁসি হয়েছিল কিনা'।

আমি আর কথা না বলে ওদের থেকে সরে এসে বেঞ্চটায় বসলাম। সকালটার গলায় ফাঁস লেগে গেল।

কিন্তু তখনও শেষ হযনি। শুনতে পেলাম ওরা তখনও আলাপ করছে। ছেলেটি বলল, 'ফাঁসির সময়ে গায়ের জামা কাপড় থাকে না। একটা কাপড়ের খোল পরিয়ে দেয়'?

'তা আর হয না'।

'হয়'।

'মেয়েদের বেলাতেও'? অতটুকু মেয়ে কিন্তু এ ব্যাপারে বেশ হুঁশ হয়েছে।

ছেলেমেয়ে দুটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হলাম। অভিভাবক স্থানীয় কারো আলাপ-আলোচনা থেকেই এদের এত তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু ফাঁসির সঙ্গে এমন একটি শহীদ-মূর্তির যোগাযোগ জন্মেছে শিশুদের মনে, এটা আমাকে বিমর্ষ করে দিল।

কিছু পরে যখন ভাবছি ওপারের চায়ের দোকানে গিয়ে চা খাব কিংবা এখানেই একটা সিগারেট ধরাব, এমন সময়ে সেই পাকানো-চিমসে বুড়োটি এল।

বুড়ো আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু হেসে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার, এখানে? বেড়াতে'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'তা বেশ। দুয়ের চাইতে তিন ভালো। কিন্তু চারে ঝামেলা। দেখবেন যেন সঙ্গী সাথী আনবেন না'?

'সে রকম ইচ্ছা নেই'—এ কথা অস্ফুট স্বরে বললাম।

লোকটি তার প্রাত্যহিক ভ্রমণ শুরু করে দিল। কিছু পরে সে আমার সামনে একটু থেমে বলল, 'এ জায়গাটা বেশ নির্জন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও। এ বকম থাকার কাবণ আমার ছেলেই এখন মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ্ অফিসার। কিন্তু নির্জনতাব কোনো নিশ্চয়তা নেই'।

'তা বটে। ছেলেমেয়েরা আসছে দেখলাম'।

'ওরা মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু পালিয়েও যায়'।

'কেন'?

'আব এক বুড়ো এখানে বসে থাকে দেখেছেন তো? সেই বুড়োর ভয়ে আসে না। শিশুমহলে ওর নাম মাছি-খাওযা বুড়ো। খুব ভয় পায় ওকে এ শহরের ছেলেমেয়েরা। প্রকৃতপক্ষে ওর ভয়েই গত সাত-আট বছর ধবে এ পার্কটুকুতে ওদের উপদ্রব নেই সকালবেলায়'।

সেই নোংরা মভ্ বঙের মোটবটা এসে থামল, এবং সম্ভবত দ্বিতীয় বৃদ্ধ এল। তাকে ঠিক মতো বসিয়ে দিয়ে চাকর চলে গেল। বৃদ্ধ আমার দিকে কয়েকবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসল। শুধু তার গলাটা পলিতকেশ মাথাসমেত শরীরটা থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে রইল। চোখ দুটি ঘোলাটে, দৃষ্টিশক্তি নেই বলে মনে হয়। ফুসফুসে বোধ হয় কিছু জমে আছে, নাক দিয়ে যে বাতাসটুকু যায় তা যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটি মেলে খপ খপ কবে বাতাস নিতে হয় তাকে। আমাব হাসি পেল—এই ব্যাপারটাকেই ছেলেরা মাছি-ধরা বলে।

প্রথম বৃদ্ধ এসে দ্বিতীয়টিকে বলল, 'দ্যাখো দাদা, এই ভদ্রলোককে বলছিলাম আমরা নির্জনতা পছন্দ করি'।

'তা করি'।

'আর বললাম, মাছি-ধরা বুড়ো আছে বলেই ছেলেমেয়েদেব উপদ্রব নেই'।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বেশ তৃপ্তি সহকারে কিন্তু নীরবে হাসল।

'তুমি তো পাহারাদার'।

'তা বইকি'। দ্বিতীয় বৃদ্ধ গ্যাড়গেড়ে গলায় বলল।

কিছুকাল নীরবতায় কাটল। প্রথম বৃদ্ধ পাক খেতে লাগল, মাপা পথ, মাপা সময়। দ্বিতীয় বৃদ্ধ একরকমের পাখির মতো গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাতে লাগল। আর মাঝে মাঝে খপ খপ।

অবশেষে আমি বললাম, 'একটা কথা কি জানেন, এখানে তারা যেমন আপনার ভয়ে আসে না, তেমনি কোনো কোনো চিন্তা যদি তাদের মনে না আসত কারো কাবো ভয়ে, ভালো ছিল। এমন একটি শহীদ-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যখন মন পবিত্র জীবনবোধে পূর্ণ হওয়া উচিত তখন যদি ছেলেমেয়েরা ফাঁসির কথা ভাবে, সেটা ভালো হয় না'।

'হুম'। প্রথম বৃদ্ধ বলল, 'ওঁকে বলুন, দাদাকে বলুন'।

প্রথম বৃদ্ধ আবার পাক খেতে চলে গেল। দ্বিতীয়জন কিছু না বলে অদৃশ্য মাছি ধবার চেষ্টা করল কয়েকবার।

প্রথম বৃদ্ধ ফিরে এসে বলল, 'তাহলে আবাব বলছি কি মশাই, বিশ বছর আগে ফাঁসি হল, এই মূর্তিটি যেদিন স্থাপিত হল ঠিক তার সাতদিন পরে। এখনও ছেলেমেয়েরা আলোচনা করে। বডরা নতুন কিছু পায় না। বাচ্চারা তো মশাই প্রথম শোনে জ্ঞান হবাব পর, আর প্রত্যেকের বেলাতেই এই প্রথম শোনাব বিস্ময়টা লাগে'।

'ফাঁসিটা কি কোনো স্ত্রীলোকের হয়েছিল'?

'তা বইকি'। দ্বিতীয় বৃদ্ধ গর্বিত বিনযের ঢঙে বলল।

আমাব মনে হল ছেলেমেয়েদের মনে ফাঁসির সঙ্গে এই প্রতিমূর্তি জড়িয়ে যাওয়ার কাবণটা যেন বুঝতে পারলাম। একই সময়েব বলেই তাবা দুয়েব মধ্যে যোগাযোগ কল্পনা করেছে। ইতিহাসের ব্যাপাবে এ বকম ভুল আমাদের প্রায়ই হয়।

প্রথম বৃদ্ধ বলল, 'উনি বলছেন ফাঁসি দেয়াটা অন্যায় হযেছিল'।

আমি বললাম, 'ঠিক তা বলিনি বটে তবে আমার মনে হয ওটা রদ কবাই উচিত'।

'হঃ'। দ্বিতীয় বৃদ্ধ বিস্মিত হল।

প্রথম বৃদ্ধ বলল, 'ভেবে দেখতে গেলে তা বলা যায়। অন্তত এক্ষেত্রে অন্যায়ই হয়েছিল'।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি সরকারি উকিল ছিলাম না? বলো ছিলাম কি না'?

'তা ছিলে'।

'তবে? আর কে আমাব চাইতে বেশি জানে'?

'কিন্তু আমিও মামলাটাব সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি আসামী পক্ষেব উকিলেব মুহুবি ছিলাম'।

'তা ছিলে'।

'তবে আমিও কিছু কিছু জানি।' এই বলে দ্বিতীয় বৃদ্ধ কতকটা যন্ত্রচালিতেব মতো একটা পাক ঘুরে এসে বলল, 'ওটাকে এখন আমি সন্দেহজনক বলে মনে কবি'।

সরকারি উকিল বলল, 'রাত দুটোয আর্টিস্টেব ঘরে ঢুকে বিভলবাব দিযে তাকে হত্যা কবা হল। তবু বিশ বছব ধরে তুমি এই কথাই বলছ'।

'তা বলছি। কিন্তু তোমার প্রধান সাক্ষী যে অন্য মেয়েটি, সে কী বলেছিল'?

'বলেছিল আর্টিস্ট আব মার্গারেট লাহিড়ী ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল। আর্টিস্ট দেবনাথ বিভলবাব কেডে নেয়াব চেষ্টা কবেছিল'।

'তুমিই বলেছ যে তুমি সেই মেয়েটিকে শিখিয়ে-পডিযে দিয়েছিলে'।

'তাকে শিখিযে-পডিযে দেয়া বলে না। সেই অন্য মেয়েটি দুর্ঘটনায অভিভূত হযে পডেছিল। ঘটনাগুলিব কোনো অর্থ কবতে পাবছিল না। সব ঘটনাব অর্থ কি সকলে কবতে পাবে? ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তাকে আমাব মতটা বলেছিলাম। তা ছাড়া একে আত্মহত্যাব চেষ্টা কেউ মনে করবে না'। সরকারি উকিল আমাব দিকে ফিবে বলল, 'মশাই চিবকাল ধরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা কবেছি। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিযে রাত দুটোয কেউ পাশের ফ্ল্যাটে যায় না'।

যুক্তিটা যে অকাট্য এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না।

কিন্তু উকিলেব মুহুরিও কম যায় না। সে বলল, 'তোমার সেই অন্য মেয়েটি কী করে রাত দুটোয় সাক্ষী হওয়ার জন্যে অকৃতদার একজন আর্টিস্টের ঘবে থাকে'?

'তোমার উকিল যে এমন প্রশ্ন তুলবে তা কি আর আমি আন্দাজ করতে পারিনি? সেইজন্যেই আমি প্রমাণ করেছিলাম সেই মেয়েটিব সঙ্গে আর্টিস্টের বিবাহ স্থির হয়েছিল'।

'তাতে সেই মেয়েটিকে খুব সচ্চরিত্র বলে মনে করা যায় না'।

সরকারি উকিল হেসে বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু রাত দুটোয় রিভলবার নিয়ে প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে ঢুকবার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটাই তো বলতে পাবেনি তোমাব উকিল'।

'তা পারেনি। কিন্তু আমি পারি'।

'বেশ তো আমাকে শুনিয়ে কী হবে। এই ভদ্রলোককেই বলো না হয়'।

'তা পারি বইকি। বুঝলেন মশাই আসলে সেটা মার্গারেট লাহিড়ীর ফ্ল্যাটই ছিল'।

'প্রমাণ'?

'মিউনিসিপ্যালিটিব খাতায় পাশাপাশি দুখানা ফ্ল্যাটেব ভাড়াটে হিসেবেই মার্গারেট লাহিড়ীর নাম লেখা আছে। মিউনিসিপ্যালিটির ফ্ল্যাট। ভাড়া ট্যাক্স মার্গারেটই দিত দুর্ঘটনার তিন বৎসর আগে থেকে। এমনকী তার ফাঁসি হয়ে যাবার পরের মাসেও তারই নামে বিল করেছিল মিউনিসিপ্যালিটি'।

'এ কথা তোমার উকিল বললেই পারত'।

'বলা উচিত ছিল'।

'লাভ হতো না। ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতাম,' বলে সরকারি উকিল হাসল। মামলা পবিচালনার সময়ে যদি সে এ বকম হেসে থাকে তবে তাতেই আসামী পক্ষেব সাক্ষীদেব গুলিয়ে যাওয়ার কথা।

সবকাবি উকিল বলল 'বড়লোকরা বাগানবাড়ি কিনে দেয়. মেয়েছেলের নামে ফ্ল্যাট ভাড়া কবে'?

'করে'।

উকিলেব মুহুবি কিছুকাল দমে বইল, যেন কোনো একটি অভ্যস্ত যুক্তি হাবিযে গেছে এ রকম ভঙ্গিতে আঙুল দিযে কপাল ঠুকলে দু একবার. তাবপব বলল. 'বড়লোকে দেয় কিন্তু আর্টিস্ট অত্যন্ত গবিব ছিল'।

সবকাবি উকিল একটু স্তম্ভিত হল. মুহূর্তকাল পবে বলল, 'ইট ইজ নট ইন দি এভিডেন্স মাই লর্ড'।

'কী বললেন'? আমি প্রশ্ন করলাম।

সবকাবি উকিল বলল, 'আর্টিস্ট যে গরিব তা প্রমাণিত কবা হয়নি'।

সবকারি উকিল যে এই জায়গায় এসে যুক্তিতে এবং ঘটনায় নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেবে আইনের কূটকৌশলে আশ্রয় নিল এটা বুঝতে পারলাম।

কিন্তু ততক্ষণে আমাদের পার্কটায় রোদ উঠে পড়েছে, চরাচর স্পষ্ট হয়েছে। জেলেরা আদুড় গায়ে মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে পার্কের পাশ দিয়ে ছুটছে। রিক্‌শা প্যাঁক প্যাঁক করে ছুটছে। কতগুলি মজুব হেঁয়ো হেঁযো করে কী একটা ঠেলাগাড়ি কবে ঠেলে আনছে। আমি উঠে পড়লাম। ওবাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাসায় ফিরে ভাবলাম কী বিদঘুটে ব্যাপার! বিশ বছর আগে একটি ফাঁসি হয়ে গেছে তাই নিয়ে একটি ছোট ছেলে সমবয়স্কা একটি মেয়েব সঙ্গে আলাপ করছে বলে খারাপ লেগেছিল, কিন্তু সকালের আবহাওয়াটাকে গবম একটি আদালতে পবিণত করছে শহবেব বৃদ্ধতম দুটি লোক, এটাই-বা কী বকম ব্যাপার। এ যেন স্মৃতিব পীড়নে দগ্ধ হওয়া।

কিন্তু এখন ভাবতে গিয়ে বিস্ময় বোধ হচ্ছে পরদিন সকালে অভ্যস্ত পথে না বেরিয়ে আমি যেন গল্পটার বাকিটুকু শুনবার জনাই পার্কে গিয়েছিলাম। কৈশোর এবং বার্ধক্যের মতো আমার প্রৌঢ়ত্বকেও খুন-অপরাধ ফাঁসি একটি লোভের মতো টেনেছিল।

আবহাওয়াটা আগের দিনের মতোই। উকিলের মুহুরি পাক খাচ্ছিল, সে বলল, 'সরকাবি উকিলের কথা আপনি বিশ্বাস করেছেন'?

'অন্তত একটা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। আর্টিস্টের পক্ষে কারো জন্যে দুখানা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেযা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আর্টিস্টরা সাধারণতই গবিব'।

'অবশ্য এক্ষেত্রে আর্টিস্টকে টাকা দেয়া হয়েছিল, একসঙ্গে পাঁচ হাজার। কিন্তু সেটা তার মৃত্যুর পরে। টাকাটা মিউনিসিপ্যালিটি দিয়েছিল। কিন্তু আর্টিস্টের কোনো ওয়ারিশ ছিল না বলে পাঁচ বছর টাকাটা পড়েছিল, অবশেষে স্থির হয় এই পার্কটা করা হবে, বাকি টাকায় এই মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হবে। সেটাই যথোপযুক্ত ব্যয়। কারণ এটা সেই আর্টিস্টেরই তৈরি এবং বলা যায় মাস্টারপিস। এবং তার মাস্টারপিসকে রক্ষা করার চাইতে তাকে অন্য আর কোন উপায়ে সম্মান করা যায়'?

মূর্তিটার একটা নতুন অর্থ আমার চোখে ধরা পড়ল। আমি বিশ বছরের আগে মৃত আর্টিস্টের জন্য দুঃখবোধও করলাম।

'এই মূর্তি সেই আর্টিস্টের তৈরি'?

'হ্যাঁ। বেচারা। যেদিন এই মূর্তিটি শেষ করে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে সঁপে দেয় সেই রাত্রিতে মারা যায় সে'।

'আহা'!

'ব্যাপারটা দুঃখের। জীবিত অবস্থায় আর্টিস্ট দেবনাথ এমন কিছু সম্মান পায়নি। এখন কলকাতার দু'একজন তাকে আর্টিস্ট বলে স্বীকার করছে। আসলে পদ্মিনীর ঘটনাই দুঃখের'।

'পদ্মিনী'?

'হ্যাঁ, তার নাম পদ্মিনী মার্গারেট লাহিড়ী বলে আমি জানতাম। কিন্তু আর কেউ তা মানতে রাজি নয়। ফাঁসি দেয়ার আগে ওরা তার নাম দিয়েছিল পলিন মার্গারেট লাহিড়ী। সরকারি উকিল শুনলে রীতিমতো বিদ্রূপ করবেন। কিন্তু বাঙালির মেয়ের নাম পদ্মিনী হলে দোষ কোথায়'?

'ক্রিশ্চান তো'?

'ক্রিশ্চান তো বটেই। এমনকী লোকে বলত ওর বাবা কিংবা মা কেউ ব্রিটিশ ছিল। এত ফরসা এবং এত পরিষ্কার নাক-মুখ ছিল তার। কিন্তু তাই বলে তার নাম পদ্মিনী হতে আটকায় কোথায়'?

উকিলের মুহুরি আজ এত উত্তেজিত হয়েছে যে তার নৈমিত্তিক পাক খাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'সরকারের উকিলের বক্তৃতা শুনবার আগে, স্যার, আমার আর্গুমেন্টটা শুনুন'। যেন সে কোনো আদালতে বক্তৃতা দেবে এমনি একটা ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে গলগল করে বলে গেল :

পদ্মিনীই তার নাম ছিল এ আমি হলপ করে বলতে পারি। আমি তখন এই পাশের গাঁয়ের স্কুলের ফুটবল ক্যাপ্টেন। টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় আমাদের স্কুলের সঙ্গে একডালা টাউন ক্লাবের খেলা ছিল। সে সময়ে একডালা টাউন ক্লাব সারা জেলার সেরা টিম। সারা জেলাকে হারিয়ে এসে কোলের কাছে এক নাবালক দলের কাছে হারবে? সেদিন সারা শহর মাঠে ভেঙে পড়েছিল। আর আমাদের সেই গেঁয়ো স্কুল জিতল। আমাদের দলের জন পঁচিশেক দর্শক আর দশজন খেলোয়াড় শীল্ড নিয়ে গেল। শহরের এলাকায় তারা চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু গ্রামে গিয়ে তারা আনন্দ করবে এ তো নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু, ইয়োর অনার, লক্ষ্য করেছেন আমি দশজন খেলোয়াড়ের কথা বলেছি। ঠিক বলেছি, ওটা আমার ভুল নয়, কারণ দলের ক্যাপ্টেন আমি একখানি ফ্র্যাকচারড হাঁটু নিয়ে পড়ে রইলাম। শহরের জনতা ঘিরে ধরবার আগে ওদের পালাতে বলে দিয়ে গড়াতে গড়াতে একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। যখন জ্ঞান হল দেখলাম আমি হসপিটালে, দুঃসহ জ্বর। ততোধিক অসহ্য বেদনা। কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্য করতাম একটা শুভ্র করতল আমার বুকে কপালে সস্নেহ স্পর্শ দিচ্ছে। আমার দু'চোখে জল ভরে উঠত। নার্স, নার্সই তো। কিন্তু এই মফস্সল শহরের এই হসপিট্যালেও একাধিক নার্স আছে। কিন্তু অন্য নার্স চোখের সম্মুখে ঘুরে বেড়ালেও দিনরাত্রিতে পাঁচ-সাত ঘণ্টা যেন অন্য রোগীকে অবহেলা ক'রে এই শুভ্রকরতল বিশিষ্ট নার্সটি আমার জন্যই রয়ে গেছে।

প্রায় মাসাধিককাল পরে আমার ছুটি হল হসপিট্যাল থেকে। যেদিন আমার বাড়ি থেকে লোক

আসবাব কথা তাব আগেব দিনই আমি বললাম—নার্স, আমি আজই যাব।

—হেঁটে যাবে কী কবে?

—এই তো গ্রাম, কেন পাবব না।

নার্স কিছু ভাবল, তাবপব বলল—তা তুমি পাববে। পাবাই ভালো।

বিকেলে হসপিট্যাল থেকে বেবিয়েছি। আমাব গায়ে খেলাব পোশাক। যেন এতদিন পবে শীল্ড জেতাব অধিনাযক বাড়ি যাচ্ছে। কাঁধে হাতেব স্পর্শ পেলাম। দেখি নার্সই। তখনও তাব মাথায় বনেট বাঁধা। সাদা পোশাকে তাকে যে কী অপূর্ব বোধ হল তা যেন সবটুকু অনুভবে ধবা যায় না।

—চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

একখানা মাঠ, একটি ছোট খাল, তাবপবই আমাদেব গ্রাম। পাশাপাশি দুজনে হাঁটছি। তখন আমাব বযস হদ্দ সতেবো আব তাব বযস আঠাবো উনিশ। সহসা শূন্য আকাশ থেকে ঝবঝব কবে বৃষ্টি নামল। আমাব খেলাব পোশাক ঝকঝকে কবে কাচা ছিল ভিজে যেতে ভালোই লাগল। ফুটবলেব পোশাকে জল কাদা না থাকাই ব্যর্থতা। তাব পোশাক ভিজল। সাদা মসলিনেব পোশাক ভিজে উঠতেই আমাব মনে হল তাব সেই আঠাবো বছব থেকে পদ্মগন্ধ পেতে লাগলাম।

মুহুবিমশাই একটু থেমে, কেশে গলা সাফ কবে নিয়ে বলল 'ভাগ্যে এখন সবকাবি উকিল নেই। অন্যদিনেব চাইতে আপনাব সঙ্গে আগে দেখা হল বলে বলতে পাবলাম। সবকাবি উকিল হেসে বলে—ও নাকি আমাব বযসেব ভুল'।

'তা হবে কেন? ও বকম কোনো পাউডাব থাকতে পাবে যাব হাল্কা গন্ধ হসপিটালেব তীব্র অ্যান্টিসেপটিকেব গন্ধে ডুবে থাকে। জলে ভিজে গন্ধটা প্রকাশ পেযেছিল'।

মুহুবি থেমে চিন্তা কবে বলল, 'এ বকম সম্ভাবনা আমাব মনে হযনি, ভেবে দেখব। কিন্তু তাকে আমি পববর্তী জীবনে পদ্মিনী বলে সম্বোধন কবেছি এবং সাড়া পেয়েছি। সাড়া পাওযাটা বোধ হয ঠিক কথা হল না। ববং সেই পথে যেতে যেতে মোটবগাড়ি থামিয়ে আমাব সঙ্গে কথা বলেছে। পথ যদি একই হতো সে মোটব দাঁড় কবাতোই। কেমন আছ, বউ কেমন ছেলেপিলে কেমন আছে এ খবব সে নিত। তখন অবশ্য সে হসপিট্যালেব মেট্রন।

'কিন্তু মেযেটাব কপাল ভালো ছিল না। ছোট শহব মেযেদেব স্বাধীন উপজীবিকাই আলোচনাব কাবণ হতে পাবে। তাব উপবে সে খ্রিস্টান। অত্যন্ত রূপসী। একা একা মিউনিসিপ্যাল কোযার্টাসে একটি ঝিব ভবসায বাস কবে। কাজেই সে যাই কবক সেটা শহবেব সর্বত্র আলোচনাব মতো ছড়িযে পড়ত। কিছুই সে গোপন বাখতে পাবত না। কিছুই গোপন থাকত না।

'একবাব এই শহবেব অদূবে একটি এবোপ্লেন বাধ্য হযে নেমে পড়ে। চালক ছাড়া আব একজন মাত্র আবোহী ছিল। চালক সঙ্গে সঙ্গে মাবা যায কিন্তু দ্বিতীয লোকটিকে হসপিট্যালে আনা হল। তাকে সেবা কবতে শুরু কবল পদ্মিনী। সে কী সেবা। প্রথম প্রথম লোকে বলত প্রেমে পড়েছে। হসপিট্যালেব ডিউটিব সমযটুকু ছাড়াও দিনবাত্রিতে পদ্মিনীব বিশ্রাম ছিল না। সে যেন কোনো তপস্যায নিবত। তাব চেহাবা শুকিযে গেল। শেষদিকে দেখলে মনে হত সে-ই বোগী। কিন্তু প্রেমে পড়াব ঘটনাটা লোকে আব বলতে পাবল না। বিষাক্ত দুর্গন্ধ ক্ষতেব সেবা কবতে কবতে প্রেম জন্মায় না এটা লোকে বুঝতে পাবল। তখন পদ্মিনীব প্রায ত্রিশ বছব বযস হযেছে। পৃথিবীব হিসাব নিকাশ কবাব বুদ্ধি হয়েছে তাব। তবুও যাবা প্রেমেব কথা বলত তাবা কেউ কেউ অতি বুদ্ধিমানেব মতো বলতে শুরু কবেছিল—এতদিনে তোমবা পদ্মিনীব স্বামীকেই দেখতে পেযেছ। একে ফেলেই চলে এসেছিল সে, এখন অনুশোচনায এত কবছে। লোকেব কী বকম মতি হতে পাবে অন্যেব সম্বন্ধে গল্প কবাব ব্যাপাবে, তাবই পবিচয এটা'।

আমাদেব বিস্মিত হতে হল। সবকাবি উকিল কখন এসে যোগ দিয়েছে বুঝতে পাবিনি। সে কেশে বলল, 'কাগজপত্র ভালো কবে ঘেঁটে এলাম হে। তা শোনো, তোমাব এই গল্পেব উত্তব দিতে আজ

আমি পারব। রাত্রিতে এটা ভেবে রেখেছি। এটার ব্যাপার হচ্ছে এই : মার্গারেটের স্বামী এমনি কোনো অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিল এবং মার্গারেট তার সেবা করতে পারেনি। কাজেই এই বৈমানিকটার সেবার মধ্যে দিয়ে সে স্বামীকে সেবা করার তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল'।

শুধু মুর্হরি নয়, সরকারি উকিলের এই বিশ্লেষণে আমি বোকার মতো তার দিকে চেয়ে রইলাম।

'আপনি কী বলেন'? দুজনে সমস্বরে প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, 'একজনে অপরজনের ব্যক্তিত্ব এমন করে আরোপ করা যায় কি না এটা চিন্তার বিষয়'।

মুহুরি বিচলিত হয়েছিল। সে এই নীরবতার অবসরে এক পাক চক্কর মেরে এল।

সে আমাদের সম্মুখে এসে বলল 'আমাদের লার্নেড ফ্রেন্ড খুব খাঁটি কথা বলেছেন এতেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হচ্ছে'।

'কী রকম'?

আমরা সবাই এতদিনে জানতে পেরেছি সেই বৈমানিকটি পদ্মিনীর স্বামী নয়, স্বামীর বন্ধুও নয়। এবং তাকে যখন পদ্মিনী সেবা করেছিল তখন পদ্মিনীর বিবাহ হয়নি। অথচ তাকে স্বামীর মতো সেবা করেছিল। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি স্বামী বলতে পদ্মিনীর কাছে যা গ্রহণযোগ্য সেটা সেই বৈমানিকের মধ্যে ছিল। পরে এটা আরো স্পষ্ট হল যখন পদ্মিনী সার্কাসের সেই লোকটিকে বিবাহ করল। সার্কাসের লোকটি বৈমানিক এবং একটি পা ভাঙা ফুটবল ক্যাপ্টেনের মধ্যে যা সাধারণ গুণ তার কাছেই পদ্মিনী আত্মদান করতে পারে দেখা যাচ্ছে। কী সেটা'?

আমি বললাম, 'পদ্মিনী বিবাহ করেছিল ?'

'হ্যাঁ। শীতকালে সেবার বিংলিং সার্কাস এই শহরে এসেছিল। সেই দলে একটি লোক ছিল যার কাজ ছিল পেশি প্রদর্শন করা। তারা আসবার পাঁচ-সাত দিন পরে এ কথাটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে পদ্মিনী তাকে বিয়ে করছে। মিউনিসিপ্যালিটি, দশজন ইতর ভদ্র স্কুল-কলেজের ছাত্র আপত্তি করবে এ রকম সম্ভাবনা দেখা দিল। আত্মীয়রা একটা অনুপযুক্ত বিবাহে যেমন আপত্তি করতে পারে তেমনি সকলে আপত্তি করবে বলে মনে হল। কিন্তু পদ্মিনী কারো কথাই গ্রাহ্য করল না। আলাপ নেই, পরিচয় নেই, খপ করে বিয়ে করে বসল।

সরকারি উকিল বলল, 'এর থেকেই বুঝতে পারছ কী তার রুচি'।

'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। কিন্তু সার্কাসওয়ালা ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাশ করতে পারেনি। বংশ ইত্যাদির খবর কেউ নেয়নি। বিবাহের পাত্র হিসাবে পদ্মিনীর পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। কিন্তু তার একটি সম্পদ ছিল যা আমাদের এই শহরে তখন ছিল না, এখনও নেই'।

'সেটা কি বীরত্ব'?

'তা না হোক। শক্তি, স্বাস্থ্য কিংবা পদ্মিনী যাকে পুরুষোচিত মনে করত তেমন কিছু। তার তো অর্থের অভাব ছিল না। নিজে সে তখন হসপিট্যালের মেট্রন। মোটর চড়ে বেড়ায়। বাজে ব্যয় না করে টাকা জমিয়েছে। স্বামী উপার্জন করে খাওয়াবে তার যেমন দরকার ছিল না, তেমনি ছিল না স্বামীর পরিচয়ে পরিচয় দেবার তাগিদ। সমাজের কোনো মানদণ্ড অনুসারে নিজের রুচিকে বাঁকানো তোবড়ানোরও দরকার ছিল না'।

সরকারি উকিল বলল, 'স্বামী কি শুধু দেহমাত্র'?

'তুমি এ রকম কথাই জজকে বলেছিলে। কিন্তু তুমি কি মনে কর স্কুল কলেজে না পড়লেই মন বলে কিছু থাকে না'।

'অপরিণত মন থাকে'।

'কিংবা অন্য কথায় বলো সরল মন থাকে। সে যাই হোক সেটা তো চিরস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী

নয়। সার্কাস এখানে একমাস ছিল, এবং দল চলে যাওয়ার পর লোকটি আর একমাস ছুটি নিয়ে পদ্মিনীর ফ্ল্যাটটায় বাস করেছিল'।

'তারপরেই সম্বন্ধ ফুরাল। যাদের এত সহজে সম্বন্ধ হয়, এত সহজে সেটা ফুরোয়, তাদের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা'? বলে সরকারি উকিল আমার দিকে চাইল। এবং আমার উত্তরের আশায় অপেক্ষা করতে সে খপ খপ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

'সম্বন্ধ ফুরাল এ তুমি কী করে বলছ'?

'নতুবা আর্টিস্ট দেবনাথ আসছে কী করে'।

'তা এসেছিল, কিন্তু পদ্মিনী মৃত্যুর আগে তার সবকিছু সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দিয়ে গেছে। এবং ট্রাস্টিদের একজন হিসাবে আমি জানি আরো পাঁচ বছর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে সেই সার্কাসের লোকটির জন্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে অর্থাৎ তার মৃত্যুর .'

'ফাঁসি বলো'।

'মৃত্যু কিংবা ফাঁসি। তার পঁচিশ বছরের মধ্যে সেই সার্কাসওয়ালা না ফিরলে সব সম্পত্তি হসপিট্যালকে দেওয়া হবে'।

'তাহলেই বোঝো। ওদিকে নামে এবং আইনত স্বামী রইল আর একজন। সার্কাসওয়ালাকে যদি সে ডাইভোর্স করত তাহলেও না হয় বলা যেত খ্রিস্টান সমাজ অনুসারে সে এমন কিছু করেনি'।

সওয়ালে নিজের কোনো দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এ রকম মুখভঙ্গি হল মুহুরির। সে মুখে একটা নির্লিপ্ততা আনার চেষ্টা করতে করতে তার দৈনন্দিন পাক থেকে শুরু করল।

কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই তার চিন্তাকে সে বোধ হয় গুছিয়ে তুলল। আমাদের দখল করা বেঞ্চটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বেশ তো তার ফাঁসির পাঁচ বছরের আগেকার কথাই ধরো না'।

'তা ধরো। তবে মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে না হলেও মার্গারেট তখনও সেই সার্কাসওয়ালার স্ত্রী'।

'পদ্মিনী মার্গারেট কারো স্ত্রী ছিল কি না এটা আসল বক্তব্য নয় আমার। আমি দেবনাথের কথাই বলছি। সেরেস্তাদারের ছেলে দেবনাথ। তার বাবা বদলি হয়ে গেল কিন্তু সে এই শহরেই থাকল। আঠারো থেকে বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত তারপর মদ গুলির আড্ডায় ঘুরতে লাগল'।

'তা লাগল। তুমি কি বলতে চাও যে এ রকম একটা লোককে খুন করে মার্গারেট কোনো অন্যায়ই করেনি'?

'না। আমার বক্তব্য শেষ পাঁচ বছর। তখন পদ্মিনী তার পাশের ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে এবং সেই ফ্ল্যাটে দেবনাথ থাকে। সত্যের খাতিরে এ কথা বলতে হবে দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসার পথ ছিল। এবং দুজনে প্রকৃতপক্ষে একই ফ্ল্যাটে বাস করলেও বাইরে থেকে লোকের তা বুঝবার উপায় ছিল না। যেবার মদের দোকানদার বাকি শোধ করার জন্য দেবনাথের মাথায় ডান্ডা মেরেছিল সেই থেকে দুজনের পরিচয়। দেবনাথ আহত অবস্থায় হসপিটালের মেট্রনের চোখে পড়েছিল'।

'এবং তারপরে দেবনাথ কিডন্যাপড হল'।

'কিন্তু দেবনাথ তো শহরের সর্বত্রই ঘুরে বেড়াত'

'গুম করা মানে কি মানুষকে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা'? সরকারি উকিল হাসল। 'মনে রাখতে হবে সাঁইত্রিশ বছরেও মার্গারেটের তুল্য সুন্দরী তখন এ শহরে কেউ ছিল না'।

'কিন্তু এ কথা তো স্বীকার করবে তুমি, দেবনাথ সেই পাঁচ বছর কোনো মদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি করেনি'।

'তা করেনি। কারণ ঘরেই পেত'।

'তা পেত। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দেবনাথ আর কিছু করেছিল। তার মৃত্যুর পর পুলিস তার ঘরে অনেক ছবি পেয়েছিল, অনেক ভাস্কর্যের মূর্তি'।

'সেগুলি কি অশ্লীল নয়? যে মেয়ে নিজের অমন অশ্লীল ছবি অন্য কাউকে আঁকতে দেয় তার দু-বার ফাঁসি হওয়া উচিত'।

'কলকাতার সমঝদাররা এখন তা বলছে না'।

'সেই ছবিগুলি যাকে দেখে আঁকা হয়েছিল সে তো রক্তমাংসে তাদের সামনে ঘুরে বেড়ায়নি। তাদের কাছে ছবি তো অমন হাল্কা হাওয়ায় তৈরি বলেই মনে হবে'।

কথাটাব সত্যতা বোধ হয় মুহুরিমশাই মেনে নিতে বাধ্য হল।

সরকারি উকিল যেন আসামীর প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাবে বলে মনে হল। সে বলল, 'অবশ্য দেবনাথের পক্ষেও কাজটা ভালো হয়নি, অন্তত সুবিবেচনার কাজ হয়নি। এতসবের পরও ওভাবে বাগদত্তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়াটা মূর্খতাই হয়েছিল। আমি দেবনাথকে ভালো লোক বলি না। এবং একে আমি সাডেন অ্যান্ড গ্রেভ প্রভোকেশন মনে করতে পারতাম, তাতে মার্গারেটের গুরুত্বও কম হতো, যদি মার্গারেট দেবনাথের সাধ্বী স্ত্রী হতো।'

মুহুবিমশাই পাক খেতে লাগল।

একসময়ে আবার সে বলল, 'অবশ্য আমাদের পক্ষের বক্তব্য এটা আত্মহত্যার চেষ্টাই ছিল। এবং দেবনাথের ঘরে যাওয়ার কারণ আত্মহত্যার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি দেবনাথের মনে কোনো অনুশোচনা জাগিযে তাকে ফেরানো যায়'।

'আইনে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা থাকে না'।

মুহুরিমশাই বলল, 'কিন্তু একটা ঘটনা মামলাব সময়ে কোনো পক্ষই উত্থাপন করেনি'।

'মার্গারেট তার কযেকদিন আগে থেকেই শহরের শিক্ষিত লোকদের কাছে দেবনাথের ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন করত-- সেই কথা তো'?

'হ্যাঁ'।

'ঘটনাটা না বলে ভালোই হয়েছে। তোমার উকিল গোপন করে ভালোই করেছে। তাতে প্রমাণ হতো মার্গারেট তাকে হত্যা কবার আগেই তার দুর্নাম করে বেডাচ্ছিল। বিদ্বেষ আগেই তৈরি হয়েছিল এটাই প্রমাণ হতো'।

'তা হতো না। কারণ যত বিদ্বেষ থাক এই শহিদ-মূর্তিটার জন্য তখনও মার্গারেট দেবনাথেব সম্মুখে সিটিং দিচ্ছে'।

'তা দিচ্ছে এবং বলে বেডাচ্ছে দেবনাথেব ছবি বা মূর্তি কিছুই নয়'।

'সে নিজে কতদূর বলেছিল তা আমি জানি না। তবে এ কথাটা ঠিক শহরেব পণ্ডিতব্যক্তিরা সবাই বলেছিল দেবনাথের ছবির এক পয়সাও দাম নেই'।

কথার মাঝখানে আমি কথা বললাম। বললাম, 'কিন্তু তখন এই মূর্তিটা তৈরি করার জন্যে দেবনাথ মিউনিসিপ্যালিটির অর্ডার পেয়েছিল। তাহলেই তো তাকে স্বীকাব করা হল'।

মুহুরিমশাই আর যাই হোক উকিল নয়। অনেকক্ষণ ধরে গল্পের ধারা ঠিক রেখে কথা বলে যাবে এ বোধ হয় সে পারে না।

হঠাৎ সে গল্পের অন্যত্র গিয়ে বলল, 'আমার দু-রকমই মনে হয় আজকাল। কখনও মনে হয় আত্মহত্যা করতেই গিয়েছিল সে, কখনও মনে হয় খুন করাই উদ্দেশ্য ছিল'।

'তাহলে'? সার্থকতার আনন্দে সরকারি উকিলের কথাটা তার লম্বা গলার উপরে কাঁপতে লাগল।

মুহুরিমশাই বলল, 'কিন্তু সে যাই হোক ঘটনার মূলে যে সেই অন্য মেয়েটির প্রতি বিদ্বেষ এ আমি মানতে পারি না সবসময়ে'।

'স্ত্রীলোকের এ রকম বিদ্বেষ থাকে'।

'কিন্তু যখন মামলা চলছে তখন এই মেয়েটির কথা তুলতে পদ্মিনী খুব সহজভাবে বলেছিল--ওটা

একটা সাধারণ মেয়ে। ও কিছুই নয়। বড় একটা ক্যানভাস শেষ করলে দেবনাথ ও রকম মাতলামো করত দু একদিন'।

'তুমি কি সন্দেহ করো অন্য মেয়েটার বাগদত্তা হওয়ার কথাটা মিথ্যা'।

'সে রকম সন্দেহ আমার বরাবর আছে। এই মূর্তিটা শেষ করেছিল দেবনাথ মৃত্যুর আগের দিন। এবং এটাকে নেয়া হবে কি হবে না এই নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারবা তর্ক শুরু করেছে। মূর্তিটা শহিদ হওয়ার পক্ষে একটু নির্লজ্জ। আমরা সকলে মূর্তিটার দিকে চাইলাম। এখন আর নির্লজ্জ মনে হয় না বরং রমণীত্ব এমন পরিস্ফুট না হলে এমন করুণ মনে হতো না।'

মুহুরি বলল, 'এত বড় একটা পাথুরে-কাজ শেষ করে দেবনাথের মাতলামোটা একটু বেশিই প্রকাশ পেয়েছিল সেই রাত্রিতে'।

'কিন্তু তাহলে হত্যা বা আত্মহত্যার কারণটা কী'? সরকারি উকিল অবিশ্বাসেব ঢঙে প্রশ্ন করল।

মুহুরিমশাই-এর কষের দু-পাশে কথা বলতে বলতে ফেনা জমেছিল। একটা ময়লা রুমালে ফেনা মুছে সে বলল, 'ফাঁসির দিন পনেরো আগে জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। হাইকোর্টে আপিল কিংবা ভাইসরয়ের কাছে দয়াভিক্ষা কোনোটাতেই রাজি হয়নি পদ্মিনী। তবু শুধু আলাপ করার জন্যেই গিয়েছিলাম। দেয়া-নেয়ার কোনো খবরই ছিল না।

চুপ করে থাকতে থাকতে বলেছিলাম—শুনেছ, পদ্মিনী, দেবনাথেব সেই শহিদ মূর্তিটা ওরা নেবে। পাঁচ হাজার টাকাও ওরা মঞ্জুর করেছে।

—কী বললে? আবার বলো। বলল পদ্মিনী।

আবার বললাম আমি।

শুনে কী যে ভাবল। সামান্য একটু হাসল। তারপর বলল—পাগল। তারপর গলায় যে ছোট্ট সোনা আব এবনিতে তৈবি ক্রশটা ছিল সেটা খুলে আমাব হাতে দিল যেন আমায় এতদিনকার কাজের বকশিশ দিচ্ছে।

আমি চলে আসার আগের মুহূর্তে বললাম—দয়া ভিক্ষা করি, প্রস্তুত হও।

অন্যান্য দিন পদ্মিনী দৃঢ়স্বরে বলে—না। আজ যেন দ্বিধায় দুলতে লাগল। একটুপরে অতি মৃদুস্বরে বলল—না, থাক গে। দরকার নেই। কী হবে আর।

তারপর যে কয়েকদিন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সে শুধু শুনতে চাইত দেবনাথকে অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটি পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছে কি না।

আর দুটি কথা আমার সঙ্গে হয়েছিল।

একদিন সে সলজ্জ হেসে বলেছিল—ক্যাপ্টেন, তোমার পদ্মগন্ধ পাওযাটা কি এখন ভুল বলে মনে হয়?

আর একদিন সে বলেছিল—দেবনাথের অন্যান্য ছবিগুলিও কি ওবা নেবে?

একটু হেসে আবাব বলল—দেবনাথ তাহলে আর্টিস্ট কী বলো?'

চড়চড় করে রোদ উঠে পড়ল। এতক্ষণ যে ধীরে ধীবে রোদ এগোচ্ছিল তা লক্ষ্য করিনি। একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ থেকে গেছে সেটা ঐ আত্মহত্যা কিংবা হত্যা ঘটনাটার কারণ সম্বন্ধে। কারণ দ্বিতীয় দিনের পর এই ফাঁসির গল্পের ভয়ে আমি ঐ পার্কে আর যাইনি।

এখন এই গল্পটা বলতে বসে মনে হচ্ছে, হয়তো পদ্মিনী অনুভব করেছিল দেবনাথ পদ্মগন্ধ সম্বন্ধে একেবারেই উৎসুক ছিল না। সে অনুপ্রাণিত হয়নি—এই ধারণাই হয়েছিল মার্গারেটের, কিংবা পদ্মিনী পলিনা মার্গারেট যে নামেই তাকে অভিহিত করো। তার হয়তো একটা অপচয়ের অনুশোচনা হয়েছিল।

দেবনাথ শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পেলে এ রকম হতো না।

সে যাই হোক, সেই কুয়াশায় বুড়োরা থাক আর না থাক, বড়ঘরের দু-একটি অকালপক্ক ছেলেমেয়ে ফাঁসি সম্বন্ধে যে আলোচনাই করুক শহিদ-মূর্তিটা হয়তো-বা এখনও আছে অবশ্য যদি নদী আবার বাঁধ ভেঙে না থাকে।

ভূকম্পন

এক-একটি গ্রাম থাকে যার আগাগোড়া শুধু পুরাতনের চিহ্নে ভরা। শুধু পুরাতনই নয় প্রত্নতাত্ত্বিক বলে মনে হয়। কোন এক রেলওয়ে স্টেশনে নেমে গোরুগাড়ির কনভয় (বহর) সাজিয়ে দেহাতি লোকজনের হাতে, মাথায়, পিঠে, বন্দুক ও জলের ব্যাগ, হ্যাজাক ও কুইনাইন নিয়ে খুঁজে বার করবার উপযুক্ত একটা গ্রাম।

ধ্বংসস্তূপ নয়, যে যথেচ্ছ বিহার করা যাবে, খুরপে খাবলে দেখা যাবে। পথের দু'ধারের জঙ্গলের আড়াল থেকে হঠাৎ কোনো একটি প্রাণীর আবির্ভাব সবসময়েই প্রতীক্ষা করে চলতে হয়। এমনও মনে হয় পায়ের তলে এ জগতের কোনো ঘরকন্না গুঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু এ সত্য নয় যে বিষাক্ত তীর উঁচিয়ে আসবে, তাদের বৈরিতা প্রকাশ পায় শুধু খানিকটা নির্লজ্জ কৌতূহল এবং খানিকটা অনাত্মীয়তার দৃষ্টিতে।

সভ্যতার অর্থ যদি হয় যাযাবরবৃত্তির বিপরীত অর্থাৎ একটি ভূখণ্ডে আবদ্ধ হয়ে চাষবাস করা তাহলে এদেরও একটা সভ্যতা আছে। আসশেওড়া, ভাঁট বিছুটি, বুনোলতার কালচে সবুজ রঙের জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একসময়ে মনে হয়ে যায় এসে পড়েছি লোকালয়ে। দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে আলোর বৃত্তাভাস যেমন ঘরের মেঝেতে পড়ে, চারিদিকের নিবন্ধ জঙ্গলের মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় তেমনি পড়েছে সূর্যের ঝকঝকে আলো, আর দিন যতটুকু জায়গায় পড়েছে সেখানে ফাঁকা জায়গায় সরষে ফুল হলুদ হয়ে আছে, আর্যদের সূর্যমুখী ছন্দের মতো।

এটা প্রাণশক্তির প্রসার চেষ্টার চিহ্ন। প্রায়ই দেখা যায় এ রকম ক্ষেতগুলির পাশে নতুন একটি কুঁড়ে। বহুদিনের পরিত্যক্ত কোনো ভিটায় কোদাল দিয়ে ঘাস চেঁছে ঘটি ঘটি গোবরজল ঢেলে, নলখাগের দেয়াল, আমনগন্ধী খড়ের ছাউনি তুলে ছোট একটা কুঁড়ে। ঝাড় থেকে সদ্য কেটে আনা বাঁশের রঙে, সদ্য লেপা আঙিনার রঙে, কাঁচার একটা আমেজ যেন জড়িয়ে থাকে।

এ রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল সুরেন জলের ছেলে ননী যখন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ফৌত হয়ে যাওয়া দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের ভিটায় ঘর তুলল। ঝগড়ার কারণটা তাদের পল্লীর পাশের একটা মেয়ে। জেলেপাড়ার লোকগুলি একদিন বৈকালে দেখতে গিয়েছিল ননীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। গত আট দশ বছরে এ গ্রামে বিবাহ একটিও হয়নি, রামেশ্বর ঢুলির নতুন আনা তার চাইতেও বয়েসে বড় বৈষ্ণবীর কণ্ঠিবদলের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে। মনের অগোচর পাপ নেই পুরুষদের সকলেই লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভাবল এমন চেহারাটা হয়ে উঠেছে কে জানত, ম্যালেরিয়ার এমন অস্বীকার, দেহের এমন বঙ্কিমতা, ঘর তোলা যায় বটে ও জিনিস পাবার জন্য।

চঞ্চলতার আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল দু তিন বৎসর পূর্বে। গ্রামের এককালীন জমিদার শিকদার বংশের ব্রহ্মোত্তর জমির উপরে একটা মাঝারি গোছের ধ্বংসস্তূপ, একটা মজে যাওয়া পুষ্করিণী, জঙ্গল হয়ে যাওয়া আম-কাঁঠালের বাগান। রাধা বৈরাগী শিকদারবাড়ির অন্দরমহলের আঙিনার ঘাসে রোজই গোরু বেঁধে দিত বৃষ্টি ধরলে গোরু আনতে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়-পরা একটি ছেলে দেখে। সংবাদটি সে-ই রটিয়ে দিল, গ্রামে কৌতূহলের সঞ্চার ক'রে।

আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তিবশে প্রাণীজগতের কোনো কোনো স্তরে প্রতিবেশের সঙ্গে দৈহিক গঠন ও বর্ণের একটা সামঞ্জস্য এসে পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রে সেটা বর্তমানেও হতে পারে এটা বোধ হয়

যুক্তিযুক্ত নয় চিন্তা করা, (মানুষের অস্তিত্ব এমন শিলীভূত হয়ে পড়েছে যে তার আর বিবর্তন হবে না এ রকম ধারণাই অনেকের) কিন্তু এদিকে যেন এটা হয়।

গ্রামের চেহারার সঙ্গে একটা সাদৃশ্য এসে গেছে শিকদারবাড়ির ছেলেটির। শিকদারের জুতো ছিঁড়বার পর জুতো এল না, জামাকাপড়গুলিতে সাজিমাটি কিম্বা সোডার লালচে দাগ পড়ে গেছে দু-তিনবার নিজে হাতে ধুয়ে নেবার পর। চেহারাও বদলে গেছে তার, তার ক্ষেত্রে এটা হল ম্যালেরিয়ায়, কিন্তু মনে হয় ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্যপ্রকারেও হতে পারত। ননী জেলের ক্ষেত্রে সেটা হল নৌকাডুবি। ননীর ঘরখানিতে মানুষের জবরদস্তির একটা ছাপ লেগেছিল। ননী পাশের গ্রাম থেকে হাট করে ফিরবার সময়ে আহার্য ছাড়া মেয়েমানুষের জন্য কোনোদিন সিঁদুর, কোনোদিন বা পান কিনে আনত ; তার আঙিনায় আগাছায় অঙ্কুর গজাতে পারেনি। হঠাৎ একদিন ননী মাছ ধরতে গিয়ে ফিরল না। দু-তিন মাসের মধ্যে ননীর ঘরের সঙ্গে চারিপাশের ঘরগুলির একটা সাম্য এসে গেল। সেই মেয়েটাকে এখন আর উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে দেখা যায় না। গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে রুক্ষ চুলে ছেঁড়া কাপড়ে মিশে গেছে। তার মুখে যেমন অশ্রু ও মাটিতে মেশানো ক্লিন্ন দাগ পড়েছে, তেমনি বর্ষায় হেজে যাওয়ার দাগ তার ঘরের বেড়ায়।

শিকদার গ্রামে এসে প্রথম বছরটায় বেশ একটু বেড়ে উঠেছিল দেহের দিকে। দ্বিতীয় বছরে তাকে ম্যালেরিয়া ধরল। পনেরো দিন পরপর এখন তার জ্বর আসে বর্ষাকালটা ধরে, তারপরেও কিছুদিন। বছরের অন্যসময়ে দু-তিন মাস পরপর হয়। প্রথমে জ্বর হলে সে একে-ওকে অনুরোধ করে কুইনাইন আনাত দূর থেকে, পথ্যাদি সম্বন্ধেও বাছবিচার করে চলত। পরে সে ঠিক করেছে কী লাভ কুইনাইন খেয়ে ; এখন সে জ্বর ছেড়ে গেলেই কুইনাইন খায়, সামান্য জ্বর গায়েও চলে।

শিকদার কেন এ গ্রামে এসেছিল খোঁজ করতে যাওয়া বৃথা, বোধ হয় অনন্যোপায় হয়ে। গ্রামে এসে শিকদারের প্রথম রাত্রি কেটেছিল ভয়ে। সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে পৌঁছে থাকবার মতো ভালো একখানা ঘর খুঁজে নিতে সাহস পেল না সে। স্তূপীকৃত ইট, কাঠ-কাঠরার মধ্যে সাপের ভয়ে, বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গন্ধে সে ঘুমোতে পারেনি। অনেকবার ফিরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল তার।

পরদিন সে জীবন্ত মানুষের সাড়া পেয়ে অবাক হয়ে গেল। প্রথমে সে একটা হোটেলের খোঁজে বেরিয়েছিল এই গ্রামে, তারপরে একটা ছোট দোকান খুঁজে পেয়ে খানিকটা চিঁড়ে আর গুড় কিনে এনেছিল। সেগুলি শুকনো চিবিয়ে খেয়ে জলের প্রয়োজনে এদিকে-ওদিকে ঘুরে খিড়কির পুকুরের জলের দুর্গন্ধে কাঁদো-কাঁদো হয়ে যখন সে ফিরে আসছে তখন তার সঙ্গে এ বাড়ির আর দুটি, তিনটিও বলা যেতে পারে, প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়। এক বুড়ি, তার মেয়ে হৈম, আর তাদের মতোই রোগজীর্ণ একটা গাভী।

বুড়ির সঙ্গে আলাপ হতে সে জেনেছিল বুড়ি এ বাড়িতে আছে তারই সুবাদে ; কী রকমে, বংশের কোন লতায়, তার কোন পিতামহী। 'আর হৈম তাহলে পিসিমা' সে হেসে বলেছিল। গাভীটি নাকি তার নিজের পিতামহের বিলেতি গোরুর পঞ্চম পর্যায়ের বংশধর।

কিন্তু গাভীটির ইতিহাস শুনবার চাইতেও বড় কাজ ছিল তার। মাত্র আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে সে, রাত্রির ভয় ছিল। সারাদিন খুঁজে সে বাড়ির এক কোণে একটু আলো-বাতাসওয়ালা, একটু কম-ভাঙা ঘর খুঁজে বার করল। অনেক কষ্টে যোগাড় করা একটা মোমবাতির আলোয় সে-রাত্রি চিঠি লিখল এক মুদিকে : ভাই, কাল আমি রওনা হব। দাদার আশ্রয়ে যাব না। তোমার দোকানে তোমাকে সাহায্য করলে কি আমায় খেতে-পরতে দিতে পারবে? চিঠির কাগজে টপটপ করে দু'ফোঁটা জল পড়ল চোখ থেকে। যাকে কোনোদিন দেখেনি, সেই বাবার কথা মনে হয়ে অভিমান হতে লাগল।

বাড়ির ভাঙা দালান থেকে ইতিপূর্বে সে বার হয়ে এসেছিল, টিনের দেয়াল টিনের ছাদ দেয়া

একটা ছোটঘর, পূর্বে বোধ হয় ভৃত্যস্থানীয়েরা থাকত, সে খুঁজে পেয়েছে। নিজে সাফসুতরো করে সে আস্তানা করে নিয়েছে সেই ঘরে। একটা ছোট জলচৌকি খুঁজে পেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিজের একখানা ব্যবহার-জীর্ণ ধুতি তার 'পরে বিছিয়ে মায়ের ফটো, চিঠি লেখার মতো খানিকটা কাগজ, একটা সস্তা ফাউন্টেন পেন রেখে দিল।

ব্যাধির বিষ কোন সুযোগে দেহে প্রবেশ করে ডাক্তারবাও সবসময়ে বলতে পারে না। এক্ষেত্রেও কারণ হিসাবে কোনো একটি ঘটনাকে নির্দেশ করা যাবে না। পচা, বুজে-আসা পুকুরে ছিপ ফেলে হঠাৎ একদিন ব্যাধিগ্রস্ত একটা মৃগেল মাছ পাওয়া থেকে এর সূত্রপাত হওয়া যেমন সম্ভব তেমনি হঠাৎ কোনো বংশানুক্রমিক প্রজা আবিষ্কার হওয়াতে। ভাত খাবার চালটা কোথা থেকে আসে শুনতে বসে সে জানতে পারল তার প্রজা আছে। অল্পবয়েসে নানা রঙিন কল্পনা মনে আসে, কিন্তু জমিদারির মানমর্যাদাব ব্যাপারগুলি তার জানতে বাকি ছিল, ফলে সে পরদিন নিজেই গেল সেই প্রজার বাড়িতে। মানুষের যে-পবিণতি সে দেখেছিল তাতে তার জমিদাবি করাব কোনো কথাই তার মনে হয়নি, ফিরে এসে নিজেকে দুয়ো বলে নিজের ঘবে বসে রইল।

বিষ প্রবেশ করার পর কিছু সময় ভালো কাটে, শেষ পর্যন্ত সবল দেহকেও আচ্ছন্ন করে' দু-তিন বছর পরে শিকদার গ্রামেব একজন হয়ে গেল। শুধু ম্যালেরিয়ায় নয়, শুধু ময়লা পরিধেয় নয়, হাই তোলার ভঙ্গিতে, দুপুরের ঘুমোনোর বাঁধাধরা নিযমে তো বটেই, কথা বলবার ধরনে, চিন্তার পদ্ধতিতেও সে গ্রামেব একজন হযে উঠল।

এ বাড়িতে এসে বড বলে প্রথমে যে ঘবখানায় সে আশ্রয় নেবাব চেষ্টা করেছিল আবাব সেইখানাতেই সে ফিরে গেছে। একটা বহুকালেব পালঙ্ক থেকে উই তাড়িযে এনে পেতেছে ঘরে, সে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে সে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। আস্তর প্রায় সর্বত্রই খসে পড়েছে, হঠাৎ দু-চাব বর্গফুট জায়গা কী করে বেঁচে গেছে, কী সুন্দব মার্বেলের মতো মসৃণ সে জায়গাটুকু। ঘরের সারি সারি চারটি দরজার মধ্যে দুটিকে ভেতর থেকে ইট গুঁজে খাড়া রাখতে হয়, একটির পাল্লা দুটি আটকায বটে তবে ঘুণে ধরেছে। চতুর্থটি হচ্ছে শিকদারের সম্পদ। এই দরজাটিব পাশের দেযালের খানিকটা এখনও অটুট আছে, সিঁদুরের দাগে সেখানে একটা স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা, কোনো উৎসবের মাঙ্গলিক চিহ্ন এত আপনার মনে হয় সেদিনের লোকগুলিকে।

মনেব ইতিহাস স্তরে স্তরে বদলে যায়, সবগুলি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আব একটা পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল একটা ভাঙা টিনেব তোরঙ্গ সরাতে গিযে। কতকগুলি পুরনো কাগজ, হলুদ হয়ে যাওয়া ভিজে ভিজে খসে-আসা কাগজ বেরিয়ে পড়েছিল সেটাকে সরাতে গিয়ে। একটা চিঠি কোণে পড়েছিল, কাগজ ভিজে বটে, কিন্তু লেখাব উত্তাপটা অনুভব করলে সে, অতীতকালের কোনো একজন পুরুষ একটি মেয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, স্ত্রী হতে পারে, নাও পারে।

বাড়ির এ ঘরে-ও ঘরে অনেকগুলি বড বড় কাঠের বাক্স ছড়ানো আছে। টাকাপয়সা কিম্বা কী আছে এইরকম মনের অবস্থা নিয়ে সেগুলি সে খুলেছিল। বাক্সগুলির উপরে ছাতা পড়ে গিয়েছিল, ভেতরের বাষ্প অবর্ণনীয়, কিন্তু বারেবাবে খুলে খুলতে বাষ্পজাতীয় কিছু আর এখন নেই, শুধু চামচিকে উড়ে বেড়ানো বদ্ধঘরের মতো সোঁদা সোঁদা গন্ধ আছে। প্রথমদিকে স্কুলের পাঠ্য হাইজিন বইয়ের কথা মনে হয়ে কত ভয়ই না করেছে তার।

ছেঁড়া ছেঁড়া স্তূপীকৃত কুশাসন, পূজার বাসনের টুকরো-টাকরা, খত, তেরিজ, পাট্টা, কত না জিনিস। সেগুলি রোদে দিয়ে ঝেড়েপুঁছে তোলা হয়ে গেছে। নিজের জিনিস, কেউ হাতে তুলে না হয় নাই দিয়েছে, কেউ ফেলতে পারে? দুপুরে জ্বর বেশি হলে বিকেলে ঘর থেকে বার হতে না পারলে কাগজগুলি সে পড়ে, অনেক কথা সে জানতে পারে, ভালো লাগে।

শুধু চিঠিপত্র নয়, বুড়িও তাকে অনেক কথা বলেছে। বুড়িকে এখন আর খারাপ লাগে না।

খানিকটা কৃতজ্ঞতাও আছে ভালোলাগার মধ্যে, বুড়ি মাঝে মাঝে সোরগোল করে, বাড়াবাড়ি করে ফেলে। বাধা বৈরাগী গোরু বেঁধে দেবার জন্য একটা থানইট কুড়িয়ে ঠুকছিল একদিন, দু-তিনটি আঘাতে ইটখানা দু-টুকরো হয়ে গেল , সেটা বুড়ির চোখে পড়াতে বুড়ি বাড়াবাড়ি করেছিল, শিকদারকে নিজে এসে থামাতে হয়েছিল। কিন্তু দৃষ্টি থাকা ভালো বইকি—শিকদার নিজেও স্বীকার করেছিল।

কিরণ নামে একটি লোক জেলেপাড়ায় প্রতি বৎসরে একবার করে আসে। সে নিজেও জেলে, কিন্তু কী সম্বন্ধ এদের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া কঠিন। লোকে বলে তার মাতুল বংশের কে নাকি ছিল কোন কালে এই জেলেদের একজন। সে বংশের কেউ নেই। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে কিরণকে আসতে দেখা গেছে। তখন জ্বরে ভোগা রোগা একটা ছেলে ছিল সে। এখন কিরণ মস্ত কালো মাংসল দেহ, ঝাঁকড়া চুলে লাল গামছা জড়ানো একজন। সারা বৎসর ব্রহ্মপুত্রে আর পদ্মায় মাছ ধরে বেড়ায়। বৎসরে নিয়মিত একটি সময়ে, যখন অন্যান্য গ্রামে পূজার সময়, কিরণ আসে। অত বড় দেহটার আড়ালে হয়তো একটা মন আছে যে মামাবাড়ির কথা ভুলতে পারে না। সে গ্রামে এলে সাড়া পড়ে যায়, সকলের সঙ্গে সব বয়েসের সঙ্গে তার হৃদ্যতা, সকলের কথা শোনে সে, ভরসা দেয়, তারপর সপ্তাহ শেষ হতে না হতে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

শিকদার এ-কথার জন্যে কিরণ গ্রামে এসেছে, পুরনো কাগজ ঘাটতে ঘাঁটতে সে দেখেছে কিরণের ফৌত হয়ে যাওয়া মামা [illegible] ইকিশোর তার প্রজা ছিল। তার ভিটাটা খালি পড়ে আছে। বিশ বৎসরে খাজনায় প্রায় বিশ টাকা পাওনা হয়েছে ভিটাটার দরুন। কিরণ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে যদি মামার ভিটায় এসে বসে একজন লোক হয় গ্রামে খাজনাটারও একটা বন্দোবস্ত হয়। তলব হল কিরণের।

কিরণ এসে তার অত বড় দেহটা প্রণিপাতের ভঙ্গিতে নুইয়ে বলেছিল, 'কর্তা অধীনের ব্যাজ্ঞাতা মাপ করতে হবে। আপনি আছেন এ খবর গতবারেও পাইনিকো।'

তার হাসিভরা বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে শিকদারের সংকোচ বোধ হচ্ছিল গল্পগাছা করে যে যখন চলে যায় তখন অন্য আর একজনের সাহায্যে কথাটা পেড়েছিল সে।

পরের দিন সকালে কিরণ এল, যাত্রাগানের নটের ভঙ্গিতে চকচকে ভিকটোরিয়া মাকা বিশটা টাকা শিকদারের কাছে রাখল, তারপরে দরজার বাইরে কাকে ইশারা করল। বাইরের লোকটি হাতে ঝুলিয়ে আনতে কষ্ট হয় এত বড় একটা মাছ নামিয়ে দিল ঝাকা থেকে।

শিকদার যদি শহরের লোক হতো, ভাবত কিরণ তাকে পরিহাস করল, তার অস্বচ্ছলতার সঙ্গে নিজের দেবার ক্ষমতার তুলনা করে। শিকদার খুশি হল, এতদিনে একজন তবু সম্মান করল।

চলে যাবার দিন গ্রামের সকলের সঙ্গে দেখা করে, তাদের ফরমাস টুকে নিয়ে কিরণ নিজে থেকেই এল শিকদারের সঙ্গে দেখা করতে। হৈমর মতো তাকে কিরণদা বলতে পারে না শিকদার, কিন্তু মনে হল বলতে পারলে ভালোই লাগত বোধ হয়। কথায় কথায় শিকদারের স্বাস্থ্যের কথা উঠল। কিরণ বললে, 'কর্তা আপনার ঐ বুড়ি গাইয়ের দুধে বিষ আছে, কেমন খয়রা রং দুধের দেখেছেন না'?

কর্তার মনটা জমিদারের খোলস থেকে বাইশ বছরের সবল মন নিয়ে বেরিয়ে এল, 'কী করব, ভাই তাহলে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়'।

কিরণ কোনো কথাই শুনলে না, শিকদারকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল গ্রামের বাইরে মুসলমানপাড়ায়। সেখানে বন্ধুস্থানীয় একজনকে বলে শিকদারের সারা বছরের দুধের ব্যবস্থা করে দিল। যখন সে নদীর ঘাটের দিকে চলে যাচ্ছিল তখন শিকদার বলেছিল, 'আচ্ছা কিরণ গ্রামে তুমি থাক না কেন? বেশ লাগে তুমি থাকলে'।

কিরণ প্রথমে পরিহাসের মতো করে বলেছিল, 'মামাবাড়ি, আজ্ঞা কর্তা, সাতদিনের বেশি থাকতে

নেই'। কয়েক পা গিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে অপেক্ষাকৃত গভীর সুরে বলেছিল, 'নদীতে থেকে খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে। রোদ আর শুকনা মাটি ভালো লাগে না, আজ্ঞা।'

কিরণের কথাগুলি তার মনে লেগে থাকল, তবে কিরণের গতিমান জীবনের সঙ্গে তার আবদ্ধ জীবনের তুলনা তখন-তখনই সে করলে না। সেটা হয়েছিল পরে একদিন স্বপ্নে, আনন্দ বোধ হয়েছিল তার স্বপ্ন টুটবার পরও কিছুক্ষণ ধরে। কিরণের সঙ্গে আলোকোজ্জ্বল নদীর বুকে চকচকে জল থেকে চকচকে মাছ তুলে আনবার স্বপ্ন।

কিন্তু এদিক দিয়ে তুলনা না করলেও তুলনার আর একটা উপাদান চোখে পড়ল তার, মুসলমানপাড়ার মাঠ পার হতে হতে সে দেখতে পেল তাদের সোনালি খড়ে নতুন করে ছাওয়া বাড়িগুলি। অনেক দূর অবধি মাঠের পরে মাঠ বিছানো, লাঙ্গলের কর্ষণে আলগা জমি, ঢিল গুঁড়ো করা—আগাছার ক্ষুদ্রতম অঙ্কুর উপড়ে ফেলে উর্বর করে তোলা। রোদ এসে পড়েছে বাঁকা হয়ে. বোধ হয় গত রাতের শিশিরের বিন্দুগুলিতে পড়ে দূরের জমিগুলি রেশমি রঙে চকচক করছে। রেশমের কাপড় যেন বিছানো আছে জমির উপরে। রেশমের মতো নরম ঝুরঝুরে মাটি, রেশমের মতো মসৃণ তল সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে প্রায় উলঙ্গ লোক পৃথিবীর বুকের কাছে বসে মাটির গায়ে হাত বুলিয়ে যেন এই মসৃণতাটুকু অনুভব করছে। ক্ষেতের পাশে তেল চুকচুকে বীর্যবান চেহারার কতগুলি গোরু-মোষ। কয়েকটি উলঙ্গ শিশু নরম মাটিতে দৌড়াদৌড়ি করছে, পড়ে যাচ্ছে, ধুলো উড়াচ্ছে, মাখছে। ওদের মোরগগুলি জমিতে খুঁটে খুঁটে কী খাচ্ছে, আর দশদিকে চেয়ে উদ্ধত লালঝুঁটি খাড়া করে ডেকে উঠছে কর্কশ দম্ভে।

ঠিক ঘুমও নয়, জাগ্রত অবস্থাও নয়, ঘুমের সেই প্রারম্ভে মনে হতে লাগল তার—তাই বলে বাড়িটাকে ভেঙে চাষের জমি করা যায় না, কিম্বা আম কাঁঠালের গাছগুলি কেটে। রোদ আসবার পথ একটু করে দেয়া যায়, কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ি কখনও আবরণহীন হতে পারে না, মাঠের মাঝখানের তোলা চাষার কুঁড়ের মতো।

বোধ করি মনের যে অংশটিতে মুসলমানপাড়ার মাঠগুলির রৌদ্র-উল্লাস ভালো লেগে উঠেছিল তার উদ্দেশে ক্ষমাভরা হাসি পেল। আর কিরণ জেলের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয় পুরনো প্রতিষ্ঠা ও অভিনব স্বচ্ছলতার মধ্যে। আমাদের গ্রামটার পাশ দিয়ে নদী ছিল, সেই নদী সরে গেল খানিকটা চর রেখে, সেই বন্ধ্যা চরে এসে শস্য করতে শুরু করল চ'রো মুসলমানরা , দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার নদী সরে গেল চর ফেলে, আবার নতুন চ'রোর দল এল। চ'রোরা চিরদিনের ভূমিহীন, তাই এখানে সস্তায় দু-কাঠা জমি পেয়ে খুব করেছে। কিন্তু চ'রোর দল? কে না জানে তাদের পাপের অশেষ কাহিনী। অনুকরণ করার কথা কেউ কোনোদিন ভাবে না, এমনকী প্রথম পর্যায়ের চরের অধিবাসীরা যাদের জমির পূর্বদিকে চর উঠে, তাদের বাসস্থানটুকুকে পুরনো প্রতিপন্ন করে গ্রামের সামিল করে দিয়েছে, তারাও দ্বিতীয় পর্যায়ের চ'রোগুলির সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ স্বীকার করে না। এ তো বয়েস বাড়বার ক্রমিক ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ের চরের চাষাদের বাড়িগুলিতে এখন টিনের ছাদ উঠেছে, তাদের বাড়ির চারিপাশে আম-কাঁঠালের গাছগুলি ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। কয়েকটা বাড়ির মাঝখানে একটা উচ্চ অভিলাষী বটের মাথাও চোখে পড়ে। যদি গাছগাছড়া এতই খারাপ, ফাঁকা মাঠ এতই ভালো, নতুন জমি একটু পুরনো হওয়া মাত্র কেন এমন গাছের কথা মনে হয়। এরপর নদী যখন আরো সরে যাবে তৃতীয় পর্যায়ে চর উঠবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের চ'রো লোকগুলি হবে গৃহস্থ, পুরনো প্রতিষ্ঠায় তারা অবাক হয়ে দেখবে অর্বাচীন আগন্তুকদের।

একদিন একটি ঘরের ছাদে উঠে কাস্তে দিয়ে লতা ঘাস কেটে নামতে নামতে শিকদার একটা ছোট ডুমুর গাছ আবিষ্কার করলে ছাদের আলসেতে। গাছটা কেটে ফেলতে গিয়ে ফলন্ত ডুমুরগুলি দেখে শিকদার হৈমকে ডাকল।

হৈম এসে বলল, 'বা, গাছটা কেটে কী হবে, থাক না বরং বেশ শূন্য-উদ্যান হয়ে আছে'। সে বললে, 'ঘরটা যে নষ্ট হচ্ছে তা দেখিস না, সব তাতে তোর মশকরা'।

হৈম মুখে চোখে গম্ভীরতা আনবার চেষ্টা করে বলল, 'এখন দেখছি বটে'।

শিকদার অতি সন্তর্পণে গাছটা কাটল, শিকড়ের চারিদিকের ইটগুলি খসে যাবে এই ভয় হয়েছিল, কিন্তু ভালোও লাগে হৈমর এমন দু'একটা পরিহাস।

কিন্তু পরিহাস-রসিকা নয় হৈম। তার হাসির কথা মনে হলে তার রাগের কথাও মনে হয়; শুধু রাগই নয়, সংকীর্ণতা ও কলহপরায়ণতার কথাও। একদিন-সেদিন জ্বর হয়েছিল শিকদারের, জ্বরের ঘোরে সে শুনছিল হৈম ঝগড়া করছে কার সঙ্গে। একটু পরে বুঝতে পেরেছিল মায়ের সঙ্গেই হচ্ছে। ভাষার কদর্যতা সেদিন এতটা বেড়ে উঠেছিল যে শিকদার ছুটে গিয়েছিল হৈমকে শাসন করতে।

হৈমর মাথা যখন সুস্থির থাকে তখন তার মনটা শুধু হাসিতে প্রকাশ পায় না, মাঝে মাঝে সুন্দর গল্পও করে সে, সেসব গল্প রাজারানীর রূপকথা হয়, আদিরসাত্মক গ্রাম্য উপকথাও হয়, কখনও বা তার চোখে-পড়া কোনো ঘটনা।

একদিন হৈম বললে, 'অনেকদিন আগে ওরা এসেছিল, সকলের কথা মনে নেই ; ওদের মধ্যে বছর বাইশ-এর একটি ছেলে আর তার সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েটির কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছেলেটির, আর তেমনি সুন্দর ছেলেটি। কিন্তু হলই বা বড়লোক, অত নির্লজ্জ হতে হবে? মেয়েটি যে ছেলেটির বউ এ বোঝা কঠিন নয়, কিন্তু হোক বউ কোমর জড়িয়ে ধরে হেঁটে না বেড়ালে বুঝি চলে না'?

'বোধ হয় মেয়েটির ভয় করছিল'।

'কেন', বললে হৈম, 'আমরা দুটি মেয়েমানুষ যে-বাড়িতে রাতের পর রাত কাটাচ্ছি সে-বাড়িতে দিনের বেলা ভয় কীসের'?

'তারপর কী হল'?

'তারপর আর কী? হাসাহাসি, 'ওবে বাপরে' বলে আচমকা চমকে ওঠা, 'যাও' বলে রাগ করা। অনেকগুলি ফটো তুললে যাবার সময়ে।

'যাবার সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে মেয়েটি। ওর স্বামী নাকি ছবি আঁকেন, অনেক পয়সাও পান এঁকে। বললে ও ছেলেটিও নাকি শিকদার। এ বাড়িরই কোনো একটা ছেলে'।

'এ বাড়ির ছেলে, বলিস কী, তাহলে তো আমাদের গর্বের কথা'।

'গর্বের না ছাই, কলকাতায় থাকে, যেয়ো একদিন দেখা করতে, দেখা করে কী রকম'।

'তোর মনটা খুব ছোট'।

ঝংকার দিয়ে হৈম বললে, 'তুই তো বড় মন নিয়ে খুব বুঝলি'।

কিন্তু শিকদারের সাধ হয়েছিল সেই ছেলেটির কথা শুনতে, হৈমকে ঠাণ্ডা করতে বলল, 'তোর কথাই ঠিক, দেখা করবে কেন'?

কথাটা হৈমকে ঠাণ্ডা করবার জন্য শুরু করলেও সেই শিকদার ও এই শিকদারের পার্থক্যটাও নজরে পড়ল।

হৈম নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এ বাড়িতে থাকলে কিছু হয় না'।

এ রকম ধরনের কথা হৈম অনেকদিনই বলে। শিকদার তখন তাকে ঠাট্টা করে বলে, 'মেয়েদের মনই ঐ রকম নিজের বাড়িতে বসে না, দিন এলে দেখব পরের বাড়িতে গিয়ে কত সুখী হস

তুই'। কিন্তু এমন উদাহরণের পর এমন করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে না। প্রায় সপ্তাহকাল বিমর্ষ লাগল শিকদারের, পুকুরপাড়ের কলার কাঁদিটা চুরি হয়ে গেল তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদিন হৈম ঝগড়াব ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে দেখল, শিকদার মাদুর পেতে বসে কী করছে। খরখর করে হৈম বললে, 'লাটসাহেবের মতো ঘরে বসে আছ, ওদিকে জেলেরা নেমে পুকুরের মাছ শেষ করল'।

শিকদার সামনের বইখানা নেড়েচেড়ে বলল, 'মাছ কোথায় পুকুরে, কাদা ঘাঁটতে চায় ঘাঁটুক'। হৈমর মন তখন কড়া সুরে বাঁধা ছিল, সে বললে, 'তাহলেই হয়েছে, বাইশ বছরের খোকা হয়ে পড়তে বসলেই হয়েছে'। পুরুষকে উত্তেজিত করা কঠিন নয়। শেষ পর্যন্ত শিকদার উঠে গিয়ে জেলের সঙ্গে ঝগড়াও কবেছিল। অশ্রাব্য দু'একটা কথা তাকে শুনতেও হয়েছিল, বলতেও হয়েছিল।

শিকদাবের শিরায় তখন জমিদারি ফিরে এসেছে, বললে, 'দেখাচ্ছি মাছ ধবা'। সকালের রোদ মাথার উপর দিয়ে যখন হেলে পড়েছে তখনও দেখা গেল কাদাজলে এক বুক দাঁড়িয়ে বাঁশের খোঁটা আর কঞ্চি, বাবলার ডাল আর বেলের কাঁটা সারা পুকুরে পুঁতে দিচ্ছে।

যখন মাথায় জল ঢেলে সে খেতে বসল তখনই হৈম লক্ষ্য করেছিল, তাব চোখ দুটি লাল হয়ে হয়ে আছে। হু-হু করে জ্বব এল খেয়ে উঠতে না উঠতে। লেপ কাঁথা গোটা'কয়েক চাপা দিয়ে চেপে ধরে হৈম যখন বললে, 'আমার জন্যই জ্বরটা হল'। শিকদার কাঁপুনির মাঝে মাঝে তৃপ্ত স্বরে বললে, 'ঘরে বাইরে দুদিকে নজর রাখা ভালো। নতুবা সবই লুটেপুটে নেবে'।

মানুষের মনের কোথায় কোন সম্পদ থাকে সেটা হারিয়ে না গেলে বোঝা যায় না কী ছিল সেটা, কতটুকু সার্থকতা ছিল তার। শিকদাব একদিন হাহাকাব করে উঠল এক ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে অনভিজ্ঞতার বলটুকু হারিয়ে ফেলে নেমে আসতে হল বয়স্ক মানুষের পর্যাযে। পাঁচ-ছ দিন সে মুখ তুলে চাইল না, কথা বললে না হৈমব সঙ্গে।

একদিন দেখা হল ঠাকুরঘরেব ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে, প্রদীপ দিয়ে হৈম গড় হয়ে দীর্ঘ সময় ধবে প্রণাম করছে। শিকদারেব মনে হল দোষ স্খালনেব জন্য কিছু একটা বলা উচিত। হৈম প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতে শিকদার দেখল তার চোখে জল, তারও কান্না এল। কী বলা যায়, কী বলা উচিত কে জানে। শুধু নামটাই মুখ দিয়ে বেরল।

দু'চোখে জ্বালাময় অশ্রু নিয়ে হৈম শিকদারের ঘরে গেল। শিকদাবের মনে হচ্ছিল সে হয়তো সবটুকু দায়ী নয়, কিন্তু তার মতো পাপও বোধ হয় কেউ করেনি, দায়িত্বের সামান্য অংশ তার হলেও। কিন্তু হৈমও জানত না, শিকদারও না, প্রথম অভিজ্ঞতার অভিনবত্বেই তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, অনুশোচনায় নয়। তেমনি তারা জানত না গতিহীন ক্ষয়গ্রস্ত জীবনে যেখানে উদ্ভিন্ন করে কর্মের পথে বৈরাগী করে দেবাব সূর্যালোক এসে পড়ে না, সেখানে সাধীত্ব রিরংসার নামান্তর, মুখ তুলে দেখবার মতো প্রাণসূর্যের উদয় নেই যাদের দিগন্তে, পঙ্কিল হয়ে উঠবেই তাদের জীবন।

কিন্তু প্রতিঘাত করবার মতো কিছু একটা শিকদারের মনেব অন্য কোথাও ছিল। বুড়ি বললে একদিন, 'দাদু, তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তুমি বাড়িতে থাক না এতটুকু ; কী হয়েছে তোমার'?

উত্তর না দিয়ে শিকদার কালিপড়া লণ্ঠনটা হাতে করে সেই টিনের ঘবটার দিকে চলে গেল বাহিরের আঙিনায়। বাড়ির ভেতরে আব সে থাকে না। লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে মায়ের ফটোটা চোখে পড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠল শিকদার। ফটোটার কাচে মাথা রেখে চোখের জল শেষ করে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হলে বলল সে, 'কী হবে আমার মা? কী হল আমার এ গ্রামে এসে! সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হবার আগে যেন প্রাণটা আমার বেরিয়ে যায়'।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে পৈতাতে আঙুল জড়িয়ে ঘুমে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করল সে।

একদিন রাত্রিতে হৈম এসে দাঁড়াল তার পাশে. কী রোগা হয়ে গেছে হৈম এ কয়েকদিনে ; মুখরা, কুৎসিতভাষিণী, কোপনস্বভাবা নয় সে আর। চলবার ভঙ্গিতেও দুঃখের একটা দাগ পড়েছে যেন।

হৈম বললে, 'আজ রাত্রিতেও খেলে না। ক'দিন থেকেই দেখছি খাওয়া কমে গেছে। দোষ তো তোমার একাব নয়। (এখানটায় হু হু করে জল নেমে এল দু-চোখে, ঠোঁট দুটিতে আঁচল দিয়ে চেপে ধরল হৈম)। তুমি চলে যাও অন্য কোথাও। মা'র একটা ব্যবস্থা হলে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব! তারপরে তুমি ফিবে এস। যাব, সত্যি আমি যাব'।

শিকদারের মন বিমুখ হয়েছিল, হৈম ঘবে ঢুকতে নিজেকে শাসন করবার জন্য হৈমর প্রতি রূঢ় হয়ে উঠল সে. কিন্তু হৈম চলে গেলে ভাবল সে—আহা তাব মতোই দুঃখ পাচ্ছে বেচারা, সে তো তবু কুৎসিত ভাষায় একদিন গালি দিয়ে উঠেছিল, হৈম শুধু মাথা নিচু করেই চলে।

একদিন শিকদার ভোরের দিকে দরজা দিয়ে এসে পড়া আলোর দিকে চেয়ে ভাবল : পালাবে সে, শহরে যাবে।

কিন্তু গ্রাম থেকে পালানো আর নিজেব মন থেকে পালানো এক কথা নয়।

শহরের ছোট একটা হোটেলে খেয়ে, হোটেলের চাল-ডাল রাখবার ঘরে ঘুমিয়ে দু-চার দিন কাটল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে সে ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে। মোটরগাড়ির ড্রাইভাবরা বড় বড় বাসগুলি কী অদ্ভুত কায়দায় বা নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গেঞ্জির কলে ঘূর্ণমান গতির মাঝখানে বলিষ্ঠ দু-হাত নিয়ে কী সুন্দর কাজ কবে লোকগুলি। তাদের হাসি গল্পে, চিৎকার করে কথা বলায় কী থাকে, ওদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে। ইতিমধ্যে একজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপও হয়েছে তার। এমন বলিষ্ঠ চেহারা. এমন দিলখোলা কথাবার্তা। টাকা নেই—নাই থাকল এ রকম একটা ভাব।

গ্রামে আসবার আগের দিন পর্যন্ত শিকদার গুরুজনদের মুখে শুনেছে—লেখাপড়া শেখো নতুবা ঘাস কাটতে হবে। এই অবস্থায় তার মনে হল লেখাপড়ায় অবহেলা করেই তার এ দুর্গতি। পরিচিত এক দোকানদাবকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এখানে যারা কলেজে স্কুলে পড়ে সবাই তো বড়লোকের ছেলে নয়. শহরেরও নয়। তাদেব লেখাপড়ার কী ব্যবস্থা হয়'। দোকানদার সব খোঁজ রাখে না, তবু বললে, 'হয়ে যায় কোনোবকমে'।

কোর্ট কাছারির কাছে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন কাছারির এক বুড়ো কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পেয়াদার কাজ করে সে, কিন্তু সেই একমাত্র রাজকর্মচারী যে মাঝে মাঝে গ্রামে যায়। গত ফাল্গুনে সেসের মোকদ্দমার নোটিশ দিতে গিয়েছিল শিকদারবাড়িতে। শিকদার তাকে আদর যত্ন করেছিল। গোপনে নিজেই পুকুরের কাদা খুঁজে একটা রোগা কালবাউস ধরেছিল অতিথির জন্য।

পেয়াদা শিকদারকে দেখতে পেয়ে একটু আনন্দিত স্বরেই তাকে ডাকল। গরিব পেয়াদা, পেয়াদারা গরিবই হয়, চা খাওয়ালে পথের ধারে একটি দোকানে। যথোচিত সংবর্ধনা করে নিয়ে গেল সে তাদের আফিসঘরে, 'চলেন বাবু, আমাদের বাবুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। জমিদারির কাজে ওনাদের সাথে আলাপ থাকলে অনেক সুবিধা হবে'।

শিকদার ভেবেছিল পেয়াদাকে একবার এ কথা ও কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করে নেবে গরিব ছাত্রদের কোনো ব্যবস্থা হয় কি না, কিন্তু পেয়াদাকে এরপরে আর কিছু বলা যায় না। অফিসের বাবুরা তার মলিন বস্ত্র, মলিন চেহারা দেখে তার সঙ্গে আলাপ করেনি, কিন্তু সেটা বোধ হল

না, বরং এতগুলি ভদ্রলোকের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে সে একটা তৃপ্তিই বোধ করল, আভিজাত্যের তৃপ্তি।

হোটেলের ঘরে শুয়ে সেদিন রাত্রিতে হৈমর কথা মনে হল। হৈম বলেছিল, চলে যাবে ; কোথায় যাবে সে, পৃথিবীতে কেইবা আছে। বোধ হয় আত্মহত্যার সংকল্প করেছে মনে।

সারারাত ছটফট করে শিকদার পরের দিন সকালে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগল। কিন্তু এমনি মানুষের মন পথের ধারের এক দোকান থেকে ছেঁড়াখোঁড়া একখানা অ্যালজেব্রা বই কিনলে সে।

মানুষের মন বুঝতে না পেরে খানিকটা বিস্ময়ের মধ্যে অনুভূতিকে জাগ্রত করে রাখবার চেষ্টা করি মাত্র। এমন হতে পারে শিকদারের গ্রামে ফিরে যাবার আকর্ষণের মূলে যেমন ছিল আভিজাত্য বোধ তেমনি হয়তো কিছু একটা ছিল বেছে বেছে অ্যালজেব্রা বই কিনবার মূলেও। হয়তো স্কুলে যখন সে পড়ত তখন এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা কঠিন বোধ হতো তার। আজ বোধ হয় অবচেতনায় অনুভব করেছে—কঠিনটাকে জয় করতে পারলে সহজ পথটুকু অক্লেশে সবার উপর হয়ে যাবে। শিশুর মতো এত সরল এদের অনুভব!

সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে পা দিয়ে দেখলে হৈম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

শিকদার বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে'?

মাথা নিচু করে কুণ্ঠিত স্বরে হৈম বললে, 'হঠাৎ চলে গেলে, আট-দশ দিন খবর নেই'।

শিকদার নিজের ঘরে বসে ভাবল হৈমর মনে ঘৃণাটা আর নেই বোধ হয়। শোকতাপ ভোলা যায়, এ তো সামান্য ব্যাপার। বিয়ে দিতে হবে তার। কিন্তু কথাগুলি নিজের মনে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পেছনের টানে যেন পা আটকে গেল—এর চাইতে বড় প্রবঞ্চনা আর কী আছে, হা ভগবান, হা ভগবান।

পরের দিন সকালে হৈম স্নান করে ঘরে এসে বলল, 'এখন বেরনো হবে না। তিন টাকা ছ-আনা খাজনা আদায় করবার জন্য এই রোদে তিন মাইল হাঁটতে হবে না'।

'টাকার দরকার'।

'একটা চাকর ঠিক করেছি তাকে বলে দাও'।

হঠাৎ হৈমর স্বর বদলে গেল, রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'এখনও মরিনি, কিন্তু ঠিক একদিন গলায় দড়ি দেব, তোমাকে যেতেই হবে এখান থেকে বেরিয়ে'।

বিকালের দিকে হৈম আবার এল চোখের জল মুছতে মুছতে।

'মা কী বলছে, শুনেছ? বলছে—অনেক দিন পরে তুমি বাড়ি এলে, আমার নাকি চুল বাঁধা দরকার'। অন্যমনস্ক ছিল বলেই হয়তো তাৎপর্যটা প্রথম ধরতে পারেনি শিকদার। একটুপরে দুঃসহ ক্রোধে জ্বলে গেল তার মন। কী একটা রূঢ় কথা বলতে গিয়ে অসীম লজ্জায় মাথা নিচু করলে সে : মনের একান্তে এ রকম একটা আশা তারও হয়েছিল।

দুজনে দুজনকে এড়িয়ে যাবার জন্য প্রাণপণ করে, তবু এত বড় বাড়িটা কেন, গোটা গ্রামখানাতেও আর কে আছে? শুধু কথা বলবার প্রয়োজনে দুজন দুজনকে খুঁজে বার করে। কে খাজনা দিল না এর আলোচনার জন্য যেমন, পুরনো একখানা সাপ্তাহিক কাগজ হাতে এলেও তেমনি, কিম্বা শুধুমাত্র একটু খাওয়া ও ঘুমোনোর বাইরে কথা বলতে গেলে।

একদিন জ্বরের ঘোরে শিকদার অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। জ্বরের মোহাবস্থায় ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্মৃতিজাত মূক কল্পনা মিশে গিয়ে যে অবস্থাটা হয় তেমনি। দেয়ালের দিনপঞ্জির গায়ে কালীয়দমনের ছবি ছিল। সহস্রশীর্ষ নাগরাজের মাথায় কিশোর কৃষ্ণ, চারিদিকে প্রার্থনারতা নাগকন্যা। কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জ্বরের সংমোহটা এসেছিল। অর্ধনিমিলিত চোখে শিকদার যেন দেখতে পেল ওদের মধ্যে সুন্দরতম মুখখানি যার

সেই নাগকন্যা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে স্পর্শের গণ্ডির মধ্যে। নাগকন্যার অধমাঙ্গের কুণ্ডলীকৃত ঘৃণা যেন তাকে পরম লালসায় বেষ্টন করছে। ঘৃণায়, ভয়ে পলায়নের বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠায় মোহটা টুটে গেল। তবু খানিকক্ষণ ধবে মনে হতে লাগল নাগকন্যার মুখখানায় যেন বেদনার অশ্রু ছিল, যেন সে মুখটা হৈমর মতো। মনে হল শিকদারের যেন নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে নাগকন্যাকে সে অপরিসীম আঘাত করেছে।

দেয়ালেব দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হল তার, ভয়ে ও ঘৃণায় হৈমকে সে কষ্ট দিয়ে কী করবে, হৈমর চোখের জল দেখে হাত বাড়িয়ে তার মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরতে হয়, কাছে এগিয়ে আসে হৈম। হয়তো-বা নাগকন্যার প্রতি তার সরীসৃপ অবয়বের জন্য স্বাভাবিক ঘৃণাটা আছে সেটা কেটে গেলে তার স্পর্শও তেমনি সুখদ হবে। কিন্তু পরে হয়তো বিষের যাতনায় ছটফট কবতে হয়। কেন হৈম মেয়ে হল, এই অভিযোগ জানিয়ে পরম শূন্যে সে পাশ ফিরল।

এ ঘটনাটা বিচিত্র হলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হযতো সম্ভব, কিন্তু বিচিত্র বোধ হয়, মানুষের সমগ্র জীবনের রূপ এমন একটি প্রতীকে ফুটতে পারে স্বপ্নের মাঝখানে। নিজের জীবনের কদর্যতা এখন শিকদার দেখতে পায়। প্রথম দিকের অভিনবত্বজাত মোহ তার আর নেই, কিন্তু নির্মম হয়ে দূবে সরে যেতে পারে না, দূরে সবে যাবার কথা মনে হলেই মনে হয় নির্মমতাব চূড়ান্ত হবে। হৈমর চোখে জল যেমন, তেমনি কাবো চোখের জলে মনের একটা কোণকে দুর্বল কবে দেয়। পুরাতনের জীর্ণতার বেষ্টনের ঘৃণা ও আকর্ষণ যুগপৎ অনুভবে আসে।

চেষ্টা করেছিল শিকদার, মনের সামনে ছিল ছোটবেলায় শোনা কথা—লেখাপড়া কবে ভদ্রলোক হতে হয়। এ ছাড়া অন্য পথের কথা কেউ তাকে বলেনি। পুরস্কাব দেবার ভঙ্গিতে হৈম পর্যন্ত একদিন বলল, 'আরো বেশি করে পড়ো, অনেক বয়েস হয়েছে, একটু বেশি না খাটলে কী কবে হবে। পডা শেষ হলে আমি এসে গল্প করব'।

কিন্তু হৈম না জানলেও শিকদার বেশ জানত, একখানা ছেঁড়া অ্যালজেব্রা কেন, তাব সঙ্গে ট্রানস্লেসন বইখানা জুড়ে দিলেও ম্যাট্রিক পাশ হয না। শুধু অর্থের অভাবই নয়, বলে দেবার লোকেব অভাবই নয়, তার চাইতেও বড় একটি অভাব ছিল শিকদাবেরও জানার বাইরে। ছাত্রের মন তার ছিল না। সাধারণ ছেলেদের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকলে হয়তো সে লেখাপড়া করত, চাকরি কবত ; অসুবিধাগুলিকে জয় করা তার ভাগ্যলিপি নয়।

কিছুদিন পর দেখা গেল হৈমও আর পড়তে বলে না তাকে, সে-ও বোধ হয বুঝতে পেবেছে অসম্ভাব্যতা।

শুধু একদিন একটা বিদ্রোহের ভাব মনে এসেছিল : পুকুরপাড়েব খানিকটা জায়গা সাফ করে কয়েকটা বেগুন গাছের চারা লাগিয়েছিল শিকদাব। গাছগুলির গোড়া থেকে ঘাস নিড়িয়ে দিচ্ছিল শিকদার আর হৈম সেগুলি জড়ো করে করে বাইরে ফেলে দিচ্ছিল। শিকদার বললে, 'মুসলমানপাড়ার মাঠগুলি দেখেছ হৈম, কেমন রোদ আর কেমন তেজ মাটির'।

'আমাদের এটাও তেমনি হবে। একমাসের মাথায় ফল না ধরে...

শিকদারের মনে শুধু রৌদ্রদৃপ্ত ভূমির কথাই ছিল না, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ভাবে ওদের দাবিদ্র্য-উদ্ভিন্ন জীবনের যে দৃঢ়তা ও দীপ্তি অনুভব করেছিল, সেটাও ফুটে উঠেছিল।

শিকদার বললে, 'আমরা যদি ওদের মতো হতে পারতাম, ভালো ছিল। সুখী হতাম। কুঁড়েঘর তুলতাম, দেহে স্বাস্থ্য থাকত। আর বোধ হয় তোমাকে, তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখী হতে পারতাম'।

শিকদারের স্বরেব উত্তাপে হৈমর মুখ পাংশু হয়ে উঠল, নিষেধ ও কান্নায় মেশানো একটা অস্ফুট শব্দ করে সে প্রায় ছুটে পালাল শিকদারের কাছ থেকে এবং বোধ হয় তার রচনা-করা স্বপ্নের কাছ থেকে।

কিন্তু বিদ্রোহটা সকলে করতে পাবে না, হৈমর পক্ষে শিকদারের সহায়তা পেলে তবু হয়তো সম্ভব হতো, শিকদার নিজেই পারত না। নতুন মাটিতে আবরণহীন আকাশের তলে শীর্ণদেহে সামান্য কিছু নিবিড় প্রাণরস সে সঞ্চয় করতে পারে না। বুড়ি একদিন বলেছিল, 'আ, ছি, হৈম, তোরা দুজনেই শিকদার, সুয্যিঠাকুর দেখবে যে রে ; কখন ভোর হয়েছে'। ঠিক তখনই হৈম ও শিকদার সাধনার ফলে রাত্রির দুর্বার আহ্বানকে বিমুখ করতে পেরেছে। ক্রুদ্ধ শিকদার বেত হাতে করে বুড়িকে মারতে গিয়েছিল, হৈম কাছাকাছি ছিল না তাই কেলেঙ্কারিটা জানাজানি হয়নি। কিন্তু শিকদারের মনের মধ্যেও বোধ হয় অমনি একটা বুড়ি ছিল, ভগ্নস্তূপের একখানা থানইট দু-টুকরো হয়ে গেলে কুৎসিত ভাষায় যে গালাগাল করতে পারে, সুয্যিঠাকুবেব চোখে পড়ে যাবার ভয়েই যার পাপকে মনের গোপনে পাঠিয়ে লোলুপ করে রাখে।

তথাপি এই মানুষের সন্তানগুলিও জীর্ণতার গুটি কেটে বাইরে আসবার সুযোগ ঘটে যায়। ঘটিয়ে দেয় যেন কেউ। ভূকম্পনের মতো কোনো নির্দয় আঘাত। ভূকম্পনে শুধু ধ্বংসস্তূপই ভেঙে পড়ে না, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও গুঁড়িয়ে যায়, কিন্তু ভূকম্পন যাব সৃষ্টি সেই শুধু বলতে পারে ধ্বংসের তুলনায় নতুন সৃষ্টি বড় হয়ে উঠবে কি না ভবিষ্যতে।

ভূকম্পন এসেছিল : কিরণ জেলে অসময়ে গ্রামে এসে ঘুরঘুর কবে বেড়াচ্ছে কেন কেউ জানত না। একদিন রাত্রিতে শিকদাবকে ঘুম থেকে তুলে বলল, 'চলেন কর্তা আজ্ঞা, নৌকা ছাড়ব'।

মুসলমানবা আক্রমণ কবেছে এ জেলার সব হিন্দুপল্লী। অসংখ্য মত্যু ঘটছে, মৃত্যুর চাইতেও বীভৎস পাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিবণেব পেছনে একদল ছেলে মেয়ে, বুড়ো, পুরুষ, শিশু, ভীত, কান্নাকাতর। দিগন্ত আগুনে লাল হয়ে উঠেছে। সমস্ত মাটিটা যেন আঘাতে আঘাতে টলছে, যন্ত্রচালিতেব মতো ওরা হরিবোল বলছে।

ভূকম্পনের পব কী হয় সেটা অন্য গল্প, তবু শুনুন।

প্রায় একমাস পরে একদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পব শিকদাব দেখল উপুড় হয়ে নদীর পাড়ে শুকনো বালিতে শুয়ে আছে সে। সনাতন জেলেব এক বছরেব ছেলেটা তাব পিঠে বসে চুল ধরে টানছে। তার মনে পড়ল এটা একটা জেলের পল্লী, পেছনে সাবি সাবি কুঁড়ে চোখে পডছে তাদের।

ভূকম্পনের মতো দৃশ্যপট মনে পড়ল তাব, পালিযে এসেও বেহাই পায়নি। জেলেপাড়ার সুস্থ ও সমর্থ বলতে ছিল যাবা কেউ নেই তারা আব। অবশিষ্ট গুটিকয়েক শিশু আর চার-পাঁচটি মেয়েছেলেকে নিযে সে এসে আশ্রয় পেয়েছে এ পল্লীতে কাল রাত্রিতে। অনেক মৃত্যুর মধ্যে কিরণের মৃত্যুটা মনে পড়ে, পাঁচ-ছ জন মিলে যখন তাকে ঘিবে ফেলল তখন আহত হয়ে উদ্যত খড়্গের আঘাত এড়ানোর জন্য ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটাই নাডতে পারছিল শুধু।

হৈমর কী হল কে জানে। অনেক দূর অবধি দলের সঙ্গে ছুটে এসেছিল সে। শেষবাব আক্রান্ত হয়ে দলটা যখন ছুটে পালায় তখন হৈম পড়ে গিয়ে আহত হয়ে ডেকেছিল বারবার—'ওগো দাঁড়াও'।

(শিশুটি আবার চুল ধরে টানাটানি করছে) আহা কী দারুণ মৃত্যু এর মায়ের। যদি হৈম থাকত বাঁচত মা-মরা ছেলেটা, হয়তো বাঁচবে নিজে নিজেই। খোলা নদীব বুকে ও পরিষ্কার বালিতে রোদ চকচক করছে—বাঁচবে এটা।

কাল রাত্রির স্বপ্নটার কথাও মনে হল শিকদারেব--ঘবের দাওযায় বসে জালে গাব লাগাচ্ছে যেন সে নিজে আর হৈম এসে পরিহাসভরে ডাকছে তাকে জেলের পো বলে, কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে কপালে সিঁদুর আঁকতে আঁকতে সূর্যকে সাক্ষী রেখে।

চোখ থেকে হাতে, হাত থেকে বালিতে পড়ে চোখের জল শুকিয়ে যেতে লাগল দাগ রেখে রেখে।

ভদ্রলোকের বাড়ি

ওবা আমাদের এক ধরনের প্রতিবেশী ছিল।

১৯৪৮-এ এসেছিলাম বলে ১৯৫০-এর আগতদের তুলনায় ভালো ছিলাম বলতে হবে। একটা ঝরঝরে বাড়িব দোতলায একটা ফ্ল্যাট দখল করতে পেরেছিলাম আমরা। পাশের ফ্ল্যাট থেকে আমাদেব অংশটা কোথাও কাঠের কোথাও-বা চুনলেপা চটের পর্দা দিয়ে পৃথক করা ছিল। এটার জন্য উপার্জনেব একটা বড় অংশ ব্যয় হতো তবু একটি শোয়া-বসার ঘর এবং একটি রান্নাঘরের আভাস মাত্র নিয়ে ব্রাহ্মণী সুখে ছিলেন, কারণ ফ্ল্যাটে একটা পাযখানা এবং পায়খানার বাইরের দিকে দেয়ালে বসানো একটি স্বল্পতোয়া জলের ট্যাপও ছিল। বান্নার বেশির ভাগ ও আহারাদি শযনকক্ষে করতে হলেও, তার দরুন সারা দিন সাবা রাত শোবাব ঘরের মেঝে পিছল হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণী তাঁর দেবর, স্বামী, পুত্রকন্যাদি নিয়ে সুখে ছিলেন। তাঁর ভাষায, জলেব কলে আব পায়খানাব জন্য লাইন দিতে হচ্ছে না, এটাকে নিশ্চয়ই ভদ্র ফ্ল্যাটই বলব।

আমাদের রান্নাঘরের জানলা খুললেই সাত-আট হাত নিচে একটি বাসা আববণহীন হযে চোখে পড়ত।

আমরা এসে দেখেছিলাম সে অংশটা আমাদেব অংশেব এবং ওদিকেব অংশেব কাবো কাবো আঁস্তাকুড়। জানলা খুললেই ছাইয়ের গাদা, তার উপবে ছড়ানো জঞ্জাল, ব্যান্ডেজের কাপড, ছেঁডা ন্যাকড়া, ডিমের খোলা—এক কথায় একটি আধুনিক নবক চোখে পড়ত এবং ভক করে একটা গন্ধও নাকে আসত। শোবাব ঘবে খেতে বসে ব্রাহ্মণীব শত চেষ্টাতেও তা ভুলতে পাবতাম না।

একদিন ব্রাহ্মণী এসে বললেন, 'চেহারা দেখে লোকটাকে যা মনে করেছিলাম, তেমন নয়। নিশ্চিতই ভদ্র।'

উদ্দিষ্ট পুরুষ আমাদের বাড়িওয়ালা। তাব বাড়িতে একটা পাতিলেবুর গাছ আছে। এ সময়ে মশায় কাটা লেবুগুলো হলদে হয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়। আমাব ধাবণা হল সেই লেবু গোটা কয়েক হয়তো পাঠিযে দিযেছে। তা দিক. চাব গণ্ডা পয়সা বাঁচা মন্দ কথা নয়, কিন্তু তার বিনিময়ে বেআইনি কিছু না কবতে হয়. কোনো পারমিট এনে দেয়া কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।

আমার আশঙ্কাব কথা ব্রাহ্মণীকে প্রকাশ করতে শুরু কবেছি তখনই তিনি প্রায আমার হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমি 'করো কী কবো কী' বলতে বলতে জানালাটা খুলে দিলেন।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসেব প্রশ্ন ওঠে বটে। জানালা দিয়ে দেখলাম দশ-পনেবোজন মুদ্দফরাস কোদাল ঝুড়ি নিয়ে ছাইগাদা পরিষ্কাব করতে লেগে গেছে।

'দেখলে তো। বলেছিলাম এবাব যখন ভাড়া নিতে এসেছিল।'

বিকেলে এসে দেখলাম ছাই-টাই কিছু নেই। লাল সিমেন্টের ভাঙাচোরা চত্বর বেরিয়ে পড়েছে। একটা থামের কারুকার্য করা গোড়া। এসব দেখেই মনে হয়েছিল পূবাকালের বাড়িওয়ালার কোনো পূর্বপুরুষেব নাটমন্দির ছিল হয়তো এ অংশটা।

ভালো। খুবই ভালো।

মেয়ে এসে বলল. 'ইস্কুলেব সব মেযে নীল শাড়ি কিম্বা নীল ফ্রক পরবে। একটা নীল ফ্রক কিনে দিও, বাবা। সুতোব হলেই হবে'।

'তা হবে, খুব হবে। ডাক্তারের খরচ মাসে পাঁচ-ছ'টাকা কমলো বলে মনে হচ্ছে'। ব্রাহ্মণীরও মেজাজ খুব ভালো ছিল। তিনি বললেন, 'তুমি বড্ড সিনিক হচ্ছ'।

কেউ কেউ সিনিক নামে পরিচিত হতে বিরক্ত হন, অন্য কেউ কেউ সিনিক না হয়েও এমন নামটা পছন্দই করেন। আমার অবশ্য এসব কিছু হল না। আমাব শুধু ব্রাহ্মণীর মুখে ইংরেজি শুনে অনেকদিন পরে মনে পড়ে গেল বিয়ের সময়ে তিনি কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

আমি বললাম, 'কিন্তু এ আব কতদিন। আমরা আর সব ব্যাপাবে অসুবিধা ভোগ কবতে পারি কিন্তু ছাই ফেলবার জাযগা না হলে আমাদেব চলে না।'

'তুমি দেখে নিও, আমি.

'তোমার কথা হচ্ছে না। অত ছাই তোমার একার সাধ্য কী'।

ব্রাহ্মণী আবার একদিন রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন ছাইমুক্ত চত্বরটায় একটা বাড়ি উঠছে। বাঁশ পুতে, বাঁশের ফ্রেমে, খোলার ঘর। দেয়ালেব জন্য গুড়েব টিন কাটা হচ্ছে।

'ভালো'।

'তাহলে আর আমাদেব ভাবনার কিছু বইল না'।

'ভাবো যদি তাহলে অনেকই রইল। চত্বরেব দিকে আমাদের এ ব্লকটাব পেছন দিক। প্রত্যেক ঘর থেকে একটি কবে নালি কখনও ফুটো ঝাঁঝবা হয়ে যাওয়া লোহার নল বেয়ে, কখনও দেয়ালের গায়ের ফাটল বেয়ে চত্বরে গিয়ে তাদের কাদা জলগুলি ঢেলে দেয় এবং এই ব্লকটার ভিত্তির গায়ে একটা উন্মুক্ত মাঝারি ড্রেন সেগুলোকে বহন কবে নিয়ে যায় সদরের বড ঢাকা ড্রেনটায়। এ নতুন বাড়িতে যারা আসবে তাদেব টাইফয়েড এবং অন্যান্য রোগে ভুগতেই হবে'।

'তুমি সহজে সন্তুষ্ট হওয়াব মতো নও'।

আপাতত অবশ্য দুর্ভাবনাব কাবণ আমাব চোখে পড়ছে না, কারণ ও-বাড়িতে ঢুকবার পথ খুঁজে পাবার মতো কোনো ভাড়াটের কোনো সম্ভাবনা দেখাছ না'।

'তাও ভালো। টাইফয়েড বড় ছোঁয়াচে বোগ বাপু'। বলে ব্রাহ্মণী বিদায় নিলেন।

কিন্তু আমাদেব বোঝা উচিত ছিল বাড়ি যে কবছে বাড়ি ভাড়া দেযাই তার উপজীবিকা। আপাতদৃষ্টিতে এই নতুন বাড়িটা আফগানিস্থানের মতো সদরেব গলিগুলিব সঙ্গে সব রকমে বিচ্ছিন্ন হলেও একটা করিডব তৈরি হল। খোলা ড্রেনটাব উপর দিয়ে বাঁশেব একটা ঢাকনা তৈবি হয়ে গেল। সেই ঢাকনা-দেয়া ড্রেনই হল এই নতুন বাসায় আসবার পথ।

'এখানে কি ভাড়াটে আসবে'?

'এলেও বস্তির লোক'।

'তাহলে?'

'জানালা খোলা চলবে না। এত টাকা দিয়ে এখানে থাকবাব উদ্দেশ্যই হচ্ছে বস্তিব দৃশ্যগুলো ছেলেদের চোখে না পড়ে। মনে করো যদি ঐ উঠোনে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কেউ গান শুরু করে দেয়'।

'গান ভালো জিনিস বটে, কিন্তু...

'সেই কথাই বলছি। সেই বিশেষ ধরনেব পবিস্থিতিতে বিশেষ রকমের গান'।

'আমাদের একই কথা। দক্ষিণের জানালা দুটো খোলা যাবে না, সে শোবার ঘরই বলো আর রান্নাঘরই বলো'?

'তা ছাড়াও আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে হবে। ওরা যাই করুক আমরা সেটা দেখছি তা দেখতে দিলে চলবে না'।

একদিন অফিস ফেরত ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরের মধ্যে অপরিচিত মেয়েছেলে।

বাড়িতে ঢুকে আমার ফ্ল্যাটটায় আসতে হলে ট্রাউজারের পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরতে হয়। এই অবস্থাতেই আসছিলাম। অপরিচিত মেয়েছেলে দেখে ট্রাউজারের ঝুল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ওঁরাও আমাকে দেখেছিলেন। বউটি আমার পাশ দিয়ে বার হয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম চালচলনটা ভালো।

'কে বলো তো'?

ব্রাহ্মণী আর কিছু না বলে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমি আমার দামি খোলসটা টিনের চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় মাদুর-ঢাকা তোশকে ছেলেমেয়েদের বইখাতা সরিয়ে গা ঢেলে দিলাম।

দু-পাঁচ দিন পরে ব্রাহ্মণী বললেন, 'মেয়েটা বড় ভালো গো। একটা কথা তোমাকে বলি, ওদের এর আগে ভালো দিন ছিল'।

'তা আর ছিল না'।

'ঠাট্টা করো কেন? অনেকে হয়তো মিথ্যে লাখ দু'লাখের গল্প করে কিন্তু ব্যবহারেই বোঝা যায় সব'।

না, লাখ দু'লাখের গল্প এখন সহ্য হয়ে গেছে। এদেশি লোকদের মুখে অন্যের বাগানবাড়িতে ছিপে-ধরার গল্প, বাড়িতে কী কী রান্না হয়েছিল তার ঢেকুরসমেত বর্ণনা, আর ওদিকের লাখ দু'লাখের বাগ-বাগিচা জমি-জিরাত এসব সহ্য হয়ে গেছে। বরং না শুনলে অস্বস্তি লাগে'।

'সে তুমি যাই বলো। আমি বুঝতে পেরেছি ওরা ভদ্রলোক'।

'ঘুষ দিয়ে গেছে কিছু'।

'তা যদি বলো অস্বীকার করব কী করে। একটা ছোট্ট তোলা-উনুন দিয়ে গেছে মেয়েটি। এমন শক্ত আঁটোসাঁটো ছোট্টখাট্ট জিনিসটি সে এক্‌জিবিসনে দেয়া যায়। স্টোভ আর জ্বালতে হবে না। এখন তাতে করেই তোমার চা করে আনলাম। ভালো হয়নি চা'?

হেসে বললাম, 'তা হয়েছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হল কী করে'?

'হল, মশাই, হল'।

'তা হোক। তোমার সারা বাড়িতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখা অভ্যেস। যাওয়া-আসার পথের ধারে অন্তত দামি কিছু রেখো না যেন'।

'ছি, ছি, একটা বউকে কি তুমি .

দু-তিন মিনিট পরে আমাকে মত বদলাতে হল। ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। তুমি তো কতই সামলাচ্ছ, এ ব্যাপারেও পারবে'।

ব্রাহ্মণী ঈষৎ নরম হলেও তখন-তখনই নিজের থেকে কথা বলার মতো সহজ হলেন না। কিন্তু গত দশ বছর এ. কাজ করে এ বিষয়ে আমার দক্ষতা জন্মেছে। নিজের সাংসারিক বোকামি ও দৃষ্টিহীনতার কথা আর কিছুক্ষণ বলে যেতেই ব্রাহ্মণী পাশে এসে বসলেন এবং পাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে করতে আনুপূর্বিক সব বললেন। কী করে আলাপ হল। বউটির ছেলেপুলে নেই। সাত-আট বছর বিয়ে হয়েছে। ও হবেও না। পেটে ব্যথা আছে। ওর স্বামী ট্রামের কন্‌ডাক্টর। এমনকী এখন তিনি জানালা খুলতে পারেন। আমি আফিসে যাওয়ার পর-পরই ওর স্বামী এসে খেয়ে যায়। তারপর থেকে বউটি একা বাড়িতে থাকে। উঠোন ঝাঁট দেয়। বাসনপত্তর মাজে। কখনও সেলাই করে। তখন জানালা খুললে আপত্তি নেই। জানালায় দাঁড়িয়ে গল্প করাও চলে।

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। দেখলাম ছোটমেয়েটা ঘরময় কালি মেখে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমার বড়ছেলেটি বিছানার উপরে বসে কতগুলি খেলনা নিয়ে খেলা করছে। আমার ছোটমেয়েটি আমার অত্যন্ত আদরের। তার মুখে কালি দেখে আমি বললাম, 'তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই রে। ছোটবোনটা কালি মেখে বেড়াচ্ছে আর তুই ঐ আবর্জনাগুলো নিয়ে বিছানার উপরে গিয়ে বসেছিস? নাম্, হতভাগা, নাম্'।

ব্রাহ্মণী প্রবেশ করতে করতে আবর্জনা কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন। এবং সে কথাটাই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেল।

'আবর্জনা কোথায়? ওটা তো খেলনা'।

কথাটা অত্যন্ত সাধারণ হলেও এক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্য। ব্যাপারটা খেলনাই বটে। পাতলা কাঠের টুকরো এবং পেস্টবোর্ড দিয়ে তৈরি একটা বাংলোবাড়ি। অন্যসময়ে হলে প্রশংসাই করতাম।

কিন্তু সে সময়ে আমার রাগ কমলো না, বরং বাড়ল। 'পিণ্ডি আমার। না হোক কতগুলো পয়সা খুইয়েছ। এই তো তোমার ছেলে মানুষ করার বুদ্ধি'।

ছেলের সম্মুখে অন্তত এমন কথা ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহ্য করা শক্ত। তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

'চেঁচাচ্ছ কেন'?

থামলাম। তবু বললাম, 'মেয়েটার মুখে কালিমাখা কেন'?

ব্রাহ্মণী বললেন, 'থামো। ঐ বাড়ির বউটি তোমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। কাজল পরিয়ে দিয়েছে। কী অন্যায় হয়েছে বলো'?

সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে মনটা একটু স্থির হল। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বসে অনুভব হল ঐ বাড়ির বউটির সন্তান নেই। কাজল যদি পরের মেয়েকে দিয়ে থাকেই তাই বলে এমন কিছু হৈচৈ করা উচিত হয়নি। লজ্জা বোধ হল। ছেলেকে বললাম, 'তোকে বুঝি খেলনা দিয়েছে'? গলাটা উঁচু করলাম। ছেলের ভীতমুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। চৌকির তলা থেকে তার খেলনার বাড়িটা বার করে আনল। তখন আমি প্রায় চীৎকার করে বললাম, 'বাহ্, ভারি সুন্দর তো। এটা একটা শিল্পীর কাজ বলতে পারা যায়'। আশা করেছিলাম আমার আফিসফেরতা উঁচু গলা যদি কেউ শুনে থাকে তারা আমার প্রশংসাও শুনুক।

কিন্তু ব্রাহ্মণীকে রাত্রিতে বললাম 'এত ঘনিষ্ঠ হওয়া কি ভালো? ওদের কাছ থেকে তুমি তোলা-উনুন নিয়েছে নাও, কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ের খেলনা নেবে কেন'?

'দোষ কী? ওরা তো ভদ্রলোকই'।

কিন্তু এক রবিবারে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আমার যেন মনে হল বুলুর একটা জামা হাতে করে ব্রাহ্মণী কাকে দিয়ে এলেন। এ রকম দান তিনি মাঝে মাঝে করেন না তা নয়, কিন্তু আমাকে, অন্তত আমার তাই ধারণা, সামলাতেও হয়। কতকটা অভ্যাসবশে বললাম, 'জামাটা কি তেমন পুরনো হয়েছিল'?

'পুরনো কেন, একধোপ মাত্র পড়েছে'।

'তবে'?

'এত কৃপণ কেন'?

'না, তেমন আর কী। পাত্রটা উপযুক্ত হল কি না দযাব গই ভাবছি'।

ব্রাহ্মণীর কোনো কারণে মনটা ভালো ছিল, তাই সোজা না বলে বাঁকা কথায় চলছিলেন। এবার সরল করে বললেন, 'ঐ বাড়ির বউটিকে দিলাম'।

'তার ছেলেমেয়ে নেই বলেছিলে'?

'চাইল'।

'চাইলেই কি দিতে হবে। ওসব লোকের নানারকম তুকতাক আছে'।

'তুমি কি বিশ্বাস করো ওসবে'।

'তা করি না। ওতে নিজের মঙ্গল হয় না, অন্যের অমঙ্গল হতে পারে'।

'দ্যাখো, এসব মেয়েলি কথা কি তোমার মতো একজন বিদগ্ধ ভদ্রব্যক্তির বলা উচিত! অজ পাড়াগেঁয়ে কোনো ঝিয়ের কোলে মানুষ হয়েছিলে'?

এরপরে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। রাগ হল। বললাম, 'তোমার আভিজাত্য বোধ থেকে তুমি বলতে পারো কেন জামাটি তার দরকার হতে পারে'!

ব্রাহ্মণী বললেন, 'জামাটায় ঢাকাই কাজের নমুনা তুলে দেবে'।

'গবজটা কোন পক্ষের'?

'ওই বলেছিল'।

'তবে? তাহলে তুমিও বুঝতে পাবছ না?'

ব্রাহ্মণীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, বললেন, 'কেন ভয় দেখাচ্ছ'? তিনি ভয়ে কেঁদেও ফেললেন।

সে যাই হোক, স্থির করলাম প্রতিবেশী সম্বন্ধে কোনো কথা আমি আর বলব না। এমনকী ব্রাহ্মণী বললেও না। লক্ষ্য করতে লাগলাম ছেলেরা মাঝে মাঝে চকোলেট বিস্কুট পাচ্ছে। তবু লক্ষ্যে আনলাম না।

এক শনিবার বাত্রি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুপুর দুটোয় বাসায় ফিরে দেখলাম ছোটমেয়েটা ছাড়া বাসায় সবাই অনুপস্থিত। ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'সব গেলো কোথা'?

'পিসির বাড়িতে'।

কথাটা আকস্মিক। জুতো খুলতে খুলতে ব্যঙ্গ করে বললাম, 'পিসি গাড়ি পাঠিয়েছিল'?

'না, তাহলেও। অনেকদিন যায না পিসির বাড়িতে'। ব্রাহ্মণী স্বাভাবিকের চাইতেও সুন্দব করে হাসলেন।

'কিন্তু পিসি যদি বসতেও না বলে? এই আট-দশ মাইল পথ বাসে-ট্রামে কবে তিনটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে'?

'তারা তো ট্রামে-বাসে চলাফেরা করেও। খেলা-টেলা দেখতেও যায'।

ছেলেরা বলতে আমার যোলো-সতেরো বছরেব একটি ভাই আর আমার দুই ছেলে। 'তা যায়। কিন্তু বডলোকদের বাড়িতে যাওয়ার কী দরকাব ছিল'?

ব্রাহ্মণীর মুখ তার অন্তরগত কোনো কথায় বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কুটো চেপে ধবার ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ তো পিসি আদর না করে, দিদি আদব না করে, ফিরে আসবে।'

আর কোনো কথা না বলেই চুপ করে রইলাম। চা এল।

চায়ের বাটি নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'নির্জন লাগছে'।

দশ-বাই-বারো হাত ঘরের ছ'জন বাসিন্দার মধ্যে যদি তিনজন অনুপস্থিত থাকে তবে এমন নির্জন বোধ হয।

ব্রাহ্মণীর চোখে জল এল। তীব্র অভিমানের স্বরে তিনি বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ, আমি ইচ্ছা করে নির্জন করেছি বাসা'।

'না, না। দ্যাখো'।

ব্রাহ্মণী চলে গেলেন। সে রাত্রিতে প্রয়োজনের চাইতে জোর দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে গেলেন তিনি ইচ্ছা করে ঘর নির্জন করেননি। ঘরেই এলেন না তিনি, বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুলেন।

ঘুম আসবার কথা নয়। এদিক-ওদিক করতে করতে মনে হল দক্ষিণ দিকের জানালাটা খোলা

আছে। বন্ধ করতে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম। তখনও ট্রামের কন্‌ডাক্টর বোধ করি তার ডিউটি শেষ করতে পারেনি। মনে হল বউটি উঠোনে বসে আছে। সহসা তার দুঃখের কথা মনে হতে পারে কিন্তু ক্ষণপরেই মনে হল একটা লণ্ঠনের আলোয় বসে বালিশের ওয়াড়ে সে ফুল তুলছে, কিম্বা বুলুর সে-জামাটায় ঢাকাই কাজের নমুনা। এবং তার মুখে তখন হাসি হাসি ভাব। ফ্ল্যাটগুলির গোলমালের উপরে ফুটে ওঠা তার সেই নির্জন শান্ত অপূর্ব বোধ হল। ভদ্রতার দিক দিয়ে যা অন্যায় তেমনি করে বউটির বসে থাকার স্তব্ধ সাবলীল ভঙ্গিটি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু মনকে সেটা শান্ত করল না। আমার মনের মধ্যে ছেলেদের অনুপস্থিতি কোলাহল করে বেড়াচ্ছে। মনে হল, ব্রাহ্মণী লজ্জায় ঘরে আসেননি। মনে হল, এ বউটির নির্জন অবসর ব্রাহ্মণীকে কুদৃষ্টান্তের মতো বিচলিত করেছিল।

ওদের স্বরূপ প্রকাশ পেল। এমনকী ব্রাহ্মণীকে বললাম। আমার পার্থিব জ্ঞান যে তাঁর চাইতে বেশি এটা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলাম কয়েক মিনিট ধরে।

রাত তখন দশটা। চিৎকার শুনে মনে হল কেউ কাউকে মারছে। এদিকের ফ্ল্যাটগুলির সব ক'টি জানলা খুলে গেল। ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'সরে এসো। আজ ওদের মাইনে পাওয়ার দিন'। জানলা বন্ধ করলেও কানে আসতে লাগল

'কে বলেছে তোমাকে টাকা দিতে, কোন নবাবের ঝি তুমি? তোমাকে কি টাকা দিই যাচ্ছেতাই খরচ করবার জন্যে'?

'মা বললেন, কাল একাদশী গেছে'।

'সে রাক্ষুসি না খেয়ে মরল, গোল্লায় গেল, তাতে আমার কী'?

বউটির মা হয়তো অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছে। দুর্দশায় না পড়লে এমন জামাইয়ের বাড়িতে একাদশীর পরদিনও না খেয়ে থাকলেও কেউ আসে।

লোকটির রাগ এতেও কমলো না। 'তুমি যেখানে সেখানে টাকা জমাবে, যাকে তাকে দেবে, তুমি ভেবেছ কী? টাকা আমার না'?

সে কী সব বার করল। উঠোনে বসে ভাঙল। বোধ হয় পয়সা জমানোর কৌটো বা ছোট বাক্স-টাক্স হবে। ভাঙাচোরার শব্দ ধুঁয়োর মতো ভেসে আসতে লাগল, 'যার তার জন্যে খরচ করবে, না'?

কয়েক দিন আগেও বউটি লজেঞ্চুস টফি তো বটেই একটি রাঙন পুতুলও কিনে দিয়েছে আমার ছোটছেলেকে। বউটির লজ্জা আমারও লাগল। মনে হল ওদের দেয়া উপহারগুলো জানলা গলিয়ে লোকটির মাথায় ছুঁড়ে মারি। সে উপহার না দিলেও যে আমার ছেলেদের কোনো ক্ষতি হবার নয়, তার উপহার নেয়াটা যে আমাদের পক্ষে বদান্যতা মাত্র, এ রকম কিছু একটা বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা হল।

পরদিন সকালে আমার মেজছেলে খবর আনল। সে তার দাদাকে বলল, তাদের কাকা উঠোনে কপাল ধরে বসে আছে, বোধ হয় জ্বর হয়েছে।

কথাটা কানে গেলেও তখন কিছু বললাম না, কিন্তু অবসর মতো ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'এমন মাতলামো করা তো ভালো নয় বাপু। তা ছাড়া ছেলেরা যাকে তাকে কাকা বলে কেন'?

ব্রাহ্মণী একটু উদাস স্বরে বললেন, 'কী করা যাবে'?

'ছেলেপুলেদের সামলাতে হয়'।

'তা সামলাব'।

কিন্তু ব্রাহ্মণী যে তাদের সামলাতে পারছেন না তার প্রমাণ পেতে লাগলাম। ছেলেদের হাতে দু-একটা দামি খেলনাও আসতে লাগল। যেন স্ত্রীর যা-তা খরচ করবার মধ্যে আমার ছেলেদের

উপহার দেয়াও ধর্তব্য নয় তারই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে লোকটি।

কিন্তু লজ্জা যেন ভেঙেছে। শুধু মাইনের দিন নয়, অন্যান্য দিনও হৈ-হল্লা হতে লাগল। শুধু এইটুকু বাঁচোয়া যে অশ্লীলতা নেই। বউকে তাড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখানো আছে, গলা টিপে মেরে ফেলার শাসানি আছে, আর সবচাইতেই বেশি কোনো এক রাক্ষসীকে টাকাপয়সা এটা-ওটা দিয়ে সাহায্য কবার ব্যাপার।

পাশের ফ্ল্যাটের ভুবনবাবু একদিন বললেন, 'বেটা ছোটলোক, বেহেড মাতাল। আপনার ছেলেপুলেদের সঙ্গে অত খাতির করতে চায় কেন বুঝি না'।

'তাই চায়? চায় নাকি?' বলে চলে এলাম। কিন্তু মাতালটার চিৎকার যেন আমার ব্যক্তিগত একটা লজ্জায় পরিবর্তিত হবে এমন সূচনা দেখা দিল। অথচ প্রথম দশ-পনেবো দিন ইঁদুরেব মতো নিঃশব্দে যাতায়াত করেছে। ব্রাহ্মণী না বলে দিলে আমি ধাবণা কবতে পারতাম যে রাত্রিতে সে বাক্স-টাক্স ভেঙেছিল, তার আগে পর্যন্ত বউটি একাই বাস কবত। ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'স্বরূপ কি বেশি দিন চেপে রাখতে পারে'?

'বউটারই দুঃখ'।

সিনিকেব ভঙ্গি নিয়ে বললাম, 'অবশ্য, সে স্বাভাবিক হবার চেষ্টাই কবেছে। তোমাদেব দশজনের চাপে আর কতদিন সে আত্মসংকোচ করবে। তাবও তো একটা অধিকার আছে'।

কিন্তু সব বিষয়েবই একটা সীমা আছে।

এই পরিবারটি আমাব মানসিক শান্তি বিঘ্নিত কবছিল। ব্রাহ্মণীব সঙ্গে ছোটখাটো কথা কাটাকাটি বাড়তে লাগল। একদিন তিনি বললেন, 'বউটি যাকে সময়ে-অসময়ে সাহায্য করে সে বউটিব শাশুড়ি, নিজের মা নয়'।

'মানে লোকটির সৎ মা বলছ'?

'না। নিজের মা'।

'তাহলেও কন্ডাক্টর মানে ছেলেই যখন নিষেধ করছে তখন কী দরকার বউটির ভালোমানুষি করে'?

ব্রাহ্মণী বললেন, 'বউ হওয়ার অনেক জ্বালা'।

কথাটার এখানেই শেষ হল না। আমার মনে হতে লাগল মায়েদেব কথা। বললাম, 'বউটিব বোধ হয় কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে। ছেলে আব মাযেতে পার্থক্য এনে দিয়ে এখন.

'বউয়েদের দোষ এমন ধরে নেয়ার কী যুক্তি? শাশুড়িদের দোষ থাকতে পারে'।

'তুমি নিজে বউ হয়ে শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার ব্যাপারে বউয়ের পক্ষ নিলে সেটা কেমন দেখায় না'?

'আমার মনের ছবিটা দেখতে পাও বুঝি'?

অফিসে এসে মনটা কেন তিক্ত হয়ে রইল কারণ খুঁজে পেলাম না। উপরি কয়েকটি টাকা পেলাম। ভাবলাম, কটু কথা অকারণে বলে এসেছি, একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যাই। তারপর মনে হল সেটা ভালো হবে না, ঘুষ দেয়ার মতো দেখাবে। তারপর মনে হল আবার মায়েদের কথা। মা বলেছিলেন, 'তুই তো শহরে যাবি, বউকেও নিয়ে গেলে কি টাকা পাঠাতে পারবি আর!'

'কী দরকার টাকা পাঠিয়ে? তুমিও চলো'।

মা কিছু বলেননি। কিন্তু শহরের সেই এক ঘরোযা ফ্ল্যাটে যে শাশুড়ি-বউয়ের স্থান সংকুলান হয় না এ তো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমিই বলেছিলাম।

একসময়ে এ রকম মনে হয়েছিল ছেলের সুখের চাইতে ছেলের টাকার দিকেই যেন মায়েদের নজর বেশি। বলেছিলাম, 'পৃথিবীতে আর সব মায়ের মতো তোমারও টাকার দিকেই নজর'। মা'র

মুখটা বিবর্ণ হযে গিযেছিল, কিন্তু তবু আসবাব সমযেও মা বলেছিলেন, 'পাবিস তো কিছু পাঠাতে চেষ্টা কবিস'।

একটা আকস্মিক আবেগে উপবি পাওনা টাকা ক'টা মাযেব নামে মনিঅর্ডাব কবে দিলাম। স্থিব কবলাম প্রতিমাসেই অতঃপব টাকা পাঠাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আব চলল না।

একদিন তুমুল ব্যাপাব হযে গেল। কিছুক্ষণ যাবৎ গোলমাল শুনছিলাম। কী নিযে ব্যাপাবটা বুঝবাব চেষ্টা কবিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পবেই মনে হল এপক্ষে কন্‌ডাক্টব ওপক্ষে একটি খাণ্ডাব মেযেছেলেতে বস্তিব ঝগডা শুক হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'মা নাকি'?

ব্রাহ্মণী জানালাগুলি বন্ধ কবে দিযে এসে ভযে যেন কাঁপতে লাগলেন।

'খুন-টুন হবে নাকি'?

ব্রাহ্মণী পাংশুমুখে বসে বইলেন। উভযপক্ষেই মাঝে মাঝে একটি কথা উচ্চাবিত হচ্ছে–সেটা নিজেব ভদ্রলোকত্বেব প্রতিষ্ঠা ও অন্যেব অভদ্রতায ইঙ্গিত। এবং তা কবতে গিযে অশ্লীলতাব চূডান্ত কবছে। খাণ্ডাব মেযেছেলেটি ভাডাব তাগাদা দিতে এসেছিল। বাড়িওযালাব কেউ হবে।

পবদিন সকালে মেজছেলে তাব দাদাকে বলল, 'কাকাব' চলে যাচ্ছে'।

'চলে যাচ্ছে'?

'হ্যাঁ, সকাল থেকে বাস্তাব মোডে একটা ট্রাক দাঁডিযে আছে। কাকা এক বন্ধুকে নিযে এসেছে মাল চাপাচ্ছে'।

কথাটা শুনে কিছু বলাব আগে ছোটছেলে খোকা জানালাব ধাবে গিযে চিৎকাব কবে বলল 'কাকা যাচ্ছ'?

দু তিনবাব বলবাব পব নিচে থেকে হাসিব শব্দ পেলাম। অত্যন্ত মধুব গলায কে যেন বলল, হ্যাঁ বাবা, যাচ্ছি। মাঝে মাঝে এসে তোমাদেব দেখে যাব

যা কবা উচিত নয তাই কবলাম। জানালায উঁকি দিলাম। দেখলাম লোকটি বন্ধুব সঙ্গে গল্প কবতে কবতে মাল তুলে নিযে যাচ্ছে। যেন সে আনন্দে শিস দিচ্ছে এমন সন্দেহ হল। এ বাড়ি থেকে অব্যাহতি পেযেছে এই যেন তাব ভাব।

সন্ধ্যাব পব ব্রাহ্মণী বললেন 'যাই বলো বড্ড যেন নীবব হযে গেছে'.

কথাটা সত্যি।

'আচ্ছা ভদ্রলোক কি সত্যি মদ খেত'

কী জানি'। দার্শনিব ভঙ্গিতে বললাম কাবো কাবো অমন বাই ও থাকে।

কিন্তু কলকাতায বাসা খালি পডে থাকে না সাতদিনেব মধ্যে একজন ভাডাটে এল।

'লোক এসেছে বুঝি'?

ব্রাহ্মণী হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। স্বামী স্ত্রী আব একটি ছেলে।

'কিন্তু দেখো বাপু, আলাপ কোবো না।

'না'। আমবা একমত হলাম।

একদিন ব্রাহ্মণী বললেন, 'বউটিব চেহাবা দেখলে কিন্তু এদেব ভদ্র বলেই মনে হয'।

'চেহাবায কি বোঝা যায'?

'আভিজাত্য ভাবটা থাকে না'?

'তা থাকুক। আলাপ কবোনি তো?

'না। বউটির স্বামীটি যেন মাটির মানুষ। আমরা এদিকের জানালা খুলে রাখি বলে সে মাটির দিকে মাথা রেখে হাঁটে'।

'মন্দের ভালো বলতে হবে'।

দু-দিন না যেতে আরো খবর এল।

'ওদের অবস্থা ভালোই ছিল। পূর্ববঙ্গে ব্যবসা ছিল। স্বামীটি এখানে এসে কোনো কাজ যোগাড় করে নিতে পারছে না। কখনও কারো কাছে কাজ করেনি, কোনো কাজও জানে না। এক দোকানে খাতা লিখে সামান্য কিছু পায়। দিন চলতে চায় না। একটি মেয়ে ছিল। এর আগে যেখানে ছিল সেখানে প্রায় অচিকিৎসায় মেয়েটি মারা গেছে এদের। তারপর থেকে স্বামীটি কেমন জড় হয়ে গেছে'।

শুনে কষ্ট হল কিন্তু তবুও বললাম, 'এই পর্যন্তই। এর বেশি নয় কিন্তু'।

বউটি নিজে থেকে ডাকাডাকি করে আলাপ করল। এ বউটির আলাপ করার ধরন আগের বউটির চাইতেও ভালো। শব্দ ব্যবহার দেখে বোঝা যায় ভদ্রঘরের এরা।

প্রায় একমাস কেটে গেল। হৈ-হল্লা চেঁচামেচি কিছু নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'যাক, বাঁচা গেল'।

আমি ধারণা করেছিলাম ওরা ওদের অস্তিত্বকে আমাদের জীবনের খিড়কির দিকেই অজ্ঞাতে রাখতে সাহায্য করবে।

একদিন ব্রাহ্মণী আবার মুখ খুললেন।

'ওদের চালচলন কিন্তু নতুন রকমের'।

'হুঁ'।

'মানে আমার-তোমার দশজনের সঙ্গে পার্থক্য আছে'।

'হুঁ'।

'তৃতীয় একটি পুরুষ আছে'।

'তৃতীয় পুরুষ তো সর্বত্র আছে। তাতে কী'?

'ঠিক ধরা যায় না, তবে নতুনত্বটা চোখে পড়ে'।

'চোখে না পড়লে আপত্তি কী'?

ব্রাহ্মণী বললেন আর একদিন।

'এই জানালায় চোখ রাখো'।

'সে কী?'

'রাখো না'।

প্রতিবেশীর একতলা বাড়ি অসহায়ের মতো দোতলার অধিবাসীর কাছে উন্মুক্ত হল। দেখলাম, উঠোনে একটা লোক বসে আছে। বউটি তার সঙ্গে গল্প করছে। এমন কিছু ব্যাপার নয়। তারা কী আলাপ করছে তা বোঝা যায় না, কিন্তু তাদের ভঙ্গি দেখে মনে হয় আলাপের বিষয়টা স্নিগ্ধ এবং গোপনীয়। লোকটির অবস্থা ভালো তা তার পোশাক-পরিচ্ছদে সুস্পষ্ট।

এরপরে জানতে পারলাম এদের সংসার যেটুকু চলছে সেটা এই তৃতীয় পুরুষের অর্থে।

ব্রাহ্মণী একদিন বললেন, 'লক্ষ্য করে দ্যাখো এই লোকটির সঙ্গে স্বামীটির কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।'

'তাই নাকি? এসব ব্যাপারে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেলে বিপদ ঘটে'।

'ব্যাপারটা যেন কী রকম। স্বামীটি শুনেছি বেকার কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে আসে'।

'তুমি কি বলতে চাও তাব অনুপস্থিতিটা আলাপ-আলোচনায স্থিব কবা'?

'তা নাও হতে পাবে। কাবো কাবো অত্যন্ত ভয থাকে। নিজেব একটা অসুখ আছে জেনেও কাবো কাছে সেটা প্রকাশ কবতে পাবে না। কী দেখব, কী চোখে পডে যাবে এ বকম ভয়েই স্বামীটা বহু দূবে পালিযে যায'।

'তৃতীয পুরুষেব বন্ধুত্ব ও সহৃদযতা অন্য কোনো পবিণতিব দিকে অগ্রসব হতে পাবে এই ভয়'?

'তাই মনে হয না'?

ব্রাহ্মণী একটু ভেবে বললেন, 'ছেলেটাব কিন্তু বড দুর্গতি'।

'কী হযেছে তাব'?

'লেখাপডা কবাব সুবিধা নেই, খেলাব সঙ্গীসাথী নেই।'

'গলিতে ঢুকবাব পার্কে একটা ছেলে ঠায দুপুবে বসে থাকে, সেই নাকি'?

'হতে পাবে। লোকটি বাসায ঢুকেই ছেলেটাকে দেখতে পেলে দু চাবটে পযসা দেয়। প্রথম প্রথম ভাবতাম, আহা, তবু তো শিশুটাব শখ মিটছে'।

'এখন কী মনে হয'?

'এখন বউটি আগে থেকেই ছেলেটিকে বাজাবে পাঠাবাব ছল কবে সবিযে দেয যেন'।

ইতিমধ্যেই শহবে একটা গোলমাল শুরু হল। এদিক ওদিক থেকে দাঙ্গাব খবব আসতে লাগল। এ বাডিতে যেন একটা পবিবর্তন দেখা দিল। লোকজন আসতে লাগল। গুজগুজ ফিসফিস কবে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। তাব মধ্যে বাজনৈতিক ও বিপ্লবসূচক কথাবাতা শোনা যেতে লাগল। স্বামীটি সহসা যেন দীর্ঘদিনেব সঞ্চিত আলস্য ত্যাগ কবে খাডা হযে দাঁডাল। মিছিলে যোগ দেযা নয শুধু মিছিল চালনা কবছে তাও বোঝা গেল।

একদিন সন্ধ্যাব পব মস্ত একটা মোট পিঠে বেঁধে চীনে ফিবিওযালাদেব ভঙ্গিতে সে ফিবে এল।

পবদিন সকালে খববেব কাগজে দেখলাম শহবেব উত্তব প্রান্তে অন্য সম্প্রদাযেব কযেকটি দোকান লুঠ হযেছে।

পুলিস এল, তাবা বোধ হয খবব বেখেছিল। সকালে তিন চাবজন কনস্টেবল এবং একজন দাবোগা এসে ধবে নিযে গেল স্বামীটিকে।

পুলিস চলে যাওযাব পবে বউটি কিছুকাল কাঁদল। ছেলেটিও কাঁদল। ব্রাহ্মণী বললেন, 'শুনেছ? ছ' মাসেব জেল হযেছে'।

'তা হওযা উচিত'।

দু একমাস ওদেব কোনো খববই আব বাখিনি। একদিন অবসব বুঝে ব্রাহ্মণীকে বললাম 'প্রতিবেশীব কী খবব'?

'বুঝতেই পাবছ'।

'মানে'?

'আজকাল ছেলেটা সিনেমাতে যাওযাব পযসা পাচ্ছে। দিনেব বেলায তো বাজাবেব চাবদিকেই ঘুবে বেডায।

'ছেলেটা কি সিনেমা বোঝে'?

'পযসা পাচ্ছে যাচ্ছে। বউটা আব কত বাধা দেবে। ছেলেটা সবসময়েই প্রায অনুপস্থিত থাকছে। সে থাকলেও হযতো হতো'।

কিন্তু ওদেব জীবনে একটি আমূল পবিবর্তন দেখা দিল এবং সেটা এল আকস্মিকভাবে। আব

একটি পুরুষ আবির্ভূত হল। তার মোটা গলা প্রায় সবসময়েই উচ্চগ্রামে থেকে তার উপস্থিতি ঘোষণা করতে লাগল। আমার ঘরের মধ্যে থেকে তার বাজারে যাওয়া, বাজার থেকে ফেরা, সাংসারিক কর্তব্যাদির অন্যান্য সংবাদ পেতে লাগলাম।

একদিন বিস্মিত হলাম। তখন আমার আফিস যাওয়ার সময়। সহসা একটা হাসির শব্দ কানে এল। প্রথমে নিচু গলায় একজন, তারপরে আর একজন তাতে যোগ দিল। তারপরে সম্মিলিত হাসি উচ্চতম গ্রামের কাছাকাছি দমকে দমকে পৌঁছাতে লাগল। আমার মনে পড়ল, এই এতদিন ধরে আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে কেউ কখনও হাসেনি।

ব্রাহ্মণী বললেন, 'আজ খবর পেলাম চতুর্থ পুরুষটি ছেলেটির জ্যেঠামশাই। লোকটি অকৃতদার। বয়স হয়েছে। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও এই ছোট পরিবারটির গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করতে পারে। দেশে ছিল। খবর পেয়ে এসেছে। ছোটভাইয়ের উপরে যে অভিমান ছিল এখন তা নেই। আজ ছোটভাইকে নিয়ে এল জেল থেকে'।

ব্রাহ্মণী খবর দিলেন, 'সেই তৃতীয় পুরুষটি কিন্তু বেকায়দায় পড়েছে'।

'কী হল'?

'ব্যাপারটি আমার চোখে পড়ে গেল। তৃতীয় পুরুষটি বাড়িতে ঢুকছিল। এমন সময় ছেলেটির জ্যেঠামশাই ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়াল। দুজনে কিছুকাল পরস্পরকে দেখে নিল। তারপর তৃতীয় পুরুষ বললে—কবে এলেন? জ্যেঠামশাই বলল—এই তো এলাম। তৃতীয় পুরুষটি বিড়বিড় করে কী বলে চলে গেল'।

এর মাসখানেক পরে ব্রাহ্মণী মন্তব্য করলেন, 'তোমার সেই যে কী একটা গল্প আছে না— ঐ যে কে এসে দেবদূতের মতো সাহায্য করছে। এও যেন তাই। এতদিনে মেয়েটার ভাগ্য ফিরেছে। শত হলেও সে তো আর পাঁচটি গৃহস্থঘরের বউয়ের মতো। আজ ওদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হল উঠোনে। সবাই মিলে যখন পুজোর কাছে বসেছিল তখন আমার মনে হল, আহা ওদের ভালো হোক।'

কিছুদিন পরে রহস্য করে বললাম, 'কী গো, খবর কী তোমার প্রতিবেশীর'?

'এখন আর কোনো খবর নেই। বেশ আছে ওরা। মেয়েটি সুন্দর করে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে'।

সত্যি, সংসার গুছিয়ে নেয়াই বটে। সন্ধ্যায় যেদিন গোলমাল কম থাকে ছেলেটার সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। সে তার জ্যেঠামশাইয়ের কাছেই বেশির ভাগ সময় থাকে। সন্ধ্যায় আজকাল বই নিয়ে বসে। ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে বোঝা যায় ছেলেটা দ্বিতীয় ভাগ পড়ত একসময়ে, এখন তাকে আবার প্রথম ভাগ থেকে শুরু করতে হবে। জ্যেঠামশাইয়ের কাছে সে গল্প শুনবার বায়না ধরে। এ রকম এক গল্প থেকে বোঝা গেল ওর জ্যেঠামশাই এম. এ. পড়ত, পরীক্ষা দেয়া হয়নি।

কোনো একটি অবলম্বন না থাকলে মিছরি দানা বাঁধে না। এদের সংসারে তেমনি একটা আদর্শ অবলম্বন হয়ে উঠল। প্রায়ই তাদের কথাবার্তা থেকে একটা শব্দ কানে আসতে লাগল, সেটা ভদ্রলোক। ভদ্রলোক কী করে, কী করা তাদের পক্ষে উচিত, কোনটা তাদের পক্ষে অসংগত, এইসব আলোচনা তারা করত।

কলঙ্কের ছোঁয়াচ নেই এমন একটি অর্থাভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীর কথা মনে থাকে না। আমি ওদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণী একদিন বিষয়টিকে একটি দার্শনিক তথ্যের চেহারায় উত্থাপন করলেন, 'আচ্ছা...

'বলো'।

'বউটির কথা ভাবছি। তার যেন নবজন্ম হয়েছে। কিন্তু এ তো শ্মশানে পুড়ে নবজন্ম পাওয়া

নয়। স্মৃতির হাত থেকে কী করে রেহাই পাবে?

'তুমি বোধ হয ভাবছ বউটি তাব আদিম পবিত্রতা ফিবে পাবে না। এবং আদিম পবিত্রতাকে তুমি বড় মনে কবছ। কিন্তু বযস্ক মানুষেব পক্ষে অনুশোচনা বা পবিতাপদগ্ধ মন অনেক বেশি মূল্যবান।'

তথাচ আমি ভাবলাম—মদেব যেমন নেশা আছে, মদ ছাডাব পবও যেমন স্নাযুগুলি অনেকদিন ধবে প্রতিক্রিয়াটিব জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাতে থাকে মেযেটিব পক্ষেও তেমন কিছু হচ্ছে কি না কে জানে। বাইরে সে এই অভাবগ্রস্ততাকে একটা সুন্দব কিছুব মতো আঁকডে ধবলেও আফিমেব নেশাব মতো সেই আব একটি জীবনেব ছাযা তাকে ইশাবায ডাকে কি না বলা সহজ নয।

কিন্তু তখন-তখনই শুনতে পেলাম 'খোকা, পডতে বোসো।'

'যাই জ্যেঠা'।

কল্পনা কবলাম ছেলেটা দুলে দুলে পডছে।

সাধাবণ একটা সংসাবে যা হয—ছেলেটা দুষ্টমি কবে, ছেলেমানুষি কবে। আদৃত হয, তিবস্কৃত হয, দুবন্তপনাব মাত্রা বেড়ে গেলে প্রহৃত হয।

একদিন খুব শাসন কবল ওবা ছেলেটাকে। তখন বাত প্রায় নটা হবে। কিছুক্ষণ আগে থেকে ওব জ্যেঠামশাই এবং বাবা এদিকে ওদিকে খুঁজছিল। ছেলেটা ফিবে এলে বাগ কবে বলল, 'কোথায গিছলি'?

'সিনেমায'।

'সিনেমায'।

'এইটুকু বযসে সিনেমায? কোনো ভদ্রলোকেব ছেলে যায'?

ওব জ্যেঠামশাই খুব তিবস্কাব কবল। ওব বাবা ওকে দুমদাম কবে মাবল। ছেলেটা চিৎকাব কবে কাঁদল। অবশেষে আহাবাদিব পব বোধ হয জ্যেঠামশাই ওকে পাশে নিযে শুযে গাযে মাথায হাত বুলিযে দিল।

আমাব ছোটছেলেটা তাব নিকটতম দাদাকে বলল, 'আমি কিন্তু কখনও সিনেমায যাব না। বাবা মাববেন'।

ছুটি-ছাটাব দিনে মাঝে মাঝে কানে আসত 'আবে তুই কোথায গিযেছিলি আবাব। এই না তোকে ধাবাপাত পডতে বলে গেলাম। কী খাচ্ছিস? বাজাবে গিযেছিলি'?

এক-একবাব ছেলেটা মাব খেত জ্যেঠাব কাছেই। কিন্তু তাব বাবা মা শাসনেব বাডাবাডি কবলে জ্যেঠামশাই মাঝখানে পডে বলত, 'থাক থাক, অত মেবো না। একদিনেই কি শোধবায'।

একদা ছেলেটা আমাদেব ফ্ল্যাটে এল। শীর্ণ চেহাবাব একটি আট-দশ বছবেব ছেলে। তাকে স্কুলে ভর্তি কবে দেওযা হযেছে এবং সে আমাব ছোটছেলেব সঙ্গে পডে। স্কুলে যাওয়াব সময। ছেলেবা ঘবেব মধ্যে বইখাতা গুছিযে নিচ্ছে এমন সমযে সেই ছেলেটি এসে দাঁডাল। ফুটপাত থেকে কেনা অত্যন্ত সস্তাব নতুন প্যান্ট ও বেডৌল একটা নতুন কামিজ পবনে। পাযে শাদা ক্যানভাসেব নতুন জুতো। ওবা ছেলেটিকে অবশ্য যথাসাধ্য সাজিযে দিযেছে। ছেলেটি বাবান্দায দাঁডিযে উঁকি দিযে আমাব ছেলেদেব পোশাক পবা দেখছিল। প্রতিবেশী ছেলেবা একসঙ্গে স্কুলে যায়। আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দেব আভাস ছিল ছেলেটাব মুখে।

কিন্তু আমাব বিবক্ত বোধ হল। দবজাব কাছে গিযে আমি প্রযোজনেব অতিবিক্ত গম্ভীব হযে বললাম, 'তুমি যাও, এদেব যেতে দেবি হবে'।

ছেলেটি নিচে গেল, এবং তাব বইখাতা আঁকডে ধবে নেমে গেল।

সে সন্ধ্যায ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'মুশকিল হবে যদি ঐ ছেলেটি তোমাব ছেলেদেব সঙ্গী হয।

সিনেমার দরজায় ঘোরা, বাজারে ঘোরা ছেলেরা এমন অনেক বিষয় জানে শোনে যা ভদ্রলোকের ছেলেদের জানা উচিত নয়'।

'স্কুলে মেশা তো বন্ধ করা যাবে না'।

'মুশকিল, মুশকিল'।

ওদের নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমার মনে হল এই ছেলেটিকে অবলম্বন করে এরা উঠবার চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মনের এক কোণে এরা বুঝতে পেরেছে নতুন করে জীবন শুরু করা ওদের নিজেদের পক্ষে কোনো কোনো কারণে আর সম্ভব নয়। আঘাতের ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত পেশি স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে আছে, ত্বকের গভীরে ক্ষতের চিহ্নটি এখনও আঘাতটিকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। নিজেদের সব সাধ, সব কামনা যেন ছেলেটির মধ্যে প্রস্ফুটিত দেখতে চায়।

আমার এত কথা মনে হওয়ার কারণ, আমি লক্ষ্য করতাম ছেলেটিকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে ওরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্ন নিচ্ছে। লক্ষ্য করতাম ওর যে-কোনো ব্যাপার নিয়েই বাপ-মা ও জ্যেঠামশাই কথা বলছে একসঙ্গে।

একদিন ছেলেটিকে ওরা অত্যন্ত বেশি শাসন করল। তখন সন্ধ্যা হবে। জ্যেঠামশাই বাসায় ফিরে বলল, 'খোকা আসেনি'?

মা বলল, 'কই না তো'।

'ছেলে তোমার বেহাত হয়েছে বাপু। ডাক্তারের দোকানে ওষুধ কিনে দিয়ে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ছাত্র পড়াতে গিয়েছি। সে দেড়-দু' ঘণ্টার কথা। বাপের অসুখ, তার ওষুধ, তা বলেও কি মায়া নেই'।

'কোথায় গেল'?

'যাবে আবার কোথায় বাজারে ঘুরছে। বাজারে ঘোরা অভ্যেস করিয়েছ তোমরা। ওটুকু ছেলেকে দিয়ে কি বাজারে করাতে আছে'।

'বাজারে ঘুরবে পয়সা পাবে কোথায়'?

'তুমি সত্যি করে বলছ তুমি পয়সা দাও না, বউমা?

'না'।

'তাহলে যা ভয় করেছিলাম তাই। আমার তোশকের তলে পয়সা প্রায়ই কমে যায়। এতদিন ভাবতাম আমার ভুল। চুরিও শিখেছে তাহলে'।

কিছু পরে ছেলেটি বাসায় ফিরল। ঘরে ওষুধ রেখে সে হাসিমুখে তার মাকে কী বলতে গেল। মা বলল, 'এদিকে শোন্'। ছেলেটা কাছে যেতেই, 'অকারণে বাজারে ঘোরা তোমার'? এই বলে চটাপট মা কয়েকটা চড় মারল। ছেলেটা কিছুটা নিরুদ্ধ অভিমানে কিছুটা-বা রাগ করে উঠোনে এসে দাঁড়াল। জ্যেঠা বলল, 'আহা মারো কেন, বউমা। এদিকে শোন্।' এই বলে ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে তাকে তিরস্কার করতে লাগল। তিরস্কার করতে করতে রাগ বেড়ে উঠল তার। তারপর— 'তুমি এই বয়সে চুরি করো', এই বলে সে দুমদাম করে ছেলেটিকে মারল। ছেলেটি এবার হাহাকার করে কেঁদে উঠল। বোধ হয় সে চিনেবাদাম চিবোচ্ছিল, কষ বেয়ে সাদা ফেনার মতো চিনেবাদামের রস গড়াতে লাগল চোখের জলের সঙ্গে। বাবা ঘরে শুয়েছিল। সে উঠে এসে বলল, 'আহা কী করো।' বোধ হয় কিছু আশ্বাস পেয়ে ছেলেটা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'বল্, চুরি করেছিস'? এইবার প্রশ্নটা দু'বার করে হঠাৎ সে-ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে লাথি মারল ছেলেটাকে। ছেলেটা

উঠোনে পড়ে গেল। তার উপরে উপর্যুপরি লাথি পড়তে লাগল। তখন জ্যেঠা এগিয়ে এল—কিম্বা বোধ হয় কোনো এক সময়ে জ্যেঠার কাছে ভালো ব্যবহার পেয়েছিল তার স্মৃতিতে ছেলেটা জ্যেঠার কাছে এগিয়ে গেল। জ্যেঠা দু-একটা কথা বলে আবার মারতে শুরু করল।

ওদের হুঙ্কার ও ছেলেটার আর্তকান্নায় এদিকের ফ্ল্যাটের সবগুলি জানালা খুলে গিয়েছিল। উঠোনের ভিন্ন দিকে বাবা জ্যেঠা মা দাঁড়িয়ে, মাঝখানে মাটিতে পড়ে ছেলেটি। এখন সে আর কাঁদছেও না, গোঙাচ্ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে একবার এর কাছে আর একবার ওর কাছে আশ্রয়ের জন্যে যাওয়ার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকের কাছেই নিদারুণ প্রহার খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি যেন উপলক্ষ মাত্র, তাকে আঘাত দিয়ে এই চক্রব্যূহ যেন কোন বিভীষণ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

কী হল জানি না। অনেক পরে এদিকের বারান্দায় ব্রাহ্মণীকে বসে থাকতে দেখলাম। আমার ছেলেরা বোবা হয়ে গেছে ভয়ে। তারা আলো কমিয়ে দিয়ে না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণী বললেন, এর চাইতে ট্রামের কন্‌ডাক্টরের বাগাবাগি ভালো ছিল। সে এই পল্লী থেকে বস্তিতে চলে গেছে সেও ভালো। জিতবার এমন চেষ্টার চাইতে হার মানা ভালো'।

দেখলাম ব্রাহ্মণীর চোখে জল। তিনি বললেন, তুমি বলতে চাও ওর বাবা আর কখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সুযোগে চুরি করবে না? ওর মা সেই তৃতীয় পুরুষকে কখনও একেবারে পরিত্যাগ করেছে? ছেলেটার যে বাজারে যাওয়ার অভ্যেস সেটা ওর বাবা মা করায়নি'?

আমি ভাবলাম—অভ্যাসটি কী রকম দ্যাখার। ওই ছেলেটিও কি অভ্যাস ত্যাগের জন্যে চেষ্টা করছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষতের মতো তার জাগ্রত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভ্যাস তাকে পুরনো জীবনের আবর্তে টেনে নামাত।

ভোর রাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল

ব্রাহ্মণী ধড়মড় করে উঠে জানালা খুলে দিলেন।

'আহা হা, হায় হায়—খোকা আর কোনোদিন তোকে মারব না। চোখ মেল, ও খোকা'। বিকৃত কণ্ঠের মর্মভেদী শোকপ্রকাশ।

ব্রাহ্মণী মুখে আঁচল চাপা দিলেন কিন্তু কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন।

কাজটা বোধ হয় ভুবনবাবুই করেছিলেন। পল্লীর ভদ্রতা রক্ষা সম্বন্ধে তাঁর একটা বাতিক আছে। পুলিস যখন এল তখন বিছানার চাদর ঢাকা ছেলেটার পাশে তার মা ফিট হয়ে পড়ে আছে। তার বাবা মাটিতে মাথা ঠুকছে, জ্যেঠা নিজের মাথার চুল টেনে টেনে উঠোনে উদভ্রান্তের মতো পাক খাচ্ছে আর বলছে—ও হো হো'।

ওরা আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বনটির উপরে অত্যধিক নির্ভর করতে গিয়ে সেটিকেও হারাল যেন।

পুলিস অফিসার আমাকেই প্রশ্ন করল

'সে কি আপনি দেখেননি? ভুবনবাবুরই বরং এদিকে জানালা নেই। আপনার জানালা থেকে তো সব দেখা যায়।

'না। আমি দেখিনি। ছেলেটা অসুখে ভুগছিল শুনেছিলাম।

মিথ্যাটা বলে পুলিসের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সাক্ষী দেওয়া আমার ধাতে সয় না।

পলদহ

রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও আবহাওয়া নিয়ে খুব খানিকটা আলোচনা মিনিট দু'এক আগে শেষ হয়েছে। শব্দতরঙ্গ যদি দৃশ্যমান হতো, দেখা যেত প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণমান কতগুলি স্রোত লোকগুলিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। ঠিক তখনই, যখন আদৌ উচিত নয়, মুখোটি বললে, 'মজুন্দার, একটা কায়দাষ্টিক গল্প ছাড়ো'।

'আমার আবার গল্প তার আবার কলাকৌশল,' বলে মজুন্দার বললে, 'সেবার, তখনও আমি কোম্পানির কাজ করে বেড়াই, সাইকেল তখন আমার বাহন, আর...

'তোমার ব্যক্তিগত ডিটেইল্‌স্ বাদ দাও। তুমি কোন কোম্পানির কাজ করতে তাও আমরা জানতে চাইনে। তোমার চাকরি সম্বন্ধে যা বলবে স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবে অসম্ভব হলেও আমরা মেনে নেব'।

'সেটা কি কোনো যুক্তির কথা'।

গল্পটা মাঠে মার খায় দেখে ভট্টাচার্য বলল, 'তুমি স্রেফ গাঁজা বলে গেলেও আমাদের আপত্তি নেই। মোদ্দা গল্প হওয়া চাই'।

'হ্যাঁ। যদি গণ্ডগ্রামে সাইকেল করে গিয়ে তুমি এজলাস খুলে বসো এবং নরহত্যার বিচাব করতে শুরু করো তাতেও আপত্তি নেই। শুধু নিজের কথা বলবে না'।

মজুন্দার বললে : (সে যে গল্পের গোড়াপত্তনের লাইন পঞ্চাশ কেটে বাদ দিল বাধ্য হয়ে, তা বোঝা গেল) বড়সাহেব তার করে খবর দিল— এগোও, রাম অফিস এবং শ্যাম অফিস দুটিই পাকিস্তানেব বর্ডারে। তাদের স্থানীয় কর্তা টাকাপযসা কাগজপত্তব-সমেত পাকিস্তানে চলে যাব-যাচ্ছি কবছে, ব্যবস্থা করো।

টাকাপযসা নিতে পারে, কাগজপত্তর নেবে কেন ? এমন নয় কাগজপত্তর ফেলে গেলে তার দুর্নীতির নজির হিসাবে সেগুলি ব্যবহার করে ফায়দা হবে, পাকিস্তান গেলে উদ্ধার করা যাবে না।

মজুন্দার ফোন মারফত এ যুক্তি দিয়ে প্রত্যুত্তরে সাহেবের গালি শুনল।

অগত্যা মজুন্দার রওনা হল।

দাঙ্গা ব্যাপারটির সম্বন্ধে মজুন্দারের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, যেমন ছিল না বাংলা দেশে বাস করেও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে। যখন সে শুনল দাঙ্গাবিধ্বস্ত নয়, দাঙ্গাউদ্দীপ্ত গ্রামের উপর দিয়েই তাকে যেতে হবে তখন তাব মানসিক অবস্থা অত্যন্ত কটু হয়ে উঠল।

মাস চৈত্র। ঘরে বসে চৈতালি যারা করে তাদের মানসিক প্রবণতা ঐ কথাটা থেকেই বোঝা যায়। এমন একটা মাসকে 'লি' প্রত্যয়ান্ত করে যারা মধুবগন্ধি করার চেষ্টা করে তারা কী কী নেশা করে না এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায়।

চৈত্রের রোদে মাটি ফেটে গেছে, দিঙ্‌মণ্ডল পুড়ে তামাটে, সবুজের অভাবে চোখ ক্লান্ত, রৌদ্র-উদ্বেল বাতাসের তরঙ্গ চোখে পড়ছে বলে মনে হয়, নিঃশ্বাস গ্রহণ করলে অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। ট্রেন চলছে, থামছে খুশিমতো, যাত্রীরা খুশিমতো থামাচ্ছে। সেকেন্ড ক্লাস ছোট কামরাটায় অজস্র যাত্রী। মনে পড়ছে মাথার উপরের বাংকের একদিকের কবজা যাত্রীর ভারে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

বিরক্ত হয়ে সহযাত্রীদের বলল মজুন্দার— তোমরা তো পাকিস্তানের থেকে পালিয়ে এসেছিলে, তবে আবার পাকিস্তানেই যাচ্ছ কেন! প্রথমে সকলেই চুপ করে রইল, তারপর সমস্বরে উত্তর দিল—

একবর্ণও বোঝা গেল না। মজুন্দারের একটা কথা মনে হল এই যাদের রূপ, তাদের নাকি কেউ হরণ করে! আদিবসকে যদি দেশছাড়া করতে হয় এদের হাতে বরণডালা দিয়ে পাঠিয়ে দিও। কী দাঁত, আর কী চুল।

বিরুবাবু ইতিমধ্যে একখানা খবরের কাগজ কিনেছিল। গাড়িটা একটু থামতেই সে দিয়ে গেল। বলল, 'আপনার তো অসুবিধা হচ্ছে স্যার'।

'তা একটু হচ্ছে'।

'আর দুই স্টেশন'।

অর্ডারলি জগতে বিরুবাবু সিংহ। তাকে অর্ডারলি-শার্দুল বললে অত্যুক্তি হয় না। মজুন্দার কিছুদিন আগে বিরুবাবুকে বলেছিল, 'বিরু, তোমার পোশাকটা পরো না কেন? দ্যাখো তো ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সার্কেল অফিসার সকলেরই অর্ডারলি কেমন ইউনিফর্ম পরে'।

'ওরা স্যার, পশ্চিমা'।

বিরুবাবু একটু ভেবে বলেছিল, 'শুধু এই শহরে স্যার। শহরের বাইরে যেখানে ইউনিফর্ম পরতে বলবেন পরব। শহরে আমার আত্মীয়স্বজন আছেন অনেকে' এই হচ্ছে বিরুবাবুর জীবনের ফিলোজফি।

মুখোটি বলল, 'তোমার অর্ডারলিকে আমার কাছে ট্রান্সফার করে দাও না দেখি কী রকম সে পোশাক না পরে। হ্যাঁ'।

ভট্টাচার্য আবার বললে, 'থামো মুখোটি, নিজের জীবনদর্শন লোকের সামনে নাচাতে বোসো না'।

বিরুবাবু দু-স্টেশন বাদে তাড়াতাড়ি সাইকেল দুটি গাড়ি থেকে নামাল, ছোট বিছানা দুটি নামাল। তারপরে আমরা রওনা হলাম।

ভট্টাচার্যের ধমক কাজ করেছে। মজুন্দার গল্পকে কয়েক ধাপ একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু ভট্টাচার্য তাকে থামিয়ে বলল, সেদিন খবরের কাগজ কিনেছিলে বললে না? খবরের কাগজে খবর কী ছিল?

'খবরের কাগজ তখনও খোলা হয়নি'।

'সেটা খোলো'।

বিরুবাবু মজুন্দারকে স্টেশনের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে খবর আনতে গেল গ্রামে। সেই সুযোগে মজুন্দার খবরের কাগজ খুলল। এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি অক্ষরে লেখা ব্যাপার সব। গাদিপোতা গ্রাম লুঠ। পাকিস্তান থেকে লোক এসে গাদিপোতা লুঠ করে গেছে একজন নিহত, অন্তত দশজন আহত। একটি স্ত্রীলোককে নাকি নিয়ে গেছে তারা। মজুন্দার রওনা হবার সময়ে এতসব জানবার সুযোগ পায়নি। তাহলে সে কী করত, ছুটি নিয়ে পালাত কি না বলা যায় না। এখন মজুন্দারকে যেতে হবে সেই গাদিপোতায় এবং গাদিপোতা ডিঙিয়ে সানকিডোবায়।

মজুন্দার নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। দূরে একটা গাছতলায় গাভী তার বাছুরের গা চাটছে, একটি কাক ঠোঁট দিয়ে তার পাখা পরিষ্কার করছে। স্টেশনের একটি বাবু পান চিবোতে চিবোতে এক ঢাউস খাতায় যোগ অঙ্ক করছে। অথচ কিছু দূরে, সামান্য কিছু দূরে এ রকম ব্যাপার ঘটছে, যার জন্য কলকাতার খবরের কাগজে দেড় ইঞ্চি লম্বা হরফের খবর ছাপা হয়েছে। খবরের কাগজে উদ্ধৃত ঘটনার মধ্যে অবতরণ করতে কী রকম লাগে তা মজুন্দার জানত না। খবরের কাগজ হাতে তার গা শিরশির করে উঠল।

বিরুবাবু এসে বলল, 'থানায় না গেলে খবর পাওয়া যাবে না। কিছুক্ষণ আগে সদরের হাকিম সাহেবেরা, পুলিশ সাহেবেরা জিপে করে গেছেন এই পথ দিয়ে। চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে মাটির রাস্তায়'।

থানায় পৌঁছে মজুন্দার দেখলে— থানায় লোক নেই। একটিমাত্র কনিষ্ঠবল হাফপ্যান্ট পরে, গলায়

পৈতা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রেষ্ঠবল, মধ্যবল সবাই অনুপস্থিত।

'কোথায় গেল সকলে'?

'গাদিপোতায়'।

'হুঁ'।

থানা থেকে বেরিয়ে মজুন্দার বিরুবাবুকে বলল, 'এটা তো গ্রাম, এখানে বাপু তোমার আত্মীয়স্বজন নেই তো'?

'তা নেই'।

'উর্দিটা পরলে কি খুব অসুবিধা হবে তোমার? পথটা ছায়ায় ঢাকা বলেই বোধ হচ্ছে, খুব গরম লাগবে না তোমার'।

'আপনি যখন বলছেন'।

বিরুর মুখের দিকে চেয়ে মজুন্দারের মনে হল কাজটি সুন্দর হল না। বললে, 'মন খারাপ করে কোনো কাজ করা অনুচিত। বিশেষ করে এই শেষ দিনে'।

'শেষ দিনে'?

'পথের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। গাড়ির চাকার দাগ দেখে মনে হচ্ছে, ছোট একটা ট্রাকটর চালিয়ে গেছে লোকে। রেমার্ক পড়েছ বিরু? পল যখন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে গিয়েছিল সে-ও বোধ হয় এমনি চাকার দাগ দেখতে দেখতে গিয়েছিল'।

'আমরা কি ফিরব না'? বিরু পেছনে আসছিল, সে ঘন ঘন পেছন দিকে তাকাতে লাগল।

'কে বলতে পারে? তাহলেই দ্যাখো উর্দিটা গায়ে থাকাই ভালো। লোকে চিনবে, তুমি না বলতে পারলেও, তুমি একজন সরকারি কর্মচারী, কর্তব্য কাজে যাচ্ছিলে। তুমি কোনো পক্ষেই দাঙ্গায় যাচ্ছিলে না'।

বিরু সাইকেল থেকে নেমে বলল, 'এখানেই অপেক্ষা করুন স্যার. কারো একটা জিপ গাড়ি পেলে উঠে পড়া যাবে। জিপগুলিকে আজকাল খুব লোকে মানে'।

'তা হয় না, জিপ গাড়ি এখন পুবদিকে যাবে, আমাদের যেতে হবে পশ্চিমে'।

বিরু শুকনো মুখে বলল, 'উর্দি পরলে কি কিছু সুবিধা হবে স্যার'।

'তা হবে। কলকাতায় দাঙ্গার সময়ে ক্রিশ্চানদের কেউ কিছু বলেনি'।

'উর্দি পরলে কি আমাদের ক্রিশ্চান বলে মনে হবে?'

'কারো কারো হতে পারে মনে। তা হোক আর না হোক, আমরা হিন্দু মুসলমান নয় বলে মনে হবে'।

বিরু ঝোলা থেকে উর্দি বার করে সাইকেলের হাতলে বেঁধে নিল। গায়ে না উঠলেও ঝোলা থেকে মুখ বার করল উর্দি।

এরপর সাইকেল চালানো যেন অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হল। উর্দিপুরঃসর বিরুর পেছনে সাইকেলে চলল মজুন্দার।

ছোট একটা আম-কাঁঠালের বাগান পার হয়ে রাস্তাটা একটু প্রশস্ত হয়েছে। এতখানি পথটা ছিল পেটানো মাটির, এখন হল ঝুরঝুরে বালির। সাইকেল কষ্টে চলছে। বেশি জোরে প্যাড্‌ল্ করলে সাইকেল ডান-বাঁ যেদিকে ইচ্ছা চলে যাচ্ছে, সামনে এগোচ্ছে না। এমন সময়ে মজুন্দার তাদের দেখতে পেল। গুরুসদয় দত্তর পদাতিক বাহিনী। কালো কপালে লাল সিঁদুর-পরা রায়বেঁশের দল। মালসাট করে কাপড় বাঁধা। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, সেটা এদের দেহের পুষ্টি আর উচ্চতা।

মজুন্দার বলল, 'বিরু আরো এগোবে'?

'কপালে সিঁদুর রয়েছে, স্যার, এরা হিন্দু'।

'তুমি ঠিক বলেছ? অবশ্য আমি যখন কিছু বুঝতে পারছি না, তোমার বুদ্ধি নেয়া ভালো। তা হলে

উর্দিটাকে কী কববে'?

'কেন, স্যাব, উর্দি

'তুমি একটু ভেবে দ্যাখো বিরু, এবা যদি কংগ্রেসি হয'।

'দেশ তো এখন স্বাধীন, কংগ্রেসি মানেই তো সবকাবি'।

'দ্যাখো, অভ্যাসটা প্রায স্বভাবেব মতো। এবা যদি সবকাব বিবোধী হওযাব অভ্যাস না ছেড়ে থাকে। মনে কবো এমন নির্জন পথে যদি বেযাল্লিশেব কথা ওদেব মনে হযে যায'।

বিরু একটু চিন্তা কবল। তাবপব তাব ঝোলাটা কাযদা কবে সাইকেলেব হাতলে বেখে উর্দিটা ঢেকে দিল। বিরুব মুখ শুকনো।

লোকগুলিব পাশ দিযে যাবাব সময দেখা গেল তাদেব গতি অত্যন্ত মন্থব যেন তৃণতৃপ্ত কবটক বোমন্থন কবতে কবতে পবিক্রমণ কবছে।

এদেব পাব হযে মজুন্দাব বলল, 'এবা কাবা বিরু? এমন চেহাবা বাংলা দেশে প্রায দেখা যায না'।

'এবা গোযালা, স্যাব। পবেব ধানেব জমিতে গোরু ছেড়ে দিযে ক্ষেতকে জল খাইযে আব নিজেবা খাঁটি দুধ খেযে জলখাওযাদেব চাইতে তুলনায মোটাসোটা হযেছে।

'বেশ বলেছ, বিরু। তোমাকে আমি এব আগে একদিন ইনটুাসনেব কথা বলেছিলাম। এ ব্যাপাবেও তাই। এদেব পাশ দিযে যেতে যেতে বোমন্থনেব কথা মনে হচ্ছিল'

মুখোটি বলল, 'শুধু বিরুব নয, তোমাব মুখও শুকিযে যাচ্ছিল তা আমবা বুঝতে পাবছি। কিন্তু এবাব গন্তব্যে পৌঁছে যাও'

মজুন্দাব বিনা প্রতিবাদে বলল আমাদেব অফিসেব দবজায পৌঁছে দেখলাম ধুলোয ধুলোময। তিন চাবদিন কেউ কাজ কবতে চেযাবে বসেছে বলেই মনে হল না।

লোকটি ধাবে কাছেই ছিল। এসে বসল। মজুন্দাব বলল 'মিএগ্র আপনি নাকি কাজ থেকে বিদায নিচ্ছেন'?

'আমাকে বিদায দিন'। ঠিক এই তিনটি শব্দ বলতে বলতে লোকটি ঝবঝব কবে কেঁদে ফেলল।

মজুন্দাব অবাক। মজুন্দাবেব বিনযবাবু অবাক। অফিসেব হিন্দু কর্মচাবীবা অবাক। তাবপব অবশ্য শুরু হল ইনসপেকশন। সোজা কথা নয, পুলিশ খবব দিযেছে টাকা পযসা নিযে পালাচ্ছে পাকিস্তানে। সে ইনস্‌পেকশনকে নির্মম ছাড়া আব কিছু বলতে পাবা যায না। খাতাপত্র দেখা, আদায, খবচেব খুঁটিনাটি ওজন কবা, সম্ভব অসম্ভব জেবা কবা কিন্তু এতটুকু সন্দেহ কবাব মতো কিছু পাওযা গেল না, পক্ষান্তবে অন্য দশটা অফিসেব চাইতে কোম্পানিব উন্নতিব দিকেই যেন এব নজব।

ইনসপেকশন শেষ কবে কপালেব ঘাম মুছে মজুন্দাব বলল, 'মিএগ্র আপনি যাবেন কেন'?

বোবাব মতো চেযে বইল লোকটি। মজুন্দাব আপাদমস্তক দেখল তাকে। কালো কালো চেহাবাব বোগবোগাটে একটা লোক। অথচ কী নিষ্ঠায কাজ কবেছে। মজুন্দাব বললে, 'আপনাকে সদবে নিযে যাব। আপনি সেখানে কাজ করুন। সেখানে দাঙ্গা হবে না, এব গ্যাবান্টি আপনাকে দিতে পাবি'।

ভূতগ্রস্তেব মতো লোকটি মজুন্দাবেব মুখেব দিকে চেযে বইল।

এমন সমযে একটা চাপা কোলাহলেব শব্দ এল। কোলাহল কান্নায পবিবর্তিত হল। ধুলোব ধোঁযা উড়ছে ধূসব বঙেব। তাব মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল সাববন্দী হযে মানুষেবা যাচ্ছে। প্রায সকলেই কৃষক, তাদেব সঙ্গে তাদেব ইহকালেব সম্বল, আব শিশু এবং মেযেবা। মেযেবা সত্যি সত্যি বুক চাপড়াচ্ছে।

মজুন্দাব বলল, 'এবা যাচ্ছে কেন, কোথায যাচ্ছে'?

নতুন যে লোকটিকে চাকরি দেয়ার সম্ভাবনা আছে সে বলল, 'পাকিস্তানে যাচ্ছে'।

'কে এদের উৎখাত করল'?

'কাল গাদিপোতা লুঠেছে পাকিস্তানিরা, আজ পলদহ লুঠবে হিন্দুস্তানিরা'।

স্থানীয় আফিসের কিছুক্ষণ আগেও যে কর্তা ছিল সে অকস্মাৎ হাহাকার করে কেঁদে উঠল আবার। যার চাকরি পাবার সম্ভাবনা সে-ই বলল, 'মিএগ্রা, চাকরিতে ইস্তাফা দেবেন না। ছুটি নিন সাহেবকে ধরে। গোলমাল কমলে আসবেন'।

'তা হয়, স্যার'?

'হয়। তাও হয়'। মজুন্দার তাতেই রাজি হল।

কাজ শেষ হয়েছে। বিরু ততক্ষণে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। সে এসে বলল, 'এ গ্রামে ডাকবাংলো নেই স্যার'।

'তাহলে...

'জমিদারবাড়িতে আজ রাত কাটাতে হবে। কাল সকালে গাদিপোতা দেখে সে আফিসের খোঁজখবর নিয়ে...

'সে আফিস কেন? সেখানে তো বাপু হিন্দুই আছে। সে তো পাকিস্তানে পালাবে এমন সম্ভাবনা নেই! তার ইনস্পেক্‌শন্ ডিউ হয়নি। কেন মিছে লোককে উত্যক্ত করা'।

মুখোটি বলল, 'এ কী রকম গল্প হচ্ছে মজুন্দার? কথার পরে কথা বলে যাচ্ছ। এমন বেকায়দায় গল্প নিয়ে পড়তে তোমাকে দেখিনি'।

মজুন্দার বললে, 'তাহলে গবেষণা শোনো :

জমিদারবাড়িতে আসা গেল। জমিদারবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপই একমাত্র খাড়া আছে বলে মনে হল। চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডী নেই, একদিকে ছাদ পর্যন্ত ঠাসা পোয়াল। অন্যদিকে একটা ছোট ঘর। ঘরে অনেকগুলি নতুন বালতি দেখলাম। একটা পিঠভাঙা চেয়ার যোগাড় করেছিল বিরু। বিরুকে বললাম, 'হ্যাঁ হে, রাতে কি এই ঘরে থাকতে হবে? ওটা তো বালতির দোকান'।

বিরু বললে, 'বালতির দোকান নয়। পুলিশের বর্ডার আউটপোস্ট'।

'বালতি কেন'?

'কাল রাত্রিতে আগুন লাগিয়েছিল ঘরে। তাই আজ সদর থেকে এসডিও-র জিপে এসেছে বালতি'।

'বাহ্, বেশ খবর নিয়েছ। আপাতত একটা বালতি নিয়ে দ্যাখো কিছু জল যোগাড় হয় কি না'।

বিরু বালতি নিয়ে গেল এবং শূন্য বালতি নিয়ে ফিরে এল। জমিদারবাড়িতে জল তুলবার কোনো ব্যবস্থা নেই। বিরু পুকুর থেকে জল আনতে গেল।

'কোথায়'?

'ঐ তালগাছটার নিচে হবে'।

এমন সময়ে বর্ডার আউটপোস্ট হঠাৎ গমগম করে উঠল। একজন দারোগা চার-পাঁচজন কনেস্টবল নিয়ে ফিরল।

'কে আপনি', বলে যে-সুরে বিওপির কর্তা কথা শুরু করেছিল, মজুন্দারের পরিচয় পেয়ে সে সুর বদলালে। সে বললে, 'আমাদের উপরে হুকুম আছে আপনাদের কোম্পানিকে সবরকমে সাহায্য করতে। ঐ যে খবরটা পেয়েছিলেন সেটা আমিই দিয়েছিলাম। সাইকেলে লোক গেল রহমৎগঞ্জের থানায়, রহমৎগঞ্জ পিং পিং করে বেতারে খবর দিল আপনাকে'। রামভজন কনেস্টবলকে ডেকে বলল, 'সাহেবের থাকার জায়গা উপরে করে দিও'।

'উপরেও ঘর আছে নাকি'।

'আছে'।

'চণ্ডীমণ্ডপেব উপবে ঘব'।

'চণ্ডীমণ্ডপ নয়। এটা বোধ হয দববাব-ঘব ছিল'।

মজুন্দার মনে মনে হাসল কথাটা শুনে। একটা অভাব মজুন্দাব অনুভব কবেছিল, সেটি চাযেব। মজুন্দাব দেখল বিওপিব একজন চৌকিদাবেব সাহায্যে উনুন জ্বেলে বিক মস্ত একটা হাঁড়ি তুলে দিযেছে উনুনে। কিছুক্ষণেব মধ্যে মস্ত এক গ্লাস চা এনে দিল। মজুন্দাবেব মনে পড়ল সিকিমেব এক গ্রামে এ বকম চা সে খেয়েছিল। যাকে এককথায গুড-টি বলা যায।

চা খেতে খেতে মজুন্দাব বিওপিব কাছে জানতে চাইল ব্যাপাবটা।

'গোলমালটা হঠাৎ লাগল। কোথাও কিছু নেই ঝড শুরু হল। একদল লোক এসে গাদি পাতা লুঠ কবল। আমবা ছিলাম না, হাটে গিযেছিলাম। কযেকটা খডেব চালায আগুন দিল ওবা। একজন লোক খুন হযে গেল। দু-তিনজন জখম হল। পবেব দিন সকালে শুনলাম একটি মেযেছেলে পাওযা যাচ্ছে না'।

'আপনাবা থাকতেই এ বকম ব্যাপাব হল।'

'আমবা পবদিন অনেক চেষ্টা কবেছি। এই তো কজন সিপাহি, এই নিযে পাকিস্তানেব ভেতবে আধ মাইলেবও বেশি ঢুকে গিযেছিলাম। টেঞ্চে এগিযে যাবাব মতো বিলেব শুকনো খাদ ধবে ধবে এগিযে এগিযে ওদেব গ্রামেব মাতব্ববেব বাড়িব নিচে পর্যন্ত গিযেছিলাম। সঙ্গে দুটিমাত্র বন্দুক।'

'সাহসেব কাজ কবেছেন। মেযেটি কে? তাব বাপ মা স্বামী ভাই নেই? তাবা কী কবল'?

'কেউ নেই'।

'সে কী? শহবেব মেযে হলে না হয বুঝতাম স্কুলমিসট্রেস বা এ বকম কিছু'?

'এও কতকটা তাই, স্যাব। কযেকজন দূবসম্পর্কীযা আত্মীযাব সঙ্গে তাব নিজেব বাড়িতে বাস কবত। জোতজমা আছে। জোতজমাব আদাযপত্তবও নিজেই কবে। অনেক গোরু আছে। গোরুব বাখাল ছোঁড়াবাই একমাত্র পুরুষ যাবা তাব বাড়িব ভেতবে যেতে পাবে। ছানা তৈবি হযে বোজ সন্ধ্যায চালান যায বহমৎগঞ্জেব মিষ্টিব দোকানে'।

'জাতিতে গোপ ?

'তাও নয। আমি এদিকে নতুন লোক আমাব কাছে বহস্যপূর্ণ। ওদিকে নিবক্ষব মেযেটি'।

মজুন্দাব কয়েক মিনিট চুপ কবে থেকে বলল, 'আচ্ছা, আমাদেব কোম্পানিব লোকটি কি সত্যিই টাকা-পযসা নিয়ে পালাত'?

'আমাদেব তাই সন্দেহ হযেছিল

'আমাব কিন্তু সে বকম সন্দেহ হল না। ববং আমি সন্দেহ কবে এসেছি মনে কবেই লোকটা ঝবঝব কবে কেঁদে ফেলল। টাকা পযসাব ব্যাপাবেও লোকটা খুব পবিষ্কাব'।

'লোকটি ভযংকব। তাব পবামর্শেই পলদহেব মুসলমান চাষীবা গ্রাম ছেড়ে পালাল।

'সকলে চলে গেছে'?

'যাবা আছে তাবা কাল সকালে যাবে'।

'কেন, কাল সকালে যাবে কেন? কী যুক্তি। এদিকেব লোকেবা যদি লুঠই কববে তবে তো আজ বাত্তিবেও পাবে। যদি আজ বাত্তিবে না হয, তবে কাল সকলকে চলে যেতে দিযে লুঠ কববে কেন ?

বিওপির মাথাব উপবে একখানা ঘব ছিল। সেই ঘবে মজুন্দারেব স্থান হল। বিক ঘবটাকে ঝাঁটপাট দিযে মজুন্দাবেব বিছানা পেতে দিল। বর্ষাকালে ঘবটিব দেযাল বেযে জল পড়ে ছাদ থেকে তা বোঝা যায। দেযালেব পনেবো আনা আস্তব নেই। ইটগুলিব গাযে শেওলাব দাগ। ঘবেব মেঝে এককালে বোধ হয

রক্তের মতো লাল ছিল। এখন ভাঙাচোরা মেঝেটা সুরকির মতো রঙ নিয়েছে। কড়িকাঠে লেখা ঠিকানাটা মজুন্দারের চোখে পড়ল। শ্যামচাঁদ রায়, পিতা মৃত লক্ষ্মীকান্ত রায়, সন ১২৫১ সাল। একশো বছরের আগে কোন এক বিলাসী শ্যামচাঁদ এই বাড়ি তৈরি করেছিল। বড় বড় জানালাগুলি তার তদানীন্তন আধুনিক রুচির পরিচয়। একটি জানালার শিক নেই, পাল্লাও একটিমাত্র আছে। মজুন্দার বলল, 'ওটা তো ভালো নয় বিরু, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে যেতে পারে'।

'এ বাড়িতে ছেলেমেয়ে নেই'।

'তোমার জমিদারবাড়ি এটা, জমিদাররা কোথায়'?

'জমিদাররা পঞ্চাশ বছর আগে ফৌত হয়ে গেছে, এখন এ বাড়ি তো ফোরং সা-র। বিওপির জন্য সে আট টাকা ভাড়া পায়'।

'তাদের কেউ নেই'?

'আছে বোধ হয়'।

লণ্ঠনটা কাছে এগিয়ে দিয়ে বিরু বলল, 'আপনি তাহলে লেখাপড়া করুন, স্যার। আমি ওদিকের যোগাড় করি। আর একটা কথা, নিচে যেন নামবেন না। নিচে যাবার দরকার হলে ডাকবেন, সিঁড়িটা খুব ভাঙা'।

বিওপির ঝকঝকে নতুন ডিজের আলোয় বসে মজুন্দার তার বালিশের তলা থেকে বই বার করল। মজুন্দার খুব পড়ুয়া তা নয়, বিশেষ করে ফরাসি বই তাকে বানান করে করে পড়তে হয়। সেজন্যই বেকায়দায় না পড়লে তার পড়া হয়ে ওঠে না। আজ তার সঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেই' ছিল।

সময়টা কতটুকু পার হল বলা কঠিন, সহসা একটা আর্ত চিৎকারে মজুন্দার ভয়ে শিউরে উঠল। 'বিরু, বিরু'!

বিরু একটা মোমবাতি নিয়ে উঠে এল। 'ও কিছু নয়, স্যার। এখনও পাকিস্তানের দিকে যাত্রীরা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কোনো বিপদে পড়ল হয়তো'।

'কী সর্বনাশ! রাত করে যাচ্ছে কেন'?

'অনেক দূরের দূরের গ্রাম থেকে এরা পাকিস্তানে যাচ্ছে। এই গ্রামে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেছে। এটা মুসলমান-প্রধান গ্রাম ছিল। ওরা রাত্রিতে এখানে আশ্রয় পাবে ভেবেছিল'।

জিভ দিয়ে টাকরায় আঘাত করে ক্ষোভসূচক একটা শব্দ করে মজুন্দার বইয়ের দিকে নজর দিল। বিরু নিচে চলে গেল।

ভট্টাচার্য বলল, 'যখন একদল মানুষ রাত্রির অন্ধকারে বিপদে আর্ত চিৎকার করছে তখন তুমি থেই এর বর্ণনা পড়ছিলে। দেহ ও মন—প্রেম কার অবলম্বন, এই মনোজ্ঞ আলোচনায় ডুবে ছিলে। সেক্ষেত্রে তোমার রাত্রির আহার ও নিদ্রা ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। কাজেই ও পর্ব দুটি বাদ দিয়ে যাও তুমি'।

মজুন্দার তার পাইপে তামাক গুঁতোতে গুঁতোতে বলল, 'আপত্তি ছিল না। একটা খবর তোমাদের দিয়ে রাখি, দরকার হলে পলদহ-গাদিপোতা স্মরণ কোরো। অমন সুঘ্রাণ কোনো গ্রামের ঘিয়ে নেই। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম : তারা বলল— পলদহের পলিমাটিতে অজস্র কলাই হয়, আর গাছসমেত কচি কলাইশুঁটি খেয়ে থাকে গরুগুলি শীতকালভোর। সেজন্যই এত সুঘ্রাণ ঘিয়ে। জাফরান নেই, এলাচ যৎকিঞ্চিৎ, তবু সেই রাত্রির ঘিভাত আর মোরগঝোলের কথা আমি বহুদিন ভুলতে পারব না। খেতে খেতে মনে হচ্ছিল ঘরের দেয়ালগুলিও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। জমিদারের যখন ভালো অবস্থা ছিল তখন আহার্যের এমন সুঘ্রাণ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দেয়ালের গায়ে লেগেছে কি না কে জানে'!

বিরু এঁটো সরাতে এল। মজুন্দার বললে, 'বিওপির লোকেরা কোথায় থাকবে'?

'সারা গাঁয়ে টহল দেবে। শুধু দুজন ঘরে ঘুমাবে আর একজন বন্দুক নিয়ে দরজায় পাহারা দেবে'।

'দরজা মানে তো আমার এই সিঁড়িব মুখে'।

'হ্যাঁ'।

মজুন্দাব আহারাদিব পব আবো কিছুক্ষণ 'থেই' পড়ল। তাবপব আলোটা কমিযে বেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই দেখল বিক ঘবেব মধ্যে দাঁড়িযে।

'চা হয়েছে স্যার. মুখ ধুয়ে নিন'।

মজুন্দাব হাতমুখ ধুযে দেখল— প্রচুব আহার্যের বাবস্থা কবে ফেলেছে বিক ইতিমধ্যে। মজুন্দাব চা পর্ব শেষ করতে করতে বিরু সাইকেল দুটি একটু ঝাড়পোঁছ কবে প্রস্তুত হযে দাঁড়াল বাস্তার ধাবে। অতঃপব মজুন্দাব গাদিপোতাব দিকে চলল। পথ দেখিযে দেবাব জন্য গ্রামেব একজন লোক সাইকেল-সমেত বিক যোগাড় কবেছে।

কোথাও শুকনো মাটিব খটখটে সমতল পথ, কোথাও ঝুবঝুবে বালিব. কোথাও-বা গোরুগাড়িব খাদে অসমান বাস্তা। কিছুদূর যাবার পব দু-তিনটি দগ্ধাবশেষ বাড়ি পড়ল চোখে। ছোট ছোট মাটিব দেওযালগুলি আর পোড়া বাঁশেব খুঁটিগুলি কালো হযে দাঁড়িযে আছে। সঙ্গেব লোকটি বলল— এগুলি কংফুদ্দিন পুড়িয়ে দিযেছে। এগুলি হিন্দু গোযালাদের বাড়ি। আব কিছুদূব গিযে একটা আম-কাঁঠালেব ঘেবাব মধ্যে আব একটা দগ্ধাবশেষ বাড়ি দেখা গেল। সঙ্গেব লোকটি বলল, এটি মুসলমানেব বাড়ি, কাল পুড়েছে।

বাস্তা বলো পথ বলো, সেটা সোজাসুজি জলে গিযে নেমেছে।

'এবই নাম পলদহ'।

'এব থেকেই গ্রামেব নাম? কিন্তু জল কোথায'?

পলদহেব খাত শুকিযে গেছে। সোজাসুজি ডাইনেব দিকে খানিকটা জাযগায জল চকচক কবছে। তাব উপবে একটা ছোট সাঁকো। সাঁকোব ওপাবে ছোট ছোট বাড়ি, দু তিনজন লোক একটা বাড়িব সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, একজোড়া বলদ জুড়ছে একজন লাঙলে। পায়েব তলে পলদহব খাত, একজাতীয লম্বা ঘাস এবং কলাইজাতীয লতা লকলক কবছে। চৈত্রেও শুকিযে যাযনি ঘাস। পলদহব মাটিতে পলিব সাব আছে। হাঁটু সমান উঁচু আগাছা, শিশিবে ভেজা বোধ হয, গাযে লাগছে, দুই একটি পচা পাতা ও ঘাসেব ডগা জোঁকেব মতো গাযে লেগে যাচ্ছে।

মজুন্দাব বলল. 'তোমবা বাস্তা ন করেছ। ঐ সাঁকো দিযেই গ্রামে যেতে হবে। এদিকে সোজাসুজি গ্রাম কোথায'?

সঙ্গেব লোকটি হাঁ হাঁ কবে উঠল। ওদিকে পাকিস্তান।

'আমবা তো পাকিস্তানেই যাচ্ছি তাহলে'.

'না, স্যাব। সামনেব ঐ বড় অশ্বত্থ গাছটায নজব বাখুন। ঐটেব ডানদিকে পাকিস্তান বাঁদিকে পলদহ। অশ্বত্থ গাছটাব ডানদিকে গেলেই ওবা ধবে ফেলবে'।

মজুন্দাব এই যাত্রীদলেব নেতা। সে সাহস দেখিযে বলল, 'ধবা মুখেব কথা নয'। একটুপবে বলল, 'অকাবণ গোলমাল বাধিযে দেওযা উচিত নয। তোমাদেব ভাব দেখে বোধ হচ্ছে অশ্বত্থ গাছেব ডালপালা ধবে পলদহ থেকে উপবেব মাটিতে উঠতে যাচ্ছ। তাব দবকাব কী? ওরা মনে কবতে পাবে তোমবা অশ্বত্থ গাছটাব ডানদিকেই উঠে পড়াব চেষ্টা করছ। এখানে দাঁড়িযে অশ্বত্থ গাছটাব বাঁদিকে দশ গজ দূরে অন্তত কোনো জাযগা লক্ষ্য কবে চলো'।

'আজ্ঞে তাহলে এক বুক কাদায় গিয়ে পড়তে হবে'।

'তা হবে কেন? ওদিকে তো জলের চিহ্নও নেই'।

'ঢোলকলমি আব কচুরির জঙ্গল দূব থেকে মাঠেব মতো দেখাচ্ছে'।

'তাহলে'?

'অশ্বত্থর বাঁ-কোণ ঘেঁষেই উঠতে হবে'।

কী সর্বনাশ! কিন্তু মজুন্দার দলের নেতা হিসাবে ফিবে দাঁড়াতে পারে না। সে গল্প জুড়ে দিল, 'আচ্ছা, বাপু, তোমাদের এই শুকনো জায়গাটার নাম পলদহ হল কেন? এখানে কি কোনোকালে পলা পাওয়া যেত'?

'আজ্ঞে, তা আমরা বলতে পারব না। তবে বর্ষার পর আশ্বিন, কার্তিক মাসে এখানে চিংড়ি পাওয়া যায়, এক-একটা এক পোয়ার ওপর'।

'তা বেশ। আচ্ছা তখন তো জল থাকে। জলে তো দাগ কাটা নেই, মাছ ধরতে ধরতে তোমরা পাকিস্তানেব চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ো না তো? নাকি তখন অশ্বত্থগাছের ছায়া দেখে সীমা ঠিক করো'?

'তা হবে কেন, গোটা বিলটাই তো হিন্দুস্থানে'।

গাদিপোতায় পৌঁছাল মজুন্দার। পরে সে শুনতে পেল, পলদহর দুপারেই গাদিপোতা, এপার গাদিপোতা, ওপার গাদিপোতা। একটি তৃতীয় গাদিপোতা তৈরি হয়েছে, পাকিস্তানি গাদিপোতা। অশ্বত্থগাছের গোড়ায় দুটি কৃষক গোরু বেঁধে দিচ্ছিল। লক্ষ্য করে মজুন্দার দেখল দুজনেই অশ্বত্থের ডানদিকে। মজুন্দারের গলা শুকিয়ে উঠল। বন্দুক-টন্দুক হাতে নেই তো। মজুন্দার বললে, 'আর দেরি নয়, সাইকেল চাপো'। যারা গোরু বেঁধে দিতে এসেছিল তারাও বোধ হয় মজুন্দাবকে আশা কবেনি। বলা বাহুল্য মজুন্দার দলপতি হিসেবে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসেছিল এতক্ষণ। গোরু ছেড়ে কৃষক দুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

ভট্টাচার্য বললেন, 'কী আজগুবি, দুজনই দৌড়ালে। কিন্তু বন্দুক দূবেব কথা, বর্শাফলা, ধনুক ব্যবহার কবলেই তো মারাত্মক হতে পারত। দৌড়ানোটা কি নিরর্থক হয়নি'।

মজুন্দার বলল, 'একেবারেই নিরর্থক নয়। গাদিপোতার হাটে পৌঁছতে সোয়া ঘণ্টা লাগাব কথা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল। পথে কিছু বিপদ হয়নি। একটিমাত্র ঘটনা ঘটেছিল'।

সঙ্গের লোকটি হাঁ হাঁ করে তেড়ে উঠেছিল। তার উদ্দেশ্য মজুন্দাব, সে-ই আগে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা সামান্যই, রাস্তাটা সেখানে একটা বাঁক নিয়েছিল, ফলে বাঁক ঘুবতে সামনেব চাকাটা একটু বেশি জায়গা নেয়াতে মজুন্দাবের সামনের চাকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছিল।

গাদিপোতার হাটের পরিস্থিতিটা খুব চমৎকার। বড় একটা খেলার মাঠের উপরে ইতস্তত ছড়ানো গুটিকয়েক তাঁবুর মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খড়ের ছোট ছোট চালা। পনেবো দিনে একদিন হাট বসে। চালাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় দোকানদারদের। ছোট দোকানদাববা খোলা আকাশের নিচেই বসে। মাঠেব এক কোণে মজুন্দারের কোম্পানির অফিস। মাটির দেওয়াল, টিনেব ছাদ। আভিজাত্য আছে। কিন্তু একসময় ছিল যখন হাটের আশেপাশে যতগুলি ঘর ছিল তার মধ্যে আভিজাত্য-গরিষ্ঠ ছিল মজুন্দার কোম্পানির আফিস। মজুন্দার দেখতে পেল তাদের আফিসের হাত ত্রিশেক দূরে প্রকাণ্ড একটা খড়ের আটচালা তুলেছে।

মজুন্দার সঙ্গেব লোকটিকে প্রশ্ন করল, 'ওটি কোন আফিস'?

'পেট্রোল'।

'সে কী, এখানে মোটর চলে নাকি'!

'সে পেট্রোল নয়। ধানচালের পাহারা'।

'তাই বলো, সরকারি আফিস'।

আফিসের স্থানীয় কর্তাকে ডেকে পাঠানো হল। সে এলে কাগজপত্তর দেখল মজুন্দার। এ লোকটি বেশ। অল্পবয়সি একটি ছোকরা। কাজকর্মে পলদহের মিঞার চাইতে কাঁচা। কাগজপত্রে কিছু ভুল বার হল, কিন্তু তার হাসিখুশি মুখ দেখে মজুন্দার সন্তুষ্ট হয়ে ভুলগুলি নিজেই শুধরে দিল। ছেলেটির পিঠে একটা বন্দুক বাঁধা। বেশ লাগল মজুন্দারের। এই রকমই তো চাই। বর্ডারের লোকদের তো এমনি

চেহাবাই হওযা উচিত। হাসিখুশি মুখ, বলিষ্ঠ চেহাবা, পিঠে বন্দুক বাঁধা। কাগজপত্তবে ভুলভ্রান্তি কিছু থাকাও স্বাভাবিক।

বিক তাব নিজেব কাজে গিযেছিল। সেই বলল, 'আহাবাদি এখানেই হবে'। বান্নাব বাসন পাওযা মুশকিল। তা হোক। স্থানীয কর্তাব উপবে মজুন্দাব এত খুশি হযেছে যে তাব বাডিতে খেতে আপত্তি নেই।

কাগজপত্তব উল্টে দেখতে দেখতে একটা সোবগোল কানে আসছিল। প্রশ্ন কবে মজুন্দাব জানল— ব্যাপাবটা বর্ডাব চেকিং। 'বর্ডাব চেকিং। এখানে কি কাস্টমস আফিস আছে'?

'না, স্যাব। ঐ পেট্রোলম্যানই চেক কবছে'।

ওকে চেক কববাব ক্ষমতা দিল কে'?

'কে দেয, স্যাব। এদিকেব মধ্যে ওই একমাত্র সবকাবি কমচাবী'।

এমন সময়ে বাইবে থেকে একটা ফোঁপানিব শব্দ উঠল। মজুন্দাব বাইবে এসে দাঁডাল। তাব সঙ্গে সঙ্গে উর্দিপবা বিক, এবং মজুন্দাব—কোম্পানিব স্থানীয কর্তা, তাব পিঠে বাঁধা বন্দুক।

দৃশ্যটা এই বকম কোম্পানিব আফিসেব পেছন দিকটায একসাবি লিচু গাছ। তাবপবই একটা টুপত্যকা। পাহাডেব অপেক্ষাকৃত উঁচু জাযগায দাঁডিযে একটা ক্রমশ ঢালু উপত্যকা দেখলে যেমন বোধ হয প্রায সে বকম অনুভব হবে সেই লিচু গাছগুলিব কাছে দাঁডিয়ে সবুজ মাঠগুলি দেখলে। এদিকেব জমিটা উঁচু। খানিকটা উপত্যকাব মধ্যে ঢালু জমি তাব ওপাবে, আবাব ক্রমশ উঁচু হযেছে জমি। আব সবটাই সবুজ ঘাসে ঢাকা।

লিচু গাছগুলিব নিচেই বাদানুবাদ চলছে। ওটি চাবেক পুরুষ ওটি সাত আট শিশু-বালক-বালিকা, তিনটি নাবী একপাশে, অপব পক্ষে চাব পাঁচজন পুরুষ। প্রথম পক্ষীযদেব মলিন বেশ, দুজনেব কাঁধে বাঁক। বাঁকেব থেকে ঝুলছে দুটি ধামা। ধামায কী আছে বোঝা যায না। মলিন কাপডচোপড, তাব চাইতেও মলিন কাঁথাগুলি চোখে পডছে। দুজন পুরুষেব মাথায ধামা। সেগুলি থেকেও ছেঁডাখোডা কাপডচোপড চোখে পডছে। মেযেগুলিব হাতে কাখে ছোট ছোট পুঁটুলি। একটি ছেলেব মাথায জডানো একটি পাটি। এ পক্ষেব একজনেব পবনে খাকি হাফপ্যান্ট ও সার্ট। অন্য কযেকজনেব বর্ণনা দেবাব মতো কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য নেই। তাদেব একজনেব নাম বিষ্টু ঘোষ তা মনে আছে মজুন্দাবেব।

দ্বিতীয পক্ষ বলল, সব মাল নামাও' ধামাগুলি, বাঁক দুটি পুঁটুলিগুলি সব জডো হল। নির্মম হাতে সেগুলি পবীক্ষা কবল। ধামাগুলিব একটিতে পাওযা গেল সেব দু তিন চাল। বিষ্টু ঘোষ ঢেলে বাখল। বিষ্টু ঘোষেব এক সাথী নির্মমভাবে একটা বাঁক। পডপড কবে টেনে ছিঁডে ফেলল।

'এই তোলো বাঁক যাও। বাঁকওযালা দুজন উপত্যকাব ঢালুতে গিযে দাঁডিযে এদেব জন্য অপেক্ষা কবতে লাগল।

একটি মেযেব ছোট পুঁটুলিটাব ভেতবে একটা ছোট কাঁসাব বাটি ছিল কলাপাতায মুখ বাঁধা। খোল বাটি'।

'কিছু নেই একটুক চিডে ভেজানো'।

'বটে? চিডে ভেজানো। ও যদি আফিম না হয কি বলেছি'।

'জে, কোলেব ছাওযাল আছে দুটে জল কোথায পাব, খাতে চাল বা দেব তাই জলে সলে দুটে চিডে ভিজায়ে নিছি'।

'হুঁ। ফাঁকিব আব জাযগা পাওনি। বাটিটা কাঁসাব ভালো কাঁসা। ওটাকে পাব কবতে চাও। বিষ্টু ঘোষ চিডেটা উপুড কবে ফেলে সঙ্গীব হাতে বাটিটা দিযে দিল।

হঠাৎ মেযেটি ঝবঝব কবে কেঁদে ফেলল চিডেব শোকে। মজুন্দাব লক্ষ্য কবে দেখল দেড বছব আব মাস দুযেকেব দুটি বোগা বোগা শিশু বোদে পুডে নেতিয়ে আছে দুজনেব কোলে।

একে একে সবাই পার হল। একটি মেয়ের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। যারা পার হয়েছিল তারা মেয়েটির জন্য দাঁড়াল না। মেয়েটি যুবতী।

'এই জামা খোল'। মেয়েটি অঁ অঁ করে কান্নার উপক্রম করল।

'চুপ করে বুবী। কী আর করছিস তাই বল? ওরা তোর কে, ওদের সঙ্গে যাচ্ছিস'?

মেয়েটি বোধ হয় সত্যি বোবা— হাত পা নেড়ে আঁ আঁ করে কী বোঝানোর চেষ্টা করল।

হঠাৎ মজুন্দারের রাগ হল। সে কোম্পানির লোকটির হাত থেকে বন্দুকটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, এই বাসকেল্‌রা'। বিষ্টুর দল হকচকিয়ে গেল।

'কে তোমাদের বডার চেক করার হুকুম দিয়েছে'।

'আজ্ঞে আজ্ঞে' বলে কী বলতে গেল লোকগুলি।

'ছেড়ে দাও ওকে'।

বিষ্টু কম লোক নয়। সে বললে, 'ও পাকিস্তানে গিয়ে মরবে, স্যার। কার হাতে পড়বে ঠিক কী? দেখলেন না, ওর সঙ্গীরা পর্যন্ত দাঁড়াল না'।

'ওরা ওর সঙ্গী নয়, তাই বোঝা গেল। ছেড়ে না দিলে খুন হয়ে যাবে। খুন হও আর না হও এখুনি আমি অ্যারেস্ট করব'।

বুবীকে ছেড়ে দিল। বুবা উপত্যকা বেয়ে দৌড়াতে লাগল। এবং বিষ্টুর দলের একজন লোক কিছুক্ষণ পরে উপত্যকার পথ ধরল।

বিষ্টু ডেকে বলল, 'এরফান, বকনাটাকে তেইড়ে দিস'।

এরফানের হাসির শব্দে বুবী থমকে দাঁড়াল। রাখাল যেমন গোরু তাড়ায় তেমনি বিকট শব্দ করল এরফান। বুবীটা বোধ হয় জড়বুদ্ধিও। মজুন্দারের মনে হল গোরু তাড়ানোর শব্দে বুবী ভুল পথ ধরে ছুটতে লাগল দলের দিকে না গিয়ে।

বিরু এসে বলল, আহারাদির পর যখন একটু বিশ্রাম করাও শেষ হয়েছে মজুন্দারের, 'আমাদের স্যার এবার ফিরতে হয়'।

'এত রোদে'?

'বেলা থাকতেই যেতে হয়। বর্ডার জায়গা, বেলা থাকতেই পলদহ যেতে হবে'।

'হ্যাঁ বটে, চলো', অশ্বত্থ গাছটার কথা আমার মনে ছিল না।

কোম্পানির লোকটি ভদ্রতার খাতিরে সঙ্গ নিল। খানিকটা যাবার পর সে ই প্রস্তাবটা উত্থাপন করল, 'স্যার একটু শিকার খেললে হয় না'?

'শিকার, এদিকে শিকার কোথায়'?

'ধানক্ষেতগুলিতে ভরই পাখি পড়ছে স্যার। এখনও ক্ষেতে চাষ পড়তে দেরি আছে, এ সময়ে ভরুই পাখির ঝাঁক পড়ে ক্ষেতে'

মজুন্দার ইতস্তত করতে লাগল।

মুখোটি মুখ খুলল, 'মজুন্দর তুমি হিপোক্রিট। বর্ডার পার হতে যার আতঙ্ক সে শিকারের কথায় ঐ পরিস্থিতিতে ইতস্তত করে না'।

ভট্টাচার্য বলল, 'মুখোটি, একটা দিক ভাবো। মানুষ মজুন্দারের মতো বোধশূন্যও হতে পারে। যখন গ্রামের লোকগুলির মুখ আতঙ্কে শুকিয়ে যাচ্ছে তখন নীরোর মতো বাঁশির অবতারণা করতে সবাই পারে [redacted] মরা-মরা খেলাও খেলতে পারে'।

[redacted] ক্ষেতে নেমে কোম্পানির লোকটি বলল আপনি প্রথম ফায়ার

করুন স্যার'।

'আমি? না, তুমি করো। চৈত্রমাসে আমি প্রাণীবধ কবতে চাই না'।

লোকটি চাব-পাঁচবাব ক্ষেত থেকে ক্ষেতান্তবে গিযে ফায়াব কবল, কিন্তু একটি পাখিও পড়ল না।

হঠাৎ মজুন্দার বলল, 'দেখি, দাও তো দেখি'।

মুখোটি বললে, 'দেখলে ভট্‌চায, এটার্ন্যাল মজুন্দাব। যখন দেখল বন্দুকওয়ালা শিকাব জানে না তখন মজুন্দাবের প্রাণীবধ না কবার প্রতিজ্ঞা আর বইল না। আনাড়ির সামনে নিজের স্বল্পবিদ্যা দেখানোর লোভ'।

মজুন্দার বলল : এমনি কবে শিকাব কবা ও এগোনো চলতে লাগল। একসময়ে দেখা গেল পথেব দুদিকে মাটি উঁচু। বোধ হয় পলদহব খাত বেয়ে চলেছে। কিছু চাষও হয়েছে এ অঞ্চলে পলদহব খাতে। বলতে ভুল হয়ে গেছে, ভরুই পাখিব কিছু কিছু বিরুর গলিয়াটায জমা হচ্ছিল। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকাব। ভরুই পাখিকে বসা অবস্থায ফায়ার করতে নেই। ঠিক যখন তাবা উড়তে শুরু কববে, সেই মৌমাছির ঝাঁকে গুলি ছাড়ো, পাখি পাবে। শব্দেই ওবা কাহিল।

অনর্গল বন্দুক ফোটানো চলল। ভরুই ক্ষেত ফুবালো তো হবতেলেব গাছ পাওয়া গেল। কিন্তু হরতেল গাছেব লালচে পাতাব আড়ালেও যেমন সবুজ পাতাব আড়ালেও তেমনি নিশানা কবা দুষ্কর। হবতেলেব পব জল পাওযা গেল। পলদহব জল। খেলনাব হাসেব মতো ছোট ছোট বুনো হাঁস ভাসছে। পাঁচটা ফাযাব করে একটা পাওয়া গেল সংগ্রহ করাব মতো।

কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কাব কবল মজুন্দাব- এ কোথায় এসেছে তারা। পলদহেব জল ধবে চলতে চলতে সামনে সাঁকো। আট দশ হাত দূরে কতগুলি বাড়িঘব খড়েব, দু-চাবজন লোক তাদেব দিকে অবাক হযে চেযে আছে।

সহসা বিরু বলল, 'সাঁকো পাব হন স্যাব'।

সপাবিষদ মজুন্দাব সাঁকোটা প্রায় ছুটতে ছুটতে পাব হল। সাঁকো পাব হয়ে পলদহর আগাছা ঢাকা খাত পেয়ে মজুন্দাব বলল, 'কোথায এলাম বিরু'!

'আজ্ঞে হিন্দুস্থান।'

'ওঃ তাহলে

'আজ্ঞে তাই। খুব বাঁচা গেছে।

পলদহব গ্রামেব পথে উঠে দাঁড়িয়ে মজুন্দাব একটা চুরুট ধবাল। প্রায় ত্রিশজন চাষী স্বল্প পবিসব পানসি নৌকোব পাটাতনে বসাব মতো গাদাগাদি কবে বসে আছে। বাস্তা বন্ধ। দুপাশে দুটি বাড়িব বাঁশেব প্রাচীব। দু-মাথায দুজন দুজন চাবজন সিপাই বন্দুক তাগ কবে দাঁড়িয়ে আছে।

বিওপিব কর্তা মজুন্দাবকে দেখতে পেয়ে বলল, 'গাদিপোতা থেকে ফিবলেন? আপনার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। বন্দুকেব শব্দ শুনছিলাম'।

বিষযটি জানা গেল। মজুন্দাব বিলেব জল ধবে চলতে চলতে পাখি শিকাবেব ব্যর্থ চেষ্টা কবছিল যখন, তখন তাব সেই অবিবাম গুলি চালনাব শব্দে পাকিস্তান গাদিপোতার লোকবা মনে করেছিল পাকিস্তান-সদর থেকে সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে। তারাও লাঠি কাস্তে নিযে সাঁকো পাব হয়ে চড়াও হযেছিল। এদিকে বিওপিব এবাও বন্দুকেব শব্দে ভীত হযেই ব্যাপাব কী দেখাব জন্য এসেছিল। ত্রিশজন লোককে এবা ধবে ফেলেছে।

মজুন্দাব হো হো কবে হেসে পথ চলতে লাগল। সেই বিওপিব উপবতলাব ঘবে। জামা জুতো খুলে বসতে না বসতে চা জলখাবাব এসে গেল তাব। শব কোম্পানিব স্থানীয কর্তা পথে লোক বেখেছিল স্যাবেব গতিবিধিতে লক্ষ্য বাখাব জন্য। চানেব জল সে ই ঠিক বেখেছিল। বিরু বলল, 'স্যাব

মাস্টার্ড নেই, সরষে খুব ভালো করে গরম জল দিয়ে একরকম তৈরি করছে। দেবে'?

'তা দিক'।

মুখোটি বললে, 'স্ক্যান্ডাল। এখনও মাস্টার্ডের কথাও ভোলোনি তুমি'?

মজুন্দার বললে . চা খেতে খেতে এ কথায় সে কথায় সেই মেয়েটির কথা উঠল—যাকে নাকি ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কোম্পানির নতুন লোকটি বলল, 'মেয়েটির নিজেরও দোষ আছে। কাউকে কেয়ার করে না। পুরুষমানুষের মতো নিরঙ্কুশ হয়ে ঘুরে বেড়ায়'।

'স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় তাহলে'।

'তাই-বা বলি কী করে স্যার, গ্রামের একটি লোকও সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না। বদ ছোকরাগুলিও তাকে বেশ মেনেই চলে। বছর দশেক আগে একবার একটা কথা উঠেছিল– তার বিয়ে হবে। ঢলাঢলির পর্ব নাকি চলছে বিয়ের আগে। কিন্তু কোথায় কী, সব মিথ্যে হয়ে গেল'।

'গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে তাকে'?

'তা করুক আর না করুক। তাকে নিয়েই গোলমাল। গোলমালের কারণই সে। তাকে ধরে নেবার জন্য হামলা, তার জন্যই গ্রামে এত উত্তেজনা'।

ওরা চলে গেলে বিরু বলল, 'আপনার ঘরের ওপাশে আর একটা ঘর আছে ঝাঁড়পোঁছ করে পরিষ্কার করছে। একজন সিপাহি বলল– ওটাকে কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তা করুক। আজ রাত্রিটা না করলেই হল'।

মজুন্দার বললে, 'আজ রাত্রিতে যদি করে, আর ঐ ত্রিশজন লোককে যদি রাখে তবে মুশকিলই করবে। তবে ওদের কোনো কাজ অমত করতে যেয়ো না। আমরা উট্‌কো লোক।'

রাত্রিতে আরেকবার আকণ্ঠ সুস্বাদু সুপক্ক আহারে পূর্ণ করে বিওপির ঝকঝকে আলোয় 'থেই' পড়ল মজুন্দার। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মজুন্দারের মনে হল পাশের ঘরে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ও রকম মনে হয় একা পোড়োবাড়িতে থাকতে।

মজুন্দার থামল।

মুখোটি বলল, 'ভ্রমণকাহিনী শেষ হল ?

মজুন্দার বলল, 'অনেক রাত্রে অনেক স্বপ্ন দেখে থাকে মানুষ। সে রাত্রিতে স্বপ্ন অনেকে দেখেছিল'।

মুখোটি বলল, 'তুমিও দেখেছিলে'?

মজুন্দার সে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছিল কে একজন ঘরের মধ্যে এল, আলোটা হাতে তুলে কমিয়ে দিল।

'তোমার মনিব্যাগ খোয়া গিয়েছিল'?

'তা যায়নি'।

মজুন্দারের পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তার মনে হল সেই কে একজন তার পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মজুন্দার চোখ খুলেও যেন তাকে দেখতে পেল। সেই অবগুণ্ঠনবতীর মুখখানা অন্যদিকে ফিরানো ছিল। মজুন্দারের মনে হল সে চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু তার মনে হল সে তো স্বপ্নই দেখছে। তার চিৎকার শুনে যারা আসবে তাদের কাছে কী বলবে! স্বপ্নর কথা? মজুন্দার দাঁতে-দাঁত চেপে প্রহরগুলি কাটাতে লাগল! কী অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন! অতগুলি প্রাণী বধ করার ফলই বোধ হয়। আর মশলা সংযুক্ত আহার্যের ফল। স্বপ্নের মধ্যে এসব তর্কবিতর্ক করল মজুন্দার।

স্টেশনে পৌঁছে সিগারেট ও কাগজ কিনে আনল বিরু।

বলল, 'আপনার পাশের ঘবে কেউ একজন ছিল স্যাব'?

মজুন্দাব চমকে উঠল।

'কাল আপনি শুলে সেই মেয়েটি এসেছিল। আমাদেব বন্দুক নিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়ার ফলে পাক-গাদিপোতার লোকবা, মানে যাব বাড়িতে তাকে আটকে বেখেছিল সে বাড়ির মেয়েরা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল। মেয়েটি বিওপির লোকদেব কাছে হাসতে হাসতে বলল—তাবা নাকি তাকে অলক্ষ্মী বলে গালিও দিয়েছে। অনেক গল্প কবাব পব মেয়েটি ওপাব-গাদিপোতায় ফিরতে চাচ্ছিল'।

বিওপির লোকরা তাকে উপরের কয়েদখানায় রাত কাটানোর জন্য অনেক অনুরোধ কবল। 'দেখি তো' বলে মেয়েটি অন্ধকারে বেবিয়ে গিয়েছিল।

মুখোটি বলল, 'তুমি একটি মহৎ মিথ্যাবাদী। তুমি কি বলতে চাও গল্পটাব কোথাও এতটুকু সত্যপ্রয়োগ আছে'?

মজুন্দার বলল, 'গল্পে সত্য থাকে না বলে তোমাদেব অভিযোগ উড়িয়ে দেযা যায়। কিন্তু তাব দরকার নেই। গল্পের মজুন্দারের সম্বন্ধে গল্পেব মধ্যে তোমবা যেসব উক্তি কবেছ সেগুলিও গল্পের অংশ বলে ধবে নেয়া যাক। নাটকেব স্বগতোক্তি যেমন, তেমন তোমাদেব উক্তি'।

ভট্টাচার্য বলল, 'মেয়েটিব অন্তবেব কথা তো আমবা বলতে পাবিনি। সে কি বীর্যশুল্কা'?

মুখোটি বলল, 'নাকি সেই তথ্য? সে নিজে থেকে যখন আসে তখন বরদাত্রী। জোব করে গেলে সবংশে নিধন'।

মজুন্দাব বলল, 'একটা স্বপ্ন না বলাব কী যুক্তি আছে? সবশুদ্ধ মিলে একটা ভ্রমণকাহিনী'।

মজুন্দার আবাব চুরুট ধবাল।

একাঙ্ক নাটক

রাঙাদি

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরোগ্য নিবাসের একাংশ। উত্তর দিকের সাদা বাড়িটা ইংরেজি 'এল অক্ষরের মতো। এই 'এল'-এর বাহুদুটির সন্ধিস্থলের কাছে এক বাহুতে একটি অপরটিতে দুখানি লাগালাগি এই ঘর তিনটি নিয়েই আমাদের মঞ্চদৃশ্য। ঘরগুলির সম্মুখে টানা বারান্দা, মার্বেলে তৈরি। ঘরের দেয়ালগুলি মেঝে থেকে ছ'ফিট পর্সিলেনে তৈরি, তারপর থেকে স্বচ্ছ কাচে। প্রত্যেক ঘরেই একটি করে দরজা, দরজার বাঁ পাশে একটি করে অনতিপ্রস্থ একপাল্লার জানালা। দরজা জানালার পাল্লাগুলিও পুরু কাচের। ঘরগুলির ভেতর থেকে পর্দা ফেলবার ব্যবস্থা আছে, দেয়ালের পর্দা ফেলে দিলে তখন আর বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরের কিছু দেখা যায় না।

ভোর হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রাত্রির শেষপাদে বহু পতঙ্গ ফিরে যাচ্ছে, বোধ হয় তাদের পাখার কম্পনে সাঁ সাঁ একটানা একটা শব্দ হচ্ছে। উঠানের মাঝখানে একটা বেদিতে যজ্ঞকুণ্ডের মতো আকৃতির একটা বাতিদান। বিদ্যুতের আলো আগুনের শিখার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বলছে।

ভোরের আলো মেশানো ধোঁয়াটে অন্ধকারে চারিদিকে আচ্ছন্ন। দুখানি ঘরের দেয়ালে পর্দা ফেলা। বাঁয়ের ঘরটির জানালার কাছটায় দেয়ালের পর্দা একপাশে সরে আছে। ঘরটিতে একটা আলো জ্বলছে। আলোটা গাঢ় নীল রঙের কিন্তু জ্যোতি খুব কম বলে ঘরের একটা অংশমাত্র দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে কাচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে ঘরের আলোকাঙ্কিত অংশটাকে একটি আঁশালো রেশমের বড় গুটির মতো মনে হচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে আলোর দিকে মাথা রেখে কে একজন শুয়ে আছে। শয্যার খানিকটা তার একখানি হাত। তার হাতখানিতে দৃষ্টি পড়লে সহসা চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। সারা গায়ে কাপড় টেনে দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে হাতখানি বুকের কাপড় ছুঁয়ে বুকের উপর লুটিয়ে আছে। বাঁধনখোলা ম্যাগনোলিয়ার দল, শুধু যে রঙ, শুধু যে গঠন তাও নয়, হাতখানি দেখে ম্যাগনোলিয়ার কোমল মসৃণতার কথাও মনে পড়ে যায়।

স্থূলাঙ্গী মেট্রন ও একজন নার্স প্রবেশ করলে, পেছনে ঝাড়ুদার।

নার্স — এখনও রাত আছে।

মেট্রন — তা থাক, তা থাক।

(ঝাড়ুদারকে) তোর কাজ তুই শেষ করেনে। কোথাও যেন এতটুকু ধুলো এতটুকু মাটি না থাকে। আজকাল তোর কাজ কর্মে মন নেই। কাল বারো নম্বরের দেয়ালে সিঁদুরের দাগ লেগেছিল। মেয়েটা সিঁদুর পরবে, মেঝেতে দেয়ালে দাগ লাগাবে, ওকে নিয়েই হয়েছে আমার জ্বালা।

ঝাড়ুদার যথাসম্ভব কম শব্দ করে বারান্দা ঝাড়তে আরম্ভ করলে।

ঐ দ্যাখ, দেখলি কাণ্ড ৮ নম্বরের? সারারাত ঘরে আলো জ্বলেছে, এখনও জ্বলছে। সারারাত জেগে মেয়েটা করে কী? নিজেরা তো বাঁচবেই না, আমাকে শুদ্ধ কৈফিয়তের তলায় ফেলবে।

দেয়ালের সুইচ টিপে আট নম্বরের আলো নিভিয়ে দিল। এবার আট নম্বর ঘরটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নার্স — আহা, বাঁচবে না কেন?

মেট্রন — দ্যাখ, রোজ সকালে তোর সাথে আমি এদের মরা বাঁচা নিয়ে তর্ক করতে আর পারিনে।

নার্স — তর্ক নয়, এরা বাঁচবে বলেই তো এত পয়সা খরচ করে এতসব তৈরি হল। এরা বাঁচবে।

মেট্রন : তৈরি হয়েছে সেটা আমিও দেখছি, কিন্তু ও কথাটা কি তুই নিজেকেই শোনাস রোজ সকালে—নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যে?

নার্স : কেন তবে এত অজস্র খরচ করে দেশের শ্রেষ্ঠ গুণী ডাক্তারদের এনে রাখা হয়েছে?

মেট্রন : এসব আমিও জানি, কিন্তু তোর চাইতে চাকরি আমার অনেক বেশি দিন হল। এদিকের এসব ঘরে কাদের রাখা হয়, তা আমি জানি। এখানে কিছু দিন থাকবার পর কী হয় তাদের তাও জানি।

(ঝাড়ুদারকে) ঐ দ্যাখ বাঁদিকে ওগুলি কী পড়ে রয়েছে কাগজের টুকরো, নয়? তুলেনে তোর হাতে করে।

ঝাড়ুদার বারান্দার অন্যত্র ঝাড়তে প্রস্থানোদ্যত হল।

একটু বেলা হলে আবার আসবি। দেয়াল-টেয়ালগুলি ভালো করে দেখে যাবি, দাগ-টাগ না থাকে।

ঝাড়ুদার ডান দিক দিয়ে প্রস্থান করলে।

নার্স : একটু দাগই তো, থাক না। মানুষ যেখানে থাকে তার চিহ্ন সেখানে একটু থাকলই বা। তোমরা সবকিছু স্টেরিলাইজ করে রাখতে চাও, সবকিছু থেকে জীবাণু তাড়াবার বাতিকে এমন গরম কবে তুলছ! মানুষ বাঁচে কী ক'রে।

মেট্রন : (অবাক হয়ে) তোর হল কীবে?

নার্স : দেয়ালে একটু দাগ লাগলে, মেঝেতে আলতা-পায়ের ছাপ পড়লে একটু কম ব্যস্ত হলেও চলে। ওরা সবসময়েই আড়ষ্ট হয়ে থাকে, সবসময়েই ওরা সন্ত্রস্ত। কেউ যদিবা এতটুকু স্বাভাবিক হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা কবেছে অমনি ছুটে এল সদাজাগ্রত তোমার সাফ-করনেয়ালাবা, ঘরদোর দোকানের মতো করে ফিটফাট করে সাজিয়ে দিয়ে গেল ; ওরা তখন লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিকক্ষণ নার্সের মুখের দিকে চেয়ে থেকে

নার্স : কী বললি?

নিজেব কথার জেব টেনে

মেট্রন : ঐ ঘরের ঐ মেয়েটার কথাই ধরো না। ঐ তো সবচাইতে বেশি নিয়ম ভাঙে তোমাদের, ওর ঘরেই দেয়ালে সিঁদুরের দাগ লেগেছিল, মেঝেতে আলতার ছাপ পড়েছিল।

মেট্রন : কী হয়েছে তার, কী করেছি তার আমরা?

নার্স : (আপনার চিন্তায় মগ্ন থেকে) কিন্তু কেন সিঁদুরের দাগ লেগেছিল, কেন আলতার দাগ পড়েছিল এ কেউ খোঁজ করে না। এরই মাঝে ওর জীবনের একটা বিশেষ তিথি এসে পড়েছিল কি না কে জানে। তাইতে পরেছিল আলতা ; আর দেয়ালে মাথা রেখে সে যখন এই দিনের কথা ভেবেছিল, সেই দাগ লেগেছিল দেয়ালে।

(হঠাৎ মেট্রনকে লক্ষ্য করে) কাল যখন তোমার লোকেরা তার ঘরের আলতার ছাপ মুছবার জন্য হৈ চৈ করছিল, তখন আমি দরজার পাশেই ছিলাম। দেখলাম হঠাৎ মেয়েটাব মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অথচ তার কিছুক্ষণ আগেও সে ঐ আলতার ছাপের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের মনের কথা বোঝা যায় না, কিন্তু কী করে মনে হল ওকে দেখে যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছি, মনে হল—ও অবাক হয়ে গেছে, যেন ওর নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না, মনে হয়েছে পুরনো দিনের কথা—যখন ওর নিজের ছাপ পড়ত অসাবধানতায়, যখন ওর স্বামী তা নিয়ে রঙ্গ করত।

মেট্রন : (অনুসন্ধী দৃষ্টিতে নার্সের মুখের দিকে চেয়ে) আমরা রোগীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি—

এই তবে তোর নালিশ? বল্, তাই কি না? ঐ দ্যাখ উত্তর দিতে পারলিনে। কী যে তোর নালিশ তা তুই নিজেও জানিসনে। (স্বল্প বিবতি) এমনি হয়বে, কিছুদিন এখানে থাকবার পর। শেষ পর্যন্ত মানুষ উদাসীন হতে শেখে, কঠিন হতে শেখে।

এদের কথার আড়ালে আর একজন নার্স এদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে এবার প্রথমা নার্সের গালের 'পর একখানা হাত রাখলে।

প্রথমা নার্স : কী যে মস্করা তোর দিন রাত, এমন চমকে দিয়েছিস।

দ্বিতীয়া নার্স : মুখ অমন গম্ভীর করে আছিস কেন, চুমু চাই? সারারাত জেগে এমন হাই উঠছে

পকেট থেকে সিগারেট ও দেশলাই বাব কবে প্রথমা নার্সকে একটা অফার করলে সে নিল না। তখন নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

প্রথমা নার্স : এত রাত জাগতে হল কেন, কোথায়?

দ্বিতীয়া : বারো নম্বরে।

প্রথমা নার্স খুব বাড়াবাড়ি নাকি?

দ্বিতীয়া : হয়ে গেছে—

প্রথমা : হয়ে গেল—ইস

দ্বিতীয়া : কাল সকাল থেকেই বাড়াবাড়ি চলছিল , একজন ডাক্তারও ছিলেন। ভোবের দিকে ওঁরা গেলেন। তারপরে দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হল। সাবারাত যা কষ্টটা গেছে কহতব্য নয়।

প্রথমা . (মেট্রনেব দিকে নীরবে চাইল) আর তোমাব ঘবে দাগ লাগাবে না।

দ্বিতীয়া · কিন্তু কাল এক আশ্চর্য ব্যাপাব ঘটল বে, বুঝলি. ও বোবা নয়।

প্রথমা · কথা ও বলতেই তবে খুব কম লোকেই ওব কথা শুনেছে। ওব সেই জানালার পাশে চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, লোক দেখলে পাগলেব মতো চাওয়া এসবের মানে যেন আজ বোঝা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়া . পিঠটা টাটাচ্ছে, সারারাত খাড়া বসে কেটেছে, (মেট্রনকে) সরানোর ব্যবস্থা একটা কোরো দিদি। চলি...

দ্বিতীয়া নার্স চলে গেল। স্বল্প বিবতি।

নার্স : এমনি অনিশ্চয়। কালও কেউ জানেনি, সহসা সব শেষ হয়ে যাবে।

মেট্রন : যাই এবার, এদিকেব ব্যবস্থা করতে হবে ; সময় নেই অসময় নেই—এই যাওয়া আর আসা।

মেট্রন বাঁ দিক দিয়ে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তভাবে বিপরীত দিক থেকে আধবয়েসি ডাক্তাব প্রবেশ করলে :

ডাক্তাব · হেম নয় খবর জানো? সব ক্যাবিনেরই—বিশেষ করে বারো নম্বরের? ভেবেছিলুম রাত থাকতেই আসব, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম চুপ কবে বইলে যে, কিছু ঘটল নাকি?

নার্স : বাবো নম্ববের রোগিনীটি মারা গেছে।

ডাক্তার : (কিছুক্ষণ চুপ কবে বইল)। বড় খারাপ সময় যাচ্ছে হেম। এরপরে আর একটি বোগীও আর আমার হাতে বাঁচবে না।

ডাক্তাব প্রস্থানোদ্যত হল।

নার্স : যাচ্ছেন?

ডাক্তার : অনেক আশা নিয়েই এসেছিলুম। মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? ভাবি, পালিয়ে যাই। এর বিষ আমাকেও আচ্ছন্ন করে দেবে। (একটু থেমে ম্লান হেসে ফিরে দাঁড়িয়ে) সেদিন

আবার মোহিত চিত্রকরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে আমার এই মহারাজ্যের ছবি এঁকেছে।

নার্স — আপনার বন্ধুরাই আপনাকে আরো বেশি হতাশ করে দেয়।

ডাক্তার — ওরা ঠিক বলে, হেম। এমন যে কল্পনাই করা যায় না। এত আয়োজন, বিজ্ঞানের এত একনিষ্ঠ সাধনা, সব যেন ওরা উপহাস করছে। ওরা যেন হতাশায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। যেন আমাদের প্রতি এতটুকু বিশ্বাস নেই।

নার্স — রোগতাপে মানুষ এমন হয়ে পড়ে।

ডাক্তার — (মলিন হেসে) যন্ত্রণা বাড়লেও কি এরা বুঝতে পারে না? আর্ত মূক প্রাণীর মতো শুধু মলিন চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আমি তো চাই এরা একটু স্বার্থপর হোক, অমন করে গা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা না করে স্বাভাবিক মানুষের মতো কাঁদুক ওরা, বলুক—ডাক্তারবাবু সারিয়ে দিন। ওরা ঠিকই বলে হেম। মোহিতের সেই বিষের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চরাচর, আর তার একান্তে স্থির মৃত্যুর অবসাদে লুটিয়ে পড়া মানুষের মূর্তিগুলি এরই যথার্থ প্রতীক।

নার্স — আমার জন্যে কোনো উপদেশ আছে? বিশেষ করে কারো উপরে নজর রাখতে হবে? দশ নম্বরে কাল রাত্রিতে যে নতুন রোগী এসেছে তার সম্বন্ধে?

ডাক্তার — নতুন? যত নতুনই হোক, আমি সবাইকে চিনি, এ কোন হতাশার কোন নিঃসঙ্গতার দেশ থেকে এল সেই খোঁজ নাও গে।

ডাক্তার মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ নির্বাত। তারপর ভোরের পাখি ডেকে উঠল। দু'একটা শালিক পথের বাঁকে ঠোঁট ঘসে কিচিরমিচির করে উঠল। দূরে কোথায় একটা দোয়েল লেজ নাচিয়ে শিস দিল একবার।

অন্ধকার তরল হতে হতে আলো প্রকাশ পাচ্ছে দু'একটা আলোর রশ্মি দেয়ালে এসে পড়ল। দেয়ালগুলি অভ্রের পাতের মতো ঝলসে ঝলসে উঠছে। ভেতর দিক থেকে যে পর্দা দিয়ে দেয়ালগুলি আগাগোড়া মোড়া এতক্ষণে তার রঙ বোঝা গেল। উঠোনের আলোটা এবার কারা নিভিয়ে দিল।

ন' নম্বরের ঘরের জানালার কাছে যে কালো ছায়াটা দেখা যাচ্ছিল এবার সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথমে জানালার পর্দাটা খানিকটা দুলে উঠল, তারপর কে সেটাকে ভেতর থেকে সরিয়ে দিল। ন' নম্বরের অধিবাসী কিশোরী। বহুদিন তেল না পড়ায় মাথায় এক রাশ চুল ফুলেফেঁপে রয়েছে। ঘুমের ঘোরে যাতে জট না পাকিয়ে যায় তার জন্য একটা সোনালি ফিতে দিয়ে চুলের ডগাগুলি কুড়িয়ে মাথার 'পরে তুলে বাঁধা। চুলের মাঝে তার মুখখানা দেখা যাচ্ছে—সে মুখ যত না সুন্দর তার চাইতেও অনেক বেশি করুণ। চোখের দৃষ্টিতে প্রভা নেই, তার 'পরে যেন একটা পর্দা পড়েছে—সেটা কান্নার কিম্বা মৃত্যুর বুঝবার উপায় নেই।

জানালা খুলেই প্রভাতের আলোর দিকে চেয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেল। এমনি সে তন্ময়, সহসা নার্সকে দেখতে পেলে না।

নার্স মুখ তুলে দেখল ন' নম্বরের কিশোরীকে। নার্স তার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল।

নার্স — কী হচ্ছে

কিশোরী — দেখছি।

নার্স — কী?

কিশোরী : ঐ বাড়িটার জানালায় বসে কে কাজ করছে। সারাদিন সারারাত কী পরীক্ষা যেন হচ্ছে ওখানে।

নার্স : ঐ অতদূরে? ওখানে ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা হয়।

কিশোরী . হ্যাঁ, ওখানে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

নার্স : আর কী ইচ্ছে করে তোমার?

কিশোরী : অনেক ইচ্ছাই করে।

নার্স . এখন কী ইচ্ছা হয়েছে?

কিশোরী · খানিকটা ঘুরে আসতে তোমার সঙ্গে।

নার্স . মিছে কথা, তুমি এসেছ বাঙাদির খোঁজ নিতে। তাই নয়?

নিঃশব্দে সলজ্জভাবে কিশোরী একটু ম্লান হাসি হাসলে।

কিশোরী . বাঙাদির সাথে কাল তোমার দেখা হয়েছিল?

নার্স : হ্যাঁ।

কিশোরী . রোজই দেখা হয়? তুমি খুব ভালো, তাই। রাঙাদি এখন ঘুমিয়ে আছে, তাই নয়? কাল বলেছিলে আমার কথা? বলোনি? আচ্ছা কেন তোমরা রোজই ভুলে যাও বলতো? কাল বাঙাদির দরজার বাইরে কত লোক এসেছিল। যাচ্ছ নাকি?

নার্স হ্যাঁ, সকাল হল এখন সবাইকে ওষুধ দিতে হবে, খাবার দিতে হবে।

কিশোরী তোমার খুব কাজ, নয়? আচ্ছা, একদিনও তোমাদের ছুটি হয় না?

নার্স হবে। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব বসে বসে। যাই আমি?

কিশোরী যাও। বাঙাদির ঘুম এখন ভাঙবে।

নার্স চলে গেল, কিশোরী তার জানালার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি সুদূরে ছড়ানো, কী ভাবছে সে। স্বল্পক্ষণ পরে দশ নম্বরের সাড়া পাওয়া গেল। সে ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তার গলা শোনা গেল। একটা কবিতা সে নিজেকে পড়ে শোনাচ্ছে

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
শার্সির পরে ঠোকর মারো এসে,
দেখো কোনো খবর আছে নাকি।

কিশোরীর মুখে বিস্ময়ের হাসি ফুটল, কী মনে করে সে ঠুকঠুক করে কাচের শার্সিটা একটু ঠুকল। দশ নম্বরের কবিতা একটু থামল, তারপর আবার সে পড়তে লাগল। কিশোরী আবার শার্সি ঠুকল। দশ নম্বরের অধিবাসী পড়া থামিয়ে শুনল খানিকক্ষণ। কবিতার লাইন গোলমাল হয়ে গেছে, শেষের দিকে আবার সে পড়তে শুরু করল

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুঃখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুপাত,
অভীক তোমার চটুল তোমার
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি,

সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি।

একটুখানি হাসি কিশোরীর মুখে ফুটে উঠল।

কিশোরী : কে আপনি? (নিস্তব্ধতা)

দশ নম্বরের কণ্ঠস্বর : আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

দশ নম্বরের পদশব্দ দেয়ালের কাছে এগিয়ে এল।

কিশোরী : এইতো এই ন' নম্বর ঘর থেকে। আপনি?

দশ নম্বরের কণ্ঠস্বর : কী করে বলব কোথায় আছি? কাল রাত্রিতে যখন এসেছি তখন নম্বর জিজ্ঞেস করে রাখিনি, আজ রাখব।

কিশোরী : বুঝেছি। আমারও এমনি হতো প্রথমে। এখন সব জানি, সব ঘরের নম্বর জানি ; কে কোন ঘরে আছে তাও জানি ; কোন ঘর থেকে কী দেখা যায় তাও বলে দিতে পারি। আচ্ছা বলুন দেখি আপনার ঘর থেকে কী দেখা যাচ্ছে?

দশ নম্বর : একটা বাগান—থলো থলো ক্রিসান্থিমাম ফুটে রয়েছে।

কিশোরী : ওদিকে নয়। দরজার দিকে (দেয়াল ঠুকে) এই দিকে।

দশ নম্বর : 'এদিকে সারা দেয়াল জুড়ে সবুজ ক্যানভাসের পর্দা স্ক্রু দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা।

কিশোরী : আপনি কিছু জানেন না ; পর্দা দেখে ও রকম মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। দেখুন ওর মাঝে বোতামের মতো আঁকা আছে, সেখানে দু-হাতে চাপ দিয়ে দু-দিকে সরিয়ে দিন।

দশ নম্বর · দিয়েছি।

এবার দশ নম্বরের অধিবাসীকে আমরা দেখতে পেলাম দীর্ঘ শীর্ণদেহ পুরুষ, মুখে ক্ষয়েব ছাপ এত স্পষ্ট যে সেটাই আগে দৃষ্টিতে পড়ে ; মাথার চুল বেশির ভাগ উঠে গেছে, যেটুকু আছে তাও অযত্নে রোগের অত্যাচারে লালচে হয়ে উঠেছে। চিবুকের কোলে ফরাসি ভঙ্গিতে ছাঁটা খানিকটা দাড়ি। পরনে নীল ডোরা ও সাদা গুল আঁকা সবুজ নাইট-গাউন, বাঁ হাতে বই ও জ্বলন্ত সিগারেট।

কিশোরী : অনেকটা খুলবেন না, ঠাণ্ডা লাগবে।

পুরুষ : তা লাগুক একটু। বেশ লাগে কিন্তু ভোরের এই বাতাসটা গায়ে মাখতে। পর্দা খুলেও কিন্তু বুঝতে পারছিনে আমি কোন ঘরে আছি।

কিশোরী : কী দেখতে পাচ্ছেন, বলুন তো। আচ্ছা দাঁড়ান আমি বলছি ; লাল রঙের সুরকির রাস্তাটা যেখানে বেঁকে গেছে সেই বাঁকটা দেখতে পাচ্ছেন?

পুরুষ : না।

কিশোরী : তবে বারো নম্বর নয়। আচ্ছা তিনটে শ্বেতপাথরের থাম দেখতে পাচ্ছেন? দূরের একটা সাদা বাড়ির। ঐ বাড়িতে ডাক্তাররা সারাদিন যন্তর নিয়ে ঠুকঠাক কী যে করে? থাম দেখতে পাচ্ছেন না—তিনটে—ঐ বাড়ির? বাঁ দিকেরটা সবখানি, আর দুটোর আধখানা ক'রে?

পুরুষ : একটা দেখা যাচ্ছে।

কিশোরী : একটা? তা হলে হয়েছে। আপনি আমার পাশের ঘরে আছেন। দশ নম্বরে।

পুরুষ : তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে পাশের ঘরে আছ, তবু দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কিশোরী : কী করে পাবেন, আপনার আর আমার মাঝখানের দেয়ালটা, কাচের নয়, কাচকড়ির।

পুরুষ পর্দার ফাঁক থেকে সরে গেল দরজার দিকে। দরজা টানাটানি করার শব্দ পাওয়া গেল, তারপরে পুরুষ আবার ফিরে এল।

পুরুষ : আমার ঘরের দরজা আঁট হয়ে বসে গেছে, বোধ হয় নতুন বার্নিসে ; কিছুতেই টেনে খুলতে পারলাম না। তোমারটা খুলে তুমি বেরিয়ে এস।

কিশোরী এবার হাসল।

পুরুষ : হাসলে তুমি? আমার গায়ে দরজা খুলবার জোর নেই বলে?

কিশোরী : তা নয়। সবাই প্রথমে এসে এ কথা বলে, বুঝতে পাবে না। দরজায় ওরা চাবি দিয়ে যায় তা কেউ বুঝতে পারে না।

পুরুষ : চাবি দিয়ে যায় কেন?

কিশোরী : এখানে তাই নিয়ম। বেলা দশটার সময় ওরা এসে দরজা খুলে দেয়। ভোরবেলা উঠে পাশের বাড়ির সন্তুর সঙ্গে খেলা করা অভ্যেস আমার, এখানে তা হবাব উপায় নেই। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘরে থাকতে হবে। একটুও ভালো লাগে না আমার। সকালবেলাতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, তারপরে ঠায় বসে থাকতে হয়। কোনো কাজ নেই, বিশ্রী, বিশ্রী লাগে। আর রাত্রিতে মাগো. কী ভয যে করে, মনে হয় বাগানের দিকে দেয়ালের বাইরে কালো কালো হেঁটে বেড়াচ্ছে। তখন বালিশে মুখ গুঁজে ফুপিযে ফুঁপিয়ে কাঁদি, মনে হয় পিঠে কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

পুরুষ এমনভাবে আটকে বাখে কেন?

কিশোরী : অসুখ যে।

পুরুষ তা তো হল। আমি কি পাগল. না চোব যে আমাকে এমন করে বন্ধ কবে রাখবে। আমি ওদের কাছ থেকে একদিন চাবি কেড়ে নিয়ে লুকিযে বাখব।

কিশোবী · তা হলে তো খুব ভালোই হয় (হাততালি দিযে হাসল)।

পুরুষ পর্দার ফাঁক থেকে সবে গিয়ে অদৃশ্য হযে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। কিশোবী দেয়ালে বাহু রেখে বাহুতে মাথা বেখে বাহিবেব দিকে চেয়ে চেয়ে কী ভাবতে লাগল।

পুরুষটির পাযচারির শব্দ পাওয়া যেতে লাগল। একটুক্ষণ পরে আবাব তাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে তার আগের জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়ে পর্দাটিকে টেনে দেয়ালেব প্রান্ত পর্যন্ত রেখে এল। এবার তাব ঘরের স্বচ্ছ দেয়াল দিযে ঘবের ভেতবটাও দেখা গেল। পাযচাবি থামিয়ে দেযালের কাছে ফিবে এসে

পুরুষ : ওবা আসতে আর কত দেরি কববে জানো? সকালে ওরা আসে না খাবার দিতে? তুমি ওখানে আছ নাকি?

কিশোরী : আমাকে বলছেন?

পুরুষ : হ্যাঁ। সকালে খেতে দেয় না এখানে?

কিশোরী : দেয়—আটটার সমযে। তখন ওরা আসবে. এখন ক'টা বাজে কে জানে।

পুরুষ · সারা দেশ রোদ্দুরে ভরে উঠল. এখনও কি ওদের আটটা হয়নি?

কিশোরী : ওরা দেরি কবে আসতে। রোজ ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায় আমার, এমনি রোজ ঠাণ্ডা দেয়ালে কপাল রেখে আমি লাল সুরকির ঐ পথটার দিকে চেয়ে থাকি। প্রথমে ডাক্তাররা আসে তাদের গাড়ি কবে, তাবা চলে যায় ঐ দিকের ঐ বড় ফটকআলা বাড়িটার দিকে। তারপব এক এক করে নানা পোশাক পরে অনেক লোক এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে। এক এক দিন বড় গাড়িখানা সাঁ করে বেরিয়ে যায়—কোথায় যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

ভাবি শুধু। তারপরে কুয়াশা কেটে যায়, একটু একটু করে রোদ চড়া হতে থাকে। তারপরে তার কত পরে আটটা বাজে—দেউড়ির পেটাঘড়িটাতে ; তখন তকমাপরা বাবুর্চিরা এসে ঘরে ঘরে খাবার দিয়ে যায়। তখনও আমি দাঁড়িয়ে থাকি। ভাবি, কতক্ষণে ছেড়ে দেবে আমাকে ; খেতে আমার ভালো লাগে না।

পুরুষ : এ রকম করে এদের কী লাভ—এই আটকে রেখে? (বিরক্ত হয়ে) বাহ্। (আবার পায়চারি করে বেড়াতে লাগল)। আচ্ছা, তোমার ঘর আর আমার ঘর কি একই রকম?

কিশোরী : কী করে বলব? আপনার ঘরের ভেতরে আমাকে কোনোদিন যেতে দেয়নি।

পুরুষ : (পায়চারি করতে করতে ঘরের জিনিসগুলি দেখতে লাগল) আচ্ছা তোমার ঘরে বড় খাট আছে?

কিশোরী : আছে। তার মাথার দিকে চিত্তির করা।

পুরুষ : কীসের ছবি? ফুলের?

কিশোরী : না। একটা ছোট মেয়ে ফুল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আপনার ঘরে আর কী আছে?

পুরুষ : একটা টেবিল পুবের জানালার ধারে, লিখবার প্যাড, দোয়াত কলম এইসব আছে তাতে।

কিশোরী : আমার ঘরে নেই তো! আচ্ছা আপনার ঘরে ছোট্ট একটা অর্গান আছে?

পুরুষ : আমি বাজাইনে, সেইজন্যে নেই বোধ হয়। তোমার ঘরের মেঝেও রঙ করা?

কিশোরী : হ্যাঁ, চকচকে সবুজ রঙের জমিতে নীল নীল ছোপ আর খুব ফিকে সোনালি রঙের চোখ সব আঁকা।

পুরুষ : ময়ূরের পাখার মতো?

কিশোরী : হ্যা, ঠিক তাই। আমি রোজ ভাবতাম, কীসের মতো ; কিছুতেই মনে হতো না। আপনার মেঝেতেও কি ময়ূরের পাখা আঁকা আছে?

পুরুষ : না। সারা মেঝে কালো কুচকুচে পাথরে তৈরি, দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ছবি দেখা যায় তাতে। আচ্ছা তোমার ঘরে একটা ছোট টেবিল আছে মাথার কাছে—যার 'পরে বই রাখে, জলের গ্লাস রাখে?

কিশোরী : আমি বই পড়িনে।

> পুরুষ কিছুকাল পায়চারি করে তারপরে বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে বিছানার মাথায় বসলে। বিছানার পাশে ছোট টেবিলটায় দু'একখানি বই, বইগুলির 'পরে একটা লোহার টুকরো চাপা দেয়া আছে। সে একসময়ে টেবিলের 'পর এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। একসময়ে একটা বই হাতে তুলে নিল, পর মুহূর্তেই সেটা নামিয়ে রাখলে। এবার অন্যমনস্কভাবে সে বই চাপা দেয়া লোহাটা তুলে নিল। হাতে করে সেটা নাচাতে নাচাতে তার দিকে তাকিয়ে কী ভাবলে—প্রথমে অন্যমনস্কভাবে তারপরে ক্রমশ একাগ্র দৃষ্টিতে লোহাটার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল। মস্তিষ্কে নতুন এক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে এমনসব রেখা ফুটে উঠতে লাগল—এবার সে উঠে দাঁড়াল, মুখের রেখাগুলি একত্রিত হয়ে বিস্ময়ের চিহ্ন হয়ে উঠল, তারপরে পুরুষ হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসি থামতে চায় না। কিশোরী তার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

পুরুষ : তুমি কি আছ ওখানে, শুনছ, ওগো আমার পাশের ঘরের লোক।

কিশোরী : আপনার অসুখ বেড়েছে?

> পুরুষ হা হা করে হাসতে লাগল।

কিশোরী : অমন করছেন কেন?

পুরুষ : আচ্ছা এই যে বাইরে যাবার ইচ্ছে, এ কি সবারই হয়—না শুধু আমাদের দু'জনের?

কিশোরী চাবি পায় না বোধ হয়।

পুরুষ কিন্তু আর কোনো ঘর থেকেই সাড়া পাচ্ছিনে, অনেক বেলা অবধি ঘুমায় সবাই। খুব অবাক করেছিল, ইস। (পুরুষ দরজার দিকে এগিয়ে যেয়ে হাতের লোহাটা চাবির ঘরে বসিয়ে ঘুরাল। দরজা খুলল না।) কী হল আবার। আশ্চর্য এতগুলি লোক এমন ভেড়া হয়ে আছে নিষেধ শুনে—একবার খোঁজও করে দেখে না চাবি আছে কি না।

পুরুষ দরজা ঠেললে।

কিশোরী আপনি কী করছেন? দরজা ভাঙছেন নাকি?

এবার পুরুষের হাতের চাপে—প্রথমে একটু তারপরে দরজার সবটাই ধীরে ধীরে খুলে গেল, পুরুষ অবাক হয়ে দরজা আর চৌকাঠ দেখতে লাগল—যেন দরজা খোলার রহস্যটুকু বুঝতে চেষ্টা করছে। বাহিরের বাতাসের স্পর্শে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে তারপরে প্রায় ছুটে বেরিয়ে কিশোরীর সামনে এসে দাঁড়ালে।

পুরুষ খুলে ফেলেছি, দরজা খুলে ফেলেছি, এই দ্যাখো এই লোহা দিয়ে। আরে তুমি এতটুকু। হ্যাঁ, দাঁড়াও খুলে দিচ্ছি, তোমার দরজাও খুলবে এই চাবিতে। সকলের দরজা খুলে দেব। এই বারান্দা দিয়ে যত ঘর আছে সব খুলে দেব।

পুরুষ কিশোরীর দরজায় চাবি দিয়ে ঘুরাতে লাগল।

পুরুষ খুলছে না তো। এইবার হয়েছে, বোসো তুমি একটু টেনে ধরো দরজাটা।

কিশোরী দরজার ওপারে এসে দাঁড়াল। এমন সময় কট করে একটা শব্দ করে চাবিটা পুরুষের হাতের মধ্যে ভেঙে এল।

পুরুষ সর্বনাশ।

কিশোরী কী হলো?

পুরুষ ভেঙে গেল চাবিটা, বোসো আমি বাইরে থেকে টেনে ধরছি তুমি একটু ধাক্কা দাও। হয়েছে, খুলেছে। (কিশোরীর দরজা একটু শব্দ করে খুলে গেল)।

কিশোরী (হাতে তালি দিয়ে সহসা থেমে গেল। আমি বাইরে যাব না।

পুরুষ কেন? এত কষ্ট করে দরজা খুলে দিলাম।

কিশোরী বাঙাদি বিরক্ত হবেন।

এদের কোলাহলে আট নম্বর ঘরেও নিদ্রা টুটে গিয়েছিল সে উঠে এসে দাঁড়িয়ে এদিকে দেখতে লাগল স্তব্ধ হয়ে। যেন সে উমার মতো তপস্বিনী। কিন্তু এরা বাস্তু অপপ্রত্যাশার পাওয়া মুক্তি নিয়ে, সেদিক লক্ষ্য করবার মতো সময় এদের হল না।

পুকষ বাঙাদি? কে তোমার বাঙাদি? চলো তাকেও তাঁকেও আমরা ডেকে বলব। তার দেয়ালের বাইরে আমাদের সাড়া পেলেই তিনি বাইরে আসবেন। তাঁরও একা লাগছে।

কিশোরী বাইরে এসে পুরুষের হাত ধরলে।

পুরুষ কোথায় থাকেন তোমার বাঙাদি?

কিশোরী ঐ তো ঐ ঘর (আট নম্বরের ঘরের দিকে দেখাল)।

পুরুষ চোখ তুলে চাইল। আট নম্বরের অধিবাসিনীর সাথে এক মুহূর্ত হয়তো দৃষ্টি বিনিময় হল, কিন্তু নমস্কারের জন্য উত্থিত পুরুষের যুক্তকর অর্ধপথে উঠবার পূর্বেই, মুখে প্রভাত সংবর্ধনার হাসি অর্ধের ফুটতেই আট নম্বরের অধিবাসিনী পর্দা টেনে দিয়ে মিলিয়ে গেল। পুরুষ কিছুক্ষণ পর্দার দিকে চেয়ে রইল তারপর কিশোরীর দিকে ফিরল।

পুরুষ তোমার বাঙাদি?

কিশোরী ছাই। বলুন না, আপনি দেখেছেন?

পুরুষ : হ্যাঁ।

কিশোরী : আর কোনো দিন তাকাবেন না ওর দিকে ; আড়ি ওর সাথে আমাদের।

পুরুষ : ওঁর সাথে কথা বলো না? কিন্তু আমি গেলে উনি যদি রাগ করেন?

কিশোরী : বয়ে গেছে উনি রাগ ক'রে থাকলে।

পুরুষ : এখন আমরা কী করব? চলো বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসি—অনেক দূর।

কিশোরী : না, বাপু, থাকগে ; রাঙাদি বকবেন ঠাণ্ডা লাগলে।

পুরুষ : আমার সঙ্গে গেলে কিছু বলবেন না। আমি রাঙাদিকে বুঝিয়ে বলব।

কিশোরী : সত্যি যাব? তা হলে ওঁকে বলে দেবেন বুঝিয়ে।

পুরুষ : হ্যাঁ নিশ্চয়, চলো।

কিশোরী হাত বাড়িয়ে দিল, পুরুষ তার হাত ধরে বারান্দার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালে। কিশোরী একবার ফিরে দেখল, রাঙাদি তার এই কুকর্মের সাক্ষী রইল কি না।

কিশোরী : আপনি সব পথ চেনেন ; ঐ লাল সুড়কির রাস্তাটা যেখানে শুরু হয়ে দেয়ালে মিশেছে সেখানটায় আমায় নিয়ে যেতে পারেন?

পুরুষ : কেন?

কিশোরী : দেখতাম একটুখানি, দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করে।

দুজনে বারান্দার প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্মব্যস্ত নার্স প্রবেশ করলে বিপরীত দিক থেকে, তার হাতে চার্ট ও কতকগুলি ওষুধের শিশি। এগারো নম্বর ঘরে ঢুকতে গিয়ে সহসা দশ নম্বরের খোলা দরজায় দৃষ্টি পড়ে অবাক হয়ে গেল। এগিয়ে এসে দশ নম্বরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখল। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে চোখে পড়ল ন' নম্বরের দরজার ভাঙা চাবিতে। এগিয়ে গিয়ে চাবিটায় হাত দিতে যখন দরজা খুলে গেল তখন সে বিস্ময়ের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। ছেলেমানুষের লুকোচুরিতে মানুষ যেমন না হেসে পারে না এদের পালানোতে তেমনি তার হাসি পেল। এবার সে শব্দ করে হেসে ফেলল।

পরের দিন সকালবেলা। ন' নম্বরের ঘরের গুটানো পর্দার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র আলোর রেখা ঘরের প্রায় সর্বত্র এসে পড়েছে। ঘরের মাঝখানটায় মেঝেতে কয়েকটা আলোর ধারা চারিদিক থেকে বয়ে এসে একত্রিত হয়ে যেন ছোট একটা তড়াগের সৃষ্টি করেছে। কিশোরী পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল সেই আলোর একপাশে। তার হাতে একটা বাক্স—ছোট ছোট মেয়েরা যাতে পুতুল রাখে—তেমনি। তার চোখে মুখে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ছাপ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বারবার তার সে চেষ্টা খানিকটা দুষ্টুমি ভরা হাসিতে পর্যবসিত হচ্ছে।

কিশোরী : রোসো এবার—দিচ্ছি পেতে ফাঁদ : এমনি ফাঁদ—সে ফাঁদ পাতত রাঙতাইদের ছোকরা মালি তার ঘরের জানালার তলে—যুঁই ফুলের কেয়ারির পাশে। তাকে তোমরা চেনো না, তার মতো ফাঁদ পাততে শিখেছি আমি—নিজে নিজেই। (বাক্সটা খুলে সে রাখল আলোর তড়াগের পাশে)। আর একটা আসছে, রোসো। (নিজের বুদ্ধির তারিফ করে সে মাথা দোলালো)। কালকে যেটা ধরেছিলাম তার গায়ে রঙ ছিল না বেশি ; ভেবেছ খুকি বোকা, ফাঁকি দেবে রোজ।

পুরুষ তার ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটু দাঁড়িয়ে দেখলে কিশোরী'কে, তারপর কিশোরীকে ডাকলে। কিশোরী চমকে উঠে দেয়ালের ওপারে পুরুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

কিশোরী : (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ।

পুরুষ : কেন? (নিচু গলায়)

কিশোরী : ফাঁদ পেতেছি।

পুরুষ : (চোখ বড় বড় করে চাইল) হুঁ।

কিশোরী : হ্যাঁ, এই দ্যাখো না, আলো ধরব।

পুরুষ হেসে উঠল।

কিশোরী : (আলো ধরার খেলা ছেড়ে দিয়ে) একটা পাখি এসেছিল।

পুরুষ : কোথায়?

কিশোরী : আমার দেয়ালের গায়ে যে লতাটা আছে, তাতে বসে দুলছে খুব কায়দা ক'রে।

পুরুষ : চড়ুই পাখি?

কিশোরী : না, টুনি একটা। আমি ছোট কিনা তাই টুনি। কিন্তু যে রকম কাচের দেয়'ল ও ভেতরে আসবে কী করে তাই ভেবে আমি সারা। আমার ঘরের ছাতের কোণায় বাসা বাঁধবে না তবে?

পুরুষ . ও ঠিক চলে আসবে দেখে নিও।

কিশোরী : আজ আপনার চড়ুই এসেছিল?

পুরুষ : না।

কিশোরী : তবে তো খুব মুশকিল হল।

পুরুষ : মুশকিলই তো. খুব মুশকিল।

কিশোরী : কালও আসবে না।

পুরুষ · আসবে নিশ্চয়, দেখে নিও। আসবে না?

কিশোরী : আচ্ছা, ও সকলের কাছেই যায়? বাঙাদিব কাছে যাবে?

পুরুষ : না।

কিশোরী : বাঃ। কাল বললেন যায়।

পুরুষ : যায় বইকি। সবাই দেখতে পায় না। যাদের খুব একা একা লাগে তারাই দেখতে পায়। তুমি বাইরে আসবে না?

কিশোরী : হ্যাঁ। বাগানে বেড়াতে যাব। জুতো পরব না। খালি পায়ে ভিজে ঘাসের উপর দিয়ে একটুখানি দৌড়ে আসব। দেবেন আমায় দৌড়তে? কবে থেকে যে দৌড়ইনে।

পুরুষ · আজ নয়, কাল ঠিক দৌড়তে দেব। রাত্রিতে জল হয়েছে, সব ঘাস ভিজে আছে। আজ আমরা দুজনে বসে চড়ুই পাখির গল্প করব।

কিশোরী দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতে

কিশোরী : এহ্, তা হলে আমি যাব না। আপনি একেবারে রাঙাদির মতো। রাঙাদিও বলে ঠাণ্ডা পড়েছে, বেরিও না। তার চাইতে আমি ঘরে বসে বসে আলো ধরি গে। জানেন, আমার বাক্সে অনেক আলো ধরা আছে ; কিন্তু ভারি মুশকিল হয়েছে —সবগুলোর একরকম চেহারা, এমন মুশকিল চিনতে পাবি না যেন।

পুরুষ . এস, আমরা বসি এখানে. আলো ধরার গল্প করি।

কিশোরী : আরে, কে দিয়ে গেল এটা? (বারান্দার ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে)

পুরুষ : ওরা। আমি আর তুমি বসব বলে।

কিশোরী : তা হলে তো দুটো দিত, একটা কেন?

পুরুষ : আমি বললাম, একটা দিও, আমার খুকি চেয়ারে বসতে ভালোবাসে না—আমার চেয়ারের হাতলে বসতে ভালোবাসে। (ইজিচেয়ারেব চওড়া হাতল দেখিয়ে)। এখানটাতে বসবে তুমি। (পুরুষ চেয়ারে বসল)।

কিশোরী : তাই কখনও বসে!

পুরুষ : আমি বললাম—ও তো শুধু খুকি নয় একটা, ও আমার ভোরের চড়ুই পাখি। পাখিরা হাতলে বসে দুলতে ভালোবাসে।

কিশোরী : আমি বুঝি পাখি? (খিলখিল করে হেসে উঠল) তা যেন হল ; যদি রাঙাদি এখন আসেন, কোথায় বসবেন? ঐ হাতলটায় বুঝি? বাহ্।

পুরুষ : (হেসে) তোমার রাঙাদিকে তো আমি ডাকিনি, তবে তিনি আসবেন কেন?

কিশোরী : (হাতলে বসে দোল খেতে খেতে, নিচু গলায়) রাঙাদির দরজাও ওরা খুলে দিয়েছে, নয়? হঠাৎ যদি দরজার কাছে এসে উনি দরজাটা ঠেলে দেন একবার—যদি দরজা খুলে যায়? উনি ভেবেই পাবেন না রোজ দরজা বন্ধ থাকে আজ কী করে খুলে গেল। আচ্ছা, ডাকব একবার রাঙাদিকে? বলব—ও রাঙাদি, দরজাটা একটু ঠেলা দিয়ে দ্যাখো, বলি?

পুরুষ : তোমার রাঙাদির দরজা ওরা খুলে দেয়নি।

কিশোরী : ওঁর বুঝি বাইরে আসতে ইচ্ছা করে না? ওঁকেও বাইরে আসতে দেয় না কেন?

পুরুষ : বললাম ওদের, রাঙাদির সাথে খুকির ঝগড়া।

কিশোরী : এমা! ঝগড়া কোথায় গো? তুমি খুলে দাও না রাঙাদির দরজা। দেখেছ তোমাকে আমি তুমি বললাম ; রাগ করবে না?

পুরুষ : একটুকুও না।

কিশোরী : খুব ভালো তুমি। আচ্ছা, ওরা আমাদের দরজা খুলে দিল কেন? আমাদের অসুখ সেরে গেছে বলে?

পুরুষ : ভয়ংকর যুদ্ধ হল যে, বললাম—আমার ঘরে একটা আলনা আছে তার কাঠ দিয়ে তরোয়াল বানিয়ে তোমাদের টুকরো টুকরো করে দেব। ওরা তখন করলে কী—হাতজোড় করে বললে, মহারাজ রক্ষে করুন, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

কিশোরী : কোথায় যুদ্ধ হল, আকাশে?

পুরুষ : হ্যাঁ, কালকের সেই রাঙা মেঘটায় আমি চড়ে বসলাম ঘোড়া করে।

কিশোরী : তারপর?

পুরুষ : আমি বললাম—তবে দাও খুলে দরজা।—আমার আর খুকির ঘরের ; আমরা যখন ইচ্ছা হয় বেড়াব।

কিশোরী : দিল খুলে। (হেসে উঠল) কাল ওদের বলবে রাঙাদির দরজা খুলে দিতে? বোলো তখন কেমন? আমাকে একটিবার তোমার ঘরের ভেতরে যেতে দেবে?

পুরুষ : নিশ্চয়, এখন যাবে?

কিশোরী : আমি দেখে আসি তোমার ঘরের ভেতরটা, আমার ভয়ানক দেখতে ইচ্ছা করে, তুমি বোসো। আমাকে না নিয়ে বাগানে যেয়ো না কিন্তু।

পুরুষ : আচ্ছা।

কিশোরী প্রস্থান করলে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল।

পুরুষ : হয়ে গেল দেখা? তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারো। এরপরে তোমার ঘরে আমি বেড়াতে যাব। এখন নয়, বিকেলে।

কিশোরী : সে তো খুব ভালোই হয় তবে।

পুরুষ : তোমার আলো-ধরা বাক্সটা আমায় দেখতে দেবে? ওটা কী হাতে? কী লুকাচ্ছ পেছনে?

কিশোরী : বলো তো কী?

পুরুষ : কী করে বলব?

কিশোরী : এমা, এ যে তোমার টেবিলের 'পরে ছিল। এই দ্যাখো না।

পুরুষ : ও যে ছবি, ছবি এল কী করে আমার টেবিলে?

কিশোরী : নিজে এঁকে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

পুরুষ : আমি আঁকলাম! কখন? আচ্ছা বলো তো ওটা কার ছবি?

কিশোরী : কী করে বলব, ওটা কার ছবি? আমি তো দেখিনি।

পুরুষ : সত্যি দ্যাখোনি? ঠাট্টা করছ? তোমার রাঙাদির মতো নয় দেখতে?

কিশোরী : রাঙাদির ছবি! (স্বগত) এই বকম! যাহ্।

পুরুষ : হ্যাঁ গো, ঐ তো তোমার রাঙাদির ছবি।

কিশোরী : না, ওটা আমার রাঙাদির ছবি নয়, তুমি আঁকতে জানো না।

পুরুষ অবাক হয়ে কিশোরীর মুখের দিকে চাইল।

কিশোরী : ও তো রোগাটে লম্বা একটা বড় মেয়েব ছবি। আমার রাঙাদি ও বকম হতে পারে না। আমার রাঙাদি ওর চাইতেও সুন্দর। কতকটা আমার কাকিমার মতো। রাঙাদি আমার দিকে চেয়ে সবসময়েই মিষ্টি করে হাসেন। কই, ছবিতে তা আছে? আমার জ্বর হয়। রাত্রিতে ঘুম হয় না, খুব ভয় করে, খুব কষ্ট হয়, মনে হয় এক ছুটে রাঙাদির কাছে চলে যাই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাঙ'দিকে ডেকে ডেকে কাঁদি। আচ্ছা আমি কি রাঙাদির মতো বড? রাত্রিতে জ্বর হলে, ঘুম না হলে অত বড় মস্ত বিছানায় একলা ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে ভয় কবে না বুঝি? আচ্ছা, আমি কি রাঙতাই এর চাইতেও বড? বাঙতাইকে তুমি চেনো না। কী কবে চিনবে—সে আমার কাকার মেয়ে। আমি বোজ সকালে উঠে কাকিমার ঘবে যেতাম বাড়িতে থাকতে, দেখতাম রাঙতাই কাকিমার কাছে শুয়ে আছে কাকিমাব বুকের মধ্যে মুখ দিযে। ...আব কাকিমা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এক একদিন আমার খুব ইচ্ছা হতো—অমনি করে বুকের মধ্যে মুখ রেখে শুয়ে থাকতে আমাব খুব ভালো লাগে। একদিন আমি কাকিমার কাছে শুযেছিলাম—জ্বর হযেছিল আমার। আমি সেদিন তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রেখেছিলাম আমায়। এত ভালো, এত নরম, এত মিষ্টি। এখন যখন জ্বর হয তখন ভাবি আমাব রাঙাদি আসবেন। সত্যি এটা রাঙাদির ছবি? কই তবে এসব ছবিতে?

পুরুষ : আমি ভালো আঁকতে পারিনি।

কিশোরী : পারো তুমি? দেবে এঁকে মত করে?

পুরুষ : দেব!

কিশোরী : কিন্তু..

পুরুষ : কী?

কিশোরী : জানো আমাব যখন এক একদিন জ্বব হয, আমি বিছানা থেকে উঠে যাই, রাঙাদি আর আমার ঘরের মাঝে যে দরজা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। খুব আস্তে আস্তে ডাকি রাঙাদিকে। রাঙাদিও উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ঘবে তাঁর দেয়ালেব কাছে। আমায় বুকে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আসতে পারেন না, দরজা ওরা বন্ধ করে দেয়। ওদের কি একদিনও ভুল হতে নেই, ভুল কবে রাঙাদির ঘবেব চাবি ফেলে যেতে পারে না।

পুরুষ : তোমার রাঙাদি সাড়া দেন না?

কিশোরী : আমি দরজায় মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকি, তবু সাড়া দেন না। শুধু ওপারে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমিও যেতে পারিনে, মাঝখানের দেয়ালের জন্যে। দেখতেও পাইনে—

রাঙাদির ঘরের কাচকড়ির দেয়ালে। এসব দেবে তুমি এঁকে।

পুরুষ বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

কিশোরী : কী ভাবছ, রাগ করেছ? ঐ যে বললাম রাঙাদির মতো হয়নি, তাই? দেবে আমাকে এই ছবিটা?

পুরুষ কিশোরীকে তার বুকের পরে টেনে নিল ; কিশোরীর মাথা তার বুকের 'পরে রেখে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিশোরী কিছুক্ষণ নীরবে সে সুখ অনুভব করল।

কিশোরী : (হঠাৎ মাথা তুলে) যাহ্—তুমি বুঝি আমার বাবা। রাঙতাই-এর বাবা তো রাঙতাইকে এমনি ক'রে আদর করে।

পুরুষ : কেন? আমি তোমার বাবার বন্ধু যে।

কিশোরী : তা কী করে হবে? তুমি আমার বাবাকে দেখেছ কখনও? আমার বাবাকে কেউ দেখেনি। কাকা বলেন আমার বাবার কথা, কিন্তু আমার শুনে হাসি পায়—খুকির বাবা ও রকম হবে কী করে। ওরা বলে—বাবার অসুখ করেছিল আমার মতো। আমি বলি—কেমন করে হবে? আমার বাবা কত বড় ছিল, কত জোর ছিল তার গায়ে ; তিনি তো ছোট ছিলেন না আমার মতো। অবাক হয়ে কী যে ভাবো কথায় কথায়! সত্যি, দেখেছ তুমি আমার বাবাকে? আমার মাকেও দেখেছ?

পুরুষ : (অপ্রতিভ হ'য়ে) তুমি দ্যাখোনি?

কিশোরী : কী করে দেখব? কেউ তাঁদের দেখতে পায় না। আমি রাঙতাই-বাবাকে বাবা বলতাম ছেলেবেলায় ; সে তো আমার কাকা। তোমার বুকে ব্যথা লাগছে। হ্যাঁ, আমি জানি, লাগছে। আমাদের সকলের বুকের মধ্যে ঘা হয়ে গেছে। তার জন্যেই কষ্ট হয়।

কিশোবী ছাড়া পেয়ে সোজা হয়ে বসল।

পুরুষ : এতসব কথা তুমি কোথায় শেখো?

কিশোরী : আমি ভাবি, বসে বসে ভাবি শুধু।

পুরুষ : ভেবে কাজ নেই। তার চাইতে তোমার আলো-ধরা বাক্সটা নিয়ে এস, আমি দেখি। কাল কোন আলোটা ধরেছ আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে।

কিশোরী : কালকের আলোটা একটুকুও ভালো নয়। তুমি ডাকলে যখন তখন ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসেই দেখি কিনা ঘরের কোণটায় যেখানে বুড়ি মাকড়সাটা জাল পেতে বসে থাকে সেই তেপান্তরের ডাইনির মতো, সেখানে একটা আলো পড়েছে ওর জালে।

পুরুষ : সেইটে ধরেছ? কী করে যে আলো ধরো তুমি আমি ভেবেই পাইনে।

কিশোরী : সে বুঝি খুব কঠিন কাজ? আমি নিজে নিজেই শিখেছি। আলো বুঝি সত্যি সত্যি ধরা যায়? আমি মেঝেতে বসে খেলি রোজ আলো-ধরা খেলা।

পুরুষ : কত খেলাই না তুমি জানো। একা একা বসে রাতদিনই এইসব খেলো?

কিশোরী : তা কেন হবে? আমার ঘরে কত জিনিস আছে, এত কোথাও নেই। একটা বুড়ি মাকড়সা আছে, জানো, সেটা যেই রাগ করে অমনি ইংরেজি বলে।

পুরুষ : এ তোমার মিছে কথা—মাকড়সা কখন ইংরেজি বলে, কথা বলতেই শেখেনি।

কিশোরী : ভারি তো জানো তুমি। মাকড়সাটা নিশ্চয় কোনো সাহেবের জামার ভাঁজে লুকিয়ে এসেছিল। না হলে ও ডব্লিউ, এক্স এসব শিখবে কোথায়? চুপ করে বসে আছে, যেই বাতাস লাগল, একটু ছিঁড়ে গেল জালটা অমনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে সাদা একরাশ ডব্লিউ আর এক্স লিখে দেয় পাশাপাশি। ভারি বোকা ও, ভাবে অনেকগুলি ডব্লিউ আর এক্স লিখলেই কঠিন কথা তৈরি হল। তৈরি হয়তো হয়, ও কখনও তার মানে বুঝতে

পারে? আমিই বুঝি না। বসে বসে দেখি আর ভাবি—কী লেখে এত। সর্বনাশ! ঐ শোনো।

পুরুষ : কী?

কিশোরী : রাঙাদি জেগে আছেন, পায়ের শব্দ পেলাম।

পুরুষ : তাই নাকি? আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না—তুমি যদি দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকো রাঙাদিকে।

কিশোরী : রাঙাদিকে? যদি রাঙাদি আসেন, তবে? কী বলবে তাঁকে তুমি, রাঙাদি? তা কী করে হবে? ও তো আমার রাঙাদি শুধু। ডাকব?

পুরুষ : হ্যাঁ, বলবে—রাঙাদি, ওঠো, ভোর হয়েছে। তোমার সাথে আজ থেকে আবার ভাব হল, কথা বলতে এসেছি।

কিশোরী : আর রাঙাদি যদি আমায় চিনতে না পারে, যদি ভুলে যায়? তখন বলব—এ যে আমি, রাঙাদি, তোমার সাথে আমার কতদিনের আলাপ, তুমি যেন কিছুই জানো না। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার থেকে রোজ ডাকতাম তোমায়—তাও জানো না তুমি। বলব?

পুরুষ : হাঁ, তাও বল।

কিশোরী যাহ্, তাই কখনও হয়। রাঙাদি যদি কথা না বলে, যদি শুনতে না পায়?

পুরুষ : তুমি ডেকে দ্যাখো।

কিশোরী . তুমি একটিবার ডেকে দাও না।

পুরুষ : না। তুমি নিজে ডাকো।

কিশোরী : ডাকব? যাহ্।

কিশোবী উঠে যেয়ে আট নম্বরেব দরজাব কাছে দাঁড়িয়ে কী শুনল যেন কান পেতে, তারপবে আস্তে আস্তে ফিবে এল।

সত্যি ডাকা যায়? ওঁব কাছে তো শুধু পণ্ডিতরা আসে।

পুরুষ কী হল, সাড়া পেলে না?

কিশোরী দিয়েছে।

পুরুষ : কখন? বাহ্, আমি শুনতে পেলাম না। আবার ডাকো। আমি শুনব। (কিশোবীর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল)।

কিশোবী . কথা বলে না, কথা বলে না। সাড়া দিতে জানে না রাঙাদি ও আমায় চেনে না, চিনতে পারে না কোনোদিন। আমার বাঙাদি ও নয়। উনি বুঝতে পারেন না। কোনোদিন পারেন না কে খুকির রাঙাদি। (কিশোবীর গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এল)।

পর্দা নেমে আসে।

বচনাপ্রসঙ্গ

কে ন লি খি

একই শিবোনামে দুই ভিন্ন সময়ে দুটি লেখা একত্রে গ্রথিত হল। পবেশচন্দ্র সোম সম্পাদিত সাহিত্যসভা ভবন, কোচবিহাব থেকে 'কোচবিহাব সাহিত্যসভা পত্রিকা', ১ ১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬ [1959] সংখ্যায় প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ সুভাষ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'কেন লিখি', কলকাতা মিত্র-ঘোষ, ২০০০-এ প্রকাশিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ কবার, বিভিন্ন আলাপচাবিতায়, এমনকী প্রবন্ধেও অমিয়ভূষণ এই নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁব ভাবনা ব্যক্ত কবেছেন। বর্তমান সংযোজন তাঁব দুটি আলাপচাবিতা থেকে উদ্ধৃত হল।

আমাব বাল্য, কৈশোব, প্রথম যৌবন—এক সমপাতনেই বলা যায়—অবিদ্বিষ্ট ধনেব অভাবে, ভাষাব সুচাকতায়, পবিবেশেব সৌন্দর্যে কেটেছিল। জীবিকা ধবেই, জল থেকে তোলা মাছেব মতো হয়েছিলাম। এই বকম অবস্থায় আমি কে, কোথায় আমি, অনেকেবই এ বকম মনে হতে পাবে। এ অনুভূতিগুলোকে মনে বেখেই একবাব 'কেন লিখি' এই প্রশ্নেব উত্তব নিজেব কাছে দিতে গিয়ে লিখেছিলাম—লিখি নিজেকে আবিষ্কাব কবতে। কিন্তু প্রশ্নটা প্রায় পঞ্চাশ বছবেব শিল্পীজীবনে নিজেকে কবেই চলেছি। এই নিজেকে আবিষ্কাব কবা কথাটা বেশ গোলমেলে। তাব মধ্যে এ বকম একটা ভাব থাকে, আমি এই পবিবেশেব নয়—এই কুৎসিত, বিদ্বিষ্ট, নিবানন্দ অল্পপ্রাণতাব সঙ্গে আমি এক নই। এটা অবশ্য একবকমেব পলায়ন এবং নেগেটিভ। পবে একসময় বুঝতে পাবলাম, পলায়ন বটে, কিন্তু অন্যবকম।

আবাম বলে একটা কথা আছে না? আব বিবাম বলে একটা কথা আছে। বিবাম, এব অর্থ হচ্ছে আমি আব হাঁটব না, আমি আব চলব না। এই যেখানে বিবামেব বিন্দু লাভ হয় শিল্পকর্মে সেখানেই ইস্‌থেটিক ডিলাইট আসে। জটিল উত্তব হল। মানুষেব সবচাইতে সুখেব সময় কোনটা? ঘুম। আমবা ঘুমুতে ভালোবাসি। আমাব নিজেব ধাবণা আমবা জন্মেব প্রথমেই যেটাকে পাই সেটা হচ্ছে ঘুম—মায়েব জঠবে, পবম আবামে, ভবশূন্য অবস্থায়, যেখানে আমাকে খাবাবেব কথা ভাবতে হয় না, যেখানে আলো কখনও কড়াও হয় না অন্ধকাবও হয় না, সেখানে আমবা পবম আবেশে ঘুমিয়ে থাকি। আব সেইজন্যই পববর্তীতে মানুষ না ঘুমিয়ে পাবে না। এই ঘুমেব প্রতি যে আগ্রহ শুধু ফিজিক্যাল নয় মনেব যে আগ্রহ আছে আমাব মনে হয় সেই অভ্যাসেব ফল। এখন দ্যাখো, এই যে ভাবশূন্য অবস্থায় আমবা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন তো ঘুমিয়েই থাকি। কিন্তু যখন জেগে থাকি? কিছুতেই এই ভাবসাম্য অবস্থা পাওয়া যায় না। আমাদেব চাবিদিকেব সময় যে সময় ধিকধিক কবছে, কাঁপছে, ভাঙছে সমস্ত কিছু এই সময়েব মধ্যেই লক্ষ্য কবলে আমবা দেখব এই সময়েব শিকল থেকে কিছুতেই বাঁচাব উপায় নেই। কিছুতেই আমাব জাগ্রত মন এমন একটা বিন্দু পায় না যখন আমি বলতে পাবি আমাব জাগ্রত মনটা ঘুমিয়ে আছে। আমবা সবসময় কাজ কবছি চিন্তা কবছি কিন্তু যেজন্য আমাব শবীব ঘুম চায় মন ঘুম চায় এটা তো সেই মাতৃজঠবেব স্মৃতিব বশে অভ্যাসেব বশে, তেমনি মানুষ সবসময় এমনকী তাব জাগ্রত অবস্থাতেও, এমনকী কর্মশৃঙ্খলাব মধ্যেও এস্‌কেপ কবতে চায়। মানুষ ঘুমুতে চায়। আমবা এস্‌কেপিজমটাকে খুব গালাগালি কবি। মানুষ এস্‌কেপ কববে? মানুষ এস্‌কেপিস্ট হবে? ছিঃ। আচ্ছা, আমি যদি এবাব প্রশ্ন কবি—সবচাইতে দুর্দান্ত যে বৈজ্ঞানিক, সবচাইতে বলিষ্ঠ যে সমাজসেবী তাব যখন ঘুম হয় না সে ঘুমেব বড়ি খায় কি না? সে প্রবলেম্‌স অভ লাইফ থেকে ক্ষণিকেব জন্য হলেও সবে যাওয়াব চেষ্টা কবে কি না? কবে। ঘুমেব বড়ি খায়। তাহলে এস্‌কেপ কথাটাব নিন্দে কবাব কিছু নেই। মানুষকে এস্‌কেপ কবতে হয়। এস্‌কেপ না-কবলে সে পাগল হয়ে যাবে।

[কিন্তু] জীবন থেকে কখনই পালায় না। জীবনকে সে গভীবভাবে অনুভব কবাব জন্য এই যে সময়েব শৃঙ্খলে বাঁধা এই যে চ্যাঁচামেচিব পৃথিবী তা থেকে সে নিজেব মধ্যে সবে যেতে চায়।

এখন আমি যেটাকে মনে কবি ইস্‌থেটিক ডিলাইট, সেটা হচ্ছে সেই বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছানো যে বিন্দুতে

গিয়ে আমার সাহিত্যের মধ্যে যা বলা আছে তার বাইরে আর কিছু দেখি না, সেটাকেই আমি সারাৎসার বলে মনে করি। তার ফলে কী হয়? পৃথিবীতে অন্যত্র কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি সেখান থেকে এস্কেপ করেছি ইন দ্য পোয়েট্রি। এই অবস্থায় যখন আমি কোনো ছবি বা কোনো কবিতা বা কোনো ফিক্শন-এর মধ্যে পৌঁছাই তার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকি তখন তার মধ্যে আমি ডিলাইট কে পাই। দ্যাখো, ইস্থেটিক ডিলাইট একধরনের এস্কেপিজম্—এটা খুব গালাগালির কথা। শুনলে তোমরা বলবে এসকেপিস্ট হলে আমাদের আর দরকার কী? আমি আগেই বলেছি জীবন থেকে পালানো নয়। জঠরে থেকে যেভাবে জীবনকে, শুরু জীবনকে, অনুভব করার জন্য শুধু জীবনকেই অনুভব করে—সে তো আর কিছু ভাবে না। তেমনি এই যে জাগ্রত অবস্থা—আমরা যাকে ঘুম বলি—তারই তুলনা হচ্ছে আমার কন্শাস্নেস-এর মধ্য থেকে আমার যে অ্যাক্টিভ ইনটেরিয়র ওয়ার্ল্ড থেকে সেই ঘুমের জগৎ হচ্ছে সেই শিল্পের জগৎ। ঘুম যেমন আমাকে সক্রিয় ক'রে আমার মেধাকে পরিপুষ্ট ক'রে পরের দিন সকালে কাজ করবার জন্য উৎসাহ যোগায়—আমার এই শিল্পের নন্দনতত্ত্বের আনন্দ আমাকে শক্তি সামর্থ্য করে রাখে, আমাকে নতুন নতুন লিখতে প্রেরণা যোগায়। শুধু তাই নয়, নতুনভাবে পৃথিবীকে চিনতে শেখায়—আমরা এতদিন যা দেখে এসেছি চিনে এসেছি তার থেকে অন্যরকম হতে পারে পৃথিবী। আমি তো এতদিন কজ অ্যান্ড কন্সিকোয়েন্স হিসাবে যা দেখেছি সব মিথ্যা। আমার ইমোশনটাকে বাদ দিয়ে আমি চলে এসেছি। আরো একটা মজার জিনিস দ্যাখো, যে ইসথেটিক ডিলাইট সম্বন্ধে বলছিলাম, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এর একটা তুলনা আছে যে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরা'—নান্দনিক আনন্দ ব্রহ্মস্বাদের সহোদর।

যখন যোগী ধ্যান করতে আরম্ভ করে সে নাকে চোখ টেঁখ রাখে অনেককিছু করে করতে করতে সে যখন একটা জায়গায় এসে পৌঁছায় যখন সে জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান এবং জ্ঞাতা এক হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় সে একটা ভরশূন্য অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেখানে তার বাইরে কিছুই নেই, সে সব জ্ঞান সে জ্ঞাতা—সে নিজে জ্ঞান এবং সে নিজেকে জ্ঞানের মধ্যেই ডুবিয়ে রেখেছে। তার মানে অজ্ঞান নয় সে, সে দূরে সরে যায়নি, পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। তেমনি শিল্পের এই যে নান্দনিক আনন্দ বা ইসথেটিক ডিলাইট সেটা জীবন থেকে সরে যাওয়া নয়, পূর্ণভাবে তাকে পাওয়া—এক কথায় বলছি এসকেপ অন্য কথায় এসকেপ মানে এই। এস্কেপ মানে এই নয় যে, আমি কিছুই দেখছি না। আমি বোধ হয় তোমাকে গঙ্গার কথা বলেছি। গঙ্গা আমিও দেখেছি, তুমিও দেখছ—একসময় আমার মনে হল আমরা একটা গঙ্গা আঁকব। আমি কিন্তু ফটোগ্রাফি করব না, যদি কেউ বলে ফটোগ্রাফি করেছে খুব নিসর্গাসিক হয়েছে—মিথ্যে কথা। কোনো শিল্পী কোনো সাহিত্যিক ফটোগ্রাফি করে না। ফটোগ্রাফার আর শিল্পীর মধ্যে তফাত এইখানে যে শিল্পের গঙ্গাটা আকাশে চলে যায়। শিল্পী নিজে একটা গঙ্গা তৈরি করে। ওই গঙ্গাটা পারফেক্ট। পারফেক্ট মানে এই নয় যে ওই গঙ্গায় ত্রুটি নেই, জল নোংরা হয় না, ওই গঙ্গায় কান্না নেই, ওই গঙ্গার তীরে শবদাহ হয় না। ওই গঙ্গায় সবই এই গঙ্গার মতো হয়, কিন্তু ওই গঙ্গার মৃত্যু নেই আর এই গঙ্গা শুকোবে।

তাহলে একটা কথা বলি। আমাকে দেখতে হবে সাহিত্য করবার আগে। এ তো একটা শিল্প, বহুদিন ধরে তৈরি হয়। এতে নিজেকে সেপারেট করতে হয় দ্রষ্টা হতে হবে, দেখতে হবে মন্ত্রদ্রষ্টা না হোক, সত্যিকারের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, অনুভব করতে হবে, জানতে হবে। এইভাবে জেনে জেনে সে একটা গঙ্গা তৈরি করে মনে মনে—সে একটা পৃথিবী তৈরি করে। সে মানুষ তৈরি করে। যত মানুষ পৃথিবীতে বাঁচে ঠিক তত মানুষ সেখানেও বাঁচে। এদের যতগুলো অনুভূতি আছে, ভাব আছে সেখানেও আছে। এখন আমি যখন একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি—অনুভূতির সমস্যা, বুদ্ধির সমস্যা—তখন আমি বিরাম লাভ করলাম। এটা কিন্তু কোনো পোলিটিক্যাল বা ইকনোমিক্যাল সমাধান নয়, মানুষের জীবনের সমাধান—টোটাল জীবনের সমাধান। তখন আমি কী করি? বিরাম লাভ করি। এবং পাঠকও যখন পড়তে পড়তে সাহিত্যিকের মনের সঙ্গে, অনুভূতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে তখনই ইস্থেটিক ডিলাইট লাভ করে।

পাঠককেও বিচ্ছিন্ন হতে হবে, বিচ্ছিন্ন করতে হবে। শিল্পী যেমন বিচ্ছিন্ন করছে নিজেকে শিল্পসৃষ্টির সময় এবং যে শিল্প আস্বাদন করছে সে-ও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে শিল্প উপভোগের সময়। এখন এই দুটোর ফিউশন হবে কখন? ফিউশন হবে তখনই যখন ইকোয়াল ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। একেই সংস্কৃত সাহিত্য বলছে 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী'। উভয়ের অনুভূতি সমান এবং এইভাবেই ইস্থেটিক ডিলাইট এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে যায় বলে আমি মনে করি।

আশা করি দুজন পাঠক বুঝবে, তারা আরো পাঁচজনকে খবর দেবে সত্যি যদি আমার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো কিছু থাকে। তাহলে উঠবার লোকও থাকবে। আর, আমি যদি উইটিবি হই তাহলে এসেও কোনো লাভ হবে না। রবি ঠাকুরের কবিতা সম্বন্ধে যেমন বলতে পারি, রবি ঠাকুরের কবিতাটা আজ সকালে পেয়েছি, হঠাৎ আমার কুড়ি বৎসরের কাছাকাছি এসে মনে হল—সত্যি, কবিতাটা আজকে পেলাম ; তেমনি হয়তো আজ থেকে একশো বছর পরে কোনো পাঠকের মনে হল, আরে! এই দুটো লাইন তো বড় জীবনের কাছাকাছি লেখা। তাদের জন্যই লিখি।

সূত্র : প্রথম অনুচ্ছেদটি 'জারি বোবাযুদ্ধ', জানুয়ারি ২০০২—যা প্রকৃতপক্ষে এই সাহিত্য পত্রিকার ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রণ থেকে সংকলিত। 'কথা বলতে বলতে' শিরোনামের এই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন পত্রিকা সম্পাদক তাপস ঘোষ ও প্রচেতা ঘোষ ; সাক্ষাৎকার শেষে অমিয়ভূষণ মজুমদারের স্বাক্ষর-সহ তারিখ হল ২৭. ১২. ৮৮।

দ্বিতীয় অংশটি নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত 'একটি মফস্বলীয় গদ্যের কাগজে—নবার্ক'-র ১:১, নভেম্বর ১৯৮৬ থেকে সংকলিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী।

উপন্যাস

দু খি য়া র কু ঠি

প্রথম প্রকাশ শারদীয় 'গণবার্তা', ১৩৬৪। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ কলকাতা : নিও লিট পাবলিশার্স, ১৩৬৬ : 1959। উপন্যাসটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৩৬৯ : 1989। সংস্করণের 'মুখবন্ধ'-এ লেখক জানিয়েছিলেন : 'সংস্করণ সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু প্রাচীনপন্থী হতে পারে। পরন্তু উপন্যাসটিতে কিছু পরিমাণে পুনর্লিখন ও সংযোজন হয়েছে। প্রকাশের আবার পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে শিল্পের প্রয়োজনেই অংশত নতুন করে লেখা দরকার। আশা করছি এই উপন্যাসটি যাঁদের ভালো লেগেছিল তাঁদের এখন আরো ভালো লাগবে। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে এই সংস্করণ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশিত হতে চলেছে। তাঁদের গ্রহণযোগ্য হলে সার্থক হবে'। স্বাক্ষরিত এই মুখবন্ধের তারিখ ছিল ১০ই ফাল্গুন, ১৩৯৫/কোচবিহার। উৎসর্গ · 'আমার গল্পের আদি পাঠক/আমার মাকে'।

নি র্বা স

প্রথম প্রকাশ শারদীয় 'গণবার্তা', ১৩৬৬। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ কলকাতা : নিও লিট, ১৩৬৬ : 1959। পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬। উপন্যাস সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য : 'এটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। যদি রাজনীতির কোনো ইশারা এসে গিয়ে থাকে, তবে তার প্রতিপাদ্য রাজনীতি উদ্বাস্তুকে তার বাস্তু ফিরিয়ে দিতে পারে না। যদি কিছু রাজনীতি করে, তা মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা মানুষদের নিয়ে ভোটের ব্যবসা করতে পারে।

নিও লিট এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে। এই সংস্কবণে কিছু সংযোজন হয়েছে। আশা করি তা নতুন মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু মূলত একই থেকে গিয়েছে 'পোস্ট কলোনিয়াল' সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম দিককার নিদর্শন'। উৎসর্গ : 'অধ্যাপক শ্রীমান নবকুমার নন্দীর করকমলে'।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে 'গণবার্তা' পত্রিকা দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে।

গল্প

সাদা মাকড়শা। গল্পটি 'গণবার্তা', ১৩৬১ : 1954-এ প্রকাশিত। ১৯৬২ সালে কলকাতা : নিউ স্ক্রিপ্ট প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চকন্যা'-র অন্তর্ভুক্ত।

হনিড লার্ক। 'নতুন সাহিত্য', ১১ : ১, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৭। গ্রন্থালয় প্রকাশিত 'অমিয়ভূষণ মজুমদার/গল্পসমগ্র' প্রথম খণ্ড-এর অন্তর্গত। *পত্রিকাটির সংখ্যা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।*

গল্প। 'মানস', ৫ : ২, মার্চ ১৩৬৭। গ্রন্থালয়-প্রকাশিত 'গল্পসমগ্র'-এ অন্তর্ভুক্ত। 'মানস' পত্রিকা অজয় গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

একটি বিপ্লবের মৃত্যু। নতুন সাহিত্য, ১২ ৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬১। অনিলকুমার সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
অনঘমিত্রা। 'নতুন সাহিত্য', ১৩ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ · 1962। অনিলকুমার সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
সুশোভনার কাহিনী। পত্রিকা ও প্রকাশ তারিখ নিয়ে সংশয় আছে—'অন্যস্বর' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হলেও সম্ভবত পুনর্মুদ্রণ। অনিল সিংহ জানিয়েছিলেন, 'নতুন সাহিত্য'-এ প্রকাশিত বেশ কয়েকটি গল্পের একটি 'খুব সম্ভব সুশোভনার কাহিনী'। গল্পটি কলকতা . গ্রন্থালয়, ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'অমিয়ভূষণ মজুমদার/গল্পসমগ্র' প্রথম খণ্ড-এর অন্তর্গত।
রানী ইন্দুমতী। পত্রিকা ও প্রকাশ তারিখ জানা নেই। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৬৫) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
পদ্মিনী। পত্রিকাও প্রকাশ তারিখ জানা নেই। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-র (১৯৬৫) অন্তর্ভুক্ত।
ভূকম্পন। পত্রিকা ও প্রকাশ তারিখ জানা নেই। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-ব (১৯৬৫) অন্তর্ভুক্ত।
ভদ্রলোকের বাড়ি। পত্রিকা ও প্রকাশসাল 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৬৫)-ব অন্তর্ভুক্ত।
পলদহ। পত্রিকা ও প্রকাশসাল জানা নেই। ১৯৬৫ সালে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'দীপিতাব ঘবে রাত্রি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

নাটক

বাঙাদি। উত্তবাযণ, ১ ১০,